ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক পরিচালিত

প্রতিভা

মাসিক পত্রিকা

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্ সম্পাদিত

অষ্টম বর্ষ

১৩২৫

বর্ষ সূচী

বর্ণানুক্রমিক

ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ

সপ্তম সাংবৎসরিক কার্য্য বিবরণী—

১৩২৪ সন

১৩২৪ সনের চৈত্র মাসে ঢাকা সাহিত্য পরিষদের সপ্তম বর্ষ পূর্ণ হয়। উক্ত সনে পরিষদের সভ্য সংখ্যা এইরূপ ছিল :—

আজীবন সভ্য——১৩

সাধারণ সভ্য——৪০১

বিশিষ্ট সভ্য—— ১

অত্যধিক সংখ্যক ভিঃপিঃ ফেরত আসার দরুণ এই বৎসর সভ্য সংখ্যার এইরূপ হ্রাস হইয়াছে। অনেক সময়ে মফঃস্বলের সভ্যগণ তাঁহাদের ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ আমাদিগকে জানান না। এই কারণেও অনেক ভিঃপিঃ ফেরত আসিয়াছে। আমি এবিষয়ে মফঃস্বলের সভ্য বৃন্দের নিকট বিনীত নিবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা যেন আমাদিগকে আপন আপন ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ যথা সময়ে জানাইয়া দেন। এবং যাঁহারা সভ্য থাকিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা যেন তাঁহাদের প্রদত্ত অগ্রিম চাঁদা ফুরাইয়া গেলেই আমাদিগকে পত্রিকা পাঠাইতে নিষেধ করেন। তাহা হইলে ভবিষ্যতে পরিষৎ অনেক অনর্থক ক্ষতির হস্ত হইতে রক্ষা পাইবে। আলোচ্য বর্ষে বঙ্গ কবিকুলরবি স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ঢাকা সাহিত্য পরিষদের আজীবন সভ্য পদ গ্রহণ করিয়া পরিষৎ ভাণ্ডারে ১০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, এতদ্দ্বারা ঢাকা সাহিত্য পরিষদের অশেষ গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, ঢাকার প্রধান শ্রেষ্ঠী শ্রীযুক্ত গৌরনিতাই সাহা শঙ্খনিধি মহাশয়ও এই বৎসর পরিষৎ ভাণ্ডারে ১০০৲ টাকা দান করিয়া পরিষদের আজীবন সভ্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন।

১৩২৪ সনে আয় ব্যয় এইরূপ হইয়াছিল—

গত বর্ষের উদ্বৃত্ত সহ মোট আয়—	৩৩৭০।
ব্যয়—	১৭৬৯৵১৫
উদ্বৃত্ত তহবিল	১৫৬১৴

ইউরোপীয় যুদ্ধের দরুণ কাগজের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়াতে আমাদিগের এইরূপ ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, ১৩২৩ সনের কার্য্য বিবরণীর উল্লিখিত বন্দোবস্ত অনুসারে মাসিক ১৫৲ টাকা হিসাবে পরিষৎ কার্য্যালয়ের ভাড়া দিতে হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষেও পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় একজন বেতনভুক্ কেরাণী ও পিয়ন নিযুক্ত ছিল। আলোচ্য বর্ষে নিম্ন লিখিত ১১টী মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল—

তারিখ	প্রবন্ধের নাম	লেখকের নাম
২৩ শে জ্যৈষ্ঠ	বিক্রমপুরের বিবাহ মঙ্গল	শ্রীমতী ইন্দুবালা সেন (প্রবন্ধপাঠক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী)
২রা শ্রাবণ	সুইডেনের নাট্যকার ষ্ট্রীণ্ডবার্গ	শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র মজুমদার এম, এ, বি, এল
১৪ আশ্বিন	প্রাচীন ভারতে আগ্নেয়াস্ত্র	শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম, এ
৭ই পৌষ	সভ্যতার খতিয়ান	শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল
১৫ই পৌষ	কবি আবদুল শুকুর মহম্মদের গোপী চাঁদের গীত	রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম, এ, (প্রবন্ধপাঠক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী)

তারিখ	প্রবন্ধের নাম	লেখকের নাম
২৫ শে মাঘ	নব্য নারী-সমস্যা	শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম এ, বি এল।
২৭ শে মাঘ	১৩২৩ সনের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ	শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ।
১১ই ফাল্গুন	প্রাচীন ভারতে বিবাহ বিধান.	ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম, এ, ডি এল
২০ শে ফাল্গুন	প্রাচীন গন্ধার	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন এম, এ
২১ শে চৈত্র	মনসা মঙ্গল ও পৌরাণিক মনসা	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ বি, এ বিটি
৮ই বৈশাখ (১৩২৫)	পাল ও সেন রাজগণের আমলে বাঙ্গালীর শৌর্য্য	শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি এ

শেষোক্ত প্রবন্ধ ১৩২৪ সনের চৈত্র মাসেই পঠিত হইবার কথা ছিল কিন্তু অনিবার্য্য কারণ বশতঃ উহা স্থগিত রাখিতে হইয়াছিল। বর্ত্তমান বর্ষের বৈশাখ মাসের ৮ই তারিখে উহা পঠিত হয় এবং ঐ অধিবেশন ১৩২৪ সনের একাদশ মাসিক অধিবেশন বলিয়াই গৃহীত হয়।

১৩২৪ সনের ১২ই জ্যেষ্ঠ তারিখে পরিষদের ৫ম বার্ষিক অধিবেশন হয়। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও নরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ মহাশয় উক্ত অধিবেশনের সভাপতি রূপে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে এক গভীর গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ করেন। উক্ত বিষয়ে এরূপ আলোচনা আর ইতিপূর্ব্বে হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

ইহা ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত ৩টী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল—

তারিখ	বিষয়	লেখক
২০ শে শ্রাবণ	প্রতিভা ও চারিত্র নীতি	শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

এই সভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্ চেন্সেলার ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৬ ই আশ্বিন	বৈষ্ণব সাহিত্য	শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ ভাগবতরত্ন বি এ
৫ই পৌষ	কবি গোবিন্দ রায়	শ্রীযুক্ত কামিনী কুমার সেন এম, এ, বি এল

এই বৎসর পরিষদের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির ৭টী অধিবেশন হইয়াছিল। হিসাব পরীক্ষক শ্রীযুক্ত শ্যামাশঙ্কর দাস বি এল ও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র রায় যত্ন পূর্ব্বক হিসাব পরীক্ষা ও মঞ্জুর করিয়া দিয়াছেন।

পত্রিকা সম্পাদক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অক্লান্ত চেষ্টায় পরিষৎ পত্রিকা 'প্রতিভা' এবৎসরও নিয়মিত-রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

এই বৎসরও ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ স্বীয় কর্ত্তব্য পালনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। পুরাতত্ত্বের বিভিন্ন বিভাগে ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন ও শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র লাল আচার্য্য মূল্যবান গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। স্থানীয় সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কে শ্রীমতী ইন্দুবালা সেনের বিক্রমপুরে বিবাহ মঙ্গল প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য সম্পর্কে রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ বি এ, বি টি মহাশয়ের প্রবন্ধ দ্বয় মূল্যবান। আধুনিক সাহিত্য বিভাগে কবি গোবিন্দ রায় সম্পর্কে শ্রীযুক্ত কামিনী কুমার সেন এক মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। যিনি 'কতকাল পরে'ও 'যমুনা লহরী' প্রভৃতি গান

লিখিয়া অমর হইয়াছেন, তিনি ঢাকার লোক। তাঁহার জীবন চরিত ও রচনা সম্পর্কে যাহা কিছু জানা সম্ভব, তাহা সংগ্রহও ঢাকা সাহিত্য পরিষদের অবশ্য কর্ত্তব্য। কামিনী বাবু তৎসম্পর্কে হস্তক্ষেপ করিয়া আমাদের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। নীতিশাস্ত্র সম্পর্কে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'প্রতিভা ও চারিত্র নীতি' শীর্ষক প্রবন্ধ স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ সুধীবর্গের সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে।

আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্য সম্পর্কে শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় দুইটী প্রবন্ধ লিখিয়া এবিষয়ে পরিষদের পূর্ব্ব কৃতিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ঢাকা আসিয়া বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ে এক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। তিনি সমসাময়িক বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ সঙ্কলন করিয়া কলিকাতা সাহিত্য পরিষদে পাঠ করিয়া থাকেন। কিন্তু আলোচ্য বর্ষে তিনি ১৩২৩ সালের বিবরণ ঢাকা সাহিত্য পরিষদে পাঠ করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ভরসা করি, ভবিষ্যতেও তিনি এইরূপ ঢাকা সাহিত্য পরিষৎকে অনুগৃহীত করিতে বিরত হইবেন না।

পরিষদের মন্দির নির্ম্মাণকার্য্যের চেষ্টা আর একটুকও অগ্রসর হয় নাই। আমাদের এই কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইলে চলিবে না। ভরসা করি, পরিষদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রই এই বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা ও উদ্যম করিবেন।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ, সম্পাদক।

৮ম বর্ষ　　বৈশাখ ১৩২৫　　১ম সংখ্যা

স্বাগতম্

(ঢাকা সাহিত্য-সম্মিলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ) ।

হে আমার মা আনন্দময়ী বাঙ্গলার সন্তানগণ, আজ গঙ্গা-পদ্মা-করতোয়া-মেঘনা-ব্রহ্মপুত্র-নদ-বারি-বিধৌত সেই প্রাচীন গৌড়-বঙ্গের অতীত সমৃদ্ধির স্বপ্নময় পুরীতে মা আমাদের ডাকিয়াছেন, তাই আজ আমরা মার কথা কহিবার জন্য এখানে মিলিত হইয়াছি। 'বন্দে মাতরম্'— সুজলা সুফলা নদীবহুলা এই আমার মাতৃভূমিকে বার বার বন্দনা করি! জননী আমাদের যে বাণী দিয়াছেন, মাতৃকণ্ঠের সেই গর্ব্বাণী—সেই মা মা ধ্বনি, পবনে গগনে ধ্বনিত হইয়া পদ্মার পারে পারে যেন সেই বাণী দুলিতে থাকে, মাও যেন প্রাণমন ভরিয়া সন্তানের এ বাণী শুনিয়া আকুল হন।

আজ সংক্রান্তির ক্রান্তিপাত পড়িয়াছে, বর্ষ ওই চলিয়া যায়, নূতন তাহার রাগোজ্জ্বল বিভায় মূর্ত্তিমন্ত হইয়া আমাদের ঘরে অতিথি হইতে আসিয়াছে; সেই কবেকার গৌড়ের আঙ্গিনায় সেই পুরাতন আবার নূতন হইয়া আসিয়াছে। তাই আজ বলিতেছি, হে আমার পুরাতন, হে আমার নূতন, স্বগৃহে স্বাগতম্! এই গৃহের রজে পিতৃপিতামহের পদারবিন্দের রেণুকণা আছে, এই ধূলি মস্তকে গ্রহণ কর, এই আয়ুষ্মন্ বায়ুতে তাঁহাদের নিঃশ্বাসের গন্ধ আছে, প্রাণ ভরিয়া মাখিয়া লও, এই পদ্মা-গঙ্গার জলধারায় তাঁহাদের তর্পণ হইয়াছে, তাঁহারা তৃপ্ত হইয়াছেন, আজি আমরা তাঁহাদের সেই স্মৃতির স্মরণে ধন্য হইব।

কত দিনের এ দেশ! কত সভ্যতার কাহিনী এই ধূলিতে তাহার চরণচিহ্ন রাখিয়া গেছে, কত মান-সাগর এই পদ্মা-সাগরের তীরে তীরে ঢেউয়ের মাথায় মাণিক ছড়াইয়া গেছে, কে আজি তাহার সে স্মৃতির ধ্যান করে! কিন্তু স্মৃতি আত্মস্থ হইতে শিখায়, প্রতি ব্যক্তিতে চৈতন্যের আভাস জাগাইয়া দেয়, তাই স্মৃতির স্মরণ পুণ্যকথা।

সেই পুণ্যকথার শ্রবণে মনুষ্য-জন্ম ধন্য হয়, তাই আজ মাতৃ-মন্দিরে সেই পুণ্য কাহিনী শুনিতে আমরা মিলিত হইয়াছি। মাতৃরূপা এই শ্যামলা জননীকে আমরা বার বার নমস্কার করি!

আপনারা আজ যে গৃহের আঙ্গিনায় সবে সমবেত হইয়াছেন, কত ইতিহাস তাহার আছে। কত আলো-কোজ্জ্বল প্রভাত, কত ঘোরা অমানিশার কাহিনী, তাহার অঙ্গে অঙ্গে জড়াইয়া আছে। দুর্দ্দাম দুর্ব্বার পদ্মার ভাঙ্গন, কত রাজ্য গড়িয়াছে, কত ভাঙ্গিয়াছে। পদ্মার ভাঙ্গন ও গড়ন আজিও থামে নাই; কিন্তু যে ইতিহাস সে একবার গড়িয়াছে, সেই পৃষ্ঠা সে নিজেই আবার ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়াছে। আপনারা আজ যেখানে আসিয়াছেন, অশ্রান্ত-বারি-বিস্তার পদ্মা আপনাদের বুকে করিয়া আনিয়াছে। কিন্তু পদ্মার সে গৌরবের দিন নাই, হে অতিথি! হে নারায়ণ! সে—

* * * * জলপাত্র, দিব্যাসন,
সুরঙ্গ-কম্বল, বহু প্রকার বসন,
উত্তম পদার্থ যত ছিল যার ঘরে—

তাহা আর নাই!

কাল আমাদের ভাগ্যহীন করিয়াছে। চিরদিনই কিন্তু আমরা এমন ছিলাম না। ইতিহাস আলোচনার অবসর এখন নয়। আর আমি ইতিহাস ব্যবসায়ীও নহি। আমি সেই পরশমণির খোঁজেই ছুটিয়াছি। বাঙ্গালীর প্রাণধর্ম্মের আমি কাঙ্গাল। ইতিহাস সেই প্রাণধর্ম্মেই ভিত্তি করে, সেই প্রাণধর্ম্মের ইতিহাসেই জাতির প্রাণের সত্য পরিচয় পাওয়া যায়। দেশ-মাতৃকার ক্রোড়ে সন্তান চিরদিনই সেই প্রাণের স্নেহরসে জীবিত থাকে। সেই প্রাণধর্ম্মের পরিচয় মার আশীর্ব্বাদে প্রাণের অনুভূতিতেই জাগে, স্বধর্ম্মের তন্ত্রীতে সে সুর ধ্বনিয়া উঠে, সন্তান মার স্নেহের সত্য পরিচয় লাভ করে। সেই প্রাণধর্ম্মের দিক হইতেই এই ডাক আমার আসিয়াছে; মা আমাকেও ডাকিয়াছেন, আপনাদের সেবার জন্য; মা আপনাদেরও ডাকিয়াছেন, মিলিবার জন্য। প্রাণে প্রাণে, মর্ম্মে মর্ম্মে, ভাবে ভাবে। এ এক বিশাল প্রাণযজ্ঞ, যে যজ্ঞের হবিঃ প্রাণ, যে যজ্ঞের চরু জীবন, যে যজ্ঞের কামনায় মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠা হয়, যে যজ্ঞের হোমধূমের মাঝে সাহিত্যের মিলনবাণী ও মন্ত্র ধ্বনিত হয়, জাতি আপনাতে আত্মস্থ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ দেখিতে পায়। সেই মাহেন্দ্রক্ষণে, হে আমার পুরাতন, হে আমার নূতন অতিথি! ব্রীহি, যবধান্য সকলি প্রস্তুত, আপনারা যজ্ঞে বৃত হউন। আজ পূর্ব্ববঙ্গ দরিদ্র হইলেও,

তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সূনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন॥

দারিদ্র্যের জন্য অন্নদানে অক্ষম হইলেও, অতিথির শয়নের জন্য তৃণ, বিশ্রামের জন্য ভূমি, চরণপ্রক্ষালনের জন্য জল, আর চতুর্থতঃ প্রিয়বচন—স্বধর্ম্মপরায়ণের গৃহে এ সকলের উচ্ছেদ বা অভাব কদাচ সম্ভব নয়।

অকৈতবে চিত্ত সুখে যার যেন শক্তি।
তাহা করিলেই বলি অতিথির ভক্তি॥

এ অকিঞ্চন যেন চিত্ত-সুখে সেই অকৈতব ভক্তি নারায়ণের জন্য সাজাইয়া রাখিতে পারে। তাই আজ পূর্ব্ববঙ্গ—

শিরে ধরি বন্দে নিত্য করো তব আশ।

আমাদের আয়োজন অতি অল্প। সে দিন আর আমাদের নাই। কিন্তু আপনারা যে ভূমিতে আজ চরণ-চিহ্ন আঁকিতে আসিয়াছেন, সে ভূমি বহু পুরাতন; হে নূতন! সে পুরাতনের স্বপ্ন-ঘেরা মোহ-তমাচ্ছন্ন দিনের পরপারে সে যবনিকা একবার সরাইয়া দেখিবে না কি—কাল যে অবগুণ্ঠনে তাহাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে, এ সেই ঢাকা নগরী। শুনা যায়, এই নগরীর নাম ঢাকা হওয়ার দু'একটা প্রবাদ কথা আছে। 'ঢাক' বলিয়া এক রকম গাছ এ দেশে প্রচুর ছিল, তাই সেই গাছের নাম হইতে এই নগরীর নামকরণ হইয়াছে। যদিও সে 'ঢাক' গাছ এখন আর মিলে না। কেহ

বলে, সম্রাটশেখর বল্লাল, বুড়িগঙ্গার উত্তরে যে অরণ্যানী ছিল, সেই অরণ্যে দশভুজার এক ধাতুমূর্ত্তি পান। অরণ্যের অন্ধকারে সে সিংহবাহিনী ঢাকা ছিল। বল্লাল পিতৃসিংহাসন পাইবার পর, সম্রাট বল্লাল ঢাকেশ্বরীর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া এই ধাতুমূর্ত্তিকে—দুর্গামূর্ত্তিকে নগরের অধীশ্বরী রূপে স্থাপিত করেন, তাঁহার নাম ঢাকেশ্বরী। তাই এই নগরের নাম ঢাকা। আবার কেহ বলেন, ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন ইসলাম খাঁ রাজমহল হইতে বুড়িগঙ্গায় আসিয়া, এই নদীবক্ষস্থ ভূমিকে মনোরম দেখিয়া, এইখানে রাজধানী করিবার সঙ্কল্পে স্থিরনিশ্চয় হন। আজ যেখানে ঢাকা অধিষ্ঠিত, সেই স্থান হইতে ঢাক বাজাইলে যতদূর অবধি শুনা যায়, ততদূর পর্য্যন্ত সহরের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া ইহার নাম ঢাকা রাখেন। কীর্ত্তিনাশার বক্ষের উপর দিয়া আজ আপনারা সেই ঢাকা নগরীতে আসিয়াছেন।

শতাব্দীর সেই যবনিকা যদি সরাইয়া দেখেন, তবে দেখিবেন যে সমুদ্র হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত এই বিশাল জনপদই বঙ্গদেশ—এখন সচরাচর যাহাকে পূর্ব্ববঙ্গ বলে, মহাভারত ও পৌরাণিক যুগের সময় হইতে গৌড়ের সেনরাজগণের রাজত্ব পর্য্যন্ত তাহাকেই বঙ্গ বলিত। পদ্মামেখলা এই চিরশ্যামা একদিন কি মহিমার কোটী সূর্য্য কিরণ ভাতিতে দীপ্তিময়ী ছিল। ঢাকা, বিক্রমপুর বলিতে সেই পুরাতন গৌড়বঙ্গের কেন্দ্র বলিয়া মনে পড়ে। গৌড়-বঙ্গ ও মগধের কত না কাহিনী, কত সভ্যতার সংবর্দ্ধনের ইতিহাস ওতপ্রোত ভাবে চলিয়াছে। মগধের কণ্ঠলগ্ন হইবার পূর্ব্বে গাঙ্গেয়গণের বিপুল বলশালী রণকুঞ্জরসজ্জিত অসংখ্য বাহিনী-শোভিত এই দেশের প্রাসাদশিখরে গগনস্পর্শী স্বাধীনতা-ধ্বজা সূর্য্যকিরণে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিত। সপ্তম শতাব্দীতে সে গৌড়-বঙ্গ কালের ঝঞ্ঝায় আঁধারে ডুবিয়া গেল। তারপর একদিন উত্তরাপথের আলোড়নে যুগবিপর্য্যয় হইল। অবিরাম রাজ্যবিপ্লবে দেশ তোলপাড় হইয়া গেল। এই যুগব্যাপী ঘোর অরাজকতার ভিতরে বাঙ্গালার প্রাণ লুকাইয়াছিল, সে তাহার ধর্ম্ম ত্যাগ করে নাই। সুপ্ত প্রজাশক্তি সহসা স্বপ্নোত্থিতের মত আঁখি কচলাইয়া ভোরের আলোকে সব দেখিয়া লইল। সিংহপ্রতিম প্রজাশক্তি সমবেত হইয়া সেই "মাৎস্য ন্যায়", সেই দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার ও অরাজকতার চরম দুর্দ্দশাকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিল। এই যুগেই গৌড়-বঙ্গের শিল্প-প্রতিভায় বাঙ্গলার প্রাণধর্ম্মের বিকাশ অতি সুন্দর ভাবে প্রস্ফুরণ হইয়াছিল; জগতের ইতিহাসে সে কাহিনী সোনার নিকষে রেখা টানিয়া লিখিয়া রাখিয়াছে। আজ সে দিন গিয়াছে, কালের যবনিকা তাহাকে শুধু তমগূঢ় অন্ধকারে ঘেরিয়াছে। তারপর, কুক্ষণে বঙ্গ গৌড়-বঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। বিচ্ছিন্ন বঙ্গ ও গৌড় এই বিচ্ছেদে হীনবল হইয়া পড়িল। স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনে ভেদবুদ্ধি আসিয়া উভয়কেই নষ্ট করিল। সে দিন বঙ্গ যে মহামণি প্রাণের মণিকোঠায় রাখিয়াছিল, তাহা টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া গেল। বাঙ্গলার মহানাগ অনন্তের মাথার মণি সেই দিন হারাইয়া গেল। তাহা আর মিলিল না। হায় গৌড়, কেন এমন মণি হারাইয়া ফেলিলে! তাই সেই বিচ্ছেদের দিনে—সেই বিরহের দিনে—বাঙ্গালীর রাজার মাথার শ্বেতছত্র কে কাড়িয়া লইল? সে উত্তর ইতিহাস আর দিবে কি?

এইরূপে সেই যে দিন গৌড়ের স্বাধীনতা গঙ্গার জলে ভাসিয়া গেল, সে দিনও এই পদ্মামেখলা শ্রীবিক্রমপুরের প্রাসাদশীর্ষে স্বাধীনতা-সূর্য্যের শেষ রশ্মিরেখাটুকু বঙ্গের ভাগ্যাকাশ হইতে একবারে মিলাইয়া যায় নাই। আজ সে শ্রীবিক্রমপুরের সে শ্রী নাই, বুকের উপর দিয়া পদ্মা চলিয়া গেছে, সে ভূভাগকেও টুক্‌রা করিয়া দিয়াছে। সেই স্বপনের দেশ, কোথায় গেল? সুখের সে স্মৃতি আছে, আর কিছু নাই।

আজ পূর্ব্ববঙ্গ শ্মশান— পারতন্ত্র্য অন্ধকারে দিবসে নিশীথ! প্রেতের মত আমরা কয়টী আছি। তবু এই

আমাদের ভিটা। তৈল বিনা সন্ধ্যা-দীপ জ্বালিতে পারি না, ঘরের চালে খড় দিতে পারি না, দেউলে দেবসেবা হয় না! কীর্ত্তিনাশা ভাঙ্গে গড়ে, দুর্দ্দমা মাতঙ্গিনী একবার করিয়া কাঁদে, আরবার গরজি আস্ফালন করিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া ওঠে। পেটে অন্ন নাই, কটিতে বস্ত্র নাই, জলাশয়ে জলও নাই। যে মহাবীর্য্যের কেন্দ্র হইতে গৌড়বঙ্গ একদিন প্রয়াগ পর্য্যন্ত শাসনদণ্ড পরিচালন করিত, যে কেন্দ্র হইতে একদিন বঙ্গ জগতের বিলাস যোগাইত, যে কেন্দ্র হইতে গৌড়ীয় রীতি ভারতে চলিয়াছিল, এ সেই ভূমি! যে ভূমিতে আদিশূর একদিন পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এ সেই ভূমি! এই ভূমিতেই সেই সাগ্নিক পঞ্চব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন; যাঁহাদের আশীষমন্ত্র ও শান্তিবারিতে শুষ্ক গজারী বৃক্ষ নব মুঞ্জরায় মুঞ্জরিত হইয়াছিল, এ সেই দেশ! সিংহল, বালী, আরব, সুমাত্রা হইতে যে বাণিজ্য-লক্ষ্মী অর্ণবপোত বোঝাই করিয়া ধন আনিত, সে ধনেশ্বরী আজ নাই। শতাব্দীর ছিন্নবিচ্ছিন্ন মেঘান্ধকারে সে সব কোথায় মিলাইয়া গেছে। তাই আজ মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য নিজ গৃহে পরান্নভোজী, নিজ গ্রামে চিরপরবাসী, জীবন-মরণের সন্ধির মধ্যে না-বাঁচা না-মারা হইয়া আছি। কি দিয়া আপনাদের অভ্যর্থনা করিব। কবির সে কণ্ঠ আমার নাই, তাহা হইলে আজ শুনাইতাম---এই অরণ্যানীমুখরিত বনভূম শ্যাম-তমাল ক্রমসুশোভিত দেশের রূপের কথা; শুনাইতাম— এই অতল জলরাশির অতল তলে কি সৌভাগ্য ও বৈভব নিমজ্জিত; শুনাইতাম—যদি আমার এই প্রিয় সুহৃৎ গোবিন্দদাসের মত আমার কণ্ঠ থাকিত, তবে "আদি-শূরের যজ্ঞভূমি"—বল্লালের অস্থিভস্মে পরিণত যে দেশের 'পথের ধূলি'—সে দেশের বিগত সমৃদ্ধির কথা ও কাহিনী আপনাদের শুনাইতাম; আর শুনাইতাম অরণ্যের তমাচ্ছন্ন ঘোর অন্ধকারে, অতল নদীতলে ও ভূগর্ভে মহাসমাধিতে লীন কি কীর্ত্তি, কি বিজয়কাহিনী! কি দারুণ অদৃষ্টের পরিহাস, কি করুণ কাহিনী এই কীর্ত্তিনাশার! আর শুনাইতাম—সেই দাস-সাগরের কথা, কামরূপ-কলিঙ্গ-কাশী-বিজয়ীর পলায়ন-কলঙ্ক অপনয়ন করিতাম। গাইতাম—হরিশ্চন্দ্রের কথা, অদুনা-পদুনার সেই প্রাণমনবিমোহনকারী মধুরকাহিনী; সেই চাঁদরায় কেদার রায়ের বীর্য্যগাথা! হে বাঙ্গলার সন্তান! এ সেই সোনার দেশ, এই দেশে আজ আপনারা আসিয়াছেন। আজ সে প্রয়াগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত সে সাম্রাজ্য নাই, সে গৌরবের স্মৃতিই আজ আমাদের পুণ্যকথা, তাঁহাদের সেই পুণ্য-কাহিনী আজ যদি আমাদের আত্মস্থ করিয়া দেয়, যদি এই অসীম জলরাশির বুকে তেমনি করিয়া, আবার পাল তুলিয়া, জীবন-যাত্রায় যাত্রা-গান গাহিতে পারি।

সেই স্বপ্নের দেশে, আজ দেখুন, আমরা কি হইয়া-আছি! দিন গিয়াছে, এই দেশ একদিন জ্ঞান ও ধর্ম্মে কত উন্নত ছিল, সমতটের ব্রাহ্মণ রাজবংশে যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত শীলভদ্র জন্মিয়াছিলেন, তিনিই চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াং এর গুরু। ভারতেতর দেশের পরি-ব্রাজকেরা জ্ঞানলাভের জন্য এই দেশে আসিতেন। সেই জগদ্বিখ্যাত সেই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এই দেশেই জন্মিয়াছিলেন। আজিও লোকে নাস্তিক পণ্ডিতের বাড়ী বলিয়া দেখাইয়া দেয়। এই গৌড়-বঙ্গের বীরদেবই এক-দিন জগদ্বিখ্যাত নালন্দা মহাবিহারের প্রধান আচার্য্য ও সংঘস্থবির ছিলেন। আপনারা আজ সেই দেশে আসিয়াছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই বাঙ্গলার প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রসমূহ একেবারে নিস্তেজ হইয়া যায়। সে যুগের পরিচয়, কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গেই বিশিষ্ট-ভাবে যুক্ত; তবুও সেই শতবৎসরের মাঝে ব্রাহ্মসংস্কার ও স্বদেশীয় মহা-আন্দোলনের দিনে এই আমরা পূর্ব্ববঙ্গবাসী কতভাবে কতদিক দিয়া আমাদের এই ক্ষুদ্র শক্তিতে যাহা পারিয়াছি, তাহাই করিয়াছি। কবে আমাদের সব আয়োজন সার্থক হইবে, কবে আমাদের পথ

চেষ্টা যথার্থ মাতৃপূজায় পরিণত হইবে। কবে সেই মহাযজ্ঞের ধূম নদীপ্রান্তে, অরণ্যশীর্ষে, বনানীর অন্ধকারে জ্বলিয়া উঠিবে। বড় দুঃসময়ে আপনাদের ডাকিয়াছি—আসিয়াছেন ভালই হইয়াছে, দেখিয়া যান—এ সেই পূর্ব্ববঙ্গ।

এই বঙ্গে শুধু আজ আমরা একলা নই, আমাদের আর এক ভাইরা এখানে আছেন। তাঁহাদেরও গৌরবের কথা আছে, তাঁহাদেরও দুঃখের কাহিনী আছে। আজ এই আমাদের মুসলমান ভাইরা। অতিথিপরায়ণ বঙ্গ কখন অতিথিকে ফিরায় নাই। বুদ্ধকে সে স্থান দিয়াছে, মুসলমান ধর্ম্মকেও স্থান দিয়াছে। সে দিন যে ইসলামের অর্দ্ধচন্দ্রশোভিত পতাকা হাতে করিয়া, গৌড়ের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আজ তাহারা আমাদের প্রতিবেশী, আমাদেরই মত সমদুঃখী। একই মাতৃস্তন্যপানে আমরা বাঁচিয়া আছি, বাঙ্গলা তাহাকে তাহার বুকের কাছে টানিয়া লইয়াছে। ভাই ভাইয়ে কলহ কোন্ দেশে না হয় তাহা হইলেও তাহারা আমাদের ভাই। সেই ইসলাম পতাকাবাহীর বংশে মহাপ্রাণ সোলেমান কিরাণী জন্মিয়াছেন; সেই যবন হরিদাস একদিন হরিধ্বনিতে বঙ্গ মাতাইয়াছে; সেই মুসলমান আলোয়াল একদিন পদ্মাবতী রচনা করিয়াছে; সেই মুসলমান কত কবির কত গান, কত ফকির, কত সাধু এই বঙ্গদেশের জন্য ভগবানের কাছে দোয়া করিয়াছে; সেই মুসলমান কবি চাঁদ কাজির গানে আছে—

ওপার হইতে বাজাও বাঁশী এপার হইতে শুনি।
আর অভাগীয়া নারী হাম সে সাঁতার নাহি জানি॥

মুসলমান কবি এ গান বাঁধিবার সময় বাঙ্গলার প্রাণের সঙ্গে পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই এ গান বাঁধিতে পারিয়াছিলেন। এই ঢাকা নগরীতে সেই ইসলামের বিজয়-তোরণ আজিও দাঁড়াইয়া আছে। একই জমির পাশে পাশে লাঙ্গলের ফলকে হিন্দু-মুসলমান, আপনাদের ক্ষুধার অন্ন যোগাইতেছে। তাহাদের মর্য্যাদা আমরা যেন কখন লঙ্ঘন না করি। সে দিনেও টাকায় আট মণ চাউল মিলিত, এ দারিদ্র্য সে দিনেও আসে নাই।

হে অতিথি! ওই সেই রামপাল, ওই সেই প্রাচীন যজ্ঞবেদী আপনাদের মুখের পানে চাহিয়া রহিয়াছে, সে ত মূক নয়, যজ্ঞের মন্ত্রের প্রতিধ্বনি এখনও তাহার প্রাণের তারে ঝনন্ রনন্ করিয়া বাজিতেছে। ওই সেই ভস্মসুপ্ত অগ্নি, বুঝি বা এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। আছে অতিথি আছে! যে বেদধ্বনি এই যজ্ঞভূমে উঠিয়াছিল, যে ধ্বনি অরণ্যানী শুনিয়াছে, যে ধ্বনি পদ্মায় একদিন ঘোর করিয়া ধ্বনিয়া উঠিয়াছে, তাহা এখনও আছে; আকাশে বাতাসে এখনও তাহার সুর বাজিতেছে। এই সেই প্রাচীন হব্যভস্ম মাটী বুকে করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। সেই ভস্ম আজি আপনাদের ললাটদেশ শোভিত করুক্। এভূমি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়াছে। হে ঋত্বিক্! আবার তারস্বরে বেদমন্ত্র পাঠ করুন, অগ্নি জ্বলিয়া উঠুক—দেখিবেন এই এতকালের সহিষ্ণু মাটী শতধা দীর্ণ হইয়া, সেই জ্বলিতঅনল মহান ধূর্জ্জটীকে অনলজ্বাল-ললাট দীপিয়া তুলিয়াছে। যিনি সহস্র সহস্র বৎসরের বাঙ্গলার মৃতসতীকে স্কন্ধে করিয়া প্রলয়কালের তাণ্ডব-নর্ত্তনে সব রিষ ঈর্ষা অক্ষমতা পরানুকরণের মতিচ্ছন্ন অহঙ্কার জ্বালাইয়া, সেই সৃষ্টি পারাবারের একাকার আনিয়া দিবেন—সংহারের পর আবার নীহারিকায় নূতন বাঙ্গলার সৃষ্টি হইবে। বাহান্ন পীঠের মত সারা ভারতে আবার পীঠস্থানে মন্দির উঠিবে। হে তপোনিষ্ঠ সত্যসন্ধ সাহিত্যের ঋষিগণ, জীবনে, কর্ম্মে, ধর্ম্মে একাত্ম হইয়া সেই মন্ত্র আমরা উচ্চারণ করি আসুন; স্বাহা স্বধা ত্রিবিধ অগ্নিই জ্বলিয়াছে! পূর্ব্ববঙ্গের শ্মশানে, বল্লালের ভিটায় সেই শব-সাধনায় অগ্রসর হউন। তাই বাঙ্গালীরা আপনাদের ডাকিয়াছে। এই শ্মশানে মড়ার হাড়ে ফুলের মালা পরিয়া, কি ভুলে ভুলিয়া আছি, সেই ভুল একবার ভাঙিয়া দিউন।

আমি দেখিতেছি, ও প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছি, সেই বাঙ্গলার প্রাণধর্ম্ম ধীরে কেমন লীলাচঞ্চল স্রোতে

মত চলিয়াছে। 'মাৎস্যন্যায়ের' অরাজকতার যুগে বাঙ্গলা যে গর্জ্জন করিয়াছিল, সে সুর বাঙ্গলা ভুলিয়া যায় নাই। আজ ফেরঙ্গ যুগেও বাঙ্গলা সে ধর্ম্মের আন্দোলন ভুলে নাই। কত শতাব্দী পরে আবার দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতলে বাঙ্গলার স্বভাবধর্ম্ম যে প্রাণ মূর্ত্ত করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, সেই সময়েই এই নগরোপান্তে সেই অদ্বৈতবংশধর গোঁসাই শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গেণ্ডেরিয়ার গহনবনে সেই প্রাণধর্ম্মের মূর্ত্ত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। দেখিতেছি, পদ্মাগঙ্গার লীলার স্রোত একই প্রাণের আন্দোলন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু একদিন এই পদ্মাবতী তীরে তাঁর সেই অরুণ রাঙ্গা চরণ দুখানি রাখিয়াছিলেন, তাই—

সেই ভাগ্যে অদ্যাপিহ সর্ব্ব বঙ্গদেশে।
শ্রীচৈতন্য সংকীর্ত্তন করে স্ত্রী-পুরুষে॥

আর—ভাগ্যবতী পদ্মাবতী সেই দিন হৈতে।
যোগ্য হৈলা সর্ব্বলোক পবিত্র করিতে॥

আর—বঙ্গদেশে মহাপ্রভু হইলা প্রবেশ।
অদ্যাপিহ সেই ভাগ্যে ধন্য বঙ্গদেশ॥

আর, এই ঢাকা নগরীতে বাঙ্গলার শেষ বৈষ্ণব কবি কৃষ্ণকমল, সেই মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ ও তাঁহার রাধা-ভাবের রসে সিঞ্চিত 'রাই-উন্মাদিনীর' প্রথম অভিনয় করিয়াছিলেন। আমরাও আজ কৃষ্ণকমলের রাধিকার মত—তব পথ নিরখিয়ে ব'সে আছি সই!

তুমি চন্দ্রে! একা এলে, প্রাণনাথ কই?

চন্দ্রা রাইকে বলিয়াছিলেন,—

অঘটন ঘটাতে পারি—কৃপা হ'লে তোর—

চন্দ্রা অঘটন ঘটাইয়াছিলেন, আপনারাও 'কৃপা হ'লে' অঘটন ঘটাইতে পারিবেন না কি?

তার পর, এই ঢাকায় প্রথম 'নীলদর্পণ' হইয়াছিল, সে কথা বোধ হয় আপনাদের কাহারও অজ্ঞাত নাই।

এই প্রদেশের কাছে ভাওয়াল, সাভার, ধামরাই প্রভৃতি যে সমস্ত খণ্ড খণ্ড ভূভাগে স্বাধীনরাজ্য প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহাদের কত না কাহিনী, কত না দুঃখ-সুখ এই মাটীর ধূলিতে মিশাইয়া আছে। হায়! তাহার কাহিনী কে আজ গাহিবে। যদি সেই সুপ্ত ইতিহাসের বাণী কোন দিন কেহ সজাগ করিয়া তুলেন, তবে দেখিবেন,—কি শক্তিমান, এক মহাপ্রাণ জাতি কি গৌরবময় ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছে।

সুখ-দুঃখের অনেক কথা আপনাদের শুনাইতে চাই, সব শুনাইতে পারি কই, কণ্ঠ রোধ হইয়া আসে—বুক ফাটিয়া যায়! বুঝি আজিকার দিনের মত বাঙ্গলার ঘরে এমন দুর্দ্দিন কখনও আসে নাই। এত কালের দীর্ঘ ইতিহাসের পৃষ্ঠায়ও এত অন্ধকার, দীর্ঘনিঃশ্বাস ও হা-হুতাশের নিষ্ফল বাণী ফোটে নাই! এমন বিপন্ন আমরা আর কখনও হই নাই। এক রামচন্দ্রের বনবাসে সারা অযোধ্যা কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিল, আজ পূর্ব্ববঙ্গ ভাগ্য-হীন, কত শত রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে বনবাসে দিয়া এক-হাতে চক্ষু মুছিতেছে, আর অন্য হাতে আপনাদের জন্য পাদ্য ও অর্ঘ্য আনিয়াছে। দয়া করিয়া আমাদের সকল ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। সুদিন গেছে, কুদিনে আসিয়াছেন। আপনারা দুর্দ্দিনের অতিথি, দুঃখী বিদুরের খুদ আছে, আর কিছুই নাই। পূর্ব্ববঙ্গ কৃতাঞ্জলি হইয়া তাহাই অপনাদের নিবেদন করে—শ্রদ্ধার হবিঃ গ্রহণ করুন, আজ পূর্ব্ববঙ্গ ধন্য হউক, কৃতকৃত্য হউক।

দারিদ্র সেবক মোরা আছি জন্ম জন্ম।

হে সাগ্নিক! আসুন, সমস্বরে মাকে ডাকি। মা যদি গঙ্গায় ডুবিয়া থাকেন, মা যদি পদ্মায় ডুবিয়া থাকেন, মা যদি মহাসাগরের স্থির, গভীর অতল জলেও ডুবিয়া থাকেন, তিনি শুনিতে পাইবেন। মার ভাবে ভিয়াই মাকে ডাকি, আসুন! মা ত আমাদের আর কোন বাণী শিখান নাই। মা আছেন, আবার মা উঠিবেন, আবার আমরা এই ভাগ্যবতী পদ্মাবতী-তীরে মাতৃপূজা করিব। আবার সেই সহস্রদলবাসিনী রাজরাজেশ্বরীর রক্ত চরণে প্রাণের শ্রেষ্ঠ ও প্রিয়তম হবিঃ দান করিব, আর গললগ্নীকৃতবাসে বলিব, জননি জাগৃহি।

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস।

নূতন বৎসর।

কালচক্রের আর একটী আবর্ত্তন পূর্ণ হইল--আর একটী বৎসর অতীতের গর্ভে বিলীন হইল। 'প্রতিভা'র জীবনেও আর একটী অধ্যায় সমাপ্ত হইয়া গেল। পুরাতনের নিকট বিদায় লইয়া নূতনকে বরিয়া লইবার সময় উপস্থিত। তাই জীবনের আর একটী সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা আজ ভাবিতেছি. আমাদের চেষ্টার ফল কি হইল। দ্বাদশটী উদ্যমের জন্মমৃত্যু দেখিয়া বৎসর চলিয়া গেল, কিন্তু ফল রাখিয়া গেল কি ?

একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, আমাদের এ উদ্যোগের ক্ষান্তি আমরা কখনও কামনা করি না। চেষ্টাই জীবন। ফলে পরিসমাপ্ত হইলে চেষ্টার বিরাম হয়, কিন্তু বিরত চেষ্টা জীবনের শেষ অঙ্ক সূচনা করে। আমরা তাই আকাঙ্ক্ষা করি, স্রোতস্বিনীর খরস্রোতের মত চেষ্টা আমাদের কালের সঙ্গে বহিয়া চলুক। এ পথের যেন শেষ না হয়। চলিয়াই আনন্দ, বিরামে নহে। সুতরাং সাহিত্যপথিকের পথ যে একটা সুনিষ্পন্ন এমারতে পৌঁছাইয়া দিয়া বিরত হয় নাই, ইহাতে সাহিত্যানুরাগীর দুঃখ নাই, 'প্রতিভা'রও নৈরাশ্যের কোন কারণ নাই। এ যেন আমাদের তীর্থযাত্রীর যাত্রা। প্রান্তরের পর প্রান্তর অতিক্রম করিয়া চলিয়াছি; মাঝে মাঝে প্রাণে প্রশ্নের সাড়া শুনিতে পাই, 'আর কতদূরে?' দেবতা আমাদের পথ টানিয়া নিয়া চলিয়াছেন, কিন্তু চলিয়া চলিয়া কতদূরে আসিলাম?

সম্মুখের দিকে পথের অন্ত যদিই বা না দেখি, যদিও বা আমরা চাই এ আমাদের যাত্রার যেন শেষ না হয়—দেবতা যেন চলিবার শক্তি আমাদের অক্ষুণ্ণ রাখেন, তথাপি পিছনের দিকে চাহিয়া জানিতে ইচ্ছা হয় না কি, কয়টী প্রান্তর অতিক্রম করিলাম? কতটুকু পথ আমাদের চলা হইল? নূতন ও পুরাতনের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া তাই আজ আমরা নিজেদিগকে জিজ্ঞাসা করি, কতটুকু সম্পন্ন হইল এবং অদূর ভবিষ্যতে আমাদের লক্ষ্য কি?

বাংলার প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধার এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, এখনও অনেক প্রাচীন সম্পদ্ লোপের মুখে রহিয়াছে। সে জন্য কে দোষী জানি না; কিন্তু উদ্ধারের চেষ্টা যিনি করেন, তাঁহার জানা উচিত, তাঁহার চেষ্টার ত্রুটী কোথায় রহিয়া যাইতেছে। আমরা প্রাচীন সাহিত্য হইলেই তাহাকে সম্পদ্ বলিয়া ঘোষণা করি এবং আড়ম্বরের এক শেষ করি। কিন্তু কখনও দেখাইবার চেষ্টা করি না, তাহার মূল্য কি এবং কেন। এর পরে যদি শ্যেনচক্ষু সমালোচক সন্দেহের ভ্রূকুটী করে, পণ্যান্তরের মত যদি আমাদের আবিষ্কৃত রত্ন না বিকায়, তবে সে দোষের ভাগ আমরা গ্রহণ করিতে বাধ্য। তথাপি আশার কথা এই যে, প্রাচীনের দিকে মানুষের দৃষ্টি পড়িয়াছে। প্রাচীন যে শূন্য নয়, অসৎ হইতে যে সত্যের উৎপত্তি হয় নাই, একথা আজ আমরা স্বীকার করিয়া লইয়াছি। 'প্রতিভা' যদি এই কার্য্যে বিন্দুমাত্রও সহায়তা করিয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিব, তীর্থযাত্রা আমাদের নিষ্ফল হয় নাই।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের চর্চ্চা এখনও আপেক্ষিক সমালোচনার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সংস্কৃত পালি, প্রাকৃত প্রভৃতি সাহিত্য এবং তুলনার জন্য ইউরোপের ও এসিয়ার সাহিত্যনিচয়ের জ্ঞান লইয়া বাংলা সাহিত্যের চর্চ্চায় এখনও আমরা নিযুক্ত হইতে চাই নাই। সাহিত্যের বিচার শুধু ভাষার বিচার নহে, বস্তুরও বিচার; এবং সাহিত্যের বস্তু দেশ পর্য্যটনে এমনই পটু যে, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইউরোপে ফষ্ট (Faust) আর্থার (Arthur), শার্লমান (Charlemague), ডন জুয়ান (Don Juan) প্রভৃতির কথা ও উপকথা নিয়া বিপুল সাহিত্য রচিত হইয়াছে এবং তাহাদের তেমনই বিপুল চর্চ্চা,—তথ্যনিরূপণের তেমনই বিরাট্ চেষ্টাও সে দেশে হইয়াছে। প্রাচীন বাংলায় তেমনই 'মঙ্গল'-সাহিত্য, 'ভাসান'-সাহিত্য, 'পাঁচালী'-

সাহিত্য প্রভৃতি রহিয়াছে,--সেও এক কম বিরাট ব্যাপার নহে ; কিন্তু তাহার বিশালতার অনুরূপ বুঝিবার চেষ্টা আমরা করি নাই। আবিষ্কারের চেষ্টা আমরা যতটা করিয়াছি, বুঝিবার—মূল্যনিরূপণের চেষ্টা, আমরা ততটা করি নাই। এ কথা স্বীকার করায় বোধ হয় লজ্জার কোন কারণ নাই যে, আমাদের দৃষ্টি এখনও ক্ষুদ্র হইয়া রহিয়াছে ; আমরা একজন লেখকের কিংবা তাহার একটী ছত্রের বিচারে যতটা পাণ্ডিত্যের এবং অনুসন্ধানের পরিচয় দেই, গোটা সাহিত্যটাকে ধরিয়া বিশ্বসাহিত্যের —তথা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অঙ্গ হিসাবে তাহার স্থান ও মূল্য বিচারের চেষ্টা তেমন ভাবে এখনও করি নাই। সুতরাং সম্মুখের পথে, অদূর ভবিষ্যতে ইহা আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

বাঙ্গলায় জ্ঞানের জন্য জ্ঞানের চর্চ্চা বড় বেশী হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় পাস রূপ পাশ তৈয়ার করে ; টোলের পণ্ডিতেরাও এখন পাসের এবং সেই সূত্রে পয়সার কাঙ্গাল হইয়া পড়িয়াছে। বাণী এখন চঞ্চলার সেবা-দাসী হইয়া পড়িয়াছেন। হয় ত বা বরাবরই এরূপ ছিলেন। কিন্তু আমরা প্রাণে প্রাণে একটা আকাঙ্ক্ষা অনুভব করিতেছি, পদ্মাসনা বাগ্‌দেবীকে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে। আকাঙ্ক্ষা হইতেই কার্য্যের উৎপত্তি হইলেও উভয়ের মধ্যে অন্তরায় ঘটিতে পারে ; তাই আজ আমরা নিদ্রালস ব্যক্তির মত চোখ মেলিতে গিয়াও আবার ঢুলিয়া পড়িতেছি। তথাপি ভরসা আমাদের আছে যে, এই ঘুমঘোর কাটিবে, আলস্য আমাদিগকে ছাড়িবে,—স্বতন্ত্র বাণীর মন্দির দেশে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

কিন্তু সব জিনিসই কি আমরা তৈয়ার দেখিতে চাইব, কিছুই তৈয়ার করিতে সাহায্য কি আমরা করিব না? বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি কেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া দেশে যে জ্ঞান-চর্চ্চা চলিতেছে, তাহার অপূর্ণতাকে পূরণ করিবার চেষ্টা বাহিরের পিদ্বন্মণ্ডলী ও জনসাধারণ করিতে পারে। প্রবন্ধ, বক্তৃতা, গ্রন্থ প্রভৃতি দ্বারা দেশে জ্ঞান-পিপাসা বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা পরিষদ্ সমূহ করিতে পারে। এ চেষ্টা যে হইতেছে না, তাহা নয়; কিন্তু ইহাকে অধিকতর সুপরিচালিত করার সময় আসিয়াছে।

মাসিক সাহিত্যের কাণ্ডার ধরিয়া বসিয়া আছেন যাঁরা, তাঁহাদিগকে মাঝে মাঝে বলিতে শুনি যে, নূতন লেখককে উৎসাহ দান করা এবং লেখক সৃষ্টি করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু মনে হয়, মানুষের মনের এ প্রকার চাষ শক্তির অপচয় মাত্র। যেখানে যেমনটী হয় না, সেখানে তেমন ফল সৃষ্টি করিবার চেষ্টা কৃষি-বিজ্ঞান করিয়া থাকে বটে ; কিন্তু তেমন চেষ্টা মানুষের মনের বেলায় জুলুম মাত্র। যাহার মানসকাননে কাব্য-কুসুম ফুটিবে না, সেখানে অস্বাভাবিক উপায়ে পারিজাত দেখিতে চাইলে ধুতুরার বেশী লাভ হইবে না। তার চেয়ে, আমাদের মনে হয়, আমাদের বেশী প্রয়োজন পাঠকের। লেখক সৃষ্টির চেষ্টা না করিয়া আমরা যদি পাঠক সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পাই—নানা প্রকারে মানুষের চিত্তকে জ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট করিতে চাই, তবে অধিকতর কল্যাণের অধিকারী হইব। যাহার কিছু বলিবার নাই তাহাকে দিয়া বলাইতেই হইবে, মন্দকেও কবিযশঃপ্রার্থী করিয়া তুলিতেই হইবে,—এমন কোন যুক্তি নাই। বরং ইহা স্বভাবের বিরোধী। ইহা যদি আমরা না চাইতাম, তবে সাহিত্যের প্রাঙ্গনে অনেক বেয়াদবি কমিয়া যাইত। ভাষার বাধা, শক্তি, শিক্ষা ও ধৈর্য্যের অভাব, প্রভৃতি অন্তরায়ের নিমিত্ত বাণীর বিশাল মন্দির যাহাদের নিকট রুদ্ধকবাট, তাহাদিগের নিকট সহজ ও সরস সংক্ষিপ্ত পন্থায় সে মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেওয়া আমাদের প্রথম চেষ্টা হওয়া উচিত। সকলেই লিখিবে আর কেহই পড়িবে না,—এ এক বিষম ব্যাপার! তার চেয়ে যদি এক জন লিখিত আর সকলে পড়িত, তাহা হইলেও হইত ভাল। বিশিষ্টেরা বলিবে আর অবিশিষ্টেরা শুনিবে, ইহাই স্বাভাবিক বিধি। জ্যাঠামি নামক পদার্থটী সাহিত্যেও ঢুকিতে পারে, এবং সেখানেও তাহার না ঢুকাই সঙ্গত।

বিশিষ্টদের জ্ঞানরাশি বাঁধ ভাঙ্গা নদীর মত বেগে বাংলা সাহিত্যের আঙ্গিনায় প্রবেশ করিতেছে না, ইহা অবশ্যই ক্ষোভের বিষয়। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যে বিশিষ্ট হইয়াও বাংলায় ভাবিতে শিখেন নাই, ইহা আরও ক্ষোভের বিষয়। এ ব্যাপার অবশ্যই এখন অস্তায়মান, সুতরাং তাহার প্রতি কটাক্ষ করিবার আর প্রয়োজন নাই। ভবিষ্যতে আমরা চাইব, শিষ্ট, সংযত ধিষণা লইয়া পণ্ডিতেরা বাংলা সাহিত্যের সভায় আপনা-দের ন্যায্য আসন অধিকার করিবেন,—সভা বসিবার পূর্ব্বে ছেলেরা ও মজুরেরা যে হল্লা করিতেছিল, অতঃপর তাহা ক্ষান্ত হইবে,—পল্লব-গ্রাহিতা লজ্জায় মুখ ঢাকিয়া নেপথ্যে প্রস্থান করিবে।

'সিদ্ধিঃ সাধ্যে সতামস্তু'।

১৩২৩ বঙ্গাব্দের বঙ্গসাহিত্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৫) ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব।—আলোচ্য বর্ষে ইতিহাস বিভাগে মহারাজ-কুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত 'বীরভূম বিবরণ (প্রথম খণ্ড)' ও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার সম্পাদিত 'সমসাময়িক ভারত, প্রাচীন ভারত (চতুর্থ খণ্ড)' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় ছত্রী বাংলার ইতিহাস 'নেপালী ছত্র' লিখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র ২০ পৃষ্ঠার মধ্যে 'যশোহরের পরিচয়' দিয়াছেন।

মাসিক পত্রে এবার কতকগুলি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আওরঙ্গজেবের টাকশাল,' শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকারের 'পাটনার প্রাচীন চিত্র' (প্রবাসী) 'পাটনার কথা' (ভারতবর্ষ), ও 'আওরাংজীবের পরিবারবর্গ' (মানসী ও মর্ম্মবাণী), শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের 'আলেকজান্দারের অভিযান' (মানসী ও মর্ম্মবাণী), 'কলিকাতার অবরোধ' (মানসী ও মর্ম্ম) ও 'অন্ধকূপহত্যা (ভারতী) ; শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী রায়ের 'পালরাজ্যের অধঃপতন' (প্রতিভা), স্বর্গীয় রসিকলাল রায়ের 'কবিভূষণ ও শিবাজী' (মানসী ও মর্ম্ম) ; শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্তের 'মগধের আদিপর্ব্ব' (মানসী ও মর্ম্ম) ও 'ভারতে বাণিজ্য সংঘর্ষ' (সাহিত্য)' শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায়ের 'হুগলী ও দক্ষিণরাঢ়' (সাহিত্য), শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দের 'নবাবী আমলে বাংলার জমীদার' (সাহিত্য) ; শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সলিমা সুলতান বেগম' (মানসী ও মর্ম্ম), 'ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ' (ভারতবর্ষ), 'জেবউন্নিসার চরিত্রে কলঙ্কারোপ' (ভারতবর্ষ), শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কারের 'লিচ্ছবী অধিকার' (মানসী ও মর্ম্ম), শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাকলাদারের 'পাটলিপুত্র' (ঐ), শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন গুপ্তের 'পৃথিবীর পুরাবৃত্ত' (ঐ), শ্রীযুক্ত পুরণচাঁদ সামসুখার 'প্রাচীন ভারত'।

বণিক্‌গণের 'সমুদ্র যাত্রা (ঐ)', শ্রীযুক্ত পুলিন বিহারী দত্তের 'ব্রজ-কাহিনী' (ঐ) ; শ্রীশান্তা চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজগৃহ (প্রবাসী), শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায় চৌধুরীর 'আকবরের নিদাঘবাস' (প্রবাসী), শ্রীযুক্ত সুধাংশুশেখর মজুমদারের 'তেলিয়া গড়ি' (প্রবাসী), শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র নাথ সমাদ্দরের 'মুগল দরবারের বৈদেশিক' (উপাসনা), প্রতিভায় প্রকাশিত 'মধ্যযুগে বঙ্গদেশ', শ্রীযুক্ত প্রসন্ন-নারায়ণ চৌধুরীর 'সেন রাজগণের সময়ে বাঙ্গালার বিস্তৃতি' (ভারতবর্ষ), আব্দুল মালিক চৌধুরীর 'মুসলমান সমাজে দাসত্ব প্রথা' (ভারতবর্ষ), শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেন গুপ্তের "ত্রিপুরার রাজচিহ্ন" (ভারতবর্ষ), শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তীর 'একচক্রা' (ভারতবর্ষ), শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ লাহার 'আকবর বাদশাহ কি নিরক্ষর ছিলেন ?'

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়।—

প্রতাপাদিত্যের গৃহদেবতা ... শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন,
শ্রীনগর ... শ্রীগুরুদাস সরকার।

এইগুলি এ বৎসরের উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক প্রবন্ধ।

আলোচ্যবর্ষে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার 'পালরাজ্যের অধঃপতন' নাম দিয়া শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের বক্তৃতার সারাংশ 'মানসী ও মর্ম্মবাণীতে' প্রকাশ করিয়াছেন।

পুরাতত্ত্ব বিভাগে কয়েকটী উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, নিম্নে প্রবন্ধগুলির তালিকা প্রদত্ত হইল।—

নারায়ণ—মগধের মৌখরি রাজবংশ—ননীগোপাল মজুমদার। সেকেলের নবদ্বীপ—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। অশোকের ধর্ম্মলিপি—শ্রীযুক্ত

চারুচন্দ্র বসু। বৌদ্ধধর্ম—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে—ননীগোপাল মজুমদার।

কায়স্থ পত্রিকা—অষ্টমনীষার নন্দীবংশ—নীলমাধব রায়। আড়াই হাজারী রায় চৌধুরী—সুরেশচন্দ্র রায় চৌধুরী। টাকীর মুন্সী বংশ—অঘোরনাথ কবিশেখর। নাগচৌধুরী বংশ—ঐ। প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান—বিনোদবিহারী রায়।

গৃহস্থ—দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের ইতিহাস—সেবাভিক্ষু-জীবন। পুণ্ড্রজাতির ইতিহাস। পুণ্ড্র জাতির বিভিন্ন কেন্দ্র—হরিদাস পালিত।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের তাম্রশাসন—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। নবাবিষ্কৃত সূর্য্যবর্ম্মার শিলালিপি—যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত। বুদ্ধগয়ার দুইখানি শিলালিপি—ননীগোপাল মজুমদার। মহাভারতের সময়—কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী।

ভারতবর্ষ—দিল্লীর জগবিখ্যাত লৌহস্তম্ভ—শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সোম বিদ্যারত্ন।

ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন—যশোধর্ম্মদেব—রেবতীমোহন গুহ। মগধের রাজবংশ—রামপ্রাণ গুপ্ত। প্রাচীন ভারতের নাট্যশাস্ত্র ও অভিনয় কৌশল—রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য। ঋগ্বেদে লিখনপ্রণালীর আভাস—তারাপদ মুখোপাধ্যায়।

প্রবাসী—গোয়ালিয়রে খোদিত জৈন শিল্প—শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায় চৌধুরী। দিব'র দীঘি প্রসঙ্গ—সুবর্ণচন্দ্র বিশ্বাস।

প্রতিভা—শশাঙ্ক—রেবতীমোহন গুহ। নবাবিকৃত অশোক অনুশাসন—রমেশচন্দ্র মজুমদার। ভারতীয় অস্ত্রচিকিৎসা—মোহিনীমোহন দাস। অদ্বৈতমঙ্গল পুথি ও অদ্বৈতাচার্য্যের কাল নিরূপণ—উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ। প্রাচীন ভারতের শিক্ষা-পদ্ধতি—গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য। একান্ন পীঠ—রমাপ্রসাদ চন্দ। সায়ণ মাধব—গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ। হর্ষবর্দ্ধন—জ্যোতিরিন্দ্র নাথ সেন। দেওভোগের বৃষ—সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়।

ভারতবর্ষ—চট্টলে শিবমন্দির—ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী। সিংহল-পাটন—রাখালরাজ রায়। সুবর্ণরেখাগর্ভে প্রাপ্ত মূর্ত্তি—সত্যেশচন্দ্র গুপ্ত। ঋগ্বেদে সৌর বৎসর নির্ণয়—তারাপদ মুখোপধ্যায়। নদীয়া ও তাহার প্রত্নসম্পৎ—প্রফুল্লকুমার সরকার। মিথিলা—সুরেন্দ্রনাথ সেন। বীরভুমের অজয় তীরবর্ত্তী ঐতিহাসিক সম্পদ—মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী।

সাহিত্য—প্রাচীন শিল্প-পরিচয়—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ। গঙ্গবংশানুচরিতম্—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। প্রাচীন ভারতের রণপ্রসঙ্গ—পূর্ণচন্দ্র রায়। কুমার গুপ্তের রাজ্যসময়ের তাম্রশাসন—রাধাগোবিন্দ বসাক। ধানাইদহ-লিপি—প্রতিবাদের উত্তর।

মানসী ও মর্ম্মবাণী—বাঙ্গালী জীবন-বসন্তের স্মৃতি নিদর্শন—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

এইবার আমরা ইতিহাস সম্বন্ধে দু'এক কথা বলিতে চাই। আজকালকার ঐতিহাসিকেরা মনে করিয়া থাকেন, ঐতিহাসিক ঘটনার তালিকা সংগ্রহ করিতে পারিলেই ইতিহাসের সার্থকতা হইয়া গেল, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস প্রণয়ন করা হইল। কিন্তু বাস্তবিকই কি ইতিহাস রাজা প্রজার ঘটনাবলীর ফিরিস্তি মাত্র? এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, ঘটনাই ইতিহাসের প্রাণ। ঘটনা লইয়াই ঐতিহাসিককে কার্য্য করিতে হয়। এক্ষণে বিচার করা উচিত, সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার

কি ঘটনা নহে? শিল্প বাণিজ্যের ধারা কোন্ পথে, কি ভাবে চালিত হইয়াছে তাহাও কি ঘটনা নহে? এ সকলের বিবৃতি কি আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাইব না? এগুলিও ত ঘটনা, তবে কেন তাহারা ইতিহাসের মধ্যে স্থান পাইবে না? এক কথায় বলিতে গেলে, মানবের জীবন-ধারা যে যে পথে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার বিবরণ ইতিহাসের মধ্যে স্থান পাইবার ন্যায্য দাবী রাখে।

এখন দেখিতে হইবে, কি প্রকার ঘটনা লইয়া ইতিহাসের কারবার চলিয়া থাকে। ইতিহাসের আলোচ্য হইতেছে পৃথক্ পৃথক্ ঘটনা; প্রমাণ সাহায্যে সেগুলির যাথার্থ্য নির্ণয় করা ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্য। প্রমাণ কি ভাবে লওয়া উচিত, কোন্ প্রমাণ আবশ্যক, কোন্ প্রমাণ গ্রহণীয়, কোন্‌টা কতদূর বিশ্বাস্য, তাহা জানিতে হইবে। ইন্দ্রিয় সাহায্যে আমরা ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, কিন্তু নানাকারণে অনেক সময়ে আমরা তাহার যথাযথ বর্ণনা করিতে পারি না। সত্যের প্রতি অচলা নিষ্ঠা থাকা ঐতিহাসিকের প্রধান কর্ত্তব্য। যুক্তি ও বিচারের নিকটে সংগৃহীত প্রমাণগুলিকে যাচাই করিয়া দেখিতে হইবে। কার্য্য কারণ জানিতে হইলে তর্কশাস্ত্রের আরোহ-পদ্ধতিগুলি (Inductive Methods) ভাল করিয়া শিক্ষা করিতে হইবে; তাহা না করিলে ভ্রমে পতিত হওয়া খুবই সম্ভব। কারণের প্রকৃত কার্য্য বাহির করা দুষ্কর হইবে। তার পর ঐতিহাসিককে প্রমাণ শাস্ত্র বেশ ভাল করিয়া জানিতে হইবে। কারণ, ঐতিহাসিকও যে বিচারক। আদালতের সমক্ষে দুই পক্ষের ওকালতী হয়। এখানে প্রভেদ এই যে, বিচারককে সংগৃহীত ঘটনাগুলির যাথার্থ্য নির্ণয় একাই করিতে হয়। কোন্ সাক্ষীর জবানবন্দী কতটুকু বিশ্বাস্য, তাহা বিচার করিতে হইবে; কতটুকু ঘটনা সেই সাক্ষিবয়ের দেখিবার সুবিধা হইয়াছে, তাহাও দেখিতে হইবে; দেখিতে হইবে, তিনি সত্যনিষ্ঠ কি না এবং তাঁহার পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি কতদূর প্রখর। এ সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র অধ্যাপক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের 'প্রাচীন ভারত' সমালোচন কালে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা অতি সমীচীন বলিয়া মনে করি। তিনি বলিয়াছেন—কোন্ কথাটা আমরা বিশ্বাস করিব, আর কোন্ কথাটা অবিশ্বাস করিব তাহা নির্দ্ধারণ করিবার কতকগুলি উপায় পাশ্চাত্য তর্কশাস্ত্র অবধারিত করিয়া দিয়াছে। সেগুলির সহায়তা আমাদিগকে লইতেই হইবে। যে সকল বৃত্তান্ত প্রকৃতির অনুকূল নহে, যে সকল তথা-কথিত সত্য অবিসংবাদী প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূত, তাহা কখনও সত্যরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। ভূয়োদর্শনকালে আমরা যে সকল সত্যে উপনীত হই, সে সকল সত্যের বিপরীত কোন কিছু সত্য হইতে পারে না; তবে যদি এরূপ বহুতর নিদর্শন আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তখন আমরা পূর্ব্ব সত্যের প্রতি সন্দিহান হইতে পারি। আরোহ-পদ্ধতিক্রমে (Inductive generalisation) যে সকল সত্যে উপনীত হওয়া যায়,কোন স্থানে তাহাদের ব্যতিক্রম দেখিলে আমরা সে ঘটনার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে কুণ্ঠিত হই। আবার অধিকাংশ মানব স্বাভাবিক সংস্কার বশে অথবা অভ্যাসবশে সহজেই সরল ভাবে অস্তপ্রদত্ত বিবরণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন। সরল বিশ্বাসে ঐতিহাসিকের কোন কিছু গ্রহণ করা উচিত নহে। প্রত্যেক ঘটনা যথাযথ বিচার করিয়া গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। তবে, একথাও মনে রাখিতে হইবে যে,আমাদের পূর্ব্বসুরীগণ তৎকালোচিত শিক্ষাপ্রভাবে যে সকল ঘটনার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতেন, অধুনা আমরা সে সকলের উপর বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারি না, কিন্তু তাই বলিয়া যে তাঁহাদের সকল সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিব, এমন কোন কথা হইতেই পারে না।

কেবল মাত্র চাক্ষুষ প্রমাণের উপর নির্ভর করিলে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা একরূপ দুরূহ ব্যাপার।

তাই ঘটনাসংগ্রহে সাধারণতঃ পর্য্যবেক্ষণ শক্তির বিশেষ আবশ্যকতা দেখিতে পাওয়া যায় না। সমসাময়িক লেখকদিগের উপর বড় একটা আস্থা স্থাপন করিতে পারা যায় না। তাহার দুইটা প্রধান কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, সমসাময়িক লেখক কোন দলভুক্ত হন এবং সেই দলের প্রতি তাঁহার পক্ষপাত দোষ স্বভাবতঃই আসিয়া পড়ে। তাই তাঁহার বিবরণ একটু একদেশদর্শী ও অনুরঞ্জিত হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, মানুষের মজ্জাগত দোষ হইতে তিনি রক্ষা পাইতে পারেন না, তিনিও আপনার কীর্ত্তিকাহিনী প্রচার করিবার জন্য অন্যের গুণগরিমায় কলঙ্ক কালিমা মাখাইতে আদৌ পশ্চাৎপদ হন না। পর্য্যবেক্ষণ শক্তির প্রখরতা মুখ্যতঃ অনাবশ্যক হইলেও গৌণতঃ খুবই প্রয়োজনীয়। কারণ, ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহকারীকে দেখিতে হইবে, প্রথমে যিনি উপকরণের পশরা লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন,তাঁহার পর্য্যবেক্ষণ শক্তি কতদূর ছিল। এই শক্তি দুইটী শক্তির উপর নির্ভর করে—দৃষ্টি ও স্মৃতি শক্তির প্রখরতা। ভুল পর্য্যবেক্ষণের ফল যে বিষময় হইয়া থাকে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন; আবার কখনও পর্য্যবেক্ষণকারীর দোষেও ভ্রম পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ঘটনার যে অংশটুকুতে তাঁহার অনুরাগ, তিনি কেবল মাত্র সেই অংশটুকুর উপর নজর দেন। ফলে সমগ্রভাবে ঘটনাটী দেখিতে পারেন না।

সত্যের পথ হইতে বিচ্যুত হইবার প্রধানতঃ দুইটা কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম, পক্ষপাতিত্ব, দ্বিতীয় স্বার্থ। স্বার্থান্ধ মানব স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে কি করিতে পারে, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যকতা নাই। মানব স্বতঃই কোন ব্যক্তি বা নীতির আদর্শ অনুসরণ করিয়া থাকে এবং সেই আদর্শের যাহা কিছু অনুকূল তাহার প্রতি তাহার অত্যধিক মমতা বা পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়। এই কারণেও অনেকস্থলে ঐতিহাসিককে ভ্রমে পতিত হইতে হয়। তবে কি পক্ষপাতিত্ব সর্ব্বথাই বর্জ্জনীয়? অপক্ষপাতিত্ব গুণ কোন্ মানবেই পূর্ণভাবে বিরাজ করিতে প্রায়ই দেখা যায় না। পক্ষপাতিত্ব দোষ যে সর্ব্ব সময়ে দোষের আকর, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। পক্ষপাতিত্ব দোষ সত্ত্বেও যদি সংগ্রহকারক সত্য ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করেন, ও যথাযথ বর্ণন করেন, তাহা হইলে তাহাকে আমরা দোষ দিতে পারি না। তাহার পক্ষপাতিত্ব দোষদুষ্ট সিদ্ধান্তগুলি আমরা ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু তাহার ঘটনাগুলি লইয়া আমরা নূতন সিদ্ধান্তেও উপনীত হইতে পারি।

আজকাল একদল ঐতিহাসিক লেখক উঠিয়াছেন, যাঁহারা ধূয়া ধরিয়াছেন, ইতিহাস বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে লিখিত হওয়া উচিত। বেশ কথা, বিজ্ঞানের যুগে বিজ্ঞানসম্মত হওয়াই ত ভাল; কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীটা যে কি, তাহা আমরা আজ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিতেছি না। আর, এই দলের কোনও লেখক আজ পর্য্যন্ত সে কথাটা কোথাও খুলিয়া বলেন নাই। যদি ইহার অর্থ আরোহ-পদ্ধতি ক্রমে ঘটনা সংগ্রহ করা, তাহাদের যাথার্থ্য নির্ণয় করা এবং সেগুলি হইতে সুষ্ঠু সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া হয়, তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারি। ইতিহাস ও বিজ্ঞানের পার্থক্য ঐতিহাসিকপ্রবর পাদরে জর্জ সাহেব তাঁহার 'Historical Evidence' পুস্তকে এইরূপ লিখিয়াছেন :—"Science & History, though they agree as to the purpose for which they investigate evidence, differ in every other respect except in so far as they are concerned in the credulity of testimony." (page 21) * * *. "Science and history differ profoundly :—

(1) As to the nature of evidence with which they deal.

(2) As to the method of treating it.

(3) As to the result at which they aim.

(4) "As to the amount of certainty which they may expect to attain."

এ সম্বন্ধে যাঁহারা বিশদ ভাবে জানিতে চাহেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া পুস্তকখানি পাঠ করিয়া দেখিবেন। এই পুস্তক ইতিহাস আলোচনাকারীদের অবশ্য পাঠ্য।

এখন একটা কথা বলিয়া আমরা এ বিষয়ের আলোচনা শেষ করিতে চাই। প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হইলে কেবলমাত্র শিলালিপি, তাম্রশাসন, মুদ্রা, মুদ্রিত পুস্তক বা সরকারী কাগজপত্র হইতে সহায়তা লইলেই চলিবে না। অবশ্য একথা স্বীকার্য্য যে, এ গুলির উপর যেরূপ সহজে বিশ্বাস স্থাপন করা যায়, অমুদ্রিত, হস্তলিখিত কুলপঞ্জী বা বংশলতার উপর ততটা আস্থা স্থাপন করা যায় না। তবে এ কথাও সত্য যে, শেষোক্ত প্রমাণ গুলিকে বাদ দিলে চলিবে না; সেগুলিকে যুক্তির নিকটে ফেলিয়া যাচাই করিয়া লইতে হইবে। দেখিতে হইবে, সেগুলির ঘটনাবলীর সহিত অন্যান্য উপায়ে প্রাপ্ত ঘটনাবলীর পার্থক্য কত দূর। যদি উভয়ের মধ্যে সমতা দৃষ্ট হয়, তবে কেন সেগুলিকে গ্রহণ করিব না? এ স্থলে সুপ্রসিদ্ধ "পারজিটার সাহেবের" 'Ancient genealogies—Are they trustworthy' প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন—বংশলতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবার পক্ষে প্রধান অন্তরায় হইতেছে রাজন্যবর্গের নামের বিস্তৃত তালিকা। প্রত্যেক বংশের রাজগণ প্রকৃত পক্ষে জীবিত ছিলেন কি না জানিবার উপায় নাই; অধিকন্তু অলৌকিক ঘটনা সম্বলিত তাঁহাদের জীবনও রহস্যমাত্র। এরূপ হওয়া কিন্তু বিচিত্র নয়, কারণ আরম্ভে তখন ঘটনাগুলি সংরক্ষণের কোনরূপই ব্যবস্থা ছিল না। বংশ পরম্পরায় ইতিকথা মুখে মুখে ব্যক্ত হইলে তাহার মধ্যে যে কতকটা ভুল ভ্রান্তি থাকিয়া যাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? অধিকন্তু এটাও ধরিয়া লইতে হইবে যে, ভ্রান্তি মানবের মজ্জাগত এবং মানব অতীতকে গৌরবময় করিয়া জগতের সমক্ষে ধরিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারে না; সে পুরা কাহিনীকে কল্পনার রেখাপাতে মধুময়ী করিয়া চিত্তাকর্ষক গল্পে পরিণত করিতে সতত চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও বংশলতাকে অবিশ্বাস করিবার কোনরূপ বৈধ কারণই আমরা দেখিতে পাই না। অবশ্য কৃত্রিম কুলপঞ্জী বা বংশলতা যে সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য হইবে তাহা আর বলিতে হইবে না। জাল তাম্র শাসন, খোদিত লিপি ও মুদ্রাও পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু সেগুলি যেমন বিচারসহ হয় নাই বলিয়া ঐতিহাসিকেরা গ্রহণ করেন নাই, সেইরূপ জাল কুলপঞ্জীও গ্রহণ করিবেন না; কিন্তু কুলপঞ্জীর নাম গ্রহণ করিলেই যে নাসিকা কুঞ্চিত করিতে হইবে, তাহার কোন কারণ নাই।

এতগুলি কথা যে বলিলাম তাহার কারণ হইতেছে, এখন ইতিহাসের আলোচনা যে ভাবে হইতেছে তাহাতে আমরা আশান্বিত হইয়াছি। সাহিত্যের ইতিহাস বিভাগে যেরূপ দ্রুত উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে, অন্য কোনও বিভাগে সেরূপ হইতেছে না। তাই যাহাতে ঐতিহাসিক গবেষণা ধীর ও শান্তভাবে চালিত হয় তাহার জন্যই দু'এক কথা বলিলাম। ঐতিহাসিক তাঁহার সাধনায় জয়যুক্ত হউন, ইহাই আমাদের প্রাণের কামনা। গত বৎসর উপাসনা সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় দুঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন, 'আমাদের ইতিহাস হইয়াছে তাম্রশাসন ও খোদিত লিপির তর্জ্জমা ও বিশ্লেষণ, ধর্ম্মপাল ও মহীপালের কাল লইয়া মারামারি কাটাকাটি। অথচ আমরা আমাদের সভ্যতার ইতিহাস, সামাজিক ইতিহাস, Cultural and social history কাহারও নিকট পাইতেছি না। সে ইতিহাস এই নূতন যুগে আমাদের সভ্যতার বিকাশ সাধনে আমাদের সমাজের উন্নতির সহায় হইবে। যেটুকু Cultural history আমরা পাইয়াছি, তাহা মৃত আকাঙ্ক্ষার গলিত শব, ব্যর্থ আশার জীর্ণ কঙ্কাল, সে ইতিহাস আমাদের এই মরা

দেহে প্রাণ দিতে পারে না।'

(৬) সাহিত্য—সাধারণ সাহিত্য বিভাগে এবার কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। তবে প্রধান প্রধান মাসিকপত্রে এ সম্বন্ধে কয়েকটী উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে তাহাদের তালিকা প্রদত্ত হইল :—

সাহিত্য—বাঙ্গালা সাহিত্য—৺ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। নীরবে—বলেন্দ্র ঠাকুর। প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর বাংলা রচনা—মন্মথনাথ ঘোষ। বঙ্কিমবাবুর প্রবন্ধ, বঙ্কিমবাবুর আর একটী প্রবন্ধ—মন্মথনাথ ঘোষ। বেদান্ত-বক্তা—ক্ষেত্রমোহন বন্দোপাধ্যায়। কঠোর কাব্য, পঙ্ক, পার্থিব সমালোচক, সমালোচনা-সোপান—ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

উ—বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যের লিখন পদ্ধতির ক্রমাভিব্যক্তি—শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ নাগ।

মানসী—ফুল—সতীশচন্দ্র ঘটক। সাহিত্যে সমালোচনা—শ্রীমহীতোষকুমার রায় চৌধুরী। অভ্যর্থনা ও উদ্বোধন—(অভিভাষণ, উত্তর বঙ্গ)—মহেন্দ্রচরণ রায়। ভ-কারের ভ্রূকুটী—ললিতকৃষ্ণ ঘোষ। আমার সেতার শিক্ষা—খগেন্দ্রনাথ মিত্র। মেঘনাদ বধ কাব্যে অলঙ্কার—দীননাথ সান্ন্যাল। মেঘনাদ বধ কাব্যে রস—দীননাথ সান্ন্যাল।

সবুজ পত্র—ফরাসী সাহিত্যে বর্ণ পরিচয়—শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী।

সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকা—ইউরোপীয় লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গলা পুস্তক—শ্রীসুশীল কুমার দে। কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ ও বাঙ্গলা উচ্চারণতত্ত্ব—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। সম্বোধন—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

নব্যভারত—উপন্যাসে ধর্ম্মপ্রচার—জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়। নীতি ও সাহিত্য—যতীন্দ্রনারায়ণ রায়। ভাব ও ভাষা—রামসহায় বেদান্ত শাস্ত্রী।

নব্যভারত—জাতকের ইতিহাস—ঈশান চন্দ্র ঘোষ। পুরাণে নব্যভুগোলের একটী মত—শীতল চন্দ্র বিদ্যানিধি।

নারায়ণ—ইরাবতী ও পার্ব্বতীর প্রণয়—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। বিরহ বিলাপ—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রবাসী—আবস্তা-প্রসঙ্গ—শ্রীযুক্ত বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য। শিল্প ও ধর্ম্ম, শিল্প ও সাহিত্য—অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী। বাঙ্গালা সাহিত্যে ছোট গল্প—কালীপদ বন্দোপাধ্যায়।

উ—যশোহরের ভাষা—বিপিনবিহারী বিদ্যাভূষণ। সাহিত্যের স্থায়িত্ব—অতুলচন্দ্র দত্ত।

প্রতিভা—বাঙ্গলা সাহিত্যের উৎপত্তি ও আদি প্রকৃতি,—শূন্যপুরাণ, বাঙ্গালা সাহিত্যে বৌদ্ধযুগের অবসান—ভূপালচন্দ্র দত্ত। সাহিত্যে জয়দেব—অভিলাষ চন্দ্র কাব্যতীর্থ। সংস্কৃত নাটকে নানান ভাষা—শিবাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ। জয়দেবের শ্রীরাধা—অভিলাষচন্দ্র কাব্যতীর্থ। রবীন্দ্রীয় কথা-সাহিত্যে কল্প-পন্থা—সুখরঞ্জন রায়। মীন-চেতন প্রসঙ্গ—আবদুল করিম। নবীনচন্দ্র—অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়। আইসলণ্ডের সাগা-সাহিত্য—অবিনাশচন্দ্র মজুমদার। বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ (পরিশিষ্ট ভাগ)—আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ।

ভা—আমাদের সর্ব্বনাশ—আদিনাথ বন্দোপাধ্যায়। গুজরাতী সাহিত্যের ক্রমবিকাশ—রসিকলাল রায়। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি—মহারাজ কুমার মহেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্ম বিদ্যার্ণব। কল্পনা ও ছোটগল্প—সতীশ বাগচী। প্রাকৃত কবিতা—শ্রীযুক্ত বিধুশেখর। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন—রমেশচন্দ্র মজুমদার। চণ্ডীদাস প্রসঙ্গ—দীনেশচন্দ্র সেন। বঙ্কিমচন্দ্রের

শিশুচরিত্র—শরচ্চন্দ্র ঘোষাল। দুই ভগিনী—ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী—আবদুল করিম। বঙ্কিম প্রতিভা—বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য। কর্ণভার—শরচ্চন্দ্র ঘোষাল। গ্রাম্য গাথা ও প্রবচন প্রসঙ্গ—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। বঙ্গসাহিত্যের ভবিষ্যৎ—মাননীয় বিচারপতি স্যর আশুতোষ। বাঙ্গলায় অনুজ্ঞা—অনাদি বন্দোপাধ্যায়। সাহিত্যের ভাষা—সারদাচরণ মিত্র।

ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন—বঙ্কিমপ্রসঙ্গ — তারকনাথ বিশ্বাস। অজ্ঞাতপদ কর্তৃগণ — সতীশচন্দ্র রায়। কাব্যে মিত্রকবি হরিশ্চন্দ্র—গিরিজাকান্ত ঘোষ। বর্ষবিদায়—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

ব্রহ্মবিদ্যা—সামাজিক কথা—পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

বাঙ্গলায় বানান কিরূপ হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে এবার 'প্রবাসীতে.' 'ভারতবর্ষ,' 'উপাসনা,' 'মানসী ও মর্ম্ম বাণী'তে এবং অন্য দুই একটী পত্রে নানা বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার ভাষা কিরূপ হইবে, তাহা লইয়াও অনেক তর্ক বিতর্ক চলিয়াছিল এবং এখনও চলিতেছে। এ বৎসর সাহিত্যে আলোচনার বিভিন্ন বিভাগে অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে সেগুলির একটী তালিকা প্রদত্ত হইল :—

ভারতবর্ষ—নিরক্ষর কবি—(১) জয়চাঁদ, (২) ঈশান ফকির।—মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য। প্রাচীন ভারতে কর্ম্মকাণ্ড—রাধাকুমুদ। সাহিত্য আলোচনার মাপকাটি—রাধাকমল। হিমাচলের অপর পার—বিনয় সরকার। বাঙ্গালা তারিখে লা, রা, ঠা, ই, এ যোগ—সত্যেশচন্দ্র গুপ্ত। সাহিত্যের ভাষা ও চলতি কথা—বৃন্দাবন ভট্টাচার্য্য। চীনের 'তাও' পন্থক কবিবর চুকুঙ—বিনয় সরকার। য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধে ভারতীয় রাজন্যবৃন্দ—বীরেন্দ্র ঘোষ।

ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন—সাহিত্য ও সাহিত্যিক—উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। প্রাচীন চতুষ্পাঠীর শিক্ষা—শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। মুসলমানগণের সংস্কৃত জ্ঞান—বীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর। সভাপতির অভিভাষণ—দীনেশ সেন। ভাষার আকার ও বিকার—নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত। আবার ভাষার কথা—যতীন্দ্রমোহন সিংহ। চীন ও ভারত সন্তান—বিনয়চন্দ্র সরকার।

নব্যভারত—তাম্রশাসনের অত্যুক্তি ইতিহাস নহে—সুদর্শন বিশ্বাস। পুণ্যাহ—ধীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও জীবন সংগ্রাম—প্রকাশচন্দ্র সরকার। বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি—পরেশনাথ সেন। ভক্তিসুধা—জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়। মহাকবি কালিদাস—রাজকিশোর রায়। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা—দেবেন্দ্রবিজয় বসু। সঙ্গশিক্ষা—দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী। স্বদেশভক্তি—　ঐ

(৭) আলোচনা।—

সাহিত্য—বাঙ্গালীর আদর্শ—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

উপাসনা—ইয়াঙ্কি সভ্যতার বিশেষত্ব—বিনয়কুমার সরকার।

মানসী ও মর্ম্মবাণী—বৈদেশিকী—গৌরহরি সেন। শ্রুতিস্মৃতি—মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়। ভাষার সংস্কার—রাখালরাজ রায়। পুরাতন প্রসঙ্গ—নূতনকল্প—বিপিনবিহারী গুপ্ত। জাতীয় সাহিত্য—(অভিভাষণ) আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

কৃত্তিবাস—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। জন্মভূমি—(অভিভাষণ)—জগদিন্দ্রনাথ রায়। রোগশয্যায় প্রলাপ—রোগাতুর শর্ম্মা (৺ ব্যোমকেশ)। ভারতবর্ষে প্রচলিত ওজন ও মাপ প্রণালী—রাখাল রাজ রায়। আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে 'মা'—জিতেন্দ্রলাল বসু। নারীসম্মান—যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী। রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ—বিপিনবিহারী গুপ্ত। ইতিহাসে বৈজ্ঞানিক প্রণালী—বৃন্দাবন ভট্টাচার্য্য। চড়কপূজার স্মৃতি—প্রমথনাথ চৌধুরী। ভাষা সম্বন্ধে দুই একটী কথা—রাখালরাজ রায়। সঙ্গীতাচার্য্যের স্মৃতিকথা—বিপিন-বিহারী গুপ্ত।

সবুজপত্র—ফরাসী ও জার্ম্মাণ ভাষার কথা—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘটক। বাঙ্গালা সাহিত্যে বাঙ্গাল ভাষা—হারীতকৃষ্ণ দেব। ভাষার কথা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সাহিত্যের ভাষা—প্রমথ চৌধুরী। হিন্দুসঙ্গীত—প্রমথনাথ চৌধুরী। রাগ ও মেলতি সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সত্যনিষ্ঠা—নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত। শিক্ষার লক্ষ্য—অতুলচন্দ্র গুপ্ত।

প্রবাসী—বাংলা বানান'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নূতনশিক্ষা ও প্রাচীন আধ্যাত্মিকতা—বিজয়চন্দ্র মজুমদার। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন—ভাষার প্রকৃতি—অজয়-নাথ ঘোষ। জাতের বিবাহ-নিয়ম—জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর। আধুনিক কাব্যের প্রকৃতি—অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী। জন সাধারণের শিক্ষা—রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বংশোন্নতিবিজ্ঞান ও ও পাত্র নির্ব্বাচন—সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বিংশশতাব্দীর নারী সমস্যা—বিনয়কুমার সরকার। বঙ্গভাষার অভিচার—যোগেশচন্দ্র রায়। পরজাতি বিদ্বেষ ও নৃতত্ত্ব—বিনয়কুমার সরকার। পঞ্জিকা-সংস্কার—কৃষ্ণলাল সাধু। বাংলা রামান—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। স্বপ্নদর্শন—নবকুমার কবিরত্ন। ধনবিজ্ঞান চর্চ্চা—বিনয়কুমার সরকার। পিকিঙে নান্‌ মহল্লায়—বিনয়কুমার সরকার। প্রকৃত বণিক—যোগেশচন্দ্র রায়। বাঙ্গালা বানান—যোগেশচন্দ্র রায়। অক্ষরের আলোচনা—বিজয়চন্দ্র মজুমদার। বায়োস্কোপ—চারু বন্দ্যো-পাধ্যায়। চীনে দুনিয়া পূজা—বিনয়কুমার সরকার। ইতিহাস—বিজয়চন্দ্র মজুমদার। চীনাদের জীবন যাত্রা—বিনয়কুমার সরকার। চীনের তৃতীয় রাষ্ট্র বিপ্লব—ঐ। চীনের শিকাগো—বিনয়-কুমার সরকার। জগৎপ্রসিদ্ধ মহাপ্রাচীর—বিনয় কুমার সরকার। প্রাচীন ভারতের রাজা, মুকুট ও সিংহাসনের লক্ষণ—চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়। বাঙ্‌লার বানান সমস্যা—যোগেশচন্দ্র রায়, বিধু-শেখর শাস্ত্রী। ভারতে স্থাপত্য—অসিতকুমার হালদার। মানুষের ক্রমোন্নতির সঙ্গে খাদ্যের ক্রমবিকাশ—জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চী। মিং সম্রাট্‌দিগের গোরস্থান—বিনয়কুমার সরকার। শব্দ প্রসঙ্গ—বিধুশেখর শাস্ত্রী।

নারায়ণ—আর্টের আধ্যাত্মিকতা—শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। বঙ্গদেশীয় মহাকাব্য—সারদাচরণ মিত্র। সাহিত্য ও সুনীতি—রাধাকমল মুখোপাধ্যায়। কাব্য ও তত্ত্ব—নলিনীকান্ত গুপ্ত। সাধু ও শিল্পী—নলিনীকান্ত গুপ্ত। জাতি বা বর্ণ-ভেদের কথা—বিপিনচন্দ্র পাল। চলিত ভাষা ও সাধু ভাষা—শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত। বঙ্গ সাহিত্যের ভবিষ্যৎ—আশুতোষ মুখো-পাধ্যায়। বৈষ্ণব মহাজন ও বাঙ্গলা মহাজন পদ—বিপিনচন্দ্র পাল। 'দিউয়ান-ই-মখফী' কি জেব-উন্নিসার ?—ব্রজনাথ বন্দোপাধ্যায়। স্বামী বিবেকানন্দ ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ—

গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী। সাহিত্যে অনধিকারী—ঐ। মহাজন পদের ঈশ্বরতত্ত্ব, মহাজনের সিদ্ধান্তে পুরুষ ও প্রকৃতি, রূপান্তরের কথা—বিপিনচন্দ্র পাল। ইউরোপীয় ট্রাজেডি ও ভারতীয় করুণ রস—নলিনীকান্ত গুপ্ত। রাধামাধবোদয় (প্রথম মিলন)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব—বিপিনচন্দ্র পাল।

জন্মভূমি—আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধারের উপায় নির্ণয়—সুরেশ চন্দ্র সেন কবিরঞ্জন। রাসলীলা—প্রসাদদাস গোস্বামী। সনাতন ধর্ম্ম—কবিরাজ শ্রীসুক্ত হরিপদ শাস্ত্রী।

উদ্বোধন—বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু জীবনে বেদান্তের প্রভাব ও উপযোগিতা—স্বামী শুদ্ধানন্দ। সম্রাট অশোকের ধর্ম্ম—গোকুলদাস দে। বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম ও শ্রীবিবেকানন্দ—দেবেন্দ্রনাথ বসু। মানব-সমাজে ধর্ম্মের প্রয়োজন—স্বামী শুদ্ধানন্দ। মানুষের স্বরূপ কি—কিরণচন্দ্র দত্ত। নীট্‌চে রচিত গ্রন্থাদির শ্রেণীবিভাগ—গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী। ধর্ম্ম ও মোক্ষ—ব্রহ্মচারী সাধুচৈতন্য। তত্ত্বজ্ঞান—উপেন্দ্র নাথ দত্ত। কুশদহ সংস্কারে কালের প্রভাব—জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

গৃহস্থ—অভিব্যক্তিবাদ—প্রফুল্লনাথ লাহিড়ী। জ্যোতিষ চর্চ্চাফলে মানব ও ব্রহ্মের ধারণা—তারকনাথ মুখোপাধ্যায়। ভারতীয় মুসলমান সম্রাটগণের সাহিত্য সেবা ও শিক্ষাবিস্তার—নরেন্দ্রনাথ লাহা। জীবাভিব্যক্তি বাদ—প্রফুল্লনাথ লাহিড়ী। সৈয়দ মর্ত্তুজার নূতন পদাবলী—আবদুল করিম।

নারায়ণ—ভাষা বিভ্রাট — । শিক্ষা ও শিক্ষক—সত্যকাম। বিশেষজ্ঞের অজ্ঞতা—রাধা-কমল। বৃহত্তর জাপান—বিনয়কুমার। বাংলা বাসায়—নূতন শিক্ষা ও প্রাচীন আধ্যাত্মিকতা—সাহিত্যে ভাববিপর্য্যয়—বিভূতিভূষণ ভট্ট। চীনাদের প্রেম-সাহিত্য—বিনয়কুমার। বাঙ্গালা 'চলতি' ভাষা—কালীপদ।

প্রতিভা—বিদ্যালয়ে ইতিহাস শিক্ষা—গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য। পাশ্চাত্য প্রভাবে বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যের উদ্ভব—ভূপালকুমার দত্ত। ভালমন্দের জন্ম কথা—উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। বার্ণার্ড শ'—উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। ভাগবত কথা—অক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত কবিরত্ন। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজি নাট্যসাহিত্য—অবিনাশচন্দ্র মজুমদার। সাম্রাজ্ঞী বনাম সম্রাজ্ঞী—সুরেন্দ্রমোহন কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। সাহিত্য-প্রসঙ্গ—অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অবিনাশচন্দ্র মজুমদার। পাপের শাস্তি—উমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ভারতবর্ষ—সমাজ ধর্ম্মের মূল্য—অনিলা দেবী। কায়স্থেরা ক্ষত্রিয় কি না—বিজয় মজুমদার। সাহিত্যিক ভাষা ও চলিত কথা—বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সাহিত্য—কথার দুইদিক—নিধিরাম। সভাপতির অভিভাষণ—মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। সীতারাম প্রসঙ্গ—রমাপ্রসাদ চন্দ। ঋষি রবীন্দ্রনাথ—যতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। উপবাসতত্ত্ব—চুনীলাল বসু। স-কারের সাফল্য—মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। বরেন্দ্র-খনন বিবরণ—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। 'প্রতিমা' নাটক—রাধাগোবিন্দ বসাক। ঋষি ও কবি—রমাপ্রসাদ। সাহিত্যে রুচি ও নীতি—অমরেন্দ্র রায়। প্রবাল, প্রবাল দ্বীপ—কেশব গুপ্ত। সহযোগী সাহিত্য—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

উ—ভারতীয় ভক্তিতত্ত্ব—বিভূতিভূষণ ভট্ট। আমেরিকায় সভ্যতা—বিনয় সরকার। কবি—শশাঙ্কভূষণ সিংহ। শ্রীমদ্‌বেদানন্দ স্বামীর উপদেশ—দেবেন্দ্র বিজয় বসু।

মানসী ও মর্ম্মবাণী—অলোক-পন্থা ও কথা-সাহিত্যের ধারা—সুখরঞ্জন রায়।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য—শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য। বঙ্গাক্ষরের সাহায্যে আরবী ও পার্সী ভাষার শব্দ ও অক্ষরের উচ্চারণ বিধি এবং লিখন প্রণালী—ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী। দশম স্বতঃসিদ্ধ—যোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত। মুসলমান ও বঙ্গসাহিত্য—ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী। ইউক্লীডের প্রথম স্বীকার্য্য—ইউক্লীডের স্বতঃসিদ্ধ—শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত। বাঙ্গালা শব্দকোষ (সমালোচনা)—সতীশচন্দ্র রায়। সমালোচনার উত্তর—যোগেশচন্দ্র রায়। আলোচনা—অম্বুজাক্ষ সরকার।

(৮) কাব্য ও কবিতা—এবার যে সমস্ত কবিতার পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বলাকা', নাটোরাধিপতি জগদিন্দ্রনাথ রায়ের 'সন্ধ্যাতারা', শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সপ্তস্বর', শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরীর 'রাকা', শ্রীমতী নিরুপমাদেবীর 'বসন্তমালিকা' এবং কপিঞ্জলের ব্যঙ্গকবিতা 'চূণ ও কালি' উল্লেখ্য। মাসিক পত্রিকায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বাগচী, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় প্রমুখ কবিদের কয়েকটী ভাল কবিতাও প্রকাশিত হইয়াছে। রবিবাবুও এ বৎসর কয়েকটী অতি সুন্দর কবিতা প্রকাশ করিয়াছেন।

(৯) ভ্রমণ—আলোচ্য বর্ষে ভ্রমণ বিষয়ে কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। তবে মাসিক পত্রে কয়েকটী ভ্রমণ বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে তাহাদের একটী তালিকা প্রদত্ত হইল—

প্রবাসী—গোয়ালিয়র ভ্রমণ—সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। তিব্বত রাজ্যে তিন বৎসর—হেমলতা দেবী।

উপাসনা—কুম্ভমেলায় গঙ্গাস্নান—রাধাকমল।

প্রতিভা—বারাণসী—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেন। জয়পুর কাহিনী—রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার বিদ্যাভূষণ। গোরক্ষপুর—জ্যোতিরিন্দ্র নাথ সেন, নৈমিষারণ্য—ঐ।

ভারতবর্ষ—জব্বলপুরে বিশ দিন—নসীরাম দেবশর্ম্মা। য়ুরোপে তিনমাস—দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী। পারস্যে বঙ্গরমণী—বম্বে হইতে পারস্য উপসাগর—এস্ এ স্ চাকলা। অরণ্য-বিহার—জিতেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী। সিমলা—প্রফুল্লকুমার বন্দ্যো। কাশ্মীর যাত্রা—বিমলা দাস গুপ্তা—(পূর্ব্ববর্ষে আরব্ধ)। হিমালয়ের কথা—জলধর সেন। কক্সবাজার—ইন্দুভূষণ দত্ত। রাঁচী তীর্থ—বৈকুণ্ঠ নাথ বসু। তীর্থ-ভ্রমণ—সারদাচরণ মিত্র। অষ্ট্রেলিয়া ভ্রমণ—অনুকূল মুখোপাধ্যায়। কৃষ্ণদেউলের যাত্রী—হেমেন্দ্রকুমার রায়। বীরভূমের কথা—জলধর সেন। শিলং ভ্রমণ—হেমনলিনী দেবী।

ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন—উত্তরাপথ ভ্রমণ—ভবঘুরে। শারনাথ—মণীন্দ্রকিশোর সেন। পরেশনাথ পাহাড়—রবীন্দ্রনাথ সেন। চীনা ও জাপানী সমাজদ্বয়ের আবহাওয়া—বিনয়কুমার সরকার। বাগীরাজ—নগেন্দ্রনাথ ঘোষ। পুষ্কর—রাজকুমার সেন।

সাহিত্য—উজ্জয়িনী—নগেন্দ্রনাথ সোম। অমরনাথ—নগেন্দ্রনাথ সোম। ইন্দোর—নগেন্দ্রনাথ সোম। খাণ্ডোয়া—নগেন্দ্রনাথ সোম। বুরহানপুর—নগেন্দ্রনাথ সোম। মহীপুর ভ্রমণ—প্রবোধচন্দ্র দে।

মানসী ও মর্ম্মবাণী—তীর্থভ্রমণ, মথুরা—অরুণকুমার মুখো-

পাধ্যায়। তীর্থভ্রমণ—বৃন্দাবন—ঐ। চেকা-বিহার—শরৎ ঘোষাল। খড়গপুর—ললিতমোহন রায়।

নারায়ণ—মায়াবতী পথে—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। মহীসুর ভ্রমণ—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। মহীসুর—মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

জন্মভূমি—নেপালগঞ্জ—খগেন্দ্রনাথ বসু।

উদ্বোধন—মায়াবতী ভ্রমণ—গোপালচন্দ্র দাস।

(১০) বিজ্ঞান—আলোচ্য বর্ষে বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম করিতে পারা যায় না। কেবল মাসিক পত্রের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি উল্লিখিত হইল।

প্রতিভা—১৯১৫ খৃষ্টাব্দে রসায়ন চর্চ্চা—শ্রীযুক্ত অনুকুল চন্দ্র সরকার।

প্রবাসী—চন্দ্রের উৎপত্তি—অধ্যাপক শিশির কুমার মিত্র। ডিম্বের দৃঢ়তা—প্রফুল্ল চন্দ্র সেন গুপ্ত। বক্তৃতাঘরে প্রতিধ্বনি—চারু বন্দোপাধ্যায়। বধিরের সঙ্গীত শিক্ষা—প্রফুল্লচন্দ্র সেন গুপ্ত। বিমানচারীদের যোগ্যতার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা—প্রফুল্ল সেন। মাংসাশী গাছ—চারু বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রগ্রহে জীব আছে কি?—সূর্য্যের শক্তি পরীক্ষা—প্রফুল্ল চন্দ্র সেন।

প্রতিভা—রঞ্জেন আলো—মেঘনাথ সাহা। রক্তমোক্ষণ—জ্যোতিষচন্দ্র সরস্বতী।

ভারতবর্ষ—বৃহস্পতি—আদীশ্বর ঘটক। ঐ ব্যাক্টেরিয়া—জ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ বাগচী। দুগ্ধজাত খাদ্য—বিপিন বিহারী সেন। মশক নিবারণ—মাধুরী মোহন মুখোপাধ্যায়। ঝটিকা-তত্ত্ব—ফকির চন্দ্র দত্ত। সূর্য্য—আদীশ্বর ঘটক। পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান—সুরেন্দ্র নাথ গুহ। প্রাণময় জগৎ—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। অয়ন বিচার—বৈকুণ্ঠ চন্দ্র রায়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যুগ—শীতল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন—প্রাণীর স্বাভাবিক সংস্কার—শ্রীজগদানন্দ রায়।

সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা—প্রস্পেক্ট পাহাড়ের ভূতত্ত্ব—শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত। রেশম শিল্পের পারিভাষিক শব্দ—রাখাল রাজ রায়।

মধ্য ভারত—অণু ও পরমাণু—সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। আমাদের সার্ম্মণ (কড়াইশুঁটি গাছের শিকড়)—শশিভূষণ মিত্র। জড়ের মূল উপাদান—সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। বাঁকীপুর বিজ্ঞান শাখার সভাপতির অভিভাষণ—শশধর রায়। ভারতের কৃষি শিক্ষা—প্রকাশচন্দ্র সরকার।

জন্মভূমি—বায়ুর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী।

উদ্বোধন—প্রকৃতির সামঞ্জস্যে উদ্ভিদের স্থান—প্রবোধ চন্দ্র দে।

গৃহস্থ—জড় ও শক্তিতত্ত্ব—প্রফুল্লনাথ লাহিড়ী।

ভারতবর্ষ হইতে গতবৎসর বিজ্ঞান ও রসায়ন সম্বন্ধে ইংরেজীতে যতগুলি মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অধিকাংশের লেখকই বাঙ্গালী। এটা বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়। স্যর জগদীশ চন্দ্র ও প্রফুল্ল চন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণকারীরা বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন; সভ্য জগতের সমক্ষে তাঁহাদের মনীষার পরিচয় দিয়া ধন্যবাদ লাভ করিতেছেন; কিন্তু দীনা মাতৃভাষা কি তাঁহাদের নিকট কোন কিছু প্রত্যাশা করিতে পারে না? তাঁহাদের স্বজাতি-ভ্রাতারা যাহারা ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞ, তাহারা কি তাঁহাদের আবিষ্কার-বার্ত্তা শুনিতে পাইবে না? বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রবন্ধগুলি বাঙ্গালী পাঠকের নিকট উপস্থাপিত করা কি তাঁহাদের কর্ত্তব্য

নয় ? জগৎ তাঁহাদের জ্ঞান-গরিমা দেখিয়া বিস্মিত হইবে, নূতন তথ্যের সন্ধান পাইয়া কৃতার্থ হইবে, আর তাঁহাদের স্বজাতি ও স্বজনগণ যে আঁধারে সেই আঁধারেই থাকিবে ! যদি চ তাঁহারা পারিভাষিক শব্দের জন্য বাঙ্গালায় না লিখিতে চান, তাহা হইলে তাঁহাদের নিকট সানুনয় অনুরোধ, ইংরেজি পরিভাষা দিয়াই তাঁহারা প্রবন্ধ লিখুন। আর, সাহিত্যপরিষদের কল্যাণে অনেক বৈজ্ঞানিক পরিভাষাও ত প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলি আবশ্যক মত গ্রহণ করিতেও পারেন। যাক্ সে কথা। আলোচ্য বর্ষে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় আমাদিগকে একটী অনবদ্যসুন্দর বিজ্ঞানের প্রবন্ধ উপহার দিয়াছেন। এই প্রবন্ধ "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার "প্রাণময় জগৎ' যে কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হইত তাহারই গৌরব বৃদ্ধি করিত। কঠিন বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলিকে সরল করিয়া বলিবার অনন্য-সাধারণ শক্তি তাঁহার আছে ! এই প্রবন্ধ পাঠ করিতে করিতে আমরা অনেক নূতন তথ্য শিক্ষা করিয়াছি ও সঙ্গে সঙ্গে আনন্দও লাভ করিয়াছি। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ যাঁহারা লিখিতে চান, তাঁহারা আচার্য্য রামেন্দ্র সুন্দরের প্রবন্ধ গুলিকে আদর্শ করিয়া লিখিতে চেষ্টা করিলে কালে যশস্বী হইতে পারিবেন।

ডাক্তার অনুকূলচন্দ্র সরকারের "১৯১৫ খৃষ্টাব্দে রসায়ন চর্চ্চা" শীর্ষক প্রবন্ধটীও প্রত্যেক বিজ্ঞান আলোচনা-কারীর অবশ্য পাঠ্য। এমন গবেষণামূলক সুতথ্য-পূর্ণ প্রবন্ধ বাঙ্গালা ভাষায় বহুদিন প্রকাশিত হয় নাই।

(১১) ধর্ম্ম ও দর্শন—দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা স্বাধীন ভাবে এখন একরূপ হইতেছে না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নূতন দার্শনিক তথ্য বাহির হইতেছে না। যে সকল দার্শনিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে, তাহা মামুলি দার্শনিক তথ্যের বিশ্লেষণ মাত্র। নীরস দার্শনিক সমস্যার সরস সমাধান, ও প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দার্শনিক মতের তুলনায় সমালোচনা এখন আর হয় না। যে হিন্দুজাতি জগতে সর্ব্বপ্রথম চিন্তনীয় দার্শনিক সমস্যাগুলির মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের বংশধরদের নিকট কি আমরা কোন নূতন আদর্শ ও ভাবের পরিচয় পাইব না, যে গুলির অনুসরণ করিয়া—সাধনা করিয়া--মোক্ষ আমাদের অনায়াসলভ্য হইবে, শান্তি করতল গত হইবে ? যে গুলি বহুকালের জড়তা ও অবসাদ দূর করিয়া নূতন আলোক আনিয়া দিবে ? যে আদর্শ আমাদিগকে কর্ম্মে অনুপ্রাণিত করিবে, জাতীয়তাগঠনে সহায়তা করিবে ? অবশ্য আমরা জার্ম্মান দার্শনিক ' নীট্চের" মত 'অতিমানব-বাদ' চাহি না ; চাহি আমরা আমাদের সেই আদর্শ যে আদর্শ মানবকে দেবত্বে উপনীত করিবে, যে আদর্শ মধুর সম্ভাষণে সোদরজ্ঞানে আলিঙ্গন করিবে। এক কথায় যে আদর্শ ব্যবহারিক জীবনে কার্য্যকর হইবে সেই আদর্শই আমরা চাই।

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সিংহ মহাশয় ধারা-বাহিক ভাবে মনোবিজ্ঞানের তত্ত্বসমূহ যেরূপ সরস করিয়া লিখিতেছেন, তাহাতে আমরা যে তাঁহার নিকট হইতে সত্বর একখানি মনোজ্ঞ মনোবিজ্ঞান পাইব, তাহা আশা করিতে পারি।

বাঁকিপুর বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের দশম বার্ষিক অধিবেশনে দর্শন-শাখার সভাপতি শ্রীযুত রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরীর 'অভিভাষণ' বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য। শ্রীযুক্ত নিরঞ্জনানন্দ তীর্থস্বামীর বেদান্ত দর্শন (২য় খণ্ড। উপাদেয় গ্রন্থ।

প্রবাসী—পরা বিদ্যা এবং অপরা বিদ্যা—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এক পুরুষের সহিত অনেক পুরুষের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পুরাতন গ্রীসে ভারতের ভারতীর অজ্ঞাতবাস—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। নিখিল বিজ্ঞান-শাস্ত্রের গোড়ার শাস্ত্র—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বেদান্তের প্রতিধ্বনি—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বেদমন্ত্রে দীক্ষিত যবনাচার্য্য—

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভারতপ্রাণা ভারতীর যবনদেশে যবনীবেশ—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভারত-ভারতীর চরণ-প্রান্তে আর দুই এক ডালি—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রতিভা—তন্ত্রতত্ত্ব—উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ। জড় ও চৈতন্য—(অনুবাদ) উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ।

ভারতবর্ষ—সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে বৌদ্ধদর্শন—ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী। মনোবিজ্ঞান—চারুচন্দ্র সিংহ। হেয়, উপাদেয়, শ্রেয়ঃ, প্রেয়ঃ—খগেন্দ্রনাথ মিত্র। চার্ব্বাক দর্শন ও তাহার সমালোচনা—যাদবেশ্বর তর্করত্ন। আহ্নিকী—হরিহর শাস্ত্রী। প্রাকৃত দর্শনের ইতিহাস—সীতানাথ প্রধান। সাংখ্যদর্শনে ক্রমবিকাশবাদ—শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ব্রহ্মবাদী—চিন্তাশক্তি, তাহার সংযম ও সাধনা—মাখনলাল রায় চৌধুরী। মানব ও জগৎ—নলিনীনাথ ভট্টাচার্য্য। ফ্রেডারিক নীটসের দার্শনিক মত—নলিনীনাথ ভট্টাচার্য্য। হিন্দু ও বৌদ্ধদর্শনে প্রভেদ কোথায়—ক্ষেত্রনাথ বন্দোপাধ্যায়। বৈদিক ও পৌরাণিক উপাখ্যানে দার্শনিক-তত্ত্ব—শশিভূষণ দাস বিদ্যারত্ন। জীবনীশক্তি—সতীশচন্দ্র লাহিড়ী। ভারতীয় ভূমাবাদ—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। সৃষ্টিতত্ত্ব—পরেশচরণ চট্টোপাধ্যায়।

নব্যভারত—আত্মার অমরত্ব—শীতলচন্দ্র বিদ্যানিধি। আত্মার স্বরূপ—শীতলচন্দ্র বিদ্যারত্ন। গ্রীক-দর্শন—দিগ্বিজয় রায় চৌধুরী। গীতোক্তব্রহ্ম-তত্ত্ব—দেবেন্দ্রবিজয় বসু। বেদান্তদর্শন—কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী। ভক্তিবাদ ও নামসংকীর্ত্তন—রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।

দর্শন।

উদ্বোধন—বেদান্ত দর্শন (অনুবাদ)—অমূল্যাক্ষ সরকার। গৃহস্থ—ভারতের ধর্ম ও দর্শন—বিনয়কৃষ্ণ। নারায়ণ—ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস—কানাইলাল দাস। নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্ম—জলধর সেন।

ব্র—মনোবিজ্ঞানের নূতন ধারা—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। জ্ঞান ও কর্ম্মরহস্য—রামসহায় বেদান্ত-শাস্ত্রী। চরিত্র-গঠন ও চিন্তাবল—যোগেন্দ্রনাথ গোস্বামী। সাংখ্য ও বেদান্ত—প্রসন্নকুমার বেদান্ততীর্থ।

ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ।

প্রবাসী—চীনে বৌদ্ধ ও কন্‌ফিউসিয়স ধর্ম্ম—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার।

ভারতবর্ষ—শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের উৎপত্তি, বিকাশ ও প্রচার—শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

মানসী ও মর্ম্মবাণী—জৈন ধর্ম্ম ও দর্শন—অমূল্যাক্ষ সরকার। কর্ম্মযোগ—অশ্বিনীকুমার দত্ত।

(পুস্তক)

ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়খানি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য :—

১। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা—(মূল, ভাষ্য ও বঙ্গানুবাদ)—শ্রীসচ্চিদানন্দ বালব্রহ্মচারী।

২। চারিটী বক্তৃতা—শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক।

৩। জাতক (১ম খণ্ড)—শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ।

৪। আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান—নবীনানন্দ স্বামী।

৫। ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন—শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী।

৬। কীর্ত্তন ঘোষা (শঙ্কর, মাধবদেব ও শ্রীধর কদলির পদাবলী)—প্রকাশক শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য।

৭। নামঘোষা—(আসামী হিন্দু সাধু মাধবদেবের কবিতা) প্রকাশক—শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য।

৮। বৈরাগ্যশতক—শ্রীবিপিনবিহারী দেবশর্ম্মা।

৯। শব্দামঙ্গল—মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ।

১০। যুগধর্ম্ম ও যুগাবতার—শ্রীশশিভূষণ মল্লিক।

১১। নচিকেতা—শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

১২। অর্জ্জুন গীতা—কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন।

১৩। অথর্ব্ববেদীয় শিখোপনিষৎ—উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

১৪। অথর্ব্ববেদীয় শির উপনিষৎ—উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

১৫। ভক্তিসিদ্ধান্ত ভাগবত—আশুতোষ দাস [বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর উপদেশ]

১৬। শ্রীগৌরগোবিন্দার্চ্চন পর্দ্ধতি—ললিতমোহন ঘোষ [বৈষ্ণব অনুষ্ঠান]।

১৭। সচিত্র সাধন বিজ্ঞান—যোগপ্রকাশ ব্রহ্মচারী—২য় কাণ্ড। ২য় খণ্ড।

১৮। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ শিক্ষা। প্রথম খণ্ড কেশবলাল সাহা।

১৯। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় তেজোবিন্দুপনিষৎ ধ্যানবিন্দুপনিষচ্চ -উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পৃঃ ২২।

২০। শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব—রেবতীমোহন রায় চৌধুরী কাব্যতীর্থ।

২১। সরস্বতী তন্ত্রম্। তন্ত্রকল্পতরৌ গ্রন্থ ৯—গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ—সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ।

২২। জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র—যোগেশচন্দ্র রক্ষিত (পদ্যানুবাদ) ৯ পৃঃ।

(১২) বিবিধ—বিবিধ বিষয়ক পুস্তক ও প্রবন্ধাদির মধ্যে উল্লেখ্য গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদির তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

প্রবাসী—প্রাচীন রোমীয় চিকিৎসাতত্ত্ব—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন গুপ্ত। প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য আর্য্য প্রকৃতির সাম্য হইতে বৈষম্যে পরিণতি—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্লেটো, সোক্রেটিসের আত্মসমর্থন—অধ্যাপক রজনীকান্ত গুহ।

প্রতিভা—সম্পাদকীয় ব্রত—শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রকিশোর সেন। সোসিয়ালিজম্-এ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মজুমদার এবার আন্তর্জ্জাতিক শ্রমজীবী সমিতি ও সোসিয়াল ডিমক্রেশী এবং আনার্কিসম্ বা অরাজকতাবাদ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন।
সভাপতির অভিভাষণ—সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। স্বপ্নতত্ত্ব ও সাহিত্যে স্বপ্ন—শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার সেন। পাখীর কথা—সুরেন্দ্রনাথ সেন। পাখীর বিবাহ পদ্ধতি, পাখীর গার্হস্থ্য-জীবন—ঐ। বিবাহ সমস্যা জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চী। আদর্শ ব্যায়াম পদ্ধতি—মন্মথনাথ মজুমদার। জিম্‌ন্যাষ্টিক—ঐ।

ভারতবর্ষ—অভিভাষণ—কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ রায় বাহাদুর। যুগরহস্য সম্বন্ধে মহাভারতের কয়েকটি উক্তি—রাখালদাস নাগ চৌধুরী। ধনোৎপত্তি—অক্ষয় সরকার। ভারতে য়ুরোপীয় পর্য্যটক—যোগীন্দ্র সমদ্দার। প্রাণী ও উদ্ভিদের সাদৃশ্য ও সম্বন্ধ বিচার—প্যারীমোহন দেববর্ম্মা। অশোক অনুশাসন ও বর্ণভেদ—সারদাচরণ মিত্র। দেবাসুর সংগ্রামে জাতের ক্রমবিবরণ—দেবেন্দ্রবিজয় বসু। শ্রুতি-উল্লিখিত আধ্যাত্মিক দেবাসুর সংগ্রাম—দেবেন্দ্রবিজয়।

নারায়ণ—রাজা রামমোহন রায় ও ব্রহ্মসভা—বিপিনচন্দ্র পাল। বুড়ার অ্যালবাম—শ্রীমতী গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী।
চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে—মনীগোপাল মজুমদার। বিশ্বসেবায় বিদ্যুৎ—হরিদাস হালদার। প্রেম ও পরিণয়—হরিদাস হালদার। ফাল্গুনী পূর্ণিমা—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত। দোল পূর্ণিমা—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। নূতন বিজ্ঞান—শিশির কুমার মিত্র। নিয়তির খেলা (কথা নাট্য)—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত। শাব্দিক শাকটায়ন—মনী গোপাল মজুমদার। তদুচিত গৌরচন্দ্র—বিপিন চন্দ্র পাল। কৃত্তিবাস—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

জন্মভূমি—আরোগ্যলাভ (রঙ চিত্র)—দেবেন্দ্রনাথ বসু।

চরিত্র গৌরব—রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ। শ্বাস-প্রশ্বাসে জ্যোতিষ তত্ত্ব—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। খনিজবিদ্যা (Mining)—করালীচরণ চক্রবর্ত্তী।

উদ্বোধন—স্বামী বিবেকানন্দের পত্র—(ইংরেজী হইতে অনুদিত)। বেদকথা—পণি অসুর ও সরমার আখ্যান—উপেন্দ্রনাথ দত্ত। বেদান্তে সৃষ্টিতত্ত্ব—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। হিন্দুর প্রতিমাপূজা অদ্বৈতবাদ ও পূজা অর্চ্চা স্বামী শুদ্ধানন্দ।

গৃহস্থ—ফরাসী শিল্প ও বাণিজ্য—বিনয়কুমার সরকার। রুশিয়ার শিল্প ও বাণিজ্য। রঙপুর কৃষি বিভাগের সভাপতির অভিভাষণ। চীনা কবিদের প্রকৃতি নিষ্ঠা। পো চুইয়ের বীণাওয়ালী—বিনয়কুমার সরকার। আত্মতত্ত্ব—প্রফুল্লচন্দ্র লাহড়ী। বর্দ্ধমান জেলার মেলার বিবরণ—ভোলানাথ ব্রহ্মচারী।

ভারতী—চণ্ডী উক্ত দেবাসুর সংগ্রাম—দেবেন্দ্রবিজয় বসু। ধর্ম্মে মতি—ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলিত জ্যোতিষ—খগেন্দ্রনাথ মিত্র। বিজ্ঞান-রহস্য—হরিদাস হালদার। বিবাহে বিবিধ বাধা—ললিতকুমার বন্দ্যো। সংস্কৃত—ভাষা ও সাহিত্য—ঐ। শ্রীপঞ্চমীর পল্লী—দীনেন্দ্রকুমার রায়।

ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন—সেকালের বাঙ্গালা পত্রিকা—কেদারনাথ মজুমদার। ব্যাকরণের দশ্বাস্ত—অনুকূলচন্দ্র শাস্ত্রী। ঢাকায় রথযাত্রা—যতীন্দ্রমোহন সিংহ। চীনা শিল্প-শাস্ত্র—বিনয় সরকার।

ভারতী—সৌন্দর্য্যের বিজ্ঞান—শীতল চক্রবর্ত্তী। কাব্য-সৌন্দর্য্যে শ্লীল ও শ্লীলতা—বিজয় বাবু। বঙ্কিম প্রসঙ্গ—পূর্ণ চট্টোপাধ্যায়। সমসাময়িক ভারতের নৈতিক সভ্যতা—জ্যোতিরিন্দ্র। প্রাণশক্তির বিকাশ—শীতল চক্রবর্ত্তী। কীট পতঙ্গের জীবনের কার্য্য—জগদানন্দ রায়। সংস্কৃত ভূত ও দেশী পেত্নী—বিজয়। লজ্জার বিকাশ—শীতল চক্রবর্ত্তী।

ভারতী—আর্টের আদর্শ—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়।

জগজ্জ্যোতি—শ্রোণকোটি কণাবদান হারীতিকা দমনাবদান কপিলাবদান—শরৎচন্দ্র দাস। অসদৃশজাতক—ঈশানচন্দ্র ঘোষ। জন্মান্তর বাদ ও বংশানুক্রম—সন্তোষ কুমার মুখোপাধ্যায়। প্রাতিমোক্ষ—বিধুশেখর শাস্ত্রী। হারীত জাতক—প্রমথনাথ তর্কভূষণ। আর্য্যমার্গদীপিকা—অত্রিবংশ। বিদ্যাবিনোদ। বুদ্ধচরিত কাব্য—বিজয়কৃষ্ণ মজুমদার। ন চ সমাজো কর্ত্তব্যো—চারুচন্দ্র বসু।

নব্যভারত—আর্য্যদিগের দিগ্‌নামের আদিরহস্য—শীতলচন্দ্র বিদ্যানিধি আসামের জাতিবিভাগ—কৃষ্ণবিহারী রায়চৌধুরী।

পুস্তক

১। ঠাকুরমার চিঠি—শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ রায়। ইহাতে সমাজ সম্বন্ধীয় পত্রাবলী প্রকাশিত হইয়াছে।

২। ময়মনসিংহের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ও জমিদার। ২য় খণ্ড। সুসঙ্গ রাজবংশ শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।

৩। বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলনের নবম অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ (১ম খণ্ড)

৪। কায়স্থ দীপিকা—শ্রীযুক্ত যাত্রামোহন বিশ্বাস।

৫। চাতুর্ব্বর্ণত্ব—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।

৬। ব্রহ্মচর্য্য ও বাল্যবিবাহ—শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেন গুপ্ত।

৭। নূতন বঙ্গের পুরাতন কাহিনী—শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন চন্দ্র পূততুণ্ড। ইহাতে ১৭ ও ১৮শ শতকের বাঙ্গালা দেশের আচার-ব্যবহার বর্ণিত হইয়াছে।

৮। কাব্য-সুধা—শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহাতে বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসের স্ত্রী-চরিত্রের আলোচনা আছে।

৯। ১৩২২ বঙ্গাব্দের সাহিত্য পঞ্জিকা—শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ও শ্রীযুক্ত রাখালর জ রায়।

(১৩) অনুবাদ—আলোচ্য বর্ষে উল্লেখ যোগ্য কোন অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। তবে শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য এবৎসর ফরাসী ও সংস্কৃত হইতে অনেক নূতন উপাদান অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। জ্যোতিরিন্দ্র বাবু প্রবাসীতে 'ভারতে বর্ণ ভেদ', 'ব্যবসার ভেদে বর্ণভেদ', 'জাত ও আহারের নিয়ম,' জাত ও আনুষঙ্গিক আচার অনুষ্ঠান', 'জাতের পঞ্চায়ৎ', 'দলপতি ও দণ্ডবিধি', 'জাতের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবিধ আলোচনা', 'জাতের ভিতর ভাঙ্গা-গড়া ও ওঠা-নামা', 'প্রাচীন ভারতে বর্ণভেদ', 'বর্ণ, শ্রেণী ও জাত', 'কায়স্থ ক্ষত্রিয়ে বিরোধ', 'ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে, বেদ ও বর্ণভেদ'—এই কয়টী বিষয় ফরাসী হইতে অনুবাদ করিয়াছেন। তিনি মানসীতে ফরাসী হইতে একটী গল্পও বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছেন। গুরুবন্ধু বাবু এবার ভাসের 'অবিমারক' প্রতিভায় অনুবাদ করিয়া শেষ করিয়াছেন। 'মধ্যম ব্যায়োগ' ও 'দূতবাক্য'—নামক ভাসের অপর দুইখানি নাটকও তিনি প্রতিভায় অনুবাদ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়ও 'শাশ্বতীতে' ভাসের গ্রন্থান্তরের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহারা দুইজনেই আমাদের ধন্যবাদার্হ। 'ব্রহ্মবিদ্যা'য় শ্রীযুক্ত হরিদাস বিদ্যাবিনোদ আনি বেসান্তের একটী বক্তৃতা 'দুঃখের অর্থ ও ব্যবহার' নাম দিয়া অনুবাদ করিয়াছেন।

(১৪) মুসলমানী বাঙ্গলা-সাহিত্য—বিগত কয়েক বর্ষ হইতে আমাদের মুসলমান ভ্রাতারাও বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছেন। ইহা অত্যন্ত সুখের বিষয়। পূর্ব্বে তাঁহারা উর্দ্দু ও মুসলমানী ভাষায় গ্রন্থাদি রচনা করিতেন। এক্ষণে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গালা ভাষার দিকে অবহিত হইয়াছেন। আলোচ্য-বর্ষে সাহিত্যের সকল বিভাগেই তাঁহাদিগের ভূয়োচেষ্টায় সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ ও কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এবার মুসলমানী বাঙ্গালায়ও 'রেছালায় হাদিয়া' 'ফরজ শিক্ষা', 'কেয়াছোল মোজতাহেদিন বা কেয়াছের অকাট্য প্রমাণ' প্রভৃতি অনেকগুলি পুস্তক বাহির হইয়াছে। এগুলির মধ্যে কয়েক খানির ভাব সুন্দর হইলেও ভাষার জন্য অনেকেই রস গ্রহণ করিতে অসমর্থ। এখনকার এই সাম্যের দিনে মুসলমানী বাঙ্গালা প্রচলন করিয়া বৈষম্য সৃষ্টি করা কোন মতেই উচিত নয়। যাঁহারা প্রাদেশিক ভাষায় পুস্তক প্রচলন করিবার পক্ষপাতী, তাঁহারা মুসলমানী বাঙ্গালার নজির যেন ভুলিয়া না যান। বৈষম্যের সৃষ্টি করা, নূতন ভাষার প্রচলন করা কোন মতেই বিধেয় নয়। প্রত্যেক জেলায় যখন শব্দের উচ্চারণগত ও অন্যান্য ভাষাগত পার্থক্য আছে তখন যদি প্রত্যেক জেলাবাসী তাঁহার কথিত ভাষায় গ্রন্থরচনা করেন, তাহা হইলে তাহা অন্য জেলাবাসীদিগের নিকট দুর্ব্বোধ হইবে ; কারণ, সমগ্র বাঙ্গালাদেশের কথিত ভাষা শিক্ষা করিবার সময় ও সুযোগ সকল মানবের হইতে পারে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

এবার নিম্নলিখিত কয়খানি নূতন সাময়িক প্রকাশিত হইয়াছে :—

১। ছাত্ররঞ্জন—সরোজকুমার রায় সম্পাদিত।

২। কর্ম্ম—কৃষ্ণকিশোর দাস সম্পাদিত।

৩। উপচার—হরিলাল সাহা।

৪। বাণী—বীরেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত এম্. এ ও পরমেশ প্রসন্ন নাগ চৌধুরী।

৫। অনাথ বন্ধু—শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

৬। সুবর্ণবণিক সমাচার—নৃসিংহপদ দত্ত।

৭। কথা—রাজেন্দ্রচন্দ্র সেন বি এল্. ও কিশোরী মোহন জোয়ারদার এম্. এ সম্পাদিত।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সাগর মন্থন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৪।

অসুর মন্থনবেগে আকুলিল সৃষ্টি পারাবার
আক্ষেপে বিক্ষেপে ঘোর উঠে ভাসি' আবেগ তাহার!
নিখিলের খুলিছে বন্ধন!
অসুরেরা না করে গণন
দিগ্বিদিক নাহি গণি আপন গরবে করি ভ'র
অনিয়ত অবিরত মত্ত হেন মথিছে সাগর।

ঘন বিশ্লেষণে উঠে সৃষ্টিময় নিদারুণ গোল
সকলের অন্তরঙ্গে তুলি মহা যাতনার রোল;
পরমাণু ত্র্যসরেণু যত
পরস্পরে ছুঁড়ি অবিরত
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেন উড়িতেছে বিপুলে উজারে!
নিখিল ভুবন ভাণ্ড গরাসিল জমাট আঁধারে!

অন্ধকার সিন্ধু যেন ভরিল রে ভুবন অম্বর!
অন্ধকার দাঁড়াইল বিশ্বেরে গরাসি বিশ্বম্ভর!
শ্রুতি নেত্রে ঘ্রাণে রসনায়
অন্ধ অন্ধ অন্ধকার ভায়
আশাহারা ভাষাহারা দিশাহারা ঘন অন্ধকার
আরতি বিরতি হারা আত্মহারা মোহ পারাবার!

কি দেখিছে! আন্দোলিত অন্ধকার সাগরের বুকে
যুগল মুরতি যেন সুরাসুরে নেহারে চমকে!
জানা পুনঃ অজানা মুরতি
বিরূপ প্রকাশি' ক্রিয়াগতি!
নিরখিতে বাণী যেন লক্ষ্মী যেন যেমন সুন্দরী
দারুণ সোদরা দু'টি এল উঠি হাতে হাত ধরি'!

প্রেমপুরে কামোন্মাদ ভাবোন্মাদ করি' পরচার,
গেয়ান পদবী পুরে জড়তা বিবাদ অহঙ্কার!
গভীর ঘৃণার হাসি হাসি'
চোখে পুনঃ লেহা পরকাশি'
সৌন্দর্য্য আড়াল হতে বরষিয়া হলাহল ধার—
সাগরের মুখে যেন উগারিয়া বিষাক্ত আঁধার!

সুরাসুর স্তব্ধ হয়ে নেহারে সৃষ্টির রাহুকেতু
—অমৃতের বুকে গুপ্ত নিত্যকাল মরণের হেতু!
আপাত দয়ার গুপ্তপুরে
ভুবনের তৃষার্ত্ত অধরে
ধরিয়া বিষের ভাণ্ড সৃষ্টিরে নাশিতে কৃতমতি
অলক্ষ্মী উদিল এ যে উপজিল দুষ্ট সরস্বতী।

নেহারি দারুণ মূর্ত্তি সুরাসুর সভয়ে মূর্চ্ছিত
আপনি ধরিলা তারা মন্থনের রশি বিপরীত।
ফটাফট যেন বিশ্বরাশ
ছিঁড়িছে তুলিয়া অট্টহাস!
সূর্য্যচন্দ্র গ্রহতারা উলটিল রাশিচক্র ছাড়ি'
অন্তিম প্রলয় কাণ্ডে তুমুলে নড়িল বিশ্বনাড়ী।

'সংহর, সংহর প্রভো, রাখ' রাখ' এ বিশ্বসংসার'—
ভুবন হৃদয় হতে উপজিল মহা হাহাকার!
প্রতি অণু পরমাণু রন্ধ্রে
অবধি করিয়া সূর্য্যচন্দ্রে
নিদারুণ ছটফটি—উপজিল আকুল আহ্বান!
—'রক্ষ', রক্ষ', মহাদেব. এ সঙ্কটে কর পরিত্রাণ!'

তুরন্ত নিখিল ছাপি' তুরন্ত দারুণ গতিশীল
হুঙ্কারে বিষের সিন্ধু আগুণ লহরে ঘননীল,
তরঙ্গ রসনা লেলাইয়া
স্বর্গমর্ত্ত্য ফেলিল ছাইয়া

বারুদ বসন সম ভস্ম করি' দিক দিগন্তর!
ধরিল সে মহাবহ্নি গরাসিতে আপনি অম্বর!

ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া উঠে অন্তিমের হাহাকার রোল
দিক্ দেশ কালগণ উঠিল কাঁদিয়া উতরোল!
চরাচর ভুবন সকল
সুরাসুর যক্ষোরক্ষোদল
স্থিতি নীতি গুণগণে সংস্থিতি ছিঁড়িয়া আপনার
মহামৃত্যু মুখে সবে পশিছে তুলিয়া হাহাকার!

'কেহ আছ'? কে রক্ষিবে, এ সঙ্কটে কে করিবে, হায়
—অন্তিমে মালীকহারা ভুবন ভাতিল অসহায়।
হেনকালে সাগরের বুকে
শান্তি যেন ভাসিল পলকে
নিমিষে স্বপন সম সর্ব্বভয় করিয়া নিরাস
ধবল দেবতা মূর্ত্তি সিন্ধু বুকে হল পরকাশ!

অপূর্ব্ব ঈশ্বর মূর্ত্তি, সর্ব্বেশ্বর, যেন সর্ব্বহারা
নিখিল ঐশ্বর্য্যভূতি ধরি' পুনঃ ভিখারীর ধারা!
সৃষ্টির সমস্ত গুণরাশ
ধরিয়া অচল প্রতীকাশ!
একেতে অনন্ত পুনঃ অনন্তে দেখায়ে একাকার
উচ্ছ্বসিত 'জয়' রোল বেআপিল নিখিল সংসার।

'মাভৈঃ, মাভৈঃ' রবে মৃদু হাস্যে পরসারি' পাণি
সকল সৃষ্টির পানে বরষিয়া অভয়ের বাণী,
গরলের সাগর সংহরি'
গণ্ডূষে নিমিষে পান করি'
দাঁড়াইলা নীলকণ্ঠ—নিমিষে নিখিল বিষ পিল!
চরাচর আশ্বাসিলা উচ্চারিয়া 'শিব শিব শিব'।

করুণা কটাক্ষে যেন ছিঁড়ি' সর্ব্ব বিমোহের পাশ
দাঁড়াইলা মহাদেব হাতে ধরি মন্থনের রাশ!
গুপত অন্তর পথ ধরি
ভূতচক্র ভুবন উত্তরি'
পলকে অলোকে পশি' দাঁড়াইলা ধেয়ানে নিশ্চল,
—একপদে বিশ্বমুখে ফুটিল আনন্দ কোলাহল।

সুরাসুর সবে যেন নয়ন বিকাশি' নেহারিলা—
প্রকাশিছে বিশ্বজুড়ি' অপরূপ মন্থনের লীলা!
ভিতরে, বাহিরে পুনঃ তার
পরকটি' অপূর্ব্ব আচার!
স্ফুরিল নিখিল চিত্ত অজানিত বিদ্যুৎ পরশে
অজানা সূর্য্যের রসে হিয়াপদ্ম সবার বিকশে।

দেখিলা অদ্ভুত ধারা ক্ষিতিলোক মিশিছে সলিলে,
সলিল অনলে, পুনঃ অনল সে পশিছে অনিলে!
অনিল মিশায় মহাকাশে,
মহাকাশ বিন্দু বুকে পশে!
বিন্দুতে অনন্ত দেশে দাঁড়ায়ে নিখিল জীব-বিৎ
দেখিলা নিজেরে এক মহাসিন্ধু লহরী সম্বিৎ!

চিন্ময় সাগরে সেই, তথা হতে বাহির সাগরে
ঘন মন্থনের ছন্দে আন্দোলন ছুটেছে লহরে।
প্রতি অণু জীব যোনি তার
—জীবনের অনন্ত পাথার—
ওতপ্রোত ফোটে যেন সর্ব্বত্র জীবনযোনিময়
—আনন্দের মহাচ্ছন্দে ভবময় সৃষ্টিস্থিতি লয়!

আনন্দ সাগরে সেই, চিন্ময়ী সকল স্বরূপিণী
নিরখে দেবের চোখে অপরূপা কে ওই রঙ্গিনী!
দিক বাহু, কাল নেত্র তার
অখিল শক্তির একাধার!
পঞ্চমুখ ভবশিরে বিকশিত চিত্তপদ্ম বুকে
আঁধার দলনী মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিল দেবচোখে!

অনন্ত শকতি ছবি গীতি সম পরকাশে যেন!
অনন্ত গতির মূর্ত্তি স্থিতিসম অবভাসে হেন!
অনন্ত মুরতি এক রীত!
একেতে অনন্ত পরতীত!
পরমা শান্তির ছবি, অপরূপা সমর রমণী!
সৃষ্টিস্থিতি লয়করী ভুবনের অনাদ্যা ঘরণী।

বীণায় কমলে পুনঃ পাশাঙ্কুশ ধরি' ধনুঃশর
ভুবনে আপনাসি যেন পশারিয়া বরাভয় কর
পরকাশে যোগিনী মূরতি!
বিশ্বময়ী 'বিশ্ববাড়া' রতি!
লক্ষ্মী সরস্বতী ধরি' বামে ডানে একদেহ গতা
—জ্ঞানময়ী ভাবময়ী ইচ্ছাময়ী ভুবন-দেবতা!

ছায়ারূপে মায়ারূপে দ্যুতিরূপে সর্ব্বভূতময়
ধৃতিরূপে বৃতিরূপে বেআপি' বিশ্বের সমুদয়;
শ্রীহ্রীকীর্ত্তি-রতিরূপ ধরি'
ভুবনের আনন্দ সুন্দরী!
ভীষণ-ভীষণা, পুনঃ নিত্যকাল অন্তরে মোহিনী
—অন্তরে বাহিরে ওই বিকাশে বিশ্বের সনাতনী।

নেহারে দেবতাকুল—অজানা রহস্য এতদিন—
কর্ত্রীরূপে শিবঙ্করী দেবীর মহিমা অন্তহীন!
অনন্ত বিশ্বের প্রতিকণা
সর্ব্বাণীর আনন্দ ভাবনা!
অনন্ত বিভূতি বহে ব্রহ্ম হতে পরম বিন্দুর;
ভবের উদ্ভব লয় লহরী সে আনন্দ সিন্ধুর।

যক্ষরক্ষ নরানর লোকে লোকে গন্ধর্ব্বকিন্নর,
কতজীব কত জাতি দেহহীন পুনঃ দেহধর,
—অগ্নিদেহী বায়ুদেহী কারা
কারো যেন বারিময় কায়া,

আকাশ তরঙ্গ কেহ—নানাভঙ্গে লহরী সৃষ্টির
জনমে মরণে বহে দুঃখসুখে কল্লোলে গভীর!

নিরখে ব্রহ্মাণ্ডময় অনন্ত সৃজনরঙ্গ লীলা।
অনন্ত ভুবন ভূমি ভবানীর ভাবময়ী লীলা।
শূন্য হতে নীহারিকা বুকে
জমি' যেন মিলায় পলকে,
কোটি কোটি কোটি বর্ষ ইতিকথা করি পরচার।
পলক বৃত্তান্ত হেন বিশাল নয়নে দেবতার।

শূন্যহতে শক্তিরূপে—অগ্নিরূপে মহাকাশময়!
অগ্নিহতে জলে জমি গড়ি পুনঃ, ধরার নিলয়,
উদ্ভিদ জীবের ইতিহাস
পরবাহে করি পরকাশ,
পরিশেষে নর জাতি—অভাবের ভাবনা মাতাল,
ক্ষুদ্রবুকে অসীমের তৃষামত্ত তরঙ্গ উত্তাল!

অপরূপ নরজাতি জনমিয়া কীটকৃমিকুলে—
অবনী গরাসে যারা মানসের শকতি-কবলে!
নগ্নদেহ পশুর আচার;
গিরিদরী গুহায় আগার;
কদর্য্য জীবন জীবী পূতিজীবী নিরগ্নি বামন,
মানুষ করিছে ধীরে ধরাপরে রাজত্ব স্থাপন।

লুকায়িত অগ্নিদেব আকাশের মাতরিশ্বা হতে
নামিলা নবীন পুনঃ মানুষের ভবনে মরতে!
রাত্রিভীত মনুর সন্তানে
অভয় আশিষ দয়া দানে
প্রথম আহবে সেই—উদ্ভিদ পশুর সনে রণে—
সমাপিলা পৃথিবীর আদি সেই খাণ্ডব দাহনে।

শ্বাপদ জীবন হতে এল ধীরে কৃষক চরিতে।
রাজত্ব শিখিলা নর আদিম সে গোত্রপতি হতে।

দিশাহারা জীবন মরুতে
গৃহস্থ হইল কিবা পথে।
বসিয়া গৃহের ভিতে নিশ্চিন্ত হইল ভাবী পানে।
প্রীতি নীতি স্বস্তিপানে বিকাশিলা সমাজ জীবনে।

সমাজরহস্য লভি—শক্তি নব লভি ততঃপর
ধরণীরে বসুন্ধরা সর্ব্বস্ব ভাবিলা কিসে নর।
জমীরে জানিয়া সর্ব্বসার
যুঝিলা খুঁজিয়া অধিকার,
হাজার হাজার বর্ষ নররক্তে করি সিক্ত ভূমি
ভোজ্য সাম্রাজ্যের লোভে আদিম সে পশুর ধরনী!

এই রূপে কত জাতি সৌন্দর্য্য সুখের আবিষ্কারে,
ভোগের নবতি নব ইষ্টতথ্যরতি পরচারে,
জাতিরে জানিয়া সর্ব্বসার
ব্যক্তিরে পেষিয়া অনিবার
—প্রাচীন জীবন তন্ত্র—ধরণী জুড়িয়া স্রোতোধারে
আপন নিয়তি-নাট্য পরকাশে কাতারে কাতারে।

কত জাতি এই মতে জীবন প্রবাহ বক্ষ ভরি'
—সৌন্দর্য্য সন্ধানী কেহ, অন্ধ কেহ আলোক পূজারী—
ধরণীরে আশায় ভরিয়া
অপরূপে, পলকে ফুটিয়া,
অকালে টুটিয়া কেহ, জীর্ণ হয়ে যায় কেহ গলে!
সৃষ্টি জোড়া জনতার মহাঘূর্ণি মহার্ণব জলে!

অবশেষে পরকাশে দেবনেত্রে স্ফুট পরিচয়
ইয়োরোপ আমেরিকা নরলীলা ঐশ্বর্য্যনিলয়!
জীবনের বৈজয়ন্তী ধরি,
উঠিছে অবনী গ্রাস করি'—
লক্ষ্মীর বাণীর পুনঃ শকতির মহাসম্বর্ষণী
সভ্যতার মহালোকে ক্ষিতিলোক হৃদয় মোহিনী।

পড়িল পৃথিবী জুড়ি মহানন্দ কোলাহল সাড়া
মহামানবের চিত্ত জাগিল ধরিয়া নব ধারা
ধরা জুড়ি' নবীন উচ্ছ্বাস
জীবন আনন্দ পরকাশ;
পরাধীন জাতিতন্ত্র স্থিতিমন্ত্র দলিয়া চরণে
চলিছে অমৃত সুনু নরআত্মা আপনাশরণে

বিশ্বনাশী অগ্নিবাণে সভ্যতার পরমা শকতি—
চির দৈত্যভীতি হতে ধরণীরে দিয়ে অব্যাহতি
বিনাসূতে বিদ্যুতে বশিয়া,
দূরেরে নিকটে বিকশিয়া,
বিতরিয়া ঘরে ঘরে পাবনী অক্ষর নদী ধার
একদা কোটির পাতে পরিবেশি' সুধা অমরার,

সাহিত্যে বিজ্ঞানে ধর্ম্মে—সব কর্ম্মে জীবনের রসে
মানুষ ছুটিলা যেন বিশ্বতালে, পূর্ণ আত্মবশে।
পারে বাধা নাহি বিঘ্ন ভয়
নর নারী জাগে ধরাময়
মাটীতে রাখিয়া পদ আকাশে তুলিতে উচ্চশির!
হাতে ধরি ভাই ভাই ঊর্দ্ধপায়ে বাহিতে সুস্থির!

কি হইছে কি হইবে, নরভাগ্যে কিবা লিপি লেখা
অনন্ত অমৃত পদ সশরীরে যায় ও কি দেখা?
ভূতলে আকাশে অনিবার
বিস্তারে নরের অধিকার!
ক্ষিতি বারি অগ্নি বায়ু দাসী হয়ে সেবিছে তাহার
নরের অসাধ্য আশা অসম্ভব কি রহিল আর?

কি দেখিছে সুর-নেত্রে? দেবী তুই সকলি পরাসি'
চেয়ে নাই ধরা পানে, অধরে কারুণ্যমাখা হাসি।
কি যেন রয়েছে গুপ্তভুল
দারুণ খাইছে যার মূল!

অতুল আলোক বুকে গুপ্ত কোথা যেন অন্ধকার ;
জয়ের হুঙ্কার মাঝে লুকায়িত মহা-হাহাকার !

বিজ্ঞান-বিলাস আড়ে গলে ঘেরে স্বার্থঅন্ধ ফাঁসি
অমৃত পিয়াসা তলে শোণিত তিরিষা আত্মনাশী !
জগতের খোশা চিবাইয়া
প্রত্যক্ষের বিলাসে রসিয়া,
মানুষ চলেছে মরি' বাঁধা পড়ি আপনারি পাশে,
রমণী চলেছে সাজি নর-অরি পৌরুষ বিলাসে !

ধরাকীট চলিয়াছে ডিঙ্গাইতে মরণ-নিয়তি
মৃত্যুর স্বখাদ খুঁড়ি পদে পদে জীবনের পথি !
নিরদয়া ভীষণ দুর্ব্বার
চরম রচিছে যেন তার !
নিমিষে সমস্ত বুঝি হয়ে তাঁরি কটাক্ষে আহত
বিশূন্যে বিলীন হয়ে যাবে গলি' জলবিম্ব মত !

দেবের নয়নে নারে বিবরিয়া নিরখিতে তাঁরে
অসীম রহস্য ভাণ্ড নিরূপিতে বাক্যমন হারে !
উপস্থিত এতকালে কিরে
চূড়ান্তে সাধনানদী তীরে ?
সর্ব্বতৃষা জিজ্ঞাসার হোথা বুঝি আছে সমাধান ?
সকল শেষের শেষ ! আজি কার লভিল সন্ধান ?

সকল প্রকাশ মাঝে গুপ্ত তার মূরতি যেমন ?
—সর্ব্বলয়করী দেবী প্রকাশে মূরছি ত্রিভুবন !
মহিমায় মজি দেবকুল
পুনরপি হইল আকুল,
আস্ফালি ধরিতে যবে গেলা তারে বাড়াইয়া হাত,
অঘোরে গলিল সব ছায়াবাজী সম অকস্মাৎ !

ছাড়ায়ে অমৃত মূর্ত্তি—দেবনেত্র নেহারে বিস্ময়ে—
মিলাইছে সে মূরতি এক-মগ্ন শিবের হৃদয়ে !

সকল সত্যের শেষ সাড়া
সকল গতির শেষ ধারা
অগতির মাঝে সে কি ? সকল সৌন্দর্য্য শিবাধার
সর্ব্বের অন্তর পথে রহে সে কি পথে স্তব্ধতার ?

কি দেখিল, কি লভিল অসম্ভব অপরূপ ধারা !
বহুরে ঘাঁটিতে শেষে এল এই একের ইসাড়া ?
অনন্ত ধ্বনির পারাবার
রহে কিসে বুকে স্তব্ধতার ?
অনন্ত চঞ্চলা পুন বহুমুখী বিচিত্রার আড়ে
কি ওই উদ্ধারা গতি একেরে দেখাল আঁখি ঠারে !

গাহিলা অমর কবি, 'অস্বপন অয়ি দেবগণ,
না লভিয়া লভিয়াছ নিখিল রহস্য নিকেতন !
ধর এই মন্থনের পথে
নিত্যকাল একের সুরতে
ঊর্দ্ধ-ঊর্দ্ধলোকে ডুবি' চল নিত্য পথে স্তব্ধতার ;
এই পথ এই প্রাপ্তি আপনাতে সমাপ্তি যাহার।

'ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবগণ এক কণ্ঠে করে কার স্তুতি !
শক্তিগণে দাসী হয়ে করে এক আনন্দ আরতি !
শৈব শাক্ত সকল বৈষ্ণব
গুরু মুখে করে কার স্তব
পরম সে মহাআত্মা আত্মসিন্ধু লহরী যথায়
নিত্যকাল এক পথে ছুটিয়াছে এক পিপাসায় !

৫।

প্রকট বুঝিল, তবু বুঝিল না হিয়া দেবতার
মুষ্টিতে ধরিল তবু না লভিল পরশ তাহার।
অন্তহীন মন্থনের ব্রতে,
একের সে ইসাড়ার পথে,
ধরিতে নাহিক ধরি, অমৃত বিলাস মত্ত মনে,
দেবগণে পুনর্ব্বার আছে রত সাগর মন্থনে।

কি দেখিছে, কি লভিছে কভু তাহা মুঠে নাহি আসে
নাহি ধরে ধারণায় মনের মহলে নাহি ভাসে ;
মধুর সাগরে আত্মহারা
চিরজীবী মধুব্রত ধারা
মজিয়া রসিছে তারা ; রসের অন্তরে নিমগন
করিছে অমর কুল স্তব্ধপুরে সাগর মন্থন।

নেহারিছে, নিত্যকাল স্তব্ধপুরী মন্থন যেন সে
সংসারের হিয়াদেশে জড়তার বক্ষোদেশে পশে !
আপাত সে নিশ্চলতা হতে
সৃষ্টিরে বেআপে গতি স্রোতে !
দেবতার চিত্ততালে অন্তর আনন্দ-আন্দোলিত
নিখিল ভুবন লোক একরসে, নিয়ত মন্থিত !

দেবতার যজ্ঞ সেই লোকে লোকে সৃষ্টির মাঝারে
দেবতার অনুগতি ক্রিয়ারতি নিয়ত আচারে।
দেবতার মননের যাগ
লোকে লোকে বাটে যজ্ঞভাগ ;
দেবতার স্তুতি সেই বিশ্ব জুড়ি' শত লক্ষ ধারে,
পশে জাগ্রতের বুকে সত্য-বেদ প্রতিভা আকারে।

প্রতিমা আকারে আসি' স্থিরে ভাসে ভারতীর পুরে ;
এ লোকে জনমে কবি ঋষিকণ্ঠে সুধাময় সুরে ;
ধরাকীট জীবের পরাণে
অজানা উপমা অনুমানে
অনুভূতি ভক্তিরূপে, তৃপ্তিরূপে মনোদেশে পশে
একসূত্রে হাতে হাতে সৃষ্টি ছুটে একের উদ্দেশে।

ভাবের দেবতা তারা বসে যারা দেশে অলোকের
মনোলোকে মূর্ত্তিমতে পরকাশে যারা ভুবনের।
সৃষ্টির জীবনপতি তারা ;
গুপ্ত লোকে যাদের পহড়া ;

মাটীর মূরতি গড়ি মমতায় যাহাদেরে নর
অতর্কিতে এক-রসে দেশে দেশে পূজে নিরন্তর।

অসীমেরে বাঁধে ভুলে মৃত্তিকার সীমাবিশেষণে—
ওই পাপপথে লভে নিত্যযাহে আপন মরণে।
দুঃখ সুখ ক্ষুদ্রতার রীতে
পাপ পুণ্য মনের মাটীতে
রচিয়া ভূমার সীমা, গড়ে নর আপনারি কারা !
মুক্তি লভে তার হতে ক্বচিৎ সে ভাগ্যবান্ যারা।

ভাগ্যবান্ নর সেই-নিস্তব্ধ মনের নিকেতনে
সর্ব্বেরে ধরিতে পারে আপনারি জীবন বিজনে।
স্থিরে মতি স্থির রতি সুখে
মজে নিতি স্তব্ধতার বুকে ;
অনু-পথে উত্তরিয়া যায় ছুটি'-বিশ্বের ও'পারে ;
ডিঙ্গাইয়া দেশ্রেকালে যায় ডুবি অদেশ পাথারে।

আত্মপথ ধরি যারা যায় গলি অশোক অলোকে—
নিমিষে ছাড়ায়ে ছুটে জগতের জড়তা নির্ম্মোকে !
ডিঙ্গাইয়া পুরী অন্ধকার
পলকে আলোক সিন্ধু পার !
মূর্ত্তি আর স্ফূর্ত্তি আর, জড় পুন, ভাব বিশেষণ
জীর্ণ বাস সম করে-যে বা সে সৌভাগ্যবান্ জন।

সংসারে জীবন তার সুখ দুঃখ কৌতুকের খেলা
নটরাজ পুত্র সেই, বিশ্ব তার নটরঙ্গ মেলা।
জনতায় বিজনের রসে
হিয়া তার নিয়ত নিবসে।
অনন্ত স্রোতের তলে গুপ্তবহা একের রাগিনী ;
সহস্র সুপ্তের মাঝে জাগ্রত সে একের কাহিনী।

এক সেই, একপথে লোকে লোকে একের উচ্ছ্বাস
—ভূর্ভুব স্বর্লোক হতে সত্যলোকে একের পিয়াস।

এক আত্মা, লোকে লোকে নিতি
বিশ্ব জোড়া একের আরতি!
সুরনর এক-তৃষ্ণ; লোকে লোকে অসীম-পিয়াসা;
প্রতিচিতে সর্ব্বমাঝে অপ্রাপ্ত সে অজানার আশা।

এরূপে অনন্তরসে বিলসিয়া সুরাসুর গণ
করিছে নিয়তকাল সৃজনের সাগর মন্থন।
সে মন্থন-রতি বিশ্ববাসে
সুরাসুর শিষ্যেরে পরশে!
সে মন্থন সনে বহে নিয়ত ভবের চক্র-রতি—
কোথা স্থূল কোথা সূক্ষ্ম পাপ পুণ্য সুখ দুঃখ গতি!

আত্মপথে দেশকাল সীমারে লঙ্ঘিয়া দেবগণ
অন্তঃপুরে নিত্যকাল করিতেছে জীবন মন্থন!
নিখিল অজ্ঞাতে নিত্যদিন
দেবতার শিষ্যতা অধীন।
চূড়ান্তের স্বাধীনতা স্বরাজে তাহার গুপ্তরতি—
স্বাধীন গোঁয়ামী সাথে স্বধরমে মিলাইতি মতি!

পাগল ভোলার আখি হেরে নিত্য চাহিয়া ভুবন
—সকল লঙ্ঘনে শুধু সৃষ্টিরবে মরণ বন্ধন!
সকল অনীতি ভুল পাশে
অতর্কিতে ঘোরে এক-আশে!
সকল ভাঁটার মাঝে অপ্রাপ্ত সে চরমের টান
অতর্কিতে ভবগতি ধীরে ধীরে টানিছে উজান।

নিরখিছে দিব্য চোখে নরগতি—সভ্যতার বাণী
ব্যক্তির বিকাশ রসে সত্যমতি ধরার স্বামিনী।
জগতের খোসাটারে বড়
—জড়তারে ভাবি সর্ব্ব দড়
আপন অস্থোষ্টি বাস রচিছে আপনি সঙ্গোপনে!
এক সে ভুলের বশে ডাকিতেছে আপন মরণে!

দেখিছে, তরণী করি দুস্তর অতীত অতিপাত
মগ্ন শৈলে ঠেকি পুন দারুণ হইছে ধূলিসাৎ!

জড়তার ঝড় সন্নিপাতে
না জানি বারিতে কোন মতে,
—মাঝী যারা, নাহি বুঝে নির্ভুলে ধরিবে কোথা হাল,
মহা মানবের তরী চলিয়াছে যথায় পাতাল!

বিশ্বের হৃদয় নিত্য শিবনেত্রে ছবি সমতুল
—জাতির "নিয়তবিধি" ইতিহাস পাতে পাতে ভুল!
জগতে জাগ্রত জন যারা
সময়-সুমতি ধরি' তারা
স্বতন্ত্র-কাণ্ডারী হয়ে আত্মতরী বাহিছে উজানে!
সর্ব্বকামে চলিয়াছে আপনারি পরমের পানে।

ঢেউ হতে ঢেউ নিত্য উঠি' জাতি খেয়াল সীমায়,
ঢলিয়া মিলায় পুন সনাতনী ভাবিনীর গায়!
হেথা হোথা পক্ষধর কারা
চকিতে দলের ছাড়ি' ধারা
আপনার পক্ষভরে উড্ডীন পশিছে মহাকাশে
—উত্থান পতন রসে বৈশ্বানরী নিয়ত নিশ্বাসে!

পাগল ভোলার চেলা সর্ব্বপথে একরঙ্গে ভাসে!
নিজেরে বাঁধিছে পাশে সর্ব্বকাল বিপাশার আশে।
শিবপ্রিয় শিবশিষ্য যারা
প্রেয় হতে শ্রেয় করে বাড়া;
প্রত্যক্ষ মথিয়া শুধু লভিতেছে পরমের ধারা,
সকলের অগ্রশিরে লভে তারা একের ইসাড়া

সর্ব্বত্র সকল পথে নিত্য চাহে সেই নিত্য স্থান
নিত্যকাল শিব যেথা শিবমন্ত্রে করে নিত্য ধ্যান।
অসঙ্গ জীবন তলে সত্য
অন্তঃপুরে খুঁজে এক তথ্য;
সংস্কার মথিয়া তোলে অতলের শান্ত শতদল
মৃত্যুরে মথিয়া তারা প্রাপ্তি তোলে জীবনমঙ্গল।

(সমাপ্ত)

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

——

গায়ক পাখী।

(ছাতারিয়া বা সাতভাই)

তিন চারি জোড়া পাখীই প্রায় সর্ব্বদা একত্রে বিচরণ করে, এজন্য ইহাদিগকে সাতভাই কহে। ঢাকা ও ময়মনসিংহ জিলার কোনও কোনও স্থানে ইহার নাম পাবৈ বা পাপৈ।

পাবৈ বা সাতভাই বড় চঞ্চল পাখী। ইহারা এক স্থানে দুদণ্ড সুস্থির থাকিতে পারে না। লাফালাফি করা, চেঁচামিচি করাই ইহাদের কার্য্য। ছেলেদের মত ড্যাং ডিং খেলিয়াই ইহারা সময় কাটায়। ইহাদের গড়ন বেশ মোটা মোটা, নাদুস্ নোদুস্। ছাতারে শালিকের মতই বড় পাখী কিন্তু লম্বে আরও একটু খাটো এবং একটু বেশী মোটা। সারা গায়ে অতি মলিন গেরি মাটির রং বা শুক্‌না পাতার রং। ঠোঁটের রংও অতি পরিষ্কার গেরি মাটীর রং। গলা খাটো, যেন দেহের উপরই মাথাটী বসান। গলার অস্তিত্বই যেন অনুভূত হয় না। ইহাদের ঠোঁট অপেক্ষাকৃত মোটা এবং নরম।

ছাতারিয়া অনুচ্চ ঝোপের ভিতর খড় কূটা ঘাস দিয়া বাসা নির্ম্মাণ করে। কখন কখন গাছের ফাটালেও বাসা করিয়া লয়। মাটীর গর্ত্তে নিরাপদ স্থান পাইলে বা মাটীর উপর ভাঙ্গা হাঁড়ি, কলসী পাইলে সেখানেও ছাতারে বাসা নির্ম্মাণ করে। সেখানে তাহারা পল্লী করিয়া লয়। মানবজাতি যেমন দলবদ্ধ হইয়া বাস করে, ছাতারেও সেইরূপ স্বজাতিকে প্রতিবেশীরূপে লইয়া বাসা তৈয়ার করে। পাখীর মধ্যে পাড়াপ্রতিবেশীর ঝোঁক ছাতারে, বাবুই, নাকুটী প্রভৃতিরই দেখা যায়।

ছাতারে এক সময় দুই হইতে চারিটী ডিম পাড়ে। ডিমগুলি শালিকের ডিমের মত বড়। একদিক একটু সরু। রং মেটে সাদা তাহাতে দুই একটা ছিট। পাখী প্রায় দুই সপ্তাহ তা দিয়া ডিম ফুটায়। শৈশবে ছানাগুলির পালক পরিষ্কার হলুদে রঙ্গের থাকে। একটু একটু করিয়া ছানা বড় হয়, পালকের রংও পরিবর্ত্তিত হয়। চৈত্র মাসের শেষ ভাগেই ইহারা ডিম পাড়ে এবং বৈশাখ মাসে ছান্না হয়। ছানাগুলিকে লইয়া ছাতারে-দম্পতী জঙ্গলে জঙ্গলে উড়িয়া বেড়ায়।

ছাতারে মানুষের ভয় তত বেশী করেনা। এই বোকামীর ফলে মধ্যে মধ্যে ছাতারের প্রাণদণ্ডও হইয়া থাকে। আমার বিড়াল ত বছরে দুই একটী ছাতারের মাংস ভোজন না করিয়া ছাড়েনা। ঘরের পেছনে—যেখানে ভাতের ফেণ, ভাত ইত্যাদি ফেলান হয়, ছাতারে সেইখানে আসিয়া লাফালাফি ও আনন্দ করিয়া খাইতে লাগিয়া যায়। চতুর বিড়ালী তখন সুবিধা মতে এক আধটীকে গ্রেপ্তার করিয়া লয়।

ছাতারের সহানুভূতি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। গত পূর্ব্ব বৈশাখ মাসে আমাদের অঞ্চলে বড় বেশী শিলাবৃষ্টি হইয়াছিল। শিলগুলি ক্ষুদ্র হইলেও উঠানে প্রায় আধ হাত পুরু হইয়া জমিয়াছিল। সুতরাং বনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখীর পাড়ায় যে মড়ক লাগিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? বহু পাখীই মরিয়াছিল। আমার প্রতিবেশী ছাতারে গুলির মধ্যে অনেকেরই ইহলীলা শেষ হয়। একটা ছাতারের পায়ের উপর শিল পড়িয়া—একখানি পা জখম হইয়া যায়। বেচারী ঘরের কানাচে প্রাণ বাঁচায়। পরদিন দেখি—সে ভয়ে ভয়ে বাসার দিকে যাইতেছে। হাটিতে পারেনা—এক পা ও পাখার সাহায্যে চলিয়াছে। আর তাহার জুরীদার স্বামী—কি স্ত্রী—তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে। আমি তাহাকে বাসায় পৌঁছাইয়া দিলাম। জুরীদার প্রায় সারাদিন কাছে বসিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঠোঁট দিয়া আঁচড়াইয়া দিত। কখন কখন আহার অন্বেষণে যাইত—আবার পালকের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে খাওয়াইত। আমি আহারান্তে এক মুষ্টি অন্ন তাহার বাসার অল্প দূরে রাখিয়া দিতাম। তাহাতে তাহার সুবিধা হইত। প্রায় মাস খানিক পরে দেখিলাম—উভয়ে উড়িয়া চলিয়াছে। আহত বেচারী বড় কৃশ হইয়াছিল। ঘরের পেছনে আসিয়া লাফালাফি করিত বটে,—কিন্তু তেমন উদ্যম তাহার আর দেখি না। সে এখনও মধ্যে মধ্যে আসে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

প্রাচীন গন্ধার। *

প্রাচীন গন্ধারের আলোচনা ক্ষেত্রে আমরা উহার তিনটী যুগের আলোচনা করিব। হিন্দু যুগ, ম্যাজদা যুগ, এবং ইসলাম যুগ।

গন্ধার শব্দটীর সহিত কান্দাহার শব্দের বিশেষ জ্ঞাতিত্ব রহিয়াছে, এমন কি, মনে হয় যে দুইটী শব্দ একই শব্দের রূপান্তর মাত্র। প্রাচীন কালে গন্ধার নামে একটী রাজ্য ছিল, সেই নামের অনুকরণেই বর্ত্তমান কান্দাহার নগরের নামাকরণ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এই গন্ধার রাজ্য ভারতের পশ্চিমোত্তর প্রান্তে অবস্থিত ছিল। গন্ধার রাজ্য অতি প্রাচীন। ধৃতরাষ্ট্র-পত্নী গান্ধারীর পিত্রালয় এই গন্ধার রাজ্যে ছিল। গান্ধারী গন্ধার-রাজের কন্যা ছিলেন। মহাভারতীয় যুগে সুদূর গন্ধার-রাজের কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে হস্তিনাপুরের অধীশ্বর কুণ্ঠিত হয়েন নাই। গন্ধার শব্দটী গান্ধার গ্রাম নামক স্বরের নামেও লক্ষিত হয়। গন্ধার ও গন্ধর্ব্ব এই দুইটী শব্দের সৌসাদৃশ্য আলোচনা করিলে ইহাও মনে হয় যে, প্রাচীন কালে গন্ধার দেশ গান ধর্ম্মের জন্যে প্রসিদ্ধ ছিল এবং সুগায়কগণ এমনই সুমিষ্ট কণ্ঠে গান করিতেন যে, তাঁহারা দেবাংশী গন্ধর্ব্ব বলিয়া প্রতীত হইতেন। মধ্যযুগে গন্ধার দেশ স্থপতিবিদ্যার জন্যেও বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। ঋগ্‌বেদ বর্ণিত যুগে গন্ধার দেশ পশমি কাপড়ের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এই গন্ধার দেশই, বর্ত্তমান যুগে পেশাবর ও রাওবালপিণ্ডী ও তৎ-সংলগ্ন পঞ্জাবের পশ্চিমোত্তর দেশ নামে পরিচিত। (Smith p. 23). বর্ত্তমান কান্দাহার সহরটী খৃঃপূঃ অনুমান ৩২৮ অব্দে আলেকজেণ্ডর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত হয়।

বৈদিক যুগে গন্ধার ক্ষত্রিয়গণ প্রথমতঃ সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া কুভা বা কাবুল নদীর তীরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। পরে তাঁহারা পারস্য জাতির অংশীভূত হয়েন। বৈয়াকরণ পাণিনি মুনির জন্মভূমি এই গন্ধার দেশে ছিল। আটক নগরের পশ্চিমোত্তর কোণে অবস্থিত শলাতুর গ্রামে পাণিনি জন্মগ্রহণ করেন, এই জন্যে পাণিনি 'শলাতুরীয়' নামে পরিচিত (পা ৪।৩।৯৪)। সার্ কানিংহাম্ সাহেবের মতে বর্ত্তমান লাহোর সহর প্রাচীন শলাতুর গ্রামের উপরে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু, চীন পর্য্যটক হিউএন্থ্‌ সংএর ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি শলাতুর ভ্রমণে গিয়াছিলেন। তিনি সপ্তম খৃষ্টাব্দের লোক। এই সপ্তম খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্তও শলাতুর গ্রাম পাণিনি মুনির জন্মভূমি বলিয়া তীর্থস্থান মধ্যে পরিগণিত ছিল। তিনি সেই শলাতুর তীর্থ পর্য্যটনে গিয়াছিলেন। তখনও শলাতুর গ্রামে পাণিনি মুনির স্মৃতিরক্ষক একখানি প্রতিমূর্ত্তি তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন। রাজতরঙ্গিনী ও কথাসরিৎসাগরে বর্ণিত পাণিনির উপাখ্যানের ঐতিহাসিক প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইলে পাণিনিকে মগধরাজ্যবাসী বলিতে হয়। তিনি মুক্ত কণ্ঠে বলিয়াছেন যে, 'কোলোটুজো' ই কৌণিনির জন্মভূমি। ইহা সিন্ধুতট হইতে প্রায় ৬ মাইল দূরে পশ্চিমোত্তর কোণে অবস্থিত সুতরাং শলাতুরীয় পাণিনি মুনিও গন্ধারদেশবাসী ছিলেন। এবং ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক প্রমাণের উপরে নির্ভর করিলেও স্বীকার করিতে হয় যে, গন্ধার দেশই পাণিনির জন্মভূমি।

গন্ধার দেশের প্রাচীন রাজধানী পুষ্কলাবতী ছিল। খৃঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে, আলেকজেণ্ডার যখন পারস্য রাজ্য বিধ্বস্ত করেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে গন্ধার রাজ্যটীও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই পুষ্কলাবতী নগরীকে অযোধ্যাপতি ভরতপুত্র পুষ্কর বা পুষ্কল প্রতিষ্ঠিত করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে (Beal Vol. I. p. 109). এই পুষ্কলাবতী নগরীতেই পুনরায় কনিষ্ক (120—150 A. D). পুত্র-হবিষ্কের রাজধানী প্রতিষ্ঠাপিত হয়।*

*ঢাকা সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

* পাণিনি ব্যাকরণে অঙ্গ কলিঙ্গ মগধ প্রভৃতি

পাণিনীয় ব্যাকরণের কচ্ছাদিগণে গন্ধার শব্দটীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় (পা, ৪।২।১১৩, ৪।১।১৬৭)। যখন খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩২৬ অব্দে আলেক্‌জেন্দার গন্ধার দেশ জয় করিয়াছিলেন, তখন কাবুল নদীর উত্তরে অশ্বক-দেশ এবং দক্ষিণে গন্ধার দেশ অবস্থিত ছিল। দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দে কনিষ্কের রাজত্ব সময়ে পুরুষপুর (Beal P. 97n) (পেশোয়ার) গন্ধার রাজ্যের রাজধানী ছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পারসীক রবির প্রচণ্ড প্রতাপের সময়ে গন্ধার দেশ পারস্য রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। খৃঃ পূঃ ৪৮০ অব্দে পারসীরাজ জারক্‌সেজ যখন গ্রীক্‌দেশ আক্রমণে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন এক দল গন্ধারক্ষত্রিয় পারসীকরাজের সাহায্যার্থ প্রেরিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বে আমরা পুষ্কলাবতী ও পুরুষপুরের কথা বলিয়াছি। তন্মধ্যে, প্রথমে পুষ্কলাবতী ও পরে পুরুষপুর (পেশোয়ার) গন্ধার রাজ্যের রাজধানী ছিল, ইহাও বলিয়াছি। এই দুইটী সহর ভিন্ন পশ্চিমোত্তর অঞ্চলে আর একটী সমৃদ্ধিশালিনী নগরী ছিল—উহার নাম তক্ষশিলা। সিন্ধুনদ ও ঝিলামের মধ্যে অবস্থিত এই তক্ষশিলাতে পৌঁছিয়া গ্রীক্‌যোদ্ধ্‌গণ ব্রাহ্মণ যোগীর সন্দর্শনে অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছিল। তদানীন্তন গন্ধার ও পার্শ্ববর্ত্তী হিন্দুরাজন্যবর্গ অত্যন্ত বীর্য্যশালী ছিলেন। ঝিলাম ও চেনাবের মধ্যে অবস্থিত পৌরব রাজের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া আলেকজেন্দার পৌরবকে পরাজিত করেন, কিন্তু তাঁহার পৌরুষে সন্তুষ্ট হইয়া পৌরবের রাজ্য পৌরবকে প্রত্যর্পণ করেন। পরে আলেকজেন্দার সাট্‌লেজ্‌ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন এবং গঙ্গাভিমুখে যাত্রা করিতে আকাঙ্ক্ষা করিলেন। কিন্তু প্রাচ্য, Prasioi বা Easterns দের (Mc. Crindle's Magasthenes P. 68) বীরত্ব কাহিনী শ্রবণে ভীত হইয়া তাঁহার গ্রীক্‌ সেনাগণ পশ্চাৎপদ হইলেন এবং দিগ্‌বিজয়ী গ্রীক্‌রাজ ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। [Macdonell's History of Sans. Lit P. 410].

খ্রীঃ পূঃ ২৭২ অব্দে, তক্ষশীলা অশোকের শাসনাধীনে ছিল। অতুল সমৃদ্ধিশালিতায় এই নগরী অনির্ব্বচনীয় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। তক্ষশিলার যশঃসৌরভ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইত। ব্রাহ্মণতনয়, রাজকুমার ও বণিক্‌পুত্রেরা নানা দিগ্‌দেশ হইতে বিদ্যার্থী হইয়া তক্ষশিলাতে আগমন পূর্ব্বক তথায় বিদ্যা উপার্জ্জন করিতেন [Smith P. 135]। এই নগরীর চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী জনপদ সমূহ সমৃদ্ধিশালী লোকালয়ে পরিপূর্ণ ছিল। ঐতিহাসিকগণের তক্ষশিলা বর্ণনা পাঠ করিলে মনে হয় যেন এক সময়ে এই তক্ষশীলা বর্ত্তমান কাশীধামের ন্যায় সংস্কৃত শাস্ত্র শিক্ষার স্থান ছিল—মনে হয় যে খৃঃপূঃ অন্ততঃ পক্ষে পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দীতে পর্য্যন্ত তক্ষশিলানগরী ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার পীঠস্থান বলিয়া যে পরিগণিত ছিল, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। (Rhys Davids p. 203). *

পূর্ব্বদেশের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা দেখিয়া বেবার প্রমুখ মনীষিগণ মনে করেন যে, পাণিনি প্রাচ্য দেশীয় না হইলেও হইতে পারেন, কিন্তু সম্ভবতঃ তিনি একবার প্রাচ্য দেশে পর্য্যটন করিয়াছিলেন। কিন্তু পাণিনির ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক জ্ঞানের আলোচনা করিয়া যদি আমরা স্বীকার করি যে, তিনি প্রাচ্য দেশবাসী ছিলেন, তাহা হইলে, বলিতে হয় যে, রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনা কালে কালিদাস যে সমুদয় জনপদ ও রাজন্যবর্গের উল্লেখ করিয়াছেন সেই সমুদয়কে তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। এইরূপ প্রমাণ ভ্রমসঙ্কুল বটে।

* গন্ধার, পুরুষপুর ও তক্ষশিলা হিন্দুকোষ পর্ব্বতের উত্তরস্থিত কপিশা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এই জনপদগুলি ভারতবর্ষের মধ্যে ছিল না, এবং ন্যূনাধিকক্রমে বর্ব্বর জাতির বাসস্থান ছিল। Elphinstones' History of India P. 283.

আমরা গন্ধারকে ভারতের পশ্চিমোত্তরস্থিত রাজ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। কিন্তু, তাঁহা বলিয়া, ইহা মনে করিতে হইবে না যে, গন্ধার দেশ ভারতের পশ্চিমোত্তর সীমানা ছিল, সেই দুর্ভেদ্য সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া ভারতবাসিগণ যদৃচ্ছাক্রমে আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান ও পারস্য দেশে গমনাগমন করিতে ও বসবাস করিতে পারিত না। ঐতিহাসিক প্লীনীর মত অত্যন্ত প্রামাণিক। তিনি বলিয়াছেন যে, প্রাচীন Geodrosia, Arachosia, Aria ও Paropamisus গন্ধারের পশ্চিমে অবস্থিত ছিল, এবং ইহারা সকলেই ভারতবর্ষের অন্তর্গত ছিল। যদি তাহাই সত্য হয়, তবে পারস্য দেশের প্রায় দশআনি বরাদ্দে ভারতবর্ষের অধীনে ছিল (Cowell's Elphinstones pp 250, 251)। কাহারো কাহারো মতে বর্ত্তমান ভারত সীমানার বহির্ভাগে পশ্চিমোত্তর অঞ্চলে প্রাচীনকালে যবন ও অন্যান্য বর্ব্বর জাতির বসতি ছিল। (Ibid p 252) এই অনুকল্পেও সিদ্ধান্ত এই দাঁড়ায় যে, উক্ত যবন ও অপরাপর বর্ব্বর জাতিরা হিন্দু সন্তানই ছিল, কিন্তু তাহারা নিষ্ঠার সহিত হিন্দুধর্ম্ম প্রতিপালন করিত না (Dr. R. L. Mitra)। আবার কাহারো কাহারো মত এই যে, সময়ে সময়ে হিন্দু সন্তানগণ সিন্ধু নদ অতিক্রম করিয়া তৎপশ্চিম ভূভাগে নানাস্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছিল (Cowell)। তথায় অদ্যাপি ঐ সকল হিন্দু সন্তানগণ সংস্কৃতের অপভ্রংশ-বহুল ভাষা বলিয়া থাকে। ঐ সকল লোকের মধ্যে অনেকেই জাট্‌। উহাদের ভাষা ভারতের ভাষা। উহাদের মধ্যে অনেকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে বটে, কিন্তু উহাদিগকে মুসলমানগণও হিন্দু বলিয়াই জানে। উপর্য্যুক্ত স্থান সমূহে এক সময়ে যে হিন্দুধর্ম্মের প্রচলন ছিল, তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপে হিঙ্গলাজ তীর্থ অদ্যাপি দেদীপ্যমান। হিঙ্গলাজ সিন্ধুনদের মোহানা হইতে ৮০ মাইল দূরে (N. Bose's বিশ্বকোষ); এবং আরব সমুদ্র হইতে ১২ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। এই হিন্দু তীর্থস্থানটী অতিপ্রসিদ্ধ। তত্রত্য গিরিশৃঙ্গ সমারূঢ় কালীমূর্ত্তি 'নানী' নামে পরিচিত। উপর্য্যুক্ত স্থান সমূহের দক্ষিণ প্রান্তেই যে হিন্দুর ধর্ম্মমন্দির অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে কেবল তাহা নহে। উত্তরাঞ্চলেও কাস্পিয়ান হ্রদের পশ্চিম উপকূলে বাকু প্রদেশে একটী কালী মন্দির ছিল, অনুমান ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে কোনও কারণে উক্তমন্দিরের পূজারি ঠাকুর তথা হইতে পলাইয়া আসিয়াছিল।

পূর্ব্বে আমরা দেখাইয়াছি যে,ঐতিহাসিক প্লীনীর মতে প্রাচীন কালে, Geodrosia, Arachosia, Asia ও Paropanisus ভারতের অন্তঃপাতী ছিল।* এক্ষণে, আমরা দেখাইব যে, পাণিনি ব্যাকরণে এমন বহু স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়, যাহারা আফগানিস্থান অঞ্চলে অবস্থিত। পাণিনির সময়ে আফগানিস্থানের নাম সুবাস্তু ছিল।

আফগানিস্থানের উত্তরাংশ কোনও কোনও গ্রীক্‌ এবং রোমক ভৌগোলিকের নিকটে Kapisene নামে পরিচিত ছিল। (R. G. Bhandarkar, S. Indian Antiquary). Hwan Thsang ইহাকে Kia-pi-she নামে অভিহিত করিয়াছেন। কাপিশায়নী শব্দের অর্থ কাপিশী দেশীয় আঙ্গুর ফল প্রসূত মদ্য। এই শব্দটী পাণিনি (P. 4 2. 99) সাধন করিয়াছেন। কাবুলের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান গুলি অদ্যাপি আঙ্গুর ফলের জন্য প্রসিদ্ধ। পাণিনির টীকাকারগণ Arachosia শব্দটী ঋক্ষোদ পর্ব্বতের নাম হইতে উদ্ভূত বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। যে ব্রাহ্মণতনয়গণ তথায় বাস করিত তাহাদিগকে আর্ক্ষোদ বলিত। এই

* Arrian বলেন যে, পরোপনিষদ ক্ষেত্রে উপনীত হইয়াই আলেকজান্দর পার্ব্বত্য ভারতীয় জাতিকে দেখিতে পাইলেন। Cowell বলেন যে, উহারা হিন্দুদের সজাতি ছিল। উহারা নানা সময়ে সিন্ধু নদ পার হইয়া উক্ত স্থান অধিকার করিয়াছিল। তাহারা সংখ্যায় অতি অল্প, তাহাও এদিক ওদিক ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

শব্দ নির্ম্মাণে পাণিনীর ৪।৩।৯১ সূত্র (আয়ুধজীবিভ্যশ্ছঃ) প্রয়োজ্য নহে। Hwang Thsang এর Falanu এবং Cunningham এর Banu শব্দটীকে পাণিনি-ধৃত বর্ণ্ দেশ বলিয়া মনে হয়। (4. 2. 103, & 4. 3. 93). সুবাস্তু নামে কাবুল নদীর একটী শাখা আছে। উহার বর্ত্তমান নাম Swat. এই সুবাস্তু শব্দটী সুবাস্বাদি (4. 2. 77) গণের আদ্য শব্দ।

Aovnos নামে একটী গিরিদুর্গের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। Cunningham এর মতে ইহা Raja-Vario শব্দজাত। সম্ভবতঃ এই শব্দটী পাণিনীয় (4. 2. 82) বরণা শব্দ। বরণা শব্দটী দেশের ও তদ্দেশ-বাসী ক্ষত্রিয়দের নাম। অদ্যাপি সিন্ধুনদের দক্ষিণ তটে আটক নগরের বিপরীত দিকে Baranas বা Varanas নামে একটী স্থান আছে। প্রাচীন ভৌগোলিকগণ Ortospan নামে একটী স্থান নির্দ্দেশ করেন। তাঁহাদের মতে ইহাই বর্ত্তমান কাবুল। Dr. Bhandarkar এর মতে পাণিনির (5. 3. 117) পর্শ্ব শব্দ দ্বারা এই স্থানটীই লক্ষিত হইতেছে। পাণিনি ও পতঞ্জলি উভয়েই পঞ্জাবকে বাহীক (P. 4. 2. 117 & 5. 3. 114) নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই সমুদয় শব্দের আলোচনা করিলে নিশ্চয় প্রতীতি হয় যে, আফগানিস্থান সম্বন্ধে পাণিনির বিলক্ষণ জ্ঞান ছিল। তিনি পাশ্চাত্য শব্দটীও সাধিয়াছেন তাহাতে ইহাও মনে হয় যে আফগানিস্থানের পশ্চিমস্থিত অন্ততঃ সুবিশাল মালভূমিকে তিনি এই নাম দিয়াছেন। উহাই বর্ত্তমান পারস্য দেশ।

আফগানিস্থানের পূর্ব্বোক্ত কয়েকটী লক্ষণ হইতে ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে, গন্ধার রাজ্যই ভারতের পশ্চিমোত্তর সীমন্তরাজ্য ছিল না, কিন্তু তাহার পশ্চিমেও আফগানিস্থানে হিন্দু সন্তানের বসবাস ছিল। প্রাচীন ভারতের অভ্যুদয়ের সময় আফগানিস্থানের লগ্ন পশ্চিম দিগ্‌বর্ত্তী পারস্য দেশের অবস্থা সম্বন্ধে আমরা একটু আলোচনা করিব।

পূর্ব্বপ্রান্ত সিন্ধুনদ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম সীমানা টাইগ্রীস্ নদ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ যে উচ্চাবচ সুবিশাল ক্ষেত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে পুরাকালে উহাকে ইরাণ অধিত্যকা বলিত। আফগানিস্থানের অবস্থার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বেলুচিস্থানও তদ্দ্বারা গতার্থ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। আফগানিস্থান ও বেলু-চিস্থান ব্যতীত, উক্ত অধিত্যকার অধিকাংশই পারস্য দেশ নামে অভিহিত হইত। পারস্যগণ আপনাদিগকে ইরাণী বলিত, এবং স্বদেশকে ইরাণ বলিত। এই ইরাণ-কেই আবেস্তা শাস্ত্রে আইরিয় বা আর্য্যনিবাস বলা হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়েও ইরাণ শব্দদ্বারা পারস্যদেশ এবং ইরাণী শব্দদ্বারা আফগানিস্থান ও বেলুচি অধিত্যকা বুঝাইয়া থাকে। পার্সি শব্দটা হইতে পারস্য শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। পার্সি শব্দে প্রাচীনকালে পর্শদেশকে বুঝাইত। ইহার বর্ত্তমান রূপ ফার্স্। এই পর্শ-দেশেই আকিম্নিদ রাজন্যবর্গের জন্ম হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে ফার্স্ শব্দের অর্থ পারস্য (পারসিয়)। পার্শি শব্দটা পারস্য ভাষাজাত এবং ফার্স্ শব্দটা আরব্য ভাষোৎপন্ন।

খৃষ্ট পূর্ব্ব অনুমান সপ্তম শতাব্দীতে (Syke's Persia P. 101) খোরাশানের উত্তর অধিত্যকায় মিডিয়া রাজ্যে জরথ্উষ্ট্র বা জোরোষ্টার নামক এক যুবক নির্জ্জন যোগ সাধনে মগ্ন হইয়াছিলেন। তিনি নানা প্রকারে চিত্ত সংযম সাধন করেন এবং ক্রমে সাতটী স্বপ্ন সন্দর্শন করেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি আপন ধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। কিন্তু বহুকাল পর্য্যন্ত স্বধর্ম্ম প্রচারে সফলতা লাভ করিতে পারিলেন না। অতঃপর, পারস্য দেশের পূর্ব্বাংশে সেই ধর্ম্ম প্রচার করিতে তাঁহার উপরে দৈববাণী হইল। খোরাশানে * অবস্থিতিকালে তাঁহার সহিত বিস্তাশ্প

* রাইরাজ্যে দামবাওয়ান্দ জেলার একটী দুর্গ ছিল,

(Gustap of Ferdusi) নামক রাজার সাক্ষাৎকার হয়। ঐতিহাসিকদের মতে সম্ভবতঃ এই বিস্তস্প রাজাই ডেরিয়স্ রাজার পিতা হিষ্টস্পেস্। রাজা বিস্তস্প্ ও তদীয় অমাত্যবর্গ জোরোস্তারের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন (MaxMuller P xLxii)। খৃঃ পূর্ব্ব ৬৬০ অব্দে জোরোস্তারের আবির্ভাব হয় এবং খৃঃ পূঃ ৫৮৩ অব্দে তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন। (কাহারো ২ মতে কয়েক পুরুষ পূর্ব্বে জোরোস্তারের জন্ম হয়)। তদীয় শিষ্য বিস্তস্প্ রাজার সাহায্যে তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত স্বধর্ম্ম প্রচারে নিরত ছিলেন।

জোরোস্তারের নিকট তদীয় ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহ স্বয়ং অর্ম্যাজ্দ্ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া জোরোস্তা ধর্ম্মের অন্যতর নাম ম্যাজ্দা ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত।

মিডিয়া রাজ্যে ম্যাগি নামক এক জাতির বাস ছিল। তাহারা বংশানুক্রমে উপর্য্যুক্ত ইরাণ দেশে পৌরহিত্য করিত। এজন্য ষ্ট্রাবো ইহাদিগকে পুরোহিত জাতি নামে অভিহিত করিয়াছেন।

খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে, জোরোস্তারের সম সময়ে পারস্য দেশে য়্যাকিমিনিজ্ নামক এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। সেই সময় পর্য্যন্ত পারস্য দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির বাস ছিল। য়্যাকিমিনিজ্ তন্মধ্যে পসরগদই (Pasargadae) জাতির দলপতিরূপে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলিকে সমসূত্রে গ্রথিত করিয়া একটী মহা জাতির প্রতিষ্ঠা করিলেন। তদীয় বংশধর কাইরস (Cyrus) খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে মিডিয়া রাজ্য অধিকার করেন, কিন্তু, মিডিয়া রাজ্যে প্রচলিত জোরোস্তার ধর্ম্ম কর্ত্তৃক তাঁহার হৃদয় অধিকৃত হয়। তিনি পারস্য দেশে উক্ত জোরোস্তার ধর্ম্ম আনয়ন ও প্রচার করেন। তদবধি পারস্যদেশে ম্যাজ্দা ধর্ম্ম প্রচলিত হইতে লাগিল।

ম্যাজ্দা ধর্ম্ম শাস্ত্রকে আবেস্তা বলে। আবেস্তা শাস্ত্র ম্যাগিদের ভাষায় লিখিত, পারস্য ভাষায় নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ম্যাগি-পুরোহিত এবং পারস্য-যজমানের মধ্যে ব্যবসায় গত পার্থক্য ত ছিলই, ভাষা ও জাতিগত পার্থক্যও ছিল। সুতরাং য়্যাকিমিনিজ্ রাজত্বের প্রারম্ভে উক্ত ধর্ম্ম পারসীক জনসাধারণ গ্রহণ করিতে পারে নাই, ইহা বিচিত্র নহে। তখন পুরোহিতগণের ধর্ম্ম ম্যাজ্দা এবং ইতর লোকের ধর্ম্ম আর একটা ছিল।

খৃঃ পূর্ব্ব ৫১২ অব্দে পারসীক রাজ ডেরিয়সের বিজয়ী সৈন্যসঙ্ঘ ইরাণীয় অধিত্যকার পূর্ব্ব শিখরে দণ্ডায়মান হইয়া পঞ্জাব ও সিন্ধু দেশের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। রাজা ডেরিয়স্ স্কাইলাক্স্ (Skylax) নামক স্বকীয় গ্রীক্ সেনাপতিকে তথায় প্রেরণ করিলেন।

সেনাপতি নানা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া নৌকা যোগে ভারত মহাসাগরের দিকে যাত্রা করিলেন। পরে খৃঃ পূঃ ৪৮০ অব্দে যখন তদীয় পুত্র জারক্সেজ্ গ্রীস্ বিজয়ের নিমিত্ত মহা সমারোহে যুদ্ধযাত্রা করেন, তখন গন্ধার দেশীয় ও অন্যান্য ভারতীয় সৈন্য মিলিত হইয়া একদল সেনা সংগঠিত হইয়াছিল।

ম্যাজ্দা ধর্ম্মের সহিত বৈদিক আর্য্য ধর্ম্মের আনুকূল্য সন্দর্শনে মনে হয়, ঐ দুইটী ধর্ম্ম যেন একটী বৃন্তে দুইটী ফুল। অথবা বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম যেমন সনাতন হিন্দু ধর্ম্মেরই দুইটী শাখা মাত্র, ম্যাজ্দা ধর্ম্ম সেইরূপ বৈদিক ধর্ম্মের একটী শাখাও হইতে পারে। কিন্তু, অকুণ্ঠ হৃদয়ে ইহা বলা যাইতে পারে যে, গন্ধারের (সুতরাং ভারতের), আফগানিস্থানের এবং পারস্য

ঐতিহাসিকগণের মতে উহা খৃঃ পূর্ব্ব ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

*পারসীক রাজ ডেরিয়স আবেস্তা শাস্ত্রগুলিকে সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমান আবেস্তা তাঁহারই প্রণীত। Behinstun Inscription.

দেশের প্রাচীন ইতিহাসে এমন এক সমসাময়িক যুগ পরিলক্ষিত হয়, যখন উক্ত দেশত্রয়ে এক সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রচলন থাকুক বা নাই থাকুক, একরূপ ধর্ম্ম যে প্রচলিত ছিল, সে বিষয়ে মনে কোনও সন্দেহেরই উদয় হয় না।

খৃষ্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত—প্রায় সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া পারস্য বা ইরাণ দেশে আবেস্তা ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। বিস্তস্প ও তৎপুত্র কর্ত্তৃক উপর্য্যুক্ত ইরাণ দেশের স্থানে, স্থানে অগ্নিমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—অগ্নির উপাসনা তথায় জাতীয় ধর্ম্মরূপে পরিগৃহীত হইয়াছিল। তথায় অগ্নির উপাসকগণের হৃদয়ে অগ্নির উপাসনা এমন বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবের যুগে প্রবল বৌদ্ধধর্ম্মও তথায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে প্রায়শঃই পারে নাই। ম্যাজদা ধর্ম্মের সহিত সংগ্রামে উক্ত বিশাল ক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারই প্রতিহত হইয়াছে।

মহাপুরুষ মহম্মদ ৫৭০ খৃষ্টাব্দে আরব দেশে জন্মগ্রহণ করেন। ৬৩২ খৃষ্টাব্দের তাঁহার মানবলীলা সাঙ্গ হয়। ৬৪২ খৃষ্টাব্দে নিহাবন্দের যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক ম্যাজদা ধর্ম্মাবলম্বী পারসীকরাজ পরাভূত হয়েন। পরবর্ত্তী শতাব্দীর মধ্যে বিজিত পারসীকগণ ক্রমে ক্রমে বিজয়ী মুসলমান গণের ধর্ম্ম আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। বর্ত্তমান সময়ে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অনন্ত শাখা প্রশাখা সম্ভূত বাহ্য আচার ও পদ্ধতির খোসা বিসর্জন করিতে পারিলে অনেক ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু সন্তান যেমন রক্ষা পান বলিয়া মনে হয়, তদ্রূপ অনেক ধর্ম্মপ্রাণ পারসীক সন্তানও কঞ্চুকবৎ প্রাণ ম্যাজদাধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক একেশ্বর বাদী মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া যেন মৃতদেহে পুনর্জীবন লাভ করিলেন। অনেক পারসীক সন্তান অন্যান্য কারণে ম্যাজদা ধর্ম্ম বর্জন ও মুসলমান ধর্ম্ম আলিঙ্গন করিলেন। আর, যাঁহারা পৈতৃক সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক হইলেন তাঁহারা দেশান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে প্রয়াসী হইলেন। এবং উদারচেতাঃ ভারতবাসী দিগের আনুকূল্যে ভারতের পশ্চিম উপকূলে এবং গুজরাট্ দেশে বসতি স্থাপন করিয়া অদ্যাপি উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছেন। ইহারাই ভারতীয় পার্শি সম্প্রদায়। ইরাণীয় আর্য্যধর্ম্ম মাতৃক্রোড়ে আশ্রয়লাভ করিল—সাগরের জল সাগরেই মিশিল।

সিন্ধুনদ হইতে পশ্চিমে টাইগ্রীস্ নদী পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ইরাণ দেশে সহস্র বর্ষ ব্যাপিয়া আবেস্তা ধর্ম্মের বা একরূপ সনাতন আর্য্য ধর্ম্মের প্রচলন ছিল, ইহা আমরা আলোচনা করিয়াছি। ভারতবর্ষের সহিত একধর্ম্মা ইরাণকে মিলাইলে উক্ত ধর্ম্মসূত্রে মিলিত রাষ্ট্রকে বৃহত্তর ভারত বলা যাইতে পারে। ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাণাদিতে আমরা ধারাবাহিক ক্রমে একটী দেবাসুর বিরোধের বিবরণ দেখিতে পাই। দেবতারা আর্য্য ছিলেন এবং অসুরগণ Assyria বাসী Semitic জাতি ছিলেন এবং তাদের রাজ্যের সীমানা Euphrates ও Tigris ছিল। দেবাসুরগণের এইরূপ ব্যাখ্যা অযৌক্তিক নহে। কারণ, আচার রীতি নীতি ও ভাষা হিসাবে উভয়ের মধ্যে মজ্জাগত বা জাতিগত পার্থক্য রহিয়াছে। হিউএন্থ্সঙ্ বলেন যে অনুমান ৬৩০ খৃষ্টাব্দে হিন্দুগণ পারস্য দেশীয় প্রধান প্রধান নগরে বসতি স্থাপন করিয়া স্বকীয় ধর্ম্মও সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ৬৪২ খৃষ্টাব্দে নিহাবন্দের যুদ্ধক্ষেত্রে ম্যাজদা ধর্ম্মাবলম্বী পারসীক রাজ মুসলমানগণ কর্ত্তৃক পরাস্ত হয়েন এবং তদবধি পারস্যদেশে মুসলমান ধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ হয়। সুতরাং আমরা যদি এইরূপ অনুমান করি যে, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্বে, পারস্য দেশে হিন্দুগণ বহুশতাব্দী-ক্রমে যাতায়াত ও বসবাস করিতেন, তাহা হইলে সত্যের অপলাপ করা হইল বলিয়া বিশ্বাস হয় না।

যাহা হউক, মুসলমানকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া প্রাচীন পারস্য বা পার্শিরাজ্য বিনষ্ট হইল। ক্রমে মুসলমানগণ

হিন্দুরাজ্য আক্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আক্রমণ ও আনুষঙ্গিক অত্যাচারে ক্রমে ক্রমে হিন্দুদের হৃদয়ে ম্লেচ্ছ বিদ্বেষভাব উদ্রিক্ত হইতে লাগিল।

কিন্তু, জিগীষু মুসলমানগণ অতি প্রথমে কাবুল সীমান্ত বা সিন্ধুনদ অতিক্রম করেন নাই। তৎপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে গাজ্‌নী নগরীতে সামানী বংশধরগণের উপরে আধিপত্য বিস্তার করিতে হইয়াছিল। ৯৭৭ খৃষ্টাব্দে সবক্তজিন কাফের বিজয় করাকে ধর্ম্মযুদ্ধরূপে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাহাই তাঁহার জীবনব্রত হইল। তাঁহার ভাবী বংশধরগণের জয় সৌকর্য্যার্থ ভারতগামী অনেক পথ নির্ম্মাণ করিয়া ভারতের পশ্চিম প্রান্ত বেষ্টনীর দৃঢ়তা শিথিল করিয়া রাখিলেন। তদীয় পুত্র মহম্মদ (খৃ১০০১—১১৮৬) ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধির কথা শ্রবণে বিমুগ্ধ ও প্রলুব্ধ হইয়া ভারত আক্রমণে প্রবৃত্ত হয়েন। মহম্মদ গন্ধার দেশের সমৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার যুদ্ধযাত্রাগুলির ফলে, ভারতের পশ্চিমোত্তর প্রান্তবাসী হিন্দুগণ বাতাক্ষিপ্ত ধূলিরাশির ন্যায় অসার হইয়া পড়িয়াছিল। তদবধি তত্রত্য হিন্দুগণের সমৃদ্ধিশালিতা লোকের নিকটে উপকথার মধ্যে পরিগণিত হইতে লাগিল (Alberuni)। তদবধি হিন্দু হৃদয়ে মুসলমানগণের প্রতি বিদ্বেষানল জ্বলিতে লাগিল। ভারতের যে সমুদয় স্থান তখন মুসলমানগণের দুর্গম বলিয়া প্রতীত হইত, এমন সুদূর কাশ্মীর, কাশী প্রভৃতি অঞ্চলে যাইয়া আর্য্যসন্তানগণ শান্তির শীতল ছায়া অন্বেষণ করিলেন। ১০১৩ খৃষ্টাব্দে যখন মহম্মদ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন,তখন সিন্ধুতীরবর্ত্তী গন্ধার দেশ ব্রাহ্মণরাজগণের অধিকারে ছিল (Lane Poole)। তিনি গন্ধারদেশ ধ্বংস করাকে ধর্ম্মকর্ম্ম মনে করিলেন। তিনি সত্তর বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তিনি বহু দেবদেবীর মন্দির ও বিগ্রহ ভঙ্গ করিয়া যশস্বীও হয়েন এবং 'প্রতিমা-ভেদী' উপাধি লাভ করেন। লুণ্ঠিত ধনরাশি দ্বারা তিনি স্বকীয় গাজনী নগরীতে একটী নবরত্ন সভা বা বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি স্বকীয় গাজ্‌নী নগরীর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে ত্রুটি করেন নাই। আল্‌বেরুণী ও ফার্‌দৌসি কবি তাঁহারই সৌরাজ্যের অমৃতময় ফল।

খৃষ্টীয় অনুমান দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে কাবুল তুর্কীগণ কর্তৃক অধিকৃত ছিল। (C. B. Duff p. 83). বর্হতিজিন নামক তুর্কীরাজের বংশধরগণ ৬০পুরুষ পর্য্যন্ত কাবুলে রাজত্ব করিয়াছিলেন। (Elphinstone p. 252). তাহাদের শেষ রাজা কতোরমান ছিলেন। কতোরমানের কলর নামক একজন ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ছিলেন। কতোরমান সুরাজা ছিলেন না। প্রজাদিগের নানা প্রকার অভাব অভিযোগ মন্ত্রী কলরের কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। কতোরমান বন্দী হইলেন। মন্ত্রী কলর দুর্লালসা প্রেরিত হইয়া সিংহাসন স্বহস্তগত করিলেন এবং অর্থ সাহায্যে সমুদয় কণ্টক অপসারিত করিয়া স্বয়ং রাজা হইলেন। তৎপরেও সমন্দ, কমলুয়া, ভীম, জয়পাল, আনন্দপাল, নর্দজন পাল ও ভীমপাল কাবুলের সিংহাসন অধিরোহণ করেন। (Sir H. Elliot Vol. II. p. 403). ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইঁহারা বিশালরাজ্যের অধীশ্বর হইয়াও সদ্‌গুণালঙ্কৃত ছিলেন। তাঁহারা যেমন কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন, তেমন স্বজনবৎসলও ছিলেন। ঘোরতর শত্রুতার সময়েও, যে সৌজন্যপূর্ণ পত্রখানি আনন্দপাল কর্ত্তৃক আমির মামুদের নিকটে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার ব্রাহ্মণোচিত ঔদার্য্যেরই পরিচায়ক বটে। এই রাজবংশীয়গণ প্রায় ১০০ বৎসর কাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

উপসংহারে দু'একটী কথা বলা আবশ্যক। হিন্দুযুগে গন্ধার ও তৎসম্পৃক্ত পুরুষপুর (পেশাবর), পুষ্কলাবতী ও তক্ষশিলার সমৃদ্ধির বিষয় আমরা আলোচনা করিয়াছি। তদ্দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইতে পারে যে, হিন্দুযুগে প্রাচীন গন্ধারের ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহের নানা প্রকারে যেরূপ

সমৃদ্ধি ছিল—যেরূপঃজ্ঞান গরিমা ছিল—তাহাতে খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে গন্ধারদেশে জগতের অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ পাণিনির মত মনীষীর যে আবির্ভাব হইবে তাহা বিচিত্র নহে। প্রাচ্য শব্দে ঐতিহাসিকগণ মগধকে বুঝিয়া থাকেন, কিন্তু পাণিনির জন্মভূমির তুলনায় চন্দ্রবংশীয় ভরতগণও (Bhattoji p. 4. 2. 117) প্রাচ্য বটেন। তিনি উত্তর দেশীয় ও পূর্ব্বদেশীয় পণ্ডিতদের মত স্থানে স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। উত্তর দেশীয় পণ্ডিত বলিতে পূর্ব্বোক্ত ম্যাগি পণ্ডিতদিগকে বুঝাইয়াছেন কি? নতুবা উত্তর দেশীয় পণ্ডিত অন্বেষ্টব্য বটে। আর একটী কথা, পাণিনি গন্ধার বাসী হইয়াও পূর্ব্বোক্ত ডেরিয়স প্রমুখ পারসীক বিজেতৃগণের নাম উল্লেখ করেন নাই, তাহাতে বোধ হয় পাণিনি ডেরিয়স্ অপেক্ষা প্রাচীনতর। বৌদ্ধযুগীয় নলন্দ বিশ্ব-বিদ্যালয়, ও খোটানের চিহ্ন সমুচ্চয় ভূগর্ভে লীন হইয়াছে। ভূগর্ভ খনন দ্বারা সে সমুদয় চিহ্নের আবিষ্কার করা হইয়াছে। এমতাবস্থায় তৎপূর্ব্ববর্ত্তী তক্ষশিলার ও গন্ধারের গৌরব কাহিনী যে আরও অতল ভূগর্ভে থাকিয়া ভূমিসাৎ হইয়া থাকিবে তাহা নিতান্ত সম্ভবপর। তদুপরি আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া গন্ধার দেশ ভারতে বৈদেশিক আক্রমণের প্রথম সংগ্রামস্থল। এস্থানে তুমুল সংগ্রাম বহুবার হইয়া গিয়াছে। এমতাবস্থায়, প্রাচীন গন্ধারের হিন্দু কীর্ত্তির পরিচয় যাহা কিছু আমরা পাইতে পারি, তাহাই বহুমূল্য বটে।

শ্রীদেবেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন।

গ্রন্থ সমালোচনা।

(১) আলোকণা—শ্রীযুক্ত অক্রূরচন্দ্র ধর প্রণীত। মূল্য ছয় আনা। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ক্ষুদ্র কবিতার সমষ্টি! গ্রন্থকার নবীন, তাঁহার কাব্যচেষ্টা সার্থক হউক, ইহাই আমাদের কামনা। নূতন লেখকের ত্রুটী থাকা অমার্জ্জনীয় নহে, কিন্তু মাঝে মাঝে যে সুন্দর ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাই প্রশংসার যোগ্য।

(২) আত্মবোধ ও (৩) রাক্ষসরহস্য—শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মৈত্র প্রণীত। দুইখানিই দার্শনিক গ্রন্থ। প্রথম খানিতে গ্রন্থকার প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, 'পরিদৃশ্যমান জগতের বাস্তবিকতা নাই'। এক মত হইতে পারি, আর নাই পারি, এই প্রকার দার্শনিক আলোচনা আমাদের নিকট অত্যন্ত প্রীতিকর। গ্রন্থকারের লিখনভঙ্গি নূতন এবং চিত্তাকর্ষক।

'রাক্ষস-রহস্যে' গ্রন্থকার রাক্ষসকে রূপক হিসাবে ধরিয়া রামায়ণ ইত্যাদির তত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার মৌলিকতা প্রশংসনীয়। এবং সকলের চেয়ে প্রশংসার বিষয় এই যে, তাঁহার মতে দীক্ষিত করিতে না পারিলেও গ্রন্থকার আমাদিগকে পুরাতন কথা নূতন করিয়া ভাবিতে বাধ্য করিয়াছেন।

বনের পাখী।*

বনের পাখী লেখাপড়াও করে না, দশজন ভদ্রলোকের 'মহালে' ঘুরিয়া রীতিনীতিও দুরস্ত করিয়া লয় না, কিন্তু তথাপি তাহার মধুর সঙ্গীতে জগৎ মুগ্ধ হয়। দূর দূরান্তর হইতে একএকটী বিহঙ্গ শাবক বহু অর্থে ক্রীত হইয়া রাজরাজেশ্বরের প্রাসাদে স্থান লাভ করিয়া থাকে। এ আদর বিহঙ্গ জাতির প্রতি নহে। ইহা তাহার মধুর কণ্ঠস্বরের প্রাপ্য পুরস্কার।

মানবজাতির মধ্যেও এইরূপ পুরস্কার পাওবার যোগ্যতা অনেকের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে। অতীতের পৃষ্ঠা উল্টাইলে দেখা যায়, মহর্ষি বাল্মীকি হইতে কত মধুর কবিতার রচয়িতা জগদ্বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন। কত রাজা মহারাজা তাহাদিগকে সিংহাসনের পার্শ্বে আদরে ঠাঁই দিয়া স্বয়ং চিরপ্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। স্বভাব কবি যাঁহারা, যাঁহাদের কাব্যের মধ্যে হৃদয় আকর্ষণ করিবার মত ক্ষমতা আছে—তাঁহারা সর্ব্বত্রই আদরণীয় হইয়া গিয়াছেন। কেহ বা বর্ত্তমানে জ্বলিয়া পুড়িয়া হৃদয়ের ভাবসম্পদ্ ছড়াইয়া গিয়াছেন, কেহ তাঁহাকে চিনিয়া লইতে পারে নাই, কিন্তু সুদূর ভবিষ্যতে তাঁহার নিক্ষিপ্ত সেই অমূল্য রত্নরাজি বন বনান্তর হইতে কুড়াইয়া লইয়া কোনও কৃতী জহরী অপূর্ব্ব মাল্যরচনা করিয়াছেন। ঘরে ঘরে না হউক—গ্রামে গ্রামে না হউক—দেশের মধ্যে এমন দুই চারটী মহামূল্য জীবন প্রায় প্রতি যুগেই আবির্ভূত হইয়া সাহিত্যের পুণ্য ক্ষেত্রের সজীবতা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ কয়েকটী বনের পাখীর——কয়েকটী অজ্ঞাতপূর্ব্ব কবির পরিচয় আমরা নিম্নে প্রদান করিতেছি।

অনুসন্ধান করিতে করিতে আমরা সম্প্রতি তিন খানি প্রাচীন পুঁথির সন্ধান পাইয়াছি, যাহার বয়স নির্ণয় করা আমাদের শক্তিতে কুলায় নাই। একখানি ঈশাখাঁর সমসাময়িক বলিয়া রচনা ভঙ্গীতে মনে হয়, আর দুইখানি শ্রীগৌরাঙ্গের পরবর্ত্তী কোনও কালে রচিত। প্রথমোক্ত খানি একজন মহিলার লিখিত। মহিলাটীর নাম করুণাময়ী, পুঁথির নাম "রামবনবাস"। কবিতাগুলি একান্তই করুণরসাত্মক। কবিতার ভণিতায় অনেক স্থানেই আছে—

"অভাগী করুণা ভাসে নয়নের জলে।"

আমরা সময়ান্তরে এই কবির কবিতার আলোচনা করিব। আজ মাত্র একটী কবিতার উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত রহিব।

আমাদের প্রাপ্ত অন্য দুইখানি গ্রন্থের একখানি শ্রীজগন্নাথ দাস রচিত নিমাইসন্ন্যাস, অন্যখানির নাম নাই। আজ ইহাদের কথাও বলিব না।

করুণাময়ীর গান।

(রামায়ণ)

করুণাময়ী কে, কোথায় বাড়ী, কতদিনের লোক, জানিবার কোন উপায় আছে কি না, কিছুই বলিতে পারা যায় না। আমি দুই তিনটী মাত্র লোকের নিকট করুণার গান শুনিয়াছি। যাঁহারা করুণার গান বলিয়াছেন তাঁহাদের কাহারওই বয়স পঞ্চাশের কম নহে। ইদানীং করুণার সঙ্গীত দেশে অচল হইয়া পড়িয়াছে। যেমন করিয়া এদেশের অনেক অতীত সম্পদই বিস্মৃতির গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে, সেই একই রাস্তায় করুণাময়ীও হারাইয়া গিয়াছেন। সুতরাং সে জন্য আপশোস করা বৃথা।

একটী গান।—

কত না দুঃখেতে রাম রে, ও রাম ধইরা ছিলাম পেটে—
রাম রে—কেমুন কৈরা যাওরে বনে
রাম রে মায়ের বান্ধন কাইটে, রাম রে।

* বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ঢাকায় একাদশ অধিবেশনে সাহিত্য শাখায় পঠিত।

কত না দেবদেবী রাম রে, ও রাম—পুজলাম দিনে দিনে
রাম রে—এতদিনে পাইলাম তার ফল—
বাপ রে কড়ায় কড়ায় গইণে রাম রে—
কত না উপাস রাম রে, আমি কর্‌ছি মাসে মাসে,
বাপ রে—কোন্ উপাসের পাপ হইল,
ও তুই চললি বনের বাসে—রাম রে।
কত না গাছেরে আমি, আমি পুজলাম মানস কইরা,
বাপ রে, তবে কেন আইজ আমারে গেলা তুমি ছাইড়া,
রাম রে—
কত না সন্ধ্যায় আমি, রাম রে, ভাসাইলাম বাতি,
রাম রে, আজ কেনে মোর মনে লয় রাম
গলায় দিতাম কাতি, রাম রে।
কত না যতনে আমি—রাম রে পথে চাইয়া চলি,
বাপ রে—পিপড়ার ঠাঁইয়েও তোমার লাগি
কতই কথা বলি—রাম রে।
গাছের ফুল তুলি না, রাম রে তলার ফুলই আনি,
বাপ রে তোমার লাগি দেবতার পায়ে
কত পূজাই মানি—রাম রে।
বিছানায় শোয়াইয়া, রাম রে ও রাম, আমি থাকি বইসা,
রাম রে—এক ধেয়ানে চাইয়া দেখি
যেমন চান্দ পইড়াছে খইসা। রাম রে,
অত যে আদরের তুমি রাম রে, ও রাম চল্‌লা বনবাসে
রাম রে আমি ত দৌড়িয়া যাইবাম
তোমার পাছে পাছে, বাপ রে,
রাজপাটে থাক তুমি, রাম রে, ও রাম—থাকবা তরুতলে
(ভাইবা) অভাগী করুণা ভাসে
বাপ রে, নয়নের জলে। রাম রে।

আজ আরও দুইটী বনের পাখীর পরিচয় এখানে দিতে চাই। তাহারা দুইজনই কবিওয়ালা। দুইজনই পূর্ব্ববঙ্গে বিশেষ ভাবে বিখ্যাত। এক জনের নাম হরিচরণ চক্রবর্ত্তী। আর একজন হরিচরণ আচার্য্য। ইনি আজও তাঁহার রচিত মধুর সঙ্গীতে হাজার হাজার লোককে মুগ্ধ করিয়া রাখিতেছেন। ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি স্থানের অনেক কবিওয়ালার কবিতা শুনিয়াছি, অনেকের কবিতা সংগ্রহ করিয়াছি, কিন্তু আমার মনে হয়, হরিচরণ যুগলের সঙ্গে এক শ্রেণীতে বড় বেশী নাম স্থাপন করা যাইবে না। দেশের রুচি বদলাইয়া গিয়াছে, হাওয়া বদলাইয়াছে, তাই কবির গান, দুর্গাপুরাণ, মালসী এখন কেহ বড় শোনে না। কবিগান এখন শুনিবার লোক নাই, কাজেই কেহ কবিওয়ালা হয় না। কিন্তু কবিগানে যে মাধুরী, দুর্গাপুরাণ, মালসী বা ঘাঁটুগানে যে তন্ময়তা, যে স্থায়ী রস পাওয়া যায়, তাহা বাস্তবিকই আদরের জিনিস।

আমরা এস্থলে এ দেশের দুই একটী কবির গান তুলিয়া দিয়া বক্তব্য শেষ করিব।

কবি আসরে দাঁড়াইয়াছেন, মধ্য খানে কেহ বলিয়া বসিলেন, এখনই অর্থের মহিমা বর্ণন করিয়া একটী গান গাহিতে হইবে। ভাবনা চিন্তার সময় নাই। গায়কেরা তৈয়ার হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কবি নিমিষের মধ্যেই গান ধরিলেন—

"জীবের কর্ম্মফল ভোগের তরে, সংসারে জন্ম বারে বার
ভুলে, ধরম করম, পরম পদার্থ,—মা,
কেবল অনর্থ অর্থ চিন্তাসার।
মা গো, কিসের ধর্ম্ম, কিসের কর্ম্ম, টাকা হ'ল কলির ধর্ম্ম,
বৃথা জন্ম—যার না আছে টাকা।
ও তার বৃথা ভবে থাকা। মা গো।
লোহার সিন্দুক আর ঢেউ টিনের ঘর,
যার আছে সে গুণের সাগর, বিদ্যাবাগীশ বিদ্যাসাগর,
টাকা না থাকলে হয় বোকা।
গুরু মন্ত্র নিবার আগে, গুরুর চরণ কিনতে টাকা
লাগে, বার্ষিক দিতে টাকা॥
ও'নে টুন্ টুন্ শব্দ মধুমাখা—মানিনীর মান রয় না।
দুর্গে, দেখলাম ভেবে, টাকা অভাবে, সতের পরিচয়

হয় না। সংসারে যে হয় নির্ধনী, সে হউক না গুণী হউক না জ্ঞানী, কে করে আদর।

তার, ভাত পাইলে ব্যঞ্জন হয় না, ধুতি হইলে হয় না চাদর।

ধনী বন্ধুর বাড়ী গেলে, চিনে না সে চিনা দিলে, টাকা পয়সা চাইবে বলে ডাকলেও কথা কয় না॥

ধন হীনের বৃথা জন্ম, তার কেহ নিবে না॥

মাগো —টাকা থাক্‌লে ঘোর জঘন্য, সেও হয় সমাজের মান্য, ধন্য ধন্য টাকার কি মহিমা।

টাকায় খুন করেও পায় ক্ষমা—মা, মা, গো টাকা ভাবের সাকার প্রভু, টাকা হীনের মান নাই কভু, টাকাতে 'রাম মাণিকবাবু', টাকা না থাকলে কয় 'রামা'॥

গণ্ডমূর্খ ভেড়াকান্ত, সে যদি হয় লক্ষীমন্ত, সভায় বসিলে পরে, তার সব কথাতে হয় হয় করে, বিরুদ্ধে কেউ যায় না॥

মা গো, অর্থহীনের স্বার্থ কি বেঁচে। কোন আত্মীয় স্বজন যায় না কাছে॥ হইলে অর্থহীন, কর্‌তে হয় ঋণ, যমের মত কত মহাজন কঠিন, দিন দিন ঠেকায় পেঁচে।

কারো চক্রবৃদ্ধির দায় বাড়ী যায় আসল উসল কি আছে? মাগো অর্থহীনের .. ..

টাকা পয়সাতে করে বাধ্য, অসাধ্য—সাধ্য হয় কত, কত উৎকৃষ্ট লোক অর্থাভাবে—মা—নীচ নিকৃষ্টের হয় আশ্রিত।

মাগো—ধনী লোকের নারী লোকে,খায় পরে থাকে সুখে কর্ত্তার ডাকে থাকে অনুগতা।

তারা সতী পতিব্রতা,—মা—গো—
গরীবের স্ত্রীর নাই গো সুখশ্রী,
পতি করে দাস্য বৃত্তি,
আগুন চাইলে অগ্নিমূর্ত্তি
কথায় কথায় খায় তার মাথা॥"

এই গানটীর বিশেষত্ব এই যে, চিন্তা ও বিবেচনার সময় না লইয়া, কবি লাইনের পর লাইন রচনা করিয়া গেলেন, অথচ, যে গানটী হইল তাহা একেবারে ফেলিয়া দিবার জিনিস নয়।

আর একটী গানের নমুনা দিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ প্রভাসে যজ্ঞ করেন। বৃন্দাদূতীর সঙ্গে শ্রীরাধা সেইখানে গিয়াছেন। দ্বারী দ্বারে কড়া পাহাড়া দিতেছে। কবি গান ধরিলেন—

"নিয়ে অষ্টসখী বিধুমুখী প্রভাসে উদয়।
ভ্রমে দ্বারে দ্বারে,
বৃন্দে তাই হেরে, কেন্দে ধরে দ্বারীর করে, কাতর অতিশয়।
তখন দ্বারী কয়—গোয়ালা রেণ্ডী,
হাম কেয়া করেঙ্গে
নেহি দরজা ছোড়েঙ্গে,
নাই মানেঙ্গে সাধাসাধি,
জলদী ভাগ্‌ হারামজাদী,
ফের্‌ এইছে বাত্‌ কহ যদি—কেল্লা তোয় লেঙ্গে।"
বৃন্দে মনের দুঃখে দ্বারীর কাছে কয়,
সময়ে সকলি করে, শাস্ত্রে আছে তার প্রমাণ॥
দ্বার ছেড়ে দে, ওরে দ্বারী কারে কর্‌লিস্‌ এত অপমান।
এই যে যজ্ঞে এলেন যজ্ঞেশ্বরী, তোদের ভাগ্যোদয়।
যাঁর পায় ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গের ফল॥
বল্‌ যেয়ে তোর রাজার কাছে, যজ্ঞভাবে রাই এসেছে,
অস্থি চর্ম্ম সার হয়েছে, বাকী মাত্র আছে প্রাণ॥
দ্বারি তোদের ভাগ্যোদয়-যজ্ঞে উদয় রাই রূপসী।

* * * *

প্যারী অনাদরে দ্বারে দ্বারে কর্চ্ছে ভ্রমণ।

* * * *

যজ্ঞে নিমন্ত্রণ পেয়ে প্যারী এলেন দ্বারকায়—
তারে চিন্তে কেবা পায়।
দ্বারী তোদের কি দুর্ভাগ্য, চিন্‌লি নারে যোগ্যাযোগ্য
শেষে বা হয় প্রভাস যজ্ঞ—দক্ষযজ্ঞের প্রায়॥"

যাঁহারা কবিগানের বিচ্ছেদ, দশম দশা প্রভৃতি শুনিয়াছেন—তাঁহারাই এ সকল গানের প্রকৃত ভাব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কেবল রচনা পাঠ করিয়া ইহার প্রকৃত রস অনুমান করা অসম্ভব।

আমরা আরও একটী গান দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।—

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ছাড়িয়া মথুরায় গিয়াছেন। বৃন্দা সেখানে তাঁহার নিকট গিয়া হাজির। সভায় দাঁড়াইয়াই কবি গান ধরিলেন—

"গিয়ে নিরানন্দে বলে বৃন্দে গোবিন্দের সভায়।
ওহে শ্যাম গুণধাম, বৃন্দে আমার নাম,
বহু দিনের পরে এলাম প্রণাম করি পায়॥
গোপীর মনের ব্যথা, কইব কোথা
ব্যথিত কোথায় পাই।
দুঃখে যথা তথা যাই।
দুঃখের দিন আর আঁধার নিশি
পোহায় না হে কালশশী
সুখের দিন আর চাঁদ্‌নী নিশি
এই দেখি এই নাই॥
যা হোক—আমরা কান্দি মনের দুঃখে
তুমি যদি থাক সুখে
আমরা—শুনে হই সুখী।

কাল বলে এসেছ বঁধু, সে কালের আর কত কাল বাকী।
আশা পাশে রাইকে বেঁধে, এলে মথুরায়—হায়,
তোমার ব্রজে যাওয়া,—ঠেকে কার মায়ায়।
যদি থাকে বান্ধবের মন, নদী পার তার হয় কতক্ষণ,
মথুরা আর শ্রীবৃন্দাবন কয় দিনের পথ কও দেখি।
একদিন বন্ধু ব্রজে গেলে ক্ষতি ছিল কি ?

* * *

* * *

সদা মথুরার পথপানে চেয়ে প্যারি কান্তেছে,
বড় কষ্টেতে আছে, হায়—হায়—রে—
মিত্র লোক যার বিদেশ থাকে, দেখা না হয় পত্র লিখে,
তাও কি হে শ্যাম তোমাকে নিষেধ করেছে॥

* * *

তুমি বই কে আছে রাধার দুঃখে দুঃখী।
বন্ধু হে, যার জন্য যার প্রাণ যায়, তারে চক্ষের দেখা দেখ্‌তে চায়,
প্রাণান্ত সময়, তারে বঞ্চিত করা উচিত নয়।
রাধার কান্তে কান্তে গেল জন্ম, সার হয়েছে অস্থি চর্ম্ম,
দেখা দিয়ে রাখ ধর্ম্ম—জন্মের মত প্যারি বিদায় হয়॥
উঠ্‌ল হাহাকার এই ধ্বনি ব্রজপুরে—
বুঝি ব্রজেতে মৈল রাধা পদ্মমুখী।
বড় নিদান দশা, রাধার দশম দশায় চল কমলাক্ষী।
রাধার নাসিকায় নাই নিশ্বাস,
বাঁচিবার নাই বিশ্বাস, অন্তর্জ্জলে সুধায় হরিনাম।
বিচ্ছেদ শাসনে প্যারী ধরাসনে ধরাশয়নে—
যেমন মৃত্যুর লক্ষণ।
সখীগণ নিয়ে ধরাধরি রাধিকায়, নিয়ে যমুনা পুলিনে যায়
কান্দে অবিশ্রাম,
হৈল এতদিনে বিধি বাম,
রেখে অর্দ্ধাঙ্গ যমুনার জলে
অর্দ্ধাঙ্গ তুলসীর তলে
রাই মইল রাই মৈল বলে—কর্ণে শুনায় মধুর কৃষ্ণনাম।

* * *

এতদিনে শ্যাম ব্রজলীলা সাঙ্গ হল।
হায় কি হৈল! বুঝি কৃষ্ণ নামে কলঙ্ক রৈল।"

* * *

কবি হরিচরণের ভীষ্মের শরশয্যা, নিমাইর গৃহত্যাগ শ্রীরামের বনবাস, কর্ণের দান, দক্ষযজ্ঞ নষ্ট, কংসবধ প্রভৃতি অতি করুণ রসাত্মক কবিতা।

আমাদের এই স্বল্পশিক্ষিত বনবিহগ হরিচরণের কবিতা প্রাচীন কবিগণের কবিতার পার্শ্বে বসাইয়া দিলে একেবারে বেমানান হইবে না।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
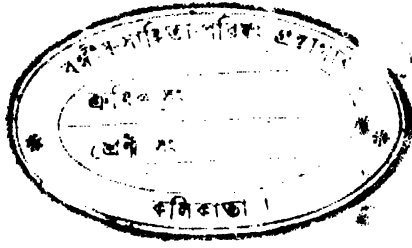
৮ম বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩২৫ | ২য়, ৩য় সংখ্যা

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের

একাদশ অধিবেশনের

সভাপতির অভিভাষণ।

বঙ্গবাণীর সেবকগণ, বন্ধুগণ !

মধু-অভাবে গুড়ের ব্যবস্থা সঙ্গত না হইলেও শাস্ত্র-সম্মত। কিন্তু মধুর স্থলে নিম—মিঠের স্থলে তিত—এ ব্যবস্থার কে অনুমোদন করিতে পারে? অথচ বর্ত্তমান সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্‌যোগকারী ঢাকার অভ্যর্থনা-সমিতি সভাপতি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থাই করিয়াছেন। স্বনামধন্য সাহিত্যিক বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় এই সম্মিলনে সভাপতির সম্মানের আসন অলংকৃত করিবেন—এইরূপ স্থির হইয়াছিল। যিনি বঙ্গসাহিত্যের ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের যুগব্যাপী অক্লান্ত সেবার দ্বারা নিজের শরীরে অকাল-বার্দ্ধক্য আনয়ন করিয়াছেন, যিনি দর্শন বিজ্ঞানের অপূর্ব্ব তথ্যপূর্ণ বিবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়া স্বীয় প্রতিভাবলে দর্শন বিজ্ঞানের ব্যোমবিহারী সুপর্ণকে আমাদের পৃথিবীর মাটিতে নামাইয়া আনিয়াছেন, বঙ্গবাণীর সেই একনিষ্ঠ সেবক, সৌম্য শান্ত সুধী রামেন্দ্রসুন্দরকে এই আসনে সমাসীন দেখিলে আমরা সকলেই ধন্য হইতাম এবং বর্ত্তমান যজ্ঞের প্রজাপতি অভ্যর্থনা-সমিতির উদ্দেশে কালিদাসের ভাষায় বলিতে পারিতাম—

> চিরস্য বাচ্যং ন গতঃ প্রজাপতিঃ।

কিন্তু 'মরে করে আখা, পুরান জগদম্বা'। রামেন্দ্র বাবু এমন পীড়িত হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার পক্ষে সম্মিলনের সভাপতির পদ গ্রহণ করা অসম্ভব হইল। তখন অভ্যর্থনা-সমিতির সানুগ্রহ দৃষ্টি আমার উপর নিপতিত হইল—মধুর অভাবে নিমের ব্যবস্থা হইল। ইহাকেই বলে অভাবে স্বভাব নষ্ট। কিন্তু রামেন্দ্র বাবুর বেলা আমি! এ যে 'স্বর্গ হ'তে রসাতলে দারুণ পতন।' অভ্যর্থনা-সমিতি উদারতার যথেষ্ট পরিচয় দিলেন বটে,

এবং Any port in a storm (তুফানে বন্দরের বাচ বিচার নাই) এই প্রাচীন নীতির সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিলেন, কিন্তু আমি প্রমাদ গণিলাম। প্রথম প্রথম নিজের অযোগ্যতার কথা স্মরণ করিয়া বিশেষ দ্বিধা অনুভব করিতে লাগিলাম এবং আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়কে সময়ের সংক্ষিপ্ততা প্রভৃতি নানা অজুহাত জ্ঞাপন করিলাম। কিন্তু বন্ধুবর আদ্যোপান্ত সুকবি—তিনি কবিতা-রস-মাধুর্য্য মন্থন করিয়া গৈরিশ ভাষায় বলিলেন, 'অতিক্রান্ত অতিক্রান্ত ধাও বীর!' অর্থাৎ যদিও এক অষ্টাহমাত্র সময় আছে, ইতিমধ্যেই তোমার অভিভাষণ লিখিত পঠিত মুদ্রিত করিয়া শীঘ্র ঢাকাভিমুখে অগ্রসর হও। বন্ধুবর ভুলিয়া গেলেন যে, আমি বীর নই—ধীরবিলম্বিত পাদ-ক্ষেপই আমার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু অবশেষে ভাবিলাম, আমি রন্ধ্র-শোধক মাত্র—যাহাকে stop-gap বলে—কি লাগে আমার। সেই ভাবেই আমি এখানে আসিয়াছি এবং সেই ভাবেই আপনারা আমাকে গ্রহণ করিবেন। আমার অক্ষমতা, আমার দোষ ত্রুটী, আমার এই অভিভাষণের ভ্রমপ্রমাদ, চিন্তার তরলতা, নীরসতা, পল্লবগ্রাহিতা, গাম্ভীর্য্যের মৌলিকতার অভাব ইত্যাদি যখনই আপনাদিগকে পীড়িত করিবে, তখন এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিবেন যে, এই নিয়মের জগতে উৎকট কর্ম্মের ফল হাতে হাতে ভোগ করিতে হয়—তা সে কর্ম্ম ব্রহ্মহত্যাই হ'ক অথবা অযোগ্য সভা-পতির নির্ব্বাচনই হ'ক। আর পারেন যদি, তবে উপ-নিষদের প্রাচীন উপদেশ স্মরণ করিয়া রামেন্দ্রসুন্দরের বাসে আমাকে আবৃত করিয়া আমার ব্যক্তিত্ব বিস্মৃত হইবেন—

ঈশা বাস্য মিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

এই সাহিত্য-সম্মিলনের ভাব-জগতে সূচনা হইবার পর, সুকবি ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের আহ্বানে ১৩১২ বঙ্গাব্দের চৈত্রের শেষে সাহিত্যসেবিগণ কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে প্রথম সাহিত্য-সম্মিলন অনুষ্ঠিত করিবার জন্য বরিশাল নগরে সমবেত হন। কিন্তু রাজনীতির কল কোলাহলে, বিশেষতঃ পুলিশ-পুঙ্গবদিগের সুদীর্ঘ 'রেগুলেসান' লাঠির গুরুগম্ভীর নিনাদে, ঐ মিলিত-প্রায় সাহিত্য-সম্মিলনের বোধন না হইতেই বিসর্জ্জন হইয়া গেল। পরে ১৭ই কার্ত্তিক ১৩১৪ সাল, রবিবারে কাশিমবাজার রাজবাটীর ইতিহাসপ্রসিদ্ধ প্রাঙ্গনে দানবীর বিদ্যোৎসাহী বঙ্গজননীর সুসন্তান শ্রীযুক্ত মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয়ের উদ্‌যোগ আমন্ত্রণ ও আয়োজনে এই 'সাহিত্য-সম্মিলন' প্রথম সমবেত হইলেন। ঐ দিন বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে একটী স্মরণীয় দিন। ঐ দিন প্রথম সর্ব্ব বঙ্গের সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগী সুধীগণ এক বিরাট যজ্ঞশালায় সমবেত হইয়া এক শুভ বাণী-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার পর বঙ্গ ও বিহারের নানা স্থানে এই সাহিত্য-সম্মিলনের পর পর নয়টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে—আজ আমরা ঢাকাবাসীর আহ্বানে সাহিত্য-সম্মিলনের এই একাদশ অধিবেশনে উপস্থিত হইয়াছি। প্রথম অধিবেশনের উদ্‌বোধন স্বরূপ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, আজ তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাহার একাংশ আপনাদের শুনাইতে চাই—"সাধকভেদে যেমন জননীর মূর্ত্তিভেদ হয়, সেইরূপ দেশভেদে ও কালভেদে তিনি ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি গ্রহণ করেন। 'বন্দে মাতরম্' এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র সেই শ্যামাঙ্গিনী জননীকে যে মূর্ত্তিতে দেখিয়াছিলেন, সেই মূর্ত্তি আমাদের উপস্থিত যুগধর্ম্মের অনুকূল মূর্ত্তি। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বে আর কোন বাঙ্গালী মায়ের এই মূর্ত্তি এমন স্পষ্টভাবে দেখিতে পান নাই, এবং সেই মূর্ত্তিকে ইষ্টদেবতারূপে স্বীকার করিয়া তদুপ-যোগী সাধনার সময় পান নাই। * *

"অতঃপর আর বলিতে হইবে না, আমাদের যুগ-ধর্ম্মের লক্ষণ কি? বঙ্গের সাহিত্যগুরু আমাদিগকে

যে লক্ষ্য ধরিয়া যাইতে বলিয়াছেন, বঙ্গের সাহিত্যসেবিমাত্রকেই সেই লক্ষ্যের অভিমুখে চলিতে হইবে। প্রত্যেকের পক্ষে চলিবার পথ ভিন্ন হইতে পারে। সাহিত্যসেবির মধ্যে কেহ কবি, কেহ ঔপন্যাসিক, কেহ দার্শনিক, কেহ বৈজ্ঞানিক, কেহ জ্ঞানপ্রচারে ব্রতী, কেহ কর্ম্মমার্গের পথপ্রদর্শক। কিন্তু আজিকার দিনে বঙ্গের সাহিত্যসেবীর এক বই দ্বিতীয় লক্ষ্য হইতে পারে না, যিনি যে কামনা করিয়া কর্ম্ম করিবেন, তাঁহাকে সেই শ্যামাঙ্গিনী জননীর চরণে সেই কর্ম্মফল অর্পণ করিতে হইবে। যিনি যে ফুল আহরণ করিবেন, সে সকল ফুলই সেই রাঙ্গা চরণের রক্তজবার সহিত মিশাইতে হইবে। পত্র, পুষ্প, ফল, তোয়, যাহা আহরণ করিবেন, তাহা ভক্তিপূর্ব্বক সেই স্থানেই অর্পণ করিতে হইবে। "যজ্জুহোষি যদশ্নাসি, যৎ করোষি, দদাসি যৎ",—ভগবতীর আদেশ—সেই সমস্তই সেই এক চরণে অর্পণ করিতে হইবে।" আমিও রামেন্দ্র বাবুর এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলি—আজ নহে কাল নহে, 'যুগে যুগে বর্ষে বর্ষে নিত্য নিরন্তর' আমাদের সমস্ত সাধনার লক্ষ্য, সমস্ত উদ্দেশ্যের বিধেয়, সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষার গম্য ঐ শ্যামাঙ্গিনী জননী, ঐ সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা, ঐ কাননকুন্তলা, ঐ নদীমেখলা, ঐ সাগরসুন্তলা, ঐ সুস্মিতা ভূষিতা জননী। আসুন মাকে প্রণাম করিয়া বলি—

বন্দে মাতরম্॥

শোকপ্রকাশ।

১৩২৩ সালের পৌষমাসে বাঁকীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সন্মিলনের দশম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ অধিবেশনের পর সাহিত্য-সন্মিলনের দুই জন ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার। উভয়েই বিশিষ্ট সাহিত্যিক ছিলেন—তাঁহাদের অভাবে বঙ্গসাহিত্যের ও বঙ্গদেশের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালার প্রাচীন কাব্যের যে আলোচনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার পথপ্রদর্শক এই দুই মহাত্মা। তাঁহারই প্রথমে সহযোগে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, মুকুন্দরাম প্রভৃতির কবিতা ও কাব্যের সটীক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে আজ বহু বৎসরের কথা। তার পর সারদাচরণ মিত্র মহাশয় ব্যবহারক্ষেত্রে বহু ধনাগম ও পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ক্রমশঃ হাইকোর্টের জজিয়তি প্রাপ্ত হন; কিন্তু তথাপি কোন দিনই বঙ্গবাণীর সেবায় উদাসীন হয়েন নাই। তাঁহারই কর্ণধারতায় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ উন্নতির পর উন্নতির সোপান অতিক্রম করিয়াছে এবং এই সাহিত্য-সন্মিলন সংবদ্ধ ও সুস্থিত হইয়া সাহিত্যসেবীর গৌরবের বস্তু হইয়াছে।

সাহিত্যগুরু অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের বিষয় আমি কি বলিতে পারি? বঙ্গমাতার এমন একনিষ্ঠ সেবক আমরা আর কবে দেখিতে পাইব? প্রথম যৌবনের আরম্ভ হইতে বার্দ্ধক্যের শেষ দিবস পর্য্যন্ত সমান আদরে, সমান গৌরবে, সমান নিষ্ঠার সহিত কে এমন বঙ্গভাষার ও বঙ্গসাহিত্যের আলোচনা করিয়াছে? কে এমন অবহিত সতর্ক প্রহরীর মত বঙ্গজননীর মন্দিরদ্বারে দিনের পর দিন সজাগ পাহারা দিয়াছে? চুঁচুড়ার ও চট্টগ্রামের সাহিত্য-সন্মিলনে উপস্থিত হইবার সৌভাগ্য যাঁহাদের ঘটিয়াছিল, তাঁহারা এই প্রবীণ সাহিত্যিকের সাগ্রহ আন্তরিক অমোঘ মর্ম্মবাণী সহসা বিস্মৃত হইবেন না।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনের কথা।

সাহিত্য-সন্মিলনের প্রথম অধিবেশনে সন্মিলন-পরিচালনের জন্য কোন নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ করা হয় নাই; বরং সন্মিলনের শৈশব-দোলায় নিয়মের বজ্রবন্ধনী নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল; এবং প্রথম বর্ষের কার্য্যবিবরণীতে ঘোষিত হইয়াছিল যে—"বঙ্গীয় সাহিত্য-সন্মিলনের অন্নপ্রাশন সংস্কার সম্পাদিত হইলে চূড়াকরণকালে তাহার ভবিষ্য জীবনের অনাময় নিমিত্ত

উপযুক্ত বিধি ব্যবস্থার আস্থাপন করা যাইবে।" কিন্তু অচিরেই বিধি-ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। তদনুসারে দ্বিতীয় অধিবেশনে সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্য-প্রণালী স্থিরীকরণের নিমিত্ত পাঁচজন ব্যক্তির উপর ভার অর্পিত হয়। তাঁহারা খসড়া নিয়মাবলী প্রস্তুত করিয়া ভাগলপুরে অনুষ্ঠিত তৃতীয় অধিবেশনে উহা উপস্থিত করিলে, ঐ বিষয়ে অনেক বাদানুবাদ হইয়া উক্ত নিয়মাবলী তৎপরবর্ত্তী সম্মিলনে বিবেচিত হইবে, এইরূপ স্থির হয়। কিন্তু ঐ তৃতীয় অধিবেশনেই ভবিষ্যৎ সম্মিলনের কার্য্যনির্ব্বাহার্থ সাহিত্য, ইতিহাস, ও বিজ্ঞান, এই তিন বিভাগের জন্য তিনটী শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছিল। জাতীয় সাহিত্যের গঠনে দর্শনের স্থান সংকীর্ণ বিবেচিত হওয়ায় বোধ হয় ঐ অধিবেশনে দর্শনের জন্য কোন ভিন্ন শাখা-সমিতি-গঠনের প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। পরবর্ত্তী অধিবেশনে, যাহা ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই অধিবেশনে নিয়মাবলীর পাণ্ডুলিপি গৃহীত হয়। ঐ নিয়মাবলীতে সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্দেশ্য এই প্রকারে বিবৃত হইয়াছিল,—

"বিবিধ শাস্ত্রের আলোচনা, প্রচার ও সুধীগণের মধ্যে ভাব-বিনিময় সম্মিলনের উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। বাঙ্গালাদেশ ও বাঙ্গালী জাতি সম্বন্ধে স্থানীয় অনুসন্ধান দ্বারা সর্ব্ববিধ তথ্যনির্ণয় উক্ত উদ্দেশ্যের বিশিষ্ট অঙ্গরূপে গণ্য হইবে; তজ্জন্য এবং বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের জন্য ও স্থানীয় লোকদিগকে তৎসম্বন্ধে উৎসাহিত করিবার জন্য প্রতি বর্ষেই সাহিত্য-সম্মিলন আহূত হইবে।"

পরে সংশোধিত হইয়া সম্মিলনের উদ্দেশ্য এখন এই ভাবে প্রকাশিত হইতেছে,—

"সুধীগণের মধ্যে ভাব-বিনিময়, বিবিধ শাস্ত্রের আলোচনা ও প্রচার, বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালী-জাতি সম্বন্ধে স্থানীয় অনুসন্ধান দ্বারা সর্ব্ববিধ তথ্যনির্ণয় এবং জনগণের মধ্যে সাহিত্যানুরাগ ও জ্ঞানের বিস্তার বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।"

প্রথম প্রথম দর্শন সাহিত্যিক শাখার অঙ্গীভূত ছিল, কিন্তু পরে দর্শন স্বতন্ত্র শাখায় নিজের যোগ্য আসন লাভ করিয়াছে। এখনকার নিয়মে কার্য্যের সুবিধার জন্য সম্মিলনের কার্য্য নিম্নলিখিত চারিভাগে বিভক্ত হইতে পারে। প্রয়োজন হইলে একই সময়ে একাধিক শাখার অধিবেশন হইতে পারে। (ক) সাহিত্য শাখা (খ) দর্শন শাখা (গ) ইতিহাস ও ভূগোল শাখা (ঘ) গণিত ও বিজ্ঞান শাখা।

চুঁচুড়ায় সাহিত্য-সম্মিলনের যে পঞ্চম অধিবেশন হয়, ঐ অধিবেশনে প্রথম বিজ্ঞান শাখার স্বতন্ত্র সভার অনুষ্ঠান হয়। তৎপরবর্ত্তী চট্টগ্রামের অধিবেশনেও ঐ প্রণালী অনুসৃত হইয়াছিল। কলিকাতা নগরীতে সাহিত্য-সম্মিলনের যে বিরাট অধিবেশন হইয়াছিল, ঐ অধিবেশনেই প্রথমতঃ-সম্মিলনের কার্য্য উক্ত চারি শাখায় বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন শাখার স্বতন্ত্র সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

তদবধি বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া সাধারণ সভাপতি ব্যতীত চারি শাখায় চারি জন বিভিন্ন সভাপতি নির্ব্বাচিত হইতেছেন, এবং প্রত্যেক সভাপতি স্ব স্ব শাখার উপযোগী স্বতন্ত্র অভিভাষণ পাঠ করিতেছেন। ইহার ফলে সমাগত সুধীবৃন্দ অনেক সময় ইচ্ছা সত্বেও সকল শাখার রসাস্বাদে বঞ্চিত হইতেছেন। কারণ, সময়াভাবে প্রায়ই এক সময়েই চারি শাখার ভিন্ন ভিন্ন গৃহে অধিবেশন করিতে হইতেছে। শ্রোতৃবৃন্দ যোগসিদ্ধির অভাবে কায়ব্যূহ-রচনায় অসমর্থ হইয়া হয় এক শাখায় সুস্থিত থাকেন, অথবা উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া শাখা হইতে শাখান্তরে বিচরণ করিয়া যুগপৎ শ্রান্তি ও নির্ব্বেদ অনুভব করেন। ইহার একটা সদুপায় হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সে সদুপায়ের প্রধান অন্তরায় পঠিতব্য প্রবন্ধের বাহুল্য।

সম্মিলনের কর্ত্তৃপক্ষেরা প্রবন্ধ-সংগ্রহের জন্য সারা দেশময় নারদের নিমন্ত্রণ করেন। তাহার ফলে প্রত্যেক

শাখাতে পাঠের জন্য নানা বিষয়ে উত্তম মধ্যম বহুসংখ্যক প্রবন্ধ উপস্থিত হয়। সময়াভাবে অধিকাংশ প্রবন্ধই পঠিত বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। এবং যদি বা দু' এক জন সৌভাগ্যবান্ লেখকের ভাগ্যে প্রবন্ধপাঠের সুবিধা ঘটে, তথাপি সেই সকল প্রবন্ধ চারি শাখার যুগপৎ অধিবেশনের হট্টগোলে যথোচিত মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে না। এইরূপে অনেক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ মাঠে মারা যাইবার উপক্রম হয়। সাহিত্য-সম্মিলনের কর্তৃপক্ষদিগকে এই বিষয়ের প্রতিবিধান করিবার জন্য আমি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। সাহিত্য-সম্মিলনকে সাহিত্য দর্শন ইতিহাস বিজ্ঞান—এই চারি শাখায় বিভক্ত করিবার ব্যবস্থা যে সঙ্গত ও সমীচীন, এ বিষয়ে বোধ হয় মতভেদ নাই। এই চারি শাখার পৃথক পৃথক অধিবেশনও যে বাঞ্ছনীয়, তাহাও বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু এই সকল বিশেষ অধিবেশনে সাধারণ শ্রোতৃবৃন্দের মিলন-স্থান না হইয়া বিশেষজ্ঞের চিন্তাবিনিময় ও গবেষণা-পরিচয়ের কেন্দ্র করিলে কিরূপ হয়? এবং প্রত্যেক শাখার বিশিষ্ট সভাপতির অভিভাষণ যুগপৎ পঠিত না হইয়া সাধারণ সভায় পর পর পঠিত হইবার ব্যবস্থা করিলে কেমন হয়? যেন সমবেত সুধীবৃন্দ ইচ্ছা করিলে কেহই ঐ সকল অভিভাষণের রসাস্বাদ হইতে বঞ্চিত না হন। সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ প্রবন্ধের বাহুল্য-ঘটা সঙ্কুচিত করিয়া প্রত্যেক শাখার আলোচ্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এক বা দুই জন ব্যক্তিকে সাধারণ শ্রোতার উপযোগী করিয়া স্ব স্ব বিষয়ে বক্তৃতা বা প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য আহ্বান করিলে ভাল হয়। শুনিয়াছি, এরূপ এমন একটি প্রবন্ধ শুনাইবার জন্য ইংলণ্ডের বিশিষ্ট বিশিষ্ট লোক সর্ব্বদাই এটল্যান্টিক সমুদ্র পার হইয়া আমেরিকায় যান, এবং আমেরিকার বিশিষ্ট লোক ইংলণ্ডে আসেন। আমাদের বিশিষ্ট মহোদয়েরা এক জেলা হইতে অন্য জেলায় আসিতে পারিবেন না কি?

এইরূপ করিলে প্রতিবর্ষে সাধারণ সভাপতির অভিভাষণ ব্যতীত প্রত্যেক শাখায় সেই শাখার সভাপতির অভিভাষণ এবং একটী কিংবা দুইটী বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ সম্মিলনের গৌরবের সামগ্রী হইতে পারিবে এবং ঐ সমস্ত প্রবন্ধই সাধারণ সভায় সমবেত সকল সুধীবৃন্দের বিনোদন ও শিক্ষণের উপায়স্বরূপ হইবে। সঙ্গে সঙ্গে বিশেষজ্ঞের বৈঠকে কূট প্রশ্ন ও সমস্যার আলোচনা চলিবে। সংসঙ্গে প্রাচীন পুঁথী মুদ্রা লিপি আলেখ্য শাসন মূর্ত্তি প্রভৃতির প্রদর্শন, আলোকচিত্রের সাহায্যে সরল ও সরসভাবে জ্ঞানবিস্তার এবং সাহিত্যিকদিগের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য ও ভাববিনিময় দ্বারা সাহিত্য-সম্মিলনের এই আনন্দের মেলা শুধু হাসি-খেলা ও হট্টগোলে শেষ না হইয়া সাফল্য ও সার্থকতা লাভ করিবে।

আপনাদের স্মরণ হইবে যে, বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের বিগত দশম অধিবেশনে সম্মিলনকে ১৮৬১ খৃঃ অব্দের ২১ আইন অনুসারে রেজেষ্টরী দ্বারা বিধিসিদ্ধ বৈধতা প্রদান করিবার জন্য সেই সম্মিলনের সভাপতি মাননীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয়, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী এবং আমাকে লইয়া একটী শাখা সমিতি গঠিত হইয়াছিল। এই সমিতি বর্ত্তমান নিয়মাবলীর আদর্শে কতকগুলি নিয়মাবলীর খসড়া প্রস্তুত করিয়া সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি, উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্যকারী সমিতি প্রভৃতির নিকট বিবেচনার্থ পাঠাইয়াছেন। তাঁহাদের অভিমত প্রাপ্ত হইলে রেজেষ্টরীকারী-সমিতি আপনার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া বোধ হয় সম্মিলনের আগামী অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত করিতে পারিবেন।

বঙ্গ-সাহিত্যের বিশ্ববিজয়ী সৌধ।

দশম অধিবেশনের সভাপতিরূপে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী যে আশা ও উদ্দীপনা পূর্ণ হৃদয়গ্রাহী

অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার ধ্বনি নিশ্চয়ই আপনাদের হৃদয়-তন্ত্রীতে এখনও ঝঙ্কৃত হইতেছে। "দেশমাতৃকার মুখ উজ্জ্বল করিব। আমার জননী বঙ্গভাষাকে জগতের বরণীয় করিব। আমার মাকে এমন করিয়া সাজাইব, এমন করিয়া সুন্দর করিব, যাহাতে আর দশ জন অন্য মায়ের সন্তান আমার মাকে মা বলিয়া জীবন ধন্য জ্ঞান করিবে।" এই প্রকার পবিত্র সঙ্কল্পরূপ গঙ্গাজলে আমাদিগকে অভিষিক্ত হইতে তিনিই উপদেশ করিয়াছিলেন। বঙ্গসাহিত্যের বিশ্ববিজয়ী সৌধ নির্ম্মাণকল্পে দেশবাসীকে আহ্বান করিয়া তিনি উদ্দীপনার ভাষায় বলিয়াছিলেন,—"বাঙ্গালী জাতির ইতর ভদ্র সকলের মনে একবার কোন ক্রমে জাগাইয়া তুলিতে হইবে যে, আমরা মাতৃভাষার অভ্যুদয়ের সহিত একসূত্রে আমরা নিজের, তথা মদীয় জাতির অভ্যুদয় গ্রথিত; বঙ্গদেশের অদৃষ্ট, বঙ্গবাসীর অদৃষ্ট, বঙ্গভাষার ভূয়োবিস্তারের উপর নিহিত। যতদিন বঙ্গের অতি নগণ্য পল্লীতে পর্য্যন্ত বঙ্গবাণীর বিজয়শঙ্খ নিনাদিত না হইবে, ইতর ভদ্র সমস্বরে বঙ্গভাষার বিজয়প্রশস্তি উদাত্তকণ্ঠে আবৃত্তি না করিবে, ততদিন বঙ্গের জাতীয় সাহিত্যের বিশ্বসাহিত্যে অন্তর্নিবেশ অসম্ভব। যখন ঋতুরাজ বসন্ত ধরাধামে অবতীর্ণ হন, সারা ব্রহ্মাণ্ডটা এক ভাবে, এক উন্মাদনায় বিভোর হইয়া উঠে, একমনে সকলে মধুর বাসন্তীমূর্ত্তির পূজা করিয়া তৃপ্তিলাভ করে। যদি সারা বঙ্গদেশটাকে এক ভাবে, একই উন্মাদনায় বিভোর করিয়া তুলিতে পার, তোমার জননী বঙ্গভাষার ভুবনমোহিনী মূর্ত্তির বিমল প্রভায় বাঙ্গালী জনসাধারণের হৃদয় বিভাসিত করিয়া তুলিতে পার, দেখিবে, তোমার দ্বিভুজা বঙ্গভারতী দশভুজার মূর্ত্তিতে বাঙ্গালীর সমক্ষে অবতীর্ণ। দেখিবে, বিশ্বের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে তোমার বঙ্গবাণীর বিজয়-শঙ্খ ধ্বনিত হইতেছে। 'বাঙ্গালার মাটী, বাঙ্গালার জলে' পৃথিবী ছাইয়া ফেলিয়াছে।"

আমরা সমস্বরে দেবভাষায় বলি—ষাতম্, বাইবেলের ভাষায় বলি, Amen—আরও বলি "সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাম্।"

কিন্তু সরস্বতী মহাশয় ধ্যাননেত্রে ভাবরাজ্যে যে মহনীয় চিত্র দর্শন করিয়াছেন, যদি তাহাকে আকার দান করিয়া বাস্তবে পরিণত করিতে হয়, তবে প্রথমেই বঙ্গভাষাকে বাঙ্গালীর সর্ব্ববিধ শিক্ষার বাহন করিতে হইবে—তাহা না পারিলে আমাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইবে, সমস্ত শ্রম পণ্ড হইবে, সমস্ত আশা ভগ্ন হইবে।

কথাটা এত গুরুতর যে, একটু বিস্তার করিয়া বলি। বঙ্গসাহিত্যের বিশ্ববিজয়ী সৌধ নির্ম্মাণ করিতে অনেকগুলি নিপুণ কর্ম্মঠ স্থপতির দরকার—এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। এখন প্রশ্ন এই যে, বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর দ্বারা ঐরূপ স্থপতির উদ্ভব হইতেছে কি না? আমার এক পরিহাসরসিক বন্ধু বলেন, যে গবর্ণমেণ্টের প্রবর্ত্তিত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রণোদিত শিক্ষার ফলে কেবল দুই শ্রেণীর জীব তৈয়ারী হইতেছে—এক গোলাম, অন্য গুণ্ডা। কথাটা যে একেবারে অমূলক, তাহা নহে; কিন্তু হয় ত ইহাতে কিছু অত্যুক্তি আছে। অতএব যাঁহারা আমার বন্ধুর মত চটুল নহেন, যাঁহারা গম্ভীর ভাবুক দায়িত্ব-জ্ঞানী লোক, তাঁহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাউক। প্রথমতঃ, আমাদের সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ইনি বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর উপর এমন বিরক্ত ছিলেন যে, আমাদের শিক্ষিতদিগকে ভারবাহী গর্দ্দভের সহিত তুলনা করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই—"খরো যথা চন্দনভারবাহী"। তার পর যিনি বিধিদত্ত অধিকারে বঙ্কিমবাবুর সাহিত্য-সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন, সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি বলেন? তিনি আমাদিগকে চলন্ত নোটবুক ও ফুরন্ত ফনোগ্রাফ বলিয়াছেন, এবং শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মৌলিকতা ও সজীবতার অভাবকে লক্ষ্য করিয়া তাহাদের মুখে এই কবিতাটী বসাইয়াছেন:—

"ভয়ে ভয়ে যাই ভয়ে ভয়ে চাই,
ভয়ে ভয়ে সুধু পুঁথি আওড়াই !"

পূর্ব্ব ও পশ্চিম—যুক্ত-বঙ্গের গৌরব কবিবর নবীনচন্দ্র সেন আত্মজীবনচরিতে আমাদের শিক্ষাপ্রণালীকে শিশুমুণ্ডমালিনী মহাকালী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, এবং ঐ শিক্ষার ফলে অকালে কত শিশুহত্যা হইতেছে তাহার বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার ভাব অবলম্বন করিয়া আমার এক অভিন্নকলেবর বন্ধু একটী ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা আপনাদের শুনাইতে চাই—

নিজ শিব পদে দলে,
শিশু মুণ্ডমালা গলে,
সংহার-রূপিণী, ঘোরা, মুখে অট্টহাস।
লোল রসনা লকে,
রুধির ঝলকে ঝকে,
পূতনারূপিণী বামা বঙ্গে পরকাশ॥

ইহা আপনাদের নিকট কবিতার অত্যুক্তি মনে হইতে পারে। অতএব, এক জন ধীর স্থির প্রাজ্ঞ ব্যক্তির উক্তি শুনন। ইনি দেশপূজ্য মারাঠা জননায়ক জষ্টিস্ রাণাড়ে। তিনি এই শিশুহত্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, —

"The chief of the causes leading to the premature deaths of our students is over-study and the strain caused by the stiff system of frequent competitive examination in subjects which have to be mastered in a foreign language and which tax the powers of students beyond their endurance. * * * Attempting to secure thoroughness, as it is called, the University system directly produces the unhappy result of *killing many of the brightest students* who come within its influence * * * * The true etiology of what I call nervous or vital exhaustion and atrophy of energies, must be sought in the deeper recess of the educational system. The bow is too much bent, and when it is relaxed it refuses to unbend again except under pressure and enforced order." দেহক্ষয় অপেক্ষা এই যে মনের অপচয়—মানসিক পঙ্গুতা—ইহা আরও মারাত্মক।

আমাদের দেশমান্য স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, যিনি আজীবন শিক্ষার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন, এবং যিনি স্বভাবসুলভ ধীরতার বশে প্রত্যেক শব্দ ওজন করিয়া উচ্চারণ করেন, তিনি এ সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছেন,—

"The existing system of English Education in this country has failed to produce satisfactory results * * * The time for change of method has certainly arrived." আমার স্মরণ আছে, একবার কলিকাতার সেণ্টজেভিয়ার কলেজের অধ্যক্ষ Father Lafont, যাঁহার সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তিনি আমাদের শিক্ষা প্রণালীকে huge sham বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার জানত এমন কয়েকটী ছাত্র আছে, যাহারা উপাধি পরীক্ষার উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে, অথচ সেই সেই বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। এ কথার বোধ হয় আমরা অনেকেই নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতে সমর্থন করিতে পারি। আমি একজন দর্শন শাস্ত্রের এম-এর কথা জানি, যিনি কেবল নোট পরিয়া পাশ হইয়াছেন, একখানিও দার্শনিক গ্রন্থ উল্টাইয়া দেখেন নাই! সম্প্রতি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে, এক জন Astronomy সংযুক্ত গণিত বিভাগে এম এ পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন, অথচ কোন দিন গগনবিহারী গ্রহনক্ষত্রের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য দূরবীক্ষণে চক্ষুঃ সংযোগ করেন নাই। অনেকেই শিক্ষিত-

দিগের পঙ্গুতা ও শিক্ষার বন্ধ্যাত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন বোম্বাই প্রদেশের ডাক্তার ভাণ্ডারকর দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন—"the languid interest which our graduates feel in literary pursuits in after-life"। দ্বিতীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই জ্ঞানস্পৃহার অভাবকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন —"যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত বিদ্যালয়-সমূহে বহুকাল হইতে বিজ্ঞান অধ্যাপন ব্যবস্থা হইয়াছে, তথাপি বিজ্ঞানের প্রতি আন্তরিক অনুরাগসম্পন্ন ব্যুৎপন্ন ছাত্র আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না; কেন না, ইংরাজিতে একটি কথা আছে, ঘোড়াকে জলাশয়ের নিকটে আনিলে কি হইবে? উহার যে তৃষ্ণা নাই। একজামিন্ পাশ্ যেখানকার ছাত্রদের মুখ্য উদ্দেশ্য, সেখানকার যুবকগণের দ্বারা অধীত বৈজ্ঞানিক বিদ্যার শাখা প্রশাখাদির উন্নতি হইবে, এরূপ প্রত্যাশা করা নিতান্তই বৃথা। সেই সকল মৃতকল্প, স্বাস্থ্যবিহীন যুবকগণের যত্নে জাতীয় ভাষার উন্নতি বিধান কিংবা যে কোন প্রকার দুরূহ ও অধ্যবসায়-মূলক কার্য্যের সাফল্যসম্পাদনের আশা নিতান্তই সুদূরপরাহত।"

ডাক্তার রায়ের বহু পূর্ব্বে মনস্বী ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "সামাজিক প্রবন্ধে" আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, দেশে বিজ্ঞানশালার প্রতিষ্ঠা করিলে কি হইবে, দেশের মধ্যে এখনও বৈজ্ঞানিকতার অঙ্কুরোদ্গম হয় নাই। এই সকল গুরুকল্প ব্যক্তিদিগের কথার পর আমি কি বলিতে পারি? আর যদিই বা বলিতে যাই, হয় ত কিছু কটু কঠোর বলিয়া ফেলিব। তবে আমার যাহা বক্তব্য, এক জন আইরিস্ লেখক আয়ারল্যাণ্ডের শিক্ষা-বিভ্রাটের বর্ণনায় তাহা যথাযথ বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিই—আপনারা ঐ উক্তিতে আয়ারলাণ্ডের স্থানে ইণ্ডিয়া বসাইয়া লইবেন :—

"Education in Ireland encumbers the intellect, checks the fancy, debases the soul and enervates the body. It cuts off the Irishman from his tradition and by denying him a country debases his soul; it stores his mind with lumber and nonsense; it destroys his fancy by cutting him off from his traditions and enervates his body by denying him physical culture."

যে শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে এত দোষ, তাহার আমূল সংস্কার না হইলে আমাদের জাতির কি ভরসা আছে? যদি বঙ্গ-সাহিত্যের বিশ্ববিজয়ী সৌধ গড়িয়া তুলিতে হয়, তবে তাহার জন্য অনেকগুলি মানুষ চাই—কয়েক জন অতিমানুষও চাই—মেষের দ্বারা সে কার্য্য হইবে না, মহিষের দ্বারাও হইবে না। আমরা এমন শিক্ষা চাই, যাহার ফলে স্বতন্ত্র স্বালম্ব স্বনিষ্ঠ স্বাধীন সামাজিক প্রস্তুত হইবে; যাহাদের দেহে বল থাকিবে, মনে দৃঢ়তা থাকিবে, হৃদয়ে বিশ্বাস থাকিবে, এক কথায়, যাহারা এই মৃতকল্প দেশকে সজীব সজাগ করিতে পারিবে, দেশে নূতন শিল্প নূতন বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা করিবে, নূতন সাহিত্যের নব-গঙ্গা আনয়ন করিবে; নূতন বিজ্ঞানের যজ্ঞশালা রচনা করিবে; নূতন দর্শনের স্বর্ণসৌধ গড়িয়া তুলিবে। কেন বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীতে এইরূপ মানুষ প্রস্তুত হইতেছে না? বাঙ্গালীর বুদ্ধির অভাব নাই, অধ্যবসায়ের অভাব নাই, তথাপি এইরূপ হইতেছে কেন? আমাদের দেশে শিক্ষা কেন বন্ধ্যা হইতেছে, শিক্ষিত কেন পঙ্গু হইতেছে? ইহার প্রধান ও প্রথম কারণ, বাঙ্গালাকে **শিক্ষার বাহন** না করিয়া বিদেশী ভাষার দ্বারা শিক্ষা-দান। এইরূপ পৃথিবীর আর কোন দেশ আছে বলিয়া শোনা যায় নাই। আর কোথাও কখনও ছিল কিনা, তাহাও জানা যায় নাই। কেবল কিছুদিনের জন্য ছিল নরম্যান-বিজয়ের পর নিপীড়িত ইংলণ্ড দেশে।

কিন্তু ইংরেজ জাতি প্রকৃতি-সুলভ অমোঘতায় শীঘ্রই নরম্যানকে আত্মসাৎ করিয়া নিজের শিক্ষা স্বাভাবিক ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছিল। এদেশে কত দিনে এই শুভ ঘটনা সংঘটিত হইবে ?

আমাদের শিক্ষার্থীদিগকে cram-কারী বলিয়া বিদ্রূপ করা হয়। তারা মুখস্থ করিয়া পাশ করে; বস্তু শিখে না বাক্য শিখে, ভাব শিখে না ভাষা শিখে; তারা গতানুগতিক—তাহাদের মৌলিকতা নাই, স্বাধীন চিন্তা, আত্মনির্ভর নাই, গবেষণার প্রবৃত্তি নাই। তাহারা কেবল চর্ব্বিতচর্ব্বণ করে, বান্তনিষেবণ করে। তাহারা নিজের পথ কাটিয়া লইতে পারে না, জাতীয় জীবনের প্রদীপ্ত হোমানলে ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থ ও সুবিধা আহুতি দিতে পারে না। সমস্তই স্বীকার করি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—ইহার জন্য তাহারা দায়ী না তাহাদের শিক্ষাপ্রণালী দায়ী ? আমার স্মরণ আছে যখন আমি প্রবেশিকা পরীক্ষার দ্বারে উপনীত হইবার জন্য প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছিলাম, তখন ইংরেজী ভাষায় ইতিহাস প্রভৃতি আয়ত্ত করিবার জন্য কি গলদ্‌ঘর্ম্ম পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল এবং অবশেষে পরাভূত হইয়া কিরূপে Key ও Catechismএর আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। অথচ যাদের 'ভাল ছেলে' বলে, মেধাবী পরিশ্রমী তীক্ষ্ণবুদ্ধি সচ্চরিত্র—আমি তাহাদের একজন ছিলাম। অবশ্য আমার বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে আপনাদের একথা বিশ্বাস হইবে না, কিন্তু স্মরণ রাখিবেন আমার যে বর্ত্তমান আমি, সেটা পুরাতন আমির ধ্বংসাবশেষ মাত্র—এ আমি পরীক্ষা-ঘানির ঘর্ঘরনিষ্পিষ্ট নিঃসার জীব। কিন্তু চিরদিন এমন ছিলাম না। তবে জানেন ত'—পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙে হীরার ধার।

"আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ"—নিজেরা ছাত্র দশায় যে সকল মর্ম্মপীড়া অনুভব করিয়াছিলাম, এখন শিশু পুত্রদের মধ্যে তাহার পুনরভিনয় দেখিতেছি। আমার একটী নয় বৎসরের পুত্র আছে। সে সখ করিয়া বিনা সাহায্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শকুন্তলা ও সীতার বনবাস পড়ে। অবাধে পড়িয়া যায়, নিরস্ত হয় না। কিন্তু দেখিতে পাই, ইংরাজি পড়িতে হইলে তাহার হৃৎকম্প হয়। দুই বৎসরের বিবিধ চেষ্টাতেও সে এখনও first book সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারিল না। শিক্ষা এ দেশে কত সুখের, কত আনন্দের প্রস্রবণ হইতে পারিত, যদি না বিদেশী ভাষা-শিক্ষার বিকট ছায়া শিক্ষাঙ্গণে নিপতিত হইয়া শিশুদের হৃদয়ে ভীতি ও আতঙ্কের সঞ্চার করিত। বাঙ্গালি জাতি নাকি অজেয় অমর জাতি, তাই এত শিক্ষা সঙ্কটের মধ্যেও বাঙ্গালীর প্রতিভা একবারে ম্লান হইয়া যায় নাই; এবং তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি একেবারে ভোতা হইয়া যায় নাই। এই প্রণালী সত্ত্বেও যে স্যর গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, স্যর রাসবিহারী ঘোষ, স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি মনস্বী পুরুষ (বিদেশে যাঁহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে তাঁহাদের নাম ধরিলাম না) আবির্ভূত হইয়াছেন, ইহাতে আশা হয় যে বাঙ্গালীকে কেহই পরাভূত করিতে পারিবে না। স্যর আশুতোষও গতবারে বলিয়াছিলেন—'সুজলা সুফলা, শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির বক্ষের ক্ষীরধারায় এমনই একটা সঞ্জীবনী-শক্তি আছে, যাহাতে বঙ্গে কোন দিন কৃতীর অভাব হয় না, হইবেও না। যেমন অবস্থাতেই বাঙ্গালীকে ফেলিয়া দাও না কেন, বঙ্গসন্তানের হৃদয়ে কখনও নৈরাশ্য বা দৌর্ব্বল্য আসে না।' তবে এ কথা আমি বলিতে বাধ্য যে, রবীন্দ্রনাথকে যদি আমাদের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সোপান-পরম্পরা অতিক্রম করিতে হইত, তবে তিনি রবীন্দ্রনাথ হইতেন কি না সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ। কিন্তু শ্বেতভুজা শতদলবাসিনী নাকি তাঁহার হৃৎপদ্মে আপনার রক্তচরণ চিহ্নিত করিবেন পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়াছিলেন, সেই জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রবেশিকা অবধি পহুঁছিতে পারিলেন না। ধরণী স্বস্তিশ্বাস মোচন

করিলেন, দেবতারা দুন্দুভি নিনাদ করিলেন, দিক্‌বালারা অম্লান পারিজাতমালা হস্তে লইয়া কালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, বঙ্গদেশ আর এক জন মহাকবির সম্ভাবনায় রোমাঞ্চিত হইল। বাস্তবিক ইহা একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, আমাদের শিক্ষাপ্রণালীতে যাহারা উপেক্ষিত, অনেক সময়ে তাহাদের মনীষাই দেশকে সুবাস বিতরণ করে। সকলেই জানেন ডব্লিউ, সি, বন্দ্যোপাধ্যায় এন্‌ট্রেন্‌স পাশ করিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ ইংরেজীতে ফেল হইয়াছিলেন। সম্প্রতি যে ২৬ বর্ষীয় মান্দ্রাজী যুবক কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিষয়ে অপূর্ব্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া ভারতবাসীদিগের মধ্যে প্রথম এফ্‌, আর, এস্‌, রূপ জয়-টীকা ললাটে ধারণ করিয়াছেন, তিনি ৬ বৎসর পূর্ব্বে মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় গলাধাক্কা খাইয়া পোর্টইঞ্জিনিয়ার আফিসে কেরাণীগিরি করিতে বাধ্য হন। কিন্তু দুষ্ট সরস্বতীর এমনই প্রেরণা এবং প্রতিভার এমনই অপ্রতিহত গতি যে, সেই কেরাণী যুবক অপ্রত্যাশিত ভাবে কেম্‌ব্রিজে নীত হইল এবং অনুকূল অবস্থার গুণে তাহার মনীষাপুষ্প বিকশিত হইয়া উঠিল।

বাঙ্গালাকে যে সর্ব্ববিধ শিক্ষার বাহন করা উচিত, এ বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে, ইহা আমার ধারণা ছিল না। কিন্তু দেখিয়াছি যে সকলে এ সম্বন্ধে এক মত নহেন। সেই জন্যই এ বিষয়ে যুক্তি তর্কের অবতারণা করিতে হয়। সে যুক্তি-তর্ক নিজের কথায় না দিয়া কয়েকজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি যাঁহাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে তর্ক উঠিতে পারে না, তাঁহাদের কথাতেই দিব। প্রথমতঃ স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,—তাঁহার মত যোগ্য কে? তাঁহার উক্তি শুনুন।—

Except in the lowest forms, the different subjects of study have at present, all to be learnt in our schools and colleges in English, and this throws no small burden on our students. English is a very difficult language for a foreigner, especially a Bengalee, to learn, because English and Bengali differ so widely, not only in their vocabularies but also in their grammatical structures and idioms. And this difficulty is really so great that it not only overtaxes the energy of our students, but also cramps their thought. * * * The ignorance of the middle ages was not dispelled and the Revival of learning was not complete, until knowledge began to be disseminated through the modern languages. Nor can we expect any revival of learning here until it is imparted not merely in its primary stage, but in the higher stages as well, through the medium of the vernaculars"

অনেক বৎসর হইল বঙ্গদর্শনে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছিলেনঃ—

"যদি নিজ ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে অনেকটা সহজে হয়। তাহা না হইয়া এক অতি কঠিন, অতি দূরবর্ত্তী জাতির ভাষায় আমরা শিক্ষা পাই। শুদ্ধ সেই ভাষাটী মোটামুটী শিখিতে রোজ চারি ঘণ্টা করিয়া অন্ততঃ আট দশ বৎসর লাগে। ভাষা শিক্ষাটী অথচ কিছুই নহে, ভাষা শিক্ষা কেবল অন্য ভাল জিনিস শিখিবার উপায়—উহাকে শিখিবার পথ পরিষ্কার হয় মাত্র—সেই পথ পরিষ্কার হইতে এত সময় ব্যয় ও এত পরিশ্রম! তবুও কি সে ভাষা বুঝা যায়? তাহার যো কি?

* * *

ইংরেজী ভাষা শিক্ষা কর, ভাল করিয়াই শিক্ষা কর।

ইংরেজীতে অঁাক কসিতে হইবে, ইতিহাস পড়িতে হইবে, বিজ্ঞান শিখিতে হইবে, ইহার অর্থ কি? বাঙ্গালা দিয়া ইংরেজী শিখ না কেন? ইংরেজী দিয়া শাস্ত্র শিখিতে যাও কেন? আরও অধিক দুঃখের কথা এই যে, আমাদের সংস্কৃত শিখিতে হইলেও ইংরেজী মুখে শিখিতে হয়!"

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচয়িতা Vincent Smith একজন সুযোগ্য ব্যক্তি। তাঁহার কি অভিমত শ্রবণ করুন:—"The Indian universities suffer from the want of root. They are merely cuttings,—struck down in an uncongenial soil, and kept alive with difficulty by the constant watering of a paternal Government.

As a consequence of their extraneous origin is the necessity that all instruction has to be given in the English language. Only Indian teachers can realise what an impediment to real culture is the system of making foreign language the medium of all instruction." আর একজন সুযোগ্য ব্যক্তির অভিমত শুনুন। ইঁহারও শিক্ষা সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। ইঁহার নাম Sir Henry Craik.

"We might surely endeavour to link intellectual training which we give most closely to their life and their tradition and to abandon the senseless attempt to turn an oriental into a bad imitation of a western mind. Why should we teach them that education is impossible without acquiring the English language? * * *

It is not a triumph for our education—it is, on the contrary, a satire upon it—when we find the sons of leading natives expressly discouraged by their parents from acquiring any knowledge of their vernacular."

কিন্তু বিদেশীর নিকট ধার করা বাণী সংগ্রহ করিতে যাই কেন? আমাদের দেশের জন্য যাঁহারা ভাবেন, দেশকে যাঁহারা চিনেন, যাঁহারা দেশের অশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের ভাজন, তাঁহাদের মত ত শুনিলাম। যদি আরও অভিমত সংগ্রহ করিয়া পুঞ্জীকৃত পাহাড় রচনা করা দরকার হয়, তাহাও পারি। কিন্তু তাহাতে বিরত থাকিয়া কেবল আর একটীমাত্র অভিমত উদ্ধৃত করিব। কারণ, আমার বিশ্বাস,এ অভিমতের পর অন্ততঃ সাহিত্য-সম্মিলনে আর দ্বিমত হইবে না। এ অভিমত শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের—"বিদ্যালয়ের কাজে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা, তাতে দেখিয়াছি একদল ছেলে স্বভাবতই ভাষা শিক্ষায় অপটু। ইংরেজী ভাষা কায়দা করিতে না পারিয়া যদি বা তা'রা কোনমতে এণ্ট্রেন্সের দেউড়িটা তরিয়া যায়—উপরের সিড়ী ভাঙ্গিবার বেলাতেই চিৎ হইয়া পড়ে।

এমনতর দুর্গতির অনেকগুলি কারণ আছে। একে ত যে ছেলের মাতৃভাষা বাঙ্গালা তার পক্ষে ইংরেজী ভাষার মত বালাই আর নাই। ও যেন বিলিতি তলোয়ারের খাপের মধ্যে দিশি খাঁড়া ভরিবার ব্যায়াম। তার পরে, গোড়ার দিকে ভাল শিক্ষকের কাছে ভালো নিয়মে ইংরেজী শিখিবার সুযোগ অল্প ছেলেরই হয়,—গরীবের ছেলের ত হয়ই না। তাই অনেক স্থলেই বিশল্যকরণীর পরিচয় ঘটে না বলিয়া আস্ত গন্ধমাদন বহিতে হয়;—ভাষা আয়ত্ত হয় না বলিয়া গোটা ইংরেজী বই মুখস্থ করা ছাড়া উপায় থাকে না। অসামান্য স্মৃতিশক্তির জোরে যে ভাগ্যবানেরা এমনতর কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড করিতে পারে, তারা শেষ পর্য্যন্ত উদ্ধার পাইয়া যায়—কিন্তু যাদের মেধা সাধারণ মানুষের মাপে প্রমাণসই তাদের কাছে এতটা আশা করাই যায় না, তারা এই রুদ্ধ ভাষার ফঁাকের মধ্য দিয়া গলিয়া পার হইতেও পারে না, ডিঙাইয়া পার হওয়াও তাদের পক্ষে অসাধ্য। * * *

ভালোমত ইংরেজী শিখিতে পারিল না এমন ঢের ঢের ভালো ছেলে বাঙ্গালা দেশে আছে। তাদের শিখিবার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমকে একেবারে গোড়ার দিকেই আটক করিয়া দিয়া দেশের শক্তির কি প্রভূত অপব্যয় করা হইতেছে না?"

আপত্তি উঠিবে যে, বাঙ্গালা ভাষায় পাঠ্য পুস্তক কোথা যে আমারা বাঙ্গলাকে শিক্ষার বাহন করিব? উত্তরে বলিতে চাই যে, প্রবেশিকা ও আই,এ, পরীক্ষায় তোমরা ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল ইংরেজী কেতাব পড়াও তাহার সমতুল্য গ্রন্থ বাঙ্গালাতে এখনই প্রচুর আছে। রবীন্দ্রবাবু 'শিক্ষার বাহন'. প্রবন্ধে এই আপত্তির যথেষ্ট খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার কথাগুলি শুনুন—

"আমি জানি তর্ক এই উঠিবে—তুমি বাংলা ভাষার যোগে উচ্চ শিক্ষা দিতে চাও কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় উচুদরের শিক্ষাগ্রন্থ কই? নাই সে কথা মানি, কিন্তু শিক্ষা না চলিলে শিক্ষাগ্রন্থ হয় কি উপায়ে? শিক্ষাগ্রন্থ বাগানের গাছ নয় যে, সৌখীন লোকে সখ করিয়া তার কেয়ারী করিবে,—কিম্বা সে আগাছাও নয় যে, মাঠে বাটে নিজের পুলকে নিজেই কণ্টকিত হইয়া উঠিবে। শিক্ষাকে যদি শিক্ষাগ্রন্থের জন্য বসিয়া থাকিতে হয়, তবে পাতার যোগাড় আগে হওয়া চাই তার পরে গাছের পালা, এবং কূলের পথ চাহিয়া নদীকে মাথায় হাত দিয়া পড়িতে হইবে।

বাঙ্গালায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষাগ্রন্থ বাহির হইতেছে না, এটা যদি আক্ষেপের বিষয় হয়, তবে তার প্রতিকারের একমাত্র উপায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা প্রচলন করা।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহাতে বাঙ্গালার জন্য যোগ্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হয় এবং প্রবেশিকা ও এফ, এ পরীক্ষায় যাহাতে ইতিহাস প্রভৃতির জ্ঞান বাঙ্গালায় বাহনে বিতরিত হয় তজ্জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন কতদূর চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহা বোধ হয় আপনাদের অবিদিত নাই। আপনাদের স্মরণ হইতে পারে যে,১৩০১ বঙ্গাব্দে যখন শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সাহিত্যপরিষদের সভাপতি ছিলেন, সেই সময় স্যর গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, স্যর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতিকে লইয়া এই বিষয়ের উপায় বিধান জন্য একটী কমিটী গঠিত হয়। ঐ কমিটীর আমিও একজন সদস্য ছিলাম। ঐ কমিটী অনেক আলোচনার পর নিম্নলিখিত মন্তব্যদ্বয় গ্রহণ করিয়াছিলেন :—

I. That the University be moved to adopt a regulation to the effect that at the F. A. Examiniton and in the A course of the B. A. Examinition, where a classical language is taken as the third subject, one paper should be set containing—(i) passages in English for translation into one of the vernaculars of India, recognised by the Senate, and—(ii) a subject for original composition in one of the said vernaculars, text-books being recommended as models of style.

II. That the University be moved to adopt a regulation to the effect that in History, Geography and Mathematics at the Entrance Examination, the answer may be given in any of the living languages recognised by the Senate."

কমিটির মন্তব্যপরিষদ্ কর্ত্তৃক গৃহীত হইবার পর পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর বিশ্ব বিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের নিকট এক পত্র প্রেরণ করেন। ঐ পত্রে দত্ত মহাশয় এইরূপ লিখিয়াছিলেন।

"In accordance with the resolution of the

Parishad just referred to, I beg, under para. 12 of the Bye-laws relating to the Syndicate, to propose for the consideration of the Syndicate the following regulation :—

That at the F. A. Examination and at the B. A. Examinition in the A course where a classical language is taken as the third subject, a paper be set containing (i) passages in English for translation into one of the vernaculars of India recognised by the Senate, (ii) a subject of original composition in one of the said vernaculars, text-books being recommended as models of style.

And I beg further to request that the Vice-Chancellor and the Syndicate will be pleased to consider how far under present circumstances the second recommendation referred to in the preceding paragraph may be given effect to"

বলা বাহুল্য যে, এই উদ্যম সফল হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের যাঁহারা ঐ সময়ে হর্ত্তা কর্ত্তা ছিলেন, দ্বিতীয় প্রস্তাব তাঁহারা বিবেচনার অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। প্রথম প্রস্তাব সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদের পর মহাপ্রাজ্ঞ সেনেট-মণ্ডলী ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ শে জানুয়ারী এইরূপ স্থির করেন যে, এফ এ ও বি এর পরীক্ষার্থীদিগকে বাঙ্গালা রচনা সম্বন্ধে বিকল্প দেওয়া হউক এবং সুযোগ্য পরীক্ষার্থীদিগকে একখানা করিয়া সার্টিফিকেট দেওয়া হউক। * ইহার কিছুদিন পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিবার জন্য লর্ড কর্জ্জন সম্মার্জ্জনী হস্তে আসরে অবতীর্ণ হন। তিনি যে ইউনিভারসিটি কমিশন নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ১৯০২ সালে প্রকাশিত রিপোর্টের ৯৪-৯৫, প্যারায় দেশীয় ভাষাসমূহের প্রতি কিছু কৃপা-কটাক্ষ দৃষ্ট হইয়াছিল। "The vernacular languages should be introduced in combination with English as a subject for the M. A. Examination. The M. A. Examination in the vernacular should be of such a character as to ensure a thorough scholarly study of the subject. The encouragement of such study by graduates who have completed their general course should be of great advantage for the cultivation and development of vernacular languages." পুনশ্চ :—We hope that the inclusion of vernacular languages in the M. A. course will give an impetus to their scholarly study, and * * * we consider that the establishment of professorships in the vernacular languages is an object to which university funds may properly be devoted. We also think that vernacular composition should be made compulsory in every stage of the B. A. course, although there need be no teaching on the subject. Further encouragement might be given by the offer of prizes for literary and scientific books of merit in the vernacular languages." ইহার পর ১৯০৪ সালের এক

* An optional examination be held in original composition in Bengali and other vernaculars for the F. A. and B. A. candidates, proficiency in it entitling candidates to a special certificate. (Minutes of the Calcutta University 1895—96 p. p. 63—64 and 1896—97 p. p. 288—90 & p. 38—59.

গবর্ণমেণ্ট মন্তব্যে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, ১৩ বৎসরের অনধিক বয়স্ক শিক্ষার্থীদিগকে ইংরাজীদ্বারা শিক্ষা দেওয়া অনুচিত, এবং ইহাও বলা হয় যে, প্রবেশিকা স্কুলের ছাত্রদিগকে মাতৃভাষা শিক্ষা হইতে একেবারে বঞ্চিত করা অনুচিত। বিস্ময়ের কথা নহে কি? এই স্বতঃসিদ্ধ কথাও গবর্ণমেণ্ট মন্তব্যের দ্বারা প্রচারিত করিতে হইল। আমাদের দেশের অনেকই বিশেষত্ব, কিন্তু বোধ হয় সকলের চেয়ে বিশিষ্ট বিশেষত্ব ইহাই।

ইহার পর প্রধানতঃ স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় বাঙ্গালা ভাষার একটু বিশিষ্ট স্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রণালীর এক কোণায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এখন প্রবেশিকা, এফ্-এ, বি-এ পরীক্ষার্থী সকল বাঙ্গালী ছাত্রকে বাঙ্গালা-রচনা বিষয়ে পরীক্ষা দিতে বাধ্য করা হয়। এবং রচনার রীতি শিখাইবার জন্য models of style রূপে কয়েকখানি পুস্তকের নাম নির্দ্দেশ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে বাঙ্গালা কবিতার কোনও বই পাঠ্য পুস্তক হইতে পারে না। এমন কি বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যও কোন পরীক্ষার বা প্রশ্নপত্রের বিষয় হয় না। এ সম্বন্ধে স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় যাহা করিয়াছেন তজ্জন্য আমরা সকলেই কৃতজ্ঞ। জানি লোহার বাসরঘরে ছুঁচ লইয়া ঢোকাও শক্ত; কিন্তু ইহাতে আমরা সন্তুষ্ট নহি। এ যেন বড় মানুষের ভোজের টেবিলে দরিদ্র আত্মীয়ের ধিকৃত কষ্টাসন। সেইজন্য আপনাদের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় 'বাঙ্গালার কথায়' দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন—"আমি শুনিয়াছি, উদ্দেশ্য—শুধু বাঙ্গালা লিখিবার রীতি শিখান হইবে, আর কিছু হইবে না। এ কথা শুনিয়া আমি অবাক্ হইয়াছিলাম। বাঙ্গালা ভাষার যে অশেষ সম্পদ, তাহাতে কি বাঙ্গালী ছাত্রের কোন আবশ্যক নাই? বাঙ্গালা ভাষার যে অনন্ত সৌন্দর্য্য আছে, বাঙ্গালা সাহিত্যের যে একটা অতল প্রাণ আছে, সে কথা ভুলিয়া গিয়া কি আমাদের শিক্ষা প্রণালী নির্দ্ধারিত করিতে হইবে? আমার বাঙ্গালা ভাষা যে রাজরাণী, আপনার গৌরবে, সে যে গৌরবিণী। এই যে তোমরা বল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা প্রবেশ করিয়াছে, মনে রাখিয়ো, তাহার যে নিজস্ব গৌরব, সে গৌরবে তাহাকে প্রবেশ করিতে দাও নাই, সামান্যা দাসীর মত তোমাদের এই কারখানার মধ্যে একটা কোণায় তাহাকে বসিবার একটু ঠাঁই দিয়াছ মাত্র।"

আমি জানি কেহ কেহ অল্পেই সন্তুষ্ট। তাঁহারা বলেন "নেই মামার অপেক্ষা কাণা মামা ভাল। অল্পেই তুষ্ট হও বেশীর তৃষ্ণা ত্যাগ কর"। একথা কিন্তু এদেশের শিক্ষা দীক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরা কখনই অল্পে সন্তুষ্ট হইব না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বলিয়া গিয়াছেন—"ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি"। আমরা ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া এখনও বলি "মারি ত হাতী"। সেইজন্য দেখিতে পাই, পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনে সাহিত্য-সম্মিলন অল্পে তুষ্ট না হইয়া অধিক পাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বর্দ্ধমানে অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্য-বিবরণীতে দেখিলাম প্রায় সর্ব্ব সম্মতি মতে নিম্নলিখিত মন্তব্যটি গৃহীত হইয়াছিল। "বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের প্রসারের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে সকল বিধি-ব্যবস্থা হইয়াছে, তজ্জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণকে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন ধন্যবাদ জানাইতেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য- সম্মিলনের বিশ্বাস,—বর্ত্তমান সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের যথাসম্ভব আরও প্রসার বৃদ্ধি হওয়া সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি আপাততঃ সত্বর অবলম্বন করিবার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করিতেছেন।

(ক) প্রবেশিকা হইতে বিএ শ্রেণী পর্য্যন্ত ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষার ন্যায় বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালা-সাহিত্য পঠন-পাঠনের এবং ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষার পরীক্ষার ন্যায়

বাঙ্গালা ভাষারও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(খ) প্রবেশিকা ও ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্য ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে বাঙ্গালায় লিখিতে পারিবে।

(গ) অধ্যাপকগণ ইচ্ছা করিলে কলেজে বাঙ্গালা ভাষায় অধ্যাপনা করিতে পারিবেন।

(ঘ) বাঙ্গালা ভাষা ও তৎসংক্রান্ত ভাষাবিজ্ঞান এম এ পরীক্ষার শিক্ষার বিষয় বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঙ) দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করাইবার ও সেই সমস্ত বক্তৃতা গ্রন্থাকারে ছাপাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

সুখের বিষয় এ সম্বন্ধে রাজপুরুষদিগের সকরুণ দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে। বিগত আগষ্ট মাসে সিমলা-শৈলে শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষগণের যে সম্মিলন হয়, সেই সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে আমাদের বড়লাট বাহাদুর লর্ড চেমস্‌ফোর্ড এইরূপ বলিয়াছিলেন :—

Lastly I come to the subject of the media of instruction. As you all know the vernaculars and English are both the media of instruction in our schools and it is sometimes overlooked to what a large extent the vernacular figures at the present time as a medium of instruction. But it is certainly worth our while to examine from the educational standpoint what the relative position of these media should be to each other, having in view the one object viz, that the pupil should derive the greatest possible advantage from his schooling. * * * I recognise the value of large and generous ideals in the sphere of education, but we must never forget the need from time to time of examining and making sure of our foundations. And what more important, what more practical task in this connection could be laid upon yon than the duty of devising means whereby students may be enabled to obtain a better grasp of the snbjects which they are taught and to complete their secondary course with more competent knowledge than at present ?

বড়লাট এই সকল বাণীতে উৎসাহিত হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ বিগত জ্যৈষ্ঠমাসে স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রভৃতিকে লইয়া একটী শাখা-সমিতি গঠিত করেন। আমিও ঐ শাখা-সমিতির একজন সভ্য আছি। শাখা-সমিতির আলোচ্য বিষয় এই ছিল যে, "উচ্চশিক্ষা বিস্তারের কোন প্রকার ক্ষতি না হয় অথচ বঙ্গভাষায় উচ্চশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা যাহাতে রীতিমত হয় এবং ক্রমে ক্রমে যাহাতে বঙ্গভাষা রীতিমত পুষ্টিলাভ করিয়া পরিণামে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা-প্রদানের উপযোগী হইতে পারে, ইহার জন্য আমাদের বর্ত্তমানে কি কর্ত্তব্য ?" শাখা-সমিতি বহু আলোচনার পর যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন নিম্নে তাহা বিবৃত করিলাম :—

(১) শিক্ষা বিষয়ে বঙ্গভাষার উন্নতি ইংরেজী শিক্ষার বাধাজনক হইতে পারে এবং যে সকল বিষয়ে উচ্চ-শিক্ষা ইংরাজীতে লাভ করা যাইতেছে ও যাইতে পারে, সে সকল শিক্ষা সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ বাধা হইতে পারে—এ আশঙ্কা অমূলক।

(২) কি নিম্ন, কি উচ্চ সকল প্রকার শিক্ষাই যতদূর সাধ্য শিক্ষার্থীর মাতৃ-ভাষাতে দেওয়া উচিত। যতদূর দেখা যাইতেছে তাহাতে ইহা নিঃসন্দেহরূপে নির্দ্দেশ করা যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত

ইংরেজী সাহিত্য ভিন্ন আর সকল বিষয়েই বাঙ্গালা ভাষাতে আবশ্যক গ্রন্থের কোন অভাব নাই এবং পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পর ভাষা-বিভ্রাটেরও আর কোন আশঙ্কা নাই। মধ্য (Intermediate) পরীক্ষাতেও অধিকাংশ বিষয়েরই আবশ্যক গ্রন্থের অভাব নাই। আর যে যে বিষয়ের গ্রন্থের অভাব আছে, তত্তদ্‌বিষয়ের গ্রন্থের অভাব সহজেই পূরণ হইতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সম্পূর্ণ বাঞ্ছনীয় এবং সে বাঞ্ছা পূর্ণ হইবার কোনও বাধা দেখা যায় না যে, বি এ, এম এ পরীক্ষার বিষয়ও একদিন বাঙ্গালা ভাষাতে বাঙ্গালী শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে। দুই বৎসর পরে হউক, আর ৫ বৎসর পরে হউক, বাঙ্গালা ভাষাতেই সমস্ত উচ্চশিক্ষার বিষয় অধীত হইবে—এই ঘোষণা কর্ত্তৃপক্ষ-কর্ত্তৃক একবার প্রচারিত হইলে অল্প দিনের মধ্যেই সুযোগ্য গ্রন্থকারের লিখিত নানা বিষয়ের সদ্‌গ্রন্থ প্রচুর পরিমাণে রচিত হইবে।

(৩) আর একটি বিষয়ে বক্তব্য এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বাঙ্গালা ভাষা কেবল রচনা শিক্ষার জন্য এক্ষণে পঠিত হয়। সে নিয়মের পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য উভয় বিষয়ই পঠিত হয় ও উভয় বিষয়েই পরীক্ষা হয়, ইহা প্রয়োজনীয়।

(৪) এম্‌ এ পরীক্ষাতে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য, বঙ্গ-ভাষাতত্ত্ব এবং বঙ্গ-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস প্রভৃতি পরীক্ষার বিষয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(৫) বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিকল্পে আমাদের শেষ বক্তব্য এই যে, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে উপযুক্ত কৃতবিদ্য ব্যক্তি দ্বারা উচ্চশিক্ষা বিস্তারোপযোগী বক্তৃতা বঙ্গভাষায় প্রদানের প্রথা—যাহাতে আরও অধিকতর বিস্তৃতি লাভ করে, ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

এ সম্পর্কে এই সাহিত্য-সম্মিলনের কিছু কর্ত্তব্য আছে কি না, সমবেত সুধীবর্গ তাহার বিচার করিবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত উপাধি-বিতরণ উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভাইস চ্যান্সলার ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত Research বা অনুসন্ধান কার্য্য যে বাঙ্গালাতেই হওয়া উচিত, এই সম্বন্ধে কয়েকটি যুক্তিযুক্ত কথার অবতারণা করিয়াছিলেন। সে কথাগুলি আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

"With the field of research daily expanding, the question of its vehicle must come to the fore. No country has done real research work on a large scale and with lasting results, that has been handicapped by the language difficulty, as we have been. Though a knowledge of other languages, preferably modern, is essential for research, and though results of research in many subjects, may, for the time being have to be published in English, the place of vernrculars with regard to many other subjects, must be clearly and at once recognised. We have begun recognition of the vernacular at one end and have done well so far. Unless, however, we recognise and encourage it at the other end, neither it nor research will really thrive. This is a larger bid, in some sense, on behalf of our vernaculars than has hitherto been made; but I hope it is not unreasonable, uor untimely.

সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকটর আমাদের গভর্ণর লর্ড রোণাল্‌ডশে মহোদয় বিশ্বয় মুখে কয়েকটি আশার বাণী শুনাইয়াছেন।

"The first fundamental fact that stares one in the face is that in India all higher education is imparted in a language which is not the student's mother tongue. I am not going to

enter into the well worn controversy as to whether University teaching should be in the vernacular or in English; so far as that goes, I take things as I find them; and, assuming that the medium for imparting Western learning must be the English language, I made early enquiries as to what steps were taken to give the Indian boy a sound working knowledge of the English tongue. The general tenour of the replies which I received to my enquiries was that English is the worst taught subject in our secondary schools. I have found, indeed, a disconcerting consensus of opinion to this effect and I also found this general view endorsed by the Dacca University Committee, from whose report I learned that though the young undergraduate must be treated as a University student, and not as a school boy, yet he is hardly ripe for a course of true University lectures, nor in many cases is his knowledge of English sufficient to enable him to profit by them."

শুনিতেছি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশোধন জন্য যে কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে, আমাদের বিগত সম্মিলনের সভাপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যাহার এক জন প্রতাপী সভ্য—সেই কমিশন বাঙ্গালাকে শিক্ষার বাহন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। কমিশনের সদস্যদিগের মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, তাঁহাদের শিরে বিধাতার আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক। আমরা তাঁহাদের আশাপথ চাহিয়া রহিলাম। কালিদাসের সময়ে আশা-বন্ধ কুসুমসদৃশ সদ্যঃপাতী প্রণয়ী হৃদয়কে বিপ্রয়োগে নিরুদ্ধ রাখিত। এখন ইহা দুঃশিক্ষা পীড়িত সাত কোটী নরনারীর অবসন্ন হৃদয়কে সঞ্জীবিত করিবে।

শিক্ষালয় ও শিক্ষা-প্রণালী।

কিন্তু শুধু বাঙ্গালাকে শিক্ষার বাহন করিলেও চলিবে না—শিক্ষালয়গুলির আব্‌হাওয়া বদ্‌লাইতে হইবে, শিক্ষা-প্রণালীর আমূল সংস্কার করিতে হইবে। এখনকার স্কুল-কলেজ নামধেয় বিদ্যাবিপণিগুলিকে বিদ্যামন্দিরে—অন্ততঃ বিদ্যালয়ে পরিণত করিতে হইবে, এবং তাহার অঙ্গনে প্রাচীন ভারতের গুরুশিষ্যের মধুর সম্বন্ধের মিষ্ট বাতাস প্রবাহিত করিতে হইবে, এবং শান্ত তপোবনের মুক্ত আকাশ বিলম্বিত করিতে হইবে। দেখুন, অশ্রদ্ধার দানে দাতা ও গ্রহীতা—উভয়েই পতিত হয়। আমাদের ছাত্রেরা যে ইঁহাদের প্রদত্ত বিদ্যা গ্রহণ করিতে পারিতেছে না, তাহার অন্যতম কারণ শিক্ষকের প্রতিকূল ভাব। পূর্ব্বকালে শিক্ষক সেবক ছিলেন—বিদ্যাকে সেবার ভাবে শ্রদ্ধার সহিত সম্ভ্রমের সহিত সংযমের সহিত ভয়ের সহিত দান করিতেন। 'শ্রদ্ধয়া দেয়ং হ্রিয়া দেয়ং ভিয়া দেয়ং সংবিদা দেয়ং অশ্রদ্ধয়া ন দেয়ম্'। সেই জন্য বিদ্যা বিদিতা হইয়া ছাত্রকে গরীয়ান্ করিত।

আচার্য্যাদ্ধৈব বিদিতা বিদ্যা সাধিষ্ঠং গময়তি।

কিন্তু এখন? কদর্য্য দাতা যেমন অবজ্ঞার সহিত ভিক্ষুককে মুষ্টিভিক্ষা দেয়, অনেক স্থলে বিদেশী অধ্যাপক তেমনি অবজ্ঞায় ছাত্রদিগকে বিদ্যার ক্ষুদ বিতরণ করেন। আমরা একজন অধ্যাপকের নিকট পড়িতাম। তিনি প্রকাণ্ড পণ্ডিত ছিলেন—কত বিদ্যা তাঁহার বিশালোদরে নিহিত ছিল, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কিন্তু তিনি কোন দিন আমাদের মুখের দিকে তাকান নাই—তাঁহার চক্ষু সর্ব্বদা স্বীয় বুটের উপর সংলগ্ন থাকিত—কদাচিৎ কেতাবের উপর পড়িত—কিন্তু কোন কারণে কোনদিন আমাদের উপর পড়ে নাই। আমরা সে সময়ে রঘুবংশে বাল্মীকির তপোবন হইতে আনীতা সীতার বর্ণনা পড়িতাম—'কাষারপরিবীতেন স্বপদার্পিতচক্ষুষা', এবং মনে

মনে তাঁহার সহিত আমাদের অধ্যাপকের তুলনা করিতাম। ইনি যদিও 'কাষায়-পরিবীত' ছিলেন না, কিন্তু সর্ব্বদাই 'স্বপদার্পিতচক্ষু' থাকিতেন।

এই শ্রদ্ধার ও অশ্রদ্ধার দান লইয়া একবার দেবলোকে তুমুল কলহ হইয়াছিল। শ্রোত্রিয়ের অশ্রদ্ধার দান বড়, না পতিতের শ্রদ্ধার দান বড়। উভয় পক্ষের বক্তৃতার পর ভোট লওয়া হইল। দেখা গেল, দুই দিকের ভোট-সংখ্যা সমান। তখন দেবলোকের সভাপতি প্রজাপতি ঠাকুর উঠিয়া বলিলেন, "মা কৃধ্বং বিষমং সমম্"। অসমান জিনিসকে সমান করিও না—কারণ, "শ্রদ্ধাপূতং বদান্যস্য হতমশ্রদ্ধয়েতরৎ।" পতিতের শ্রদ্ধাপূত দান শ্রোত্রিয়ের অশ্রদ্ধার দেওয়া হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ। আমরাও এই কথা বলি। আমরা দিগ্‌গজ পণ্ডিতের অশ্রদ্ধায় বিদ্যা-বিতরণ চাই না, অপণ্ডিতের শ্রদ্ধাপূত দানই আমাদের শিরোধার্য্য।

আরও দেখুন, প্রাচীনকালে গুরু চাহিতেন যে, যেমন দিক্ বিদিক্ হইতে নদনদী আসিয়া সমুদ্রে মিলিত হয়, সেইরূপ দশদিক্ হইতে ব্রহ্মচারী আসিয়া তাঁহার আশ্রমে মিলিত হউক।

"যথাপঃ প্রবতা যন্তি যথা মাসা অহর্জরং
তথা মা ব্রহ্মচারিণঃ ধাতর্ আয়ান্তু সর্ব্বতঃ"।

আমরা কিন্তু বিদেশী ভাষার এবং বিকট রেগুলেশনের লৌহময় প্রাচীর রচনা করিয়া শত প্রকার-বেষ্টনীর মধ্যে বিদ্যা-বধূকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছি। যদি কোন দিগ্‌বিজয়ী বীর ঐ সকল আয়সী পুরী ভেদ করিয়া অন্তর্গৃহে প্রবেশ করিতে পারে, তবে সে হয় ত বিদ্যার চকিত চমৎকৃতি কোন দিন প্রত্যক্ষ করিবে।

এ দেশে যদি বিদ্যার প্রকৃত আবাদ করিয়া সোনা ফলাইতে হয়, এবং সেই সোনার অলঙ্কার রচনা করিয়া বঙ্গবাণীর বর অঙ্গের শোভা-বর্দ্ধন করিতে হয়, তবে বর্ত্তমানে প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালীর হাব-ভাব আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। এবং ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে ইয়ুরোপের বিশেষত্ব-বর্জ্জিত হীন অনুকৃতি না করিয়া ইহাকে ভারতীয় বিদ্যা, ভারতীয় ভাব, ভারতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান, ভারতীয় সাহিত্য ইতিহাস দর্শন-চর্চ্চার কেন্দ্রস্থান করিতে হইবে। ইহার অর্থ এরূপ নয় যে, আমরা পাশ্চাত্য culture হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন ও বিযুক্ত করিব। আমরা ইয়ুরোপের সাহিত্য, দর্শন, কলা-বিদ্যা, সমাজতত্ব, শিক্ষাতত্ব, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রভূত পরিমাণে শিক্ষা ও গ্রহণ করিব। কিন্তু পূর্ব্বকালে যেমন করিয়া গ্রীক্, হুণ, শক, পহ্লব প্রভৃতিকে আপনাদিগের মধ্যে হজম করিয়াছিলাম, সেইরূপ পাশ্চাত্য বিদ্যা ও জ্ঞানকে গ্রাস করিয়া আত্মসাৎ করিয়া ফেলিব। তাহারা আমাদের 'ওদন' হইবে, 'উপসেচন' হইবে, তাহারা এখনকার মত আমাদিগকে অভিভূত পরাভূত করিতে পারিবে না। ঐ সকল বিদ্যা ও কলাকে আমাদের ভারতী সরস্বতীর সম্রাজ্ঞী হইতে দিব না, শুদ্ধদাসী করিয়া রাখিব।

এ সম্বন্ধে কয়েকজন অভিজ্ঞ ইংরাজের উক্তি ও উপদেশ আপনাদিগকে শুনাইতে চাই। আপনারা দেখিবেন-যে, আমরা যাহা অবাধে উপেক্ষা করি, দূরদৃষ্টিশীল এই সকল বিদেশীয়েরা তাহাকে কি চক্ষে দেখে। প্রথম সার জর্জ বার্ডউড্-এর কথা শুনুন। তিনি অনেক দিন বোম্বাই প্রদেশে বাস করিয়াছিলেন, এবং ভারতীয় শিক্ষা দীক্ষার সহিত সুপরিচিত ছিলেন।

"I hail with delight any symptom of the spontaneous revival of the indigenous and traditional, literary and artistic, and philosophical and religious life of India—India of the Hindus. The first thing to do is to take the whole of your higher education more into your own hands. * * Science is almost the exclusive creation of modern Europe. It is to modern Europe, therefore, that you

must directly look for your scientific culture, and in the present economic condition of India, you cannot have too much pure and applied (technical) scientific instruction in all your schools, primary, secondary and higher. But for your literary and artistic and your philosophical and religious, in a word, your spiritual culture, you already possess your own—the indigenous growth of 4000-years of Aryan supremacy in India; and you must never surrender it, but to the utmost of your ability and power, strengthen it and extend its influence."

বোম্বাইএর ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড সিডেনহ্যাম—যিনি সম্প্রতি ইঙ্গ-ভারতীয় সভা প্রতিষ্ঠা করিয়া আমাদের বিদেহ-মুক্তির ব্যবস্থা করিতেছেন—তাঁহার একটা উক্তি আপনাদিগকে শুনাইব।—

"We cannot, by education, transform the intellect of an ancient people or reconstruct their tastes and opinions in exact accordance with foreign models. Even if such proceedings were practicable, it would be eminently undesirable, because a process of artificial conversion, which takes no account of inherent genius and aptitude, is more likely to injure than to elevate a native population."

এই উক্তির মধ্যে দুইটা খুব দরকারী শব্দ আছে—"artificial conversion"। আমাদের ছাত্রমণ্ডলীর যেটা বিশিষ্ট ব্যাধি—বিদ্যা-অজীর্ণ (mental dyspepsia) তাহার নিদান এইখানে। বহুবিধ ভোজন দ্বারা একটা সমগ্র জাতিকে কখনও পীন ও পুষ্ট রাখা যায় না।

আর এক জন অভিজ্ঞ ইংরেজের কথা শুনাইব—ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ। অন্য প্রসঙ্গে ইঁহার কথা একবার বলিয়াছি, তাঁহার কথাগুলি অতি সারগর্ভ এবং আমাদের সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বিশ্ববিদ্যালয় কেন দেশের হৃদয়ে শিকড় গাড়িয়া সজীব মহীরুহে পরিণত হইতেছে না, তাহার কারণ আমরা ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ মহোদয়ের কথার মধ্যে পাইয়াছি। গাছের ডাল কাটিয়া যদি ঊষর ভূমিতে প্রোথিত কর, তবে রাজকীয় জলসেক দ্বারাও তাহার কিছু বিকাশ হইবে কি?

"When an Indian student is bidden to study Philosophy, he should not be forced to try and accommodate his mind to the unfamiliar forms of European speculation, but should be encouraged to work on the lines laid down by the great thinkers of his own country, who may justly claim equality with Plato, Aristotle and Kant.

The lectures and examinations in Philosophy for the student of an Indian Unversity should be primarily on Indian Ethics and Metaphysics, the European systems being taught only for the sake of contrast and illustration. So far as I know, the courses prescribed by the Indian Universities are not on these lines. * * * * * History too, should be treated in the same way, and be approached from the Eastern, not the Western side. This change also would impose no small strain on the present staff, and require extensive alterations in the prescribed books and in the whole spirit of the teaching. It is useless to ask an Indian

University to reform itself, because it does not possess, the power. Some day perhaps, the man in power will arise, who is not hide-bound by the University traditions of his youth, who will perceive that an Indian University deserving of the name must devote itself to the development of Indian thought and learning, and who will care enough for true higher educatiou to establish *a real University in India.*"

আমরা ঐরূপ শক্তিধর মহাপুরুষের আশাপথ চাহিয়া আছি—যাঁহার আগমনে ভারতবর্ষে প্রকৃত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে, এবং যিনি ভারতবাসীর স্থগিত ভাবধারা এবং স্তম্ভিত চিন্তাস্রোতকে আবার গতি দান করিবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত উপাধি-বিতরণ উপলক্ষে রেক্টর মহোদয় লর্ড রোণাল্ডসে ইউনিভারসিটী কর্তৃক ভারতীয় দর্শনের বয়কট্ প্রসঙ্গে এরূপ কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন, যাহাতে আমাদের হৃদয়ে কিছু আশার সঞ্চার হইয়াছে।

"Now let me touch on only one other feature which caused me some surprise. I have made some attempt when visiting the colleges of Bengal to ascertain which subjects are the most popular with the students. The result of such limited enquiries as I have been able to make seem to show that philosophy takes a high place in general favour. I am not surprised at that, for the genius of India has always lain in the direction of abstract speculation. What did surprise me was to learn that up to the B. A. degree Indian philosophy finds no place in the curriculum. It is Western philosophy only that is taught. And it is only those who proceed with their studies beyond the B. A. degree, who receive at the hands of their University a draught from those springs of profound philosophic thought which have welled up in such rich measure from the intellectual soil of their own country. Frankly, that strikes me as a stupendous anomaly.

For him the study of the systems would surely be a task of love and burning interest—a study of things congenial to his national genius. Yet he may leave his own University after taking a course of philosophy as one of his subjects (and indeed if he pursues his studies no further than the B. A. degree will do so) without so much as hearing of these things. That an Indian student should pass through a course of philosophy at an Indian University without even hearing mention of shall I say Sankara the thinker who perhaps has carried idealism farther than any other thinker of any other age or country or of the subtleties of the Nyaya system which has been handed down through immemorial ages and is to-day the pride and glory of the Tols of Navadwip—does indeed appear to me to be a profound anomaly. I should have expected to find the deep thought of India, which has sprung from the genius of the people themselves, being discussed and taught as the *nor-*

nal course in an Indian University ; and the speculations and systems of other peoples from other lands introduced to the students at a later stage after he has obtained a comprehensive view of the philosophic wisdom of his own country."

লর্ড রোণাল্ডসে যাহাকে stupendous anomaly বলিলেন, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই বিরাট বেখাপ্পাটা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপুরুষদের চক্ষে এতদিন পড়ে নাই। একেই বলে চক্ষু থাকিতে অন্ধ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও রেক্টর মহোদয়ের উক্তিতে উৎসাহিত হইয়া কেহ কেহ আশা করিতেছেন যে, হয় ত এবার একটা কিছু সদুপায় হইবে। এই সকল উক্তি লক্ষ্য করিয়া ভূতপূর্ব্ব ভাইস্-চ্যান্সেলর মহোদয় সেদিন কলিকাতার এক সভায় বলিয়াছিলেন যে, ঐদিন বোধ হয় অদূরবর্ত্তী, যে দিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় ভাবে ভাবিত হইবে, এবং জাতীয় সৌরভে বাসিত হইবে। বিধাতা সেই শুভ দিন শীঘ্র আনয়ন করুন।

ইতিমধ্যে কিন্তু আমাদের কয়েকটী করণীয় আছে। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিগত অধিবেশনে বলিয়াছিলেন যে,—"বঙ্গের যে অশিক্ষিত জনরাশি, তাহাদের মধ্যে যাহাতে শিক্ষার আলোকচ্ছটা নিপতিত হয়, উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত সুধীমণ্ডলীর পার্শ্বে যাহাতে বঙ্গের নিরক্ষর জনসঙ্ঘ আসিয়া অকুতোভয়ে ও অসঙ্কোচে দাঁড়াইতে পারে, তাহা যতদিন না করিতে পারিব ততদিন আমাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।" এরূপ করিতে হইলে প্রথমেই আমাদের সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষার বিবাদ মিটাইতে হইবে। আমরা "কোকিলকলালাপবাচাল যে মলয়াচলানিল সে উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছনির্ঝরাম্ভঃকণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে"— ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের এরূপ বাঙ্গালা চাই না—"আমি ল্যাণ্ডো গাড়ীতে ড্রাইভ করিতে করিতে হাওড়া ষ্টেসনে পৌঁছিয়া বেনারসের জন্য বুক করিলাম, ফার্ষ্ট ক্লাসে লোয়ার বার্থ ভেকান্ট ছিল না, আপার বার্থে বেডিংটা স্প্রেড্ করিয়া একটু সর্ট ন্যাপ নিবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় হুইসিল দিয়া ট্রেণ ষ্টার্ট করিল" —এইরূপ ইঙ্গ-বঙ্গীয় ভাষাও আমরা চাই না। এবং "মোরা হলাম পত্তিবাসী, সারাখুণ্ডি যাওয়া আসা কত্তি লেগেচি, নুন না থাক্‌লি নুন চেয়ে আনচি, তেলপলাড়া তেলপলাড়াই আন্‌লাম, ছেলেডা কান্তি নাগ্‌লো গুড় চেয়ে দেলাম ;—বসিগার বাড়ী সাত পুরুষ খেয়ে মোরা আর ওনাদের খবর থাকি নে।"—সাহিত্যের জন্য এইরূপ গ্রাম্য ভাষাও চাই না। আমরা চাই এমন ভাষা, যাহা সাধু হইবে অথচ সরল হইবে, চলিত হইবে, অথচ ইতর হইবে না। এই মধ্যপথ অবলম্বন করিলে কিরূপ হয়? এ সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বর্দ্ধমানে আমাদিগকে যাহা উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ রাখা ভাল। "দেশের লোকে যে সকল শব্দ বুঝে, অথচ সত্য সত্য ইতুরে কথা নয়, যে সকল কথা ভদ্রলোকের কাছে বলিতে আমরা লজ্জিত হই না, সেই সকল কথায় মনের ভাব ব্যক্ত করিলে লোকে সহজে বুঝিতে পারিবে, ভাষাও ভাল হইবে।" আর একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে এই ধরণের কথাই বলিয়াছিলেন। "সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে কথোপকথনের ভাষার যত নৈকট্য থাকে, যত ঘনিষ্ঠতা থাকে, ততই ভাল ; দুইএর অন্তর যত অধিক হয় ততই মন্দ। বিচ্ছেদ হইলে কেহ কাহারও উপকার করিতে পারে না ; একই ভাষা ক্রমে দুইটি পৃথক্ ভাষা হইয়া দাঁড়াইতে পারে। তাহাতে কেবল যে ভাষার অনিষ্ট তাহা নহে, সমাজেরও বিশেষ অমঙ্গল ঘটিবার আশঙ্কা হয়।" ইন্দ্রনাথ বাবুর শেষ কথাটা মনে রাখিবার কথা। শিক্ষা ও সাহিত্যকে যদি লোকায়ত্ত করিতে হয়, তবে লিখিত ভাষা ও চলিত ভাষার মধ্যে একটা পদ্মার প্রবাহ সৃষ্টি করিলে চলিবে না। এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বাকল্ সাহেব অনেক দিন

হইল আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কথার উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে বলিয়াছিলেন,—"মহামতি বাকল্ ইংলণ্ড ও জার্ম্মাণ দেশের শিক্ষাবিস্তার তুলনা করিতে গিয়া দেখাইয়াছেন যে, জার্ম্মাণদেশে সর্ব্ববিদ্যায় অসামান্য প্রতিভাশালী লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অথচ রাজনৈতিক উন্নতি বিষয়ে ইংলণ্ড অপেক্ষা পশ্চাৎপদ। ইহার কারণ এই যে, জর্ম্মাণদেশীয় পণ্ডিতগণ চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া এমন এক "পণ্ডিতী" ভাষার সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তাহা কেবল সঙ্কীর্ণ 'গণ্ডীর' মধ্যে সীমাবদ্ধ; সে সমস্ত উচ্চভাব সমাজের নিম্নতম স্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে না। ইহার ফল এই হইয়াছে যে, মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায় ও জনসাধারণের মধ্যে একরূপ একটি অনতিক্রম্য প্রাচীর স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডে বহুকাল হইতে বিজ্ঞানবিষয়ক সাধারণের বোধগম্য অনেক সরল পুস্তক প্রকাশিত হওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে তাহার ভাব ও স্থূলমর্ম্ম প্রবেশ করিতে পারিয়াছে। এই প্রকার শ্রেণীগত পার্থক্য আমাদের অত্যধিক প্রবল।"

সঙ্গে সঙ্গে টোলের প্রচলিত সংস্কৃতশিক্ষার সঙ্গে বাঙ্গালা শিক্ষার মিশ্রণ ও মিলন করিতে হইবে। সংস্কৃতশিক্ষিত পণ্ডিতমণ্ডলী যে নবীন জ্ঞানে বঞ্চিত থাকিবেন, এবং গরীয়সী বঙ্গবাণীকে তাঁহাদের বিমাতা ভাবিয়া বিমুখ ভাব অবলম্বন করিবেন, ইহা নিতান্ত ক্ষোভের কথা। আমরা জানি, তাঁহাদের মধ্যে কেহ সেদিনও বঙ্গভাষা যে ভাবাপদের বাচ্য নহে, তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য নব্য ন্যায়ের পাঁয়তারা করিয়াছেন। কিন্তু এমন পণ্ডিতও বিরল নহেন, যিনি সংস্কৃত-ভারতীর সহিত মাতৃভাষারও পূজা করেন। আমরা চাই যে, টোলের সংস্কৃত-বিদ্যার্থীকে বাঙ্গালার সাহায্যে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি কিছু কিছু পড়ান হয়; এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের গদ্য পদ্যের অমৃতধারায় অভিষিক্ত হন। সংস্কৃতই তাঁদের তপস্যার নিধি থাকুক, কিন্তু তাঁহারা যেন দেশমাতৃকার সেবা হইতে একবারে বঞ্চিত না হন।

পরিভাষা-সঙ্কলন।

সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ সাহিত্যের প্রসার ও সমৃদ্ধির জন্য আমাদিগকে নূতন শব্দ গড়িতে হইবে। বিশেষতঃ বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে। এ সম্বন্ধে সাহিত্য-সম্মিলন হইতে পূর্ব্বে পূর্ব্বে কতক চেষ্টা ও আয়োজন হইয়াছে। সেই আয়োজন এখন সম্পূর্ণ করিবার সময় আসিয়াছে। দর্শনের পরিভাষা-সঙ্কলন সম্বন্ধে আমি বর্দ্ধমান-সম্মিলনে যাহা বলিয়াছিলাম, সে সম্বন্ধে আপনাদের প্রণিধান প্রার্থনা করিতেছি। "যত দিন না বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্য দর্শনের পঠন পাঠন সাধিত হইবে, ততদিন প্রকৃত দার্শনিক পরিভাষা সঙ্কলিত হইবার সম্ভাবনা অল্প। সজীব দর্শনচর্চ্চা দেশমধ্যে প্রচলিত হইলে ভিন্ন ভিন্ন লেখক একই দার্শনিক তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য বিভিন্ন পরিভাষার প্রয়োগ করিবেন। সেই সকলের মধ্যে যাহা যোগ্য, তাহাই টিঁকিয়া যাইবে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে বহু আয়াস ও সময় ব্যয় করিয়া সংস্কৃত দর্শন-সাহিত্যে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দের সূচী সঙ্কলন করিতে হইবে। ইহা একের সাধ্য নহে; সমবেত চেষ্টা এবং যথেষ্ট সময়ব্যয় ভিন্ন এ কার্য্যে সফলতা হইবে না।"

দর্শন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলাম, বিজ্ঞান সম্বন্ধেও সেই কথা বক্তব্য। এই প্রসঙ্গে আমাদের লক্ষ্য করা উচিত যে, ইংরাজী শিক্ষিতেরা যখন প্রথম বাঙ্গালা লিখিতে সুরু করিলেন, তখন তাঁহারা সংস্কৃত দর্শনে, বিজ্ঞানে, কাব্যে, অলঙ্কারে, নীতি-শাস্ত্রে, কলা-শাস্ত্রে, যে শব্দসম্পদ আছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া এবং তাহার সাহায্য না লইয়া মনগড়া কিম্ভূতকিমাকার অনেকগুলি শব্দ রচনা করিলেন। ঐ সকল শব্দ বাঙ্গালার মুখেও নাই, এবং সংস্কৃত অভিধানেও নাই। এবং ঐ সব

কষ্ট-কল্পিত বাক্যই এখন বাঙ্গালা সাহিত্যে চলিত হইয়াছে। ঘরে টাকা থাকিতে ধার করা যেমন আহাম্মকী, এও সেইরূপ আহাম্মকী—কিন্তু যাহা হইয়াছে, তাহার উপায় নাই। এখন আমরা যে সকল পরিভাষা রচনা করিব তৎসম্বন্ধে যেন বাঙ্গালা ভাষার জাতি ও প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখি * এবং সংস্কৃত সাহিত্যের খনির মধ্যে যে সকল শব্দ-মণি প্রচ্ছন্ন আছে তাহার সন্ধান লই।

যশোলিপ্সা-সংযম।

এখনও দেশের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে নূতন আবিষ্কার নূতন গবেষণার ফল ইংরাজী ভাষার সাহায্যে বিবৃত ও প্রচারিত করিলে শীঘ্র যশস্বী হওয়া যায়। এই ইংরাজীর দ্বারে যশের লোভ আমাদের সংবরণ করিতে হইবে। দেখুন, আমাদের মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রও প্রথম জীবনে ইংরাজীতে রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে সকল রচনা আজ কোথায়? কোন্ বিস্মৃতির অতল তলে তলাইয়া গিয়াছে। আমাদের যে কিছু প্রতিভা, যাহা কিছু আলোচন, অন্বেষণ, আবিষ্কার, সমস্তই বঙ্গবাণীর চরণ-সরোজে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হইবে। এ সম্বন্ধে গত অধিবেশনে স্যর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এইরূপ বলিয়াছিলেন।—"কোন একটা নূতন কিছু আবিষ্কার করিলেই তাহা বিদেশীয় ভাষায় প্রথমতঃ প্রকাশ করিলে প্রচুর যশঃ অর্জ্জিত হইবে, এই প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে হইবে। আমাদের যাহা কিছু উত্তম, যাহা কিছু সৎ, উদার, অপূর্ব্ব ও অনুপম, তাহা বঙ্গভাষাতেই লিপিবদ্ধ করিব, বাঙ্গালার সম্পত্তি বাঙ্গালার মাতৃভাষার ভাণ্ডারেই সঞ্চিত রাখিব, দেশের ধন স্বহস্তে দেশকে বঞ্চিত করিয়া বিদেশে বিলাইয়া দিব না, এমন করিয়া ধনের উপচয় করিব, বৃদ্ধি করিব, যাহাতে জলধির জলের ন্যায় আমার মাতৃভাষার ভাণ্ডারে সঞ্চিত ধনরাশি, যে যত পারে গ্রহণ করিলেও কদাচ ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে না।"

আমরা চাই যে, গীতাঞ্জলির মত, চিত্রার মত, বিষবৃক্ষের মত, আনন্দমঠের মত, কাব্য, নাটক বাঙ্গালা হইতে ভাষান্তরিত হইবে। আমরা আরও চাই যে, আমাদের জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত মনীষিগণ তাঁহাদের মৌলিক চিন্তা মৌলিক গবেষণা বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত করিবেন, যেন বিদেশীয়েরা মধুলোলুপ ভৃঙ্গের মত ঐ সকল অমূল্য বস্তুর আহরণের জন্য বাধ্য হইয়া বঙ্গ-সাহিত্যের তপোবনে সমিৎহস্তে উপসন্ন হয়।

উপসংহার।

বাঙ্গালী জাতির এমন দুর্দ্দশার দিন গিয়াছে, যখন বাঙ্গালা দেশনায়কদিগকে বাধ্য হইয়া বঙ্গভাষার দ্রোহ করিতে হইত। আমি এক জনের কথা জানি, যিনি বঙ্গজননীর কৃতী সুসন্তান ছিলেন অথচ ইংরেজমহলে পসারের জন্য তাঁহাকে বলিতে হইত যে, তিনি বাঙ্গালা জানেন না। কি শোচনীয় অবস্থা! অবশ্য যে সকল শাপভ্রষ্ট শ্বেতাঙ্গ বিধাতার ভৌগোলিক ভ্রান্তির ফলে আমাদের এই বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা কবি দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায়—

আমরা বাংলা গিয়াছি ভুলি, আমরা শিখেছি
বিলিতি বুলি,
আমরা চাকরকে ডাকি বেয়ারা, আর মুটেদের
ডাকি কুলি—

যাঁহাদের প্রতিনিধিস্বরূপ সধবার একাদশীতে নিমচাদ অনেক দিন হইল বলিয়া গিয়াছেন—I read English, write English, talk in English, speechify in English, think in English, dream in English,—বিধাতার আজব সৃষ্টি সেই সকল অদ্ভুত জীব দেশ হইতে বিলুপ্ত না হইলেও বিরল হইয়া আসিতেছে।

* শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর রাজসাহীতে পঠিত অভিভাষণ।

তাঁহাদের সম্বন্ধে যত্ন করা সময়ের অপব্যয়। কিন্তু আমরা —যাহারা বঙ্গবাণীর চিহ্নিত সেবক, আমরাও কি তাঁহার ভাবে মস্‌গুল, বিভোর হইতে পারিয়াছি? আমরা কি তাঁহার সেবায় সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে পারিয়াছি? এক কথায়, আমরা কি তাঁহাকে পরায়ণ করিতে পারিয়াছি? এখনও আমাদের সাহিত্য হইতে বিলাতীর বোট্‌কা গন্ধ গেল না। ১২৮৮ বঙ্গাব্দে বঙ্গদর্শনের এক জন লেখক তাঁহার সহযোগীদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, যত দিন পর্য্যন্ত মনের মধ্যে ভাব ইংরাজীতে উদয় হয়, ততদিন যেন কেহ বাঙ্গালা লিখিতে না বসেন। বাঙ্গালা লিখিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে যেন বাঙ্গালার ভাবা শিক্ষা করা হয়। এই অনুরোধ কি আমরা পালন করিয়াছি? পালন না করার ফল কিরূপ হইয়াছে? অনেক স্থলে বাঙ্গালার অর্থ করিতে হইলে ইংরাজীতে তর্জ্জমা করিয়া তবে বুঝিতে হয়। যাঁহারা ইংরাজী জানেন না, তাঁহারা মূঢ়ের মত মূক থাকিয়া অগত্যা অবশেষে লেখকের জয়জয়কার করেন।* এইরূপ অঘটনঘটন সম্পাদন করিয়া আমরা কখনই একটা বিশ্ববিজয়ী সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে পারিব না। অথচ ঐরূপ সাহিত্য আমাদের গড়িয়া তুলিতেই হইবে নতুবা আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের সমস্ত উদ্যম পণ্ড হইবে এবং আমাদের ভাষার নিয়তি ব্যর্থ হইবে। তাহা আমরা কখনই হইতে দিব না।

রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে আমরা ইংরাজি অথবা হিন্দী কিংবা হয় ত উভয়েরই ব্যবহার করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত প্রয়োজনে আমরা বাঙ্গালারই শরণাপন্ন হইব। ইংরাজী অথবা হিন্দী রাষ্ট্রীয় ভাষা হয় হউক, কিন্তু আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা, ভাব অভাব, অনুসন্ধান, আবিষ্কার, আলোচনা, আন্দোলন, সমস্তই বাঙ্গালাতে প্রচার করিব। আমাদের দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, কাব্য, নাটক, উপন্যাস, উপকথা—সমস্তই বাঙ্গালাতে প্রকাশ করিব। যে ভাষার উৎপত্তি সরিদ্বরা গঙ্গার ন্যায় উত্তুঙ্গ, যাহার প্রবাহ যমুনার ন্যায় নির্ম্মল, যে ভাষায় চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস পদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যে ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেব ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, যে ভাষায় কৃত্তিবাস কাশীদাস রামায়ণ মহাভারত রচনা করিয়াছেন, মুকুন্দরাম ঘনরাম যে ভাষায় পল্লীকবি, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, কান্তকবি যাহার ধর্ম্ম-সঙ্গীত-রচয়িতা; যে ভাষার অবসাদসময়েও ভারতচন্দ্রের মত কবি, দাশুরায়ের মত পাঁচালীকর্ত্তা আবির্ভূত হইয়াছিলেন; যে ভাষায় মধুসূদন কম্বুনাদে মেঘনাদ শুনাইয়াছেন, হেমচন্দ্র উদাত্তস্বরে বৃত্রসংহার গাহিয়াছেন, নবীনচন্দ্র রৈবতক কুরুক্ষেত্র প্রভাসে চতুর্দ্দশ বর্ষ ধরিয়া কৃষ্ণলীলা ধ্যান করিয়াছেন; যে ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস আছে, রমেশচন্দ্রের ‘শতবর্ষ’ আছে, যে ভাষার দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ নাট্যকবি; যে ভাষার রামমোহন বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমার গদ্যকর্ত্তা; কালীপ্রসন্ন চন্দ্রনাথ অক্ষয়চন্দ্র গদ্যলেখক, যে ভাষায় হরপ্রসাদ রজনীকান্ত অক্ষয়কুমার নগেন্দ্রনাথ দীনেশচন্দ্র ইতিহাস-রচয়িতা; যে ভাষায় কালীবর দ্বিজেন্দ্রলাল চন্দ্রকান্ত দর্শন রচনা করিয়াছেন, যে ভাষায় দেবেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্র শিশিরকুমার বিজয়কৃষ্ণ বিবেকানন্দ ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং যে ভাষায় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অজেয় ও অমোঘ লেখনী চালনা করিয়াছেন—সেই ভাষা আমাদের মাতৃভাষা। এমন মায়ের গৌরবে আমরা কে না গৌরবিত, এমন মায়ের মহিমায় আমরা কে না মহীয়ান্? যারা এমন মায়ের সন্তান, তারা অজর অমর অক্ষয়, তারা মৃত্যুঞ্জয়, তারা বিশ্বজয়ী। এমন মায়ের সেবায় কে না আপনাকে উৎসর্গ করিতে পারে?

আসুন, আমাদের আরাধ্যা, হৃদয়ের রাণী, বঙ্গবাণীর জয়ধ্বনি করিয়া জীবন সার্থক করি—

জয় বঙ্গবাণীর জয়!!

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

---

* ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় রচিত বাঙ্গালা ভাষার সংস্কার।

সভাপতির অভিভাষণ।

(সাহিত্য শাখা)

বস্তু সংক্ষেপ।

সাহিত্যরূপী অধ্যাত্মরাজ্যের প্রসার—উহাতে মানবাত্মার কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব অধিকার—উহাতে মানবাত্মার স্বাধীনতা ও স্বরাজ—ভাবুকতায় পুণ্যফল—নরসমাজে সাহিত্যের মাহাত্ম্য—মনুষ্যত্ব এবং জাতীয় জীবন গঠনে সাহিত্যের মাহাত্ম্য—ইতিহাসে সাহিত্যকর্ম্মী জাতিসমূহ—কালস্রোতে মনুষ্যের সর্ব্বনাশক্ষেত্রে সারস্বতগণ—সাহিত্য উন্নতক্ষেত্র হইলেও উহাতে অনন্ত জাতিভেদ—সাহিত্যিক জীবনের প্রধান সমস্যা—অধ্যাত্ম কেন্দ্রের অভাব—অথচ সাহিত্যসেবী কখনও জড়বাদী হইতে পারে না—সারস্বত জীবনে অধ্যাত্ম কেন্দ্র—সাহিত্যে প্রতিভাতত্ত্ব—উহার প্রধান গুণোপাদান সরলতা—প্রধান ক্রিয়াসাধন সরলতা—সরল দৃষ্টি এবং আনন্দ দৃষ্টি—ভারতীয় ধর্ম্ম আদর্শের সহিত উহার সাধর্ম্ম্য এবং সামঞ্জস্য—সাহিত্যের "অমৃতস্য পুত্রাঃ"—'অমৃত' পন্থার আনুষ্ঠানিক—এই অনুষ্ঠান পথেই মৌলিকতা সিদ্ধি—সারস্বত ক্ষেত্রের যমনিয়মাদি—সাহিত্যে মনঃসংযমের দৃষ্টান্ত ফল—সারস্বতী প্রতিভার স্বত্ব এবং দায়িত্ব—সাহিত্যে সৌন্দর্য্যবাদীগণের সাধনার ভ্রম—সাহিত্যজীবনে 'শীলভদ্র' এবং 'পূজারী'—সাহিত্যসেবী কথার সাধক বলিয়া কথার দায়িত্বজ্ঞান অপরিহার্য্য—তাহার পক্ষে শব্দশক্তি জ্ঞানলাভ অপরিহার্য্য—আত্মানুগত্য এবং অকপট বাক্যভঙ্গী অপরিহার্য্য—তাহার শব্দ প্রেম-সাধনা—বঙ্গসাহিত্যে শব্দ এবং ক্রিয়া সমস্যা—সাহিত্যে ভাব এবং বস্তুর আদর্শ সমস্যা—প্রাচীন 'সমুৎকর্ষ'আদর্শ—আধুনিক ইয়ুরোপীয় সমাজ এবং সাহিত্যের আধুনিক আদর্শ—উহার বিশ্বব্যাপী প্রসার - বঙ্গসাহিত্যে উহার প্রাদুর্ভাব—সাহিত্যসেবীর একমাত্র কর্ত্তব্য স্ব-প্রবৃত্তির অনুসরণ—স্বকীয় সত্যরূপী ধর্ম্মকে বরণ—এবং উহার ফলাফলকেও অপরিহার্য্য বলিয়া গ্রহণ—সাহিত্যে সত্যবাদী এবং অকপট শিল্প রচনার স্থান—আধুনিক সাহিত্যে পাঠকের নূতন দাবী, কবিজীবনের ছায়ায় কাম্যরস ভোগ—জীবনের জ্ঞানকর্ম্ম কাণ্ড ও রসকাণ্ডের মধ্যে আন্তরিক সামঞ্জস্য সাধন ব্যতীত সাহিত্যে স্থায়ী মাহাত্ম্য লাভ অসম্ভব—মহৎ সাহিত্যের মূলে মহতী প্রবৃত্তি এবং মহত্তমা চরিত্র ভিত্তি—কবির আত্মমূলা এবং স্বধর্ম্মমূলা সৃষ্টি—সাহিত্যসেবীর ঐক্যতান সাধনা—বিশ্বসাহিত্য-হৃদয়ের ঐক্যতান সঙ্গীত—পদ্মাসনে দেবতা !)

এই প্রাচীন ইতিহাসপূজ্য নগরীর অভ্যর্থনা সমিতি অযোগ্য ব্যক্তিকে সভাপতি পদে আহ্বান করিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছেন। এইরূপ সাহিত্য সভার নেতৃত্ব করিবার উপযুক্ত কোন প্রতিষ্ঠা আমার নাই। তবে আমি আশৈশব বাগ্দেবীর সেবক, এবং আমার জীবনের সমস্ত উচ্চাভিলাষ বাণীচরণেই নিবদ্ধ করিয়াছি। উহাতেই আমার প্রতি এই পক্ষপাতিতা দেখাইয়াছেন, মনে করিয়া, তাঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

সাহিত্যের অধ্যাত্ম রাজ্য ও উহার প্রসার।

কিছুকাল হইতে বাঙ্গালীর দৃষ্টি তাহার সাহিত্যের দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। ইংরাজী শিক্ষার ফলে বাঙ্গালী যদি কোন মহার্ঘ জিনিষ লাভ করিয়া থাকে, উহা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাহার সচেতন কর্ম্মপ্রবণতা এবং আত্মাদরের বৃদ্ধি। ইহার পশ্চাতে অবশ্য দেশের বর্ত্তমান সামাজিকও রাষ্ট্রীয় অবস্থার অবলম্বন আছে। তবে, বর্ত্তমানে আমাদের জীবনের কর্ম্মভূমি নানাদিকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থার দ্বারাই এত সীমাবদ্ধ যে, জগতের অপরাপর সভ্য সমাজের অন্তর্গত মনুষ্যের ন্যায় আমরা জীবনকে আত্মার স্বাভাবিক আবেগ অনুসরণ পূর্ব্বক উহার প্রকৃতিসিদ্ধ নিয়তির দিকে

অবাধে চালাইতে পারিতেছি না। বিংশ শতাব্দীর মনুষ্যজীবনের ক্ষেত্রে আমরা নানাদিকে ক্ষুদ্র; আমরা কে কোন দিকে, কি পরিমাণে যোগ্য এবং কি হইতে পারিতাম, তদ্বিষয়ে পরীক্ষার অবসরও পাওয়া যায় নাই। তবে কি না নিমিষের মধ্যেই দেশকাল সীমাবিলঙ্ঘী চিত্ত বিহঙ্গীকে আমরা মানব জন্ম স্বত্বেই লাভ করিয়াছি! উহা মনুষ্যমাত্রের দুর্ল্লভ পিতৃধন এবং পিতৃকরুণার নিদর্শন! উহাকে পঞ্জরবদ্ধ করিতে পারে এমন সাধ্য কাহারও নাই। বিশ্বপ্রকৃতির কারাবদ্ধ মনুষ্য জড়তার উৎপীড়নে এবং বন্ধনবিরে উদ্বিগ্ন হইয়া নিজের অন্তঃপুরে একবার প্রবেশ করিলেই বুঝিতে পারে, সে কত বড়! সে এত দুর্ব্বল দরিদ্র, কাঙ্গাল নহে! সে যে আপনাতেই সম্পূর্ণ সে যে অনন্তের আত্মজ পুত্র! মনুষ্যমাত্রের সাধারণ আত্মম্ভরিতার মধ্যে এই মহাত্মতার লক্ষণই গুপ্ত রহিয়াছে।

ইহা প্রত্যেক মনুষ্যের অন্তর রাজ্যের কথা এবং এই অন্তর রাজ্যই সাহিত্যের রাজ্য। বিশ্বজগৎ মনুষ্যের মনের ভিতর আসিয়া যেই ভাবরূপ ধারণ করে, সাহিত্য উহা লইয়াই ব্যাপৃত আছে। তাই সাহিত্যের ভূমিও মনুষ্যের ভাবনাশক্তি এবং চিত্ত-প্রসারের সহিত সম-ব্যাপী। তাই সাহিত্যও 'মানসোৎপ' এবং 'মনোময়' হইয়া, এবং মনুষ্যের অন্তরাত্মার সমান—ধর্ম্মে তেজস্বী হইয়াই দেশকালের সীমাবন্ধন স্বীকার করিতে চাহে না। সুতরাং, সাহিত্য আধ্যাত্মিক সৃষ্টি; এবং আত্মাবান জীবমাত্রেই এই সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া স্বয়ং কর্ত্তা অথবা ভোক্তা হইবার অধিকার রাখে।

উহাতে মানবাত্মার কর্ত্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্বাধিকার।

এই সাহিত্যের ক্ষেত্রে আসিয়াই মানুষ প্রকৃত প্রস্তাবে আপনার কর্ত্তৃশক্তির বিষয়ে আত্মবোধ লাভ করে; আপনাকে একরূপ দ্রষ্টা এবং স্রষ্টা জানিয়া অন্তরঙ্গ ভাবে নিজকে পরমকর্ত্তার প্রেরিত এবং ছায়াবহ বলিয়াই অনুভব করে। এরাজ্যে আসিয়াই মনুষ্যের অন্তরাত্মা অনুভব করে—আমিত যৎসামান্য নহি! এই লোকে ঘটনা এবং অবস্থা যে আমার দাসী! আমার ইঙ্গিতেই যে জীবনের দুরধিগম্য রহস্যময়ী অদৃষ্ট নিয়তি এই জগতে পরিচালিত হইতেছে! আমি যে এক নিমিষে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল তোলপাড় করিতে পারি! এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় আমারই করায়ত্ত! আমি যে কটাক্ষেই নব নব সংসার সৃষ্টিপূর্ব্বক উহার মধ্যে জীবনের নব নব অদৃষ্টতন্তু বয়ন করিতে পারি!" সাহিত্যের ভোক্তার সমক্ষেও দেশকালের সীমাবন্ধন সরিয়া যায়! ফিনলণ্ডের কবি নবজীলণ্ডের পাঠকের জন্য আনন্দের ডালি সাজাইয়া আহ্বান করিতেছেন! কলম্বিয়ার মানুষ ওসাকার মনুষ্য হৃদয়ের স্পর্শ অনুভব করিয়া পুলকিত হইতেছে! একই 'মানবহৃদয়ের' স্বর্ণপাত্রে সদানন্দময় হৃদয়রস অকপটভাবে বিতরণ করিয়া সাহিত্যের সদাব্রত বসিয়া গিয়াছে! আর আনন্দ! সাহিত্যরাজ্যে প্রবেশ করিয়া দুঃখও ত আনন্দের রূপ ধারণ করে—আনন্দরূপং অমৃতং যদ্বিভাতি!

উহাতে মানবাত্মার স্বাধীনতা ও স্বরাজ্য।

সাহিত্যের এই আত্মাধীন এবং জড়তার বাধাবিহীন লীলারাজ্যে প্রবেশ করিয়া মানবাত্মা "ব্রহ্মানন্দ সহোদর" রস-ভোগে রমিত হইতেছে। এই স্বত্ব এবং কর্ত্তৃত্ব আমাদের প্রত্যেকের ভোগায়তনের মধ্যেই পৈত্রিক ধনরূপে নিহিত আছে। সাহিত্যের মধ্যে মানুষ এই আত্মাধীনতা—এই স্বাধীনতা লাভ করে বলিয়াই সাহিত্য মানবাত্মার এত প্রিয়! মহাকাশ-বিহারী আত্মপক্ষী দেশকালের কারাগৃহে, প্রকৃতির

প্রপঞ্চপঞ্জরে ধরা পড়িয়াছে! একটুকু নড়িতে চড়িতে চারিদিক হইতে জড়তার রুক্ষকঠোর কারাপ্রাচীর গায়ে লাগিয়া জানাইয়া দিতেছে যে, সে বদ্ধমাত্র! সৃষ্টির অদৃষ্ট নিয়তি প্রতি মুহূর্তে তাহার পদতলে কণ্টকবিদ্ধ করিয়া বলিয়া দিতেছে—আপনাকে উদ্ধার করিতে তাহার কিছুমাত্র সামর্থ্য নাই! অগ্রপশ্চাতে, ঊর্দ্ধে কিংবা অধে দৃষ্টি পরিচালিত করিতে গিয়াও অন্ধকার দেখিতেছে! মহাজীবনের পূর্ব্বস্মৃতি, পূর্ব্ব পরিচালিত সুধাসমুদ্রের অতর্কিত সংস্কার তাহার প্রায় লুপ্ত হইয়া আসিল! এমতাবস্থায় যাহা-কোন যে-কোন প্রকারে তাহার হৃদয়তটে অনন্তের, চূড়ান্তের, স্বাধীনতার বা নির্জরতার বার্ত্তা আনিয়া দিতে পারে, যেই দীপ প্রায় নিবিয়া আসিয়াছে তাহাতে বিন্দুমাত্র তৈল সেক করিতে পারে, আভাসে অথবা ঈশারায় যেরূপেই হোক, তাহার পিতৃগৃহের ম্রিয়মান স্মৃতিটুকু জাগাইয়া তুলিতে পারে, মানুষের অন্তরাত্মা পরমানন্দে উহাকেই পরমপ্রাপ্তিরূপে বরণ করে। যে মরণমহাসিন্ধুর তরঙ্গতলে হাবুডুবু খাইয়াই ডুবিতেছে সে ভাসমান খড়কুটা টুকু পর্য্যন্ত পরমবন্ধু জানিয়া আঁকড়িয়া ধরিবে, তাহা বিচিত্র কি! সংসারে মানবাত্মারও সেই দশা! এই কারণে, যাহাতে জড়তা অতিক্রম করিতে অথবা ক্ষুদ্রতাকে ভুলাইতে পারে, যে-কোনরূপ কল্পনা জল্পনা বা বিভাবনা, বৃহতের মহতের অর্হতের যে-কোনরূপ প্রসঙ্গমাত্রই মানবাত্মার এত প্রিয় আহার! জড়তার বন্ধন হইতে, ক্ষণকালের জন্য হইলেও, মনুষ্যমনের মুক্তি-দাতা বলিয়াই সাহিত্য মানবাত্মার এত প্রিয়! অনাবিলভাবে এবং স্বার্থজড়তার নিঃসম্পর্ক ভাবে এই স্বাধীনতার রসানুভূতি উদ্দীপ্ত করে বলিয়াই, সকল সাহিত্যের মধ্যে আবার নিরবচ্ছিন্ন কাল্পনিকতার সাহিত্যই মানুষের নিকট এত মধুর! এই জন্য কাল্পনিক সাহিত্য-কর্ত্তা কবিগণ মানব-সমাজে এত আদর এবং গৌরবের আসন লাভ করিয়া আসিতেছেন; মনুষ্য সমাজের অপর সমস্ত বিভাগের কৃতিগণ হইতেই সমধিক পূজ্যতর পদবী অধিকার পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া আছেন! উহা উচিত হইতেছে কিনা, এস্থলে বিচার্য্য নহে। কিন্তু উহা যে সত্য, সর্ব্বদেশের এবং সর্ব্বকালের মানবহৃদয় অনবচ্ছিন্ন ভাবে তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। সংসারের শক্তিবীর ঐশ্বর্য্যবীর দানবীর বা কর্ম্মবীরগণ অপেক্ষাও, সহজদৃষ্টিতে একেবারে শূন্যগর্ভ বচনবাগীশগণেই যেন অধিক সম্মান আদায় করিতেছেন। কেবল তাহাই কি? পৃথিবীর মনুষ্য মহল বাছাই করিয়া সাহিত্য যাহাদিগকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপন মহলে স্থান দেন, সর্ব্বধ্বংসী কালের প্রবাহে কেবল তাঁহাদের নামটাই যেন কোনমতে রক্ষা পায়। রামযুধিষ্ঠীরের ব্যাসবাল্মীকি মিলিয়াছিলেন, ওড়িসিয়সের এবং হেকটর অকিলসের জন্য হোমার ছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের সমতুল্য হয়ত কোটি কোটি রাজামহারাজ কিংবা ধর্ম্মকর্ম্মবীর কালস্রোতে মুছিয়া গিয়াছে, কেবল তাঁহারই অমরতা লাভ করিয়াছেন। নিজের মহো দাত্ত বিক্রমকাহিনীকে রক্ষা ও অমরত্ব দান করিবার জন্য হোমার মিলিল না বলিয়া পৃথ্বীবিজয়ী এলেকজান্দরকেও একদিন মনোদুঃখে অশ্রুপাত করিতে হইয়াছে।

ভাবুকতায় পুণ্যফল।

এই সাহিত্য অধ্যাত্মরাজ্য এবং উহা মানবাত্মার স্বরাজ। এই রাজ্যের কর্ত্তা এবং ভোক্তা উভয়েই আধ্যাত্মক্ষেত্রে স্থায়ী পুণ্যফল উপার্জ্জন করেন। বঙ্গদেশের এই স্মৃতি-গরিষ্ঠ ঐতিহ্যপীঠে বসিয়া আপনারা সমস্ত বঙ্গের সাহিত্যকর্ম্মী এবং সাহিত্যপ্রেমীকে বঙ্গবাণীর পূজামণ্ডপে জাতিসূত্রে আহ্বান করিয়াছেন। এই সারস্বতমণ্ডপে দাঁড়াইয়া আমরা এই শুভদিনে বাণীপন্থীর স্বরূপ, তাঁহার জীবনের লক্ষ্য, উহার

স্বত্ব এবং দায়িত্ব চিন্তা করাই বর্ত্তমানকালে এতদ্দেশীয় পূজারিমাত্রের আসন্ন এবং প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। চিন্তা করুন, অদ্যকার এই সমাগম আমাদের প্রত্যেকের অধ্যাত্মলোকে অনপনেয় পুণ্যরেখা অঙ্কন করিয়া যাইতেছে! আমরা অদ্য এইস্থানে দাঁড়াইয়া, পুণ্যক্ষেত্রেই উপার্জ্জনশীল হইয়া, বিশাল মনুষ্যজগতের নির্জ্জন অন্তরাত্মার লোকেই নিজের হৃদয়স্পন্দন সঞ্চারিত করিয়া দাঁড়াইয়াছি। অতীতযুগের শতলক্ষ মহাপ্রাণ মনুষ্যের উপার্জ্জন ফলে আমরা অংশভাগী এবং ভোক্তা হইয়া দাঁড়াইয়াছি! কোন সাহিত্যসেবী নিজকে স্বল্পপ্রাণী অথবা নগণ্য মনে করার কারণ নাই। ক্ষুদ্রতাজ্ঞান আমাদের পিতার দান নহে। উহা জড়তার ধর্ম্ম; এবং জড়তার কারাগর্ভ মধ্যেই এই আগন্তুক মর্ত্ত্যজীবনে আমাদের সঙ্গ লইয়াছে। সাহিত্যসেবীকে মনে রাখিতে হয়, তাঁহার সাহিত্যসেবা আত্মজীবনের পরমার্থ সাধনা হইতে অভিন্ন! উহা তাঁহার চূড়ান্ত পুণ্যসাধনা এবং তপস্যার কার্য্য! ভাবমাত্রেই দেবতার ভোগ; অন্তরাত্মার ক্ষেত্রে, ভাবের ঘরে যিনি যাহা করিবেন উহার কোন অংশরই ধ্বংশ নাই। সৃষ্টি-তন্ত্রে জড়তা মানবত্বের উদ্দেশ্যে, এবং মানবত্ব পুনর্ব্বার এই ভাবতত্ত্বজীবী অধ্যাত্মতা এবঞ্চ দেবত্বের লক্ষ্যেই পরিচালিত বলিয়া আমাদের অন্তর্দ্দেহে ভাবের যেই রেজেষ্টারী আছে, যেই গুপ্ত চিত্রফলক আছে, উহাতে কোন ভাবই বাদ পড়ে না। সৃষ্টিতন্ত্রে ভাব অমর; ভাবনার মূর্ত্তি অন্তর্লোকের চিরস্থায়ী পদার্থ। যেমনই হোক, সাহিত্যসেবী মাত্রেই অন্তর্দৃষ্টি পরিচালিত করিয়া এই আত্মতুষ্টি লাভ করিতে পারেন যে, তিনি জীবন পথে জড়তান্ত্রিক হইতে উন্নততর অধ্যাত্মসোপানে দাঁড়াইয়াছেন। অজ্ঞাতনামা অথবা অকৃতী সেবক বলিয়া নিজকে অকিঞ্চন মনে করাও ঠিক নহে। ভাবের ঘরে এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে বেশী কম বা যৎকিঞ্চিৎ যিনি যাহাই করিবেন, এইটুকু নিশ্চিত জানিবেন যে মানব জীবনের পুণ্যকর্ম্মের চরম হিসাব নিকাশের সময়ে উহা জমার ঘরেই দাঁড়াইয়া যাইবে; ক্ষতির অঙ্ক কোন মতেই বৃদ্ধি করিবে না।

মানব সমাজের সাহিত্যের মাহাত্ম্য।

আমাদের এই সাহিত্যকে মনুষ্য তাহার জ্ঞান বা কর্ম্মক্ষেত্রের সমস্ত ক্রিয়াচেষ্টার মধ্যেই অগ্রগণ্য পূজাপদবী ছাড়িয়া দিয়াছে। বর্ত্তমান কালের মনুষ্য-সমাজে সাহিত্যের মাহাত্ম্য আর প্রমাণ করিতে হয় না। শুনিতে পাওয়া যায়, মিলটনের প্যারাডাইস লষ্ট কাব্যের অধ্যয়ন শেষ করিয়া কোন প্রত্যক্ষবাদী নাকি ব্যঙ্গ ভরে প্রশ্ন করিয়াছিলেন "what does it prove?" মনুষ্য সমাজের স্বতঃসিদ্ধ সত্যানুভব এখন উহার উত্তরের অপেক্ষা করেনা। সাহিত্যের সাধকগণ জানেন, সাহিত্যকে সর্ব্ব উন্নতির নিদান জানিয়াই মানবজাতির হৃদয় চিরকাল অর্চ্চনা করিয়া আসিতেছে। কতকগুলি কথাই কি করিয়া এত বড় পদবী লাভ করিতে পারে সাধারণের দৃষ্টিবিভ্রম জন্মাইবার পক্ষে এস্থলেই হয়ত প্রধান হেতু। মুদ্রাযন্ত্র রেলোয়ে টেলিগ্রাফ বা বারুদ ডিনেমাইটের দৃষ্টবিক্রম সমক্ষে সাহিত্য কোন প্রচণ্ডপরাক্রমী প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারে না। কিন্তু চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে,মনুষ্যত্বের প্রধান উপাদান গুলিই মানুষ সাহিত্য হইতে পাইতেছে। মনুষ্যচিত্তের জ্ঞান-ভাব-ইচ্ছার অন্তর্গত সকল ক্ষেত্রের সকল শস্যই বাণীচরণাশ্রিত ভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত হইলেই তবে প্রকৃত উপার্জ্জন বলিয়া গণ্য হয়। সরস্বতীর গোলাজাত করিতে না পারিলে কিছুই প্রকৃত প্রাপ্তিরূপে, বর্ত্তমান-ভবিষ্যতের পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে ভোগদখল যোগ্য সম্পত্তিরূপে গণনার যোগ্য হয় না। পুনশ্চ, ওই উপার্জ্জনকে সাহিত্যের ভাবরসে রসাল এবং হৃদয়গ্রাহী করিয়া উপস্থিত করিতে পারিলেই উহা মনুষ্যের অন্তরাত্মার উপদেয় ভোজ্য হইয়া তাহার একাংশ হইতে, এবং জীবনপথে তাহার

সারাংশ বৃদ্ধি করিতে পারে। সকল প্রাপ্তিকে রসের পথে প্রাপ্তিই স্থির প্রাপ্তি। সাহিত্য এইরূপে রসের পথেই মনুষ্যের জ্ঞানকর্ম্মকে "হৃদ্য মেধ্য এবং বৃষ্য" করিয়া মনুষ্যজীবনের নিত্য নূতন রসায়ন করিয়া, মনুষ্যের গতি এবং স্থিতির মধ্যে being এবং becoming এর মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটন করিতেছে। সাহিত্যের কবিরাজগণ অকারণে জগতের অর্ঘ্যলাভ করিতেছেন না।

মনুষ্যত্ব এবং জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে সাহিত্যের মাহাত্ম্য।

আবার সাহিত্য জাতিগঠনের এবং জাতীয় জীবনেরও প্রধান অবলম্বন ; জাতির প্রাণপ্রতিষ্ঠা, রক্ষণ এবং পরিপোষণের মূল শক্তি সাহিত্যের হস্তেই আছে। উহার হেতু খুঁজিতে হইলেও আমাদিগকে মনুষ্যের প্রধান মাহাত্ম্যটি—সৃষ্টিতন্ত্রে মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতার মূল কারণটীর দিকেই দৃষ্টিগত করিতে হয়। সৃষ্টিতন্ত্রে মানবমাহাত্ম্যের প্রধান কারণ তাহার বাক্‌শক্তির মধ্যেই আছে। মানুষ বাগ্দেবীর অমৃতপ্রসাদ লাভ করিয়াছে, সৃষ্টিমধ্যে বাণীর বরপুত্র হইয়া বেদের জন্মদান পূর্ব্বক উহাকে রক্ষা করিতে. পুত্রপৌত্রাদিক্রমে অর্জ্জন বর্দ্ধনে ওই প্রসাদ ভোগ করিতে পারিতেছে! বেদ বলিতে, শ্রুতি বলিতে মনুষ্যের প্রাচীন বাঙ্ময়ভাণ্ডার, মনুষ্যের কর্ত্তৃক লিপি আবিষ্কারের পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানভাণ্ডারকেই বুঝিব! 'বাঙ্ময়' বলিতেও প্রাচীনকালে ব্যাপক অর্থে সাহিত্যকেই বুঝাইত ; সরস্বতী এই বেদ-মাতা। সুতরাং মনুষ্যত্বের—সমস্ত জীবজগতে মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্বের মূলেই রহিয়াছেন বেদ-জননী সরস্বতী! অপর জীবজন্তুগণ সারস্বতী কৃপা লাভ করে নাই বলিয়া, পূর্ব্বপুরুষীয় কিংবা সোপার্জ্জিত বেদবিত্তের গ্রহণ কিংবা পরিপোষণ করিতে পারিতেছেনা বলিয়াই মনুষ্য আজ জীবজগতের সম্রাট্‌। এই হেতুবাদ অনুসরণ করিয়া আসিলেই দেখিবে যে, একের উপর অপর ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ও বেদাধিকারের শক্তি তারতম্যের মধ্যেই যেমন নিহিত আছে, তেমনি জাতিতে জাতিতে শক্তির তারতম্য ও—এক জাতির উপরে অপর জাতির শ্রেষ্ঠতার কারণটিও—সারস্বত শক্তির পার্থক্যের উপরেই নির্ভর করিতেছে। নরসমাজে উন্নত জাতি' বলিতে, একরূপ সাক্ষাৎভাবে, সমুন্নত সাহিত্যকর্ম্মী এবং সাহিত্যসেবী জাতিই বুঝাইতেছে।

সুতরাং সাহিত্যসেবককে মনে রাখিতে হইবে, তিনি নিজের পরমার্থের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সমাজের সমগ্র জাতির চরমার্থের সাধক। তাঁহার একটীমাত্র কথাই অবলম্বদণ্ডে পরিণত হইয়া সমস্ত সমাজের স্থিতিগতির কেন্দ্র বিচলিত করিতে পারে ; সমগ্র জাতির পুণ্য-পাপের মুখ্য কারণ হইতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রনৈতিক ভাব দার্শনিক গণের 'সাম্যমৈত্রী স্বাধীনতা' রূপ তিনটি কথাই মহাশক্তির ত্রিশূল হইয়া নরসমাজের প্রাচীন আদর্শ প্রতিমা ধ্বংস করিয়াছে। সমগ্র ইয়ুরোপ অভিনব নরতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের প্রচলন পূর্ব্বক 'নব্য ইয়ুরোপের জন্মদান করিয়া, তাহাকে পৃথিবী-জয়ে উৎসাহিত করিতেছে। পৌরাণিক ঋষি কবিগণের "অবতার" এবং "জন্মান্তর" এবং "জাতি" রূপ তিনটি কথাই পশ্চাতে বিপুল পরিচালিত সারস্বত শক্তির অনুবল সংগ্রহপূর্ব্বক ভারতবর্ষকে পৃথিবীর যাবতীয় নরসংঘ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া উহার তিনকালের অদৃষ্টকে শাসন করিতেছে। এইরূপে খ্রীষ্টধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম বা ইসলাম ইহুদী ধর্ম্ম প্রভৃতি একদিকে এক একটি কথা ; অন্য দিক মনুষ্য অদৃষ্টের প্রবল পরিচালনী সারস্বত শক্তির সূচীমুখ ব্যতীত আর কি? মহাশক্তি এই পথে সূচীমুখে প্রবেশপূর্ব্বক সমগ্র মানুষটীর—জাতিটীর জন্মজীবন এবং ইহপরকালের অদৃষ্টকে আপন বশে পরিপাক করিয়াই, পরিশেষে 'ফাল' মুখে বাহির হইতেছেন! খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, মহম্মদ প্রভৃতিও প্রকারান্তরে বাণীসাধক! সারস্বত পথে প্রবল জীবন

সাধনার পুণ্য মহারথ পরিচালিত হইতে পারিয়াছে বলিয়াই, তাঁহারা জগতে মহাশক্তিরূপে দিগ্বিজয়ী হইয়া কোটি কোটি মনুষ্যকে স্বকীয় ধর্ম্মরসে রসিত এবং বর্দ্ধিত করিতে পারিতেছেন।

ইতিহাসে সাহিত্যকর্ম্মী জাতীয়সমূহ।

মিশর, অসুরিয়া, বাবলিন ও কার্থেজ এবং মধ্য এশিয়ার ঐশ্বর্য্যশালী ও প্রবল জড়তাপরাক্রমী জাতিগুলি কালস্রোতে ধ্বংশ হইতে গিয়া, ইতিহাসের এবং পৃথিবীর বক্ষ হইতে একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গেল কেন ? উহারা সাহিত্যকর্ম্মী এবং সাহিত্যসেবী জাতি ছিল না বলিয়া। অপরদিকে প্রাচীন ভারত চীন এবং গ্রীস রোম, সারস্বতী কৃপার অমৃত টুকুর গতিকেই অতীতের উন্নত সমুজ্জ্বল আলোকস্তম্ভরূপে কালসমুদ্রের সকল যাত্রীকের নয়নানন্দ হইয়া রহিয়াছে।

কালস্রোতের সর্ব্বনাশ ক্ষেত্রে বাণীপন্থীগণ।

বাণীসাধকগণই মনুষ্যকে কালগ্রাসের সর্ব্বনাশ হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং নিজকে 'কেবল কথার বেপারী' বলিয়া, জীবনে সমাজে বা জগৎতন্ত্রে কোনরূপ অকর্ম্মা বা অপরের তুলনায় হীন বলিয়া কোন প্রকার লাঘববুদ্ধি সাহিত্যসেবীকে যেন কদাচিৎ ভ্রমেও স্পর্শ না করে। আমি জীবনের অধ্যাত্মপথে, কিংবা বিশ্বসেবায়, কোন ব্যবসায়ী হইতে কোন অংশেই লঘু নহি, আত্মমাহাত্ম্য বুদ্ধির এইরূপ স্থিরসমুন্নত শিখরে দাঁড়াইয়াই তাঁহাকে প্রতিনিয়ত সুরনদী সরস্বতীর অপূর্ব্ব-অধিকৃত অদেয় অতলে জাল ফেলিতে হইবে ; মনুষ্য-হৃদয়ের অগম্য গুহায় রত্নপিপাসায় বিগাহী হইতে হইবে; অজ্ঞাততত্ত্বের মহাকাশ-বক্ষে অজ্ঞানিত সুধা-পিপাসায় পক্ষী হইয়া উড়িতে হইবে। সকলেই সুধা লাভ করিবেন বলিয়া এমন মিথ্যা আশ্বাস দিতে পারিব না। সকল দেশের জীবনযাত্রীগণের স্থির সিদ্ধান্তিত চরম লক্ষ্য যাহা, সেই লক্ষ্যের নিকটবর্ত্তী হইবেন, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

সাহিত্য উন্নতক্ষেত্র হইলেও উহাতে অনন্ত জাতিভেদ।

তবে, তামসিকতা এবং জড়ধর্ম্মের তুলনায় সাহিত্য উন্নততর সত্যের ক্ষেত্র হইলেও,উহার মধ্যে আবার অনন্ত জাতিভেদ আছে। সাহিত্যজগতে গুণ এবং কর্ম্মগতিকে মুনি ঋষি হইতে আরম্ভ করিয়া পাষণ্ড, গুণ্ডা এবং চণ্ডাল পর্য্যন্ত যে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। এই ভেদ কোথাও জন্ম প্রকৃতিগত, কোথাওবা সংসর্গজাত। আমরা অদ্য সাহিত্যসেবীর এই জাতিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে দাঁড়াই নাই। নিরপেক্ষ দৃষ্টি এবং সূক্ষ্ম প্রত্যগনুভব অভ্যস্ত হইলে পাঠকমাত্রেই উহার দৃষ্টান্ত লাভে কুতূহল চরিতার্থ করিতে পারিবেন। আমরা এই সাহিত্য সভায় বাণীপন্থীর প্রকৃত স্বরূপ কি, এবং কি ভাবে তাঁহার ব্রত-উদ্যাপন করিতে হয় উহা দর্শন করিয়াই চরিতার্থ হইতে চেষ্টা করিতেছি। কেবল কৃতকার্য্যতার সুফল বা সফলতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াও চলিব না।

সাহিত্যিক জীবনের সমস্যা।

কেননা, সাহিত্যে সফলতা কাহাকে বলা যাইতে পারে, উহা একটা অত্যন্ত বাদ বিসংবাদের ক্ষেত্র। সফলতা সকলের ভাগ্যেও ঘটে না—বিশেষতঃ, সফলতা বলিতে সাধারণে যাহা বুঝে অবস্থাগতিকে তাহা নানা অবান্তর কারণে বিলম্বিত বা একেবারে নিবারিত হইতে পারে। আমরা বলিয়াছি, সাহিত্য মাত্রেই তপস্যার কার্য্য বলিয়া সাহিত্য সাধনা অধ্যাত্মক্ষেত্রে একেবারে বিফলে যায় না। কিন্তু মানুষের পক্ষে ঐটুকুই যথেষ্ট নহে। আমরা জানি ভাবুকতার চাষ করিতে গেলে

সংসারবুদ্ধি এবং বাণিজ্যবুদ্ধি শিথিল হইয়া যায় ; উহার দরুণ দুনিয়াদারীর ক্ষেত্রে ভাবুক [ব্যক্তির] কদাচিৎ হার বই জিত হয় না। সরস্বতীর সেবকগণ সংসার লক্ষ্মীর কৃপালাভে বঞ্চিত হ'ন, ইহা আবহমান কালের কিংবদন্তী এবং তাহার পোনের আনা সত্য। তাঁহাদের প্রকৃতি এবং চালচরিত্র হইতেই এইরূপ নিয়তি অপরিহার্য্য হয়। সুতরাং সংসারে হারত হইয়াই আছে, এমতাবস্থায় সাহিত্যেও হার হইয়া—এবং ইহাও পোনের আনা লোকের পক্ষেই সত্য—সাহিত্যসেবীকে একেবারে 'ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্ট' হইতে হয়। জগতের অধিকাংশ সাহিত্য সেবকের জীবনে উহাই ঘটিয়া আসিতেছে, এবং দেশবিদেশের সাহিত্যইতিহাসে ইহার শত শত দৃষ্টান্ত আছে। এমনও ঘটিয়াছে যে অনেকে শত শত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং হয়ত সমসাময়িক করতালিও যথেষ্ট পাইয়াছেন, অথচ সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহাদের নামটি উল্লেখ করিবার জন্যও উপায় অবকাশ নাই। ইহাদের সকলেরই যে সারস্বতী নিষ্ঠা বা ঐকান্তিকতার অভাব ছিল, অথবা সকলেই যে কেবল দৃষ্টতঃ সরস্বতীর পদচ্ছায়ায় বসিয়া লক্ষ্মীর অনুগ্রহই উদ্দেশ্য করিয়াছিলেন সুতরাং উভয় কূলে নগণ্য হইয়াছেন, তাহাও নহে। অনেকে হয়ত সমুচিত শক্তি এবং প্রতিভার অভাবে, কেহবা প্রতিভা সত্ত্বেও দেশের ছন্দানুবর্ত্তনের অভাবে, কেহ বা সাধারণের রুচি পরিবর্ত্তনের গতিকে স্থায়ী সাহিত্য ইতিহাসের স্মরণীয় কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। হাজার হাজার সাহিত্যসেবীর ভিতর হইতে, এক একটি শতাব্দীর মধ্যে কেবল যে দুই চারি জন মাত্র উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যেও এখন আবার বাছাই কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। কাব্য-সাহিত্যের বিষয়েত কথাই নাই, কেননা কাব্যের ক্ষেত্রে "মন্দ নহে" বলিয়া এমন কোন আদর্শ নাই। কাব্যকে "ভাল" হইতে হইবে। নচেৎ উহা অকিঞ্চিৎকর এবং উল্লেখযোগ্য বলিয়াও বিবেচিত হয় না। সুতরাং কবি জীবনে বিফলতা আরও ভয়াবহ। সমস্ত জীবন সাহিত্য সেবা করিয়াও জীবনের সঙ্গে সঙ্গে একেবারে বিস্মৃতির অতলস্পর্শে তলাইয়া যাওয়া ইহা সাহিত্যক্ষেত্রের নিত্য-নৈমিত্তিক দুর্ঘটনা। যাঁহারা সাহিত্যিক নহেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সাহিত্যবণিক, মাতৃসেবার অছিলা ধরিয়া কেবল বিমাতার উপাসক, সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহাদের অদৃষ্টের কথা ধরিতেছি না—তাঁহারাও অধিক আশা রাখেন না। কিন্তু যাঁহারা খাঁটি সাহিত্যসেবী, অন্তরের অহেতুকী প্রেরণার বশেই সরল জ্ঞানে সরস্বতীর পূজারী, কোন সাধ্যাতীত বিপাকে তাঁহাদের মধ্যে অসংখ্য ব্যক্তির সাধনাও যেন সাহিত্য সংসারে ব্যর্থ হইয়া যায় ; মন্দির প্রাঙ্গনে অনেকের ডাক পড়িলেও, দুই একজন মাত্র অভ্যন্তরে প্রবেশের সৌভাগ্য লাভ করিয়া পূজার অধিকারী হইতে পারেন। তবুত বাণীমন্দির-যাত্রীর বিরাম নাই ! অনির্ব্বাণ আন্তরিক কাকুতির বাধ্য হইয়া 'আমারই আহ্বান পড়িয়াছে' এইরূপ জ্বলন্ত বিশ্বাসে সাংসারিক দুঃখদৈন্যবাধাবিপত্তিকে তুচ্ছ করিয়া অগ্নি-শিখাপ্রেমিক পতঙ্গের মতই শত শত সাহিত্যিক বাণীচরণের উদ্দেশে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতেছেন ! এই দুর্ঘটনা, মানুষিক শক্তির এই দুর্ব্যয় কোন মতে সাহিত্যক্ষেত্রে পরিহার করা চলে না। পূর্ব্ব হইতে তাঁহাদিগকে কোনরূপ পরমর্শ দিয়া নিবৃত্ত করা কাহারও সাধ্য নহে ; তাঁহাদের নিজের পক্ষেও আপনার ক্ষমতাবোধ সাধ্যায়ত্ত নহে—কেননা শক্তির পরিচালনা এবং পরীক্ষার পূর্ব্বে স্বয়ং অধিকারী কিনা অনেকেই বুঝিতে পারে না। অনেকেই প্রাণের টানে অপরিহার্য্য বলিয়াই সাহিত্যসেবক। সংসারের লোক ইহাদিগকে প্রায়ই বাতুল, গোঁয়ার বেকুব বলে, তবে সফল হইতে দেখিলে বাহাবা দিতেও পশ্চাৎ-পদ হয় না। সুতরাং মানবজাতির মধ্যে এই একটা দল —যাঁহারা নিরাশ্রয় অথচ একান্ত, অকিঞ্চন অথচ অপরূপ,

গোয়ার্ত্তমীর বশে আপনাদের মেজাজী ভাবেই খুসী। দুনিয়াদারীর ক্ষেত্রে নানাদিকে বিফল অথচ মনানন্দে বিভোর! সংসার তাহাদের এই আনন্দ কখনও সম্পূর্ণ কাড়িয়া লইতে পারিল না! ইহাদের চরিত্র মধ্যে ইতর স্বার্থসংশ্রবের বহির্ভূত একটা অসাধারণ পদার্থ যে আছে, তাহা সকলেই সন্দেহ করেন! এই সমস্ত গোঁয়াড় গোবিন্দ এবং বাক্যবাগীশকে সংসার কখনও পথে আনিয়া নিয়মশৃঙ্খলায় আবদ্ধ করিতে পারিল না। কবি, দার্শনিক, ঐতিহাসিক উপন্যাসিক, সন্দর্ভকার—যাহাদের মধ্যে প্রতিভার আগুন, কিঞ্চিৎমাত্র আছে তাহাদের সকলেই ন্যূনাধিক একশ্রেণীর জীব! ইহাদের নিকট সোণামোহর অপেক্ষা কথাই বরং অধিক মূল্যবান্। ইহাদিগকে যদি পছন্দ করিতে দেওয়া হয় "ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের মহামান্য সম্রাট্ হইতে চাও, না অপমানী সেক্‌সপীয়র হইতে চাও"—ইহারা প্রাণপণে শেষোক্তের দিকেই ঝুঁকিবে। এস্থলেই উহাদের সনাক্ত করার পক্ষে প্রধান পরিচিহ্ন। স্বয়ং প্রকৃত সারস্বত কি না তাহার নিরূপণ এবং আত্মবিচারের পক্ষেও উহাই মাপকাঠি।

অধ্যাত্মকেন্দ্রের অভাব।

সংসারে এই একটা দল আছেন যাহারা অপর সমাজের কথাই ভাবেন, মানবজাতির জীবন গঠনে এবং পরিচালনেও সাহায্য করেন কেবল নিজের কথাই অনেক সময় চিন্তা করেন না। নিজের বিষয়ে ইহাদের কোন জ্ঞানকৃত পদ্ধতি বা শাস্ত্র নাই, ইহারা 'স্বভাবে'র দ্বারাই পরিচালিত। ইহাদের জীবনতত্ত্ব এবং জীবনের সাধনাই যখন হইতেছে 'স্বাতন্ত্র্য', তখন আত্মপ্রত্যয়ের দিক হইতে ব্যতীত ইহাদের সমক্ষে কোন নিয়ম শৃঙ্খলার বল দেখাইতে পারে না। সুতরাং সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে, এবং স্থূলভাবে বলিতে গেলে ইহাদের কোন ধর্ম্ম নাই—ধর্ম্ম বলিতে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী এবং সাম্প্রদায়িক আদর্শের কোন ধর্ম্ম নাই! যাহাতে দলভুক্ত হইয়া এবং একটা মত বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া জাগ্রত-ভাবে ঐহিক বা পারলৌকিক মঙ্গল উদ্দেশ্যে উপাসনা কিংবা জীবন পরিচালনা করিতে হয়, ইহারা তেমন কোন আদর্শের বশীভূত নহেন। অনেকেই গতানুগতিক ভাবে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান বা বৌদ্ধ। ইহার দরুণ কেহ কেহ যে একটা অভাব বোধ করেন না এমন কথা বলিব না। কিন্তু হাজার বৎসর পূর্ব্বকার সামাজিক অবস্থাজনিত মতবাদের সঙ্গে অনেকেই নিজের সামঞ্জস্য করিতে পারে না—এই কারণে আধুনিক কালে সকল দেশের বুদ্ধিজীবি ব্যক্তিগণের মধ্যে আপন ধর্ম্মের প্রাচীন আদর্শ ন্যূনাধিক বিপ্রতিষ্ঠ হইতেছে। যা হোক এক্ষেত্রেই যে সাহিত্যিক এবং শিল্পী জীবনের প্রধান সমস্যা এবং পরম সঙ্কটের স্থল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। হৃদয়ের এবং সমগ্র জীবনের কল ক্রিয়াচিন্তার গৌণ বা মুখ্য লক্ষ্য স্বরূপে জীবনাতীত কোন কেন্দ্র বিন্দুর দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ করিতে না পারিলে, সংসারের সকল কর্ম্মে সুখ দুঃখে সকল অবস্থায় ঐ কেন্দ্রবিন্দুর অভিমুখেই চলিতেছি এইরূপ জাগ্রত জ্ঞান না থাকিলে মনুষ্যজীবনের প্রধান অবলম্বনটুকুই থাকে না। দুনিয়ার ক্ষেত্রে নিরালম্ব এবং হতমান সাহিত্যসেবীর পক্ষে ত কথাই নাই।

অথচ সাহিত্যসেবী কখনও জড়বাদী হইতে পারেন না।

অথচ সাহিত্যসেবী যে কখনও প্রকৃত প্রস্তাবে জড়বাদী হইতে পারেন না! তিনি ভাবজগতের অধ্যাত্মজগতের অধিবাসী! বিশ্বজগৎ ভাব হইতে সৃষ্ট; ভাবই জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান পদার্থ; তিনি স্বয়ং বিশ্বভাবুকের অংশ এবং তাঁহার দয়া নিযুক্ত হইয়াই সংসারের ভাবকেন্দ্রে নিজের শক্তি প্রয়োগ করিতেছেন! প্রয়োগ যথাযথ না হইয়া বিফল হইতে পারে কিন্তু, কিন্তু ভাবইযে জগতের Fulcrum এবং পরিচালন কেন্দ্র, ইহা বিশ্বাস না থাকিলে তিনি প্রকৃত সাহিত্যসেবী নহেন, তাহার সাহিত্যসেবীর ভেক গ্রহণ করাও

আত্মবঞ্চনা। স্বয়ং প্রকৃত প্রস্তাবে অধ্যাত্মবাদী অধ্যাত্মক্ষেত্রে ক্রিয়ান্বিত হইয়াও এবং এইরূপে শ্রেষ্ঠশ্রেণীর মনুসন্তান হইয়াও, আত্মধর্ম্মের প্রধান স্বত্ব এবং সুফল হইতে সাহিত্যসেবী কেন বঞ্চিত হন? তাঁহার সাহিত্যসেবা এই জগতের হিসাবে নিষ্ফল হয় হউক, কি করিয়া উহা হইতে পরিপূর্ণ অধ্যাত্ম ফল চয়ন করা যায়? কি করিয়া সমস্ত সাহিত্যকার্য্য এবং সাহিত্যসাধনাকে মহর্লোকের কেন্দ্রানুযায়ী এবং ফলভোগী করিয়া পরিচালিত করা যায়? সমস্ত ভাব-ক্রিয়া এবং শক্তির প্রবাহধারা কি করিয়া জীবনাতীত চরম-বিন্দুর অভিমুখী করা যায়? এই প্রশ্নের কার্য্যকরী মীমাংসায় উপনীত না হইতে পারিলে এইকালে অধিকাংশ সাহিত্য-সেবীর জীবন কখনও নিদারুণ নিরাশ্বাস এবং চরমের দেউলিয়া দশা হইতে রক্ষা পাইবে না।

বাণী পন্থীর জীবনে অধ্যাত্মকেন্দ্র।

মনে রাখিবেন, আমরা কোনরূপ নীতিশাস্ত্র বা ধর্ম্ম উপদেশের উপস্থাপন করিতেছি না। যাহা প্রকৃত সাহিত্য-জীবনের পক্ষে অপরিহার্য্য ইহা তাহারই নির্দ্দেশ। প্রকৃত সাহিত্যসেবী হইতে হইলে, অন্ততঃ পোনের আনা সাহিত্য-সেবীকে চূড়ান্ত নিষ্ফলতা এবং অবশ্যম্ভাবী দীর্ঘনিশ্বাস হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, এই অধ্যাত্মকেন্দ্র স্থির রাখা অপরিহার্য্য। আত্মবিকাশ এবং আত্মপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই কার্য্যপর হইয়াছি, সাংসারিক কর্ম্মফলের দ্বারা কিছুই আসে যায় না, এইরূপ অন্তর্বুদ্ধির ভিত্তিমূলে স্থির হইতে না পারিলে সাহিত্যিকের জীবন যেমন জগৎতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গত হইতে পারে না, তেমনই হৃদয়ের সুখ-তৃপ্তি এবং আভ্যন্তরীণ পরিতুষ্টির বিষয়েও যথেষ্ট হয় না। যিনি সাহিত্যক্ষেত্রে কোন উচ্চ আশা পোষণ করেন, তাঁহাকে সাংসারিক স্বার্থ এবং টাকা কড়ির বিষয়ে যেমন নিস্পৃহ হওয়া চাই, তেমনি খ্যাতি প্রতিপত্তির বিষয়েও নিরাশ হওয়া চাই। অন্যথা তাঁহার পক্ষে চরমের দীর্ঘনিশ্বাস অনিবার্য্য। তাঁহার জীবনও নিষ্কলঙ্ক হইয়া আত্মতন্ত্রের একটা স্বাধীন সাধনারূপে কখনও পরিণত হইতে পারিবে না। কচিৎ কোন কোন সাহিত্যিককে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট, মনুষ্যদ্বেষী, নিদারুণ অহঙ্কার বিষে জর্জ্জর এবং খলকল্প হইতেও দেখা যায়; ইতর সাধারণের ন্যায় নানান চরিত্র দোষও তাহাকে স্পর্শ করে। ইহা কেবল সংসারের বিষস্পর্শের বিরুদ্ধে আপন আত্মার রক্ষা কবচের অভাব হইতেই ঘটিয়া থাকে।

যিনি সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, সর্ব্বপ্রথম তাঁহাকে আত্মবিচার করিয়া স্থির করিতে হইবে, তিনি উপরোক্তরূপে নিস্পৃহ এবং নিরাশ কি না? তাঁহার অন্তঃকরণ নিজের সাংসারিক অদৃষ্টে এবং যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট থাকিতে না জানিলে, তিনি যে সাহিত্যসেবা গ্রহণ করিয়া খুব সম্ভব ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্ট হইবার পক্ষেই চলিয়াছেন! সরস্বতী সাহিত্যের দেবতা, তিনি শুভ্রমূর্ত্তি এবং সাধক হৃদয়ের শুভ্রশতদলবাসিনী। সরস্বতীর অধিষ্ঠান-কমলের এই অপস্পাশা শুভ্রতার লক্ষণ প্রত্যেক বাণিসেবককেই আদৌ ধারণা করিতে হইবে। হৃদয়ের কদর্য্যতা বা জড়-লিপ্সার বাতাসে সারস্বতী প্রতিভার প্রফুল্ল শুভ্রকমল শুকাইতে আরম্ভ করে; দেবতার অধিষ্ঠান পদবী লাভ করার যোগ্যতা হারাইয়া ফেলে। সাহিত্যসেবকের জীবনের আবহাওয়া এবং অবস্থা-গতিকে তাহার বিভূতিক সারস্বত শক্তি এবং প্রতিভার হ্রাস বৃদ্ধি হয়, সময় সময় প্রতিভার একেবারে বিলোপ ঘটে, অনেকে জন্মলব্ধ শক্তি হইতে একেবারে বঞ্চিত হইয়া শুষ্ককাষ্ঠে পরিণত হইতেও দেখা যায়। এমনও দেখা যায় যে, কবি ভগবানের অমৃত প্রসাদ লাভ করিয়াও স্বকীয় জীবনের আন্তরিক হলাহলে উহাকে দিন দিন বিষাক্ত করিয়াই চলিয়াছেন; তাঁহার অগাধ অমৃতের উৎস একেবারে শুষ্ক হইতেও বিলম্ব নাই; আগে যে সুধারস অযাচিত ধারা প্রবাহে উৎসারিত হইত এবং ধন্য করিয়া বিশ্বের জন্য উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে উছলিয়া পড়িত, এখন তিনি স্বয়ং উহার কাঙ্গালী হইয়া কাঁদিতে থাকিলেও একটি বিন্দুও মিলে না! অবিজ্ঞাত কারণে এবং নিদারুণ অভিশাপে যেন জীবন পরিব্যাপী আনন্দের উৎসমুখ বন্ধ হইয়া গিয়াছে! ইহা

ভাবুকজীবনের অনুভূত সত্য। বিধাতার অনুগ্রহে জন্মস্বত্বে প্রাপ্ত করিয়াও অনেকে যে যাবজ্জীবন উহাকে রক্ষা করিতে পারেন না, তাহা কেবল আধ্যাত্মিক অধঃপাত এবং হৃদয় কমলের প্রসন্নতার অভাব হইতেই ঘটিয়া থাকে। উহার তারতম্যে সাধকের পক্ষে সিদ্ধিরও তারতম্য হয়।

সাহিত্যসাধক হৃদয়কে নিয়ত অনাবিল এবং একনিষ্ঠ রাখিতে অতন্দ্রিত হইবেন। গুহাযাত্রীর জীবনে ক্ষণেকের জন্যও নিশ্চিন্ত নিদ্রার অবসর নাই—দিবারাত্রি তাঁহাকে জড়তাস্রোতের বিপরীত মুখে হাল ধরিয়া অগ্রসর হইতে হইবে! তাঁহার অন্য কোন স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম নাই; তিনি বাণীপন্থী। আত্মজীবনের জ্ঞানকাণ্ড এবং কর্ম্মকাণ্ড একতায় সুসঙ্গত করিয়া, ভাবের সাধনাকে এবং বাগর্থের প্রতিপত্তি সাধনকেই নিজের পরমার্থ জানিয়া, তাঁহাকে সমস্ত জীবন জাগ্রতভাবে একাভিমুখে চলিতে হইবে। সরস্বতীই তাঁহার ইষ্টদেবতা; সারস্বতী কৃপা এবং সারস্বত আনন্দই তাঁহার ইহপরকালের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম। তাঁহার ভগবান তাঁহাকে এই পথেই অমৃত দান করিবেন! আমাদের দেশে ধর্ম্মসাধকের যাহা মূল সূত্র, সাহিত্যসেবকের পক্ষেও তাহাই "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী!" এই সূত্র মনুষ্যের সকল সাধন বিভাগেই খাটে। এইরূপে জীবনে সাহিত্যসাধনাকে ধর্ম্মসাধনার নামান্তর করিতে না পারিলে, জ্ঞান ও কর্ম্ম, আশা এবং অনুভব একাগ্র না হইলে, সাধক নির্বিকল্প হইতে না পারিলে যেমন আত্মশক্তির বিভ্রান্ত অপব্যয় নিবারণ করা যায় না, তেমন সাহিত্যে আত্মপ্রাপ্তি বা সিদ্ধি লাভও ঘটে না। যেই সাধক ইহা মানিতে পারেন না বা বিশ্বাস করেন না, তাঁহার পক্ষে সাহিত্যিক হইতে যাওয়া বিড়ম্বনা।

সাহিত্যে প্রতিভা তত্ত্ব।

সাহিত্যে প্রতিভা কি, তাহা সংজ্ঞাবদ্ধ করা কঠিন। তবে প্রতিভা বলিতে যে অনির্ব্বচনীয় পদার্থের সঙ্কেত হয় তাহাকে বিশ্লেষণভাবে দর্শন করিতে গেলে বলা যায় যে, প্রতিভা অন্তঃকরণের নির্ম্মলতা, জ্ঞাননেত্রের সুবিশদ অথচ দূরদূরান্তগামী দৃষ্টি, আপনাকে প্রসারিত করিবার জন্য আনন্দশীল সহানুভূতি শক্তি এবং আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য সৃষ্টিশীল বিভাবনা শক্তির অসাধারণ আবেগ এবং তীক্ষ্ণতার অনির্ব্বচনীয় সমষ্টি। মনুষ্য বিশেষে অন্তঃকরণ দৃষ্ট এই অপরূপ দীপনী, রসনী এবং প্রকাশনী শক্তির অপরিজ্ঞাত কারণটিকেই সাহিত্যদার্শনিক মোটামুটি 'প্রতিভা' সংজ্ঞা দিয়াছে। কি কারণে ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে এই অপরূপতার সংঘটনা হয়, তাহার খোঁজ করিতে গিয়া মনুষ্যের দর্শন বিজ্ঞান হয়রান হইয়া গিয়াছে। তবে ইহা নিশ্চিত যে অনাদি কাল হইতে মনুষ্যসমাজে এবং মনুষ্যের অদৃষ্টে এ যাবৎ যখন যাহা উন্নত, পূর্ব্বাবস্থায় ব্যতিক্রমমূলক উন্নতি, পরিবর্ত্তন বা বিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহার সমস্ত এই অপরূপাকর্ষক আবির্ভাব হইতেই ঘটিয়াছে।

প্রতিভাবান ব্যক্তির অন্তঃকরণ বা অন্তশ্চক্ষুর এই নির্ম্মলতাকেই উহার বাহ্যক্রিয়া বিবেচনায় আমরা বাহিরের দিক হইতে বলি—সরলতা। সাহিত্যের সাধক যে কোন বিভাগের প্রতিভাশালী শিল্পীর প্রধান গুণোপাদান যেমন সরলতা, তেমন তাহার প্রধান ক্রিয়াসাধনটিই হইতেছে—সরলতা।

কল্পনায়, রচনায়, আচারে, ব্যবহারে, সৃষ্টি কিম্বা দর্শনের কার্য্যে ঋজুতা, অকৈতব এবং অবৈকল্যই প্রতিভার প্রধান সাধন। যেমন সাহিত্যসেবকের তেমন পাঠক বা সাহিত্য প্রেমিকের পক্ষেও উহাই প্রধান সাধন। সকল দেশের সকল প্রতিভাশালী বাণীপন্থীর মধ্যে এই একটা বিশেষ গুণ লক্ষ্য করিবেন যে তাঁহারা আর যাহাই হউন, তাঁহারা সরল—দোষে, গুণে, পুণ্যে এবং পাপেও সরল! উহারা যেন সাহিত্য সেবায় যোগ্যতা লাভ করিবার পূর্ব্বেই এই গুণটি আয়ত্ত করিয়াছিলেন অথবা জন্মসূত্রেই লাভ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন! ইহা নিশ্চিত জানিবেন যে, জীবনে সরলতার সাধনা ব্যতীত যেমন অন্তঃকরণ নির্ম্মল হয় না, তেমন সারস্বত সাধনার ক্ষেত্র এবং সরস্বতীর পাদপীঠ টুকুও

পরিস্কৃত হয়না। নিরেট হৃদয়বাদার এবং কুটিল হৃদয়ের জন্য সাহিত্য ক্ষেত্র নহে—উভয়ের মধ্যে আকাশ পতালের অসামঞ্জস্য আছে।

সাহিত্যে সরল দৃষ্টি ও আনন্দ দৃষ্টি।

সুতরাং এই সরলতার উপরেই সাহিত্য সাধককে সর্ব্বপ্রথম অধিকারী হইয়া দাঁড়াইতে হয়। উহার পরেই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কথা—জগতের সম্বন্ধে, পদার্থমাত্রের সম্পর্কে আনন্দদৃষ্টি এবং আনন্দযোগ! হৃদয়কে আনন্দধর্ম্ম এবং জীবনকে আনন্দকর্ম্মী করিতে না পারিলে এই আনন্দযোগ সিদ্ধ হয় না। উহা ব্যতীত দর্শনে কিংবা সৃজনে, গ্রহণে কিংবা প্রকাশে প্রাণে উৎসাহ কিংবা উচ্ছ্বাসও জন্মে না। বিশ্বজগৎ কেবল শুষ্ক জ্ঞানকর্ম্মভাবের বিরস প্রবাহ সমষ্টি বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে। দুনিয়ার সাড়ে পোনের আনা লোক সংসারকে এ'ভাবেই অনুভব করিয়া যাইতেছে! এস্থলেই প্রাতভাতত্ত্বে ঈশ্বরানুগ্রহের লক্ষণ! অরসিক ব্যক্তিকে উহার ব্যাখ্যাপথ কথার দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে পারি না। কেবল এইমাত্র বলিতে পারি যে, সর্ব্বাদৌ 'সরলতা' সিদ্ধ করিতে না পারিলে, জড়-লিপ্সা জড়াভিমান বা তামসিকতার কবলমুক্ত হইয়া হৃদয় কমলের প্রসাদ সিক্ত না হইলে, জীবনের অধিকাংশ সময় মন উন্নততর ক্ষেত্রে রতি এবং আরতিশীল হইতে না পারিলে, ওই অনুগ্রহ লাভ অসম্ভব। সুতরাং আমাদের সাধ্যের মধ্যে কেবল এই 'সরলতা'।

হৃদয় সরলতা সিদ্ধ করিতে পারিলে উহা ক্রমে সজ্জিত বীণাতারের অন্তর ভাবের স্পর্শে অথবা বহির্জগতের সংশ্রবেই স্পন্দিত ঝঙ্কারিত হইতে থাকে; সমস্তকে রসের দৃষ্টিতে গ্রহণ করিয়া আনন্দময় বিগ্রহরূপে উপভোগ করে। কবি বা সাহিত্য সেবকের হৃদয় উহা হইতেই নিরেট জগৎবস্তু এবং বিজ্ঞানদর্শনের তত্ত্বগুলি পর্য্যন্ত প্রাণের আনন্দপুরীতে গ্রহণ পূর্ব্বক বাক্যার্থের আনন্দময় বিগ্রহে অবতারিত করিতে সক্ষম হয়। উহা হইতেই রচনার মধ্যে আন্তরিকতা এবং অধ্যাত্ম শক্তি অনুস্যূত হইতে পারে। মনুষ্যের জীবন মধ্যে এই সরলতা নিজেই আত্মপুরস্কার বহন করে। উহাতে অন্তর্বাহির মধুর এবং মধুময় করিয়া, হ্লাদিনী বৃত্তিকে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর তত্ত্বগামী করিয়া, চিত্তকে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর তত্ত্বগামী করিয়া পরিশেষে অনন্তের সংস্পর্শে সমাহিত করে! উহা স্বয়ংএকটা পুণ্য আচারে পরিণত হইয়া সাধকের সমস্ত জীবনে এবঙ্ক তাঁহার দেহ দর্পণেও অলৌকিক ছটা বিস্তার করে। তাঁহার দৃষ্টি হইতে সমস্ত বক্রতা এবং দৃষ্টিসমক্ষে নিত্যবিলম্বিত অপবিদ্যার যবনিকা অপসারিত করিয়া উহার প্রত্যক্ষ দর্শনের শক্তি বিকশিত করিতে পারে! তাঁহার হৃদয় বিশ্ব-তালে নাচিতে থাকে! অনন্তের 'অবাঙ্মনসো গোচর নিত্যসঙ্গীত শ্রুতিগম্য হইয়া অনন্ত ভাবময় এবং অনন্তছন্দমুখর রাগিণীলয়ে বাজিতে থাকে। তিনি প্রকৃত কবিহৃদয় এবং কবিদৃষ্টি লাভ করিতে পারেন। এইরূপেই সাহিত্যিকের বাণীসাধনা সহজস্রোতে পরমার্থ সাধনায় পরিণতি লাভ করিয়া বিশ্বজীবনের সঙ্গে সমতা এবং আপন জীবনের চরম সার্থকতায় উপনীত হইতে পারে।

ভারতীয় 'ধর্ম্ম' আদর্শের সহিত উহার সামঞ্জস্য।

চিত্তকে নির্ম্মল করিয়া আত্মাকে সমুন্নত ভাবযোগী এবং আনন্দযোগী করিতে পারিলে উহা কেন ধর্ম্ম সাধনার নামান্তর হইবে, তাহা অন্ততঃ ভারতবর্ষে বিশদ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে না। আমাদের জাতিগত স্বানুভূতির সম্বন্ধে ধর্ম্মসাধনা নিদানতঃ কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সমুন্নতভাবে আন্তরিক সাধনা ব্যতীত আর কিছুই নহে—বিশ্বজগতের চরমভাবুকের আত্মতালের সঙ্গে সঙ্গতি এবং সম্মিলন লাভের জন্য সাধনা। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রকার মনু ধর্ম্ম বলিতে চিত্তবৃত্তির নিরোধমূলক এবং মানবাত্মার স্বধর্ম্মাভিমুখী গতিসাধক কেবল দশসংখ্যক ভাবের সাধনাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমাদের যোগশাস্ত্র চিত্তবৃত্তির পূর্ণ নিরোধকেই বিশ্বাত্মার সহিত যোগ বলিয়া অভিন্নভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছে। মনুষ্যের অন্তরে যেই দ্রষ্টা আছেন, তিনি বিশ্বদ্রষ্টার অংশভূত অথবা তাহা হইতে অভিন্ন বলিয়া ভারতের সকল আস্তিকবাদী দার্শনিক লোক-

দেশান্তরের সকল অধ্যাত্মসাধক ফকির যোগী মিষ্টিক' বা পথিক মাত্রেই কোন না কোন প্রকারে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। আপনার ভিতর দিয়া ব্যতীত ধর্মের দ্বিতীয় যাত্রাপথ নাই জড়তার অন্তবর্ত্তনপথে উন্নত এবং উন্নততর ভাবযোগ সাধন পূর্ব্বক, ক্রমে চিত্তবৃত্তির নিরোধ সমাধা করিতে পারিলেই যে দ্রষ্টা আপণ স্বরূপে প্রয়াণ এবং অবস্থান করিতে পারেন, এই বিষয়ে অশেষবিশেষ প্রণালীভেদের সকল অধ্যাত্মসাধক একমত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

সারস্বতের 'যোগ' আদর্শ।

সুতরাং, বিচারের সাহায্যে বুঝিতে হইলে, বুঝিতে বিলম্ব হয়না যে সাহিত্যিক ভাবের সাধক বলিয়া স্বভাবেই নিরোধ পথে এবং জড়তাসেবী হইতে ন্যূনাধিক উচ্চতর অধ্যাত্মলোকে যাতায়াত করিতে বাধ্য। চিত্তের প্রাথমিক নিরোধ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বলিয়াই তিনি সারস্বত। বলিতে হইবে না যে, এই কারণে আমাদের যোগশাস্ত্র ঋষি বা যোগীর অবস্থাকে কবিত্বলাভের পরপর্ত্তী অবস্থা বলিয়াই নির্দ্দেশ করেন। ভাবুক সাহিত্যিক শিল্পী বা কবিমাত্রেই স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্বানুরোধে জড়তা-অতিরেকী আধ্যাত্মপথে চলিতেছেন। তিনিও যে—হয়ত সম্পূর্ণ অজানিতে এবং অতর্কিতে—একজন পথিক, উন্নত ভাবুকতা মাত্রেই যে একটা যোগের কার্য্য, তাহা অন্তর্দৃষ্টিশালী সাহিত্যিক মাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। সুতরাং এইস্থানে দাঁড়াইয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশেই বলিতে পারি যে সাহিত্যিক এই স্বতঃসিদ্ধ ভাবুকতা এবং ভাবানন্দের বীজকে উন্নতর জীবনভূমিতে একাগ্রতায় প্রতি-রোপিত করিতে পারিলেই, উহা পরিপূর্ণ অধ্যাত্মমহীরুহে পরিণত হইয়া সমুন্নত ধর্ম্মফল প্রসব করিতে পারে।

সাহিত্যের "অমৃতস্য পুত্রাঃ।"

সাহিত্যজগতের অনেক কবি এই চূড়ান্ত অমৃতের আস্বাদন করিয়া গিয়াছেন। মানবপ্রেম এবং অতি সাধারণ রূপতৃষ্ণা হইতে এই পরমার্থ ফল চয়ন করিয়াছিলেন। আমাদের বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস—বিশেষতঃ চণ্ডীদাস! শিহ্লনের কথা বিল্বমঙ্গল উপাখ্যানের ভিতর দিয়া বাঙ্গালীর নিকট সুপরিচিত। হাফেজ জামী ও রূমী প্রভৃতি সুফী কবিগণ সখ্যপ্রেম হইতে এই তত্ত্বে উপনীত হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবগণের পঞ্চপ্রেম সাধনাও বিশেষভাবে ভাবুকতা এবং কবিত্ব সাধনা ব্যতীত আর কিছুই নহে! ইংলণ্ডের রসেটি ও কীট্‌স রূপের পিপাসা হইতেই অনন্তসুন্দরের তত্ত্বে, শেলী ব্রাউনীং এবং কভেণ্ট্রি প্যাটমোর প্রেম হইতেই অনন্ত প্রেমময়ের তত্ত্বে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আমাদের ঘরের মধ্যেও উহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই! নিসর্গের সৌন্দর্য্য তৃষ্ণা হইতে এবং মনুষ্যহৃদয়ের ভাবুকতাকে সংগীতকবির নেত্রে উপভোগ করিতে করিতে রবীন্দ্রনাথ যে তত্ত্বে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহা হইতে ইতিমধ্যেই অনেকে তাঁহাকে 'ঋষিকবি' বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্লেটো বা প্লোটিনস হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কালের ফিক্‌টে এবং হেগেল, বা নারদ-বাদরায়ণ শাণ্ডিল্য হইতে জীব গোস্বামী প্রভৃতির নাম করিব না—তাঁহারা সতর্ক মতবাদী দার্শনিক, অনেকে গোড়া আদর্শের সাধক। ব্রাউনীং কেবল মনুষ্যত্বে প্রীতিমান্ হইয়া সর্ব্বপ্রকার মনুষ্যের অন্তশ্চরিত্রে কেবল সহানুভূতি পথে ধ্যানী এবং ধারণাশীল হইয়াই পরিশেষে অখণ্ড চিদানন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ব্রাউনীংহৃদয়ের গৌরববলিষ্ঠ এবং আত্মনিষ্ঠ শান্তরস তাঁহার লেখনীমুখে সংক্রামিত হইয়া পাঠকের হৃদয়কে আবিষ্ট করিতেছে! মনুষ্যচরিত্রে অনন্যপরায়ণ প্রেম-সহানুভূতি হইতে যে চূড়ান্ত অধ্যাত্মফল চয়ন করিতে পারা যায়, উহার সমুজ্জল দৃষ্টান্ত যেমন ব্রাউনীং, তেমনি, নিসর্গ প্রকৃতির অন্তর্যোগ সাধনা হইতে—নিসর্গের ভিন্ন ভিন্ন রূপ এবং অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আন্তরিক সহানুভূতি এবং ধ্যান সাধনার পথেই —যে পরাস্ত অধ্যাত্মরসের তত্ত্বসাগরে আত্মহারা হইতে পারা যায় তাহার দৃষ্টান্ত ওয়ার্ডসোয়ার্থ! জগতের সকল কবিগণের মধ্যে কেবল এই একজন কবিই জোর করিয়া বলিতে পারেন—

"I love not man the less but Natare more."

এইদিকে দুই রকমের কবিসাধক আছেন ;—

মানুষের কেহ অতি ভালবাসি'
মজে অবিরল মানুষ-রসে ;
প্রকৃতির হিয়া গন্ধ-পিয়াসী
চিত্তে তাহার কেহ বা পশে—
নরের হৃদয়-কোলাহল-পুরে
আকুলচিত্তে, ডুবায়ে কাণে
নিসর্গহিয়া স্তব্ধ পাথারে
শোনে নিখিলের জীবন গানে।

'অমৃত' পথের আনুষ্ঠানিক।

প্রকৃতির শান্ত-নিস্তব্ধ চিত্তসাগরে অন্তর্যোগী হইয়া ডুব দিতে জানিলেই বুঝিতে পারা যায়, যেন ওই নিস্তব্ধতা হইতেই সৃষ্টি-তরঙ্গ উপজাত হইয়া বিশ্বজগতে নানামুখে নানারূপে প্রকটিত হইয়া চলিয়াছে! জীব জগৎ জ্ঞানভাব এবং ইচ্ছাশক্তির নানামুখী তরঙ্গ ঝঙ্কার কোলাহলেই মুখরিত! এই কোলাহলের মধ্যে যাঁহাদের চিত্ত ধ্যানস্থির হইতে পারে, তাঁহারা নিসর্গের মধ্যেই আদিম জীবনোচ্ছ্বাসের আত্মাশক্তির পরিচয় লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারেন। ধন্য হইবেন বলিব, কারণ উহার যাহা ফল তাহা পাকিলেই, মনুষ্যের চূড়ান্ত নৈতিক অভ্যুন্নতি এবং ধর্ম্মক্ষেত্রীয় অধ্যাত্মতার সঙ্গে অভিন্ন হইয়া যায়। এই পথের যাত্রী হইতে হইলে কিরূপে আনুষ্ঠানিক হইতে হয়, ওয়ার্ডসোয়ার্থ স্বয়ং জগতের উপকারার্থে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—

Never did I, in quest of right and wrong
Tamper with conscience from a private aim;
Nor was in any Public hope the dupe
Of selfish Passion; nor did ever yield
Wilfully to mean cares or low pursuits!

বলাবাহুল্য, ইহা কার্য্যতঃ এবং ফলতঃ কেবল সাহিত্যসাধন নহে—জীবন সাধনা! এবং, এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার অর্থও হিন্দু-দর্শনের চতুর্বর্গফল ব্যতীত আর কিছুই নহে। ওয়ার্ডসোয়ার্থ না হইলে, অন্যের পক্ষে কথাগুলি অহঙ্কারের মতই ঠেকিত! এই সাধক ক্রমে কোথায় উপনীত হইয়াছিলেন তাহার আভাসও রাখিয়া গিয়াছেন; কথাগুলি ইংরাজি কাব্য-সাহিত্যের সর্ব্বোচ্চশিখর রূপেই ভারতীয় পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে—

That serene and blessed mood
In which the breath of this corporeal frame,
And even the motion of our blood
Almost suspended, we are laid asleep
In body, and become a living soul;
While with an eye made quiet by the Power
Of harmony and the deep power of joy
We see into the life of things.

Tintern Abbey.

কবি এই পথে পরিশেষে ভারতীয় অধ্যাত্মসাধকের—সর্ব্বকালের আধ্যাত্মসাধকের চরমক্ষেত্রে

শান্তেনস্তমহিম্নি নির্ম্মলচিদানন্দে তরঙ্গাবলি
নির্ম্মুক্তেমৃত সাগরাম্ভসি।

প্রবোধ চন্দ্রোদয়।

নিমগ্ন হইয়াছিলেন! তিনি যে রসের আস্বাদ লাভ করিয়াছিলেন ভারতবর্ষের সাহিত্যদার্শনিক সে রসকেই লক্ষ্য করিয়া কি বলেন নাই—

সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ড-স্বপ্রকাশানন্দ চিন্ময়ঃ।
বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ॥

সাহিত্যসাধককে লক্ষ্য করিয়া এই ওয়ার্ডসোয়ার্থ পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন—

Excite no morbid passions, no disquietude
No vengeance and no hatred.

ওই অনুষ্ঠান পথেই 'মৌলিকতা' সিদ্ধি।

ওয়ার্ডসোয়ার্থের ন্যায় চলিতে জানিলেই সাহিত্যসাধক

ক্রমে আপনার সর্ব্বোচ্চতত্ত্বকে, আপনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিজত্বকে, আপনার সর্ব্বোন্নত প্রকাশকে লাভ করিতে পারেন; এবং বলিতে পারি, সাহিত্যক্ষেত্রে উহাই প্রকৃত originality বা 'মৌলিকত্ব' সাধনার পথ। নিজের মূলতত্ত্বে স্থিরপ্রতিষ্ঠা লাভ না করিতে পারিলে, সাহিত্য-সংসারে নিত্যঋণী এবং পরবশ হওয়া ব্যতীত যেমন উপায়ান্তর নাই, তেমন পরিশেষে মহাকালের দরবারে একেবারে দেউলিয়া হইয়া পড়াও অবশ্যম্ভাবী। সাহিত্যে জীবিতেচ্ছু ব্যক্তি মাত্রকেই ইহা স্থির জানিতে হইবে যে, ওয়ার্ডসোয়ার্থের প্রদর্শিত পথে চলিতে পারিলেই প্রকৃত আত্মস্থিতি, উপরন্তু অনন্যসাধারণ নবদৃষ্টি লাভ করিয়া স্বতন্ত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারা যায়। উহার দৃষ্টান্তও অন্যত্র খুজিতে হয় না—স্বয়ং ওয়ার্ডসোয়ার্থ। ওয়ার্ডসোয়ার্থের কবিদৃষ্টি কিংবা সৃষ্টির শক্তি বিপুলবিস্তারিত অথবা অনন্যসামান্যভাবে প্রবল ছিল বলিয়া কোনমতেই ধারণা করিতে পারি না। তবু দেখিতেছি, এই কবি আপনপথে চলিয়াই সাহিত্যক্ষেত্রে নিসর্গ-কবিতার যে নূতনতন্ত্র এবং নবসুর আনিয়াছিলেন তাহাই সাহিত্যজগতে অনন্যসাধারণ এবং অপূর্ব্ব হইয়া আছে। তিনি উহাতেই শ্রেষ্ঠকবি শ্রেণীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া আছেন।

সাহিত্যক্ষেত্রের যম-নিয়ম প্রভৃতি।

সারস্বতী প্রতিভা সাধারণজীবনের জড়তাক্ষেত্র এবং মনুষ্যের অন্নময় ভূমির নিম্ন বৃত্তি ছাড়াইয়াই, মনোময় লোকে সমুন্নত ভাবুকতা, সত্যদৃষ্টি অথবা মহাপ্রাণ উচ্ছ্বাসের উপর আয়ুতব স্থির করত (রেখার-পর-রেখাক্রমে অথবা বৃহৎ তুলিকাসঞ্চালনে) মনুষ্যের চিত্তপটে সুস্থির রসমূর্ত্তির সৃষ্টি করিতেছে! সকল শ্রেষ্ঠ রচনাই কেবল এইরূপে সারস্বত ক্ষেত্রীয় যমনিয়ম আসন-প্রাণায়াম এবং ধ্যান-ধারণা-সমাধির প্রণালীতেই রচিত হইতে পারে। সকল শ্রেষ্ঠ কবিই কোন না কোনমতে আত্মতত্ত্বে স্থিরনিষ্ঠ সাধক। কেবল ব্যক্তিগত রুচি এবং প্রকৃতিভেদে, এবং সাধনার প্রকারভেদেই এস্থলে সাহিত্যক্ষেত্রে অনন্তছন্দস্রোতের প্রকাশ ঘটিয়া যাইতেছে। এইরূপে একই আত্মশক্তির লীলা হইতে অনন্তছন্দবাহিনী বিশ্বধারা ছুটিয়া চলিয়াছে!

সারস্বতক্ষেত্রে মনঃসংযমের দৃষ্টান্ত ফল।

দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিব। যেমন, প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্রক্ষুদ্র ভাববস্তু অথবা অবস্থাবিশেষ ধরিয়া, অধ্যাত্মতত্ত্বের সঙ্কেত এবং অপরূপ রসাভাস প্রদান করা মৈতরলিঙ্কের এবং পরিণতবয়সের রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব। পাঠকের চিত্তকে ভাবনিবিষ্ট করিয়া অব্যাকুলভাবে সমাহিত রাখিবার 'ধাত' তাঁহাদের নাই। ভাবের জগতে মধুলুব্ধ ভৃঙ্গের মত এই যে নিত্যচঞ্চল অথচ অচল দৃষ্টি, উহা সহজে সিদ্ধ হয় নাই। বাহির হইতে যাহাই প্রতিভাত হউক, মনোদৃষ্টির সমাহিত নিষ্ঠা ব্যতীত, বাহ্যিক জীবনের অন্তরালে অপরূপ যমনিয়ম এবং বিবিক্তসেবী মনোজীবন ব্যতীত, কাহারও পক্ষে এই সুপ্রতিষ্ঠা ঘটিতে পারে নাই। এই সিদ্ধির পশ্চাতে, আপনার অন্তঃপুরীতে অসামান্য বিবিক্ত সেবা, হৃদয়ের অসামান্য আবেগ, ক্ষণতন্ময়তা এবং অসাধারণ মধুস্পৃহা নিঃসন্দেহে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। অন্তরদৃষ্টির দ্রুতি এবং লঘুতা হইতে যে কবিতার জন্ম হয়, উহার হৃদয় দ্রুতসঞ্চারশীল ভাব-ছন্দের ব্যায়ামানন্দে মুগ্ধ হইতে থাকে। আমাদের রবীন্দ্রনাথের কবিতা হইতে এইরূপ আনন্দই লাভ করি। লীলার মধ্যে ওই দ্রুতিই দিব্যোন্মাদবশে মুহূর্ত্তেমুহূর্ত্তে স্বর্গপাতাল পারাপার করিয়া উড্ডীয়মান এবং লীলায়িত হইতেছে! অন্যদিকে, অন্তদৃষ্টির দীপ্তি এবং স্থিরসংবেশ হইতে যে কবিতা জন্মে, উহাতে হৃদয় ভাবে তদ্গত হইয়া অতলের শান্তরসে সন্নিবেশ লাভপূর্ব্বক পরিতৃপ্ত হইতে থাকে। ওয়ার্ডসোয়ার্থের কবিতায় এ রস লাভ করি। ম্যাথু আর্ণল্ড কবির এ শক্তিকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন—নির্ব্বিশেষ এবং নিরাভরণ প্রবেশশক্তি—bare sheer penetrative power. আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্ম্মী এ সকল কবির কোনবিশেষত্বই নিঃসঙ্গজীবনের দীর্ঘবিবিক্ত এবং জড়তাবিস্মৃত সাধনা ব্যতীত স্থিরতা লাভ করিতে পারে নাই। তাঁহাদের কাব্যাকৃতিত্বের সমস্ত গুণ বা দোষ এইরূপে অন্তর্জীবনের মহত্ত্ব হইতে, অধ্যাত্মলোকের ভাবজীবন এবং বুদ্ধজীবনের স্বধর্ম্ম হইতে, সংক্রামিত হইয়াই কবিতায় উপজাত হইতেছে।

এমার্শন একস্থলে বলিয়াছেন, প্রতিভার অর্থ, অসামান্য তপঃক্লেশ বরণ করিবার অপরিসীম শক্তি! সাহিত্যিকের পক্ষে এ কথার যদি কোন অর্থ থাকে, তবে উহা সাহিত্য-তপস্যার পূর্ব্বোক্ত যমনিয়মাদি ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে।

সারস্বতী প্রতিভায় স্বত্ব এবং দায়িত্ব।

প্রসঙ্গক্রমে এমন একটি বিষয়ের সম্মুখীন হইয়াছি, এস্থলে যাহার সম্পূর্ণ আলোচনা অসম্ভব; অথচ না করিলেই সারস্বত ধর্ম্মের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিবে। যিনি সারস্বতী প্রতিভা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে সর্ব্বসময় মনে রাখিতে হয় যে, যিনি সৌভাগ্যক্রমে মানবজগতের শ্রেয়োত্তমা জৃম্ভনী এবং পরিচালনী শক্তির অধিকারী হইয়াছেন; মনুসন্ততির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৌলিন্যে এবং ব্রহ্মাবংশে জন্মলাভ করিয়াছেন! তিনি দায়িক বলিয়াই, জগতের আর্য্যসমাজে তাঁহার যেমন স্বত্ব তেমন দায়িত্বও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তিনি Archangel বলিয়াই কর্ম্মদোষে অনন্ত নিরয়গামী হইবার অধিক সম্ভাবনা। তিনি কর্ম্মগুণে যেমন সামাজিকগণের উত্তমাঙ্গে হয়ত অবিসম্বাদিতভাবে পদরজঃ স্থাপন করিতে পারেন, তেমন কর্ম্মফলেই এমন কঠোর দণ্ডযোগ্য হইতে পারেন যে, মনুষ্যের দণ্ডবিধির সংহিতা যাহা কোনকালেও কল্পনাও করিতে পারে না। সুতরাং, মানব সমাজের দিকে এই সম্বন্ধ-বুদ্ধি এবং দায়িত্ব-বুদ্ধিতে, প্রত্যেক প্রতিভাশালী ব্যক্তিকেই নিয়ত সচেতন থাকা আবশ্যক—যেমন পরের, তেমন নিজের মঙ্গলের জন্যও আবশ্যক। সরস্বতীর প্রিয়পুত্রকেই মনে রাখিতে হয় যে, তিনি জন্মস্বত্বে দেবযোনি হইলেও, মাটীর শরীর পরিগ্রহ করিয়া মর্ত্ত্যলোকে এবং মনুষ্য মধ্যে বিচরণ করিতেছেন। কিঞ্চিৎ বিমনস্ক হইলে, এই দেহটিই তাঁহাকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রেই অতর্কিত খানাখন্দকে এবং অন্ধ কূপগহ্বরে নিপাতিত করিতে পারে। চন্দ্রের সুধাভাণ্ড পলকেই বিষভাণ্ডে পরিণত হইয়া নিজের এবং পরের মহামৃত্যু সংঘটন করিতে পারে। তাঁহার প্রতিভা 'মোহিনী' বলিয়াই বিপদ। এই মোহিনীকে লক্ষ্য করিয়াই জগতের দ্রষ্টাগণ বলিতে পারেন—

> "আদিম বসন্ত প্রাতে উঠেছিল মন্থিত সাগরে
> ডান হাতে সুধাপাত্র বিষভাণ্ড লয়ে বামকরে!"

সুতরাং, সাহিত্যসেবীকে সকল সময়েই ধারণা রাখিতে হয় যে তিনি সামাজিক জীব। নিজের অন্তরে যাহাই পোষণ করুন—ভাবনার দায়িত্বও কিছু কম নহে—লিপিবদ্ধ করিয়া সমাজে প্রকাশ করিতে গেলেই, উহা পর মুহূর্ত হইতে আপন দোষে-গুণে, স্বত্বে এবং দায়িত্বে মানব সমাজের অদৃষ্টে বসিয়া, হয়ত অনন্তকালের জন্য উহার জীবনপাত্রে আপনার সুধা বিষ পরিবেশন করিয়াই চলিবে! তাহাকে প্রত্যাহার করিবার কোন ক্ষমতাও যে তাঁহার থাকিবে না! ভাবনার শক্তি এবং দায়িত্বও এত অধিক হইতে পারে যে, মনুষ্যের একটি গুপ্ত চিন্তাই—হয়ত তাঁহার মৃত্যুর শত বৎসর পরে—অধ্যাত্মজগতে নিদারুণ ভাবে ক্রিয়ামুখী হইয়া মানবসমাজ তোলপাড় করিতে পারে! 'মানুষকে কেয়ার করি না' এমন কোন ভাব স্বয়ং মনে আসিলে, কিংবা কাহারও মুখে শুনিলে, উহা একটা দারুণ অবিনয়াপরাধী আত্মম্ভরিতা এবং সয়তানী কথা বলিয়াই স্থির করিবেন। উহার অন্তরালে কোথাও না কোথাও—খ্রীষ্টীয় আদর্শে—মানুষের নিত্যজীবন এবং পুণ্য-নিহন্তার কুটিল "বাঁকা শিং এবং পুচ্ছ" লুকাইয়া আছে বলিয়াই বিশ্বাস করিবেন; সকল অবিনয় এবং আত্মম্ভরিতার মধ্যেই থাকে।

সাহিত্যিক কোন সম্প্রদায়িক শাস্ত্রবন্ধনের বাধ্য নহেন; তিনি High priest of Beauty; তাঁহার আদর্শ, Art for Arts sake ইত্যাদি কথা গেঠে-শীলারের যুগ হইতে ইয়োরোপীয় শিল্পশাস্ত্রে বহুসম্মতি লাভ করিয়া প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। কথাগুলির মর্ম্মগত অর্থ বুঝিতে না পারিয়া সাধারণকে চিরকাল ভ্রান্ত হইতে দেখা যায়। অনেক সত্যদর্শীর দৃষ্টিও অতর্কিত পাপবুদ্ধির খোসামোদ অথবা খেয়ালের বশেই 'ঝাপসা' হইয়া যায়। 'সত্যসুন্দর' সর্ব্বপ্রকার শিল্পের অবিসংবাদিত প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু মনুষ্যমাত্রেই সামাজিক জীব বলিয়া, তাহার সকল কর্ম্মক্ষেত্রের বহির্ভাগে একটা নিত্য-দায়িত্বের অতর্কিত অবিসংবাদিত বৃহৎ বন্ধনা আছে। উহার

নামই শিব, বা শিল্পের আসরে শ্রেয় এবং প্রেয়ের সামঞ্জস্য। যে কবি এই সামঞ্জস্যপথে প্রতিভাকে সর্বমঙ্গলার পূজাপাত্রে নিবেদন করিতে পারেন না, তিনি যতই শক্তিশালী বা মিষ্ট-রসাল রচনা করুন না কেন, মহাকালের পুরীকক্ষে, নিত্য শ্রেয়োজ্ঞানরূপিপাসী অন্তরাত্মার সমক্ষে, উহা কোনমতেই স্থায়ী মাহাত্ম্য পদবী রক্ষা করিতে পারিবে না। পুণ্যদ্রোহী বা অসুরধর্মী রচনা আপাততঃ অমরাপুরী অধিকার পূর্ব্বক ইন্দ্রাণীকে দাস্যে নিযুক্ত করিতে দেখা গেলেও উহা একদিন হয়ত নির্ব্বিরোধে, আত্মপ্রকৃতির পক্ষাঘাতেই ভ্রষ্ট হইবে।

* * * *
* * * *

আপনারই অনুগত এবং অকপট ভাবের বাক্যভঙ্গী অপরিহার্য্য।

কপটতাই সাহিত্যসেবীর মহাপাতক! আবার কাহারও পক্ষে যেন অলঙ্কারই মহা ভার! স্থানে অস্থানে সোজা কথার উপর অলঙ্কার চড়াইতে গিয়াই কেহ নিদারুণ ভাবে ক্লিষ্ট হইয়া তলাইয়া গিয়াছেন কেহবা পরের সোণা কাণে পড়িতে গিয়াই সর্ব্বস্ব হারাইয়া বসিয়াছেন। শব্দশক্তি বা নিজস্ব বাক্যভঙ্গীর মতন এত প্রাথমিক বিষয়ে বাহুল্য করার জন্য ইহা স্থান নহে। লেখক উহার সাহায্যেই আত্মপরিচয় করেন বলিয়া, কথার আকাঙ্ক্ষা, ভঙ্গী এবং যোগ্যতার ধারণা হইতেই পাঠকের চিত্তপটে লেখকের ছবি মুদ্রিত এবং বর্ণিত হইয়া যায়। ঐ ছবিটাই লেখকের ব্যক্তিত্ব। এইজন্য বাফন (Buffon) বলিয়াছিলেন The Style is the man। সুতরাং এই ধৃতি-ছবির বিশেষত্বের মধ্যেই প্রকারান্তরে লেখকের সর্ব্বস্ব নির্ভর করিতেছে।

* * * * * * *
* * * * * * *

সাহিত্যে ভাব এবং বস্তুর আদর্শ-সমস্যা।

প্রসঙ্গাধীন আমরা সাহিত্যের আর একটি সমস্যার সম্মুখীন হইলাম। সাহিত্যসেবীর আদর্শ কি? সাহিত্যের বিষয় বস্তু কি হইবে? এ সকল প্রশ্ন বর্ত্তমান কালে বঙ্গদেশেও মুখর হইয়া উঠিয়াছে। বলিতে কি, এ সম্বন্ধে কোন সর্ব্বসম্মত পাকাপাকি আদর্শ বা বাঁধা গৎ নির্দ্দেশ করা কাহারও সাধ্য নহে। তবে স্থায়ী সাহিত্যের উৎকর্ষ লক্ষণ বিষয়ে সকলের মধ্যে এই একটি কথা দাঁড়াইয়াছে যে—উৎকৃষ্ট ভাবকে শ্রেষ্ঠতম আকার দান। অপূর্ব্ব অধৃত বা অপরিজ্ঞাত সত্যকে দর্শন পূর্ব্বক, ভাষাপথে উহাকে অনবদ্য এবং সমুৎকৃষ্টরূপে সামাজিকের রসানুভবগম্য করিয়াই সকল সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কৃতী সমূহ অমরত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন।

প্রাচীন সমুৎকর্ষ আদর্শ।

এই আদর্শের সমীপবর্ত্তী হইতে হইলে লেখকমাত্রকে নিয়তভাবে সজাগ থাকিতে হয়, যে মনোভাবকে এই সমুৎকর্ষ আদর্শের সহিত সঙ্গত করিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেছি কি? নচেৎ সমস্ত চেষ্টাই স্থায়ী সাহিত্যের হিসাবে এক বারে পণ্ড হইয়া যাইবে; ; ঐ সমস্ত কালস্রোতে রক্ষা পাইবে না; ভবিষ্যবংশীয়েরাও উহাকে আদর করিয়া বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য অগ্রসর হইবে না। এইরূপে উৎকর্ষ বিষয়ে মোটামোটি কথা বলিয়া কোনমতে অব্যাহতি পাওয়া গেলেও সাহিত্যের বস্তু কিংবা আকারের বিষয়ে কিছুতেই নির্ভাবনা হওয়া যায় না। কেবল কি উচ্চভূমি, মহৎ বস্তু, উন্নতভাব, এবং শাস্ত্র নির্দ্ধারিত কাঠাম বা আকৃতি অবলম্বন করিয়াই চলিব? সাধারণ জীবন, প্রাকৃতভাব, সমাজস্থ নিম্নশ্রেণীর সংস্রব পরিহার করিব? প্রাচীন সাহিত্যে, বিশেষতঃ এ দেশে অলঙ্কার শাস্ত্রিগণ সাহিত্যের বস্তু এবং আকৃতি বিষয়ে অনতিক্রম্য বাঁধা গৎ প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কাব্যের নায়ক "প্রখ্যাতবংশো রাজর্ষি ধীরোদাত্ত প্রতাপবান্" হইবে; কাব্যকে এইরূপে গঠিত হওয়া চাই, ইত্যাদি। সাহিত্যজগতে এখন আর এ সকল শাস্ত্র পদবী রক্ষা করিতে পারিতেছে না।

আধুনিক ইয়ুরোপীয় সমাজ ও সাহিত্যে আধুনিক আদর্শ।

রিনেশাঁসের (Renaisance) বিশেষতঃ ফরাসী বিপ্লবের পর হইতে ইয়োরোপে জনসাধনের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য ক্ষেত্রে বিষয় বস্তুর কৌলিন্য আদর্শকে নানা দিকে নিগ্রহ করিয়াই প্রকৃতবাদের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে। উহার গতিকে সাহিত্যের পূর্ব্ব রীতি, আকৃতি এবং আদর্শ যেন দিগ্‌বাজী খাইয়া একবারে উল্টিয়া দাঁড়াইয়াছে। মানুষের ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতিকে পশ্চাৎ করিয়া,এমন কি প্রকাশ্যভাবে এক বারে পদ দলিত করিয়াই, সে দেশের সাহিত্যিক "মণ্ডকরীসম" চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন!

উহার বিশ্বব্যাপী প্রসার।

কতদিক হইতে কতভাব ঘোষণা হইতেছে, সাহিত্যের আদর্শ কেবল 'ভাল লাগা!' নীতিনিয়মকে, এমন কি ব্যাকরণ এবং ন্যায়যুক্তিকে তাচ্ছিল্য করিয়া উড়াইয়া দিয়াও 'মিষ্টি' লাগিলেই হইল। অন্যদিকে, কবিপ্রতিভার পক্ষীরাজ ঘোড়াকে একবারে মাটিতে নামাইয়া আনিয়া মাঠে ময়দানে চরান যাইতেছে! গৃহ প্রাঙ্গণের অহরহ জনপদনিষ্পিষ্ট খরকুটায় এবং সাঁচের কানাচের আবর্জ্জনায় আনন্দিত হইবার জন্য তাহাকে অভ্যস্ত করান হইতেছে। এ প্রণালীতে আধুনিক সাহিত্যে একটী নব পদ্ধতির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে—প্রকৃত প্রস্তাবে উহার নামই 'নবেল।' মানুষকে একবারে অনাবৃত এবং উলঙ্গ করিয়া, অনুবীক্ষণ সাহায্যে তাহার নগ্ন, বন্য এবং জঘন্য স্থলগুলি পর্য্যন্ত চুনিয়া চুনিয়া পরখ পূর্ব্বক আনন্দ লাভ করিতে, তাহার শক্তিস্থান বা হৃদয়ের সুগুপ্ত ক্ষতস্থানগুলিতে পর্য্যন্ত ফিরিয়া ঘুরিয়া মাক্ষিকবৃত্তি করিতে অসাধারণ শক্তি, অভাবনীয় ধৈর্য্য, অপরিসীম উল্লাস। সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'প্রাকৃত' বলিয়া কোন ঘৃণাবাচক কথা নাই! এ সমস্ত আধুনিক সাহিত্যের বলবান্ লক্ষণ। শক্তি, এবং রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের অভ্যুদয় হইতে সাধারণ শিক্ষার বিস্তার, এবং মুদ্রাযন্ত্র রেলোয়ে প্রভৃতি যুগশক্তির প্রসার হইতেই সাহিত্যের এই আধুনিক আদর্শ দিগ্‌বিজয়ী হইতেছে। সুধীগণের পূর্ব্বপূজিত শালীন্য এবং কৌলিন্যের গৌরবময় আদর্শ নানাদিকে বিপ্রতিষ্ঠ হইয়া এবং বিগড়িয়া যাইতেছে। এই অর্ব্বাচীনকে এখন অস্বীকার করার যো নাই, এবং অস্বীকার করিয়াও ফল নাই।

বঙ্গ-সাহিত্যে উহার প্রভাব।

আমাদের ঘরের দিকে দৃষ্টি করিলেই দেখিব, এই বঙ্গদেশের এবং বঙ্গ-সাহিত্যের মধ্যেই গত দশবৎসরে মহা পরিবর্ত্তন আসিয়াছে! বঙ্গভাষার ন্যায় বঙ্গসাহিত্যও এখন আর কেবল হিন্দু কিংবা ব্রাহ্মণ্য লক্ষণাক্রান্ত নহে। নানাসমাজের, নানাধর্ম্মের নানা সাহিত্যের রীতিপদ্ধতি নানা উদ্দেশ্যে এবং অভিসন্ধিতে পরিচালিত হইয়া ইহার মধ্যে স্রোতোমুখে প্রবেশ করিতেছে। সাহিত্যসেবিগণের স্বাধীন সাধনাপথে, অনুকরণের বিকারে অথবা মৌলিকতার অহংকারে প্রচণ্ডরূপে প্রেরিত হইয়া অনেক নীতি-ধর্ম্ম-সমাজদ্রোহী, আত্মদ্রোহী এবং বিশ্বদ্রোহী রচনাও আত্মপ্রকাশ করিতেছে। নীতিধর্ম্মের কিংবা সাহিত্যের বা সমাজের তরফ হইতে কোনরূপ অনুরোধ উপরোধ গঞ্জনা কিংবা লাঞ্ছনায় এখন কোন কাজ দেখিবে না। কেন না ইহা যুগধর্ম্ম, এবং এই বঙ্গদেশে—এই ভারতবর্ষে নানা কারণে এখন ইহার যেমন উপযোগিতা, তেমনি আবশ্যকতা এবং অপরিহার্য্যতা আছে! সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে বরং ইহাকে এতদ্দেশের অদৃষ্টবিধাতার দয়া-প্রেরিত বলিয়াই ধারণা হইতে থাকে! দেশের হৃদয় এই দিকে নিজের শেষ পর্য্যন্ত না গিয়া ক্ষান্ত হইবে না। সাহিত্যের দিব্যালোকবাহিনী গঙ্গানদী এখন মর্ত্ত্যলোকে--নিম্নবঙ্গের সমতল ভূমে নামিয়া আসিয়া প্রত্যেক বাঙ্গালীর দ্বারদেশে আপনাকে বিলাইয়া চলিয়াছেন; একহস্তে জীবন দান করিয়া, অন্যহস্তে জীবন গ্রহণ করিতেছেন; একহস্তে

দেশদেশান্তরের আবর্জ্জনা বহিয়া আনিয়া, অন্যহস্তে এ দেশের আবর্জ্জনাও বহিয়া চলিয়াছেন।

সাহিত্যসেবীর একমাত্র কর্ত্তব্য স্বপ্রবৃত্তির অনুসরণ।

ইহার বিরুদ্ধবাদী হইয়া ফল নাই; সাহিত্যের সমুন্নত আদর্শ খর্ব্ব হইতেছে বলিয়াও দুঃখিত হইবার কারণ নাই। চিরনীরব মহাকাল স্বয়ং সাহিত্যের রক্ষক এবং চিকিৎসক; যুগশেষে সমস্ত অমঙ্গল-আবর্জ্জনার অতর্কিত সম্মার্জ্জনী বিধান করিয়া তুষ্টমান পূর্ব্বক সরস্বতীর অমরমূর্ত্তিকে তিনি উল্লাস করিয়া লইবেন। শিবাকাঙ্ক্ষীর পক্ষে এখন কেবল সম্যক্‌দৃষ্টি সাহায্যের আপন তত্ত্বে স্থির থাকিয়া চলিতে পারাই প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে! পাঠককেও উপস্থিত মতে সম্যকদর্শী হইয়া এবং সবুদ্ধভাবেই চলিতে হইবে। তবে এই অবস্থায় লেখকের, স্বয়ং সাহিত্যসেবকের কর্ত্তব্য কি? আমাদের কথাগুলির দিকে এতক্ষণ মনোযোগ দিয়া থাকিলে ইহার উত্তর করা কিছুমাত্র কঠিন নহে। সাহিত্যসেবী চিরকাল আপনহৃদয়ে অনুভূত এবং আপন জীবনে অনুজীবিত পদার্থই বিষয়রূপে অবলম্বন করিবেন। বাহির হইতে তাঁহার অন্য কোন শাস্ত্রশাসন নাই। তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে অকপট হইয়া আপন অন্তরাত্মারূপী প্রভুর ইঙ্গিতের দিকে কাণ রাখিয়াই চলিতে হইবে; অন্তর্দ্দর্শী হইয়া, আপন চরিত্রের আন্তরিক প্রবৃত্তি অনুসরণ করিয়াই তাঁহাকে অবশ্য অবশ্য চলিতে হইবে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আত্মপ্রবৃত্তি ভালমন্দ শিব অশিব যাহাই হউক, তাঁহাকে উহার বাধ্য থাকিয়াই বিষয় নির্ব্বাচন পূর্ব্বক, ওই নির্ব্বাচনের সমস্ত অদৃষ্টই মানিয়া লইতে হইবে। উহার ফল হয়ত, সংসারের হেয় অথবা অবজ্ঞেয় কিংবা উপাদেয় হইবে; অন্য কাহাকেও দায়ী না করিয়া সকল নিজেই তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই হইল সাহিত্যজীবনের পরিচালন তত্ত্ব সারস্বতের ধর্ম্ম।

নিজের সত্যরূপী ধর্ম্মকে এবং তাহার ফলাফলকে অপরিহার্য্য বলিয়া গ্রহণ।

সুতরাং খোলাখুলি নির্দ্দেশ করিতে হয় যে, আমি যদি অন্তরে পাপিষ্ঠ প্রকৃতির মানুষই হই, তবেও, প্রকৃত সারস্বত হইতে হইলে, আমাকে আপন তত্ত্বের অনুগত থাকিয়া পাপিষ্ঠ শিল্পরচনারই সৃষ্টি করিতে হইবে; এবং উহার গতিকে সমাজের শাস্তি পাইতে হইলে তাহাও বরণ করিতে হইবে। তথাপি কপটাচার বা মিথ্যাচার হইতে হইবে না—জোর করিয়া 'সাধুবুলি' গ্রহণ করিলে সরস্বতী সে ক্ষণেই বিদায় লইবেন। ইহার নাম, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।"

আসল কথা, সাহিত্যে মহৎভাবের ভাবুক হইয়া মহৎ বিষয় বস্তু অবলম্বন করা, কিংবা তাহাকে মনুষ্যের মহনীয় ভাষায় প্রকাশ করা—কিছুই জোর করিয়া কিংবা অভিসন্ধি করিয়া সিদ্ধ হয় না। দান্তে, মিলটন, শেকস্‌পীয়র, গ্যেঠে, হুগো, শীলার, হেবেল বা স্কট প্রভৃতি — যাঁহারাই সাহিত্যে ভাববস্তুর মাহাত্ম্যে অমর হইবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন, সে রূপ সৌভাগ্য নিজের আত্মাপুরুষ অনুকূল না হইলে কদাপি ঘটিতে পারে না। সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর প্রতিভা লাভ করিয়াও অনেকে তৃতীয় শ্রেণীর রচনা রাখিয়া যান। আমরা যাহাকে সাহিত্যে 'মঙ্গল্য-আদর্শের চূড়ান্ত মাহাত্ম্য' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, বলিতে কি, আধুনিক ফরাসী সাহিত্যের অনেক প্রতিভাশালী শিল্পীর তাহা নাই। মনুষ্যের আধ্যাত্ম কৌলিন্য, ধর্ম্মনীতি বা সমাজনীতি বলিয়া কোন কথা তাঁহাদের নিকট বিশেষ আমল পায় নাই। তাঁহারা খুঁজিয়াছিলেন কেবল 'সৌন্দর্য্য' বা 'ভাললাগা'—উহাতেই তাহাদিগকে চূড়ান্তস্থান হইতে নামাইয়া রাখিয়াছে বলিয়া পদে পদে প্রতীতি হইতে থাকে। তবু, তাঁহারা মিথ্যাচার ছিলেন না, তাই সরস্বতীর প্রচুর দয়ামৃত লাভে বঞ্চিত হন নাই। নীতি অথবা ধর্ম্মমন্দিরের দিকে তাঁহাদের অচৈতন্য অথবা বৈবর্ণ্য দেখিয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে গেলে,

আজ পৃথিবীর সাহিত্য অনেক দিকেই দরিদ্র হইয়া পড়ে।

সুতরাং সাহিত্যসেবীর পক্ষে, যেমন আপনার সরলতাকে বরণ, তেমনি আপনার সত্যানুসরণ। দেশের কালের সকল অবস্থায়, পরের হুজুগে মত্ত না হইয়া সাহিত্যিকের ইহাই সাধন। উহাতে যে স্থানে লইয়া যায়, তাহাই তোমার জীবনদেবতার বিধান বলিয়া মানিয়া লও। Be faithful to yourself. আত্মদ্রোহী ব্যক্তি সাহিত্যের outlaw—বিচার-সীমা হইতে নির্ব্বাসিত। সাহিত্যে ব্যবস্থাপত্র ধরিয়া, কি কোনরূপ ষড়যন্ত্র করিয়া কোন মহৎ কার্য্য সমাধা হয় নাই। সাহিত্যসেবীর পক্ষে আপনার জীবন তত্ত্বের গতিকেই বিষয়বস্তুর আবিষ্কার, বরণ এবং সমাধান অপরিহার্য্য হওয়া চাই। উহারই নাম স্বাধীনতা। "বিদ্বাংস্তত্র ন শোচতে" "ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি।" এইরূপ বিদ্বান্ এবং ধীর ব্যক্তির—স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির কার্য্যই সাহিত্যে উপেক্ষা লাভ করে না। 'আত্মানং বিদ্ধি' 'আত্মানমনুসর'। উহাতে তোমার শিল্পরচনা যদি আপন চরিত্রধর্ম্মে বিগর্হিত হইয়া যায়, তবুও প্রাণহীন অথবা ফাঁকা হইবে না! জোলা ও রেনল্ড বৃক্ষ হইতে যে ফল পাওয়া গিয়াছে, উহার আস্বাদ অন্তরাত্মার রসনায় তিক্ত, মিষ্ট, কষায়, বিদাহী কিংবা সর্ব্বনাশী যাহা বলিতে হয় বল—তবু তাঁহারা সাহিত্যের outlaw নহেন; তাঁহারা আপন জীবনের অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতা-তত্ত্বে স্থির থাকিয়াই অপকটভাবে শিল্প রচনা করিয়া গিয়াছেন।

* * * * *

সাহিত্যসেবীর ঐক্যতান সাধনা।

কবির জীবন সাধনা এবং ভাবসাধনা সমযোগী হইতে না পারিলে এ সঙ্কট এড়াইবার অন্য উপায় নাই। ইহা সাহিত্যসেবক মাত্রের সঙ্কট স্থান—সাহিত্যসেবা সংসারে বিফল হইবার মূলেও ইহাই প্রধান কারণ। আমরা সকলেই ন্যূনাধিক দুর্ব্বল; প্রকৃত জীবন এবং ভাবুকজীবনের মধ্যে বেশী কম বিরোধ লইয়াই জীবনপথে চলিয়াছি। সাহিত্যিকগণের সম্মিলন সভায় এই সর্ব্ববিধ্বংসী এবং সর্ব্বসাধারণ সমস্যার দিকে সকলের আত্মবুদ্ধি সচেতন করাই কর্ত্তব্যবোধে, সাহিত্যসেবার গোড়ার দাবীটাকে এইভাবে উপস্থিত করিলাম। যেমন উপক্রমে তেমন উপসংহারেও বুঝিতেছি যে, সাহিত্যসেবীর জীবনচরিত্র এবং কবিত্ব পরস্পর ঐক্যতান হইয়া তানলয়বদ্ধ চরমার্থ চেষ্টার আকারে পরিণত না হইলে, সকল চেষ্টাই সকলদিকে—যেমন ইহকালে তেমন পরকাল পক্ষে বিফল হইয়া পড়া অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং নিয়তভাবে মনে রাখিতে হইবে, আমরা সকলে অতর্কিতে 'মহতী বিনষ্টি'র অতল গুহাসম্মুখেই দাঁড়াইয়াছি। সাহিত্যসেবক মাত্রেই আপনাকে অনন্তের সন্তান এবং অনন্তজীবী বলিয়া ধারণা জাগরূক রাখিয়াই কায়মনে সাহিত্যজীবন নির্ব্বাহ করিতে হইবে। কেবল এই প্রণালীতে সচেতনভাবে ক্রিয়াপর হইয়া চলিতে পারিলেই এই মৃত্যুসঙ্কট উত্তীর্ণ হওয়া যায়! তাঁহাকে সাহিত্যসেবা পথে স্বভাবের অনুসরণ পূর্ব্বক যুগপৎ সারস্বত ক্ষেত্রের শাশ্বতী ঋদ্ধি এবং অনন্ত জীবনের আহার্য্য সংগ্রহে ব্যাপৃত থাকিয়াই সংসারে অগ্রসর হইতে হইবে। এই স্বল্প জীবনের সাংসারিক ফলাফল অনন্তের তুলনায় তুচ্ছ করিয়া প্রতিপদে চলিতে না পারিলে তিনি কখনও অমৃত লাভ করিতে পারিবেন না। বিশ্বভুবনের সাহিত্যরঙ্গভূমির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই দেখিতেছি সকল অমর সাহিত্যশিল্পীর হৃদয় সজ্ঞানে বা অতর্কিতভাবে সকল ভুলভ্রান্তির মধ্যে, কেবল একই সুরতানলয়ে নিত্যপুরীর অভিমুখে উত্থিত হইতেছে—

ওই শোন উঠে ছন্দে নানান
অনন্ত তান কবি হিয়া সুর!
লক্ষ ধারাণ ঐক্যের তান—
দয়ালের কর্ণে শুনিছে মধুর।
সুখ দুঃখের জাল উত্তরিয়া
নিত্যপুরীর পন্থা বরি,
মর্ত্ত্যজীবন সীমা লঙ্ঘিয়া
দগ্ধ ধূপের আরতি ধরি,
উঠে সঙ্গীত অযুত বর্ণে
অনন্ত পদে উধাও পশে
চরণে কাহার হাজার পর্ণে
ধবল কমল হেন বিকশে!

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

নবজীবন ভিক্ষা।

আজি, নবীন প্রভাতে তোমার সভাতে
এসেছি ওগো এসেছি।
শোনাতে আসিনি বিষাদ কাহিনী
আঁখিজলে যত ভেসেছি
ওগো ভেসেছি!

জানাতে আসিনি অতীতের কথা
মুখভরা হাসি বুকভরা ব্যথা,
দেখাতে আসিনি মরমের তল
যত জ্বালা নিতি সয়েছি
ওগো সয়েছি!

ছিন্ন মালিকার ঝরা ফুলগুলি
আঁচল ভরিয়া আনিনিক তুলি
আনিনিক সাথে হারান গানের সুর
আনিনিক পাপ, আনিনি পুণ্য
আনিনি গরব আনিনি দৈন্য
কেবলি শূন্য আপনারে ল'য়ে
আসিয়াছি তবপুর।—
'শূন্য' আমার করহ পূর্ণ,
'অতীতে' আমার করহে চূর্ণ,
তোমার সভার এক কোণে দাও ঠাঁই।
ওগো, আপনার মনে গাহিবারে গান
অধিকার শুধু চাই;—
ভাই, নবীন প্রভাতে তোমারি সভাতে
বড় আশা করে এসেছি
ওগো 'নবীন জীবন' লইতে মাগিয়া
ওগো এসেছি!

শ্রীকালীকৃষ্ণ সিদ্ধান্তশাস্ত্রী।

বঙ্গীয় মুসলমান ও বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্য।

আজকাল সমগ্র বাঙ্গলা জুড়িয়া বাঙ্গলা সাহিত্য চর্চ্চার একটা মহা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সাহিত্য পরিষৎ, 'সাহিত্য সম্মিলন', সাহিত্য সঙ্গত, সাহিত্য সভা প্রভৃতি নামধেয় বহু সম্মিলন সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখন আর সে দিন নাই, যে দিন দুচার হরফ ইংরাজী বুলি আওড়াইতে পারিলেই বাঙ্গালী কৃতার্থ বোধ করিত, যেদিন ইউরোপীয় সাহেবদের সঙ্গে দু একটা কথা বলিতে পারিলেই লোকে গর্ব্বে স্ফীত বক্ষ হইয়া মাটিতে পা ফেলিতে ঘৃণাবোধ করিত। এক সময়ে 'হাম্ বাঙ্গালা নাহি জান্তাহে' যে বলিতে পারিত সে নিজকে সকলের অপেক্ষা বিশেষ উন্নত মনে করিত। কিন্তু এখন সে দিন চলিয়া গিয়াছে। সে হাস্যকর অভিনয় এখন আর বাঙ্গালায় সংঘটিত হইবার উপায় নাই। এখন বাঙ্গালা ভাষা দীনা অথবা হীনা নহে। সে এখন বিশ্ব সাহিত্যে স্থান লাভ করিয়াছে। বঙ্কিম রবীন্দ্রের কল্যাণে আজ বঙ্গ ভাষা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

বাঙ্গালী প্রধানতঃ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত, হিন্দু ও মুসলমান। আমরা এ প্রবন্ধে বাঙ্গালী মুসলমান বাঙ্গালা সাহিত্য চর্চ্চায় কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাহাই মাত্র আলোচনা করিব। সমস্ত হিন্দু লেখক বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহারা বড় কেহই মুসলমান সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন নাই। বাঙ্গালী মুসলমানও যে বাঙ্গালা সাহিত্য চর্চ্চায় ব্যাপৃত আছেন, একথা হিন্দু আলোচনাকারিগণ বাঙ্গালা সাহিত্য আলোচনা সময়ে প্রায়ই ভুলিয়া গিয়া থাকেন। ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে। বাঙ্গালা সাহিত্য আলোচনার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই না কি যে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করা ও

সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যিকগণের রচনার সমালোচনা করিয়া তাঁহাদিগকে উৎসাহ দেওয়া। ইহাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে কি হিন্দু সাহিত্যিকগণের এই উপেক্ষা মুসলমান সাহিত্যিকগণকে নিরুৎসাহ করিবার পক্ষে সাহায্য করিতেছে না? আমার বিশ্বাস মুসলমান সাহিত্যিকগণের গ্রন্থ পাঠ করা হিন্দু আলোচনাকারিগণ তত আবশ্যক মনে করেন না। যাহা হউক আমরা মুসলমান সাহিত্যিকগণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আলোচনা করিবার সম্যক উপযুক্ত ব্যক্তি না হইলেও, আর কেহই যখন এ বিষয়ে হাত দিতেছেন না, তখন আশা করি ইহা একেবারেই উপেক্ষিত হইবে না।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-ক্ষেত্রে হিন্দুগণের তুলনায় বহু পশ্চাতে তাহা বোধ হয় না বলিলেও চলে। এক সময় কিন্তু বঙ্গীয় মুসলমানই বঙ্গ সাহিত্য চর্চ্চায় হিন্দুগণের অগ্রগামী ছিল। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, যে মুসলমান সম্রাট ও সুবাদারগণের উৎসাহের ফলেই বঙ্গভাষা তৎকালে সকলের নিকট অত্যন্ত আদরণীয় হইয়াছিল। যদি তৎকালে মুসলমান সম্রাট ও সুবাদারগণ বাঙ্গালা সাহিত্য চর্চ্চায় সবিশেষ উৎসাহ প্রদান না করিতেন, তাহা হইলে বঙ্গভাষা যে আজ এতাদৃশ উন্নতি লাভ করিত, তাহা কে বলিতে পারে? তৎকালে বাঙ্গালা সাহিত্য চর্চ্চায় মুসলমান হিন্দুগণ অপেক্ষা কোন অংশে হীন ছিলেন না। তাহার প্রমাণ চট্টগ্রামের উজ্জলরবি কবিশ্রেষ্ঠ সৈয়দ আলওয়াল। কিন্তু আজকাল আর সে দিন নাই। তখনকার সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই সেদিন চলিয়া গিয়াছে। আজকাল বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যক্ষেত্রে হিন্দুগণ অপেক্ষা এত পশ্চাতে পড়িয়াছে কেন? এই কেনর উত্তরে অনেকগুলি কারণ উত্থাপিত হইতে পারে।

প্রথম কারণ—তৎকালে হিন্দু মুসলমানে বিশেষ সম্প্রীতি ভাব ছিল; এমন কি হিন্দুগণ মুসলমানগণের সঙ্গে চাচা, খালু, মামু প্রভৃতি সম্বন্ধ সূচক সম্বোধন ব্যবহার করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না; পক্ষান্তরে মুসলমানগণও হিন্দুদিগকে জ্যেঠা খুড়া প্রভৃতি মধুর সম্ভাষণ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। কিন্তু পাশ্চাত্য-শিক্ষা এদেশে প্রবেশের পর হইতেই এ মধুর সম্বন্ধের মূলে কুঠারাঘাত হইল। কারণ হিন্দুগণ পাশ্চাত্যশিক্ষা 'প্রাপ্তিমাত্রেণ' গ্রহণ করিলেন; কিন্তু মুসলমানগণ উহা গ্রহণ করিতে প্রথমতঃ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ফলে হিন্দুগণ অচিরেই পাশ্চাত্য শিক্ষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন এবং মুসলমানগণ শিক্ষায় তাহাদের বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন। ইহাতে—এই উচ্চতানীচতায় পরস্পরের মধ্যে একটা ঘৃণার ভাব আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিল। ক্রমে শত্রুভাব প্রবলতর হইয়া উঠিল। হিন্দুগণ বাঙ্গালা ভাষা চর্চ্চা বেশ উদ্যম সহকারেই আরম্ভ করিয়া দিলেন; পক্ষান্তরে মুসলমানগণ বাঙ্গালা ভাষাকে ঘৃণা করিতে লাগিলেন। ইহাই বাঙ্গালা সাহিত্য চর্চ্চায় মুসলমানগণের এত পশ্চাতে পড়িবার একটী কারণ।

দ্বিতীয় কারণ—যখন বাঙ্গালা সাহিত্য চর্চ্চায় বাঙ্গালার মুসলমানগণের একটা ঘৃণা জন্মিয়া গেল, তখন তাহারা কোথাকার উর্দ্দু ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া বরণ করিয়া লইতে বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালী মুসলমানগণের পক্ষে উর্দ্দু ভাষাকে মাতৃভাষা করিয়া লইতে চেষ্টা করা যে 'নেহায়েত' খামখেয়াল' তাহা বলাই বাহুল্য। এখনও একদল বাঙ্গালী মুসলমান উর্দ্দুর স্বপ্ন দেখিতেছেন ও উর্দ্দুর জন্য বিশেষ লড়ালড়ি করিতেছেন; কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, যে ইঁহাদের চেষ্টা যে নিতান্তই নিরর্থক তাহা আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস। উর্দ্দুবাদীকে নিরর্থক তর্কের উত্তর দিয়া আমি এ প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাই না। ডাক্তার আব্দুলগফুর সিদ্দিকি সাহেব ও মৌলবী আব্দুল করিম সাহেব 'সাহিত্যে', সিরাজী সাহেব ও

মোজাফর আহাম্মদ 'আলএসলামে' এবং কাজি ইমদাদুল হক সাহেব 'মুসলমানে' ইহার সবিশেষ বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। তবে এই মাত্র বলিতে পারি, বাঙ্গালী মুসলমান—যাঁহারা দৈনন্দিন কথাবার্ত্তায় বাঙ্গালা ভাষাই ব্যবহার করেন, যাঁহাদের অস্থি-মজ্জায় পর্য্যন্ত বাঙ্গালাভাষা অনুপ্রবিষ্ট,—তাঁহাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না, এবং হওয়াও নিতান্ত অনুচিত ও অন্যায়। এই সব কারণেই বাঙ্গালী মুসলমান সাহিত্য-চর্চ্চায় এত পশ্চাতে পড়িয়াছেন। যাহা হউক এখন আমরা মুসলমান সাহিত্যিকগণের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

প্রথমেই আমরা বঙ্গীয় মুসলমানগণের মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কবি কায়কোবাদ সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি এ পর্য্যন্ত দুইখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, যথা 'অশ্রুমালা' ও 'মহাশ্মশান'। অশ্রুমালা কায়কোবাদ সাহেবের সর্ব্ব প্রথম গ্রন্থ। আমরা কাব্যখানি সম্বন্ধে প্রথমে কিছু না বলিয়া মহাকবি নবীনচন্দ্র সেনের মন্তব্য উদ্ধৃত করিলাম। তিনি লিখিয়াছেন, "আপনার অশ্রুমালা পরম প্রীতিসহকারে পাঠ করিয়াছি এবং আপনার অশ্রুর সহিত আমার অশ্রু মিশাইয়াছি। জাতি ভেদে সকলেই ভিন্ন হইতে পারে কিন্তু অশ্রু অভিন্ন। যাহার অশ্রু আছে তাহার কবিত্ব আছে। মানব রোদনমাত্রই কবিত্বময়। মুসলমান যে বাঙ্গালা ভাষায় এমন সুন্দর কবিতা লিখিতে পারেন, আমি আপনার উপহার না পাইলে বিশ্বাস করিতাম না। অল্প সুশিক্ষিত হিন্দুরই বাঙ্গালা কবিতার উপর এমন অধিকার আছে। যেদিন মুসলমান সমাজে হিন্দুদের সঙ্গে এরূপ সুললিত কবিতায় বঙ্গভাষায় অশ্রুবিসর্জ্জন করিবে, সেদিন প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্গদেশের সুদিন হইবে। এমন দিন যদি শ্রীভগবানের কৃপায় ক্ষুদ্র স্বার্থের অন্ধকার তিরোহিত করিয়া কখনও উপস্থিত হয় আপনার অশ্রুমালা তাহার প্রভাত শিশির মালা স্বরূপ বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসে স্থানলাভ করিবে।"

গ্রন্থকারের প্রথম বয়সের প্রথম গ্রন্থ সম্বন্ধে মহাকবি নবীনচন্দ্র সেন মন্তব্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা হইতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন, যে অশ্রুমালা কেমন সুন্দর। তবে এ কাব্য যে একেবারেই নির্দ্দোষ, একথা বলা চলে না। একাব্য যৌবন-সুলভ-আবেগ-প্রবাহে খচিত; কাজেই ইহাতে কিঞ্চিত অশ্লীলতা দোষ দুষ্ট হয়। যদিও অশ্লীলতা কাব্যহিসাবে বেশী দোষজনক বিবেচিত হইতে পারে না, তথাপি নীতি-হিসাবে খুব দুষণীয়। যাহা হউক, কায়কোবাদসাহেব ইহার ২য় সংস্করণে ঐ সমস্ত অশ্লীলতা-দোষ-দুষ্ট কবিতাগুলি বাদ দিয়া খুব ভাল করিয়াছেন।

কায়কোবাদ সাহেবের শ্রেষ্ঠগ্রন্থ 'মহাশ্মশান'। এ গ্রন্থে যেরূপ প্রচুর কবিত্ব বিকীর্ণ হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালায় অন্য কোন মুসলমান কবির কাব্যে ত দেখা যায়ই না, পরন্তু হিন্দু সাহিত্যেও খুব কম আছে। কাব্য খানি ৮২২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। এরূপ বৃহৎ কাব্য বোধ হয় বঙ্গ-সাহিত্যে আর এক-খানিও নাই। ইহা যে কেবল বৃহত্বেই শ্রেষ্ঠ, তাহা নহে, কবিত্ব-হিসাবেও ইহার স্থান বঙ্গ-সাহিত্যে অনেক উপরে। কবি নিজেই ভূমিকায় এ কাব্যের সহিত তাহার পূর্ব্ব প্রকাশিত 'অশ্রুমালা'র তুলনা করিয়া বলিতেছেন; "ইহা কেমন হইয়াছে, জানি না, তোমাদের উপরেই সে ভার অর্পিত হইল। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, 'মহাশ্মশানের' সঙ্গে 'অশ্রুমালা'র তুলনা হয় না। 'মহাশ্মশান' স্বর্গ, 'অশ্রুমালা' মর্ত্ত্য। এই দুইখানি কাব্যে স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ। 'অশ্রুমালা'তে কেবল কবির অশ্রুজল, আর 'মহাশ্মশানে' হিন্দুও মুসলমান সাম্রাজ্যের অতীত স্মৃতির চিতাভস্ম।"

কবির কথা আমরা অত্যন্ত সত্য বলিয়া মনে করি;

বাস্তবিক 'মহাশ্মশান' বঙ্গ সাহিত্যের একটী রত্ন বিশেষ। এই কাব্যখানির একটী প্রধান গুণ, ইহার মৌলিকতা। কবি ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "বাঙ্গলা ভাষার কাব্যগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমাদের বড়ই দুঃখ বোধ হয়। বঙ্গের অনেক মহাকবি মহাকাব্য লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু মৌলিক মহাকাব্য লিখিতে ত কেহই যত্নবান্ হন নাই। সকলেই রামায়ণ ও মহাভারতের ছায়া লইয়া কেবল চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিয়াছেন। কেন যে বঙ্গীয় কবিগণ মৌলিক মহাকাব্য লিখিতে এরূপ উদাসীন, তাহা জগদীশ্বরই জানেন। আমার এই মহাশ্মশান কাব্য কোন গ্রন্থের অনুকরণ ও কাহারও চর্ব্বিত চর্ব্বণ নহে, ইহা আমার নিজস্ব জিনিস। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের সাজ সরঞ্জামই ইহার মাল-মসলা।

"আমি বহুদিন যাবৎ মনে এই আশাটী পোষণ করিতেছিলাম যে ভারতীয় মুসলমানগণের শৌর্য্য-বীর্য্য-সম্বলিত এমন একটী যুদ্ধকাব্য লিখিয়া যাইব, যাহা পাঠ করিয়া বঙ্গীয় মুসলমানগণ স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারেন যে এক সময়ে ভারতীয় মুসলমানগণও অদ্বিতীয় মহাবীর ছিলেন; শৌর্য্যে বীর্য্যে ও গৌরবে কোন অংশেই তাহারা জগতের অন্য কোন জাতি অপেক্ষা হীনবীর্য্য, নিকৃষ্ট ছিলেন না। তাই তাহাদের অতীত গৌরবের স্বরূপ যেখানে যে কীর্ত্তিটুকু, যেখানে যে স্মৃতি টুকু পাইয়াছি তাহাই কবি-তুলিকায় অঙ্কিত করিয়া পাঠকদের চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি এবং তাঁহাদের সেই অতীত গৌরবের ক্ষীণ স্মৃতিটুকু জাগাইয়া দিতে বহু চেষ্টা করিয়াছি। আমার আশা পূর্ণ হইয়াছে।"

বাস্তবিকই কবি কায়কোবাদের আশা পূর্ণ হইয়াছে। একদিন বাঙ্গালী মুসলমানগণ জানিতে ও বুঝিতে পারিবেন, জাতীয় সাহিত্যে কবি কি অমূল্য সম্পদ্ দিয়া গিয়াছেন।

কবি যে দেশের দুর্দশায় করুণ সঙ্গীত গাহিয়াছেন তাহা সমগ্র ভারতবাসীর অন্তরে অঙ্কিত থাকিবার যোগ্য—

মা তুমি মেলনা আঁখি,
আঁধারে আঁধারে, ভাসি অশ্রু ধারে
কত দিন মাগো
রবে পড়ে
পথের এ ধূলা মাখি!
মা তোরে জাগাতে
ঊষা এসে ভোরে ডাকে প্রতিদিন,
শশী তোর দুঃখে মাসে মাসে ক্ষীণ
"জাগো মা, জাগো মা"
বলে মোরা
সদা মা তোমারে ডাকি
মা তুমি মেলনা আঁখি!
মা তোমার লাগি,
সরযু গোমতী পাগলিনী পারা,
যমুনা জাহ্নবী ঢালে অশ্রুধারা,
জাগিবে না তুমি?
শিশিরের ছলে প্রকৃতি কাঁদিছে
সুরভি কুসুম ফুটিছে ঝরিছে,
তোমার চরণ চুমি;
সবি মা তোমারে, ডাকিছে কাতরে,
উঠ জাগো বলে
মা তোমারে
কাননে ডাকিছে পাখী
মা তুমি মেলনা আঁখি।

এ সঙ্গীত দ্বিজেন্দ্রলালের আমার জন্মভূমির পার্শ্বে স্থান লাভের যোগ্য।

'মহাশ্মশান' সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে এক খানি স্বতন্ত্র বই হইয়া পড়িবে। এস্থলে তাহার সম্পূর্ণ আলোচনা অসম্ভব। কবির—

নিবাও প্রাণের আশা, ফিরে যাক ভালবাসা
কেন সখা নিতি নিতি এত জ্বালা সবে
নিবে যা'ক রবি শশী, নিবুক তারকা হাসি
আঁধার—আঁধার শুধু ভবে।

কখনও ভুলিতে পারিলাম না, কখনও ভুলিব না। যাহা হউক, এখন আমরা কবি কায়কোবাদ সাহেবের নিকট বিদায় গ্রহণ করি।

তার পর আমরা কবি সিরাজী সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলাম। ইনি 'স্পেন বিজয় কাব্য', 'মহা-শিক্ষা কাব্য' প্রভৃতি কয়েক খানা কাব্য লিখিয়াছেন। কাব্য-প্রতিভায় কায়কোবাদ সাহেবের নিম্নেই আমরা তাঁহার আসন নির্দ্দেশ করি। ইঁহার কাব্যে অত্যন্ত শব্দাড়ম্বর দৃষ্ট হয়। কায়কোবাদ সাহেবের কাব্যে আমরা যে উন্মুক্ত কবিত্ব-প্রবাহ দেখিতে পাই, ইঁহার কাব্যে আমরা ততটা দেখিতে পাই না। ইনি মাইকেলের অনুসরণকারী। তবে একথা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে তাঁহার উপরোক্ত কাব্যদ্বয়ও বঙ্গ-সাহিত্যের অমূল্যসম্পদ বিশেষ। 'স্পেনবিজয়কাব্যে' মুসলমানগণ কেমন করিয়া স্পেনবিজয় করিয়াছিলেন, তাহা কবিত্ব-পূর্ণ, তাহা বীর রসাপ্লুত করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন।—আর 'মহাশিক্ষা কাব্যে' মহরম কাহিনী অত্যন্ত সুন্দর, কবিত্বপূর্ণ ভাষায় প্রকাশিত করিয়াছেন। কবি সিরাজী গদ্য লেখায়ও সুপটু। তাঁহার 'আদব কায়দা শিক্ষা' 'তুরস্ক ভ্রমণ', তুর্কী 'নারীজীবন' প্রভৃতি গ্রন্থ গদ্য রচনায় তাঁহার অসাধারণ পটুত্ব জ্ঞাপন করে। তাঁহার ভাষা এত জোরের যে বঙ্গীয় কোন মুসলমান লেখকের লেখায় এত তেজস্বিতা দৃষ্ট হয় না। বাস্তবিক কবি সিরাজী একজন চিন্তাশীল ও তেজস্বী লেখক। বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ তাঁহার নিকট অনেক কারণে কৃতজ্ঞ।

এখন আমরা কবিবর আবুল-মা-আলী-মোহম্মদ হামিদ আলী সাহেবের গ্রন্থ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। তিনি 'ভ্রাতৃবিলাপ কাব্য' 'কাসেমবধ কাব্য' 'জয়নাল-উদ্ধার কাব্য' 'সোহরাব বধ কাব্য' ও 'কবিতাকুঞ্জ' প্রভৃতি কয়েক খানি কাব্যগ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁহার কাব্যগ্রন্থের মধ্যে কাসেম বধ' কাব্যই শ্রেষ্ঠ। 'ভ্রাতৃবিলাপ' ও 'কবিতাকুঞ্জ' এই দুইখানি কাব্য আমরা নানা কারণে এই কবির অনুপযুক্ত বলিতে বাধ্য হইলাম। 'কাসেম বধ' বেশ সরল অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। একাব্যে কবিত্বও বেশ দৃষ্ট হয়। 'সোহরাব বধ' শব্দাড়ম্বরে পূর্ণ হইলেও কবিত্ব একটু হীন বলিয়াই প্রতীয়মান হয়; তাই ভাষা কিঞ্চিৎ কটমটে হইয়া গিয়াছে। আর 'জয়নাল উদ্ধারে' কবিত্বের বিশেষ মন্দগতি। স্থানে স্থানে মাইকেলের বহু অনুকরণ দৃষ্ট হয়। যাহা হউক মোটের উপর কবির 'কাসেম বধ' ও 'সোহরাব বধ' বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যে উচ্চস্থান পাইবার যোগ্য।

এখন আমরা কবিবর ডাক্তার আবুল হসেন এম্, ডি সাহেবের দিকে অগ্রসর হইলাম। ইনি 'যমজভগিনীকাব্য', 'স্বর্গারোহণ কাব্য', 'জীবন্ত পুতুল কাব্য' প্রভৃতি কয়েকখানি কাব্য লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে 'যমজভগিনী কাব্য' সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই একখানি কাব্যেই এই কবি যশস্বী হইয়াছেন। এ কাব্যে কবি এক নূতন ছন্দ প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়াছেন এবং বেশ কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। ছন্দ গদ্যের আকারে স্থাপিত, ১৪ অক্ষরে মিল দেওয়া নয়, অথচ বেশ কবিত্ব পূর্ণ, যথা—

"কুক্ষণে রে কাপুরুষ কৃষ্ণদাস তুই, গিয়াছিলি কলিকাতা, লয়েছিলে ইংরেজের আশ্রমে আশ্রয়।"

এই কাব্যখানি কায়কোবাদের 'মহাশ্মশানের' নিম্নেই স্থান পাইবার যোগ্য। কবিশ্রেষ্ঠ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই কাব্যখানির প্রচুর প্রশংসাবাদ করিয়াছিলেন। তারপর 'স্বর্গারোহণ কাব্য'; ইহা কবিত্ব হিসাবে নিতান্তই হীন। 'যমজভগিনী' কাব্যে ভাষা একটু জটিল হইয়া

পড়িয়াছে, আরও একটু সরল হইলে ভাল হইত। কিন্তু 'স্বর্গারোহণ কাব্যের' ভাষা এত তরল যে উহা কবিত্বের ভাষা নহে।

তারপর আমরা কবি মোজাম্মেল হক সাহেব (নদীয়া) সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ইহার কাব্য যথা—'হজরত মোহাম্মদ', 'জাতীয় ফোয়ারা' প্রভৃতি। এই কবি মুসলমান সমাজে খুব লোকপ্রিয়। ইহার 'হজরত মোহাম্মদ' বঙ্গ-সাহিত্যের একটি রত্ন। ভাষা অত্যন্ত সুমধুর ও কবিত্বপূর্ণ। ইনি গদ্য রচনায় ও সমান পটুত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। 'সাহনামা' 'ফেরদৌসী চরিত', 'মহর্ষি মনসুর' তাহার নিদর্শন। গদ্যের ভাষা ও এত সুন্দর যে খুব কম লেখকই এমন সুন্দর গদ্য লিখিতে পারেন। 'জোহরা' নামক ইনি এক খানি উপন্যাস লিখিয়াছেন। 'নায়ক' পত্রের নির্ভীক সম্পাদক ও 'ভারতবর্ষের' জলধর বাবু ইহার অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন।

মোজাম্মেল হক সাহেব (ভোলা) ও একজন বিচক্ষণ কবি। তাঁহার "জাতীয় মঙ্গল" পড়িয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। তাঁহার "নির্জ্জীব বাঙ্গালী" শীর্ষক কবিতা বঙ্গবাসীর হৃদয়ে চিরজাগরূক থাকিবে।

ওসমান আলী বি, এল সাহেবের দেবলা কাব্য ও লালচাঁদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তাঁহার কবিতা আমাদের বেশ ভাল লাগে।

নবীন কবি শেখ হবিবর রহমান বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যে বিশেষ উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার 'পারিজাত', 'আবেহায়াত', 'চেতনা' 'বাশরী' প্রভৃতি কবিতা গ্রন্থে সুন্দর কবিত্ব শক্তি দৃষ্ট হয়। এই কবি রবীন্দ্রনাথের অনুসরণকারী। ফলে রবীন্দ্র নাথের কাব্যের চর্ব্বিত-চর্ব্বণ অবশ্যম্ভাবী! কবির গল্প পুস্তক 'নেয়ামত' পড়িয়া আমরা সুখী হইয়াছি। গল্পে লেখকের হাত আছে।

কবি ফজলুল করিমের 'লায়লামজনু' পড়িয়া আমরা অশ্রুবর্ষণ করিয়াছি। গ্রন্থখানি এরূপ কবিত্বময় গদ্যে লিখিত, যে কবির মিঠা হাত দেখিয়া অবাক হইতে হয়। এই গ্রন্থে মনোবৃত্তির সুন্দর বিশ্লেষণে লেখক বেশ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। এই লেখকেরই 'হারুণররসিদের গল্প' বলিয়া একটি শিশুপাঠ্য পুস্তক আছে; ইহা অত্যন্ত সুন্দর। মুসলমান সাহিত্যে এই গ্রন্থই শিশু-সাহিত্য প্রণয়নে পথ প্রদর্শক হইবে। ডালির কবি সৈয়দ এমদাদালীর কবিতা আমাদের বিশেষ প্রিয়।

গদ্য সাহিত্যে মীর মসাররফ হুসেনের স্থান সর্ব্বোচ্চে। তাঁহার এক বিষাদসিন্ধুই তাঁহাকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছে। বাস্তবিক বিষাদসিন্ধুর তুলনা কোথায় খুজিয়া পাইব জানি না। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের উদ্‌ভ্রান্তপ্রেমের সহিত ইহার কিছু তুলনা হইতে পারে। বঙ্গ-সাহিত্যে ইহার তুল্য করুণ-রসাত্মক কাহিনী বোধ হয় আর লিপিবদ্ধ হয় নাই।

উপন্যাস সাহিত্যে নজিবর রহমানের স্থান সর্ব্বোচ্চে। তাঁহার আনোয়ারা সর্ব্বজন প্রশংশিত গ্রন্থ। মুসলমান সমাজ চিত্র, মুসলমানের আদর্শ রমণীর চিত্রও গভীর দাম্পত্যপ্রেম এই উপন্যাসে অত্যন্ত সুন্দর ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, পঞ্চানন নিয়োগী প্রভৃতি বিখ্যাত হিন্দু সাহিত্যিকগণ এই উপন্যাসখানার উচ্চ প্রশংসাবাদ করিয়াছেন। তাঁহার অপর উপন্যাস হাসন গঙ্গা বাহমনীও মন্দ হয় নাই। তবে ইহা আনোয়ারার কাছে দাঁড়াইতে পারে না।

সিরাজীর 'রায়নন্দিনী' মফিজদ্দিনের "কনোজ কুমারী" ও শেখ ইদ্রিশআলীর 'বঙ্কিম দুহিতা' উপন্যাস হিসাবে আমরা ভাল বলিতে পারিলাম না। মফিজ-দ্দিনের, 'সৈয়দ সাহেব' মন্দ নহে। নূরুল হক চৌধুরীর উপন্যাস 'আকর্ষণ' উপন্যাস হিসাবে মন্দ নয়। ইহার ভাষা খুব সুন্দর।

ইতিহাস সাহিত্য লেখক আবদুল জব্বার, মৌলানা মনিরুজ্জামান ইস্লামাবাদী, রিয়াজ উদ্দিন আহম্মদ ও মহম্মদ কে, চাঁদ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। শেখ আবদুল জব্বার সাহেবের 'মক্কাশরিফের ইতিহাস' মদিনা-শরীফের' ইতিহাস, বয়তুল 'মোকাদ্দেশের ইতিহাস' নূরজাহান প্রভৃতি গ্রন্থ গভীর গবেষণার পরিচায়ক। তাঁহার আরও কয়েক খানি গ্রন্থ আছে। হজরত মোহম্মদ, আদর্শ রমণী ও গাজী। 'হজরত মোহম্মদ' ও আদর্শ রমণী উচ্চ প্রশংসিত গ্রন্থ। ইঁহার গাজী ও খুব সুন্দর। কবি আব্দুল বারী "কারবালা" নামক একখানা সুন্দর কাব্য লিখিয়াছেন। তাঁহার কাব্য খানা পড়িয়া আমরা অত্যন্ত তৃপ্ত হইয়াছি। কাব্যের স্থানে স্থানে সুন্দর কবিত্বশক্তি পরিস্ফুট হয়। দাদ আলীর "ভাঙ্গাপ্রাণ" ও "আশেক রসুল" সুন্দর কাব্যগ্রন্থ। লেখক সুকবি সন্দেহ নাই।

মুসলমান স্ত্রী লেখিকা অল্প। ইঁহাদের সাধ্য মিসেস, আর, এস্, হোসেন 'মতিচুর' লিখিয়া বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। সারা তয়কুরের 'স্বর্গের জ্যোতি' পড়িয়া আমরা মুগ্ধ। লেখিকা বাঙ্গলা রচনায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। কবিসম্রাট রবিবাবু এই গ্রন্থখানির প্রশংসা করিয়াছেন।

আব্দুল লতিফের জোলেখা, মস্তফার কবিতালোচনা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য গ্রন্থ। তবে 'জোলেখার' ভাষা অত্যন্ত সংস্কৃত ঘেসা ভাষা বলিয়া আমরা তাহার সমর্থন করিতে পারি না।

আবুনছর সইদুল্লার 'আকামে আমির চরিত', আব্দুল করিমের 'ভারতে মোসলমান রাজত্বের ইতিহাস।' হজরত মোহম্মদ ও তাহার ধর্ম্মনীতির ইতিহাস বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। কোহিনুরের বর্ত্তমান সম্পাদক রওশন আলী চৌধুরী ও 'আল্ এসলাম' ও "মহম্মদী" সম্পাদক মৌলবী আকরাম খাঁ প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী। তাঁহাদের চিন্তাশীলতা ও পাণ্ডিত্য মুসলমান সাহিত্য জগতের বিশেষ গৌরবের জিনিষ।

চট্টগ্রামের সুধী আব্দুল করিম প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া তথ্যামৃত আমাদের নিকট উপস্থিত করিতেছেন, তাহার জন্য সমগ্র বাঙ্গালী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। এই লেখক কলিকাতার কথ্য ভাষা চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বত্র ভাষা ঠিক সুন্দর কথ্য হয় নাই। মাঝে মাঝে ইহাতে এমন 'বেখাপ্পা' শব্দ প্রযোজ্য হইয়াছে, যে তাহা কাণে বড় বাজে, তথাপি এই গ্রন্থকারকে আমরা নানা কারণে অভিনন্দন করিতে বাধ্য। ইস্লামাবাদী সাহেবের ভারতে মুসলমান সভ্যতা, ভূগোল শাস্ত্রে মুসলমান, খগোল শাস্ত্রে মুসলমান, খাজা নিজাম-মদ্দীন আওলিয়া প্রভৃতি গ্রন্থে গভীর চিন্তাশীলতা ও ইতিহাস-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

রিয়াজ উদ্দিন আহম্মদ সাহেব 'আরব জাতির ইতিহাস' লিখিয়াছেন। তাঁহার এই গ্রন্থও গভীর ইতিহাসজ্ঞানের পরিচায়ক। কাজি ইমদাদুল হক বিজ্ঞান শাস্ত্রে মুসলমান ও নবিকাহিনী নামক দুই খানি সুন্দর গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

অবশেষে আমরা একজন তেজস্বী লেখকের নিকট উপস্থিত হইলাম। ইঁহার নাম মহম্মদ ইয়াকুব আলী চৌধুরী। ইনি ধর্ম্মের কাহিনী ও নূরনবী নামক দুইখানি বই লিখিয়াছেন। ইঁহার ভাষায় সিরাজীর ভাষার ন্যায় তেজ বিদ্যমান। ভাষার লালিত্যে ও সুন্দর শব্দযোজনা কৌশলে ইনি বঙ্গের যাবতীয় মুসলমান লেখককে পরাজিত করিয়াছেন। আমরা এই লেখককে অভিবাদন করিয়া আপাততঃ লেখকগণের আলোচনা হইতে ক্ষান্ত হইলাম।

উপসংহারে নিবেদন, সময়াভাবে অপর লেখকগণের আলোচনা বাদ পড়ে নাই বলিয়াই মনে করিব। লেখকের ক্ষুদ্রত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সকলে এ হীন লেখকের ত্রুটি মার্জ্জনা করিলে কৃতার্থ হইব। *

আবদুল কালাম মোহম্মদ শামসুদ্দীন।

* ঢাকায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সাহিত্য শাখায় পঠিত।

আমার বাংলা। *

এই কি আমার জন্মভূমি সোনার বাংলা দেশ ?
কোথায় এমন দেশের মানুষ সইছে এত ক্লেশ !
অন্নাভাবে জ্বরের জ্বালায় মর্‌ছে লাখে লাখে !
কে তাদেরে হাতে ধরে দুখের দিনে ডাকে !
ধুঁক্‌ছে রোগা পশুর মতন যেথায় সেথায় পড়ে';
বেশ বিলাসী দেখে শুনে যাচ্ছে দূরে সরে' !
স্বার্থে সবাই সঙ্কুচিত, আছে যে-যার নিয়ে;
নতুন অভাব তৈরি করে ভুগ্‌ছে গরল পিয়ে।
ছায়াবাজির পুতুল সম বেড়ায় ঘুরে ঘুরে ;
একটা কেমন দাবানলে শান্তি গেছে পুড়ে !
সংযমে সেই শ্রদ্ধা কোথায়—নাই শূরতার লেশ !
এই কি আমার জন্মভূমি সোনার বাংলা দেশ ?

(২)

এই কি আমার জন্মভূমি সোনার বাংলা দেশ ?
কোথায় এমন দেশের মানুষ সইছে এত ক্লেশ !
আজ বোশেখে গগনভেদী উঠ্‌ছে হাহাকার ;
তৃষ্ণায় সবার ছাতি ফাটে, দেখ্‌ছে অন্ধকার !
অসংযমী দেশের মালিক সহরবাসী সবে ;
কেমন করে গল্‌বে পাষাণ দুখীর কান্নারবে !
যাদের খেয়ে যাদের পরে আজকে তারা বড়,
যাদের অর্থে ডাগর ভুঁড়ি হচ্ছে ভীষণতর,
জড় করে যাদের টাকা দিচ্ছে শুঁড়ীর ঘরে-
অন্ন জলের জন্য তারাই ছাতি পিটে মরে।
বিলাসিতায় হচ্ছে সবার মনুষ্যত্ব শেষ !
এই কি আমার জন্মভূমি সোনার বাংলা দেশ ?

(৩)

এই কি আমার জন্মভূমি সোনার বাংলা দেশ ?
কোথায় এমন দেশের মানুষ সইছে এত ক্লেশ ?
লক্ষ্মীছাড়া চাল চলনে বজ্র বাজে বুকে;
যাদের মায়ের ভাত জোটেনা, বেড়ায় চুরুট ফুঁকে !
পতি বেড়ায় বাহার ক'রে আতর এসেন্স মাখি';
ছেঁড়া বসন দিয়ে সতী লজ্জা রাখেন ঢাকি' !
উপার্জ্জনের বিঘ্নে বুদ্ধি নাইকো ঘটে যার,
বিয়ে ক'রে বৌটি আনা হয় কি চমৎকার !
কাঙালের পাল বাড়িয়ে তোলা, দুধের কড়ি নাই ;
মর্‌বে কচি কাচা নিয়ে, বৌটি আনা চাই !
কন্যার যখন বিয়া আসে ভাবনায় পাকে কেশ,
এই কি আমার জন্মভূমি সোনার বাংলা দেশ ?

(৪)

এই কি আমার জন্মভূমি সোনার বাংলা দেশ ?
কোথায় এমন দেশের মানুষ সইছে এত ক্লেশ !
কালের স্রোতে অনেক গেছে, ঠাট্‌টি বজায় আছে;
প্রাণের টাটে ঠাট বসিলে মানুষ কদিন বাঁচে !
দেশের যারা আঁধা তাদের নাইকো কাণা কড়ি ;
পথের ধারে গাছের নীচে মরছে ঘড়ি ঘড়ি !
আয়ের চেয়ে ব্যয়টি বেশী, নট খটাতে নাশ ;
ভিটেমাটি শূন্য হয়ে ক্ষুণ্ণ বারমাস !
ভায়ের সাথে খেয়োখেয়ি, জীবন লক্ষ্মীছাড়া,
অজ্ঞানতায় মায়ের জাতি হচ্ছে যেমন ধারা ;
সর্ব্বনেশে সমাজভীতির নাইকো অবশেষ ;
এই কি আমার জন্মভূমি সোনার বাংলা দেশ ?

---

* ঢাকায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের একাদশ অধিবেশনে সাহিত্য শাখায় পঠিত।

(৫)

এই কি আমার জন্মভূমি সোনার বাংলা দেশ ?
কোথায় এমন দেশের মানুষ সইছে এত ক্লেশ !
ব্যবসা কোথায়, লক্ষী কোথায়, তেমন মানুষ কই !
লক্ষী ছেড়ে গেছেন বলে লক্ষ্মীমন্ত নই !
তখন ঘরে ধান্য ছিল, পুকুর ভরা মাছ ;
ফলের ভারে নুয়ে পড়া হাজার ছিল গাছ !
বাড়ীর গাইয়ে দুধ যোগাত, ছিল খোড়ো ঘর;
শান্তি ছিল, স্বস্তি ছিল, কেউ ছিল না 'পর'।
ছিল শ্যামল শস্যক্ষেত্র গোচারণের মাঠ ;
স্বচ্ছতোয়া জলাশয়ের শান-বাঁধানো ঘাট !
যায়না দেখা তেমন সাধু তেমন দরবেশ !
এই কি আমার জন্মভূমি, সোনার বাংলা দেশ ?

(৬)

এই কি আমার জন্মভূমি সোনার বাংলা দেশ ?
কোথায় এমন দেশের মানুষ সইছে এত ক্লেশ !
দেশের তখন স্বাস্থ্য ছিল, সবার ছিল প্রাণ ;
চাষার তখন শান্তি ছিল, গাইত প্রাণের গান !
সন্ধ্যে প্রদীপ-জ্বালা ঘরে স্বামীর প্রিয়া নারী,
সেবার আশে থাক্‌তো বসে নিয়ে শীতল বারি !
জীবন তখন সরল ছিল, প্রাণটি ছিল খাঁটি !
সংসারে এক ছিল যেমন মধুর পরিপাটি ;
স্বামীর ছিল বৌটি খাসা, বধূর ছিল স্বামী ;
সকল পুরুষ নারী সুখে থাকতো দিবস যামী।
নানান্ রোগে আজকে সবার মরণ নির্ণিমেষ !
এই কি আমার জন্মভূমি সোনার বাংলা দেশ ?

(৭)

এই কি আমার জন্মভূমি সোনার বাংলা দেশ ?
কোথায় এমন দেশের মানুষ সইছে এত ক্লেশ !
ওই ছাখো সব পাতার ঘরে পানা পুকুর ধারে ;
পল্লীমায়ের ছেলেমেয়ে কাঁদছে বারে বারে !
পিতামাতার শক্তি কোথায়, কে তাদের দেখে !
কচি কাচা মায়ের কোলে মরছে একে একে !
অন্নদানের পুণ্য তো আর চায়না দেশের লোকে ;
বট্অশথের বিয়ে দিয়ে জুড়ায় না তো শোকে !
পুকুর দিতে দেউল দিতে ব্যাকুল হতো যারা ;
সেই যে সকল আসল মানুষ কোথায় গেল তারা !
আস্‌বে না কি তারা আবার পরি নূতন বেশ !
এই কি আমার জন্মভূমি সোনার বাংলা দেশ ?

(৮)

এই কি আমার জন্মভূমি সোনার বাংলা দেশ !
কোথায় এমন দেশের মানুষ সইছে এত ক্লেশ !
সেই যে দোয়েল কোকিল ঘুঘু বৌ-কথা-কও পাখী,
বাংলা দেশের কানন জুড়ে করছে ডাকা ডাকি !
সেই জ্যোছনায় পল্লি আজো স্বপন দেখে রাতে ;
এখনো তো ফুলের প্রেমে মৌমাছিরা মাতে !
ফসল-ফলা সেই মাটিতো তেমনি খাঁটি আছে ;
এখনো যা'র বুকের দুধে কোলের শিশু বাঁচে ;
আছে ঢাকা মুর্শিদাবাদ নাটোর শান্তিপুর ;
আদর্শটা তেমনি আছে, হয়নি ভেঙে চুর !
এখন সে সব কোথায় গেল, হায় সে পরদেশ !
এই কি আমার জন্মভূমি সোনার বাংলা দেশ ?

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

মনসা মঙ্গল ও পৌরাণিক মনসা। *

বঙ্গের পুরাতন সমাজ এবং সাহিত্য জানিতে ও বুঝিতে হইলে মনসা মঙ্গল বা মনসার পাঁচালী অতীব মূল্যবান্। মনসা দেবী কিরূপে নিজ পূজা বিস্তার করেন, ইহাই 'মঙ্গলের' প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। 'মঙ্গল' সাহিত্য মনসা পূজার প্রধান অঙ্গ; কারণ, পূজার সঙ্গে এই সকল পাঁচালী বা 'মঙ্গল' গ্রন্থের পাঠের ব্যবস্থা রহিয়াছে। নব্য শিক্ষিতসমাজে ইহার আদর নাই বটে এবং এসম্বন্ধে নানা ভ্রান্ত মতবাদও প্রচলিত আছে; কিন্তু পল্লীগ্রামের অর্দ্ধশিক্ষিত এবং নিরক্ষর জনসমূহের হৃদয়ে অদ্যাপি ইহার অপ্রতিহত প্রভাব রহিয়াছে।

মনসা দেবী এতদ্দেশে 'পদ্মাবতী', 'সোমেশ্বরী', 'বিষহরী', প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। জনসাধারণ এই সমুদয় নামে এক দেবীকেই বুঝিয়া থাকে। বিভিন্ন সামাজিক ও ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে এই সমুদয় দেবীর উদ্ভব ঘটিয়া পরবর্ত্তী কালে একই দেবীর বিভিন্ন নাম রূপে পর্য্যবসিত হইয়াছে কিনা এ প্রশ্ন অধিকাংশ লোকের হৃদয়ে স্থান পায় না। শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত সকলের মনেই এই ধারণা বদ্ধমূল যে পৌরাণিক মনসা দেবীই বঙ্গীয় পদ্মাবতী, বিষহরী বা মনসা দেবী। এ সকল মতবাদের যৌক্তিকতা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে মঙ্গল সাহিত্য আলোচনা প্রয়োজন (১)।

দেবী নাগগণের জননী, নাগমাতা। 'দেবীমম্বামহীনাং' (২) লইয়াই দেবীর সুপরিচিত ধ্যান। নিরীহ পল্লীবাসী কৃষক অনন্ত, বাসুকী প্রভৃতি অমিতবিক্রমশালী পৌরাণিক নাগদিগের অস্তিত্ব সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে না; বিষধর সর্পদিগকেই নাগনামে (৩) অভিহিত করিয়া থাকে। সর্পগণের উপর দেবীর অসাধারণ প্রভাবে আস্থাবান পল্লীবাসী সর্পভীতি নিবারণের জন্যই দেবীর শরণাপন্ন হইয়া থাকে।

বর্ষাকালে পূর্ব্ববঙ্গ এবং ইহার সংলগ্ন আসামের বহু স্থানে সর্পভীতি প্রবল ভাব ধারণ করে। নিম্নভূমির পল্লীসমূহ জলরাশি মধ্যে দ্বীপের ন্যায় প্রতিভাত হয় এবং বিষধরগণ প্রান্তর ছাড়িয়া গৃহস্থের গৃহকোণে আশ্রয় গ্রহণ করে। জঙ্গলাকীর্ণ উচ্চ ভূমিতেও প্রতিপদেই বিপদের সম্ভাবনা। সর্পভয়ে অভিভূত অনুন্নত জন সাধারণ মধ্যে সর্প পূজার প্রচলন বিচিত্র

---

* ঢাকা সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

(১) কৈলাসবাসিনী উমা ও পার্ব্বতী, বিন্ধ্যবাসিনী চামুণ্ডা ও কালি, শক্তিরূপা মহেশ্বরী, কৌলিক দেবী কাত্যায়নী ও কৌশিকীর উৎপত্তি এস্থলে উল্লেখ যোগ্য। *C. f. Vaisnavism, Saivism and other minor Religious Systems. By Sir R. G. Bhandarkar pp 143-144.*

(২) দেবীমম্বামহীনাং শশধরবদনাং চারুকান্তিং বদান্যাং হংসারূঢ়ামুদারামরুণিত বসনাং সর্ব্বদাং সর্ব্বদৈব। স্মেরাস্যাং মণ্ডিতাঙ্গীং কনকমণিগণৈঃ নাগরত্নৈরনেকৈঃ। বন্দেঽহং সাষ্টনাগামুরুকুচযুগলাং ভোগিনীং কামরূপাম্॥ —পূজাবিধি।

(৩) বঙ্গের আধুনিক নাগগণ 'নাগ ধা' আরোগ্য করিতে পারে, এবং ইহাদের মধ্যে সর্পদংশনে কাহারও মৃত্যু হয় না, ইহারা সর্প বধ করে না।—জনশ্রুতি।

নহে ; উন্নত সমাজেও এইরূপ ঘটিয়া থাকে (৪)। পল্লী-বাসী বিশেষতঃ স্বভাবভীরু স্ত্রীলোক অনিশ্চিত বিপদের সম্ভাবনায় সর্পের উপর দিয়া গমন, সর্পের উপরে আঘাত অথবা কোনও রূপে সর্পের অবমাননা ঘটিয়াছে মনে করিলেই কলা ও মৃৎপাত্রে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ সর্পের উদ্দেশ্যে উৎকোচ স্বরূপ নিবেদন করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাতেও মনে শান্তি নাই। দেবী এবং তাঁহার সন্তানগণ কি করিলে তুষ্ট হইয়া অনিষ্ট সাধনে নিবৃত্ত হইবেন, ইহাই ভাবনার প্রধান বিষয় হইয়া পড়ে। সন্তানগণের উপর দেবীর অপার প্রভাব ; পক্ষান্তরে সন্তানের তুষ্টিতে কোন্ মাতৃহৃদয়ই না বিগলিত হয় ? কখন দেবীই প্রধান উপাস্য দেবতা, সর্পগণ সাঙ্গোপাঙ্গরূপে পূজিত ; আবার কখন সর্পগণই প্রধান উপাস্য দেবতা, এবং দেবী সর্প-দিগের মাতারূপে তৎসহ পূজিতা হইয়া থাকেন। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে দেবী এবং তাঁহার সন্তান-গণই বিশেষভাবে পূজিত হইয়া থাকেন। শ্রাবণী পূজা বলিতে প্রধানতঃ সর্পগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজাই বুঝাইয়া থাকে। এই পূজা বর্ত্তমান বঙ্গীয় সমাজের উচ্চস্তরে অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইতে পারে ; কিন্তু অতি প্রাচীন কালেই ভারতীয় আর্য্যগণ (৫) আদিম অনার্য্যগণ হইতে সর্প এবং উহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজা গ্রহণ করিয়াছিলেন (৬)। দেবী বিভিন্ন মূর্ত্তিতে পরিকল্পিত হন। সর্প (৭) অর্দ্ধসর্প ও অর্দ্ধনারী, চতুর্ভুজা, রক্তনেত্রা, মহাঘোরা দেবী এবং চতুর্ভুজা চারুকীর্ত্তি দেবী—এইরূপ বিভিন্ন মূর্ত্তিতে পূজার পুথীমধ্যে দেবী পরিকল্পিত হইয়াছেন। সময় সময় ঘট এবং সীজবৃক্ষ (৮) এই উভয়ই দেবীরূপে পরিকল্পিত

(৪) In Asia evidence of Serpent worship has been found in Palestine, Chaldaea, Babylon, Persia, Kashmere, Cambodia, Tibet, India, China, (traces only), Ceylon and among the Kalmuks. Serpent worship has been found among the races of Europe, among the tribes in America and is practised to the present day in Africa. The only part of Asia which seems to have remained free from it is China.—*Cyclopediaea of India.* Vol III. P. 577.

(৫) Vide Atharva Veda Book X. V. 14-15. (Whitney, pp 577-8) "The little girl of the Kiratas, she the little one digs a remedy with golden shovels upon the ridges of the mountains." 14

"Thou art a girl Tandi by name. Verily thou art by name Ghritachi. I take beneath thy poison spoiling track." 24.

এই অধ্যায়ে সর্পদংশন নিবারণের মন্ত্র এবং ভক্তিভাবে সর্পদিগকে পূজা করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে (V. 23).

(৬) ভারতের মঙ্গোলীয় অপেক্ষা খাসিয়া কোল প্রভৃতি আদিম অনার্য্যগণ মধ্যেই অদ্যাপি নাগপূজা অত্যধিক প্রচলিত। প্রাচীনকালে ভারতের পূর্ব্বাংশে কোলেরিয় জাতি বহুবিস্তৃত ছিল। কিরাত শব্দ এই অঞ্চলের যাবতীয় অনার্য্য জাতি সম্পর্কেই ব্যবহৃত হইত।

(৭) পূজিতাসি ময়াদেবী নমোস্তে সর্পরূপিনী। আগচ্ছ বরদে দেবি জগদ্গৌরি নমোঽস্তুতে ॥—পূজাবিধি।

(৮) পূজিতাসি ময়াদেবী সীজবৃক্ষ সুভক্তিতঃ। নির্জনে প্রান্তরেরণ্যে দিবারাত্রৌ চ রক্ষমাম্ ॥—পূজাবিধি। আসামের সীজুগোসাই দেবতা বা সীজগাছ স্থান বিশেষে তুলসী হইতেও অধিক পবিত্ররূপে গণ্য।

হইয়া থাকে। বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে বিভিন্নরূপে দেবীর পূজা এবং ব্রত পালন করা হয়। এই সময়ে দেবীর সাঙ্গোপাঙ্গগণের পূজা এবং ব্রতের ব্যবস্থাও রহিয়াছে।

মনসারব্রত—চারিবৎসর পর্য্যন্ত গৃহস্থকুমারীরা আষাঢ়ের সংক্রান্তি, শ্রাবণের দুই পঞ্চমী ও সংক্রান্তি এই চারিদিন উপবাস করিয়া সযত্নে নিজ নিজ ঘটে পূজা করে। প্রাচীনাগণ সাবেকী গ্রাম্য ভাষায় দেবীর পূজা প্রচলন কাহিনী এবং তৎসহ বিপুলার কাহিনী বর্ণনা করিয়া থাকেন। ব্রতান্তে বালিকারা নিজ নিজ মঙ্গল কামনা করিয়া থাকে। কথাভাগ এই ব্রতের প্রধান অঙ্গ। শ্রাবণের (হাওনের) 'হানাই বত্ত' না করিলে হাতের জল শুদ্ধ হয় না বিশ্বাসে অনেকেই এই ব্রত করিয়া থাকেন। পুরোহিতদিগের ব্যবহৃত পুথীমধ্যে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়—

> আষাঢ়ী পূর্ণিমা যা তু তৎপরং নাগপঞ্চমী
> গৌণ শ্রাবণ কৃষ্ণাচ পঞ্চমী নাগপঞ্চমী ॥
> পঞ্চম্যাং পূজয়েন্মনসা নন্তাদ্যাম্‌হোরগান্
> ক্ষীরং সর্পিশ্চ নৈবেদ্যং দেয়ং সর্পবিষাপহং ॥

কিন্তু এইরূপ ব্যবস্থা সত্ত্বেও আষাঢ়ের সংক্রান্তি দিবসেই নাগপঞ্চমীর ঘট স্থাপিত হইয়া থাকে।

স্থানে স্থানে নাগপঞ্চমীর অনুরূপ মনসা-পঞ্চমী, প্রবীণাদিগের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়। মনসাই এই ব্রতের প্রধান উপাস্য দেবতা। পূজার পুথী মধ্যে ব্যবস্থা রহিয়াছে—

> সুপ্তে জনার্দ্দনে কৃষ্ণে পঞ্চম্যাং ভুবনাঙ্গনে
> পূজয়েন্মনসা দেবীং স্নুহী বিটপ সংস্থিতা।

কিন্তু আষাঢ়ের সংক্রান্তি দিবসেই ঘট বা সীজ শাখা স্থাপন এবং শ্রাবণের সংক্রান্তিতে দিবসেই ব্রত সাঙ্গ হইয়া থাকে।

ব্রতকথা—ব্রতের মনসাকাহিনী পূর্ব্ব এবং পশ্চিম বঙ্গে একরূপ নহে। পূর্ব্ববঙ্গের ব্রত কথাই পাঁচালীর অনুরূপ। এই বিষয় যথাস্থানে আলোচিত হইবে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'ব্রত কথা' হইতে পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত ব্রতকথার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

কোনও বেনে সদাগরের সাত পুত্র ও সাত পুত্রবধূ ছিল (নাম অজ্ঞাত)। জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তির দিন বেনের ভৃত্য মাঠে দুইটী ডিম পাইয়া রন্ধনের জন্য কনিষ্ঠ বধূর নিকটে আনায়ন করে। ঐ ডিম্ব হইতে দুইটী বিষধরসর্প জন্মে। কনিষ্ঠ বধু ছোট বড় বিভিন্ন পাত্রে রাখিয়া ইহাদিগকে পালন করেন। পরে শ্বশুরের আদেশে উঁহাদিগকে বনে রাখিয়া আসেন। উহারা শিশুয়া পাহাড়ে মা-মনসার নিকট উপস্থিত হইয়া মাঠে ডিম্ব প্রসবের জন্য তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া কনিষ্ঠ বধূর দয়ার কথা প্রকাশ করে। পিত্রালয়ে তাঁহার কেহই নাই; সুতরাং মনসার নিকট কিছুদিন তাঁহাকে আনিয়া রাখিতে অনুরোধ করে। মনসা বলি-লেন, নর ও নাগ মধ্যে প্রীতি নাই; সুতরাং তোমরা দংশন করিলে নরকুলে খোটা থাকিবে। যাহাহউক নররূপ ধরিয়া এবং নানা উপহার লইয়া শ্বশুরালয় হইতে দিদিকে আনা হইল। তাঁহার জন্য ভাল বাড়ী দেওয়া হইল। ঐ বাড়ীর দক্ষিণের দরজা খুলিতে নিষেধ ছিল। একদিন তিনি ঐ দরজা খোলামাত্র নাগদিগের বিষাক্ত নিশ্বাসে অচেতন হন। উঁহারা গৃহে আসিয়া বিষ চুষিয়া তাঁহাকে আরোগ্য করে। ইহারপর তিনি অনবধানবশতঃ নাগদিগকে উষ্ণ দুগ্ধ পান করিতে দেন। ইহাতে তাহারা তাঁহাকে দংশন করিতে উদ্যত হয়। মনসা বলিলেন, উহাকে নিজ গৃহে ফিরাইয়া নেও; তথায় কোন দোষ করিলে দংশন করিও। ধনরত্ন সহ তাঁহাকে স্বামী গৃহে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। তথায় তিনি মা-মনসা ও দুই ভাইয়ের খুব প্রশংসা করায় তাঁহার স্বামী ও তাহাকে পুনঃ মনসার নিকট আনা হইল। ফিরিবার সময় মনসা বলেন—পৃথিবীতে সকল দেবতার পূজা প্রকাশ আছে, আমার নাই। তোমার শ্বশুর

গ্রামের প্রধান বেনে। তিনি পূজা করিলেই সকলে পূজা করিবে। জ্যৈষ্ঠের দশহরা এবং সংক্রান্তি এবং পঞ্চমীর দিন সীজের ডাল পুতিয়া, মনসার বাড়ী পাতিয়া গোবড়ের বেড়া দিয়া, পুরাতন হাড়ি ফেলিয়া, তিতা খাইয়া আমায় পূজাকরিও—সর্পভয় থাকিবে না।

মনসা পূজা—বঙ্গের অধিকাংশ স্থানে মনসা পূজা মনসা পঞ্চমীর স্থান অধিকার করিয়াছে। মনসা পূজায় নাগ-মূর্ত্তি অঙ্কিত ঘট, মনসাদেবী এবং অনন্ত, বাসুকী তক্ষক, কার্কোটক শঙ্খপাল, কাম্বোল এবং পদ্ম এই অষ্টনাগের ৯টী মৃণ্ময়ী সর্পমূর্ত্তি অথবা সীজশাখাকে মনসা কল্পনা করিয়া পূজা করা যায়। সুরমা এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় চতুর্ভুজা মৃন্ময়ী মূর্ত্তি সোমেশ্বরী (১) বিষহরী নামে পূজিতা হন। পশ্চিমবঙ্গে জগদ্গৌরী রূপেই দেবী বিশেষ ভাবে পূজিত হন। ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ উচ্চশ্রেণীর পূজা করিয়া থাকেন কিন্তু নিম্নশ্রেণী মধ্যে হাড়ি ডোম ডুখলা প্রভৃতি নিজেরাই পূজা করিয়া থাকে। কোচ ও ওঝাগণ উত্তরবঙ্গের মালী-দিগের পূজা করিতে দেখা যায়। পাঁচালী পুথী মধ্যে হংস, হংসডিম্ব, পারাবত, ছাগ, শূকর প্রভৃতি বিভিন্ন উপচারে পূজার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়।

(১) গারোপাহাড় হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মপুত্রের একটী উপনদীর নামও সোমেশ্বরী।

বঙ্গের উত্তরপূর্ব্ব সীমান্তে ধনশালী ব্যক্তিগণের মধ্যে বহুলোক পাঁচালী বর্ণিত চন্দ্রধর কর্ত্তৃক মধুকর ডিঙ্গায় সমবেত পদ্মাবতী ও অন্যান্য দেবগণের পূজার অনুকরণে, গণকের নির্ম্মিত নৌকায় পাঁচালী বর্ণিত চান্দ, চান্দের স্ত্রী এবং সাত পুত্র, বিপুলা, দুলাই, কাণ্ডারী এবং পদ্মা,নেতা,অষ্টনাগ, মহাদেব, গঙ্গা, পার্ব্বতী নারদ, প্রভৃতি দেবগণের মৃন্ময়ী মূর্ত্তি স্থাপনা পূর্ব্বক একযোগে ত্রিলোকের দেবগণের পূজা করিয়া ইহলোকে অপার কীর্ত্তি এবং পরলোকে সদ্গতি লাভ মানসে সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন না।

পূর্ব্ববঙ্গে অপেক্ষাকৃত অল্প আড়ম্বরের সহিত মূর্ত্তি-গুলি, মণ্ডপঘরে, পূজিত হইয়া থাকে। এই উপলক্ষে পাঁচালীর আখ্যায়িকা অশিক্ষিত ব্যক্তির হৃদয়েও সমাজ-রূপ ধারণ করে।

পাঁচালী—পদ্মাবতীর পাঁচালী পাঠ এবং গীতি বা মনসামঙ্গল পদ্মাবতী পূজার প্রধান অঙ্গ। দীর্ঘ রাত্রি জাগরণ পূর্ব্বক প্রতি পল্লীতে পদ্মাবতীর পাঁচালী পাঠ হয় এবং ভক্তিভাবে সকলে শ্রবণ করে। স্থানে স্থানে মৃদঙ্গ করতাল সহযোগে পদ্মাবতীর গীতি—

নমো নমো পদ্মাবতী শঙ্কর নন্দিনী
নাগভয়ে কর রক্ষা নাগের জননী ॥

সময় সময় ভাবপ্রাবল্য এত অধিক হইয়া পড়ে যে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে গীত বন্ধ হয় না। যাহারা গীত গায় এবং যাহারা ভক্তিভাবে গীত শ্রবণ করে উভয়েই ধন্য—

'যেই নরে শুনে গায়ে খণ্ডয়ে দুর্গতি।'
'যেই গায়ে যেই শুনে সর্ব্বত্র কৈল্যাণ।'

যাহারা পাঁচালী পাঠ করে, শ্রবণ করে, অথবা ভক্তি-ভাবে পূজা করে তাহারাও ধন্য—

যেই জনে মনসারে পূজে পৃথিবীতে
পদ্ম পুরাণ পাঠ করে হয়ে একচিত্তে ॥
সেই জন সুরপুরে করয়ে গমন
লঙ্ঘন না হয় কভু পুরাণ কথন ॥

রয়াণী ও নৌকা পূজায় একদলের পর অপর দল কীর্ত্তনীয়া অহোরাত্র পদ্মাবতীর পাঁচালী গাহিয়া থাকে। গীতি পারদর্শী ওঝা বা গাইন বিভিন্ন দলের পরিচালনা করিয়া থাকেন। সময় সময় ইঁহারা প্রতিযোগিতা সহকারে গীত গাহিয়া থাকেন। এসময়ে গুরুমা, গাইনদিগের প্রতিপত্তি অত্যন্ত অধিক। ইহাদের গীতি শ্রবণে অশেষ পুণ্য। বিধির বিপাকে ইহাদের সর্ব্বত্র অবাধ গতি এবং ইহাদের অসংযত বাক্যে কেহ বাদ সাধেনা; সুতরাং শিবের কুচুনী নগরে বিহার, গঙ্গা গৌরী দুই সতীনের

কলহ, বরবেশী শিব দর্শনে স্ত্রীলোকদিগের মনোভাব প্রভৃতি বিষয় অসংযত ভাষায় গাহিয়া থাকে। ওঝাদিগের সংগৃহীত পাঁচালী পুথি প্রধানতঃ কোনও এক কবির রচনা হইলেও আসর জমাইবার উপযোগী প্রাচীন ও সমসাময়িক কবিগণের বহু পয়ার ও লাচাড়ি দ্বারা পুষ্ট।

দ্বিতীয়তঃ কবিগণও গীত হইবার জন্যই প্রধানতঃ পাঁচালী রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেন এবং লোকরঞ্জনার্থ লোকপ্রিয় প্রাচীন উৎকৃষ্ট পদাবলী উপেক্ষা না করিয়া নিজ নিজ পুথিমধ্যে সযত্নে স্থাপন করিতেন। সুতরাং প্রতি পুথিমধ্যেই পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের ভণিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ সম্পূর্ণ পাঁচালী পুথি রচনা করিয়াছেন, কেহ কেহ বা দুই একটী উৎকৃষ্ট পাঁচালী রচনা করিয়াই বিভিন্ন পুথিমধ্যে অমর হইয়াছেন; সুতরাং বিভিন্ন কবির ৬০ টী ভণিতা দেখিয়াই ৬০টী পাঁচালী পুথি প্রণেতার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া অনেকে যেরূপ বিষম ভ্রমে পতিত হইতেছেন, তদ্রূপ কোন পুথিতে একাধিক ভণিতা দর্শনে পুথি কৃত্রিম প্রচার করিয়াও ততোধিক ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজে পাঁচালী সম্বন্ধে বহু ভ্রান্ত মতবাদ প্রচারিত রহিয়াছে। সুতরাং এই সকল পুথি জানিবার এবং বুঝিবার বিস্তর অবসর রহিয়াছে।

নারায়ণ দেবের পুথিমধ্যে দ্বিজ বংশী দাস, কবি বল্লভ, জগন্নাথ, চন্দ্রাবতী, বিপ্র জানকীনাথ প্রভৃতি নারায়ণ দেবের পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের ভণিতা দর্শনে দীনেশবাবুর 'বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্যে' (১৯৬ পৃঃ) যে কটাক্ষ করা হইয়াছে তাহা সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

প্রত্যেক কবির রচনায় পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের রচনা, ধর্ম্মভাব ও সমাজের অবস্থা সম্বন্ধে যে আভাষ পাওয়া যায়, তাহার আলোচনায় পাঁচালীর পদ্মাবতী চরিত্র বুঝিতে সাহায্য করিবে। এই সম্পর্কে নারায়ণদেব ও ষষ্ঠিবরের কবিতার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে।

১। নারায়ণ দেবের পুথি (১০)—

নারায়ণদেব আত্মপ্রশংসা ভালবাসিতেন না। তিনি জন্মাবধি মূঢ়, বিদ্যাবিশারদ নহেন। নিজ বা অপরের রচিত উৎকৃষ্ট গীত যাহা জানিতেন তৎসমুদয়ই তিনি নিজ পুথিমধ্যে স্থান দিয়াছেন। মুদ্রিত পুস্তকে নারায়ণদেবের আত্মপরিচয় সম্বন্ধে দুইটী বিকৃত পরস্পরবিরোধী পাঠ স্থান পাইয়াছে—

(ক) ১। নারায়ণদেবের জন্ম হৈল বঙ্গদেশ
নরসিংহদেব পুত্র বিজ্ঞ বিশেষ।
কায়স্থ পণ্ডিত বড় বিদ্যাবিশারদ
সুকবি বল্লভ খ্যাতি সর্ব্বগুণ যুত।
বার বৎসর কালে দেখিলাম স্বপন
মহা পরিশ্রম মনে হৈল দরশন॥ ১ পৃঃ

....

(২) নারায়ণদেবে কহে রচিয়া পয়ার
মিশ্র শ্রীপতি নহে পাণ্ডিত্য অপার
মধুকুল্য গোত্রে হন গাঞি গুণাকর
ক্ষত্র-কুলে জন্ম সংকায়স্থের ঘর
নরহরি তনয় যে নরসিংহ পিতা
মাতামহ প্রভাকর রুক্মিণী দেবী মাতা॥
লেখক যামিনীকান্ত মহাভাজমান। (১১)
ইত্যাদি ৫ পৃঃ।

নিম্নরেখ অংশগুলি যে কৃত্রিম তাহা ষষ্ঠিবরের পুথির পরবর্ত্তী উদ্ধৃত অংশ হইতে প্রমাণিত হইবে। এইরূপ পাঠ হইতে প্রাচীন কবিগণের স্বরূপ আবিষ্কার করা যে দুরূহ ব্যাপার তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

নারায়ণ দেবের পুথির বিভিন্ন ভণিতা—
(ক) সুকবি নারায়ণদেবের সরস পাঁচালী
পয়ার ছাড়িয়া এক বলিব লাচাড়ি॥

(১০) ময়মনসিংহ চারু প্রেস হইতে মুদ্রিত।

(১১) উদ্ধৃত পরস্পর বিরোধী দুইটী অংশ হইতে মুদ্রিত পুস্তকের কৃত্রিমতার জন্য লেখক অথবা প্রকাশক কে অধিকতর ভাগ্যবান তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন।

নারায়ণদেবে কয় সুকবি বল্লভ হয়।

(খ) বিপ্র জগন্নাথে (১২) কয় সুকবি বল্লভ হয়॥

গাইল বৈদ্য জগন্নাথে সরস পয়ার॥

কহে দ্বিজ জগন্নাথ পদ্মার চরণ॥

জগন্নাথ পণ্ডিতের কবিত্ব শুদ্ধমতি॥

(গ) দ্বিজ বংশীদাসে গায় মধুর পদবন্ধ
সত্যমাত্র নারায়ণ আর সব ধন্ধ॥

(ঘ) গাইল গাঞান চন্দ্রাবতী মনসার ভাষা
সভাপতিক বর দেউক জয় দেবী মনসা॥

(ঙ) পদ্মাবতীর চরণ শিরে করি বন্ধন
বিপ্রজানকী নাথে গায়,
খাড়ি বিচম্মিলইয়া কপটে ডোমনি হইয়া
শাশুরী নিকটে বেউলা যায়॥

(চ) কহে দ্বিজ মনোহর পদ্মার চরণ॥ ইত্যাদি।

২। ষষ্ঠিবরের পুঁথি—ষষ্ঠিবর কৃত পদ্মাপুরাণ পূর্ব্ববঙ্গে সুপরিচিত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীহট্টের বিভিন্ন স্থানে ষষ্ঠিবরের প্রাচীন পুথি অনুসন্ধানক্রমে দুইখানার অনুলিপি প্রস্তুত করাই। উহার একখানা বর্ত্তমানে ঢাকা সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত হইয়াছে। কোন পুথি মধ্যেই কবির আত্মপরিচয় পাই নাই; কিন্তু আভ্যন্তরিক প্রমাণে তাহাকে শ্রীহট্টবাসী বলিয়া মনে হইবে। "বঙ্গসাহিত্য পরিচয়" (২৫০-২৫৭ পৃঃ) গ্রন্থে তাঁহাকে গুণরাজ খাঁ নামে সুবর্ণবনিকা জাতীয় বিক্রমপুরবাসী রূপে প্রচার করা হইয়াছে। তিনি ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন এবং তিনি গঙ্গাদাস সেনের পিতা এরূপও প্রচার করা হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ পাঁচালীকার এবং সাহিত্য পরিচয়ের গুণরাজ খাঁর ভূগোল এবং ভাষা আলোচনায় দৃষ্ট হইবে যে গুণরাজ খাঁ পাচালীকার হইতে সম্পূর্ণ এক পৃথক ব্যক্তি। আমাদের সংগৃহীত পুথি মধ্যে ১৭৭টী ভণিতা রহিয়াছে; তন্মধ্যে জগন্নাথের ২৬টী, দ্বিজ বংশীবদনের ৯টী, দ্বিজ বংশীদাসের ১টী, চন্দ্রাবতীর ২টী. বিপ্র জানকীনাথের ৩টী, নারায়ণদেবের ২০টী, বর্দ্ধমান দত্তের ৪টী, রামঘোষের ১টী, দ্বিজ রামচন্দ্রের ২টী, দ্বিজ হরিদাসের ১টী, এবং ষষ্ঠিবরের ১০৭টী।

নারায়ণদেবের ন্যায় ষষ্ঠিবর পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের রচনা হইতে ইচ্ছানুরূপ আহরণ করিয়াছিলেন। ইনি নারায়ণ দেবের অব্যবহিত পরবর্ত্তী এবং উভয়ে একই ভাণ্ডার হইতে আহরণ করেন। ঐ ভাণ্ডারের স্রষ্টাগণ তথাকথিত কাণাহরিদত্ত এবং বিজয় গুপ্তের পরবর্ত্তী নহেন। ইঁহাদের পাঁচালী সাহিত্য সুরমা এবং ব্রহ্মপুত্র বদ্বীপের সম্পত্তি; পশ্চিমবঙ্গের ব্রত কথা ও এই সাহিত্য সম্পূর্ণ পৃথক প্রকৃতি বিশিষ্ট। যে ধর্ম্মবিশ্বাসে ষষ্ঠিবর অনুপ্রাণিত, তাহা চৈতন্য প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহার 'মহাপ্রভু' রামচন্দ্র। তাহার দেব দেবীর বন্দনায় বঙ্গের বৌদ্ধ এবং পাঠান যুগের স্পষ্ট ছাপ দৃষ্ট হইবে। মঙ্গল-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ আলোচনার পূর্ব্বে আমরা আমাদের সংগৃহীত পুথি মধ্যে নারায়ণদেবের যে আত্মপরিচয় রহিয়াছে, তাহা উদ্ধৃত করিব। আমরা একাধিক কলমী পুথিতে প্রায় এইরূপ ভণিতাযুক্ত পদ দেখিয়াছি।

দেবী মনসার পদে কর পুট করি
কহিমু জনম কথা জয় বিষহরি॥
পণ্ডিত সমাজে মুই করি নমস্কার
যাহা কিছু জানি গীত কহি মনসার॥
নারায়ণ দেবে কয় জনম যুগদ
মিশ্র পণ্ডিত ভট্ট নহে বিশারদ॥
শুদ্র কুলেতে জন্ম কায়স্থের ঘর
মধুকোল্য গোত্র গোসাই গুণাকর॥

(১২) বৈশাখ ১৩২৪ সনের প্রতিভা পত্রিকায় কোন ভণিতায় জগন্নাথের নামের পূর্ব্বে বৈদ্য আখ্যা দেখিয়াই শ্রীযুক্ত মদনমোহন [illegible] মহাশয় জগন্নাথকে শুদ্রবৈদ্য সাব্যস্ত করিয়াছেন।

বার বৎসরের কালে দেখিলাম স্বপন
মহাজন সনে মর হইল দরশন ॥
শিশুরূপে গোপাল হস্তেতে লইয়া বাঁশী
আলিঙ্গন দিলা মরে মধুমুখে হাসি ॥
তার অবশেষে পদ্মা দেখাইলা স্বপন
কবিত্ব আশা মর সেহিত কারণ ॥
গুণিগণ নিকট আমি কি কহিতে পারি
গাইনের নিকটে যেন কার্ম্মুকের ধ্বনি ॥
শঙ্খ নিকটে সামুকের কিবা কথা।
সুমেরু নিকট যেন শোভে ধর পোতা ॥ ইত্যাদি

বন্দনা—গ্রন্থারম্ভে একাধিক কবির রচিত বন্দনা রহিয়াছে। এই সকল বন্দনা হইতে বষ্ঠিবর যে ধর্ম্মবিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হইয়া মনসা মঙ্গল রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং বিভিন্ন যুগের রচনায় যে ভাবে মঙ্গল-সাহিত্য পুষ্ট হইয়াছে তাহার আভাস পাওয়া যাইবে।

(ক) প্রথম বন্দনায় সর্ব্ব বিঘ্ন বিনাশক গণপতি এবং নাগমাতার স্তুতি —

নাগমাতা—বন্দি আমি নাগমাতা অনন্তের আই।
তুমার চরণতলে নাগভয় নাই ॥

নাগমাতা হরের তনয়া, পদ্মোদ্ভবা, পদ্মপুষ্পপ্রিয়া রূপে কীর্ত্তিত হইয়াছেন ॥

(খ) দ্বিতীয় বন্দনায়—নিরঞ্জন, মৎসাদি দশ অবতার, পার্ব্বতীকুমার কার্ত্তিক ও গণপতি, সুরপতি ইন্দ্র, গন্ধর্ব্ব কিন্নর ও বিদ্যাধর, পার্ব্বতী লক্ষ্মী ও সরস্বতী, গঙ্গা আদিত্য ও মরুৎ, পদ্মা, জনক নন্দিনী, দেবতা ও ব্রাহ্মণের স্তুতি।

নিরঞ্জন—প্রথমে বন্দিমু দেব নাথ নিরঞ্জন
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এ তিন ভুবন ॥
গঙ্গা—হস্ব মুক্তি হয়ে যার জল পরসিতে ॥
পদ্মা—প্রত্যক্ষ বন্দিয়া গাই পদ্মার চরণ ॥

(গ) তৃতীয় বন্দনায়—নিরঞ্জন, গণেশ, কার্ত্তিক, যক্ষ, দানব, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, অশ্বিনীকুমার, দশভুজা, বিষহরি, সরস্বতী, গঙ্গা, বিশ্বেশ্বর, গয়া ও জগন্নাথ ক্ষেত্র এবং পাতালের নাগগণের স্তুতি।

নিরঞ্জন—নিরঞ্জন রূপে হরি বন্দিলাম শিরে।
যাহা হনে সৃষ্টি গোসাই হয়ে বারে বারে ॥
কমল আসন বন্দি বন্দুএ শ্রীহরি
শিব শক্তি বন্দি গাই কর জুড়ে করি ॥
কার্ত্তিক—তারকাক্ষ অসুর যেই করিল বিনাশ।
দশভুজা—দশভুজা ত্রিনয়নী জটাজুটভার
করজুড়ে তান পদে প্রণতি আমার ॥
বিষহরি—চতুর্ভুজা ত্রিনয়ানী রক্তবস্ত্র ধারী
করজুড়ে প্রণমহু জয় বিষহরী।
সরস্বতী—বর্ণ বর্গ শুদ্ধাশুদ্ধ কিছুই না জানি
অপরাধ ক্ষমা কর হরের জননী ॥
জন্মভূমি—অগ্নি তুলসি বন্দি জন্মভূমি স্থান।
প্রণাম করি ও মাও কর পরিত্রাণ ॥
গুরু— এক অক্ষর দুই অক্ষর যেবা শিখায় গীত
সেই গুরু বন্দি গাই সভার বিদিত ॥

(ঘ) চতুর্থ বন্দনায়—চারিবেদের উদ্ধারকারী মীন, মহীভার ধারণকারী কূর্ম্ম, পাতালে প্রবেশ পূর্ব্বক দন্তে বসুমতি ধারণকারী বরাহ, হিরণ্যকশিপুনিধনকারী নরসিংহ, বলীর ছলনাকারী বামন, রাবণ নিধনকারী শ্রীরাম, কালিন্দী বন্ধনকারী হলধর, কংশ নিধনকারী (বাসুদেব) শ্রীকৃষ্ণ, ক্ষত্রিয় সংহারকারী পরশুরাম, যোগতত্ত্বজ্ঞানী বুদ্ধ এবং কল্কি এই দশ-অবতারের স্তুতি।

হরি—নারায়ণ দেবে কহে হরি পরে কেহ নহে
এক ব্রহ্ম জগৎ বিচার ॥

(ঙ) পঞ্চম বন্দনায়—নিরঞ্জন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, গঙ্গা, গৌরী, শঙ্কর, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, বসুমতী, চন্দ্র, সূর্য্য, যম, অগ্নি, পুরন্দর, বায়ু ও মুনিগণের স্তুতি।

নিরঞ্জন—বন্দুমুনি নিরঞ্জন সংসার পালন
ব্রহ্মায়ে মুনির যে পদ্ম ধিয়ায়।

শঙ্করে বেভুল না পায় আদ্য মূল
তিন লোকে যার গুণ গায় ॥
বিষ্ণু—বিষ্ণু রূপেতে হরি কপট মায়া করি
পালন রূপে ভেদিয়াছে সংসার
অসংখ্য অবতার করে ত্রিজগতের বৈরী মারে
কেহ বুঝিতে নারে মায়া ॥
দুর্গা—দুর্গাদেবী মহামাই তাহান উপমা নাই
মুহিনী রূপে মুহিছে সংসার ॥
প্রচণ্ডরূপ ধরি ত্রিজগৎ বৈরী মারে
নারী হইয়া পাতিছে পসার ॥
কহে ষষ্ঠিবর কবি কণ্ঠে ভারতি দেবী
যথা দেব ধর্ম্মের রচন ॥

(চ) ষষ্ঠ বন্দনায়—দিবাকর, মহাদেব, জগন্নাথ ও কালীদহ সাগরের স্তুতি।

দিবাকর—পূর্ব্বে বন্দিয়া গাই পূর্ব্ব দিবাকর
যে গোঁসাই উদয় হইলে সয়াল পশর
পূর্ব্বে উঠিয়া পশ্চিমে ধরে ছায়া
তেত্রিশ কোটী দেবে যার বুঝিতে নারে মায়া॥
মহাদেব—সকল দেবের মধ্যে মহাদেব রাজা
গঙ্গা গৌরী দুই দেবী যাহার ভার্য্যা ॥
জগন্নাথ—পশ্চিমে বন্দিয়া গাইমু শ্রীজগন্নাথ
যাহার পুরিতে গিয়া মাগিয়া খাই ভাত
উচিত মূলে যে অন্ন কিনিয়া খাইমু
তার পুন্ন ফলে বৈকুণ্ঠে চলি যাইমু ॥
কালীদহসাগর—দক্ষিণে বন্দিয়া গাম কালীদয় সাগর
চান্দের চৌদ্দ ডিঙ্গা যাহাতে হৈল তল।
চৌদ্দ ডিঙ্গা তল হৈল বাদে মনুসার
সেই হনে মনুসা পূজা হইল প্রচার ॥
গায় ষষ্টিবর কবি মনুসার দাস
ভক্ত জনেরে মাও পূরণ কর আশ ॥

(ছ) সপ্তম বন্দনায়—কৃষ্ণ, বুদ্ধ এবং মহাপ্রভুর স্তুতি।

কৃষ্ণ—কংস বধ হেতু গোয়াল জন্ম যার ॥
বুদ্ধ—নবমেতে বুদ্ধরূপ করিলা প্রচার
উচ্ছিষ্ট অন্নেতে হৈলা পাতকী নিস্তার ॥ (১৩)
মহাপ্রভু—মহাপ্রভু জন্ম লইলা দশরথের ঘরে (১৪)
কলিযুগে রাম নাম পাতকী তরিবারে ॥

(জ) অষ্টম বন্দনায়—অর্দ্ধশরীরে হর গৌরী অর্দ্ধ কলেবর শঙ্কর-ভবাণী বা উমা-মহেশ্বরের স্তুতি।

(ঝ) সৃষ্টি পত্তন—

তীর্থস্নান করিবার নাহি ছিল কেও।
পূজিবার ছলেতে নাহি ছিল দেও ॥
আপনে জন্মিলা প্রভু শূন্যে করি ভর
দ্বিতীয়ে জন্মিলা পক্ষী শূন্যে করি ভর।
আপনার কায়া প্রভু বিচারিয়া চায়
মন পবন ক্ষমা ধ্যানে নাহি পায় ॥ (ষষ্টিবর)
নিরঞ্জন রূপধরি অর্দ্ধ শরীরে হরি
চারি বেদ করিলা প্রচার ॥
পঞ্চভূত এক হইয়া গড়িল আপন কায়া
নিরঞ্জন হইলা উৎপত্তি ॥ (নারায়ণ)

নিরঞ্জন কর্ত্তৃক অনাদি, উল্লুকপক্ষী, জল, বৃক্ষ, পৃথিবী, দুর্গা এবং বাসুকী সৃষ্টি হইল।

প্রভু গোসাই বা নিরঞ্জনের মুখ হইতে অনাদির জন্ম হয়। তিনি সমুদ্রজলে বটপত্র আসনে অবস্থান করেন। অনাদির গঙ্গা নামে কন্যা এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর নামে তিন পুত্র জন্মে।

অনাদি ধ্যানে মন পবন এবং ক্ষমা প্রাপ্ত হন। দুর্গাদেবী তাঁহার বাম বাহু হইতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার শরীরের ত্রিগুণে ত্রিলোক এবং গাত্রোৎপন্ন বিষ

(১৩) বঙ্গের জলবায়ুর গুণে সমাজের নিম্নস্তর মধ্যে বৌদ্ধবাদের এইরূপ পরিণতি ঘটে! সমাজে হিন্দু, বৌদ্ধ এবং জৈন মতবাদের যে অদ্ভুদ্‌ সমাবেশ ঘটিয়াছিল তাহা পরবর্ত্তী উদ্ধৃত অংশগুলি পরিস্ফুট করিবে।

(১৪) পাঁচালীর মহাপ্রভু মধ্যে চৈতন্য দেবের সংস্পর্শ নাই।

হইতে বাসুকীর জন্ম হয়। দুর্গাদেবী অনাদির তেজ সহ্য করিতে অক্ষম হওয়ায় অনাদির অঙ্গ কর্ত্তিত হয় (১৫) এবং উহা হইতে ইন্দ্রদেব জন্মগ্রহণ করেন।

দেবীর কন্যা গঙ্গা এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিন পুত্র। ইঁহারা ত্রিগুণের একটী করিয়া গুণ প্রাপ্ত হন। দেবীর মুষ্টিমধ্যে অনাদির তেজ হইতে সতী সাবিত্রী লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর জন্ম হইতে দেখিয়া অনাদি হাস্য করিবা মাত্র উহা হইতে চন্দ্র সূর্য্য উৎপন্ন হয়।

অনাদি ব্রহ্মাকে ব্রহ্মজ্ঞান ও সাবিত্রী দেবী দান করিয়া বসিলেন—'তোমার বিষয় হইল লেখন পড়ন'। শিব সংসারের রাজচক্রবর্ত্তী পদ এবং দুর্গা এবং গঙ্গাকে ভার্য্যারূপে লাভ করিলেন। অনাদি অতঃপর অপর যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করিয়া নিজ গর্ব্বে নিরঞ্জনকে বিস্মৃত হইলেন। ইহাই তাঁহার বিনাশের কারণ হইল—

নিরঞ্জন ভাবি প্রভু হইলা অচেতন
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর করয়ে কান্দন।
সমুদ্রের কূলে গিয়া করিলা দাহন
জন্মিতে লাগিলা যত সিদ্ধাগণ॥ (ষষ্ঠিবর)
সপ্ত প্রদক্ষিণ করি মুখে দিল জুই
বাপ বাপ করিয়া ডাকিলা রাও দুই।
পুড়িতে অনাদিকে গেল কতক্ষণ
জন্মিতে লাগিলা যত সিদ্ধাগণ। (নারায়ণ)

আদ্যনাথ. শ্রীগোরুকনাথ, হাড় হইতে হাড়িপাহা, কর্ণ হইতে কর্ণপাহা, চর্ম্মতট হইতে চৌখণ্ডিনাথ, (নাভী হইতে রাঘবের পেটে) মীননাথ, উরু হইতে আস্তের বাদাই, চরণ হইতে চরণী সিদ্ধাই একে একে অষ্ট সিদ্ধার জন্ম হইল। অতঃপর মেদি হইতে যমরাজ ও ইন্দ্র হইতে ইন্দ্ররাজের জন্ম হয়।

একে একে মহাপ্রভু দিলা মহাফল
যক্ষ দানব ভূত জন্মিলা সকল॥

পাঁচালীর পদ্মাবতী।

(ষষ্ঠিবরের পুথি হইতে সঙ্কলিত)

পদ্মাবতীর জন্ম—একদা দুইটী কেলিরত পক্ষী দর্শনে মহাদেবের বীর্য্য পতন হয়। উহা হইতে এক চতুর্ভুজা কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। সোমবারে জন্ম বলিয়া এই দেবীর নাম সোমেশ্বরী বা সুমাই (১৬)। মহাদেব ইঁহার জন্য পৃথক পুরীর ব্যবস্থা করিয়া আশীর্ব্বাদ করেন—

"যেই জনে ভজে তোমায় বাড়াইও বরে
যেই জনে না ভজে মারিও সত্বরে॥" (১৭)

কিন্তু পাতালে জন্ম কাহিনীই সুবিস্তরে বর্ণিত হইয়াছে—

ঢালিয়া থুইলাম বীর্য্য কমলের পাতে।
পক্ষিণী পাইয়া বীর্য্য খাইল অকস্মাতে।

পক্ষিণী শিববীর্য্য পান করিয়াই পুনঃ পদ্মপত্রে উহা উদ্গীরণ করে। অতঃপর—

সহস্র নালে বীর্য্য গেল পাতাল পত্থর
নাগগণে পাইয়া কন্যা গড়িলা সত্বর।
সোমবারে জন্মিলা দেবী প্রভাতে মঙ্গলবার
অশ্বিনিয়ে মেষরাশি হইল পদ্মার॥

---

(১৫) কিন্তু সৌপ্তিক পর্ব্বে বর্ণিত আছে যে ব্রহ্মদেবের আদেশে মহাদেব সৃষ্টি কার্য্যে বিরত হইয়া সাগরজলে প্রচ্ছন্ন থাকেন। ইহার দীর্ঘকাল পরে ব্রহ্মদেব এক প্রজাপতি সৃষ্টি করিয়া তদ্বারা নানা জীব সৃষ্টি করেন। মহাদেব এই সকল জীব দেখিয়া সৃষ্টির প্রয়োজনাভাবে নিজ অঙ্গ কর্ত্তন করেন। কর্ত্তিত অংশ ভূমি সংলগ্ন হইয়া থাকে।

(১৬) রক্তবস্ত্রাং মহাঘোরাং রক্তমালা বিভূষিতাং
বিশ্ববন্দিতাং দেবীং সোমেশ্বরীং নমাম্যহং॥
চতুর্ভুজাং ত্রিনেত্রাঞ্চ নানালঙ্কার ভূষিতাং
সর্ব্ব সম্পদপ্রদাং দেবীং সোমেশ্বরীং নমাম্যহং॥
রক্তনেত্রাং লোলজিহ্বাং সদারুধির লালসাং ..
—পূজাবিধি।

(১৭) The formula of her religion is *do ut des*—I give that you may give.

অপর জন্ম বিবরণ অনুসারে—একদা এক বিল্ব বৃক্ষতলে বিশ্রাম কালে যুগল শ্রীফল দর্শনে পার্ব্বতীর স্তন-যুগল স্মরণ করিয়া মহাদেব বিচলিত হইয়াছিলেন। ইহার ফলেই শিববীর্য্যে মনসার জন্ম ঘটে।

পিতৃদর্শন—অষ্টমবর্ষ বয়ক্রমকালে দেবী পিতৃ দর্শনে যাত্রা করিলেন। মহাদেব (১৮) পতিশোকে শোকাকুলা রতিকে দেখিয়া অধীর হইয়াছিলেন; বিবাহের পূর্ব্বেই পার্ব্বতীর কপালের সিন্দুর মলিন করিয়াছিলেন, গৃহে দুই পত্নী থাকিতেও ডোম কুচুনীর (১৯) ঘরেই সর্ব্বদা কাল অতিবাহিত করেন। "ভাঙ্গ ধুতুরা খায়ে শিবে গায়ে নাহি বল," "লম্পট পাগল শিব মাগে ঘরে ঘর"। কন্যাকে দেখিয়া "বলে শিব বচন কাচ্ছন্দ"। পিতার অনুচিত ব্যবহারে—

বিষ নয়নে তবে চাহে বিষহরি।
ঢলিয়া পড়িলা শিব উপর শিওরি॥

পদ্মাবতী "পানিপড়িয়া" "ধামাইল" গান গাহিয়া বিষ ঝাড়া মন্ত্র পাঠ করিলেন—

কালা কালা অরে বিষ কালা তব জাতি
অনাদি গরল হনে তব উৎপত্তি॥
ডাকিতে না শুন বিষ হইলে নিবে কাল
ভস্ম যাও অরে বিষ সপ্ত পাতাল॥
আদ্য মন্ত্র পাইয়া তবে বিষ নষ্ট হইল
ত্রিদেশের নাথ প্রভু বর্ত্তিয়া উঠিল॥

পিতৃগৃহে যাত্রা—

পুষ্পের করণ্ডি মধ্যে দুধকলাসহ পদ্মাবতীকে লইয়া মহাদেব গৃহে চলিলেন। পথিমধ্যে হালুয়া বচ্চাইর সহিত সাক্ষাৎ হইল। ধনলুব্ধ পিতা মাতা বৃদ্ধের নিকট কন্যা সমর্পণ করিয়াছে, এইরূপ পরিহাস করায় পদ্মাবতীর বিষদৃষ্টিতে বছাই ঢলিয়া পড়িল। বছাইর মা শোকে আত্মহারা হইলেন। (২০)

সাত পাচ হালুয়া বলে শুন বছাইর মাও
ক্রন্দন এড়িয়া বছাইর প্রতিকার চাও।

অজ্ঞাত এবং ঐহিক ভীতিবিহ্বলতার বশবর্ত্তী হইয়া বছাইর মা দেবীর পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইল। ইহাতে পাপ, পুণ্য, অনুশোচনা, মুক্তি প্রভৃতি তাহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই।

বছাইর মা দেবীর শরণাগত হইল—

কোন দেব হও মাও কোন অবতার
পরিচয় দিয়া পূজা লহত আমার॥ (২১)
পদ্মা কহে পুত্র তোর পারি জিয়াইবারে
লক্ষ বলি দিয়া যদি তুমি পূজ মোরে॥

---

(১৮) বাজসেনয়ী সংহিতায় রুদ্র "robber, cheat, deceiver, lord of pilgrims and robbers' রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। "In fact his character approximates to the fierce, terrific, impure and repulsive nature of the Post Vedic Siva."

—*Macdonell's Vedic Mythology P. 76.*

(১৯) The Aryan Rudra-Siva cult borrowed several elements viz, serpent worship, devilry, phallic worship from the Bratyas, Nishadas etc with which the Aryans came into contact. In the VanaParva Shiva appeares as a Kirata. The Kiratas are the Tibeto-Burmans who spread over Eastern India in the land once occupied by the Kolarians, Khasias, Santals and Mundas, and more or less mixed with these people.

Vide P. 115. of Dr. Bhandarkar's Shaivism etc.

(২০) ব্রহ্মপুত্র বদ্বীপের অরণ্যে ও নিম্নভূমিতে সর্পের উপদ্রবে একান্ত অভিভূত নিম্ন শ্রেণীর জন-সাধারণ সর্পদেবীর যে চরিত্র কল্পনা করিয়াছে তাহাতে আমরা তাহাদের মানসিক অবস্থার পরিচয় পাই।

(২১) পুরাণে মনসা দেবী বাসুকীর ভগিনী এবং কশ্যপের মানস-কন্যা।

আমি পদ্মাবতী হই শিবের কুমারী
আমাকে পূজিলে হয় ধনের অধিকারী ॥ (২২)
জন্ম মোর পদ্মবনে(২৩), প্রথম পূজা তোমার স্থানে(২৪)
সাবধানে শুন মালাবতী
অষ্টনাগে গড়িঘট, যেন ধরি থাকেপট
আর নাগের শ্বেত আসন ॥
লাগাইয়া ঘৃতের বাতি, ধূপ দীপ সংহতি
বিস্তর দিবা অগুরু চন্দন ॥
ছাগগণ্ডা আর মেড়া বলিদান মহিষের পাড়া
নৃত্যগীত মঙ্গল জোকার ॥
চাঁপাকলা পদ্মপাত তিল চাউল দিয়া তাত
পূজার বিধান কৈলাম সার ॥
জন্ম মোর শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণাপঞ্চমী দিবসে
যেঁাহ পূজে এই তিথি পাইয়া ॥

(২২) বিষহরি গৈবী ধনের অধিকারী। তাঁহার নাগগণ গুপ্তধন আগুলিয়া রাখে। ভাগ্যবানের প্রতি বিষহরির স্বপ্নাদেশ হইয়া থাকে। ঘালু মালুর ন্যায় বহুব্যক্তি ১ হইতে ৭ কলস ধন পাইয়াছে, এইরূপ জনশ্রুতি বহুল প্রচলিত। ধনলুব্ধ হইলে বংশ নাশ ঘটে, এইরূপও জনশ্রুতি রহিয়াছে।

(২৩) ওঁ পদ্মোদ্ভবা নাগমাতা সুরসা হংসবাহিনী—
অনেন ভক্তিমাত্রেণ তুষ্টা সা বরদা ভব ॥
পদ্মপত্রে স্থিতে দেবী পদ্ম পুষ্প সুশোভনে
পদ্মাক্ষি পদ্মহস্তাচ পদ্মাবতী নমোস্তুতে ॥
—পূজার পুথি।

(২৪) পুরাণে ইন্দ্রদেব, দেবীর পূজা সর্ব্বপ্রথম প্রচলন করেন এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। পাঁচালী পুথিমধ্যে আলুমালুধীবর, সতাই ধুপী, গন্ধবণিক্য চন্দ্রধর, হাসন হুসন প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক পূজা অনুষ্ঠানের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে সময়ের পূর্ব্বাপর্য্য রক্ষিত হয় নাই।

নারায়ণ দেব কয় সুকবি বল্লভ হয়
কহিলাম তোমাকে বুঝাইয়া ॥
আপনি মনুসা দেবী হইলা উঝা গাইন
বছাইর মায়ে বছাইর স্ত্রিয়ে হইলা দেড়ী গাইন
আপনার মঙ্গল দেবী আপনি যে গাইলা
আপনার পূজা দেবী আপনি শিখাইলা ॥

মহাদেব গৃহে আসিয়া পদ্মাবতীকে করণ্ডী মধ্যে রাখিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতে নারদ (২৫) আসিয়া বিবাদের সূত্রপাত করিলেন। গঙ্গা ও দুর্গা মনসাকে সতীন ভাবিয়া বিস্তর প্রহার করিলেন। প্রকৃত ব্যাপার অবগত হইলে পর গঙ্গাদেবী প্রহারে ক্ষান্ত হইলেন; উভয়ের মধ্যে পরস্পরের চরিত্র লইয়া কুৎসিত কলহ হইল, কিন্তু দুর্গার ক্রোধের উপশম হয় না—

মারিতে মারিতে পদ্মার লইলা পরাণ
উল কুল দিয়া পদ্মার চক্ষু কৈলা কাণ।

পদ্মাবতীর বিষ-দৃষ্টিতে দুর্গার চেতনা বিলুপ্ত হইল। ইহা দেখিয়া শিব সহমরণে কৃতসংকল্প হইলেন। পদ্মাবতী পিতাকে প্রবোধ দিলেন—

"সাতাই যাউক তুমার বালাই লইয়া
ভাল কন্যা চাইয়া তুমাকে করাইমু যে বিয়া।"

বহু সাধ্যসাধনার পর পদ্মাবতী সুধা দৃষ্টিতে চাহিবা মাত্র দুর্গাদেবী চেতনা লাভ করিলেন। দুর্গাদেবী অভিমানে পিত্রালয়ে যাইবেন, কিন্তু মহাদেব বুঝাইলেন, যে শীঘ্রই পদ্মাকে পাত্রস্থ করিয়া বিদায় করা যাইবে। নারদ ঘটক নিযুক্ত হইলেন।

সারন্ত্কাই মুনির পুত্রের সহিত পদ্মাবতীর বিবাহ স্থির হইল। বিবাহকালে দেবগণ বিবিধ প্রীতি-উপহার দিয়াছিলেন; কিন্তু তথাপিও পদ্মাবতী চন্দ্রধরকে সেবকরূপে পাইবার জন্য মহাদেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন। ইহা শুনিয়া শিবভক্ত চান্দ হেম-তালহস্তে পদ্মাবতীকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন।

(২৫) সাত্বত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক নারদ দেবর্ষিরূপে কীর্ত্তিত,

মহাদেবের অনুরোধে চান্দ শুভকার্য্যে কোনও বিঘ্ন ঘটাইলেন না।

বিবাহ রাত্রে নাগিনী কন্যা (২৬) হইতে বিপদের সম্ভাবনা জানাইয়া পার্ব্বতী নব জামাতাকে সাবধান করিলেন,—"আজি রাত্রে সংশয় তুমার" সর্পদংশন ভয়ে রাত্রি নিশা কালে নব জামাতা বাসর গৃহ হইতে পলায়ন করিলেন। যাহা হউক পদ্মাবতী মালিনীরূপ ধারণ করিয়া পথিমধ্যে তাঁহার সহিত শেষ সাক্ষাৎ করিয়া আসিলেন।

পদ্মাবতীর সহিত পার্ব্বতীর বিরোধ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। মহাদেব অবশেষে কন্যাকে বনবাসে পাঠাইতে বাধ্য হইলেন। বনবাসে আসিয়া পদ্মা নেতা ধোপানীকে দাসী রূপে প্রাপ্ত হইলেন। ইনি পদ্মাবতীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী।

"নেত মোছা ঘামে জন্ম নেত বাস পড়ে।
ইহা জানি নেতা নাম থুইলা মহেশ্বরে॥"

অষ্টাবক্র মুনির প্রতি কটাক্ষ করায় মুনির সাপে নেতা কনিষ্ঠার দাসী হইলেন।

পদ্মাবতীর মহাত্ম্য প্রচারে নেতা (২৭) তাঁহার প্রধান সহায় হইলেন। ধীরে ২ ধুপী, ডোম, হাড়ি, ধীবর প্রভৃতি সমাজের নিম্নস্তর মধ্যে পদ্মাবতীর মাহাত্ম্য বিস্তৃত হইল।

সতাই ধুপীর গৃহে পদ্মাবতীর পূজা (২৮)উল্লেখ যোগ্য। এই পূজার বিস্তৃত বিবরণ পাঁচালীর প্রথম অংশে প্রদত্ত হইয়াছে। এই উপলক্ষে কবি বলিতেছেন—

পণ্ডিত সমাজে মুই করি নমস্কার।
যাহা কিছু জানি গীত কহি মনসার॥
চতুর্ভুজা ত্রিনয়নী রক্ত বস্ত্রধারী
কর জুড়ে প্রণমহু জয় বিশ্বহরি॥ (২৯)
কহিমু মনোসার গীত সরস পয়ার
সুত্র কহিমু কিছু যে সব সমাচার॥

পক্ষীগর্ভে উৎপন্ন হংস-বাহিনী শঙ্কর কুমারীর সর্ব্বাঙ্গ নাগ আভরণ ভূষিত। তাঁহার মস্তকে পদ্মফুল ও তন্মধ্যে অষ্ট ফণী শোভা পাইতেছে।

পদ্মপত্রে দেবীর আসন প্রস্তুত হইয়াছে—
রচিয়াছে জপসর বিচিত্র মণ্ডব ঘর
ধ্যানেতে বসিলা দেউড়ি।
'আসন পাতিয়া ব্রতি সব মঙ্গল গায়'।

কিন্তু পাঁচালীতে তিনি কলহ সৃষ্টিকারী। এবং দুর্গা সপত্নীসহ কলহ পরায়ণা, সৎ মা!

(২৬) সভ্যতার বিভিন্নস্তরে নাগমাতা সর্পরূপিনী, অর্দ্ধসর্প অর্দ্ধমানবী এবং চতুর্হস্তা মূর্ত্তিতে পরিকল্পিত হইয়াছেন।

শ্রীমৎ পদ্মা কুমারিকাং নাগাম্বিকাং সুসুন্দরী
দেবস্তার্দ্ধ শারীরিনীং বিষধরঃ সার্দ্ধব পুর্ব্বি ভূতি॥
"পূজিতাসি ময়াদেবি নমস্তস্ত সর্পরূপিণী"॥ ইত্যাদি
—পুরোহিতদিগের পূজার পুথি।

For Pictures of this type in Greece see 259 page of Harrison's Prolegomena to the study of Greek Religion.

(২৭) ধুবরীর সহিত নেতার এবং উষার সহিত তেজপুরের সম্পর্ক সম্বন্ধে বহু আখ্যায়িক প্রচলিত আছে।

(২৮) হালুয়া বছাইর গৃহে প্রথম পূজার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এখানে সতাই ধুপীর বাড়ীর পূজার বর্ণনা। কোন ২ পুথীতে চন্দ্রধরের পূজার পূর্ব্বেই হাসনের পূজা বর্ণিত হইয়াছে। বিভিন্ন যুগে রচিত পাঁচালী মধ্যে সমন্বয়ের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই।

"হুকার প্রতি সবে দেয় ঘনে ঘনে"।
'নাচে গায়ে গাইনে করিয়া নানাগতি'।
এইরূপ ধুম ধামের সহিত মঙ্গল গীতি সমাপ্ত হইল।
এক্ষণে ঘট পূজা—
খই কলা দুগ্ধ আর ধুতুরার আগ
তার গন্ধে আনন্দিতা হইল অষ্টনাগ।
হংস ছাগ বলি হইল মনুষার কাছে
পূজা পাইয়া মনুসায় খল খলি হাসে॥

অতঃপর পদ্মাবতী আশীর্ব্বাদ করিলেন—
অরুগী হইয়া পুত্র জিয় চিরকাল
মর ব্রত করিলে খণ্ডিবে মহাভার॥

চান্দেরকথা—নিম্নস্তরের বহুলোক পদ্মাবতীর প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছে। চম্পকের অধিপতি গন্ধবণিক্যকুলের বণিক, কুটিশ্বরের পুত্র চন্দ্রধর, ভবানীর একনিষ্ঠ সাধক। স্বধর্ম্মে নিধনং 'শ্রেয়ঃ" তিনি এই মূল মন্ত্রে আস্থাবান ছিলেন। নাগোপাসকগণের প্রতি তাঁহার বিজাতীয় বিদ্বেষ ছিল। চন্দ্রধর পূজা করিলেই পদ্মাবতীর পূজা বিস্তার লাভ করিতে পারে; কিন্তু চন্দ্রধর কোন ক্রমেই কাণা দেবতার পূজা করিবেন না। তিনি মহাদেবের তপস্যা করিয়া 'অকালে মৃত্যু হইবে না' এই বর ও মহাজ্ঞান ব্রহ্মমন্ত্র এবং পার্ব্বতী হইতে হেমতালযষ্টি লাভ করিয়াছিলেন। একদা চান্দ বাণিজ্য উপলক্ষে রত্নাবতী গিয়াছেন, অমনি পদ্মাবতী প্রাণভয়ে সেইস্থান হইতে পলায়ন করিয়া চম্পকে চলিলেন। পথিমধ্যে জালু মালু নামক দুই দরিদ্র ধীবরকে কৃপা করিলেন। তাহাদের জালে সুবর্ণের পঞ্চঘট উঠিল। পদ্মাবতী ইহাদিগকে নিজ ঘটপূজা শিক্ষা দিয়া বলিলেন—
যত্ন করি ঘট নেও আপনার স্থানে
মনসা আমার নাম পূজিও সাবধানে।

চান্দের স্ত্রী সুনকা ইহাদিগের নিকট হইতে পূজাবিধি শিক্ষা করিয়া পদ্মাবতীর ঘট স্থাপন পূর্ব্বক রাজগৃহে পূজা আরম্ভ করিলেন। এদিকে নাগমাতার প্রতিপত্তি দর্শনে চণ্ডী বিচলিত হইয়া স্বপ্নে চান্দকে সাবধান করিলেন—
যজ্ঞ হোম ধিয়ানে পূজ নানা বিধানে
তবে তোমার হইবে কুশল।
শুন চম্পকের পতি যদি পূজ পদ্মাবতী
ধনে বংশে হারাইবা সকল॥

চান্দ গৃহে ফিরিয়া চণ্ডীপ্রদত্ত হেমতালের যষ্টিদ্বারা—
ঘটের উপরে মারে দুহাতিয়া বাড়ি।
ভয় পাইয়া পদ্মাবতী উঠে রথ ভরে।
হেমতাল মেলিয়া হানে পদ্মার উপরে॥
"পদ্মা পালাইয়া রহিলা অরণ্য ভিতরে।"

অতঃপর চান্দ পূজাস্থানের মৃত্তিকা কাটিয়া জলে ফেলিলেন। প্রতি সর্প বধ করিলে পঞ্চরতি সোনা পুরস্কার দিবার আদেশকরিলেন। এবং মনসা পূজা নিষেধ করিয়া চারি দিকে লোক পাঠাইলেন—
যেইপূজে বিষহরি তাকে লয় দণ্ডকরি
ঘর ভাঙ্গি কালায় তাহার।

শঙ্করের প্রিয়পুত্রী পদ্মা চান্দকে বধ করিতে মনস্থ করিয়া পিতার শরণাপন্ন হইলেন। মহাদেব চান্দকে বর দিয়াছিলেন; সুতরাং কন্যার মন রাখিবার জন্য চান্দের ছয় পুত্র বিনাশ করিতে পদ্মাবতীকে অনুমতি দিলেন। চান্দের মহাজ্ঞান শক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য নেতার পরামর্শে পদ্মার নাগগণ মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া চান্দের রমণীয় বাগানের বৃক্ষ সমূহ কাটিয়া ফেলিল। কিন্তু —

(২৯) ওঁ বিষহরিং [illegible]বর্ণাং চতুর্ভুজাং ত্রিনেত্রাং নানালঙ্কার ভূষিতাং [illegible] পয়োধরাং কঞ্চুকাবদ্ধগাত্রাং হংসারূঢ়াং [illegible]ক্ষকমুকুটাং কুলির কর্কোটক কর্ণাভরণাং শঙ্খপালকম্বলগদাং পদ্মহারাং প্রসন্নবদনামভয়বরদাং।—পূজাবিধি।

চান্দেরে দেখিয়া নাগের উড়িল পরাণ।
পলাইয়া যায় নাগ নাহি পরিত্রাণ॥

মহাজ্ঞান সাহায্যে কাটা গাছ জোড়া লাগিল। নেতা পরামর্শ দিলেন—'মহাজ্ঞান কহিব চান্দে পীড়িলে মদন'। বাদ সাধিবার জন্য পদ্মাবতী সতীত্বপণ করিলেন। সনকার ভগ্নি কনকার রূপ ধারণ করিয়া নিজ উদ্দেশ্য সাধন মানসে চান্দের গৃহে উপস্থিত হইলেন।

কামভাবে আকুল হইল সদাগর
কহিলেক মহাজ্ঞান রাজা চন্দ্রধর॥

এখন ধন্বন্তরী বাদ সাধিবার পক্ষে প্রতিকূল রহিলেন। (৩০) নেতা পরামর্শ দিলেন—

যদি থাকে এই উঝা না হইব তুমার পূজা।
না পারিবায় বাদ সাধিবার॥

ধন্বন্তরী, তক্ষকের পরামর্শে পরীক্ষিৎকে রক্ষা না করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন; সুতরাং নাগগণ তাঁহার বাধ্য। মহাদেবের জটাস্থিত উদয়কালী তাঁহাকে দংশন করিতে পারে; কারণ ভৃগুমুনি ধন্বন্তরীকে এইরূপ অভিশাপ করিয়াছিলেন। পদ্মাবতী মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। বাদ সাধিয়া ধন্বন্তরীকে পুনঃ জীবিত করিতে হইবে, এই সর্ত্তে মহাদেব কন্যার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। ধন্বন্তরী সর্পদংশনে অচেতন হইলে পর তাঁহার শিষ্যগণ নির্বিষ বিশল্যকরণী ঔষধ সংগ্রহের জন্য ছুটিল।

নেতা বলে পদ্মা ঔষধ ছলে হর
তবে সে ধন্বন্তরী বধিবারে পার।'

ধন্বন্তরীর মৃত্যু হইলে পদ্মার নাগগণ নানারূপ ধরিয়া চান্দের ছয় পুত্র নিহত করিল। চান্দ এই বিপদেও অবিচলিত। চান্দ নিম্নশ্রেণীমধ্যে পূজিত অজ্ঞাতকুলশীল কাণা দেবতাকে পূজা করিবেন না। তাই বলিলেন—

ঢোল দগরা আনি করাইব বাদ্যধ্বনি।
শুনিয়া যেন পুরি মরে কাণী॥

হাসনের মনসা পূজা,—ভাবিয়া ভাবিয়া পদ্মাবতী আহারনিদ্রা ত্যাগ করিলেন। এমন সময় একদিন তিনি কুতুবসাহার পুত্র হাসন রাজার গোষ্ঠে বৃদ্ধব্রাহ্মণীবেশে রাখালদিগের নিকট দুগ্ধ ভিক্ষা করিলেন।

রাখালেরা আপত্তি করিবামাত্র গাভী সকল ঢলিয়া পড়িল। পুনঃ বহু স্তুতি করায় পদ্মা উহাদিগকে জীবিত করিয়া দিলেন। রাজসৈন্যগণ একে একে ঢলিয়া পড়িল।

পদ্মাবতী রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া পূজা দাবী করিলেন। নাগভয়ে ভীত রাজা সৈন্যদিগকে জীবিত করিয়া দিলে পর পদ্মাবতীর পূজা করিবেন এইরূপ অঙ্গীকার করিলেন।

তবে হাসন রাজা কুন কর্ম্ম করিলা।
পদ্মার মাণ্ডব ঘর আপনে সাজাইলা॥
হংস ডিম্ব (৩১) পদ্মর দিলা আর যে কদলী।
মেষ মহিষ দিলা লক্ষ লক্ষ বলি॥
গণ্ডা হাস আনি দিলা হরিণ ছাগল।
মেষ শুকর আদি দিলেক সকল॥

চান্দের বাণিজ্য যাত্রা—চান্দের পিতা কুটীশ্বর ১৩খানা ডিঙ্গা রাখিয়া গিয়াছিলেন। চান্দ মধুকর নামক আর একখানা ডিঙ্গা গড়াইতে মনস্থ করিলেন। মনপবন কাষ্ঠ সংগ্রহ কালে সর্পের ভীষণ উৎপাত হইয়াছিল, কিন্তু চান্দের হস্তে হেমতাল দেখিয়া উহারা ভয়ে পলায়ন করে। ডিঙ্গা লইয়া চান্দ ১২ বৎসরের জন্য বাণিজ্যে যাত্রা করিবেন। সনকা এবং উজানীর কমলার গর্ভাশঙ্কার জন্য পদ্মাবতী মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। মহাদেব উষা এবং

---

(৩০) কোন কোন পুথিতে সনৎকুমারের উল্লেখ আছে। c. f. The Greek healing god Aesculapius and the Aswini Kumars.

(৩১) অদ্যাপি প্রাচীন প্রাগ্ জ্যোতিষরাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন স্থানে মনসা পূজায় ছাগ, শুকর, হংসডিম্ব, হংস এবং পারাবতের ব্যবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অনিরুদ্ধকে বিপুলা ও লক্ষীন্দর রূপে জন্মগ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। পাছে বাণিজ্য হইতে আসিয়া চন্দ্রধর নিজপুত্র অস্বীকার করেন, এই ভয়ে নেতার পরামর্শে পদ্মা চান্দের নিকট হইতে গর্ভপত্র লিখাইয়া রাখিতে সুন কাকে উপদেশ দিলেন।

পথিমধ্যে চান্দ যখনই ভবানীর পূজা করিতেন, অমনি থাল হস্তে পদ্মাবতী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতেন—

বাম হস্তে দেও আমরে একমুষ্টি ফুল।
সেই আমার প্রতি হইব একলক্ষের মূল॥
আমা কেন নাহিপূজ বাড়ুয়া দেহুরী।
মারিয়াছি ছয় পুত্র জিয়াইতে পারি॥
নাটুয়া হইয়া পদ্মা করে নানা রঙ্গ।
তথাপি না হইল চান্দের ধ্যান ভঙ্গ॥

কিন্তু চান্দ বলিতেন—

দূর দূর করিয়া চান্দে বলিলা উত্তর
তোমায় দেখিয়া পূজিতে না পারি মহেশ্বর॥
যাবৎ না মারি আমি হেমতালের বাড়ি
তরিত্রে অন্তর হও পূজার ভূমি ছাড়ি॥

অথবা বলিতেন—

কানা দেবতাকে না পূজিমু কোনকাল।

চান্দ লঙ্কায় বাণিজ্য করিয়া ১২ বৎসর পরে ধনরত্ন সহ গৃহে আসিতেছেন। কালীদহ সাগরে চান্দের ডিঙ্গাগুলি ডুবিবার মত জল ছিলনা। গঙ্গাদেবী পদ্মার হিতাকাঙ্ক্ষী; সুতরাং তিনি তথায় সকল নদনদী মিলিত করিয়া দিলেন।

জাহ্নবী যে ভাগিরথী ত্রিপুণীর জল।
মন্দা তিমির আইলা প্রভা সরোবর॥
তৈয়া নদী পদ্মাবতী গুঞ্জরে ভৈরব।
লুভা বরবক্র আইলা যত নদী সব॥
করতোয়া সুরেশ্বরী অধিক নির্মল।
বৃদ্ধভৈরব আইলা যত নদী সব॥
তাহান সহিত আইলা যতনদা নদী। (৩২)

ভক্তের দুঃখে চণ্ডীর চক্ষে জলস্রোত বহিল। তিনি স্থির থাকিতে না পারিয়া ভক্তের সাহায্যে আসিলেন। বাদে পরাভবের সম্ভাবনায় পদ্মা মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। মহাদেব কন্যার মান রাখিতেই ব্যস্ত। ভক্তের ক্রন্দনে তিনি নিশ্চেষ্ট। বাণ, রাবণ, কংশ, সকলকেই তিনি বৈরাহস্তে সমর্পন করেন। (৩৩) তিনি চণ্ডীকে ফিরাইয়া নিলেন। চণ্ডী যাইবার সময় আক্ষেপ করিয়া বলিলেন—

তবে দেবী বলিলেক দেব মহেশ্বর।
ডুবিতে চান্দের ডিঙ্গা প্রাণে পুরে মর॥
তোমার সেবা মহেশর করে যেইজন।
সপুত্রবান্ধবে তার অবশ্য মরণ
সর্বশেষ সেবা কইল বাণিয়ার পুতে
তারে সমর্পিলা বৈরী জনার হাতে॥

একে একে চান্দের ডিঙ্গাগুলি জলমগ্ন হইল। 'ব্রহ্মবধ হইলে নাহি পরিত্রাণ'; সুতরাং চান্দের দুই পুরোহিত শ্রীধর এবং শিরোমণি রাধাইকে রক্ষা করিতে হইবে। 'বাদীজন মরিলে বাদের স্বাদ নাই'; সুতরাং চান্দকেও রক্ষা করিতে হইবে। চান্দের নিকট একটি পদ্মপত্র রাখা হইল; কিন্তু তিনি পদ্মার কৃপায় প্রাণরক্ষা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া পদ্মপত্রে থুথু নিক্ষেপ করিলেন। শ্রীধর পদ্মাবতীকে পূজা করিবার জন্য অনুরোধ করিলে চান্দ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—

---

(৩২) ষষ্টিবরের এই বর্ণনা হইতে তাহার বাসস্থান বিক্রমপুরে ছিল, এইরূপ মনে হইবে না।

(৩৩) Ahi Budhna in one verse of the Rig Veda is besought not to give his worshippers to injury, subsequently it was applied as a term to Rudra and as an epithet to Shiva. P. 73 Macdonell's Vedic Mythology.

চান্দের হইল কষ্ট কি বলিলে নষ্টের নষ্ট
তুমার বাক্যে পূজিতাম কাণী।

তীরে উঠিবার পর চান্দ ধনবতীর কুৎসিৎ কন্যা বিবাহ করিতে বাধ্য হইলেন; কিন্তু উপার্জ্জনে অক্ষম নব জামাতারও দীর্ঘকাল শ্বশুরালয়ে আহার জোটেনা; সুতরাং তিনি কাঠুরিয়ার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। পদ্মাবতী কপটমায়ায় কাষ্ঠ নাগ দ্বারা পূর্ণ করিলেন। "জামাই না হয় বেটা গাড়ুড়িয়া উঝা" বলিয়া প্রহার করিয়া তাহারা চান্দকে দূর করিয়া দিল। নাপিত সাজিয়া চান্দকে অর্দ্ধেক ক্ষৌরী করিয়া পদ্মা পলায়ন করিলেন। ডুখলা নগরে (৩৪) মনসা মুণ্ডন বাদ্য শুনিতে যাইয়া চান্দ প্রহার লাভ করিলেন। অবশেষে নানা দুর্গতির পর ভবাণীর কৃপায় তিনি গৃহে চলিলেন; কিন্তু পদ্মা গণকের বেশ ধরিয়া পূর্ব্বেই সংবাদ দিলেন যে চান্দের বেশ ধরিয়া ভূত আসিবে; সুতরাং গৃহেও প্রহৃত হইলেন।

চান্দ লক্ষ্মীন্দরের বিবাহে যাত্রা করিতেছেন, এমন সময় পদ্মা যুগিনী বেশে সম্মুখে আসিয়া অযাত্রা করেন। তাড়াইয়া দিলে পর অভিশাপ করেন "কালরাত্রি নাগে খাউক লোহার বাসর"। বিপুলা স্নান করিতে গিয়াছেন, এমন সময় পায়ের জল গায়ে লাগিয়াছে, এই ছলে 'বিবাহ রাত্রে বিধবা হইবে' এইরূপ অভিশাপ করিলেন। লক্ষ্মীন্দরের বিবাহ কালে পদ্মার আদেশে নাগগণ তাহার মাথার উপর ফণা বিস্তার করে এবং ইহাতে লক্ষ্মীন্দর অচেতন হইয়া পড়ে। বিপুলা স্ত্রীবধের ভয় দেখাইলে, পদ্মা বাধ্য হইয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করেন। চান্দ লৌহ মাঞ্জস নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পদ্মাবতী মাঞ্জসে ছিদ্র রাখিতে কামারকে বাধ্য করেন। কাকলাস, ময়ুর এবং সর্পের বাদিয়া মাঞ্জস রক্ষায় নিযুক্ত ছিল, কিন্তু হেমতালযষ্ঠির ভয়েই নাগগণ অধীর। পদ্মাবতী চিন্তান্বিতা হইলেন—

নেতায় স্থানেতে কন্যা কহিল বহুৎ
দংশিতে নারিমু আমি বাণি[illegible]
খণ্ডাইতে না পারি গালি লঘু[illegible] কাণি
হারিলাম চান্দের হাতে মনে অনুমানি॥
প্রবোধ করিলা নেতা ধুপার কুমারী
কান্দন করহ ক্ষেমা জয় বিষহরি॥
নেতা বলে পদ্মাবতী কান্দন ক্ষেমা কর
নাগ পাঠাইয়া দেও কালীর গোচর॥

কালীনাগিনী লক্ষ্মীন্দরকে দংশন করিয়া ফিরিবার সময় লেজ মাঞ্জসে থাকিয়া যায়। পূর্ব্ব জন্মের কথা এবং বিপুলারূপে জন্ম লইবার কথা তাহার মনে হইল—

চান্দ সাধু মনসারে বিবাদ খণ্ডাইবারে
তেকারণে পৃথিবীতে আসি।

বিপুলা দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন—সমুদ্রে ভাসিবেন, নিজ স্বামী জিয়াইবেন। পরীক্ষা রাখিয়া গেলেন। সর্প দংশনে মৃত ব্যক্তির শরীর কলার 'ভেরুয়ায়' নদী-জলে ভাসাইয়া দিবার প্রথা আছে। বিপুলা স্বামীর সহিত কলার ভেরুয়াতে জলে ভাসিলেন। নানা দুর্গতির পর পথিমধ্যে দৈববাণী হইল—

**ধন জন পরিবার স্বামী কর উদ্ধার
ব্রত কর মনোষা পঞ্চমী।**

তিনি অপ্সরাগণের নিকট ব্রতকথা সাঙ্গ শ্রবণ করিলেন। অতঃপর নেতার ঘাটে উপনীতা হইলেন। নেতার সহিত প্রীতির মাসী সম্বন্ধ স্থাপিত করিয়া

ডুখলা—(৩৪) শব্দকার' ঢুলী প্রভৃতি নামে পরিচিত অনুন্নত জাতি। শ্রাবণের সংক্রান্তি হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত ইহারা নিজদের মধ্যেই যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়া বিষহরী পূজা করিয়া থাকে। ইহারা একান্ত অলস, নির্ব্বোধ এবং কলহপ্রিয়। ইহাদের মধ্যে অনেকে শীতকালে চালের ছন জ্বালায়, উচ্ছিষ্ট অন্ন ধৌত করিয়া রন্ধন করে এবং ইচ্ছামত স্বামী স্ত্রী পরিবর্ত্তন করে।

নেতার বস্ত্র ধৌত করিতে রহিলেন। মহাদেব বস্ত্র দেখিয়া প্রীত হইলেন। নেতার 'ভগিনী ঝিউ' অবগত হইয়া তাহাকে দেখিতে চাহিলেন। বিপুলার নৃত্য দেখিবার জন্য দেবগণ মিলিত হইলেন। আসিলেন না পদ্মাবতী।—বলিয়া পাঠাইলেন চন্দ্রধর হেমতালের আঘাত করায় জ্বর হইয়াছে; এখনও সারে নাই।

বিপুলার নৃত্যে মহাদেব তুষ্ট হইয়া বর প্রদান করিতে চাহিলেন। বিপুলা বিষহরির কীর্ত্তিকাহিনী বর্ণনা করিয়া স্বামী দান চাহিলেন। পদ্মাবতী সকল কথা অস্বীকার করায়, বিপুলা কালীনাগের লেজ সভার সমক্ষে উপস্থিত করিলেন। পদ্মাবতী কালীকে নিজের আসনের নীচে লুকাইয়া রাখিয়া বলিলেন ইহা কাকলাসের লেজ; কন্যা মিথ্যা কথা বলিতেছে। শাস্ত্রে 'শাঙ্গা' বিবাহের বিধান আছে—'পুনরপি বিহা আছে শাস্ত্রের বিহিত'; পছন্দমত স্বামী গ্রহণ করুক। ক্রুদ্ধ হইয়া বিপুলা বলিলেন—

জন্মদাতা পিতাকে ভণ্ডিলা বাক্য ছলে
তুমার সমান কপটী নাই ধরাতলে।

এবং আসনের নিম্নভাগ হইতে লাঙ্গুলহীন কালীনাগিনীকে টানিয়া বাহির করিলেন।

মহাদেব পদ্মাকে বন্দী করিবার জন্য নন্দিকে আদেশ দিলেন; কিন্তু ব্রহ্মা বলিলেন—

বিনয় ভাবে কথা কও মনোসার ঠাঁই
উপায় করি জিয়াউকা বণিক্য লখাই॥

পদ্মাবতী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন;—

(রাগ ভাটিয়াল)

আমি না জিয়াইব চান্দের সুন্দর পো
ও পাত্র নেতাই বঙ্গ-সুন্দরী দেশে যাউকা॥ ধু।
লঙ্কার রাজা দশানন তারে মারিলা কমল-লোচন
মন্দধরী কান্দিল বিস্তর তারে না জিয়াইলা রঘুবর॥
জ্যৈষ্ঠমাসে জালুমালু ঘরে সুনকায়ে পূজিল মরে
চান্দ ঘট ভাঙ্গিয়া কৈল চুর গালি পাড়ে নিদয়া নিঠুর।
আষাঢ় মাসেতে পঞ্চমী যে তিথি লোকে পূজে সানন্দিত মতি
ঘট ভাঙ্গিয়া কৈল চুর হইল কেন এমত নিঠুর॥
শ্রাবণে গাঙ্গে নওয়া পাণি আমার নাগে খেলে ভাণী আর উজানি
চান্দের করিলেক কোম অপচয় আমার নাগ মারিয়া কৈল ক্ষয়॥
ভাদ্রমাসেরদিন ত্রিদেশের পূজা সর্ব্বদেব পূজে চান্দ রাজা
বামহাতে না দেয় পুষ্পপানি গালি পাড়ে লগুজাতিকাণি॥
আশ্বিন মাসে গেলাম চান্দের বাড়ী মোরে পূজে সুনকানাগরী
হেমতাল দিয়া মরে মারে কাকালি ভাঙ্গিল সদাগরে॥
কার্ত্তিকমাসে লইলাম তার দাড়ি হুঙ্কারে পুরিলাম বাগানবাড়ী
তাহাতে জুড়িল মন্ত্রবান জিয়াইল পোড়া বাগান॥
অগ্রহায়ণমাসে অনুমান করি নৃত্যসাজে গেলাম তারবাড়ী
আসিয়া না চাইল আমার মুখ নাচিতে পাইলাম বহু দুখ॥
পৌষমাসে পিতৃআজ্ঞা পাইলু ক্রোধে চান্দের ছয় পুত্রখাইলু
আর করিল কুল কান্তার গালি পাড়ে পিতৃ ভ্রাতার॥
মাঘমাসে গেলাম চান্দের বাড়ী আমায় পূজে সুনকানাগরী
বেওয়ানী ডাকিয়া ধরে হাতে মর কৈন্যাবিয়া কৈল চান্দের কুন পুতে॥

ফাল্গুনমাসে ত্রিদেশের পূজা সর্ব্বত্র পূজিলা চান্দ রাজা
বামহস্তে না দেয় পুষ্পপানি গালি পাড়ে বেঙ্গ-খাউরা কাণি
চৈত্রমাসে হৈল উত্তম বাও সাগরে ডুবাইলাম চৌদ্দনাও
দয়ায়ে না মারিলাম তাতে কুবুলা ফালাইল পদ্মপাতে॥
বৈশাখমাসে লখাইয়ে বিয়ে করে আমায় গালি পারে সদাগরে

শ্রীষষ্ঠিবর কবিভূণে দণ্ডবৎ পেঁাম্মার চরণে॥

দেবগণের অনুরোধে বিপুলা স্বীকৃত হইলেন—

বাদ ছাড়ি ভক্তিয়ে পূজিবে সদাগর
হইবেক তোমার পূজা প্রতি ঘরে ঘর॥

চান্দের পুত্রগণ এবং ধনরত্ন সহ ১৪ ডিঙ্গা ফিরাইয়া

দেওয়া হইল। বিপুলার নিমন্ত্রণে মধুকর ডিঙ্গায় সকল দেবগণ আসিলেন। প্রতিজ্ঞা পূরণ না হইলে বিপুলা গৃহে যাইবেন না, তাই ছদ্মবশে ডুমুনি সাজিয়া বিপুলা চম্পক নগরে গেলেন। কিন্তু চান্দ তাহাকে লখুকাণির চর বলিয়া সন্দেহ করায়, অবিলম্বে পলায়ন পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার পর, দুলাই কাণ্ডারী চান্দের নিকট প্রেরিত হইল। বৃদ্ধ মাঝিকে দেখিয়া চান্দ আশ্চর্য্য হইলেন। তাহার নিকট একে একে সকল কথা শুনিয়া চান্দ পুত্রদর্শনের জন্য অধীর হইয়া পড়িলেন। চান্দ সমারোহে মধুকরে সমবেত ত্রিদেশের দেবগণের পূজা করিলেন এবং বাম হস্তে পদ্মাবতীকে একটী পুষ্প নিবেদন করিলেন। কিন্তু তথাপিও পদ্মার ভয় দুর হয় না—"মনোসায়ে বলে ওগো পাত্র নেতাই। চান্দেরে দেখিয়া আমি মনে ভয় পাই"॥

বঙ্গীয় পাঁচালী সাহিত্য হইতে পদ্মাবতী চরিত্র সংক্ষেপে সুধীবর্গের নিকট উপস্থিত করিলাম। বঙ্গীয় নিম্নশ্রেণীর জন সাধারণের সামাজিক অবস্থার পরিমাপ করিতে পাঁচালীর এই দেবীচরিত্র ধীরচিত্তে বিচার করিতে হইবে। বিভিন্ন জাতির বা সমাজের সভ্যতা বা অসভ্যতার তারতম্যানুসারেই দেবদেবীচরিত্র পরিকল্পিত হইয়া থাকে। মনসা, চামুণ্ডা, শনি প্রভৃতি দেবদেবী কি আমাদের জাতীয় চরিত্র এবং ধর্ম্মভাবের ক্রমবিকাশ বুঝাইতে সাহায্য করিবে না? এই সম্পর্কে বুদ্ধদেবের সমসাময়িক জনৈক গ্রীক কবির উক্তি উল্লেখ যোগ্য। তিনি বলিয়াছিলেন—

One God there is, greatest of gods and mortals;
Not like to man is he in mind or body.
All of him sees, all of him thinks and hearkens…
But mortal man made God in his image
Like to himself in vesture, voice and body.
Had they but hands, methinks oxen and lions
And horses would have made them gods like fashioned,
Horse-gods for horses, oxen-gods for oxen.
—Xenophanes (from Harrison's Prolegmena).
Frgs 1, 2, 5, 6

পৌরাণিক মনসা চরিত্র।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে মনসাদেবীর কাহিনী সবিস্তরে বর্ণিত হইয়াছে। অপর কোনও পুরাণে মনসাদেবী সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ অষ্টাদশপুরাণ মধ্যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক এবং মহাভারতের বহু পরবর্ত্তী যুগের রচিত গ্রন্থ। ইহার মনসাকাহিনীও মহাভারতের জরুৎকারুকাহিনীর ক্রমবিকাশ রূপে বিবেচিত হইবে সন্দেহ নাই; সুতরাং মহাভারতে বর্ণিত জরুৎকারু কাহিনীর মর্ম্ম প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন। আস্তিকপর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে দারুণ তপস্যায় শরীর জরাগ্রস্তকারী অকৃতদার জরৎকারু মুনি, পূর্ব্বপুরুষগণের হিত সাধন মানসে স্বনাম্নী কন্যা স্বেচ্ছায় ভিক্ষা স্বরূপ প্রাপ্ত হইলে, দার পরিগ্রহ করিতে স্বীকৃত হওয়ায়, মাতৃশাপবিমোচনের নিমিত্ত নাগরাজ বাসুকী তাঁহার নিকট নিজ ভগিনী জরৎকারুকে সম্প্রদান করেন। জরৎকারুমুনি আস্তিক নামক পুত্র উৎপাদন পূর্ব্বক ত্রিবিধ ঋণ মুক্ত হইয়া স্বর্গে পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত অবস্থান করেন। পুত্রোৎপাদনের পর নাগভগিনী জরৎকারু ভ্রাতৃগৃহে বাস করিয়াছিলেন।

আর্য্যগণ প্রথমতঃ নাগদ্বেষী থাকিলেও পাণ্ডবদিগের নাগ কন্যা বিবাহ কালে এই বিদ্বেষ ভাবের অপেক্ষাকৃত লাঘব ঘটে। যাহাহউক অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিতের সময়ে নাগদিগের সহিত পুনরায় বিরোধ ঘটে। তক্ষশীলার নাগরাজ তক্ষক কর্ত্তৃক পরীক্ষিৎ নিহত হইলে,

পরীক্ষিতের পুত্র জন্মেজয় বৈদিকযজ্ঞের অগ্নি সাহায্যে নাগদিগের প্রায় ধ্বংস সাধন করিলেন। তক্ষক ইন্দ্রের শরণাপন্ন হওয়ায়, যজ্ঞের অগ্নি ইন্দ্রসহ তক্ষককে ভস্ম করিতে উদ্যত হইল। দেবরাজ জরৎকারুর শরণাপন্ন হইলেন। বাসুকী এবং ইন্দ্রের প্রার্থনায় জরৎকারু নিজপুত্র আস্তিককে জ্ঞাতিবর্গ এবং দেবরাজ ইন্দ্রের সাহায্য করিবার জন্য আদেশ প্রদান করেন। ব্রাহ্মণ আস্তিকের কৌশলে যজ্ঞ ক্ষান্ত হইল এবং অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু হইতে সকলেই অব্যাহতি লাভ করিল। বৈদিক দেবতা ইন্দ্র কর্তৃক এই উপলক্ষে সর্ব্বপ্রথম নাগদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়। মহাভারতে মনসা নাম নাই এবং জরৎকারুর সহিত মহাদেব অথবা শ্রীকৃষ্ণ সংশ্লিষ্ট কোন অখ্যায়িকা বর্ণিত হয় নাই। এক্ষণে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের সারাংশ আপনাদের নিকট উপস্থিত করিব।

ব্রহ্ম বৈবর্ত্তপুরাণের প্রকৃতি খণ্ডে বর্ণিত বিবরণের মর্ম্ম—

জন্মকারণ—পুরা নাগভয়ক্রান্তা বভুবর্মানবা ভুবি
যান্ যান্ খাদন্তি নাগাশ্চ তেন জীবন্তি নারদ
মন্ত্রাংশ্চ সসৃজে ভীতঃ কশ্যপো ব্রহ্মণার্থিতঃ
বেদবীজানুসারেন চোপদেশেন ব্রহ্মণঃ
মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃদেবীন্তাং মনসাং সসৃজে ততঃ
তপসা মনসা তেন বভুব মনসা চ সা॥

প্রণাম মন্ত্র—আস্তিকস্য মুনের্মাতা ভগিনী বাসুকেস্তথা
জরৎকারু মুনেঃ পত্নী মনসা দেবী নমোঽস্তুতে॥

দ্বাদশ নাম—জরৎকারু জগদ্গৌরী মনসা সিদ্ধযোগিনী
বৈষ্ণবী নাগভগিনী শৈবী নাগেশ্বরী তথা
জগৎকারুপ্রিয়াস্তিকমাতা বিষহরীতি চ
মহাজ্ঞান যুতা চৈব সা দেবী বিশ্বপূজিতা
দ্বাদশৈতানি নামানি পূজা কালেচ য পঠেৎ
তস্য নাগভয়ং নাস্তি তস্য বংশোদ্ভবস্য চ॥

নামের ব্যুৎপত্তি—
শ্রূয়তাং মনসাখ্যানং যৎশ্রুতং ধর্ম্ম বক্তৃতঃ
কন্যা সা চ ভগবতী কশ্যপস্য চ মানসী॥
তেনেয়ং মনসা দেবী মনসা যা চ দীব্যতি
মনসা ধ্যায়তে যা বা পরমাত্মানমীশ্বরী॥
তেন সা মনসা দেবী যোগেন তেন দীব্যতি
আত্মারামা চ সা দেবী বৈষ্ণবী সিদ্ধযোগিনী॥
ত্রিযুগঞ্চ তপস্তপ্ত্বা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ
জরৎকারুশরীরঞ্চ দৃষ্ট্বা যৎক্ষণমীশ্বরঃ
গোপীপতির্ণাম চক্রে জরৎকারুরীত প্রভুঃ
বাঞ্ছিতঞ্চ দদৌ তস্মৈ কৃপায় চ কৃপানিধিঃ
পূজাঞ্চ কারয়ামাস চকার চ পুনঃ পুনঃ
স্বর্গেচ নাগলোকেচ পৃথিব্যাং ব্রহ্মলোকতঃ
ভৃশং জগৎসু গৌরী সা সুন্দরী চ মনোহরা
জগদ্গৌরীতি বিখ্যাতা তেন সা পূজিতা সতী
শিবশিষ্যা চ সা দেবী তেন শৈবীতি কীর্ত্তিতা
বিষ্ণুভক্তাতীব সশ্বদ্বৈষ্ণবী তেন নারদ
নাগানাং প্রাণরক্ষিত্রী যজ্ঞে জন্মেজয়স্য চ
নাগেশ্বরীতি বিখ্যাতা সা নাগ ভগিনী চ সা
বিষং সংহর্ত্তুমীশা সা তেন বিষহরীতি সা
সিদ্ধযোগং হরাৎ প্রাপ তে নাতিসিদ্ধযোগিনী
মহাজ্ঞানঞ্চ গোপ্যঞ্চ মৃত সঞ্জীবনীং পরাম
মহাজ্ঞানযুতাং তাঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ
আস্তিকস্য মুনীন্দ্রস্য মাতা সা চ তপস্বিনঃ
আস্তিকমাতা বিখ্যাতা জগৎসু সুপ্রতিষ্ঠিতা॥
প্রিয়ামুনের্জরৎকারোর্মুনীন্দ্রস্য মহাত্মনঃ
যোগিনো বিশ্বপূজ্যস্য জরৎকারু প্রিয়াততঃ॥

ধ্যান—শ্বেত চম্পকবর্ণাভাং রত্নভূষণ ভূষিতাম্
বহ্নিশুদ্ধাং শুকাধানাং নাগ যজ্ঞোপবীতিনীম্
মহাজ্ঞান যুতাঞ্চৈব প্রবরাং জ্ঞানিনাং সতাম্
সিদ্ধাধিষ্ঠাতৃ দেবীঞ্চ সিদ্ধাং সিদ্ধিপ্রদাং ভজে॥

পূজার সময়—
ব্রহ্মন্নাষাঢ়সংক্রান্ত্যাং স্নুহীশাখা সুযত্নতঃ
আবাহ্য দেবীমীশান্তাং পূজয়েদ্যোহি ভক্তিতঃ॥
পঞ্চম্যাং মনসাখ্যায়াং দেব্যৈ দদ্যাচ্চ যো বলিম্
ধনবান্ পুত্রবাংশ্চৈব কীর্ত্তিমাংশ্চ ভবেদ্ ধ্রুবং॥

বাল্যজীবনী—দীর্ঘকাল মনসা মহাদেবের তপস্যা করেন। মহাদেবের নিকট সামবেদ অধ্যয়ন পূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে কৃষ্ণমন্ত্র এবং মৃত্যুঞ্জয় মহাজ্ঞান লাভ করেন। অতঃপর পরমাত্মা কৃষ্ণের তপস্যা করায় তাঁহার বরে তিনি পূজিতা হইয়াছিলেন।

বিবাহ—ব্রহ্মার আজ্ঞায় কশ্যপ মনসাকে অযাচিতা হইলেও জরৎকারু মুনির নিকট বিবাহ দেন। একদা পুষ্কর তীর্থে স্বামীর সায়ং-সন্ধ্যা ভঙ্গ হইবে মনে করিয়া, স্বামীর নিদ্রা ভঙ্গ পাপজনক হইলেও স্বামীর নিদ্রা ভঙ্গ করেন। সাধ্বী মনসা এই অপরাধেই স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হন। এই বিপদে তিনি—

সা সস্মার গুরুং শম্ভুমিষ্টদেবং হরিং বিধিম্
কশ্যপং জন্ম দাতারং বিপৰ্ত্তোভয়কর্ষিতা॥

সুতোৎপত্তি—ব্রহ্মা মুনিকে বুঝাইলেন যে ধর্ম্মপত্নী ধর্ম্মিষ্ঠা সতী মনসার সুতোৎপত্তির পূর্ব্বে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে ঘোর পাপে নিপতিত হইবেন। মুনি মনসার নাভিস্পর্শ করায় তাঁহার গর্ভ সঞ্চার হইল। মুনি প্রবোধ দিলেন যে ধার্ম্মিক বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ কুলউদ্ধারকারী পুত্র মনসার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিবে এবং শ্রীকৃষ্ণ চরণধ্যানে তাঁহার সকল প্রবৃত্তির নিবৃত্তি ঘটিবে।

ময়াচ্ছলেন ত্বংত্যক্তা ক্ষম দেবী মম প্রিয়ে
ক্ষমাযুতানাং সাধ্বীনাং সত্বাং ক্রোধো ন বিদ্যতে॥

মনসার গর্ভে আস্তিকের জন্ম হইল। কোপহিংসা বিবর্জ্জিতা ক্ষমারূপা মনসা স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াও স্বামীকে অভিশপ্ত করিলেন না। জরৎকারুকে ক্ষমা করিয়া তিনি শঙ্কর ও পার্ব্বতীর আশ্রয় লইলেন। মহাদেব নিজ হস্তে আস্তিকের শিক্ষার ভার লইলেন। আস্তিক মহাদেব হইতে মৃত্যুঞ্জয় জ্ঞান লাভ করিয়া মাতার সহিত কশ্যপ আশ্রমে অবস্থান করেন। তক্ষক পরীক্ষিৎকে দংশন করায়, জন্মেজয় সর্পসত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সর্প সমূহ প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। তক্ষক ইন্দ্রের শরণাপন্ন হওয়ায় ব্রাহ্মণেরা ইন্দ্রসহ তক্ষককে ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মাতৃ আজ্ঞায় আস্তিক জন্মেজয় নিকট ইহাদের প্রাণ ভিক্ষা করিয়া নাগ দিগের প্রাণরক্ষা করেন।

ইন্দ্রের মনসা পূজা—

ত্বং ময়া পূজিতা সাধ্বী জননী চ যথাদিতিঃ
দয়ারূপাচ ভগিনী ক্ষমারূপা যথা প্রসূঃ
ত্বয়া মে রক্ষিতাঃ প্রাণাঃ পুত্র দারা সুরেশ্বরি
অহম করোমি ত্বাং পূজ্যাং প্রীতিশ্চ বর্দ্ধতে সদা
নিত্যা যদ্যপি ত্বং পূজ্যা ভবেহত্র জগদম্বিকে
তথাপি তব পূজাঞ্চ বর্দ্ধয়ামি চ সর্ব্বতঃ
যে ত্বামাষাঢ় সংক্রান্ত্যাং পূজয়িষ্যন্তি ভক্তিতঃ
পঞ্চম্যাং মনসাস্যায়ামীশং ত্বাং বা দিনে দিনে।
তপসা তেজসা ত্বাঞ্চ মনসা সসৃজে পিতা
অস্মাকং রক্ষণায়ৈব ত্বেন ত্বং মনসাভিধা॥

শেষ জীবন—

পুত্রেন সার্দ্ধং সা দেবীং চিরং তস্থৌ পিতুর্গৃহে।
ভ্রাতৃভিঃ পূজিত শশ্বন্মান্যা বন্দ্যা সর্ব্বতঃ॥

ক্ষমারূপা, কোপহিংসা বর্জ্জিতা পৌরাণিক মনসাদেবী এবং ক্রূঢ়মতি সর্পের ন্যায় হিংস্র বঙ্গীয় পাঁচালীর পদ্মাবতী একই সামাজিক অবস্থার দ্বিবিধ অভিব্যক্তি নহে। আদিম অনার্য্য দেবী আর্য্যহৃদয়ের প্রভাবে পুরাণে উন্নত আদর্শে গড়িয়া উঠিয়াছে। পক্ষান্তরে প্রাগজ্যোতিষ ও বঙ্গের আদিম অনার্য্যগণের সর্পদেবী, হিন্দুদর্শনে অনধিগম্য, বৌদ্ধ ও অনার্য্য মতবাদ পুষ্ট সমাজের নিম্নস্তরের হৃদয়ে দীর্ঘকাল আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া বঙ্গীয় পাঁচালী গ্রন্থে আত্মপ্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে। সমাজের অপেক্ষাকৃত উচ্চ শ্রেণী বহু বিরোধের পর সোমেশ্বরী পদ্মাবতীকে মনসা নামে পূজা করিতে স্বীকৃত হয়। এই নিমিত্তই পাঁচালীর মনসায় আর্য্যদেবোচিত চরিত্রের অভাব অদ্যাপি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বলেন (৩৫)—

"ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে মনসা মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হওয়ায় বঙ্গীয় পদ্মপুরাণের ভিত্তি দৃঢ় হইয়াছে।" এইরূপ উক্তির ভিত্তি দৃঢ় বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

'মঙ্গল' সাহিত্য হইতে বাঙ্গালার ভাষা, চরিত্র ও সমাজ সম্বন্ধে জানিবার ও শিখিবার যথেষ্ট উপকরণ রহিয়াছে; অথচ বিষয়টি এপর্য্যন্ত বিশদরূপে আলোচিত হয় নাই। এই সকল আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয় নহে; সুতরাং কেবলমাত্র উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে বাধ্য হইলাম।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ।

(৩৫) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৯৯ পৃষ্ঠা।

ইউরোপে সেবাধর্ম্মের ক্রমবিকাশ

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে আহত সৈন্যদিগের শুশ্রূষা যেরূপ সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহিত হইতেছে তাহার বিবরণ পাঠ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। যে ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ সৈন্য সমাবিষ্ট হইয়াছে, তথায় শুশ্রূষা ব্যাপারে কোন ত্রুটি ঘটিতেছে না, ইহা কত পূর্ব্বচিন্তা, কত কার্য্যশীলতা, কত জনহিতৈষণা, কত পরার্থপরতার ফল, তাহা শুশ্রূষা কার্য্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করিবেন। কোন সৈনিক আহত হওয়া মাত্র তাহার আহত স্থানে আবশ্যক মত বন্ধনী ও প্রলেপ দেওয়া হইতেছে। তার পর তাহাকে সযত্নে যুদ্ধস্থলের চিকিৎসালয় হইতে ক্রমে বহু দূরবর্ত্তী মূল আরোগ্য-নিলয়ে নেওয়া হইতেছে। আহত ব্যক্তির বহনোপযোগী গো-শকট, বাষ্পীয় শকট প্রভৃতির সুবন্দোবস্তে কোন কষ্ট হইতেছে না। প্রথমাবধি ঔষধ ও পথ্যের সুবন্দোবস্ত রহিয়াছে। এই সমস্ত ব্যাপারের বিবরণ পাঠ করিলে আমাদের মত লোককে বিস্মিত হইতে হয়। এই যে বিরাট ব্যাপার, ইহা ঘড়ির কাঁটার মত চলিতেছে। মেসোপটেমিয়া যুদ্ধের প্রথমাবস্থায় চিকিৎসাদি সম্বন্ধে সুব্যবস্থার ব্যতিক্রম ঘটাতে, ব্রিটিশ পার্লেমেন্টের তীব্র আলোচনায় সাম্রাজ্যব্যাপী যে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে ও যাহার ফলে মিষ্টার অষ্টেন চেম্বারলেনের মত প্রতিষ্ঠাবান মন্ত্রীও পদত্যাগ করিয়াছেন, তাহাতে বেশ প্রতীয়মান হয়, যে রণক্ষেত্রে উক্ত সুব্যবস্থা এখন স্বভাবসিদ্ধ নিয়মে দাঁড়াইয়াছে।

যুদ্ধাদি ব্যাপারে চিরদিনই কি এইরূপ ছিল? তাহা নয়। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। এমনও হইত যে আহত সৈন্যগণ যুদ্ধের সময় ত নয়ই, তাহার পরও ২।১ দিন কোনরূপ শুশ্রূষা, ঔষধ ও পথ্যাদি পাইত না। এমনও হইত যে যাহারা সদ্য ঔষধ পথ্য ও শুশ্রূষা পাইলে আরোগ্য লাভ করিতে পারিত, তাহারাও চিরদিনের জন্য অকর্ম্মণ্য হইত,—অনেক স্থলে ইহলোক হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিত।

যে সকল কারণ পরম্পরায় আধুনিক সৈনিক-হিতৈষী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া, দয়ামায়া শূন্য ভয়ঙ্কর যুদ্ধক্ষেত্রও করুণার ধারায় সিক্ত করিতেছে, আহত সেনার সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থা ঘড়ির কাঁটার গতির ন্যায় সুপরিচালিত হইতেছে, তাহা অতি উদার। ফরাসী পণ্ডিত রেনাল লিখিয়াছেন "যিশু যেরূপ মানব প্রীতির জন্য আত্মপ্রীতি ত্যাগ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পৃথিবীর আর কোন মহাত্মা করেন নাই এবং সম্ভবতঃ এক শাক্যমুনি ব্যতীত আর কোন মহাত্মা যিশুর ন্যায় পরিবার পৃথিবীর আনন্দ এবং পার্থিব চিন্তা পদদলিত করিতে সমর্থ হন নাই।" যিশু বলিয়াছেন, যে তোমাকে দংশন করিবে, তুমি তাহার হিতসাধন করিবে। যে তোমাকে ঘৃণা ও উৎপীড়ন করিবে, তাহাকে তুমি ভালবাসিবে এবং সাধুতার জন্য পৃথিবী বিসর্জ্জন করিবে। যিশুর এই পবিত্র জীবন ও শিক্ষা ইউরোপের উর্ব্বর ক্ষেত্রে জনহিতৈষণার বীজ বপন করে। মধ্যযুগে ইহার ফলে monastic স্থাপিত হইয়া সংসারের তাপ হইতে দুর্ব্বল এবং উৎপীড়িতকে রক্ষা করিত, চিন্তাশীল ও শিক্ষিতকে নিরুপদ্রবে ধর্ম্ম ও জ্ঞানের আলোচনার সুযোগ প্রদান করিত। খৃষ্ট সপ্তম শতকে ইউরোপে অনাথ রোগীদিগের জন্য আধুনিক প্রণালীর দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ফ্রান্সের প্যারী নগরীতে প্রথম চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইহার নাম Mansion Dier তার পর প্রোটেষ্টান্ট ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে ইউরোপে নূতন যুগের আরম্ভ হয়। ইউরোপ নূতন যুগের উল্লাসে—উদার ধর্ম্মের প্রেরণায় জনহিতের নানা প্রণালী উদ্ভাবিত করিয়া তাহাতে আত্মনিয়োগ করে। ইউরোপে জন-হিতৈষণার জন্য কত প্রতিষ্ঠান স্থাপিত

হইয়াছে, কত মণ্ডলী গঠিত হইয়াছে, কত নরনারী আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, কত অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইউরোপের এই বিরাট প্রচেষ্টার অন্যতম ফল, আহত সৈনিকদের সেবা শুশ্রূষার জন্য সমিতির প্রতিষ্ঠা। এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে পীড়িতের ও আহতের সেবা শুশ্রূষার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বিত হইত, তাহার বিবরণ কতকটা আমরা প্রদান করিতেছি।

বিভিন্ন কারণে পীড়িতের শুশ্রূষার ক্রমবিকাশ হইয়াছে। প্রথমতঃ ধর্ম্মবুদ্ধির প্রেরণা দ্বিতীয়তঃ আহত সৈনিকগণের শুশ্রূষার আবশ্যকতার উপলব্ধি তৃতীয়তঃ আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে শুশ্রূষা রীতির প্রবর্ত্তন। খৃষ্টশতকের প্রথমভাগে সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মহিলাবৃন্দ ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া রোগী-দিগের শুশ্রূষা আরম্ভ করেন। ৩৮০ খৃষ্টাব্দে ফেরো-লীয়া নাম্নী একটী ভদ্র মহিলা রোমনগরীতে প্রথমতঃ চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। এই চিকিৎসালয়ের সংশ্রবে একটি স্বাস্থ্য-নিবাসও স্থাপিত হইয়াছিল। রোম সম্রাট প্রথম থিয়োডিসাসের পত্নী সম্রাজ্ঞী ফ্লেসিলা বিভিন্ন হাসপাতাল পরিদর্শন করিতেন। পরন্তু রোগীদের শুশ্রূষা করিতেও বিমুখ হইতেন না। ইহা হইল ৩৭৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ৩৯৫ খৃষ্টাব্দের কথা। চতুর্থ খৃষ্টশতকের পূর্ব্বে ইউরোপে বিশেষ নিয়মে নিয়ন্ত্রিত কোন শুশ্রূষাকারীর দল গঠিত হয় নাই। হোনরিয়াসের রাজত্বকালে (৩৯৫ হইতে ৪২৩ খৃষ্টাব্দ) আলেকজান্দ্রিয়া নগরের হাসপাতাল সমূহে বেতন প্রাপ্তা ৬০০ শুশ্রূষাকারিণী নিযুক্তা ছিলেন। ইউরোপের মধ্যযুগে চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষার কাজ ধর্ম্ম যাজকদের হস্তে ন্যস্ত ছিল। ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে St. Vincent de Paul সম্প্রদায় স্থাপিত হয়। রোগীদের শুশ্রূষা করাই ইহার উদ্দেশ্য ছিল। এখনও এই সম্প্রদায় ভুক্ত শুশ্রূষা-কারীর দল পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জনবহুল ও উন্নত।

প্রোটেষ্টাণ্ট দেশ সমূহে ধর্ম্মবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে শুশ্রূষাকারীদের মধ্য হইতে পাদ্রীদের প্রাধান্য কমিয়া গিয়াছে।

১৮৩৬ খৃষ্ট অব্দে প্রসিয়ার অন্তর্গত কাইসারবার্থ সহরে পাদ্রী ফ্লিওনার ধর্ম্মযাজিকা মহিলাদিগকে শিক্ষাদানোদ্দেশ্যে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সেই অবধি শুশ্রূষাকারীদের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল উক্ত প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ে শুশ্রূষা কার্য্যে দীক্ষিতা হন ও সম্যক অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ইহার পর তিনি ইংলণ্ডে শুশ্রূষাকারিণীদের একটি দল গঠন করেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা যুক্ত রাজ্যের ফিলাডেলফিয়া নগরে একটি বান্ধব সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। রোগীর শুশ্রূষা করাই ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে উক্ত বান্ধব সমিতির অন্য-তম সদস্য শ্রীমতী ফ্রাই লণ্ডন নগরে শুশ্রূষাকারিণী ভগ্নি সম্প্রদায় গঠন করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ৯০জন ভদ্রমহিলা এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে আধুনিক প্রণালী সম্মত হাসপাতাল সংশ্রবে শুশ্রূষা শিক্ষাগার স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

হাসপাতাল সংসৃষ্ট নাইটিঙ্গেল ফাণ্ড বিদ্যালয় এই বিষয়ের প্রথম শিক্ষা স্থল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে Work house এ শুশ্রূষার উন্নতি সাধিত হয়। লিভারপুল নগরে শ্রীমতী অগ্নেশ জোনস ও St Thomas স্কুলের ১২টী শুশ্রূষাকারিণী এই আবশ্যকীয় কার্য্য প্রথম আরম্ভ করেন।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চমাসে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে বিভিন্ন প্রাদেশিক সৈন্যদলে যাহাতে একই প্রণালীতে শুশ্রূষাদল সংগঠিত হয়, তৎপক্ষে শাসনকর্ত্তৃগণ আইন প্রণয়ন করেন। ইহার ফলে তাহাদের আত্মদ্রোহের যুদ্ধের সময় আহত সৈন্যদিগের শুশ্রূষার বন্দোবস্ত অনেকাংশেই সুন্দর হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বেই ইউরোপে আহত সৈনিক পুরুষের সেবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ১ম নেপো-

লিয়ান যখন পররাজ্য বিজয়ে নিয়োজিত ছিলেন, সেই সময়ে তাহার সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত ডাক্তার লেবী এমবুলান্স ভলান্টেস অথবা যুদ্ধক্ষেত্রোপযোগী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। ১ম নেপোলিয়ান তাঁহার এই মহতী চেষ্টা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। এই হাসপাতাল দ্বারা দুইটী কার্য্য হইত। যে সমস্ত স্থলে সদ্য অস্ত্রোপচার আবশ্যক হইত, তাহা সেই সময়ই করা হইত। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আহত সৈন্যদিগকে যথাসম্ভব সত্বর স্থানান্তরিত করা হইত। এই সময়েই বিখ্যাত ফরাসি ডাক্তার ব্যারণ পার্সি একদল ব্রেন কার্ডিয়ার অর্থাৎ ডুলিবাহক দলের সৃষ্টি করেন। সৈন্য সম্পর্কে এই প্রথম ডুলি বাহকের সৃষ্টি হইল। প্রথম নেপোলিয়নের যুদ্ধের ফলে ইউরোপে তদানীন্তন রাষ্ট্রাধিপতিগণ সন্ত্রাসিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈন্যগণের চিকিৎসার এবং শুশ্রূষার কথঞ্চিৎ সুবন্দোবস্তের সূত্রপাত প্রথমতঃ তাহার সময়েই হইয়াছিল। অদৃষ্টের খেলায় তাহার অধস্তন তৃতীয় নেপোলিয়ানের সময়ে দলবদ্ধ অন্তর্জ্জাতিক শুশ্রূষাকারীদের প্রতিষ্ঠান হয়। যে যুদ্ধের ফলে ইহা সংঘটিত হয়, তথায় তৃতীয় নেপোলিয়ান স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। যুদ্ধ লোকপীড়া দায়ক; কিন্তু এই লোকক্ষয়কারী ও দেশব্যাপী অশান্তিকর যুদ্ধের সংশ্রবে অনেক লোকহিতকারী প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথম নেপোলিয়ানের শক্তির ও সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় যুদ্ধের পর্য্যবসানে বিভিন্ন শাসন-শক্তি পীড়িত সৈন্যের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার উপযোগী করিয়া চিকিৎসালয় গুলির সংস্কার সাধন করেন।

উনবিংশ শতাব্দির মধ্যযুগে ইটালি ক্ষুদ্র ২ রাজ্যে বিভক্তছিল। ইহাদের কতকগুলি অষ্ট্রিয়ার কর্ত্তৃত্বাধীন ছিল। ইটালির অন্যতম ক্ষুদ্র রাজ্য সার্ডিনিয়া ও পিতমণ্টের নরপতি ভিক্টর ইমানুয়েল ও তাহার যশস্বী মন্ত্রী কাবুর অষ্ট্রিয়ার প্রাধান্য উচ্ছেদ সাধন পূর্ব্বক ইটালির ক্ষুদ্র রাজ্য গুলিকে এক রাজতন্ত্রের অধীন করতঃ একটি শক্তিশালী রাজ্য গঠন করিবার অভিলাষী হইয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তাহারা তুর্ক শক্তির সাহায্যার্থ ইংরাজ ও ফরাসির পক্ষ হইয়া, তাহাদের ক্ষুদ্র সার্ডিনিয়া রাজ্যের ত্রিশ সহস্র সৈনিকসহ রুষের বিরুদ্ধে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগদান করেন।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে তিনটি ফল ঘটিয়াছিল। (ক) তুর্ক শক্তি রুষিয়ার হস্ত হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হয়। (খ) ইটালীর স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা লাভের পথ উন্মুক্ত হয়। (গ) যুদ্ধ ক্ষেত্রে আহত সৈনিকদিগের সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিবার আকাঙ্ক্ষা পরদুঃখকাতর নর নারীর হৃদয়ে উত্থিত হয়। প্রাতঃস্মরণীয়া কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল এই নব ভাবের প্রথম উপাসিকা ছিলেন। ক্রিমিয়া যুদ্ধ অবসানে সন্ধিসভায় সার্দ্দিনিয়ার প্রতিনিধি অন্যান্য ইউরোপের শক্তিপুঞ্জের প্রতিনিধির সমকক্ষ ভাবে উপস্থিত হইলেন। উপরোক্ত ঘটনার সময় ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলীয়ানের সহিত সার্দ্দিনিয়া রাজ্য আক্রান্ত হইলে ফরাসি রাজ সার্দ্দিনিয়াধিপতিকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রীয়ার সম্রাট ফ্রান্সিস যোসেফ উত্তর ইটালির ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গের অগ্রণী সার্দ্দিনিয়ার অধিপতির ক্ষমতা বৃদ্ধিতে অষ্ট্রীয়ার প্রভাবের অনিষ্টাশঙ্কা করিলেন। সেই জন্য উক্তরাজ্য আক্রমণ করেন। তৃতীয় নেপোলিয়ান পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে ভিক্টর ইমানুয়েলের সাহায্যার্থ সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। এই সময় ইতালীতে একচ্ছত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠার মূল। এই সমরের শেষ যুদ্ধ লোসবার্ডির Solferino ক্ষেত্রে হয়। মিলিত ফরাসী ও পিড্‌মণ্টিজ সৈন্যের নিকট অষ্ট্রিয়-সৈন্যদল সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স এবং সার্দ্দিনিয়া এই তিন দেশের রাজাই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আহত সৈন্যদিগের শুশ্রূষার কোনই সুবন্দোবস্ত ছিল না। ক্রিমিয়াযুদ্ধে প্রাতঃস্মরণীয়া কুমারী নাইটিঙ্গেলএর কর্ত্তৃত্বে পীড়িত ও আহতদিগের সেবার অনেক উন্নতি সাধন হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদিগের শুশ্রূষার জন্য তখনও ইউরোপের

রাজশক্তির সম্মতিক্রমে সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা হয় নাই। কুমারী নাইটিঙ্গেল কর্ত্তৃক প্রবুদ্ধ নূতন ভাব নরনারীর হৃদয়ে তরল ভাবে ছিল, উহা জমাট বান্ধিয়া তাহাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ জন্য উদ্বোধিত করিবার উপযুক্ত শক্তি সঞ্চয় করিতে পারে নাই। Solferino ক্ষেত্রে পাঁচলক্ষ সৈন্যের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ ঐতিহাসিকগণ সৈনিকের যুদ্ধ নামে অভিহিত করিয়াছেন। সেনানীগণ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই; তাই হতাহতের সংখ্যা অপরিমিত হইয়াছিল। আহত সৈন্যগণের দুর্দ্দশা দর্শনে পরদুঃখকাতর ও কোমল হৃদয় সুইস চিকিৎসক হেনরি ডুনাণ্ট অত্যন্ত ক্লিষ্ট হন। আহতদিগের কষ্ট কথঞ্চিৎ লাঘবকরার উদ্দেশ্যে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী Costiglione গ্রাম হইতে কতিপয় দয়ার্দ্র চিত্তামহিলা সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের সাহায্যে হতভাগ্য আহত সৈন্যদিগকে ভজনালয়ে গৃহস্থের গৃহে ও সর্ব্বসাধারণের ব্যবহার্য্য অট্টালিকা সমূহে, আশ্রয় দানকরতঃ শুশ্রূষা ও চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। Solferinoর ভয়াবহ দৃশ্য তাহাকে অত্যন্ত আকুল করিয়াছিল। যাহাতে এতাদৃশ কলঙ্ক যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বিলোপ করিতে পারেন, তিনি তদ্বিষয়ে বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি একদল স্বেচ্ছাসেবক গঠন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। ইহারা সম্যক নিরপেক্ষ ভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈন্যের শুশ্রূষা করিবে। ইহারা আহত সৈনিককে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপসরণ জন্য ডুলিবহন কার্য্যেও দক্ষ হইবে। তাহাদের এই কার্য্যে প্রতিপক্ষ সৈন্যও বাধা দিতে অথবা তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে অসমর্থ হইবে। ডুনাণ্ট এইরূপ স্বেচ্ছাসেবকদল স্থায়ীভাবে গঠন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রথমতঃ সর্ব্বসাধারণের মত নিজ কার্য্যকলাপের পোষক করা আবশ্যক বোধকরিলেন। তার পর ইউরোপের রাজশক্তি অনুকূল করিয়া তুলিতে মনন করিলেন। কারণ Solferino যুদ্ধে আহত সৈনিকদিগের যেরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছিল, ভবিষ্যতের কোন রণক্ষেত্রে তাহার পুনরভিনয় বন্ধ করিবার জন্য অন্তর্জ্জাতিক চুক্তি আবশ্যক বিবেচিত হইল। ডাক্তার হেনরি ডুনাণ্ট বিশ্রমসুখ ও ভোগলিপ্সা ত্যাগকরিতে কৃতনিশ্চয়হন এবং সঙ্কল্পসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তাহার ভূয়োদর্শন লিপিবদ্ধ করিয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করেন। এই গ্রন্থ প্রচার করিয়া তিনি যে মানব প্রীতির বীজ বপন করেন, তাহা হইতে ছায়া-শীতল মহামহীরুহের উদ্ভব হইয়াছে এবং তাহার আশ্রয়ে অসংখ্য আহত সৈনিক আপনাদের জ্বালা যন্ত্রণা নিবারণ করিতে পারিতেছে। Souveuir of Solferino পুস্তক ক্ষুদ্র হইলেও পাঠকগণ তাহা পাঠে বিচলিত হইলেন। পুস্তিকা খানি ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়া সমস্ত ইউরোপ খণ্ডে আন্দোলনের সূত্রপাত করিল। অনেকে ডুনাণ্ট কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত শুশ্রূষা সমিতির কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইলেও আহত সৈন্যগণের শুশ্রূষার উন্নতি সাধনের আবশ্যকতা স্বীকার করিলেন। জনহিত সাধন প্রয়াসী লোকগণকে অনেকস্থলেই বিরলকর্ম্মী ভোগবিলাসী ধনীদের বিদ্রূপ সহ্য করিতে হয়। এস্থলেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। সমস্ত বাধা ও বিদ্রূপ অতিক্রম করিয়া সাধু ডুনাণ্ট সাধনার পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ও Societe Genevoise d'utilite Publique সমীপে আপন প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। জনহিত সাধন এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল, সমগ্র দেশে ইহার অসাধারণ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত ছিল। সমিতি ডুনাণ্টের প্রস্তাব গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার আলোচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটীর সভ্য সংখ্যা ৫জন ছিল। উদার চরিত্র ডুনাণ্ট ও তাহার সহকর্ম্মী খাসটেভ মেইনিয়ার তাহাদের অন্যতম সভ্য ও প্রধান সুইস সৈন্যাধ্যক্ষ Dafour উক্ত কমিটির সভাপতির পদে বৃত হইয়াছিলেন। সৈনিক কর্ম্মচারিগণ সাধারণ লোকদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে কার্য্য করিবার অধিকার দানের বিরুদ্ধ বাদী হইবেন, এইরূপ অনেকেই মনে করিয়াছিল। নানারূপ বাধাসত্ত্বেও ডুনাণ্ট তাহার প্রস্তাব সম্বন্ধে

আন্দোলন করিতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন যে "জ্ঞানশক্তি, স্বেচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি এই ত্রিবিধ শক্তিতে তিনি ক্রিয়াবান; সুতরাং তিনি নৈরাশ্যের উপর আশা নির্ভ্রয়ক কৃতী বলিয়া আপনাকে মনে করিলেন।" অবশেষে এই আন্দোলনের ফলে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তাহার জন্মভূমি জেনেভা নগরে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের পরামর্শ সমিতি আহূত হয়। এই অধিবেশনে ক্ষমতাপন্ন ও প্রতিনিধিস্থানীয় লোক সকল উপস্থিত ছিলেন। সমবেত সভ্যদের সমালোচনার ফলে ১৮৬৪ সনের আগষ্ট মাসে Congress of Jenevaর অধিবেশন হয়। এই সভার প্রস্তাবিত শুশ্রূষা সমিতি পরিচালনোপযোগী কতকগুলি নিয়ম উপস্থাপিত হয়। বহু তর্ক বিতর্কান্তে এই মন্তব্য গুলি সংশোধিত ভাবে Convention of Geneva নামে গৃহীত হয়। য়ুনানী মণ্ডলের দ্বাদশ শক্তি ও এশিয়া খণ্ডের পারশ্য রাজপ্রতিনিধিগণ ২২শে আগষ্ট তারিখে এই convention স্বাক্ষর করেন। মন্তব্য গুলি নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

১। যে পর্য্যন্ত কোন পীড়িত ব্যক্তি সৈনিক বিভাগের চিকিৎসালয়ে থাকিবেন, অথবা বহনোপযোগী ডুলি কিম্বা গাড়িতে থাকিবেন, সে পর্য্যন্ত ঐরূপ ব্যক্তির শুশ্রূষাকারী কর্ম্মচারিবৃন্দ—নিরপেক্ষ বলিয়া গণ্য হইবেন।

২। সামরিক চিকিৎসালয় ও বহনোপযোগী ডুলিও শকট প্রভৃতি প্রতিপক্ষ দ্বারা অধিকৃত হইলেও তৎতৎ কর্ম্মচারিবৃন্দ নিরপেক্ষ বলিয়া গণ্য হইবেন। তাহারা আপন আপন ইচ্ছানুসারে থাকিতে পারিবেন, অথবা চলিয়া যাইতে পারিবেন।

৩। যদি উল্লিখিত কর্ম্মচারিবৃন্দ চলিয়া যান, তাহা হইলে তাহারা নিজেদের জিনিষ পত্র ও রোগী বহনোপযোগী সরঞ্জাম ডুলি শকট ইত্যাদি লইয়া যাইতে পারিবেন।

৪। যদি কোন গৃহে রোগী অথবা আহতসৈন্য থাকে, তাহাহইলে সেই গৃহস্বামীকে সৈন্যের বাসা দিতে অথবা রসদ সরবরাহ করিতে হইবেনা।

৫। আহত সৈন্য রোগ-মুক্ত হইলে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে পারিবেন, কিন্তু তাহাকে ঐ সময়ে পুনরায় অস্ত্রধারণ করিতে বিরত থকিতে হইবে।

৬। চিকিৎসালয় ও ডুলি শকট প্রভৃতিতে রক্ত বর্ণের ক্রশচিহ্নযুক্ত শ্বেত পতাকা থাকিবে ও কর্ম্মচারী বৃন্দ উক্ত চিহ্ন দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিবেন।

অন্যান্য সময়োচিত নিয়মাবলী প্রত্যেক শক্তির সেনানীগণ স্থির করিবেন।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে জেনেভা নগরে পূর্ব্ব স্বাক্ষরকারী শক্তিপুঞ্জের প্রতিনিধিগণের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। তাহাতে এই নিয়মগুলি পুনঃ আলোচনান্তে প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তনাদির পর গৃহীত হয়। কিন্তু ১৮৬৪ সনের গৃহীত মূলসূত্রের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। সভাস্থলে নিয়মগুলি গৃহীত হইলেও কার্য্যকালে কেহ এই সমস্ত চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন না। পোপও স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিলেন।

নিম্নে পুনঃ সংস্কৃত নিয়মগুলি উদ্ধৃত করা গেল।

১। যখন শত্রুকর্ত্তৃক অধিকৃত এম্বুলান্স বা আরোগ্য নিলয় সংসৃষ্ট কোন ব্যক্তি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ইচ্ছুক হন, তখন প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ তাহার যাত্রার সময় নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন। যদি এরূপ কোন ব্যক্তি উক্ত চিকিৎসালয়ে অথবা শুশ্রূষার কার্য্যে নিয়োজিত থাকিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে তিনি তাহার পদোচিত সম্যক মাসহারা শত্রুপক্ষের নিকট পাইবেন।

২। কোন গৃহে যুদ্ধে আহত সৈন্য থাকিলেই গৃহস্বামী রসদাদি সরবরাহ করা হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন না। তিনি আহত সৈন্যদিগের শুশ্রূষায় ও ভরণ পোষণে কি পরিমাণ দান করিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিয়া রসদ কর্ম্মচারী তাহাদের রসদের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিবেন।

৩। পূর্ব্বচুক্তি অনুসারে নিয়ম ছিল যে আহত সৈন্য আরোগ্য লাভ করিলে, সময়ের পর্য্যবসান পর্য্যন্ত, আর অস্ত্রধারণ না করিতে প্রতিশ্রুত হইলেই, নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের আজ্ঞা পাইবেন; কিন্তু পরিবর্ত্তিত নিয়মে সৈনিক কর্ম্মচারীবৃন্দ এই নিয়মের বহির্ভূত হইলেন। কারণ তাহাদের বিদ্যা বুদ্ধি তাহাদের স্বদেশের কার্য্যকরী হইতে পারে।

৪। হাসপাতাল, জাহাজ, আহতসৈন্যবাহী বানিজ্য-পোত ও সমুদ্র হইতে আহত নাবিক এবং জলমগ্ন লোক সংগ্রহকারী ডিঙ্গাগুলি নিরপেক্ষ বলিয়া ধার্য্য হইবে। উক্ত পোতগুলিতে রক্তবর্ণের ক্রুশযুক্ত শুভ্র পতাকা ও নাবিক এবং অন্যান্য কর্ম্মচারিবৃন্দের দক্ষিণহস্তে রক্তবর্ণ ক্রুশযুক্ত শ্বেতবন্ধনী থাকিবে, এরূপ নির্দ্ধারিত হইল।

৫। রাজকীয় হাসপাতাল জাহাজগুলি শ্বেতবর্ণ ও উপরে সবুজ রেখাঙ্কিত হইবে। সাহায্যকারী সমিতিগুলির হাসপাতাল পোত শ্বেতবর্ণ ও উপরে রক্ত রেখাঙ্কিত হইবে।

৬। যদি জলযুদ্ধে কোন শত্রু সন্দেহ করেন যে প্রতিপক্ষ এই সমস্ত নিয়মের অপব্যবহার করিতেছেন, তাহা হইলে সন্দেহ-দুষ্ট পক্ষ যে পর্য্যন্ত তাহার নির্দোষিতা সপ্রমাণ না করিবেন, সে পর্য্যন্ত উপরিউক্ত নিয়মগুলি তাহার পক্ষে বলবৎ থাকিবে না। যদি সন্দেহ-দুষ্ট পক্ষ এই নিয়মগুলির অপব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে সমর শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এই অধিকারগুলি হইতে তিনি বিচ্যুত হইবেন।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে নির্দ্ধারিত এই নিয়মগুলি প্রথম নিয়মগুলির মত স্বাক্ষরিত না হইলেও, শক্তিপুঞ্জ যুদ্ধ সময়ে এই নিয়মাবলি দ্বারা পরিচালিত হইতেছেন এবং সমস্ত সভ্য দেশে আহত সৈনিকদিগের সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থার জন্য সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এই সকল সমিতি বহ্বায়তন, সুগঠিত এবং প্রভাবশালী। তৎসমুদয় হইতে শতমুখে করুণা এবং প্রীতি উচ্ছ্বসিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রের বীভৎস দৃশ্যের পার্শ্বেই শত সহস্র ক্লিষ্ট মানবাত্মাকে সান্ত্বনা ও শান্তিতে স্নিগ্ধ করিতেছে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কোপ্রুসিয়ান সমর ঘটে। এই সমরের ফলে ফরাসিরাজ্যে সাধারণতন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত ও জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য গঠিত হয়। উক্ত নিয়মগুলি যথাযথ ভাবে এই সমরে প্রতিপালিত হয়। তদবধি সমস্ত যুদ্ধেই নিয়মগুলি প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান মহাকুরুক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তুর্ক গবর্ণমেণ্ট পতাকাও বন্ধনীতে রক্তবর্ণ ক্রুশস্থলে রক্তবর্ণ অর্দ্ধচন্দ্র ব্যবহার করেন। এই পতাকা যুদ্ধস্থলে দেখিলেই বুঝিতে হইবে যে, সেই স্থলে আন্তর্জ্জাতিক নিয়মানুগত শুশ্রূষা সমিতির লোক উপস্থিত আছেন। বিগত ৫০ বৎসর ধরিয়া এই পতাকা যুদ্ধে বিগত-সহায় আহত সৈন্যদিগের প্রতি যাহাতে সদয় ব্যবহার করা হয় তৎপক্ষে নীরবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। সম্প্রতি জর্ম্মণ রাজশক্তির দুর্ব্যবহারে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন, যে হাসপাতাল পোতগুলি হইতে বর্ণ চিহ্ন উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এই বর্ণচিহ্নযুক্ত হাসপাতাল পোতসমূহ জর্ম্মণ রণতরী জলমগ্ন করিয়া দিতেছে। জর্ম্মণরাজশক্তির এই অমানুষিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে Geneva নগরস্থিত অন্তর্জ্জাতিক Red cross সমিতি প্রতিবাদ করিয়াছেন।

Red cross Societyর কার্য্য ক্ষেত্রের প্রসার এখন আরো বর্দ্ধিত হইয়াছে। এখন বন্দী সৈন্যদিগের খাদ্যাদির অভাব ও তাহাদের পরিবার পরিজনের অভাব আংশিক ভাবে দূর করিতে হয়। ইহাও উক্ত সমিতির কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

সৈনিক হিতৈষী সমিতি বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে কাজ করিতেছে। প্রত্যেক দেশে একজন করিয়া উচ্চপদস্থ সৈনিক পুরুষ সমস্ত কাজের শৃঙ্খলা বিধান জন্য ইহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকেন। ফরাসী ও জার্ম্মাণ দেশে এই সমিতি সম্পূর্ণভাবে সৈনিক পুরুষদের অধীন হইয়া কাজ করেন। ইংলণ্ডের সৈন্য

দলে এই সমিতি অনেকটা স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারেন। সমিতির ব্যয় সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থ দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। সমস্ত দেশেই সমিতি সংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারিবৃন্দ পূর্ব্বোক্ত নিয়মাবলি প্রতিপালনে বাধ্য থাকেন। এশিয়ার পারস্য ও জাপান সাম্রাজ্যে এই সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। জাপানের এই সমিতির বার্ষিকআয় ত্রিশলক্ষ টাকা। টোকিও সহরে এই সমিতির একটি সুন্দর আরোগ্য নিলয় আছে। বহুসংখ্যক পরদুঃখ কাতর নরনারী এই কার্য্যে নিয়োজিত আছেন। আহত সৈন্য বহনোপযোগী দুইখানা জাহাজ এই সমিতির কার্য্যে নিযুক্ত আছে। প্রায় সমস্ত স্বাধীন দেশেই এই সমিতির কার্য্য চলিতেছে। অভিজ্ঞতার ফলে কর্ম্মানুযায়ী শ্রেণী বিভাগ হইয়া নিম্নলিখিত ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যখন কোন বৃহৎ যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন শুশ্রূষাকারীদের ন্যূনকল্পে তিনটি অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে যোদ্ধৃবৃন্দের ঠিক পশ্চাতেই প্রথম শুশ্রূষা স্থল হইবে। এই স্থানে যাহাদের আশু ঔষধ প্রদত্ত না হইলে মৃত্যুমুখে পতিত হইবার আশঙ্কা, তাহাদিগের ক্ষত পরীক্ষা ও ঔষধাদি প্রয়োগ হইবে। উক্ত অবস্থান হইতে কিঞ্চিৎ দূরে শুশ্রূষার দ্বিতীয় স্থল স্থাপিত হইবে। এই স্থানে প্রথম স্থল অপেক্ষা সুচারু রূপে ক্ষতাদি পরীক্ষা ও ঔষধাদি প্রয়োগ করা হইবে। আরো দূরবর্ত্তী স্থানে শুশ্রূষার তৃতীয় অধিষ্ঠান হইবে। এই স্থানে আহত সৈন্যদিগের সম্যক্‌রূপে চিকিৎসা ও শুশ্রূষা হইবে। যে পর্য্যন্ত আহত সৈন্যগণ স্থায়ী হাসপাতালে প্রেরিত না হয় ততদিন তাহারা এই তৃতীয় অবস্থানে থাকিয়া রোগোপযোগী পথ্যাদি ও আশ্রয় পাইবে। অধুনা কোন কোন সৈন্য শ্রেণীতে ৪টী শুশ্রূষা স্থল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রথমতঃ যুদ্ধক্ষেত্রের শুশ্রূষা স্থলে নিতান্ত আবশ্যকীয় শুশ্রূষা করা হয়। দ্বিতীয়তঃ পরিবর্ত্তন স্থল। এখানে রোগীদিগকে ডুলি প্রভৃতি হইতে ঠেলা গাড়িতে উঠাইয়া দেওয়া হয়। তৃতীয় স্থানে ক্ষতস্থলে বন্ধনী ও প্রলেপ দেওয়া হয়। চতুর্থতঃ যুদ্ধক্ষেত্রের কেন্দ্র হাসপাতাল। এস্থলে রীতিমত চিকিৎসা শুশ্রূষা করা হয়। যে সমস্ত সৈনিক এই হাসপাতাল হইতে রোগ মুক্ত হইবেন, তাহারা পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র গ্রহণ মানসে যাত্রা করেন। আরাম না হইলে আহত সৈনিক নিজদেশে স্থায়ী হাসপাতালে নীত হন।

সম্প্রতি আহত সৈন্যদিগের সম্পূর্ণ আরোগ্য ও পূর্ব্বস্বাস্থ্য লাভের আশায় তাহাদিগকে স্বাস্থ্যকর সুশীতল শৈলনিবাসে অথবা সমুদ্রতীরে অবস্থিত নগরে বাস করিবার সুবিধা দেওয়া হইতেছে। যাহারা দেশের ও দশের উপকারে জীবনোৎসর্গ করিতে অগ্রসর হন তাহাদের সুবিধার্থ সমস্ত আয়োজনই শ্রেয় ও কর্ত্তব্য। বঙ্গীয় বীরগণের আত্মীয় স্বজন জানিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন যে মেসোপটেমিয়া রিপোর্টের ফলে ভারতবর্ষীয় সৈন্যদিগের শুশ্রূষা ও চিকিৎসার সম্যক উন্নতি সাধিত হইতেছে। শুশ্রূষাকারীদের দলে নিম্নলিখিত কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়া থাকেন। (১) আহত সৈন্যদিগকে বহনকারী বেহারা। (২) পরিচারক। (৩) অস্ত্রোপচারক (৪) রোগীবহনোপযোগী শকট পরিচালক (৫) শান্তি রক্ষক। (৬) কর্ম্মচারী। (৭) সেবক।

রোগী বহনোপযোগী নিম্নলিখিত যান ব্যবহৃতহয়। (১) ডুলি, ডাণ্ডি প্রভৃতি (২) ঠেলাগাড়ী (৩) খচ্চর দ্বারা বাহিত থলিয়া এবং কেকোলেটস। (৪) অশ্বদ্বারা চালিত শকট (৫) যন্ত্রচালিত শকট (৬) Steam launch motor boat ইত্যাদি। (৭) বিশেষ বিশেষ বন্দোবস্তের রেলগাড়ী।

সৈন্যদিগের প্রত্যেক কোম্পানিতে সৈন্যদিগের মধ্য হইতে দুইজন হিসাবে রোগীবাহক নির্দ্দিষ্ট হয়। তাহারা নিরস্ত্র থাকেন ও দক্ষিণ বাহুমূলে রেডক্রশ-সোসাইটির বিশেষ চিহ্ন ধারণ করেন। প্রত্যেক ব্রিগেডে এক কোম্পানি আহত বাহকরূপে কাজ করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদিগকে সংগ্রহ করা ও তাহাদিগকে আশু আবশ্যক পথ্যাদি ও পানীয়

দেওয়া ও পরে তাহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রের হাসপাতালে পহুছিয়া দেওয়া এই রোগীবাহক দলের কর্ত্তব্য।

কোন সৈন্যদলে ৪০০০০ যোদ্ধা থাকিলে, তাহার জন্য ন্যূনকল্পে ১০টী যুদ্ধ ক্ষেত্রোপযোগী চিকিৎসালয়ের বন্দোবস্ত করা হয়। ১৮৯৭-৯৮ খৃষ্টাব্দে টিরা-সমরে ১৮৬৮৮ জন ইউরোপীয় সৈন্য ও ৪১,৬৭৭ জন ভারতবর্ষীয় সৈন্য ইংরাজ পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল। ইউরোপীয় সৈন্যদিগের জন্য ১৪টি ও ভারতবর্ষীয় সৈন্যদিগের জন্য ২২টী যুদ্ধক্ষেত্রোপযোগী হাসপাতাল স্থাপিত হইয়াছিল। প্রত্যেকটি হাসপাতালে ১০০ জন করিয়া রোগী থাকার ব্যবস্থা হইয়াছিল। সেই সৈন্য সঙ্গে আহত সৈন্যবহনোপযোগী ১৫০ খানি ডাণ্ডি, ২,১০ টী ডুলি ও ৯০০ শত কাহার নিযুক্ত ছিল। এতদ্ব্যতীত উক্ত হাসপাতাল সমূহে ও বেহারা-দলে ৯৬৫৮ জন সেবক ও ৭২০ খানা ডাণ্ডি ও ৭২০ খানা টোঙ্গা ছিল।

রণক্ষেত্রে আহত সৈনিকের শুশ্রূষা অথবা দেশব্যাপী আপদের সময় নরনারীর দুঃখ দূর করিতে হইলে যে নিপুণতা যে সংযম, যে সহিষ্ণুতা, যে সাহস আবশ্যক তাহা উদার ধর্ম্ম বিশ্বাস, সতেজ বুদ্ধিবৃত্তি এবং সরল বিবেক বোধ ব্যতীত সম্ভবপর নহে। আমাদের ভারতবর্ষেও এই সমস্ত গুণের প্রাচুর্য্য আছে বলিয়াই এখানেও সমবেত ভাবে বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে জনসেবার আকাঙ্ক্ষা উত্থিত হইয়াছে। অজয়ের জল-প্লাবনের সময় ছাত্রবৃন্দের ও সাধারণতঃ রামকৃষ্ণ-মিশনের সেবকবৃন্দের এবং যুদ্ধক্ষেত্রে বেঙ্গল এমবুলেন্স-কোরের কার্য্য আমাদের দেশে যে লোকসেবার নূতন ভাব আগত হইয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত মেসোপো-টেমিয়ার দুর্দ্দিনে যখন শুশ্রূষা ও চিকিৎসার বন্দোবস্তে কর্ম্মকর্ত্তারা কতকটা উদাসীন ছিলেন, তখন এই অল্প সংখ্যক বাঙ্গালী যুবকগণ আহত ও রোগক্লিষ্ট সৈন্য দিগের চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় নিয়ত ছিল। এই উদ্যোগী যুবকদিগের আত্মোৎসর্গের বিষয় আলোচনা করিলে বস্তুতঃই হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়। ধন্য যুবকগণ, তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে জাতিনির্ব্বিশেষে শুশ্রূষা করিয়া বাঙ্গালী জাতির মস্তক গৌরবে মণ্ডিত করিয়াছে। ফলতঃ ডুনাণ্ট যে সাধনায় নিঃস্বার্থ ভাবে ব্রতী হইয়া-ছিলেন, তাহার জীবন কালেই তাহাতে সিদ্ধিলাভ হইয়াছিল, এরূপ অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটে। সাধারণতঃ প্রারব্ধ সৎকর্ম্মের ফল দূর-ভবিষ্যতে পর-বর্ত্তীগণ ভোগ করে। ধন্য তাঁহারা যাহারা আরব্ধ ব্রতের উদ্যাপন করিয়া যাইতে পারেন। ডুনাণ্ট আপন গৃহীত ব্রতের উদ্যাপন কল্পে তাহার সময়, অর্থ ও শক্তি সমস্তই অম্লানবদনে প্রয়োগ করিয়া-ছিলেন, এই পৃথিবীর অন্যান্য জনহিতৈষীর ন্যায় তিনি ও দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হইয়াছিলেন। ডুনাণ্ট যে ব্যবসায়ে নিয়োজিত ছিলেন তাহাতে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া প্যারিস সহরে অতি সামান্য ভাবে জীবন যাপন করিয়াছিলেন। সময় সময় তাঁহার এরূপ অবস্থা দাঁড়াইত যে, সামান্য এক টুক্‌রা রুটি ভোজনান্তে জল পান করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হইত। তিনি অর্থাভাবে পোষাক ক্রয় করিতে পারিতেন না। জামার রং ঝলসাইয়া যাইত। রং করিয়া লইবার অর্থের অসদ্ভাব। লিখিবার কালী রং এর কাজ করিত। গলার কলার পুরাতন ও জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, পয়সা নাই; একটি সামান্য কলার ক্রয় করিবার অর্থের অভাব। জীর্ণ কলারই চক দ্বারা রং করিয়া ব্যবহার করা হইত। তাহার আর্থিক অবস্থা এইরূপ শোচনীয় হইয়াছিল। বৃদ্ধ বয়সে এই অবস্থায় পতিত হইয়া তিনি আরামের স্থলে স্বদেশমাতৃকার ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিয়া Appenzil cantonএ বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই দুরবস্থার বিষয় তৎকালীন রুষ সম্রাজ্ঞী মেরী ও অধ্যাপক মূলারের কর্ণ গোচর হইল। তাঁহারা তাঁহার সাহায্যার্থ একটি কমিটি গঠন করিলেন। তাঁহার আর্থিক অবচ্ছলতার লাঘব হইল।

যে সমিতি তাহার সাধনার ফল, তাহার গঠনেও প্রসারে তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিয়া ছিলেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা জীবন ব্যাপী সৎচেষ্টার পুরস্কার স্বরূপ তিনি Noble Peace Prize প্রাপ্ত হইয়াছিল। উক্ত Prizeএর বিবরণ শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই রবীন্দ্র নাথের কৃতকার্য্যতায় অবগত আছেন।

১৯১০ খৃষ্টাব্দেঅক্টোবর মাসে ব্রত উদ্যাপনের ৪৬ বৎসর ও কর্ম্মজীবনের ৮২ বৎসর বয়সে ডুনাণ্ট পরলোক গমণ করেন। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে ও পরে অনেক নরনারী আহত সৈন্যের সেবায় নিজকে চরিতার্থ করিয়াছেন; কিন্তু এরূপ বিরাট সর্ব্বদেশব্যাপী একার্থ লোকহিতকর প্রচেষ্টা আর কাহারও দ্বারা হয় নাই। এইরূপ পৃথিবীব্যাপী লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান জগতে আর দুইটি নাই। জাতি ও ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে একই ভাবে অনুপ্রাণিত হইবার পথ ডুনাণ্ট উদ্ঘাটিত করিয়া গিয়াছেন, সেজন্য মনুষ্য মাত্রেই তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। *

শ্রীকেদারনাথ সেন।

* [illegible] সাহিত্য সংসদে পঠিত।
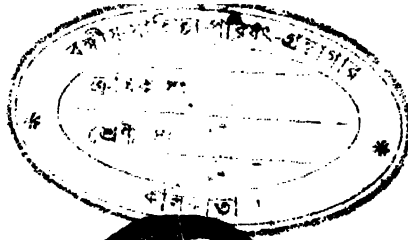
৮ম বর্ষ　　শ্রাবণ ১৩২৫　　৪র্থ সংখ্যা

কাব্য বনাম ইতিহাস। *

ঘটনা ও কল্পনা—fact ও fiction—এর মধ্যে যে একটা ঘোরতর কলহ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাচীন কালের সাহিত্যে তাহা কুত্রাপি বড় পরিস্ফুট হয় নাই। পরন্তু প্রাচীন সাহিত্যে তাহা বরাবর পরস্পরের সহযোগিতাই করিয়া আসিয়াছে। মহাকবি কালিদাসের ভাষায় বলিতে পারি—

অন্যোন্যশোভাজননাদ্ বভূব
সাধারণো ভূষণভূষ্যভাবঃ।

সেকালে ঘটনামাত্রই সাহিত্যিকগণের আদরণীয় ছিল না, কল্পনার অলৌকিক উজ্জ্বল আলোকে—কবির স্বপ্নের স্বর্গীয় মাধুর্য্যে—(the light that never was on sea or land the consecration—the poet's dream দ্বারা)—মণ্ডিত না হইলে কোনও রসজ্ঞ ব্যক্তিই তাহা পড়িবার বা স্মরণ রাখিবার ক্লেশ স্বীকার করিতেন না। আবার নিতান্ত কল্পিত ব্যাপারও হৃদয়গ্রাহী হইলে, লোক তাহা সত্যঘটনা অপেক্ষাও সত্যতর বলিয়া গ্রহণ করিতে মনে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিত না। যাহা সুন্দর তাহাই সত্য ছিল; সত্যমাত্রই সুন্দর ছিল না, এমন কি, অনেকস্থলে তাহা সত্য বলিয়াও বিবেচিত হইত না। সত্যকে সুন্দর ভাবে সামাজিকগণের নিকট উপস্থাপিত করিতে পারিলেই তাহা যথার্থরূপে সত্য হইয়া উঠিত।

সে যাহা হউক, ঘটনা ও কল্পনায় যে কলহ আধুনিক কালের সাহিত্যে নানাদিকে ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে, কাব্যে ও ইতিহাসের পরস্পরের প্রতি রেষারেষিতে তাহারই একটা দিক দেখিতে পাই।

কল্পনা কাব্যের উপজীব্য; আর ঘটনা ইতিহাসের

* ঢাকা সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

উপজীব্য। সুতরাং আশা করা যাইতে পারে যে, ইতিহাস ও কাব্যের মধ্যে একটা বুঝা-পড়া হইয়া গেলেই ঘটনা ও কল্পনার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্পূর্ণরূপে না হউক, অনেকাংশে মিটিয়া যাইতে পারে। কিন্তু লোকে বলে—গুরুতে গুরুতে বন্ধুতা সম্ভব, কিন্তু চেলায় চেলায় মিলন কখনই সম্ভব নহে। ইহার সত্যতা আপনারা আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিতেছেন। "চেলা চামুণ্ডা"-গণের মিলন হইলেই গুরুতে গুরুতে মিলন যথার্থ হয়। কবি কালিদাস এক রাজার বর্ণনা উপলক্ষে লিখিয়াছেন—

নিসর্গভিন্নাস্পদমেকসংস্থম্
অস্মিন্ দ্বয়ং শ্রীশ্চ সরস্বতী চ।

অর্থাৎ লক্ষ্মী ও সরস্বতী স্বভাবতঃ "ঠাঁই ঠাঁই" থাকিলেও এই রাজাকে পাইয়া একত্র(শান্তিতে) বাস করিতেছেন। এ বর্ণনা যে অতি সুন্দর তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্য-রামানন্দ-সংবাদে যেমন দেখিতে পাই, চৈতন্যদেব পুনঃ পুনঃ কহিতেছেন—

"ইঁহো ভাল, আগে কহ আর",

সেইরূপ যদি কালিদাসকে অন্ততঃ একবারও কেহ বলিতেন যে, "লক্ষ্মী সরস্বতীর যে মিলনের কথা বলা হইল "ইঁহো ভাল, আগে কহ আর," তবে তিনি কি বলিতে পারিতেন, মনে হয়? তিনি এইরূপ বলিতে পারিতেন না কি?—"এই রাজার গুণে মুগ্ধ হইয়া কেবল লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়েই যে ইঁহাকে আশ্রয় করিয়াছেন তাহা নহে, তাঁহাদের যে দুইটা অমূল্য বাহন—পেচক ও রাজহাঁস—তাহারাও রাজার সিংহাসনের নিম্নে পরস্পরের পাশাপাশি বসিয়া শালগ্রামশিলার গায়ের চন্দনের গন্ধে পরম তৃপ্তি অনুভব করিতেছে।" অন্ততঃ ঐরূপ বর্ণনা করিলেই যে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সন্ধিটা একটু স্থায়ী রকমের বলিয়া লোকেই গ্রহণ করিতে পারিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কল্পনা ও ঘটনার মধ্যে সন্ধিও তখনই স্থায়ী হইবার পথে আসিবে, যখন কাব্য ও ইতিহাসের তথা কবিও ঐতিহাসিকের পরস্পরের প্রতি রেষারেষি টুকু বিলুপ্ত হইবে। নচেৎ এসম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, বা হইবে, সবই "scrap of paper" মাত্র। সে যাহা হউক, কাব্য ও ইতিহাসের মধ্যে কলহটা কতকটা এইরূপ। কাব্যের পক্ষে বলেন—

সাহিত্যের আসরে ইতিহাসের বড় বড়াই—তিনি খাটি সত্যবাদী; সত্যঘটনা লইয়া তাহার কারবার; মিথ্যার ধার তিনি ধারেন না। সেইজন্য কবিতা ও উপন্যাস দুইই তাহার চক্ষুঃশূল, বিশেষতঃ যদি তাহাতে কোনও ঐতিহাসিক ঘটনার গন্ধ থাকে। সাধারণতঃ কল্পনার নাম শুনিলেই ইতিহাসের "দন্তরুচিকৌমুদী"র ঈষৎ বিকাশ লক্ষিত হয়; তাহা রসজ্ঞতার কতদূর পরিচায়ক বলিতে পারি না, কিন্তু তাহা যে কখনও কোনও সহৃদয় ব্যক্তির প্রাণের "দর তিমির" হরণ করিয়াছে এরূপত বোধ হয় না। কেননা ইতিহাস, বিশেষতঃ আধুনিক কালের ইতিহাস, কখনও প্রাণ খুলিয়া হাসে না, পাছে তাহাতে তদীয় পদোচিত গাম্ভীর্য্যের খর্ব্বতা হয়। যে হাস কাব্যে ও উপন্যাসে সাদা, অকপট ও অমিশ্র, ইতিহাসের অধরে তাহা 'উপ'-উপসর্গ যুক্ত,—সুতরাং মলিন ও কুটিল। আমাদের লাস্যময়ী শুচিস্মিতা কল্পনা যদি কখনও তাহার চিরনবীনতার আনন্দে ইতিহাসের একচেটিয়া অধিকারে পদপ্রক্ষেপ করিবার উপক্রম করে, ইতিহাস তখনই বিকট-দ্রংষ্ট্রা বিকাশপূর্ব্বক চিরপ্রবীণতার গাম্ভীর্য্যকে গম্ভীরতর করিয়া একটা প্রস্তরস্তম্ভ বা উৎকীর্ণ শিলাখণ্ড হস্তে লইয়া তাহাকে সমুচিত শাসন করিতে উদ্যত হন। কাব্য-কলার সপক্ষেরা যদি বলেন,—সাহিত্য-ক্ষেত্রে কোনও বিদ্যারই একাধিপত্য নাই, ইহা repudlic of letters—এখানকার শাসনপ্রণালী প্রজাতন্ত্র, ইতিহাস হয়ত

অমনিই বলিবেন,—ও কথাটা কল্পনার কথা—কবিত্বের ছড়ামাত্র; প্রমাণ দেখাও। বরং এ বিষয়ে সত্য এই যে, এখন যেমন আমি সাহিত্যক্ষেত্রের অধিপতি, সেইরূপ অতিপূর্ব্বে ধর্ম্ম সাহিত্যজগতের অধিপতি ছিল। ধর্ম্মেই কাব্যকলার উৎপত্তি এবং বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত ধর্ম্মকথাই তাহার একমাত্র উপজীব্য ছিল। কর্ণাট রাজমহিষীর কাছে কবি কালিদাসের লাঞ্ছনার গল্প কাহার না বিদিত? কর্ণাটরাজ পত্নীর নিকট কালিদাসকে কবি বলিয়া পরিচিত করিলে, রাজমহিষী বলিয়াছিলেন,

> একোঽভূন্নলিনাৎ পরস্থ পুলিনাদ্ বল্মীকতশ্চাপর
> স্তে সর্ব্বে কবয়স্ত্রিলোকগুরব স্তেভ্যো নমস্কুর্ম্মহে।
> অর্ব্বাঞ্চো যদি গদ্যপদ্যরচনৈশ্চেতশ্চমৎকুর্ব্বতে
> তেষাং মূর্দ্ধ্নি দধামি বামচরণং কর্ণাটরাজপ্রিয়া।

ইহার ভাব এইরূপ—কবি মাত্র তিনটি; এক কবি ব্রহ্মা—যাহার আবির্ভাব নলিনে, আর এক কবি ব্যাস—যাঁহার জন্ম পুলিনে, আর তৃতীয় কবি বাল্মীকি—যাঁহার প্রকাশ বল্মীকে। ইঁহারাই যথার্থ কবি তিনলোকের গুরু, এঁদের পায়ে নমস্কার। এই তিনজন ভিন্ন একালের যে কেহ একটু পদ্যপদ্যরচনা দ্বারা লোকের চিত্তবিনোদন করিয়া কবি বলিয়া পরিচিত হইবার স্পর্দ্ধা করে, আমি কর্ণাটের রাজপ্রিয়া তাহার মাথায় আমার বাঁ পায়ের লাথি মারি।" স্বয়ং কালিদাসেরই যখন এইরূপ সম্মান, তখন "চান্যে পরে কা কথা?"

ধর্ম্মের আধিপত্যের যুগে কাব্য যে কেবল উদার সার্ব্বজনীন ধর্ম্মমতসমূহের বিস্তারেই সাহায্য করিয়াছে, তাহা নহে, সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতারও সেবা করিয়াছে। এক বাঙ্গালা সাহিত্যেই গণ্ডা গণ্ডা ধর্ম্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, শিবমঙ্গল বা শিবায়ন, মনসামঙ্গল, সূর্য্যমঙ্গল-প্রভৃতি তাহার প্রমাণ।

তার পর একটা সময় আসিয়াছিল—যখন বিজ্ঞান সাহিত্যের আসরে নিজ আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া সাহিত্য ক্ষেত্র হইতে কেবল ধর্ম্মকে নহে কল্পনাকেও অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা বহিষ্কৃত করিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছিল। বড় বড় বিজ্ঞলোক তখন মাথা নাড়িয়া বলিয়াছিলেন,—আর কাব্য চলিবেনা—কাব্যের যুগ গিয়াছে। এখন চাই বিজ্ঞান, বিজ্ঞান, বিজ্ঞান! কেননা এটা সভ্যতার যুগ, যাহার মূল বিজ্ঞানের শিলাস্তূপে প্রতিষ্ঠিত। এ যুগে কাব্য ফুটিতে পারে না। 'As civilisation advances, poetry almost necessarily declines' *—অর্থাৎ সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কাব্যকলাকে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতেই হইবে। ইহা কোন বিজ্ঞানসেবকের কথা নহে, প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সমালোচক ও ঐতিহাসিক লর্ড মেকলের কথা, যিনি আবার একখানা কাব্যও লিখিয়াছিলেন। আমাদের অমন যে অমূল্যধন বঙ্কিমচন্দ্র, তিনিও একথাটা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কাব্যে ও বিজ্ঞানে চন্দ্রের স্থান তুলনা করিয়া তিনি লিখিতেছেন†—

"এই বঙ্গদেশের সাহিত্যে চন্দ্রদেব অনেক কার্য্য করিয়াছেন, বর্ণনায়, উপমায়,—বিচ্ছেদে, মিলনে—খোসামদে—তিনি উলটি পালটি খাইয়াছেন। চন্দ্রবদন চন্দ্ররশ্মি, চন্দ্রকরলেখা, শশী, মসি ইত্যাদি সাধারণ ভোগ্য সামগ্রী অকাতরে বিতরণ করিয়াছেন; কখন স্ত্রীলোকের স্কন্ধোপরি ছড়াছড়ি, কখন তাঁহাদিগের নখরে গড়াগড়ি দিয়াছেন; সুধাকর, হিমকরকরনিকর, মৃগাঙ্ক শশাঙ্ক, কলঙ্কপ্রভৃতি অনুপ্রাসে বাঙ্গালী বালকের মনোমুগ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু এই উনবিংশ শতাব্দীতে এইরূপ কেবল সাহিত্যকুঞ্জে লীলাখেলা করিয়া কার সাধ্য নিস্তার পায়? বিজ্ঞানদৈত্য সকল পথ ঘেরিয়া বসিয়া আছে। আজি চন্দ্রদেবকে বিজ্ঞানে ধরিয়াছে, ছাড়াছাড়ি নাই। আর সাধের সাহিত্যবৃন্দাবনে লীলাখেলা চলে না—কুঞ্জদ্বারে সাহেব অক্রূর রথ

* Macaulay's Essay on Milton.

† বিজ্ঞান রহস্য—চন্দ্রলোক।

আনাইয়া দাঁড়াইয়া আছে ; চল চন্দ্র ! বিজ্ঞান-মথুরায় চল ; একটা কংসবধ করিতে হইবে—”

আর অধিক উদ্ধৃত না করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ মন্তব্যটুকু উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে।

“অতএব সুখের চন্দ্রলোক কিপ্রকার, তাহা এক্ষণে আমরা একপ্রকার বুঝিতে পারিয়াছি। চন্দ্রলোক পাষাণময়, বিদীর্ণ, ভগ্ন, ছিন্নভিন্ন, বন্ধুর, দগ্ধ পাষাণময়। জলশূন্য, সাগরশূন্য, নদীশূন্য, তড়াগশূন্য, বায়ুশূন্য, বৃষ্টিশূন্য,—জনহীন, জীবহীন, তরুহীন, তৃণহীন, শব্দহীন, উত্তপ্তজ্বলন্ত, নরককুণ্ডতুল্য এই চন্দ্রলোক!

এই জন্য বিজ্ঞানকে কাব্য আঁটিয়া উঠিতে পারে না। কাব্য গড়ে—বিজ্ঞান ভাঙ্গে।”

ধর্ম্ম ও কল্পনা উভয়ের উপরই বিজ্ঞানের এইরূপ জবরদস্তি লক্ষ্য করিয়া টেনিসন্-প্রমুখ কবিগণ কেবল যে তাঁহাদের কাব্যগুলিতে বিজ্ঞানের একটু একটু স্থান করিয়া দিতে লাগিলেন তাহাই নহে * ; ধর্ম্মের সপক্ষ হইয়া বিজ্ঞানরাজের সভায় অর্দ্ধকরুণস্বরে একটু ওকালতিও করিলেন। বিজ্ঞানের সহিত কাব্য ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্যবিধানই ঐ ওকালতির উদ্দেশ্য †। যে কারণেই হউক, কাব্যের ও অন্যান্য সুকুমার কলা-বিদ্যার সহিত বিজ্ঞানের প্রাচীন বিরোধ এখন মন্দীভূত হইয়াছে। এমন কি বিজ্ঞানরাজ্যেও কাব্য ঢুকিয়া পড়িয়াছে। আধুনিক কালের বিজ্ঞানের ব্যাপকতম theoryগুলিতে কাব্যের গন্ধ পাওয়া যায়। কিন্তু ইতিহাস এখনও ঘোরতর সজাগ হইয়া নিজ আধিপত্য রক্ষা করিতেছেন। তিনি বলেন—“আমার অধিকারে কল্পনাকে কিছুতেই আসিতে দিব না। সে কাব্যের উপজীব্য, কাব্যের উপজীব্যই থাকুক। আমার দেবতা ঘটনা। তিনি বড় জেদের দেবতা—আর সকলের সঙ্গে যাহাই হউক, কল্পনার সঙ্গে তাহার সম্মিলন অসম্ভব। কল্পনা চটুল, অসংযত, নিরঙ্কুশ ; ইতিহাসে ত তাহার স্থান নাই-ই, আধুনিক যুগের কাব্যেও তাহার সংযমের একটা ভালরূপ ব্যবস্থা করা দরকার। এখন হইতে কাব্য লিখিতে হইলে ফুট-নোটে, উপক্রমণিকায়, অনুক্রমণিকায় তাম্রশাসন, শিলালিপি, কীললিপির প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।”

ইতিহাসের এই অক্ষুণ্ণ প্রতাপ যে কাব্যক্ষেত্রে অনুভূত হয় নাই ইহা বলা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র

---

* Before the little ducts began
To feed thy bones with lime—
The Two Voices

Still, as while Saturn whirls, his stead-
fast shade
Sleeps on his luminous ring
The Palace of Art

† একটু নমুনা দিতেছি—যথা Tennyson ;—

(1) God is law say the wise ; O soul, and let us rejoice,
For if He thunders by law, the thunder is still His voice.
The Higher Pantheism

(2) Let knowledge grow from more to more,
But more of reverence in us dwell,
That mind and soul according well,
May make one music as before.
In Memorium

(3) I curse not nature, no, nor death.
For nothing is that errs from law.
Ibid

(4) That God, which ever lives and loves,
One God, one law, one element,
And one far off divine event.
In which the whole creation moves.
Ibid

বিজ্ঞানদৈত্যকে সকল পথ ঘেরিয়া থাকিতে দেখিয়াছেন, কিন্তু তিনি চক্ষু টিপিয়া, ফাঁকি দিয়া সে দৈত্যকে একরূপ এড়াইয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইতিহাস-জুজু তাঁহার পক্ষে বিজ্ঞানদৈত্য অপেক্ষা প্রবলতর হইয়াছিল। বিজ্ঞান দৈত্যকে তিনি দেখিয়াছিলেন পথে, আর ইতিহাস-জুজু আসন লইয়াছিল তাঁহার মনের ভিতরে। যে সরিষা দিয়া ভূত তাড়াইতে হইবে, সেই সরিষাই যদি ভূত হয়, তবে উপায় কি? সেইজন্য ইতিহাসের কাছে বঙ্কিমকে পরাজয় মানিতে হইয়াছে।

যখন বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ রচনা করেন, তখন ভাবিয়াছিলেন,—চমৎকার কাব্য লিখিলাম, "গৌড়জন যাহে, আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।" তাঁহার আনন্দমঠে গৌড়জন নিরবধি আনন্দে সুধাপান করিয়াছে ও করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র নিজে ঐতিহাসিক-জুজুর ভয়ে বহুকাল পর্য্যন্ত সোয়াস্তি লাভ করিতে পারেন নাই। "দেবী চৌধুরাণী"র ভূমিকায় তিনি যে কৈফিয়ত দিয়াছেন তাহাই এ বিষয়ে প্রমাণ। ঐ স্থলে তিনি লিখিয়াছেন—

"আনন্দমঠ প্রকাশিত হইলে পর, অনেকে জানিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, ঐ গ্রন্থের কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কিনা। সন্ন্যাসিবিদ্রোহ ঐতিহাসিক ঘটনা বটে, কিন্তু পাঠককে সে কথা জানাইবার বিশেষ প্রয়োজনের অভাব। এই বিবেচনায় আমি সে পরিচয় কিছুতেই দেই নাই। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, সুতরাং ঐতিহাসিকতার ভাণ করি নাই। এক্ষণে দেখিয়া শুনিয়া ইচ্ছা হইয়াছে আনন্দমঠের ভবিষ্যৎ সংস্করণে সন্ন্যাসিবিদ্রোহের কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক পরিচয় দিব।"

আনন্দ মঠের তৃতীয় সংস্করণের শেষভাগে বঙ্কিমচন্দ্র সন্ন্যাসিবিদ্রোহের কিঞ্চিৎ বিবরণ ইংরেজি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পঞ্চম সংস্করণে স্বীয় কল্পনার সন্তান Major Wood এর নাম পরিবর্ত্তন করিয়া Captain Edwards এই ঐতিহাসিক নাম দিয়াছিলেন।

ইহাকেই বলে জুজুর ভয়! Major Wood Captain Edwards হইলেন বটে, কিন্তু আনন্দমঠ ত সন্ন্যাসিবিদ্রোহের ইতিহাস হইল না। উহা পূর্ব্বেও কাব্য—নির্জ্জল, নিছক কাব্য ছিল; ঐরূপ পরিবর্ত্তনের পরও তাহাই রহিল। সন্তান-সম্প্রদায়ের মত রাজনৈতিক সন্ন্যাসী ভারতে কখনও ছিল কি? বঙ্কিমচন্দ্র কতকটা Knights Templars ও কতকটা Robin Hood প্রভৃতি outlaw গণের আদর্শে তাঁহার সন্তানসম্প্রদায় কল্পনা করিয়াছিলেন। কি বেশভূষা, কি কথাবার্ত্তা, কি আদব-কায়দা, কি আশা-আকাঙ্ক্ষা কিছুতেই সত্যানন্দের দলের কেহই ভারতীয় সন্ন্যাসী নহে, অন্ততঃ বঙ্কিমের সময় পর্য্যন্ত ছিল না ইহা নিশ্চিত। অথচ বঙ্কিমের কল্পনাপ্রসূত এই সন্ন্যাসিদলকে কোনও কাব্যামোদীই বিজন্মা বা বিজাতীয় বলিয়া ঘৃণা করে নাই। ইহা কি কবি বঙ্কিমের কম শ্লাঘার বিষয়? ইদানীং বেলুড়মঠে আমরা যে সন্ন্যাসিসম্প্রদায় দেখিতে পাই। কে বলিতে পারে, এইরূপ নিঃস্বার্থ পরহিতব্রত দলবদ্ধ সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের সৃষ্টিবিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ আনন্দমঠের সন্তান সম্প্রদায়ের আদর্শের নিকট ঋণী নহেন? বস্তুতঃ আনন্দমঠের সন্ন্যাসিগণই পঙ্কিল, কণ্টকাকীর্ণ, দুর্গম রাজনীতির পথ পরিত্যাগ করিয়া বেলুড়মঠে আসিয়া নির্ম্মল সেবাধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সন্ন্যাসিবিদ্রোহের বিবরণ অবলম্বনে ঐতিহাসিক নিষ্ঠার সহিত যথোচিত ফুটনোটাদি সহ বিপুলাকার দশখণ্ডে সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিলেও এই গৌরবলাভে অধিকারী হইতেন কি? তবে ইতিহাস-জুজুর ভয়ে কবিত্বের "হ্লাদৈকময়ী অনন্যপরতন্ত্রা" সুকুমারতার মধ্যে নীরস ঐতিহাসিক বিবরণের যৎকিঞ্চিৎ ফোরণ কেন?

ইতিহাস-জুজুর ভয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে কতদূর ভীত ছিলেন, তাহার প্রমাণরূপে আরও দুই একটি কথা এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

"দেবী চৌধুরাণী" রচনার সময় তিনি "গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রচারিত বাঙ্গালার Statistical Account" হইতে ঐতিহাসিক দেবী চৌধুরাণীর বিবরণ পাঠ করিবার জন্য পাঠককে অনুরোধ করিয়া, পুনরপি সতর্ক করিবার জন্য লিখিয়াছেন—"পাঠক মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক আনন্দমঠকে বা দেবী চৌধুরাণীকে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বিবেচনা না করিলে বড় বাধিত হইব।" আবার সীতারাম-রচনার সময়ও লিখিয়াছেন,—"গ্রন্থের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিকতা নহে. যাঁহারা সীতারামের প্রকৃত ইতিহাস জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা West land সাহেবের কৃত যশোহরের বৃত্তান্ত এবং Stewart সাহেবের কৃত বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠ করিবেন।" কিন্তু এত সতর্কতা, এত অযাচিত কৈফিয়ত সত্বেও ঐতিহাসিক বঙ্কিমচন্দ্রকে ছাড়েন নাই। যাঁহারা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-রচিত সীতারামনামক ক্ষুদ্রপুস্তিকা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা আমার কথায় সত্যতা উপলব্ধি করিবেন। যিনি পূর্ব্ব হইতে কৈফিয়ত দিয়া নিজ দুর্ব্বলতা প্রকাশ করেন, তিরস্কারের জন্য তাহার প্রস্তুত থাকা উচিত। বঙ্কিমের ভাগ্যে সেই জন্য কৈফিয়ত সত্বেও তিরস্কারলাভই ঘটিয়াছে। অন্য কোনও ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের এত দুর্ব্বলতা ও এত বিড়ম্বনা লক্ষিত হয় নাই।

তথাকথিত ঐতিহাসিক উপন্যাস-লেখকগণের মধ্যে সার্ ওয়ালটার স্কট্ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হন। কিন্তু তিনিও ঐতিহাসিক সমালোচকের হস্তে কম বিড়ম্বিত হয়েন নাই। আবার যাহারা উপন্যাস দ্বারা ইতিহাসশিক্ষা দিতে চাহেন, তাহারা যাহা লিখেন তাহা ইতিহাসও হয় না উপন্যাসও হয় না। সে যেন দ্বিতীয় Holy Roman Empire (পবিত্র রোমক সাম্রাজ্য) যাহার সম্বন্ধে এক সুরসিক রাজপুরুষ বলিয়াছিলেন "It is neither holy nor Roman, nor an empire". [ইহা পবিত্র ও নহে, রোমকও নহে সাম্রাজ্যও নহে] Becker প্রণীত Gallur ও Charicle এই শ্রেণীর গ্রন্থ।

ঐতিহাসিক কাব্য অর্থাৎ ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে কাব্যে লিখিয়া বাঙ্গালী কবিগণের মধ্যে নবীনচন্দ্র সেন বিড়ম্বিত হইয়াছেন। নবীনচন্দ্র ঢিল খাইলে পাটকেল মারিতে জানিতেন, এবং "আমার জীবনে" অনেককে অন্যায়ভাবেও পাটকেল দ্বারা নির্দ্দয়রূপে প্রহৃত করিয়াছেন। কিন্তু তাহারও মনে ইতিহাস-জুজুর ভয় ছিল। "পলাশীর যুদ্ধে"র ঐতিহাসিক সমালোচনাকারীদিগকে তিনি তেমন ভাবে আক্রমণ করিতে সাহস পান নাই।

রবীন্দ্রনাথ কল্পনার পশরা লইয়া "বৌ ঠাকুরাণীর হাটে" গিয়াছিলেন; তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন, ঐ হাটটি ঐতিহাসিক মগের মুলুকের অন্তর্গত। কাজেই তাঁহারও বিড়ম্বনা কম হয় নাই। পরে তিনি ইতিহাস-জুজুর কাছে ভাল ছেলে হইবার আশায় "ভারত ইতিহাসের ধারা" নামক এক প্রবন্ধ লইয়া তৎসম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার পূর্ব্ব অপরাধ অর্থাৎ কল্পনার প্রাচুর্য্য দর্শনে ইতিহাস-জুজু তাহা বড় প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই। তাহার কম্পিত হস্তের অর্ঘ্য জুজুর পায়ে না পড়ায় রবীন্দ্রনাথ ক্ষুব্ধ হইতে পারেন, বাঙ্গলী কাব্যামোদী তাহাতে দুঃখিত হয় নাই, ইহা আশা করা যাইতে পারে।

আর কত দৃষ্টান্ত দিব? আধুনিক সাহিত্যযুগে ইতিহাসের আধিপত্য এত অধিক হইয়াছে যে, তাহার প্রতাপে সুকুমার-কাব্যকলা একরূপ ম্রিয়মাণা। ইতিহাসের সত্যানুরাগিতার গর্ব্বে ও তাহার প্রমাণের প্রাচুর্য্যে সংবাদপত্রের স্তম্ভ ভারাক্রান্ত। "বার-হাত

শসার তের-হাত বিচি” এতকাল প্রবচনের বিষয় ছিল। এখন ঐতিহাসিকপ্রবন্ধে তাহা সত্যরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শুনিয়াছি—মূল্য দুই আনা ও ফুটনোট চৌদ্দআনা না হইলে, কোনও রচনা ‘ঐতিহাসিক নিবন্ধ’ সংজ্ঞা লাভ করিতে পারে না; তাহা কাব্যের শ্রেণীতে পড়িয়া থাকে, ইতিহাসের শ্রেণীতে প্রমোশন পায় না।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এপর্য্যন্ত খুব অল্পসংখ্যক লোকই ইতিহাসের এই সত্যবাদিতার বড়াইয়ের উপযুক্ত জবাব দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অভিজাত ব্যক্তিবর্গের আভিজাত্য-গৌরব খর্ব্ব করিবার স্পৃহা ইদানীং সকলদেশেও সকলসমাজেই অল্পাধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। কবিগণও এবিষয়ে কম তৎপরে নহেন। Lady Clara Vere de Vere কবিতায় Tennyson লিখিয়াছেন—

Trust me Clara Vere de Vere,
From you blue heavens above us bent
The gardener Adam and his wife
Smile at the claims of long descent.

কিন্তু তিনিও কখন ইতিহাসের কৌলীন্যগর্ব্ব চূর্ণ করিবার স্পৃহা প্রদর্শন করেন নাই। ইতিহাস যখন বলে—“আমি সত্যবাদী, সত্য ভিন্ন মিথ্যার ধার কখনই ধারি না; কল্পনা কাব্যকলার উপজীব্য বলিয়া সে কলঙ্কিনী, আমার সহিত একাসনে বসিবার অযোগ্যা” তখন সেই অন্যায়রূপে অবমানিতা উৎপীড়িতা, কাব্যকলার পক্ষ হইতে কোনও দূতী বলে না—“ইতিহাস শ্যাম তোর কুলের কথা কই।” রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ যে খাতিরটুকু পান নাই, রসলেশবর্জ্জিত ইতিহাস তাহা গায়ের জোরে আদায় করিতেছে। ইহার কারণ কি? কাব্যের পক্ষ মুখে না বলিলেও মনে মনে একথা উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন যে, একালে অস্ত্রবলই প্রধান বল। য়ুরোপের বর্ত্তমান যুদ্ধে তাহা অবিসংবাদিতরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে। কবি গাহিয়াছেন বটে,—

শ্যামের সরল বাঁশের বাঁশি কি গুণ জানে?
যে শুনেছে বাঁশির গান,
হারায়েছে কুল-মান,
যমুনা বহে উজান মোহন বাঁশির গুণে।

কিন্তু শ্যামের মোহন বাঁশি যত গুণই জানুক না কেন, অস্ত্রহিসাবে যে তাহার মূল্য বড় অধিক নয়, তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। কুলমান হরণ করা এক কথা, আর মাথার খুলি পর্য্যন্ত ধূলি করিয়া দেওয়া আর এক কথা। শ্যামের বংশীর সে ক্ষমতা নাই, ঐতিহাসিকের প্রস্তরস্তম্ভের আছে। কিন্তু এমন যে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ, সিজ-গান (Seige Gun)-ওয়ালা জার্ম্মাণি, তাহারও সমুচিত শাসনের ব্যবস্থা হইতেছে, ইতিহাসের বড়াই দমনের কি কোনও ব্যবস্থা হইতে পারে না?

সত্য কেবল ইতিহাসেরই একচেটিয়া পণ্য কি না তাহা পরীক্ষা করিবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ দেখা যাউক, কতদিন যাবৎ ইতিহাস অবিমিশ্র সত্যের আদর করিতে শিখিয়াছেন। যাহারা কৌলীন্যের গর্ব্ব করে, তাহাদের কৌলিন্যের প্রাচীনত্ব সর্ব্বাগ্রে পরীক্ষণীয়। সেই জন্য টেনিসন Lady Clara Vere de Vereকে the gardener Adam and his wifeএর কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। আমাদের পূর্ব্ববঙ্গের একটা প্রবাদে আছে, এক ভুঁইফোড় কোনও মোল্লাকে তাহার সমশ্রেণীর একজন বলিয়াছিল, “এক হাটেই পেঁয়াজ বেচ্‌লাম, সাহেব,মোল্লা হৈলা কবে?” দেখা যা'ক কল্পনাভূষণা কাব্যকলাও ইতিহাসকে ঐরূপ একটা জবাব দিতে পারে কি না?

‘ইতিহাস’—নামটির অর্থ ও ব্যুৎপত্তি কি তাহাই প্রথমে বিবেচ্য। অর্থসম্বন্ধে বৃদ্ধ অমর সিংহ লিখিয়াছেন, “ইতিহাসঃ পুরাবৃত্তম্”। অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বকালে

ঘটিয়াছিল তাহার বিবরণই ইতিহাস। টীকাকারগণ এস্থলে উদাহরণ দিয়াছেন—"ব্যাসাদিপ্রণীতভারতাদি গ্রন্থঃ।" মহাভারতাদি গ্রন্থ যে সর্ব্বাংশে সত্যমূলক নহে, এমন কি, তার মূল বিবরণ যে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ, তাহাও নাকি রূপকমাত্র—এসব কথা আধুনিক কালের ঐতিহাসিকেরাই বলিতেছেন। এখন ইতিহাস-নামের ব্যুৎপত্তি দেখা যা'ক। সংস্কৃত ভাষায় ইতিহ একটি অব্যয় তাহার অর্থ পারম্পর্য্যোপদেশ *। ভানুজি দীক্ষিত বলিতেছেন—ইতিহ শব্দের অর্থ "ইতি এবং হ কিল" অর্থাৎ এইরূপই প্রবাদ বটে। ইতিহ যাহাতে আছে তাহাই ইতিহাস। † এখানেও দেখা যাইতেছে ইতিহাসে ও প্রবাদে প্রভেদ নাই বলিলেও চলে। সেকালের পণ্ডিতগণের প্রদত্ত অর্থে বা ব্যুৎপত্তিতে যাঁহারা আস্থাবান্ নহেন তাহাদের তৃপ্তির জন্য বলিতে হইতেছে যে, পণ্ডিতপ্রবর Monier Williamsও ইতিহাস অর্থে মুখ্যভাবে প্রবাদই বুঝিয়াছেন। ‡ ইতিহাস হয়ত বলিবেন, এদেশের নেটিভদের চিরকালই পুরাবৃত্তসম্বন্ধিনী ধারণা অতি সঙ্কীর্ণ রকমের। যাহারা নিজেরা মিথ্যাবাদী ও অতিরঞ্জন-প্রিয়, তাহারা আমার মর্য্যাদা কিরূপে বুঝিবে? এতদিনে এদেশের সাহিত্য-পরিষদ্-গুলির একটু সুবুদ্ধি হইয়াছে—তাহারা এখন তাম্রশাসন ও শিলালিপি প্রভৃতিকেই যথার্থ সাহিত্য বলিয়া বুঝিতে পারিয়া কাব্যকলাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার উদ্যোগ করিতেছে। ইহাই ত ঠিক। এখন ইংরেজি History কথাটার একটা নূতন পারিভাষিক বাঙ্গলা শব্দ হওয়া দরকার। আমার ইচ্ছা হয় বাঙ্গালা ভাষায় history অর্থে 'ইতিহাস' শব্দের পরিবর্ত্তে অবিকল ঐ ইংরেজী শব্দটা ব্যবহার করিলেই ভাল হয়। তবে একটা ভয় এই—এদেশের বর্ব্বরেরা হিষ্টিরিয়া ব্যারামের সহিত historyর একটা গোল করিয়া না ফেলে।

এদেশের বর্ব্বরেরা যাহাই করুক, বিলাতের সভ্য লোকেরাও history শব্দ হইতেই story শব্দের সৃষ্টি করিয়াছিল। বোধ হয় তাহারা history ও storyতে সেকালে বড় বিশেষ প্রভেদ দেখিতে পায় নাই। ইংরেজি history শব্দ গ্রীক historia শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন। ঐ শব্দটির অর্থ গবেষণা। প্রাচীন গ্রীকভাষায় historia শব্দ ঠিক পুরাবৃত্ত অর্থে ব্যবহৃত হইত না। উহা বিদ্যা বা অনুসন্ধিৎসা বুঝাইত। প্রাচীন ঘটনার বিবরণ অর্থে historia শব্দের প্রয়োগ কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী যুগের গ্রীকভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেই প্রাচীন বিবরণগুলি যে সর্ব্বত্র সুপরীক্ষিত সত্যের আলোকে আলোকিত নহে তদ্বিষয়ে প্রমাণ যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে।

History শব্দের প্রাচীন অর্থ যাহাই হউক, জগতের সকল জাতিরই প্রাচীন ইতিবৃত্ত কতকগুলি প্রবাদের সমষ্টিমাত্র তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অবশ্য এই প্রবাদগুলিতে যে কিছুমাত্র সত্য নিহিত নাই তাহা বলা যায় না; কিন্তু সেই সত্যের সহিত কল্পনা এত অধিক পরিমাণে মিশ্রিত যে অনেকসময়েই উহা বিশ্লেষণ করিয়া খাটি সত্যাংশটুকু নির্ণয় করা দুরূহ হয়। অসভ্য সমাজে ইতিহাস কিরূপে গঠিত ও রক্ষিত হয় তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ Dr. Edward B. Tylor প্রণীত

* পারম্পর্য্যোপদেশে স্যাৎ ঐতিহ্যম্ ইতিহাব্যয়ম্। ইত্যমরঃ।

† ইতিহেতি পারম্পর্য্যোপদেশেঽব্যয়ম। তদাস্তে অস্মিন্। আস উপবেশনে। হলশ্চেতি ঘঞ্। ভানুজিদীক্ষিতের অমরটিকা।

‡ ইতিহাস—(ইতি-হ-আস, so indeed it was) talk, legend, tradition, history, traditional accounty of former events, heroic history, as the Mahabharata--M. W's Dictionary.

Anthropology নামক পুস্তকে বর্ণিত আছে। তিনি সভ্য অসভ্য কোনও সমাজেরই প্রাচীন প্রবাদগুলি একেবারে অসত্যমূলক বলিয়া পরিত্যাগ করিতে চাহেন না। তিনি বলেন—ইতিহাসের দৌড় কত দূর? মোল্লার দৌড় যেমন মস্‌জিদ্‌ পর্য্যন্ত, ইতিহাস সংজ্ঞায় অভিহিত প্রাচীন গ্রন্থসমূহেরও দৌড়ও সমসাময়িক কালের ঘটনা বা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ প্রাচীন কালের ঘটনা পর্য্যন্ত। "History is no longer looked to for a record of the earliest ages of man. we moderns know what was hidden from the ancients themselves about the still more ancient nations *" অতি প্রাচীন কালের ঘটনার বিবরণ হইলেই তাহাতে সত্যের সহিত কল্পনার মিশ্রণ থাকিবেই। Tylor কয়েকটি আধুনিক অসভ্যজাতির প্রবাদে the wildest wonder tales অর্থাৎ অতি উৎকট বিস্ময়োদ্দীপক গল্পের মধ্যেও কিরূপে যথার্থ ঐতিহাসিক সত্য প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে তৎসম্বন্ধে কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছেন, "These traditions of a modern barbarous people may give us not an unfair idea of the mixture of real memory and mythic fancy in the early histoty of Egypt or Greece, where it has come down by tradition from the distant past when there was as yet no scribe to engrave on a stone tablet even the names of kings"

Dr. Tylor যাহাকে স্মৃতিও কল্পনার মিশ্রণ (real meneory and mystic fancy) বলিয়াছেন, উহাই ইতিহ। ঐরূপ ইতিহ হইতেই ইতিহাসের উৎপত্তি। টাইলার কেবল প্রবাদের মধ্যেই ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই, তাহার মতে কবির কল্পনায়ও ইতিহাসের উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। নিতান্ত কল্পিত জাতিবিশেষ, দেশবিশেষ, বা জনপদবিশেষের বর্ণনা উপলক্ষেও কবি অজ্ঞাতসারে তাঁহার সমসাময়িক জগতের ও সমাজের চিত্র আঁকিয়া যান। ওডিসাস্‌ যেখানে সুবৃহৎ একটি মেষের উদরে আপনাকে সুগুপ্ত করিয়া পলায়নের ব্যবস্থা করিতেছেন, সেখানে কোনও ঐতিহাসিক সত্য না থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহার পাতালপুরীতে ভ্রমণের বিবরণে অন্ততঃ হোমরের সমসাময়িক গ্রীকসমাজে পরলোকে বিশ্বাসের এবং তাহাদের পারলৌকিক জীবনসম্বন্ধিনী ধারণায় ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে। ঐরূপে আমরাও বলিতে পারি, বাল্মীকি-প্রণীত রাম-রাবণের যুদ্ধ অনেকাংশেই অতিরঞ্জিত, এমন কি, সর্ব্বাংশে মিথ্যা হইলেও, তাহাতে বাল্মীকির সমসাময়িক আর্য্য ও নানা অনার্য্য অর্থাৎ দ্রাবিড়ীয় জাতির দৈনন্দিন জীবন, সভ্যতা, ও সামাজিক অবস্থার যথার্থ ঐতিহাসিক চিত্র পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক রামায়ণ-মহাভারতকে ইতিহাস বলিয়া স্বীকার করিতে রাজি না হইলেও, anthropologist (মানব-তত্ত্ববিৎ) তাহাকে এক অর্থে যথার্থ ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিবেন। আবার যাহাকে ভুলেও কেহ ইতিহাস সংজ্ঞা দেয় নাই, সেই যে জগতের প্রাচীনতম সাহিত্যগ্রন্থ বেদ, তাহার ভিতরেও কি যথার্থ ইতিহাস নাই? যাঁহারা অন্ততঃ Dr. J. Muir প্রণীত Original Sanskrit Texts on the Origin and History of the people of India, their Religion and Institutions নামক সুবিখ্যাত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ড (Vol. V) দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, বেদ ইতিহাস না হইলেও তাহাতে ভারতীয় আর্য্যগণের দৈনন্দিন জীবনের— তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসের ও ধর্ম্মচর্য্যার, তাহাদের রীতি-নীতির, তাহাদের ঘরবাড়ী ও বেশভূষার, তাহাদের

* Anthropology by Dr. Ed. B. Tylor chap XV.

খাদ্য ও পানীয়ের, তাহাদের ব্যবসায় ও বাণিজ্যের তাহাদের আমোদ-প্রমোদের, তাহাদের সামাজিক ও নৈতিক অপরাধের, তাহাদের যুদ্ধ-বিগ্রহ, অস্ত্রশস্ত্র, যান-বাহন সেনা ও রণসজ্জাদির বিবরণ, এমনকি সেই প্রাচীনযুগের কয়েকটি সুবিখ্যাত নরপতি ও তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিগণের নাম পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। স্থলে স্থলে অবশ্য অতিরঞ্জিত বর্ণনাও যথেষ্ট আছে; কিন্তু তত্তৎস্থলেও ঐতিহাসিক উপকরণের অভাব নাই। যেখানে বৈদিক ঋষি বরুণ সম্বন্ধে বলিতেছেন—

বৃহন্তং মানং বরুণ স্বধাবঃ সহস্রদ্বারং জগমা গৃহংতে ঋগেদ ৭।৮৮।৫) অর্থাৎ "হে অন্নবান্ বরুণ! তোমার মহান্ ভুতগণের বিচ্ছেদকারী সহস্রদ্বার বিশিষ্ট গৃহে গমন করিব। কিংবা,

রাজানা অনভিদ্রুহা ধ্রুবে সদসি উত্তমে সহস্রস্থূণে আসতে (ঋ ২।৪১।৫) অর্থাৎ শত্রুতাশূন্য রাজা মিত্রাবরুণ স্থির, উৎকৃষ্ট, সহস্র স্তম্ভবিশিষ্ট (এই) স্থানে উপবেশন করুন * সেস্থলে একথা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যাইতে পারে যে, উহা ঋষিগণের দৃষ্ট কোনও প্রকৃত রাজ-প্রাসাদের অতিরঞ্জিত বর্ণনা। এইরূপে যখন আরএক স্থলে ঋষি বলিতেছেন—

শতম অশ্মন্ময়ীনাং পুরামিন্দ্রোব্যাস্যৎ দিবোদাসায় দাশুষে (ঋ ৪।৩০।২০)অর্থাৎ ইন্দ্র হব্যদাতা দিবোদাসকে (শম্বরের) শতসংখ্যক পাষাণনির্ম্মিত পুরী প্রদান করিয়াছিলেন *

সেস্থলেও ইন্দ্র দিবোদাসকে অনুগ্রহ করিবার জন্য ১০০ প্রস্তরনির্ম্মিত পুরী দান করুন আর নাই করুন তখনও যে প্রস্তরনির্ম্মিত পুরী ছিল তাহা অনুমান করিতে বাধা নাই। যেস্থলে লৌহ নির্ম্মিত পুর বা দুর্গের বর্ণনা আছে, সেখানে অন্ততঃ ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে, বৈদিকযুগে দুর্গও ছিল, তাহা লৌহবৃতি দ্বারা বেষ্টিত না হউক, মৃণ্ময় বা দারুময় দেওয়ালে বেষ্টিত হওয়া অসম্ভব নহে।

আমরা দেখিলাম উৎকট কল্পনায় মসগুল্ বলিয়া যে কাব্য, কথাসাহিত্য, প্রবাদপ্রভৃতি আধুনিক কালের শিলালিপি, কীললিপি, প্রস্তরস্তম্ভ ও তাম্রশাসন-সর্ব্বস্ব ইতিহাসের চক্ষে অনাদরণীয়, তাহাদেরও ঐতিহাসিক মূল্য অল্প নহে। বুঝিলাম উপন্যাসও গল্পের হিসাবে সত্য না হউক, ভাবের হিসাবে সত্য বটে। আরও বুঝিলাম কাব্য ও কথাসাহিত্য অবস্থা বিশেষে ইতিহাসপর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়ে। এখন দেখিব যথার্থ ইতিহাস বলিয়া পরিচিত কত গ্রন্থ কল্পনায় ভরপুর, এমন কি দুই-এক স্থলে তাহা উপন্যাস অপেক্ষাও উদ্ভট।

প্রথমতঃ ঐতিহাসিক কুলের আদিপুরুষ বৃদ্ধ হিরোডোটাসের কথা ধরা যাউক। Robert Flint তদীয় Historical Philosophy in France and French Belgium and Switzerland নামক গ্রন্থে তাঁহাকে "the father of history" বলিয়া স্বীকার করিতে সঙ্কোচবোধ করেন নাই *। হিরোডো-টাসের সবিশেষ পরিচয় বর্ত্তমান সভায় দেওয়া নিতান্তই অনাবশ্যক। খৃষ্টের জন্মের ৪৮৪ বৎসর পুর্ব্বে এশিয়া মাইনরে তাঁহার জন্ম হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া তিনি গ্রীস ও ইরান দেশের মধ্যে

* রমেশচন্দ্র দত্তকৃত অনুবাদ

* The comprehensiveness of research, the combined ingenuity and naturalness of arrangement, the merits and charm of style, and the general originality of conception and execution, displayed by Herodotus, well entitled him to be called "the father of History"—Robert Flint's Historical Philosophy in France etc. Introduction p 51.

দীর্ঘকালস্থায়ী বিরোধের ইতিবৃত্ত রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া তাহার উপাদানসংগ্রহের জন্য বিশেষ আয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি নানাদেশ ও জনপদ পরিভ্রমণ করিয়া তদীয় ইতিহাসের উপকরণসংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার অধ্যবসায় অসাধারণ ছিল। এরূপ অবস্থায় তাঁহার নিকট হইতে আমরা যাহা পাইব বলিয়া আশা করিতে পারি, তাহা অবশ্যই সুপরীক্ষিত সত্য হইবেই। কিন্তু দেখা যা'ক্ আমরা প্রকৃত পক্ষে তাঁহার নিকট হইতে কি পাইয়াছি। Cannon Rowlinson Encyclopaedia Britannicaয় Herodotus নামক প্রবন্ধে লিখিতেছেন *:—

The most important quality of a historian is his trustworthiness; for a professed history is of no value unless we can place reliance upon its truth. It has been questioned both in ancient and in modern times, whether the history of Herodotus possesses this essential requisite. Several ancient writers call his veracity in question, accusing him of the crime of conscious and intentional untruthfulness. Moderns generally acquit him of this charge; but his severer critics still urge that, from the inherent defects of his character, his credulity, his love of effect, and his loose and inaccurate habits of thought, he was unfitted for the historian's office, and has produced a work of but small historical value. দেখা যাইতেছে, ইতিহাসের যিনি পিতা তাঁহারও কোনও কালেই সত্যবাদিতার প্রতিষ্ঠা ছিল না। কয়েকজন প্রাচীনলেখকের মতে তিনি জ্ঞাতসারে ইচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যাবিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আধুনিক লেখকগণ তৎপ্রদত্ত বিবরণের মিথ্যাত্ব অস্বীকার করেন না, তবে তাঁহারা বলেন তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা কথা লিখেন নাই, তবে কিনা তাঁহার রুচি, প্রবৃত্তি, ও মানসিক ক্ষমতার কথা বিবেচনা করিলে বলিতে ইচ্ছা হয়, তাহার পক্ষে ইতিহাস রচনা করিতে না যাওয়াই উচিত ছিল।

* Ninth Edition Vol. XI, p 758.

এইস্থলে কেহ হয়ত বলিতে পারেন, Herodotus এর মাতৃভাষা ও পিতৃকুল উভয়ই গ্রীক হইলেও, তিনি এসিয়াটিক। তাহার শিক্ষা দীক্ষা রুচি প্রবৃত্তিতে এশিয়াবাসীর মজ্জাগত দোষ যে অতিরঞ্জনপ্রিয়তা ও মিথ্যাবাদিতাপ্রভৃতি, তাহাত থাকিবেই। তিনি ভারতবাসীর পক্ষে পাশ্চাত্য হইতে পারেন, কিন্তু য়ুরোপীয় সভ্যসম্প্রদায়ের পক্ষে ঘোরতর প্রাচ্য। প্রাচ্য বলিয়াই—এসিয়ার নেটিভ বলিয়াই—তাঁহার ইতিহাসে সত্য ও মিথ্যার—fact ও fiction এর—খিচুরী দেখিতে পাওয়া যায়। • এসিয়া ছাড়িয়া য়ুরোপের পুণ্যভূমিতে এস, সেখানে ইতিহাসের ভিন্ন আদর্শ দেখিতে পাইবে। সেখানে পদে পদে সত্যবাদিতার প্রমাণ, পত্রে পত্রে অধ্যায় ও শ্লোক সংখ্যার উল্লেখ, ছত্রে ছত্রে তারাচিহ্ন, তরবারি চিহ্ন, ডবল-তরবারি চিহ্ন দেখিবে। ইহাই ত ইতিহাস; আর সব কাব্য।

আসুন তবে কালাপানি পার হইয়া খাঁটি যবন দেশেই পদার্পণ করা যা'ক; পরে না হয় যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করা যাইবে। এখানে কি দেখিতে পাইতেছি? ঐ যে ঐতিহাসিক কুলচূড়া Thucydides (থুসিডাইডিস্) স্বীয় যশঃ প্রভায় সর্ব্বদেশীয় ও সর্ব্বকালীন ঐতিহাসিকসম্প্রদায়কে মলিন করিয়া বসিয়া আছেন, আসুন তদীয় হস্তস্থিত পিলপনীশিয়ান যুদ্ধের ইতিহাসখানির দুই একটি পাতা উল্টাইয়া দেখি। উঁহার নাম সম্ভবতঃ আপনাদের সকলেরই বিদিত

অধ্যাপক যেব (Jebb) * বলিয়াছেন, Thucydides was the greatest historian of antiquity, and, if not the greatest that ever lived, as some have deemed him, at least the historian whose work is the most wonderful, when it is viewed relatevely to the age in which he did it. অপর একজন লেখক † বলিয়াছেন "As the famous statue of Polycletus, called the Doryphorus, represented the proportions of the human body in such complete beauty that it was regarded by the ancient artists as a canon of the rules on this point, so the history of the Peloponnesian war may serve, as its author seemed to know it would, as a model which all may copy but none may equal. কথিত আছে, এই আদর্শ ইতিহাসখানি লিখিবার পূর্ব্বে থুসিডাইডিস হিরোডোটাসের গ্রন্থ পড়িয়া লইয়াছিলেন, এবং তাহার দোষ-গুণ সকলই ভালরূপে বুঝিয়া লইয়াছিলেন। তিনি সত্য ও মিথ্যা, facts ও fiction, history ও story, legend ও fable এ গোল করেন নাই। কিন্তু এমন যে আদর্শ ইতিহাসখানি তাহাতেও দেখিতে পাই গ্রন্থকার নানা ব্যক্তির মুখে অনেক কল্পিত বক্তৃতা, কথোপকথন বসাইয়া দিয়াছেন। দুই একস্থলে কোনও বক্তার বক্তৃতার সারমর্ম্ম তিনি যাহা লোকমুখে শুনিয়াছিলেন তাহাই পল্লবিত করিয়া লিখিয়াছেন; অনেক স্থলেই তত্তৎ অবস্থায় তত্তৎ ব্যক্তিগণের যাহা বলা বা মনে করা সম্ভব বলিয়া তিনি নিজে বিবেচনা করিয়াছিলেন, তাহাই তাহাদের মুখে বক্তৃতাকারে দিয়াছেন। এরূপ করিবার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে; সে কালে ওরূপ কল্পিত বক্তৃতা না দিলে লোকে নাকি কাব্য ফেলিয়া ইতিহাস পড়িতে রাজি হইত না। সুতরাং এ অংশে থুসিডাইডিস ঐতিহাসিকের "সত্যপথ" ত্যাগ করিয়া কাব্যের অনুসরণে কল্পনাকে আশ্রয় করিয়াছেন। থুসিডাইডিসের গ্রন্থের কল্পিত বক্তৃতাগুলিই উক্ত পুস্তকের শ্রেষ্ঠ অংশ। ঐ কল্পনা তাঁহাকে সত্যকে উজ্জ্বলতররূপে লোকসমক্ষে উপস্থাপিত করিবার সাহায্য করিয়াছে। উহা গ্রন্থ হইতে বাদ দিলে, গ্রন্থের সৌন্দর্য্য, এমন কি তাহার যথার্থ ইতিহাসরূপে মর্য্যাদাও ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে।

হিরোডোটাসের গ্রন্থেও ঐরূপ প্রচুর কাল্পনিক বক্তৃতা ও কথোপকথন দৃষ্ট হয়। থুসিডাইডিস হিরোডোটাসের গ্রন্থ পড়িয়া নাকি হংসের ন্যায় জলত্যাগ করিয়া দুগ্ধাংশই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহা যদি সত্য হয়, তবে কাল্পনিক বক্তৃতাও কথোপকথনের সমাবেশ তিনি হিরোডোটাস হইতে অন্ধভাবে অনুকরণ করেন নাই বলিতে হইবে। তিনি উহাতে কোনও দোষও হয় না ভাবিয়াই উহা অনুকরণ করিয়াছিলেন।

থুসিডাইডিসের পরে পলিবিয়াস (Polybius) স্যালাষ্ট (Sallust) ও টেসিটাস (Tacitus) প্রভৃতি বহু প্রাচীন ঐতিহাসিক ঐরূপ কল্পিত বক্তৃতাদির সাহায্যে নিজ নিজ ইতিহাসের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। বাইজেনটাইন (Byzantine) ঐতিহাসিকগণ কেবল অলঙ্কারের অনুরোধেই কাল্পনিক বক্তৃতার সমাবেশ করিয়াছেন। অধ্যাপক জেব (Jebb) বলেন, "ঐ সকল গ্রন্থকারকর্ত্তৃক লিখিত ইতিহাসে The speeches were usually mere occasions for rhetorical display." পরবর্ত্তীকালে Macchiavelli ও Grotius ঐ পথ অনুসরণ করিয়াছেন; এমন কি, উনবিংশ শতাব্দী

* Dr. R. C. Jebb, Prof of Greek, University of Glasgow. *Vide* his article on Thucydides in the Encyclopaedia Britannica. Ninth Edition Vol. XXIII. p. 322.

† J. Cotter Morrison. *Ibid* Vol. XII p. 20

তেও ইতালীর ঐতিহাসিক Botta তৎপ্রণীত "১৭৮০ হইতে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইটালির ইতিহাসে" কাল্পনিক বক্তৃতা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

লর্ড বেকন আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিকী গবেষণায় নূতনপথ প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া সর্ব্বত্র সম্মানিত হয়েন। প্রাকৃতিক কোনও নিয়ম সত্য বলিয়া মানিয়া লইবার পূর্ব্বে, যে সকল ঘটনা অবলম্বনে ঐ নিয়মের সত্তা কল্পনা করা হয়, তৎসমুদয় যে বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিয়া লওয়া আবশ্যক, তৎসম্বন্ধে তিনি পুনঃ পুনঃ নানাভাবে উপদেশ দিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে তাঁহার সে উপদেশ সুফলপ্রসব করিয়াছে। কিন্তু ইতিহাস প্রণয়নের সময় তিনি কি করিয়াছেন? আপনারা হয়ত সকলেই জানেন বেকন ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম হেনরীর রাজত্বকালের একখানি ইতিহাসও রচনা করিয়াছিলেন। ঐ ইতিহাসে তিনিও স্বকপোলকল্পিত বক্তৃতা সন্নিবেশ করিয়াছেন।

মেকলে ঐ রীতির কিঞ্চিৎ তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি স্বাভাবিক অত্যুক্তির সহিত বলিয়াছেন যে, আধুনিককালে কেহ ঐরূপ নিন্দনীয়প্রথা অবলম্বন করিয়া ইতিহাসে কল্পিত বাক্যালাপের বা বক্তৃতার সন্নিবেশ করিলে সে যে উপহাস ও ঘৃণার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। অথচ আমরা দেখিয়াছি মেকিয়াভেলি, গ্রোসিয়াস্, বেকন ও বটার ন্যায় লেখকও ঐ প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। বটা উনবিংশ শতাব্দীর লোক, তিনি যে ঐতিহাসিক সমাজে উপহাসিত হইয়াছেন তাহা নহে। তাঁহারও সমর্থনকারী সমালোচকের অভাব নাই। বেকনের জীবনীলেখক ও গ্রন্থাদির অক্লিষ্টকর্ম্মা সম্পাদক Mr. Spedding বেকনের জীবনের অন্যান্য কার্য্যের ন্যায় তাহার ইতিহাসরচনার প্রণালীরও সমর্থ করিয়াছেন, এবং অন্য সকল বিষয়ে না হউক, ইতিহাস রচনার প্রণালীসম্বন্ধে তাহার যুক্তি সুধীমণ্ডলীতে আদৃত হইয়াছে। যাঁহার এ বিষয়ে কৌতূহল আছে, তিনি স্পেডিং-সম্পাদিত বেকনের গ্রন্থাবলীর ষষ্ঠ ভাগ ৭৫ পৃষ্ঠার পাদটীকা দেখিবেন।

কথা এই—যৎকিঞ্চিৎ কল্পনার সাহায্যে যদি ইতিহাসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় প্রতিপাদিত করায় সাহায্য হয়, তবে তৎস্থলে প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ কিঞ্চিৎ কল্পনার সাহায্যগ্রহণ নিন্দনীয় মনে করিতেন না। আধুনিক কালের ইতিহাস কল্পনাকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিতে পারেন, কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, প্রাচীনকাল হইতে সত্যের ন্যায় কল্পনাও আংশিকরূপে ইতিহাসের উপজীব্য ছিল। এবং সেইজন্যই সে সকল ইতিহাস শিল্পসৌন্দর্য্যে এত সুন্দর। "হঠাৎ-বাবুর" যেরূপ বাবুগিরির বাড়াবাড়ি হয়, নব্য কুলীনের যেরূপ কৌলীন্য মর্য্যাদার প্রতি অস্বাভাবিক রকমের পক্ষপাত দৃষ্ট হয়, নবযুগের ইতিহাসের সেইরূপ উৎকট সত্যানুরাগের ফলে কেবল ইতিহাসেই প্রমাণপ্রয়োগের বাড়াবাড়ি, ফুটনোটের ছড়াছড়ি হয় নাই, এখনকার ঐতিহাসিক সমালোচকগণ কাব্যে ও উপন্যাসেও পদে পদে ঐতিহাসিক প্রমাণ চান। এতৎসম্বন্ধে অগাষ্ট কোম্‌তে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলেরই প্রণিধানযোগ্য। অগাষ্ট কোমতের মতে ইতিহাসের বর্ণনীয় বিষয়সমূহের মধ্যে সেইগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা গরিষ্ঠ, যাহা সুবিদিত বলিয়া পদে পদে সূক্ষ্মতম প্রমাণপ্রয়োগের অপেক্ষা রাখে না। কেবল দলিল-পত্রের দিক্ দিয়া নহে, সমাজ ও নীতিবিজ্ঞানের দিক্ দিয়াও ইতিহাসের মূল্য অল্প নহে। কতকগুলি প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারিলেই ইতিহাসের কর্ত্তব্য শেষ হইল না। ঐতিহাসিককে এক-একটা যুগের সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ এক-একটি চিত্র অঙ্কিত করিতে হইবে। তাহা ত কেবল পর্ব্বতপ্রমাণ দলিলপত্রের উপর নির্ভর করে না। ঐতিহাসিকের কল্পনাকুশলতা, শিল্পজ্ঞান ও কবি-

জনোচিত সহৃদয়তা না থাকিলে যথার্থ ইতিহাস লিখিত হইতে পারে না। প্রাচীন ঐতিহাসিকগণের ঐ গুণ যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। আধুনিক কালের ঐতিহাসিকগণ প্রমাণ লইয়াই ব্যস্ত; তাহারা কেবল বহন করিতে জানেন, আস্বাদ করিতে জানেন না। প্রাচীনকালের ঐতিহাসিকগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে ভুল করিয়াও মোটের উপরে যে বস্তু নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা অনবদ্য। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ বিপুল শ্রম সহকারে স্থলে স্থলে তাহাদের ভ্রমসমূহ প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারাও বৃহৎ বৃহৎ বিষয়ে এবং অনেক স্থলে ক্ষুদ্র বিষয়েও প্রাচীন লেখকগণের বিবরণ সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। এরূপ অবস্থায় কাব্য ও কল্পনাকে অবমাননার চক্ষে দেখিয়া ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে নিজ মর্য্যাদা বৃদ্ধি করেন না, তাহা খর্ব্বই করিয়া থাকেন। কল্পনা চটুলা বটে, কিন্তু সে চটুলত্বেরও উপকারিতা ও সাহিত্যে উপযোগিতা আছে। আধুনিক কালের সুবিপুল ফুটনোট-রূপ শ্রীপদরোগগ্রস্ত ইতিহাসের পক্ষে তাহাকে ঘৃণা না করিয়া বরং ঈর্ষ্যা করাই অধিক স্বাভাবিক। কে জানে ঐতিহাসিকের ঘৃণা প্রকৃত পক্ষে ঈর্ষ্যামূলক নহে?

অধিকন্তু আধুনিক ইতিহাসে যে সত্যতার প্রমাণের উৎকট আধিক্য লক্ষিত হয়, তাহার প্রকৃত মূল্য কত টুকু? এতৎসম্বন্ধে স্পেডিং যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্ম্ম কতকটা এইরূপ:—প্রাচীনকালের বিবরণ কুত্রাপি সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ নহে, কাজেই সেকালের বিবরণ দিতে হইলে, সবিশেষ শ্রম ও অধ্যবসায় সত্ত্বেও ঐতিহাসিককে অনেক স্থলেই অনুমান ও কিংবদন্তীপ্রভৃতির উপর নির্ভর করিতে হইবেই। তিনি নিজে অনুমান করিতে পারেন, অথবা অপরের অনুমান গ্রহণ করিতে পারেন; কিন্তু অনুমান ব্যতীত অধিকাংশস্থলেই "নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে-ঽয়নায়।" প্রাচীন লেখকগণ পদে পদে পরের অনুমান প্রমাণরূপে উল্লেখ করিবার কষ্ট স্বীকার করেন নাই, নিজের অনুমানকে সাহিত্যোচিত শিল্পসৌন্দর্য্যে ভূষিত করিয়া পাঠকের চক্ষের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন। তাহাতে পাঠকের মন মুগ্ধ হয়, অথচ সে সর্ব্বদাই কল্পনাকে কল্পনা বলিয়াই বুঝিতে পারে। আধুনিক কালের ইতিহাসের চিত্তরঞ্জন-ক্ষমতা ত নাই-ই; বরং তাহাতে ফুটনোটের প্রাচুর্য্যে অনুমান-মাত্রকে প্রকৃত ঘটনা বলিয়া ভ্রম করিবার সম্ভাবনা আছে। প্রাচীন ইতিহাসে আমরা পাই জীবন্ত মূর্ত্তি; আধুনিককালে রচিত ইতিহাসে পাই—কঙ্কাল।

কথিত আছে, লর্ড চ্যাথামকে একবার একব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি কোন গ্রন্থ হইতে ইংলণ্ডের ইতিহাস শিক্ষা করেন?" লর্ড চ্যাথাম উত্তর দিয়াছিলেন—"সেক্ষপীয়রের নাটকাবলী হইতে।" আপনারা সকলেই জানেন সেক্ষপীয়রের ঐতিহাসিক নাটকসমূহ ইতিহাস নহে—কাব্য। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় ইতিহাস-জুজুকে ভয় করিতে শিখিলে, হয়ত প্রত্যেকখানি নাটকের প্রারম্ভে সুদীর্ঘ ভূমিকার অবতারণা করিয়া বলিতেন, "দোহাই ঐতিহাসিকের এ ইতিহাস নহে। যে ইতিহাস জানিতে চাও, সে অমুক অমুক পুথি পড়িতে পার। আমি একটু সখে পড়িয়া কাব্যং করোমি নচ চারুতরং করোমি।" অথচ এমন কোন্ ব্যক্তি কোথায় আছেন যিনি সাহস করিয়া বলিতে পারেন, লর্ড চ্যাথাম ইংলণ্ডের ইতিহাস যথার্থ-রূপে আয়ত্ত করেন নাই?

আরও একটি কথা এস্থলে উল্লেখ করা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইতিহাস যাঁহারা লেখেন তাঁহারা সকলেই মানুষ। তাহাদের অনেকেরই দেশ বিশেষ, ধর্ম্মবিশেষ বা রাজনৈতিক মতবিশেষের প্রতি অনুরাগ বা আসক্তি থাকাই সম্ভব। এবং অনেকেই হয়ত ঐরূপ অনুরাগ বা আসক্তিবশে ইতিহাসরচনায় প্রবৃত্ত হন। লোকে যাহা বিশ্বাস

করিতে ভালবাসে, সচরাচর তাহাই বিশ্বাস করে। সেইজন্যই পক্ষপাতশূন্য ইতিহাস জগতে কদাচিৎ রচিত হইতে পারে। Livy, Tacitus স্বদেশের প্রতি গাঢ় অনুরক্তি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া ইতিহাস রচনা করেন। রোমান যুবকগণকে স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। লিভি গবেষণার ধার ধারেন নাই, অল্প প্রমাণেই সন্তুষ্ট ছিলেন। তাহার সংগৃহীত বিবরণ তাহার উদ্দেশ্যের অনুকূল হইলেই তিনি আর অধিক অনুসন্ধানের আবশ্যকতা অনুভব করেন নাই। তৎপরবর্ত্তী কালের খ্রীষ্টান ঐতিহাসিকগণ অনেকেই খৃষ্টধর্ম্মের গৌরব ও তাহার প্রচারের আনুকূল্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইতিহাস লিখিয়াছেন। য়ুসিবিয়াসকে (Eusebius) কখনও কখনও the father of Church History কখনও বা the Christain Herodotus বলা হয়। তৎসম্বন্ধে Flint বলিয়াছেন, "তিনি সৎলোক হইলেও নিরপেক্ষ ছিলেন না। তিনি সত্য অপেক্ষা খৃষ্টধর্ম্মকে গরীয়ান্ মনে করিতেন; এবং ধর্ম্মটাকেও বৈষয়িকদৃষ্টিতে দেখিতেন।" * বীডের (Bede বা Baeda) সত্যানুরাগ ঐতিহাসিক সমাজে খুব প্রশংসিত হইয়াছে। অথচ তিনিও ধর্ম্মবিশ্বাসে এতদূর অন্ধ ছিলেন যে, কখনও কোনও অতিপ্রাকৃত ঘটনা অবিশ্বাস করেন নাই। তিনি উহা সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন এবং নিজ সত্যবাদিতার প্রমাণ স্বরূপ কাহার মুখে কোন ঘটনার বিবরণ পাইয়াছেন তাহা উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। এই সঙ্গে জার্ম্মানির দুইজন সুবিখ্যাত প্রাচীন ঐতিহাসিকের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইঁহাদের নাম ল্যাম্বার্ট (Lambert of Hersfeld) ও আদম (Adam of Bremen) উভয়েই খ্রীষ্টান ধর্ম্মযাজক। আদমের জার্ম্মানি, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া ও রুসিয়ার ইতিহাসে সত্যের সহিত প্রচুর মিথ্যার মিশ্রণ আছে। ল্যাম্বার্টের পোপ ও সীজারের মধ্যে প্রতিযোগিতার ইতিহাস কোনও কোনও ঐতিহাসিক প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞগণের মতে ল্যাম্বার্ট পোপের প্রতি অনুচিত পক্ষপাতিতা দোষে দুষ্ট। মধ্যযুগের ঐতিহাসিকগণ প্রায় সকলেই ধর্ম্মান্ধতা, ও অনেক স্থলেই বর্ণনীয় বিষয় সম্বন্ধে অজ্ঞতা নিবন্ধন, যথার্থ ঐতিহাসিক নামের অযোগ্য। এতৎসম্বন্ধে Flint এর উক্তি উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

Ignorant of his ignorance, ignorant of what knowledge was, he (the medieval historian) readily accepted fictions as facts, and believed as unquestionable a crowd of legends regarding Greece and Rome, and even the states that had risen on the ruins of Rome, which made everything like a correct notion of the course of human development impossible. Imbued with the spirit of his age, he looked at all events through an ecclesiastical and dogmatic medium which effectually precluded him from fairly estimating secular, and still more, heathen life.

Crusade বা ক্রুশের যুদ্ধ যাহা মধ্যযুগের খ্রীষ্টানগণের ইতিহাসে ধর্ম্মযুদ্ধ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, মুসলমান ঐতিহাসিকগণের এবং পরবর্ত্তী কোনও কোনও খৃষ্টান ঐতিহাসিকের প্রদত্ত বিবরণে তাহা বীভৎস পৈশাচিক কাণ্ডরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এরূপ পক্ষপতিতা-কেবল ধর্ম্মের ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ নহে। নেপোলিয়নিক যুদ্ধসমূহের ইতিহাস ফরাসি ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থে একরূপ, ইংরেজ ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থে অন্যরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। গত কয়েক বৎসর যাবৎ য়ুরোপেৰে

* Flint's History of Philosophy in France etc. Introduction p. 63.

অভূতপূর্ব্ব লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইতেছে তাহার বিবরণ যে বিবদমান পক্ষদ্বয় কর্তৃক নিজ নিজ দেশে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রকাশিত হইতেছে তাহা সকলেরই বিদিত। ঐসকল বিবরণ হইতেই পরে ইতিহাস গঠিত হইবে। ঐতিহাসিকগণ হয়ত যথেষ্ট ফুটনোট দিয়া নিজ নিজ ইতিহাস অলঙ্কৃত করিবেন। কেন যুদ্ধ ঘটিল, এবিষয়ে কাহার দায়িত্ব অধিক, কে কখন কি বলিল, কোনদিন কোন সরকারি বা বেসরকারী বিবরণে কোন কথা কি ভাবে প্রকাশিত হইল, ।কোন জাহাজ কি ভাবে জলমগ্ন হইল, কোন যুদ্ধে কোন পক্ষের কত লোক হত আহত হইল। ইত্যাদি কথা প্রচুর গবেষণা সহকারে আলোচিত এখনও হইতেছে, এর পরে পরে আরও হইবে। কিন্তু এখন যেমন কোনও পক্ষের লোকই সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিতেছে না, পরেও যে পারিবে তাহাতে বিশ্বাস করিবার কি হেতু আছে? জার্ম্মাণ ঐতিহাসিকগণ কি এই যুদ্ধ তাহাদের স্বজাতির হঠকারিতা ও রণোন্মাদের ফল বলিয়া কখনও স্বীকার করিবে? তাহারা এখনও বলিতেছে, পরেও নিশ্চয়ই বলিবে যে এযুদ্ধ জার্ম্মাণির পক্ষে আত্মরক্ষার যুদ্ধ; এবং তাহাদের উক্তি আমাদের পক্ষের প্রদত্ত বিবরণের সহিত তুলনা করিয়া যতই আমরা তাহা বাতুলের উক্তি বলিয়া মনে করি না কেন, জার্ম্মাণগণ যে তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ফল কথা এই যে, লোকে যাহা বিশ্বাস করিতে ভালবাসে তাহাই বিশ্বাস করে; এবং তদনুকূল প্রমাণ পাইলে তাহাতেই সন্তুষ্ট হয়। এইরূপেই জগতের প্রায় সকল ইতিহাস লিখিত হইতেছে।

ইতিহাস কি ভাবে লিখিত হওয়া উচিত তদ্বিষয়েও নানা মতভেদ আছে। লর্ড বেকন বলিয়াছেন, ঘটনাসমূহ ও তৎসংক্রান্ত যাবতীয় পরামর্শ যথাযথ ভাবে বর্ণন করিয়া যাওয়াই ইতিহাসের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। ঐতিহাসিক তাহা হইতে স্বয়ং কোনও সিদ্ধান্তনির্ণয়ের চেষ্টা * না করিয়া তাহা পাঠকের স্বাধীন বুদ্ধি ও প্রতিভার উপর ফেলিয়া রাখিবেন। * কিন্তু ঘটনাসমূহের যথাযথ বিবরণ প্রদান কিরূপ কঠিন; মানুষের নিজ রুচি, প্রবৃত্তি মতবিশেষের প্রতি অনুরাগ, স্বদেশপ্রেম, বা স্বজাতিপ্রীতি অনেক সময় সত্যকে মানুষের চক্ষে বিকৃত আকারে উপস্থিত করে। আবার লেখক মাত্রেই যে নিজ নিজ মত ও সিদ্ধান্ত একেবারে গোপন করিয়া যাইবেন ইহা আশা করা যায় না। বরঞ্চ এইরূপ গোপনের ফলে পাঠকের পক্ষে সত্য নির্ণয়ে বাধা উপস্থিত হইতে পারে। লেখকের নিজ মতজানা থাকিলে পাঠক তাহার প্রদত্ত বিবরণ গ্রহণ করিবার সময় সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারে। অন্যথা পক্ষপাতপূর্ণ বিবরণ পক্ষপাত শূন্যরূপে গৃহীত হওয়ায় আশঙ্কা আছে। সার জেমস ম্যাকিণ্টস্ † বেকনের মতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, ইতিহাস রোষাদি চণ্ড ভাব হইতে মুক্ত হইবে বটে, কিন্তু তাহা যদি একবার ভাবলেশশূন্য হয়, তবে তাহা চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিবেনা; এবং এইরূপে তাহা সমাজের কোনও উপকারে লাগিবেনা।

* "It is the true office of history to represent the events themselves, togetherswith with the counsels; and to leave the observations and conclusions thereupon to the liberty and faculty of every man's judgment". Advancement of Learning.

† "History ought to be without passion; r, but if it be without feeling, it loses the interest which bestows on it the power of being useful. The narrative of human actions would be thrown aside as a mere catalogue of names and dates if it did not maintain its

sway by inspiring the reader with pity for the sufferer, with anger against the oppressor with .earnest desirer for the triumph of right over might".

ঐতিহাসিক বিবরণ যদি নিপীড়িতের প্রতি সহানুভূতি, উৎপীড়কের বিরুদ্ধে ক্রোধ এবং বলবানের উপর ন্যায় ও ধর্ম্মের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত দেখিবার বাসনা উদ্রেক করিয়া পাঠকের চিত্তে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে, তবে মানুষের কার্য্যাবলীর তাদৃশ ভাবশূন্য বিবরণ লোকে নাম ও তারিখের ক্যাটলগ মাত্র মনে করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিবে। কিন্তু এস্থলে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে ঐতিহাসিকের নিজের সহানুভূতি যেদিকে, সেই দিকেই অবশ্য তিনি পাঠকের সহানুভূতি উদ্রেক করিবার চেষ্টা করিবেন কিন্তু তাহার সহানুভূতি যে পক্ষপাত প্রণোদিত হইবে না, তদ্বিষয়ে নিশ্চায়ক হেতু কি আছে? আমাদের পক্ষের ঐতিহাসিকগণ বিংশ-শতাব্দীর মহাসমরের ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া বেলজিয়মের প্রতি অসভ্যোচিত অত্যাচারের জন্য জার্ম্মাণদিগের বিরুদ্ধে সভ্য-জগতের প্রত্যেক জীবের ক্রোধ ও ঘৃণা উদ্রেক করিবার অবশ্যই চেষ্টা করিবেন এবং করাও উচিত; না করিলে অন্ততঃ ম্যাকিণ্টসের মতে সে ইতিহাস ইতিহাসই হইবে না। কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে জার্ম্মাণগণ এক্ষণে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডকে জার্ম্মাণির অসাধারণ উন্নতির প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত ও ঐ উন্নতির খর্ব্বতা বিধানে সচেষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া বেলজিয়মকে তাহাদের সাহায্যকারী "ভিজা বিড়াল" রূপে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছে, এবং সম্ভবতঃ ভবিষ্যতের জার্ম্মাণ ঐতিহাসিকগণও তাহাই করিবে; এবং স্বীয় পাঠকবর্গকে বেলজিয়মের প্রতি ঘৃণান্বিত ও ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে উৎকট দোষ পোষণ করিতে উৎসাহান্বিত করিবে। তখন কি সে ইতিহাস ইতিহাস বলিয়া জার্ম্মাণ দেশে আদৃত হইবে না? অবশ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রজাই ইহা ন্যায়রূপ আশা করিতে পারে যে, জার্ম্মাণির বর্ত্তমান শাসকগণ সভ্য-সমাজে চিরদিনের জন্য ঘৃণাস্পদ হইয়া থাকুক, এবং যুদ্ধান্তে জার্ম্মাণ দেশবাসিগণও প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করিয়া তাহাদের নিজ শাসন-কর্ত্তৃগণের উপর ঘৃণা পোষণ করিতে শিখুক, তাহা হইলেই বর্ত্তমান শতাব্দীর যুদ্ধের যথার্থ ইতিহাস লিখিত হইতে পারিবে। কিন্তু এরূপ ঘটনা সচরাচর হয়না। স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি ভালবাসা মানুষের চিত্তে এতদূর দৃঢ়মূল যে, তাহা সহজে উৎপাটিত হয়না; তাহা নিজের পরিপোষকতার জন্য সত্যকেও বিকৃত করিয়া লইতে কুণ্ঠা বোধ করেনা। সেইজন্যই ইতিহাসে পক্ষপাতশূন্য সত্যের স্থান এত অল্প।

অধিকন্তু, সার্ জেমস্ ম্যাকিণ্টস যাহা ইতিহাসের লক্ষ্য হওয়া উচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সংস্কৃত ভাষায় আলঙ্কারিকগণ প্রকারান্তরে তাহা কাব্যের অন্যতম উদ্দেশ্য বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। আবার কার্লাইল সম্বন্ধে তদীয় ভক্ত সুবিখ্যাত এমার্শন লিখিয়াছেন "He says it is part of his creed that history is poetry could we tell it aright," অর্থাৎ কার্লাইলের মতে, লিখিতে জানিলে ইতিহাসও কাব্য হইয়া দাঁড়ায়। দেখা যাইতেছে, কার্লাইলের মতে ইতিহাস যে অংশে যতদূর কাব্যের অনুরূপ তাহা সেই অংশে ততদূর চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত বলিয়া মনে করিতে হইবে। এমন অবস্থায় কি কাব্য ইতিহাসকে বলিতে পারেনা, "ভাই, তোমার এত বড়াই কিসের? তোমার উপজীব্য না হয় কতকগুলি যথার্থ ঘটনা, আর আমার উপজীব্য কল্পনা। কিন্তু কল্পনা তোমার সাহায্য না করিলে তুমিও যে অচল পঙ্গু হইয়া পড় তাহা ত অস্বীকার করিতে পার না। সত্য তোমার একচেটিয়া পণ্য নহে; বিজ্ঞান, দর্শন, কাব্য সকলেরই সত্য লইয়া সকলের কারবার। কেবল পুরাতন পুথির পাতা উল্টাইলেই ও প্রস্তর গাত্রে বা তাম্রপত্রে উৎকীর্ণ প্রাচীন

লিপির পাঠোদ্ধার করিতে পারিলেই সার সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় না ; কতিপয় ব্যক্তির মতামত উদ্ধার করা হয় মাত্র। সত্যদর্শন করিতে হইলে পুথি, প্রস্তর স্তম্ভ, তাম্রশাসন ছাড়া আরও কিছু চাই। প্রাচীন আর্য্যগণ তাহাকে ঋষির আখ্যা দিয়াদিলেন। সাধারণ বৈজ্ঞানিক কেবল পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা লইয়া ব্যস্ত এবং তাহাতেই মনে করে যে তাহার তুল্য কেহ নাই। নিউটন বা গ্যালিলি কেবল পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা সত্য আবিষ্কার করেন নাই, অসাধারণ কল্পনা-শক্তিবলে সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহারা শুধু বৈজ্ঞানিক নহেন, ঋষি। কবিগণও কল্পনা-বলে সাধারণের অজ্ঞাত ও অগম্য সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন বলিয়া তাঁহারা ঋষি পদবী বাচ্য। বেদের কবিগণকে কখনও কবি বলা হয়না, তাঁহারা ঋষি। যত কবি কল্পনা বলে, ঋষিত্ব বলে, তোমার সেবকগণকে কতবার সত্যপথ আবিষ্কারে সাহায্য করিয়াছেন, তাহা তোমার স্মরণ থাকা উচিত। আমি একথা বলিতে চাইনা, কাব্যলেখক মাত্রেই সত্যবাদী, ঐতিহাসিক মাত্রেই সত্যবাদী নহে। অথচ সত্যই কাব্য ও ইতিহাস উভয়েরই প্রাণ। এস আমরা উভয়েই প্রাচীন কবির ভাষায় প্রার্থনা করি—

"অসতো মা সৎ গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মাঽমৃতংগময়।"

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত কবিরত্ন।

অভয়।

বিপদ সাগর গর্জ্জে যদি ভয় করোনা মন,
অগস্ত্য যে আসছে পথে দম্ভ কতক্ষণ।
রাজার চেয়ে নই ত কমি, গরব কিসের তার,
ফকির চেয়ে নই যে বড় কিসের অহঙ্কার।
জীবন আমার অফুরন্ত অন্ত কোথা তায়,
সাক্ষেব সেত উল্লেদন্ন এই মিলিয়ে যায়।
বেশী নহে কম্‌তি নহে নিক্তি ধরে দান
দারুণ ভগবান সে যে গো করুণ ভগবান।

২

ভয় ও আছে ভরসা আছে, আছে বুকের বল
কাঁটাভরা মৃণাল আছে সোণার শতদল।
শিশুপালে বধ করে সে, রাখালে দেয় কোল
ইঙ্গিতে সে ধরার দোলায় কদম্বে খায় দোল।
'বলীর' মাথায় দেয় সে পদ, 'ভৃগুর' পদে বুক,
ভয়কে করে অভয় সে যে দুখকে করে সুখ,
আছে পাঞ্চজন্য ধ্বনি, আছে বাঁশীর গান
দারুণ ভগবান সে যে গো করুণ ভগবান।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

ইউরোপে খৃষ্টধর্ম্ম।

যিশু খৃষ্টের আবির্ভাবকালে ইউরোপ এবং পশ্চিম এসিয়ার সমগ্র সভ্যভূমি, মিশরদেশ ও পশ্চিম আফ্রিকা রোমক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। সে সময় রোমক সাম্রাজ্যবাসীরা ঘোর দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইয়াছিল। দীর্ঘকালব্যাপী নৃশংস ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সবে মাত্র শেষ হইয়াছিল, নীতিহীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতা তাহাদিগকে পীড়িত করিতেছিল। রোমকদিগকে সম্বোধন করিয়া সেণ্টপল একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, এই পত্রে তৎকালের দুর্দ্দশার চিত্র উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। আদিযুগের রোমক প্রজাতন্ত্রমূলক সরলতা, উদারতা এবং সাধুতার পরিবর্ত্তে প্রচণ্ড নীতি-হীনতা ও অস্বাভাবিক পাপ-প্রবণতা সম্পদের মোহ-কর আবরণে উপস্থিত হইয়া রোমক সাম্রাজ্যবাসী-দিগকে আবিষ্ট করিয়াছিল। সক্রেটিস স্বদেশের কল্পিত দেবদেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাস জ্ঞাপন অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃকল্প করিয়াছিলেন। আমাদের বর্ণিত সময়ে গ্রীসের ও রোমের অসংখ্য নরনারী তাঁহার

ন্যায়ই বিশ্বাসহীন হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সক্রেটিসের ন্যায় নীতিবান্, স্পষ্টবাদী ও অকুতোভয় ছিলেন না, এজন্য তাঁহাদের ধন প্রাণ রক্ষা পাইত। সিসেরু নিজে যে সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হইতেন, তৎসমুদয় লক্ষ্য করিয়াই আবার বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিতেন। কবি লুক্রেটিয়াস লিখিয়াছেন, ভেনাস ও মারস শূন্যতামাত্র, কবির কল্পনা তাঁহাদের নামও বাসস্থান সৃষ্টি করিয়াছে। রোমকদের ধর্ম্মবিশ্বাস এইরূপে শিথিল হইয়াছিল, ইহার ফলে গার্হস্থ্য সুখ-শান্তি অন্তর্হিত হইয়াছিল।

আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন,—রোমক সাম্রাজ্যে চিরদাসত্বজনিতবৈষম্য সাংঘাতিক রোগস্বরূপ প্রবেশ করিয়াছিল। এক এক ব্যক্তির সহস্র সহস্র চিরদাস থাকিত। প্রভুর অকরণীয় সমস্ত সেই সকল দাসের দ্বারা হইত। ভূমিকর্ষণ, গার্হস্থ্য-ভৃত্যের কার্য্য, শিল্পকার্য্যাদি চিরদাসগণের দ্বারা নির্ব্বাহ হইত। তাহারা গোরু বাছুরের ন্যায় ক্রীত বিক্রীত হইত; গোরু বাছুরের প্রতি প্রভুর যে অধিকার, দাসের উপরেও সেরূপ অধিকার ছিল। প্রভু মারিলে মারিতে পারিতেন; কাটিলে কাটিতে পারিতেন; বধ করিলেও দণ্ডনীয় হইতেন না। প্রভুর আজ্ঞায় দাস রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইয়া সিংহ ব্যাঘ্রাদি পশুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ হারাইত, প্রভু তামাসা দেখিতেন। রোমক সাম্রাজ্যের লোক দুইভাগে বিভক্ত, প্রভু এবং দাস। একভাগ অনন্ত ভোগাসক্ত, আর এক ভাগ অনন্ত দুর্দ্দশাপন্ন। কেবল এই বৈষম্য নহে। সম্রাট স্বেচ্ছাচারী। তাঁহার ক্ষমতা ও প্রতাপের সীমা ছিল না। নীরো নগরে অগ্নি লাগাইয়া বীণাবাদন পূর্ব্বক রঙ্গ দেখিয়া ছিলেন। আবার সেই সম্রাটের উপর প্রেটরীয় সৈনিক। তাহারা যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে রাজা করে। রোমক সাম্রাজ্য তাহারা আলু পটলের মত ক্রয়-বিক্রয় করে। রোমকে তাহারা যাহা মনে করে, তাহাই করে। সুবায় সুবায় সুবাদারেরা স্বেচ্ছাচারী। যাহার শক্তি আছে, সেই স্বেচ্ছাচারী। যেখানে স্বেচ্ছাচার প্রবল, সেখানে বৈষম্যও প্রবল।" *

রোমক সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজিত, বৈদেশিক শত্রু পরাজিত, দস্যুতস্কর নির্জ্জিত. কিন্তু চতুর্দ্দিকে নাস্তিকতা ও পাপের প্রভাব বর্দ্ধমান। এরূপ সময়ে যীশুখৃষ্ট মানবজাতির পরিত্রাতারূপে প্রকট হন। যিশুখৃষ্টের আবির্ভাবের প্রাক্কালে জেরুজালেমের মেষ-চারকদের নিকট দৈববাণী হইয়াছিল, স্বর্গে পরমেশ্বরের জয় বিঘোষিত হউক, মর্ত্ত্যে শান্তি ও প্রেম প্রতিষ্ঠিত হউক।

যিশুখৃষ্ট খৃষ্টধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, পিটার, জন ও পল তাহার প্রচারকর্ত্তা। ইঁহাদের সকলেরই ধর্ম্মমত এক এবং অভিন্ন, সে মত পরমেশ্বরে ভক্তি এবং মনুষ্যে প্রেম শিক্ষা দিতেছে।

পিটার, জন এবং পল খৃষ্ট জগতের ত্রিমূর্ত্তি, ইঁহারা খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রচার জন্য প্রাণপাত করিয়াছিলেন। পিটার যিশুর সহচর ছিলেন। যিশুর তিরোভাবের পর তিনি খৃষ্টধর্ম্মের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। রাজদূতেরা যিশুকে প্রথমতঃ কারাগারে, তারপর মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ জন্য ধৃত করিলে, পিটার সুদৃঢ় বাক্যে তাঁহার সহগামী থাকিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করেন। কিন্তু যিশু বলেন, হে পিটার, দুইবার কুক্কুট ডাকিবার পূর্ব্বে তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার করিবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল। ঈদৃশ দুর্ব্বলচিত্ত ও অস্থিরমতি ব্যক্তি খৃষ্টধর্ম্মের নেতৃত্ব গ্রহণের অনুপযুক্ত ছিলেন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু তিনি তাদৃশ দুর্ব্বলতা ও অস্থিরতা প্রদর্শন করিলেও খৃষ্টধর্ম্মের প্রচার কল্পে নেতৃত্ব করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত পাত্র ছিলেন। যিশু বলিয়াছেন, তুমি পিটার এবং এই প্রস্তরের উপর আমি আমার ধর্ম্মমন্দির গঠন করিব।

* সাম্য।

পিটারের পর জনের নাম উল্লেখ করা আবশ্যক। জন মানব-প্রেমের উপাসক ছিলেন। তিনি অক্লান্ত ভাবে সর্ব্বক্ষণ মানবপ্রেমের ঘোষণা করিতেন। তিনি বলিতেন, যদি কেহ বলে, আমি ঈশ্বরকে ভালবাসি, কিন্তু মনুষ্যের প্রতি তাহার ঘৃণা দেখা যায়, তবে সে ব্যক্তি তাহার ভ্রাতাকে দেখিয়াও তাহাকে ভালবাসিতে অসমর্থ, সে কিরূপে তাহার নিকট অদৃশ্য ঈশ্বরকে ভালবাসিবে? এবং ঈশ্বরের নিকট হইতে আমরা এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি যে, যে পরমেশ্বরকে ভালবাসে, সে তাহার ভ্রাতাকেও ভালবাসে।

পিটারের অক্লান্ত পরিশ্রম ক্ষমতার অভাব ছিল, জন বার্দ্ধক্যবশতঃ শক্তিহীন হইয়াছিলেন, একারণ রোমক সাম্রাজ্যের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তনের জন্য আর একখানি শাণিত অস্ত্রের প্রয়োজন হয়। এই অস্ত্ররূপে পল কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করেন। তাঁহার সর্ব্বকার্য্যে ব্যাকুল আগ্রহ এবং প্রবল উৎসাহ ছিল। অক্লান্ত শ্রমশক্তি, সরল আন্তরিকতা, অজেয় বাগ্মীতা, এবং জ্বলন্ত বিশ্বাস তাঁহাকে কর্ম্মক্ষেত্রে সিদ্ধিদান করিত। পল প্রথম জীবনে খৃষ্টানদিগকে উৎপীড়িত করিয়াছিলেন, তারপর নিজে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন, এবং আত্মোৎসর্গ করিয়া তৎপ্রচার জন্য ব্রতী হন। যিশু অন্তিমকালে যে সকল জাতির নিকট ধর্ম্ম-প্রচার জন্য শিষ্যবৃন্দের প্রতি আদেশ প্রচার করেন. তাঁহাদের মধ্যে সিদ্ধিলাভের মূলে পলের অসাধারণ ক্ষমতা ও যোগ্যতা বিদ্যমান ছিল।

ইউফ্রেটিস হইতে আইওনান সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ধন-ধান্য পূর্ণ দেশ পলের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র ছিল। তিনি এই দেশের উর্ব্বর ভূমিতে যে ধর্ম্মবীজ বপন করেন, তাহা তদীয় শিষ্যগণের যত্নে অঙ্কুরিত হইয়া উঠে; খৃষ্টীয় প্রথম দুইশত বৎসর এই দেশেই অধিকাংশ খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীর বাস ছিল। আলেক্জেণ্ড্রিয়ার বিপুল বাণিজ্য এবং প্যালেষ্টাইনের সান্নিধ্যবশতঃ খৃষ্টধর্ম্ম সহজে তথায় প্রবিষ্ট হইতে পারে। ইউরোপ, পশ্চিম এসিয়া, পশ্চিম আফ্রিকা ও মিশরদেশের কেন্দ্রস্বরূপ রোমের বিস্তৃত বক্ষে সর্ব্বদা অপরিচিত বৈদেশিক এবং প্রাদেশিকদের সমাগম হইত। যাহা কিছু অপরিচিত অথবা অবজ্ঞেয়, যে কেহ অপরাধী অথবা সন্দেহযুক্ত,—তৎসমস্তই ব্যবস্থাপকদের অজ্ঞাতসারে রোমের বিপুল প্রবাহে মিশিতে পারিত। পৃথিবীর সকলজাতির, সকল মতের সম্মিলনস্থল রোমনগরীতে প্রত্যেক শিক্ষক, তাঁহার শিক্ষা সত্যমূলক অথবা মিথ্যা-গ্রথিত হউক, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহার আশ্রম পুণ্যক্ষেত্র অথবা পাপের আশ্রয়স্থল হউক,—সকলেই শিষ্য অথবা সহচরের সংখ্যা বর্দ্ধিত করিতে পারিত। এইরূপ উর্ব্বর-ক্ষেত্রে স্বভাবতঃই খৃষ্টপ্রচারকদিগকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। সম্রাট নিরোর সময় রোমের খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার একবিংশ অংশ অর্থাৎ পঞ্চাশসহস্র দাঁড়াইয়াছিল। রোম হইতে পশ্চিমদেশীয় প্রাদেশিক-গণ খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কেবল রোমক সাম্রাজ্যেই খৃষ্টধর্ম্ম আবদ্ধ হয় নাই। খৃষ্টের তিরোভাবের একশত বৎসরের মধ্যে তদীয় ধর্ম্মের মহিমা পৃথিবীর সর্ব্বত্র নিঘোষিত হইয়াছিল।

একদিকে ধর্ম্ম ও নীতি হইতে বিচ্যুত হইয়া ভূতলে অতুল রোমক সাম্রাজ্য অধঃপতিত হইতে ছিল এবং বর্ব্বরগণ তাহার রত্ন-খনি লুণ্ঠন মানসে অস্ত্র শাণিত করিতেছিল, অন্যদিকে একটি বিশুদ্ধ ও দীন-ধর্ম্ম লোকের মনে নূতনবিধ আধিপত্য স্থাপন করিতে ছিল, রাজহস্তে নির্য্যাতিত হইয়া নূতনবিধ শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল। এবং অবশেষে রোমনগরীর ভগ্নাবশেষের উপর নূতনবিধ বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তারপর কতকাল, কতযুগ, কত শতাব্দী অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, অদ্যাপি সমগ্র ইউরোপ সে ধর্ম্ম বাহ্যতঃ স্বীকার করিতেছে। এবং দূর হইতে

সুদূর আমেরিকা, আফ্রিকা ও এসিয়ায় প্রচার কল্পে অসাধারণ কর্ম্ম-নিষ্ঠার পরিচয় দিতেছে।

ঐতিহাসিক-কুল-তিলক গিবনের মতে যে সকল কারণে খৃষ্টধর্ম্মের পথ পরিষ্কৃত হয়, তাহা লিপিবদ্ধ হইতেছে ; (১) খৃষ্টধর্ম্মের বিশুদ্ধতা এবং পূর্ব্বাগত বদ্ধমূল মতবাদের সামঞ্জস্য ও পারলৌকিক পুরস্কার লাভের আশা, (২) খৃষ্টিয় ধর্ম্মপ্রচারকগণের অলৌকিক ক্ষমতায় জন-সাধারণের বিশ্বাস, (৩) খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার জন্য গণতন্ত্র ধর্ম্মমণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা এবং তাহার বাধ্যতা, স্বাতন্ত্র্য ও একতা (৪) খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদের বিশুদ্ধ নৈতিক জীবন এবং (৫) ধর্ম্ম-প্রচারকদের প্রাণ-গত উৎকট সাধনা। এই সকল কারণ মিলিত হইয়া খৃষ্টধর্ম্মের গতি অপ্রতিহত করিয়াছিল। আর একটি কারণে খৃষ্টধর্ম্ম একেবারে অজেয় হইয়া উঠে। রোমক রাজশক্তি ভ্রান্তির বশবর্ত্তী হইয়া খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগকে উৎপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হয়। সে অমানুষিক উৎপীড়নের প্রচণ্ড তেজে শত শত নরনারীর সুখশান্তি ভস্মীভূত হইয়া যায়। সুখশান্তি অন্তর্হিত হইয়াছিল, কিন্তু সে নিপীড়ন, সে অত্যাচার তাঁহাদের মনের তেজ ও ধর্ম্মবল ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই ; বরং প্রবল বাধাপ্রাপ্ত হইয়া খৃষ্টবিশ্বাসীকুল আরো সতেজ, আরো দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, আরো অদম্য হইয়া উঠেন। খৃষ্টধর্ম্মের ইতিহাস পুনঃ পুনঃ এই সাক্ষ্য দিতেছে যে, ধর্ম্ম, ন্যায় ও স্বাধীনতার গতি স্রোতস্বতীর মত, উহা গন্তব্যপথে বাধা প্রাপ্ত হইলে কুলপ্লাবিনী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে ; সে স্রোত সমস্ত পার্থিব শক্তি তৃণখণ্ডের মত ভাসাইয়া লইয়া যায় এবং তাহার দুই পার্শ্বদেশ শ্যামল ও কোমল করিয়া তুলে।

তীক্ষ্ণদর্শী গিবন আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন যে, খৃষ্টধর্ম্মের বিশুদ্ধ নীতি ও পবিত্রতা এবং খৃষ্টবিশ্বাসীদের নির্ম্মল চরিত্রের বিষয় বিচার করিলে স্বভাবতঃই এরূপ আশা জন্মে যে, খৃষ্টধর্ম্মে আস্থাবান না হইয়াও সভ্য ও ভব্য রোমকগণ তৎপ্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রদ্ধার পরিবর্ত্তে ঘোর বিদ্বেষ উদ্রিক্ত হয়। লোক-বিদ্বেষের সহিত রাজরোষ মিলিত হওয়াতে খৃষ্টবিশ্বাসীরা নির্ম্মম হস্তে পিষ্ট হইতেন।

খ্যাতনামা দার্শনিক লেখক লেকী প্রণীত History of Europian Morals নামক গ্রন্থের একস্থানে খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে জন-মত প্রতিকূল হইবার যে কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এখানে তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইতেছে। রোমকদের মধ্যে কোন দুর্ঘটনা উপস্থিত হইলে, তাহা ধর্ম্মানুষ্ঠানের ত্রুটীর ফল বলিয়া বিবেচিত হইত, কারণ তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, ধর্ম্মানুষ্ঠানের তাদৃশ ত্রুটী দেবরোষ উদ্দীপিত করিয়া তোলে। একবার রোমকগণ আপদ-পাতে পীড়িত হইয়া ছিল এবং দুইজন কুমারী দেবদাসীর ব্যভিচার তাহার কারণ বিবেচনা করিয়া তাহাদের প্রাণান্ত করিয়াছিল।

খৃষ্টানেরা দেবদেবীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিত ; এইজন্য তাহাদের অবজ্ঞার ফল স্বরূপ দেবরোষ রোম সাম্রাজ্যের সমস্ত আপদের মূল বলিয়া বিবেচিত হইত। ঐতিহাসিক টির্ টুল্লিয়ান লিখিয়াছেন, যদি টাইবার নদী স্ফীত হইয়া রোমনগরীর প্রাচীর মূলে প্রবাহিত হইত, যদি নীল নদ শস্য ক্ষেত্র প্লাবিত না করিত, যদি আকাশ হইতে বৃষ্টিধারা পতিত না হইত, যদি ভূমি কম্পিত হইত, যদি লোকপীড়া অথবা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইত, তাহা হইলেই রোমকগণ চীৎকার করিয়া বলিত, খৃষ্টানদিগকে সিংহ মুখে নিক্ষেপ কর।

ফলতঃ রোমকদের কুসংস্কার খৃষ্টান বিদ্বেষের কারণ ছিল। খৃষ্টানদের দুর্নীতি সম্বন্ধীয় জনরব এই বিদ্বেষের মাত্রা বর্দ্ধিত করিয়াছিল। খৃষ্টধর্ম্মের চিরশত্রু ইহুদীরা সে ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে লোক-চক্ষে হেয় করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে সুকৌশলে ঐ সকল জনরবের সৃষ্টি করিত। রোমকদের বিশ্বাস ছিল যে, খৃষ্টানেরা দুগ্ধপোষ্য শিশুর রক্তপান করিয়া পিপাসা নিবারণ করে, নরমাংস আহার করিয়া উদর পূর্ত্তি করে এবং ভগিনীও

কন্যাদির পবিত্রতা নষ্ট করিয়া কামবৃত্তি চরিতার্থ করে।

এই সকল কারণে রোমক সাম্রাজ্যের জনপুঞ্জ খৃষ্টানদের বিদ্বেষ্টা হইয়াছিল; কিন্তু রাজরোষ অন্যকারণে উদ্দীপিত হয়। বিশাল রোমক সাম্রাজ্য-ভুক্ত জনপুঞ্জের কোন অংশ যদি আপনাদের গৃহীত ব্রত উদ্‌যাপন উদ্দেশ্যে সংহত হইত এবং সর্ব্বপ্রকার আড়ম্বর ও ভোগলালসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তদর্থে জীবন উৎসৃষ্ট করিত, তবে সে দল যতঃ ক্ষুদ্র হউক, তাঁহাদের উদ্দেশ্য যতই মহৎ ও নির্দ্দোষ হউক, শাসক সম্প্রদায় তাঁহাদের সংহতি ও আত্মত্যাগের মূলীভূত অন্তর্নিহিত তেজস্বিতা দেখিয়া ভীত হইয়া পড়িতেন এবং তাঁহাদের নির্য্যাতন জন্য সদসৎ জ্ঞানশূন্য হইতেন। প্রাথমিক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা আপনাদিগকে রোমক সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সমস্ত জাতীয়-উৎসব হইতে দূরে থাকা আবশ্যক বোধ করিতেন। তাঁহারা জাতীয় বিজয়োৎসব-কালে ফুলমালায় গৃহ সজ্জিত এবং দীপমালায় গৃহ আলোকিত করিতে বিরত থাকিতেন। তাঁহাদের ঈদৃশ ব্যবহারের ফলে রাজ-পুরুষগণের সন্দেহ উদ্রিক্ত হয়। এতৎ সম্বন্ধে পণ্ডিত প্রবর গিবন লিখিয়াছেন "ইহা সর্ব্বজন বিদিত যে, রোমক রাষ্ট্রনীতির বশবর্ত্তী হইয়া শাসকগণ প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে মণ্ডলীর গঠন সাতিশয় ঈর্ষ্যা ও সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। (এমন কি বাণিজ্য ইত্যাদি সম্পর্কীয়) সমিতির গঠন জন্য স্বত্বও অধিকার ও সহজে প্রদত্ত হইত না। খৃষ্টানদের ধর্ম্ম-মণ্ডলী জনসাধারণ-সুলভ পূজা অর্চ্চনা হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে তাঁহাদের নির্দ্দোষিতা অতি সামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। খৃষ্ট মণ্ডলীর মূল-সূত্র শাসনবিধি বিরুদ্ধ ছিল, কার্য্যকালে খৃষ্টানেরা বিপজ্জনক হইতে পারিত। সাধারণের শান্তিরক্ষার্থ খৃষ্টানদের গুপ্ত, কখন কখন নৈশ অধিবেশন রাজার আদেশে বন্ধ হইত। কিন্তু সম্রাট এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়াও তাঁহারা যে আইনের লঙ্ঘনকারী ছিলেন, সেরূপ সিদ্ধান্ত জ্ঞানতঃ করিতে পারিতেন না। খৃষ্টানদের ধর্ম্মমূলক স্বাতন্ত্র্য-জনিত ব্যবহার এবং সম্ভবতঃ তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাতিশয় গুরুতর এবং দোষাবহ রূপে প্রতীত হইত।" ফলতঃ রোমক শাসকবৃন্দ খৃষ্টানদের ধর্ম্মান্তর এবং দেবদেবীর প্রতি অবজ্ঞা অপরাধ রূপে গণ্য করেন নাই, কিন্তু তাঁহারা রাজ-প্রতিকূল ভাব পোষণ করেন বিবেচনাতেই সমস্ত রোষ উদ্দীপিত হইয়া উঠে। খৃষ্টানদের দেব-দেবীর প্রতি অবজ্ঞা নহে, কিন্তু রাজপ্রসাদ লাভ এবং রাজসম্মান প্রদর্শন জন্য আগ্রহের অভাবই তাঁহাদের সমস্ত অপরাধের মূল ছিল।

খৃষ্টীয় একশত একাদশ কি দ্বাদশ বৎসরে প্রাদেশিক শাসনপতি প্লিনি সম্রাট ট্রাজনকে পরিজ্ঞাত করেন যে, কতিপয় খৃষ্টানের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এই নূতন দলের প্রকৃতি এবং কার্য্য কীদৃশ, তাহার অবধারণ জন্য চেষ্টা ও যত্নের ত্রুটি করা হয় নাই। যে দুইজন দাসী এই দলের উপাসনার সময় সাহায্য করে এবং আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দেয়, তথ্য সংগ্রহ উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে ও অম্লানচিত্তে যন্ত্রণা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই সকল অনুসন্ধানের ফলে এই মাত্র জানা গিয়াছে যে, খৃষ্টানেরা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সম্মিলিত হয় এবং লোকে যেরূপ দেবদেবীর স্তোত্র পাঠ করে, তাঁহারা সেইরূপ যিশুর মহিমা গান করে। তাহারা আবার দিবাভাগে সম্মিলিত হয় এবং আহার করে, কিন্তু তাহাদের আহার্য্য সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। তাহাদের সম্মিলনের জন্য কোন প্রকার রাজবিধি-বিরুদ্ধ নিয়মাবলী গৃহীত হয় নাই। কিন্তু তাহারা স্বদলের পরস্পরের নিকট চৌর্য্য, দস্যুতা, প্রবঞ্চনা এবং ব্যভিচার হইতে দূরে থাকিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে। তাহারা গচ্ছিত দ্রব্য প্রত্যর্পণ করা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করে। প্লিনির ন্যায় জ্ঞানীব্যক্তি ও এই সমস্ত তথ্য অবগত হইয়াও খৃষ্টানদিগকে মুক্তি প্রদান করেন নাই, অপরিজ্ঞাত

কোন রাজ-নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদের দণ্ড বিধান জন্য উদ্যোগী হন। তিনি যিশুর নিন্দা এবং সম্রাটের মূর্ত্তি পূজার বিচার জন্য খৃষ্টানদিগকে আদেশ প্রদান করেন। যে সকল খৃষ্টান এই আজ্ঞা প্রতিপালন করে তাহারা মুক্তি পায়, লঙ্ঘনকারীরা ঘাতক হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করে। রোমক শাসনকর্ত্তৃবর্গ কিরূপ নির্দ্দোষ খৃষ্টান নরনারীর উৎপীড়ন দ্বারা হস্ত কলঙ্কিত করিতেন, তাহার প্রদর্শনজন্যই আমরা সম্রাট ট্রাজনের সময়ের উল্লিখিত ঘটনার বিবরণ প্রদান করিলাম। রোমক শাসন কর্ত্তৃগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়ন কিরূপ অমানুষিক ও প্রচণ্ড হইত, তাহার প্রদর্শন আমাদের অভিপ্রেত নহে। সে উৎপীড়নের চরম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে হইলে নরাধম সম্রাট নিরোর রাজত্বকালে উপনীত হওয়া আবশ্যক।

সম্রাট নিরোর রাজত্বকালে রোমনগরীতে অগ্ন্যুৎপাত হইয়াছিল, এই অগ্নির দাহনে বিচিত্র শোভা ও সম্পদশালী রোমনগরীর কিঞ্চিন্ন্যূন অর্দ্ধাংশ ভস্মীভূত হইয়াছিল। সহস্র সহস্র সুদৃশ্য অট্টালিকা, সুগঠিত দেবমন্দির এবং মনোরম বিদ্যালয় ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছিল। সহস্র সহস্র নরনারী গৃহশূন্য হইয়া বাত্যা-তাড়িত বৃক্ষপত্রের ন্যায় দ্বারে দ্বারে আশ্রয়ের অন্বেষণ করিয়াছিল। কত ধনী সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল; কত নরনারী অগ্নির দাহনে অথবা অনশনে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিল, মৃত দেহরাশিতে রাজপথ আচ্ছন্ন হইয়াছিল। ছয়দিন পর এই প্রচণ্ড অনল আর ভোগ্যবস্তু না. পাইয়া আপনা আপনি নির্ব্বাপিত হয়। তৎকালে এরূপ জনরব প্রচারিত হয় যে, সম্রাট নিরো স্বীয় প্রাসাদোপরি উপবিষ্ট হইয়া এই প্রলয় কাণ্ড দর্শন করেন। এবং তাঁহার আদেশে ট্রয় নগরীর ধ্বংস নামক নাটকের অভিনয় হয়। সম্রাট নিরোর অগ্নিদাহের আমোদ উপভোগ জন্য তাদৃশ ধ্বংস ক্রিয়া সাধিত হয় বলিয়া লোকের বিশ্বাস জন্মে। মাতা ও পত্নীর রক্তে যাহার হস্ত কলঙ্কিত প্রকাশ্য রঙ্গক্ষেত্র যাহার বীভৎস ব্যভিচার লীলায় উপহত, তাহার পক্ষে আমোদোৎসবের জন্য প্রকৃতিপুঞ্জের ধ্বংস সাধন সম্ভবপর বোধে প্রজাকুল ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। বিশাল রোমক সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রজার রোষাগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তাহার দাহনে নিরোর রাজসিংহাসন ভস্মীভূত হইবার উপক্রম হয়। নিরো অন্যদিকে প্রজারোষ প্রধাবিত করিয়া নিজে নিরাপদ হইবার অভিপ্রায়ে খৃষ্টানদিগকে অগ্ন্যুৎপাতের মূলরূপে অভিযুক্ত করেন, নিরো শত শত খৃষ্টান নরনারীর অশ্রুজলে আপনার কলঙ্ককালিমা ধৌত করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার সে অমানুষিক উৎপীড়ন-কাহিনী ঐতিহাসিক টেসিটাস যে জ্বালাময়ী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন, অনুবাদে তাহার বিশেষত্ব রক্ষা করা সম্ভবপর নহে। এজন্য আমরা মর্ম্মানুবাদ মাত্র প্রদান করিলাম। রোম-নগরীর দাহকারীরূপে কতিপয় খৃষ্টান ধৃত হয়, তাহাদের অপরাধ স্বীকারোক্তি অনুসারে, রাজপুরুষগণ বহুসংখ্যক খৃষ্টানকে আবদ্ধ করে। তাহাদের সকলেরি প্রাণান্ত হইয়াছিল; রোমনগরীতে অগ্নি দেওয়ার জন্য যত-না হউক, মানবজাতির প্রতি ঘৃণার নিমিত্ত দোষ সাব্যস্ত এবং দণ্ড প্রদত্ত হয়। এই সকল খৃষ্টান যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অপমান ও অবজ্ঞা তাহাদের যন্ত্রণার মাত্রা বর্দ্ধিত করিয়াছিল। অনেকে ক্রুশে বিদ্ধ হইত, অনেকে পশু-চর্ম্মের আবরণে ক্রুদ্ধ কুকুরের সম্মুখে নিক্ষিপ্ত হইত, অনেকের সর্ব্বাঙ্গ সহজ-দাহ্য পদার্থে চর্চ্চিত হইত, তারপর তাহারা রজনীর অন্ধকার দূর করিবার নিমিত্ত দীপশলাকারূপে ব্যবহৃত হইত। নিরোর প্রমোদ-উদ্যান এই সকল মর্ম্মন্তুদ দৃশ্যের স্থান ছিল, একদিকে এই সকল বীভৎসকাণ্ড সংঘটিত হইত, অন্যদিকে সম্রাট সারথীর বেশে জনপুঞ্জের সহিত মিলিত হইয়া ঘোড়দৌড় দেখিতেন।

নরাধম নিরো ইহলোক হইতে অপসৃত হইলে

খৃষ্টানদের প্রতি উৎপীড়নের মাত্রা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল; লোকের বিদ্বেষের মাত্রাও কমিয়া আসিয়াছিল; খৃষ্টধর্ম্ম দ্রুতগতিতে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল; জনপুঞ্জ খৃষ্টধর্ম্মের তাদৃশ উন্নতি দর্শনেও আন্দোলিত হয় নাই। রোমক সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র সুদৃশ্য খৃষ্ট ভজনালয় সকল মস্তক উত্তোলন করিতেছিল, নিজ রোমনগরীতেই চল্লিশ সংখ্যক ভজনালয় নির্ম্মিত হইয়াছিল। অবশ্য দেবদেবীর উপাসকের সংখ্যার তুলনায় খৃষ্টানের সংখ্যা নগণ্য ছিল, কিন্তু যে সকল তীক্ষ্ণদর্শী ব্যক্তি খৃষ্টানদের সংহতি, উৎসাহ এবং দ্রুত বিস্তৃতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট অদূর ভবিষ্যতে খৃষ্টধর্ম্মের জয়লাভের সম্ভাবনা স্পষ্টীকৃত হইয়াছিল।

কিন্তু জয়লাভের পূর্ব্বে খৃষ্টানদিগকে আর একবার ভয়ঙ্কর পরীক্ষায় পতিত হইতে হইয়াছিল। সম্রাট ডিওক্লিসিয়ান বহুগুণে অলঙ্কৃত হইয়াও খৃষ্টানদের দলনে প্রবৃত্ত হন। তিনি প্রথমতঃ ঘোষণাপত্র প্রচার পূর্ব্বক সমস্ত ভজনালয় ও বাইবেল নষ্ট করিতে আদেশ প্রদান করেন, ঈশ্বরোপাসনার জন্য গুপ্ত সম্মিলন নিষেধ করিয়া নিষেধ-লঙ্ঘনকারীর মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করেন এবং খৃষ্টানদিগকে সর্ব্বপ্রকার লৌকিক স্বত্ব ও অধিকার হইতে বঞ্চিত করেন। একজন ধর্ম্মোন্মত্ত খৃষ্টান এই ঘোষণাপত্র ছিন্ন করিয়া ফেলে এবং তৎপরিবর্ত্তে সম্রাটের গ্লানিসূচক পত্র প্রচার হয়। ইহার ফলে দ্বিতীয় ঘোষণাপত্র প্রচারিত হয়। ইহাতে সমস্ত ধর্ম্মযাজকদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করিবার জন্য আদেশ প্রদত্ত হয়। এই সময় রাজপ্রাসাদে ক্রমান্বয়ে দুইবার অগ্ন্যুৎপাত হয়, সম্রাট খৃষ্টানদিগকে এই কার্য্যের জন্য সন্দেহ করেন এবং ক্রোধে একেবারে অন্ধ হইয়া খৃষ্টানহত্যার জন্য আদেশ দেন। অনেকে অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে, অনেকের ভাগ্যে এরূপ বীভৎস নিপীড়ন ঘটিয়াছিল যে, অগ্নির দাহনে মৃত্যু ও তদপেক্ষা শ্রেয়স্কর ছিল। এত অত্যাচার, এত অবিচার সহ্য করিয়াও খৃষ্টান সম্প্রদায় কিরূপে আপন অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, পরন্তু দ্রুতগতিতে উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহা চিন্তা করিলে আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হই। খৃষ্ট ভজনালয়ের আস্তর রক্ত দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া যে বাক্য প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, আর মানব হৃদয়ে শান্তিদায়িনী আশার এই মন্ত্র ধ্বনিত হয় যে, ঘোর ঝটিকাতাড়িত অমানিশার অবসানেই ঊষার রক্তিমরাগে পূর্ব্বগগন রঞ্জিত হয়, বালসূর্য্যের কিরণে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

সম্রাট কনষ্টানটাইনের রাজত্বকালে খৃষ্টানদের পক্ষে অমানিশার অবসান হইয়াছিল; খৃষ্টধর্ম্মের বিমল জ্যোতিঃ সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। পিটার, জন, পল, প্রভৃতি দ্বাদশ জন নিম্নশ্রেণীস্থ ধীবর ও চণ্ডালের হৃদয়ে প্রতিভাত রশ্মিজাল ক্রমে ক্রমে বিস্তার লাভ করিয়া সমভাবে রাজার প্রাসাদে ধনীর সৌধে এবং দীনের কুটিরে আলোক প্রদান করিতে থাকে। কনষ্টানটাইনের আদেশে খৃষ্টধর্ম্ম রোমক সাম্রাজ্যের ধর্ম্মরূপে পরিণত হইয়াছিল, এতৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে খৃষ্টানকুলের প্রতি উৎপীড়ন সম্বন্ধে দার্শনিক পণ্ডিত লেকি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সার সঙ্কলন করিয়া দেওয়া আবশ্যক বোধ করি।

প্রাথমিক খৃষ্টানদের অন্তর্নিহিত তেজস্বিতা ও তন্মূলক সংহতি এবং নিস্বার্থতা রোমক শাসক সম্প্রদায়কে ভীত করিয়াছিল, রোমকদের কুসংস্কার ও ইহুদিকর্ত্তৃক প্রচারিত অপবাদ খৃষ্টানদিগকে ঘৃণ্য করিয়াছিল; এই দুই কারণ মিলিত হওয়াতে রাজার রোষ এবং প্রজার অসন্তোষ খৃষ্টানদিগকে পিষ্ট করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের ধর্ম্ম-প্রণালী এবং

আচার ব্যবহারও কিয়ৎ পরিমাণে সে অত্যাচার উৎপীড়নের কারণ স্বরূপ ছিল।

(১) খৃষ্টানগণ ধর্ম্মনাশ ভয়ে রণক্ষেত্রে গমন করিতে অস্বীকার করিত।

(২) তাহারা পৌত্তলিকতার প্রশ্রয়দানের আশঙ্কায় সম্রাট-মূর্ত্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে বিরত থাকিত।

(৩) রোমক সাম্রাজ্যের রাজচরগণ প্রকৃতি পুঞ্জের সমস্ত কার্য্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিত, তৎকালের জাতীয় ধর্ম্ম রাষ্ট্রনীতি ও গার্হস্থ্য বিধির সহিত একসূত্রে গ্রথিত ছিল বলিয়া ধর্ম্মান্তর বিশ্বাসী খৃষ্টানেরা সহজেই রাষ্ট্রনীতি ও গার্হস্থ্যবিধি উল্লঙ্ঘনকারীরূপে অভিযুক্ত হইত।

(৪) সিসিরু একটি পুরাতন রোমক বিধির উল্লেখ করিয়াছেন, এই বিধি অনুসারে রোমক শাসকগণ খৃষ্ট ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেও কয়েকটি নূতন ধর্ম্মের বিনাশ করিয়াছিলেন।

(৫) অনেক বিবাহিতা নারী খৃষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস করেন, কিন্তু তাঁহাদের পতি প্রাচীন ধর্ম্মাবলম্বীই ছিল, ইহার ফলে দারুণ পারিবারিক অশান্তি উপস্থিত হয়।

(৬) খৃষ্টধর্ম্মের মূলসূত্র অনুসারে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ ও যিশু খৃষ্ট ভজন ব্যতীত জীবের আদৌ গতি নাই। মুক্তির পথ একেবারেই অবরুদ্ধ, জীব অনন্ত কাল নরক ভোগ করিবে। এই সঙ্কীর্ণ ও অনুদার মত প্রচার করিয়া খৃষ্টানেরা অনেক অনর্থের সৃষ্টি করেন।

লেকির মতে খৃষ্টানদের তাদৃশ সঙ্কীর্ণতা ও অনুদারতাই তাহাদের প্রতি উৎপীড়ন ও অত্যাচারের অন্যতম প্রধান কারণ রূপে গণ্য হইতে পারে। এই উৎপীড়ন ও অবিচার অতি ভয়ঙ্কর হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু উহার যে বিবরণ ইতিহাসে স্থান লাভ করিয়াছে, তাহা খৃষ্টিয় ধর্ম্মযাজক কুলের রচিত, রোমক বিবরণের সহিত মিলাইয়া দেখিবার উপায় নাই। আধুনিক ঐতিহাসিক বিচারে ঐ সকল বিবরণের কোন কোন অংশ অতিরঞ্জিত রূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে।

আমরা লেকির মত উদ্ধৃত করিলাম, খৃষ্ট ধর্ম্মবীরদের আত্মোৎসর্গের মহিমা খর্ব্ব করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। যে সকল কারণে রোমক রাজা ও প্রজার মনে তাদৃশ ঘোর উত্তেজনা জন্মিয়াছিল, তাহার বিশ্লেষণই অভিপ্রেত। এইরূপ উত্তেজনা জন্মিয়াছিল বলিয়াই ডিওক্লিসিয়ানের মত বহু গুণালঙ্কৃত সম্রাটও খৃষ্টানের প্রতি অমানুষিক উৎপীড়ন দ্বারা আপন হস্ত কলঙ্কিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ডিওক্লিসিয়ানের রাজত্বকালে উৎপীড়ন এবং অবিচার প্রচণ্ড তেজে জ্বলিয়া উঠে; তারপর চিরদিনের জন্য নির্ব্বাপিত হয়।

সম্রাট কনষ্টানটাইন রাজত্ব লাভ করিয়া খৃষ্টানদের প্রতি উৎপীড়ন এবং অবিচারের মূলোচ্ছেদ করেন। তৎকালে গৃহ-কলহে রোমক রাজশক্তি ছিন্ন ভিন্ন হইতেছিল। এক বিপ্লবের স্রোত অন্তর্হিত হইতে না হইতেই আর এক কূলপ্লাবী তরঙ্গ উঠিত। সম্রাট কনষ্টানটাইন রাজপদ লাভ করিয়া নিজের রাজসিংহাসন সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য উদ্যোগী হন। এরূপ কথিত আছে যে, এই সময় একদা মধ্যাহ্নকালে কনষ্টানটাইন সসৈন্যে অভিযান করিতেছিলেন; এরূপ সময়ে তাঁহার নয়ন সমক্ষে মধ্যাহ্নসূর্য্যের উপর ক্রুশের উজ্জ্বল বিজয়চিহ্ন প্রকটিত হয়, এই চিহ্নের নিম্নে লিখিত ছিল, ইহার দ্বারা বিজয় লাভ কর। এই অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া সম্রাট সমস্ত সৈন্যসামন্ত সহ বিস্মিত হইলেন, ইহার পর রজনীতে সম্রাট যে স্বপ্ন দেখিলেন, তাহা তাঁহাকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিল। তিনি পর রজনীতে স্বপ্নযোগে ঈশ্বরের স্বর্গীয় চিহ্ন খৃষ্টের পবিত্র নাম তাঁহার সৈন্যদের চালে অঙ্কিত করিতে আদেশ প্রাপ্ত হন। কনষ্টানটাইন এই আদেশ পালন করেন এবং প্রবল যুদ্ধ অন্তে বিজয় লাভ করিতে সমর্থ হন। অতঃপর সম্রাট খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাকে রাজধর্ম্মে পরিণত করেন।

এই অলৌকিক বৃত্তান্তের অভ্যন্তরে যে সত্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা অনুধাবন করিলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, কনষ্টানটাইন প্রথমতঃ সহজাত উদারতা বশতঃ খৃষ্টানদের প্রতি অত্যাচার অবিচার নিবারণ করেন এবং কৃতজ্ঞ খৃষ্টানসমাজের সহায়তা লাভ করিয়া জয়শ্রীতে শোভিত হন, অতঃপর তিনি বৰ্দ্ধমান এবং অমিত মনোবল সম্পন্ন সত্যসংকল্প খৃষ্টান সমাজের স্থায়ী আনুকূল্য লাভ উদ্দেশ্যে খৃষ্টধৰ্ম্ম গ্রহণ করেন।

খৃষ্টধৰ্ম্ম রোমের রাজধর্ম্মরূপে গৃহীত হইলে উহা অতি দ্রুতগতিতে রোমক সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হয়, উহার মহিমা সর্ব্বত্র ঘোষিত হইতে থাকে। এতৎসম্বন্ধে তীক্ষ্ণদর্শী ঐতিহাসিক গিবন লিখিয়াছেন যে, সম্রাট কনষ্টানটাইন মিলন নগরী হইতে প্রকাশিত ঘোষণা দ্বারা খৃষ্টধর্ম্ম বিস্তারের সমস্ত রাজকীয় বিঘ্ন দূরীভূত করেন এবং অসংখ্য কর্ম্মশীল ধর্ম্মবেত্তা খৃষ্টধর্ম্ম জনপ্রিয় করিবার অভিপ্রায়ে সর্ব্বপ্রকার যুক্তির অবতারণা করিয়া তাহার মহিমা প্রচার করে অনুমতি প্রাপ্ত হন। তাঁহারা প্রবলোৎসাহে তাদৃশ প্রচার কার্য্য আরম্ভ করেন। অতঃপর খৃষ্টধর্ম্ম রাজধৰ্ম্ম রূপে গৃহীত হইলে তীক্ষ্ণদর্শী দুরাকাঙ্ক্ষ ও উন্নতিকামী মাত্রেই বুঝিতে পারে যে, খৃষ্টধর্ম্ম ইহকালে অর্থ ও সম্মান এবং পরকালে সদ্গতি প্রদান করিতে সমর্থ। অর্থ ও সম্মানের আকাঙ্ক্ষা, সম্রাটের দৃষ্টান্ত, তাঁহার উৎসাহ এবং তাঁহার লোভনীয় কৃপাকটাক্ষ নীচমনা এবং স্বার্থলোলুপ রাজদর্শন প্রয়াসী দিগের বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত করে। যে সকল নগরের অধিবাসীরা আপনাদের উৎসাহ প্রদর্শনার্থ দেবমন্দির ধূলিসাৎ করিয়াছিল, তথায় নানাবিধ নাগরিক অধিকার প্রদত্ত হয়। নিম্নশ্রেণী কর্ত্তৃক উচ্চশ্রেণীর অনুকরণ স্বভাবিক নিয়মে রোমক সাম্রাজ্যের ধনশালী ক্ষমতাশালী ও মর্য্যাদাশালী ব্যক্তিগণের খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের আদর্শঅনুকারী জনপুঞ্জও উহার শরণাপন্ন হইয়াছিল। এরূপ কথিত হইয়াছে যে, এক বৎসরেই রোমনগরীর চতুর্বিংশতি সহস্র নরনারী খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে এবং সম্রাট কনষ্টানটাইন প্রত্যেক নবধৰ্ম্মাবলম্বীকে শুভ্র পরিচ্ছদ এবং বিংশতিসংখ্যক স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করেন। কনষ্টানটাইনের শিক্ষার গুণে তদীয় উত্তরাধিকারী পুত্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্রও খৃষ্টধর্ম্মে বিশ্বাসী হইয়া উহার প্রচারার্থ প্রবল উৎসাহ ও যত্ন প্রকাশ করেন।

সমগ্র ইউরোপ খৃষ্টধৰ্ম্ম গ্রহণ করিলে রোমের প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য অর্থাৎ পোপের অদ্ভুত মর্য্যাদা ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। খৃষ্টধর্ম্মের শৈশবকালে যাজকগণ কখনও জনমত কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত হইতেন, কখনও বা রাজাদেশে পিষ্ট হইতেন। কিন্তু স্বধর্ম্মের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে অবজ্ঞা ও উৎপীড়নের পরিবর্ত্তে অলৌকিক পদ-মর্য্যাদা, অসাধারণ প্রাধান্য তাঁহাদের করতল-গত হয়; তাঁহাদের বিজয় নিশান সমভাবে রাজপ্রাসাদের সমুচ্চ চূড়ায় এবং প্রজার কুটীরের অনুচ্চ শীর্ষে উড্ডীন হয়; গর্ব্বোন্নত রাজা এবং দীন কৃষক সমভাবে তাঁহাদের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়। তাঁহাদের অধিনায়ক আবশ্যকমত ধর্ম্মাদেশ দ্বারা শক্তিস্পৰ্দ্ধী সম্রাটকে বিব্রত করিয়া তুলিতেন, আবার দরিদ্রের গৃহ করুণার ধারায় সিক্ত করিতেন। তাঁহার দাম্ভিকতাপূর্ণ আদেশে সমগ্র ইউরোপের সৈনিকমণ্ডলী সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিত, মহাসমর সংঘটিত হইত, ইউরোপের প্রবলতম বলদৃপ্ত সম্রাটও মস্তক হইতে রাজমুকুট খুলিয়া ফেলিবার জন্য বিচলিত হইতেন।

যে সকল কারণের সমবায়ে পোপের তাদৃশ ক্ষমতা ও মর্য্যাদা লাভ হইয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইতেছে। প্রথমতঃ খৃষ্টধর্ম্ম মণ্ডলীর বিপুল অর্থবল ছিল; খৃষ্টধৰ্ম্ম রোমক সম্রাট এবং রোমক সাম্রাজ্যের ধর্ম্মরূপে পরিণত হইলে ধৰ্ম্মযাজকগণ রাজকোষের অর্থে নিরাপদ ভাবে ও সম্মান সহকারে জীবিকা নির্ব্বাহের ভরসা করেন। এতদিন খৃষ্টবিশ্বাসীরা স্বেচ্ছাকৃত দান দ্বারা তাঁহাদের ভরণ পোষণের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিল। অতঃপর রাজা ও প্রজা, উভয়ের দান মিলিত

হইয়া খৃষ্টীয় প্রচারক কুলকে ধনী করিয়া তুলিতে থাকে। মিলন নগরীর ঘোষণার আটবৎসর পর সম্রাট কনষ্টান-টাইন তাঁহার সমস্ত প্রজাকে মৃত্যুকালে সঞ্চিত অর্থরাশি খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারার্থ উৎসর্গ করিতে অনুমতি প্রদান করেন। সম্রাটের বদান্যতা প্রজাকুলকে খৃষ্টধর্ম্মের হিতার্থ অর্থদান করিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছিল। স্বেচ্ছাচারী সম্রাটের পক্ষে রাজকোষের অর্থ ব্যয় করিয়া বদান্যতা প্রদর্শন পূর্ব্বক যশোলাভের ইচ্ছা স্বাভাবিক। কনষ্টান-টাইন সহজেই বিশ্বাস করেন যে, যদি তিনি পরিশ্রমীদের অর্থদ্বারা আলস্যরতদের ভরণ পোষণ করেন এবং সাম্রাজ্যের অর্থ ধার্ম্মিকদের মধ্যে বিতরণ করেন, তাহা হইলে তিনি ঈশ্বরের কৃপালাভ করিতে সমর্থ হইবেন। সম্রাট আফ্রিকা, নুসিডিয়া এবং মৌরিটানিয়ায় ধর্ম্ম প্রচারের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ এক কালীন আঠার হাজার পাউণ্ড প্রদান জন্য কার্থেজ প্রদেশের কোষাধ্যক্ষকে আদেশ প্রদান করেন এতদ্ব্যতীত বিশপদের প্রার্থনানুসারে আবশ্যকমত অর্থ প্রদানজন্য আদেশ প্রদত্ত হয়। সম্রাট কনষ্টান-টাইনের আদেশে প্রত্যেক নগর হইতে খৃষ্ট ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় দাতব্য-ভাণ্ডার নিয়মিত ভাবে নির্দ্দিষ্ট পরিমিত শস্য প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। এইভাবে সম্রাট্ কনষ্টান টাইনের সময়ে এবং তাঁহার পরবর্ত্তীকালে খৃষ্টধর্ম্মের যাজককুল অগাধ ধনের অধিকারী হইয়াছিলেন।

খৃষ্টধর্ম্মযাজকগণ জনপুঞ্জের নৈতিক অবস্থার প্রতি সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। দোষ দেখিলে তাহার সংশোধনজন্য দণ্ড দেওয়া হইত। রাজার শুভদৃষ্টি লাভের পর এই নিয়ম হইতে খৃষ্ট ব্যবস্থাশাস্ত্রের উদ্ভব হয়। এই শাস্ত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পাপ স্বীকারের কর্ত্তব্যতা, প্রমাণ সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী অপরাধের পরিমাণ এবং দণ্ডের প্রণালী সমস্ত লিপিবদ্ধ ও ব্যাখ্যাত হয়। কিন্তু যদি 'খৃষ্টধর্ম্মের বিশপ কেবল সাধারণ ব্যক্তির গুপ্ত পাপের দণ্ড দিতেন এবং রাজপুরুষদের প্রকাশ্য নীতিহীনতা ও অপরাধ সম্পর্কে নীরব থাকিতেন, তবে আর তাহাকে ধর্ম্মদণ্ড নামে অভিহিত করা অসম্ভব ছিল। কিন্তু আইন-অনুমোদিত শাসনক্ষমতা ব্যতীত রাজপুরুষদের চরিত্র আক্রমণ করা দুরূহ হইত। ধর্ম্ম, রাজ-ভক্তি অথবা ভয় সম্রাটবৃন্দের পবিত্র শরীর বিশপদের ক্রোধ অথবা পাপনাশ জন্য আগ্রহ হইতে রক্ষা করিত। কিন্তু তাঁহারা নির্ভয়ে রাজপুরুষদের দুষ্কর্ম্মের জন্য দণ্ড বিধান করিতেন। আমরা একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। সেণ্ট এথানাসিয়ান মিশর দেশের একজন মন্ত্রীর দণ্ড-বিধান করেন। ঈদৃশ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

সম্রাট কনষ্টানটাইনের পূর্ব্ববর্ত্তী খৃষ্টসমাজ রোমক জনসাধারণ হইতে পৃথক ছিল। এই সমাজের নেতৃগণ রোমক সাম্রাজ্যের প্রচলিত মত ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছিলেন, ইহার ফলে খৃষ্ট সমাজের চতুর্দ্দিকে শত্রুতাচরণ উপস্থিত হইয়াছিল এবং তাহা হইতে আত্মরক্ষার জন্য আভ্যন্তরীণ শাসননীতির প্রবর্ত্তন এবং কার্য্যাধ্যক্ষের নিয়োগ আবশ্যক হইয়াছিল। এই শাসনকার্য্য ও ধর্ম্মযাজন একাধারে ন্যস্ত হইয়াছিল। খৃষ্ট সমাজের অস্তিত্ব ও সম্মান রক্ষা ও মত প্রচারের প্রবল আগ্রহ হইতে একরূপ ধর্ম্মভাব উপস্থিত হয়, যাহা প্রকৃত ধর্ম্মভীরু ব্যক্তিকেও উদ্দেশ্য সাধনজন্য উপায় অবলম্বন কালে কিয়ৎ পরিমাণে বিচারহীনকরিত। যে সমাজে সাম্যবাদ সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হইয়াছে, তাহার পরিচালন জন্যও এক ব্যক্তির হস্তে কর্ত্তৃত্ব প্রদান করা আবশ্যক। এই ব্যক্তি সমাজের মতামত সংগ্রহ করিয়া সে মত কার্য্যে পরিণত করেন। খৃষ্টধর্ম্মের আদিযুগে তাদৃশ প্রধান ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হইতেন, এই নির্ব্বাচন কালে গোলযোগ উপস্থিত হইত। তাদৃশ গোলযোগ নিবারণ কল্পে প্রাথমিক খৃষ্টানগণ স্ব সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে আজীবনের জন্য বিশপের পদে নিযুক্ত করিতেন।

খৃষ্টধর্ম্মের বিশপ এবং তদধীন যাজকবৃন্দের সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষণসম্বন্ধীয় কার্য্যাবলী কনষ্টানটাইনের

সময় হইতে বহু বিস্তৃত হইয়া পড়ে। অনেক প্রজা তাঁহাদের বিচারের প্রার্থী হইত। সম্রাট তাদৃশ নিষ্পত্তি বাধ্যতামূলক করিবার জন্য আইন প্রণয়ন করেন এবং বিচারকদিগকে তৎসমুদয় কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আদেশ দেন। কনষ্টান্‌টাইনের পূর্ব্বে বিপদের নিষ্পত্তি প্রতিপালন করা অর্থী প্রত্যর্থীর স্বেচ্ছাধীন ছিল। তাঁহার সময় হইতে উহা বাধ্যতা-মূলক হইয়া দাঁড়ায়।

রোমক রাষ্ট্রনীতির একটী মূলসূত্র এই ছিল যে, সর্ব্বশ্রেণীর প্রজাই সাধারণ আইনের অধীন এবং ধর্ম্মের রক্ষণ শাসকদের অধিকার ও কর্ত্তব্য কার্য্য। কনষ্টানটাইন খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এই অধিকার ও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক হইলেন এবং আপনাকে নব-গৃহীত ও রাজপুষ্ট ধর্ম্মের রক্ষণ জন্য সমর্থ ঘোষণা করিলেন। কন্‌ষ্টান্‌টাইনের পূর্ব্বে খৃষ্ট-ধর্ম্মের বিশপ এবং তদধীন যাজকগণ এই কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন। এ কারণ তিনি শাসনের সহিত যাজন একীভূত করিয়া স্বয়ং ধর্ম্মনেতার পদ গ্রহণ করেন। তাদৃশ নেতৃত্ব প্রায় শত বৎসরকাল (৩১২—৪৩৮খৃঃ) সম্রাট কনষ্টানটাইন এবং তদীয় উত্তরাধিকারিগণের হস্তগত থাকে।

আমরা প্রদর্শন করিলাম যে, অর্থবল, ধর্ম্মবল ও ও রাজবল একাধারে সম্মিলিত হইয়া খৃষ্টধর্ম্মের বিশপ-দিগকে অমিতশক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহাদের নামে সমগ্র ইউরোপে যুগপৎ ভয় ও ভক্তির উদ্রেক হইত। বস্তুতঃ সেই অ[illegible]কালের অনেক বিশপ ভয় ও ভক্তির উপযুক্ত পাত্র ছিলেন। তাঁহারা লোকের হিতসাধনই জীবনের মূলমন্ত্র করিয়া ছিলেন, এই মন্ত্রের সাধনেই সর্ব্বক্ষণ তদ্‌গত চিত্তে নিরত থাকিতেন। তাঁহারা পাশব বল হইতে দূরে থাকিয়া কেবল বিদ্যা, বুদ্ধি চরিত্রবলে জনপুঞ্জের হৃদয়ে প্রভুত্ব করিতেন।

সম্রাট কনষ্টানটাইন রোমনগরী পরিত্যাগপূর্ব্বক কনষ্টান্‌টিনোপলে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। কনষ্টানটাইন রোমক সাম্রাজ্যের মঙ্গলকামনায় সমস্ত পৃথিবীর রাজ্ঞীস্বরূপিণী রোমনগরীর গৌরব ও বৈভব মলিন করিয়াছিলেন, কিন্তু জাগতিক উত্থান ও পতনের অনতিক্রম্য নিয়মে রোমক সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে নাই। কনষ্টানটাইনের মৃত্যুর কিঞ্চিন্ন্যূন একশত বৎসর মধ্যেই রোমনগরী পশ্চিম ইউরোপীয় বর্ব্বর জাতির পদতলে পতিত এবং রোম সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। অতঃপর পশ্চিম ও উত্তর ইউরোপে নানা পরাক্রান্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

এই সকল রাজ্যেও খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়ের প্রভূত প্রতিপত্তি ঘটিয়াছিল। বিদ্যা ও বুদ্ধি বিশপদের প্রভুত্ব লাভের একটি প্রধান কারণ ছিল। সে যুগে তাঁহারাই লেখা পড়া জানিতেন, এজন্য ব্যবস্থা প্রণয়ন ও পত্র ব্যবহার সম্বন্ধীয় সমস্ত ক্ষমতা তাঁহাদের হস্তেই প্রদত্ত হয়। কেবল তাঁহারাই বিজ্ঞান বিষয়ক প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, এজন্য রাজকুমার-বৃন্দও তাঁহাদের নিকটই শিক্ষালাভ করিতেন। তাঁহাদের প্রভাবে বিজেতা-বর্ব্বরদের কঠোরস্বভাব কোমল হয় এবং রোমনগরী বাহুবলে অবিদ্ধ হইয়াও আবদ্ধকারী উগ্রস্বভাব বর্ব্বরদিগকে নীতি ও জ্ঞান বলে আবদ্ধ করিতে সমর্থ হয়। প্রধানতঃ বিশপদের সাধনায় রোমের ধর্ম্ম, রোমের ভাষা এবং আংশিক পরিমাণে রোমের আইন প্যারি, টলেডো এবং উটেনবার্গের রাজদরবারে গৃহীত হয় এবং অনুকরণের ফলে বর্ব্বরতা হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

খৃষ্ট ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায় বিপুল ক্ষমতা ও স্বত্ব সত্বেও রাজার অধীন ছিলেন। এ সম্বন্ধে রোমক সাম্রাজ্যের পশ্চিম অংশের অস্তিত্বের সময়ও যেরূপ ছিল, পর-বর্ত্তীকালেও তাহার কোন পার্থক্য হয় নাই। যাজক

সম্প্রদায় উত্তরোত্তর অধিকতর ক্ষমতা ও স্বত্বলাভের প্রয়াসী ছিলেন। আমরা প্রদর্শন করিয়াছি যে, সম্রাট কনষ্টানটাইনের আনুকূল্য প্রসূত অর্থবল, ধর্ম্মবল এবং বাহুবল ধর্ম্মযাজকদিগকে শক্তিশালী করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত অন্যপথেও তাঁহারা ক্ষমতালাভ করিতেন। রোমক সম্রাট তাহাদিগকে বিশিষ্ট রাজপদে নিযুক্ত করিতেন, অনেক সময়ে তাঁহারা গুপ্ত-মন্ত্রণাকক্ষেও প্রবিষ্ট হইতেন; সমাজের হিতার্থ অনেক সময়ে তাঁহাদের সহায়তা আবশ্যক হইত এবং তাহাদের অনধিকার চর্চ্চাও সহ্য করিতে হইত। তারপর পশ্চিম ইউরোপে নূতন রাজ্য সকল প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহাদের নূতনতর ক্ষমতালাভের পথ উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। এই সকল রাজ্যে জাতীয় সভা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায় তাহাতে প্রবেশ লাভ করেন। রোমক সম্রাট-গণ সময় সময় ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায় লইয়া সভা আহ্বান করিতেন, তাহাতে কেবল ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয়েরই মীমাংসা হইত। কিন্তু নূতন রাজ্য সমুদয়ের রাজন্যকুল ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতি, উভয় ক্ষেত্রেই তাহাদিগকে প্রবেশাধিকার প্রদান করেন। রাজন্যকুল ধর্ম্ম ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করেন নাই, কিন্তু ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায় সর্ব্বদাই রাজব্যবস্থার প্রণয়নে হস্তক্ষেপ করিতেন।

অবশেষে জর্ম্মানীর নরপতি চারলমানের সময় হইতে রাজন্যকুলেও ঈর্ষ্যা উপস্থিত হয় এবং তাঁহারা ধর্ম্মবিষয়েও প্রাধান্য রক্ষা করিতে উদ্যোগী হন। এইরূপে রাজ-শক্তি ও ধর্ম্মশক্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হয়। এক-দিকে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল, অন্যদিকে ধর্ম্মমূলক এক অভিনব শাসনকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া সমগ্র ইউরোপের ধর্ম্ম ও শাসন, উভয় শক্তিই তদধীন করিবার জন্য লোকচক্ষুর অন্তরালে ইউরোপীয় ধর্ম্ম-মণ্ডলীতে মত গঠিত হইতেছিল। সভ্যতার আদিকাল হইতে রোমনগরী জগতপূজ্যা ছিল, এজন্য প্রথমাবধি রোমের বিশপ অন্যান্য স্থানের বিশপ অপেক্ষা অধিক সম্মানের অধিকারী ছিলেন। আর এক কারণেও অধিকতর সম্মান প্রদত্ত হইয়াছিল। এরূপ কথিত আছে যে, সেণ্টপিটার রোমে আগমন করেন এবং তিনিই রোমের প্রথম বিশপ ছিলেন। এই কারণ রোমের বিশপকুল তাঁহার উত্তরাধিকারীরূপে গণ্য হইতেন। রোমনগরীর পতনের পরও তাঁহার গৌরব সবিশেষ ক্ষুণ্ণ হয় নাই, তাহার নামে জনসাধারণের হৃদয়ে সম্মান ও শ্রদ্ধার উদ্রেক হইত। এই দুই কারণের সহিত আমাদের বর্ণিত সময় বিশপদের অসাধারণ মনস্বিতা ও ধার্ম্মিকতা মিলিত হইয়া এরূপ এক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে, মানব মনে ও হৃদয়ে যাহার প্রভাব সীজার ও নিরোর প্রকৃতিপুঞ্জকে বাধ্য এবং অনুগত রাখিবার ক্ষমতার তুল্য ছিল। এই সাম্রাজ্যের নাম পোপের ধর্ম্মরাজ্য।

ইউরোপে খৃষ্টধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহার আলোক সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়া পড়িল, তাহার প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য পোপ অমিত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিলেন। এখন প্রশ্ন এই যে, পোপ শাসিত ইউরোপে পরমেশ্বরের জয় ঘোষিত এবং শান্তি ও প্রেম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কি? খৃষ্টের আবির্ভাবের প্রাক্কালে দেবদূত যে ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা সাফল্য লাভ করিয়াছিল কি? খৃষ্টধর্ম্মের ইতিহাসবেত্তা জন্ আরল্ রাসেল লিখিয়াছেন, It is of the nature of man to corrupt and pervert every gift of God. অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রত্যেক দান অপবিত্র ও নষ্ট করাই মানব প্রকৃতি। খৃষ্টধর্ম্মও এই মানব প্রকৃতির সংস্পর্শে মলিন হইয়াছিল। ব্যভিচার, কুসংস্কার ও বিদ্বেষ খৃষ্ট-সমাজ কলুষিত করিয়াছিল।

আমরা লিখিলাম, ব্যভিচার, কুসংস্কার ও বিদ্বেষ খৃষ্ট সমাজ দূষিত করিয়াছিল। এই ত্রিদোষ খৃষ্টধর্ম্ম রোমক সাম্রাজ্যে গৃহীত হইবার পর হইতেই সূচিত হইয়াছিল।

আমরা তৎসমুদয়ের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিতেছি।

খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীগণ উৎপীড়িত হইতেন, এজন্য তাঁহাদের একটি সমাজ-বিমুখতার ভাব আসিয়াছিল, তাঁহারা সমাজ হইতে স্বতন্ত্রভাবে থাকিতেন। রোমে খৃষ্টধর্ম্ম রাজধর্ম্মরূপে গৃহীত হইলে ঐ স্বাতন্ত্র্য দূরীভূত হয়। কিন্তু সমাজ হইতে পৃথকভাবে থাকিবারও একটি মোহ আছে, এই মোহ হইতে Monastic orderএর উদ্ভব হয়। এই মোহ বৃদ্ধি পাইবার একটি কারণ এই ছিল যে, সকল সমাজেই চিরকৌমার্য্যের একটি মর্য্যাদা ও সম্মান দেখিতে পাওয়া যাইত। দ্বিতীয়তঃ, ধর্ম্ম সাধন জন্য সংসার এবং স্ত্রীসংসর্গ পরিত্যাগ করা পুণ্যজনক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। স্বয়ং যিশু চিরকুমার ছিলেন, বৌদ্ধ সমাজের আদর্শও গোচরীভূত ছিল। এই সময় রোমক সাম্রাজ্যে বর্ব্বরদের দৌরাত্ম্য আরম্ভ হয়। তাহার ফলে জনসাধারণের ধন, মান, প্রাণ, সমস্তই বিপদসঙ্কুল হইয়া পড়ে। এরূপ দুঃসময়ে যে আশ্রয়ে নিরাপদভাবে বাস এবং শান্তিতে কাজ করা যাইত, তাহা স্বভাবতঃই লোকের প্রিয় হইয়াছিল। এই আশ্রয় যুগপৎ আভিজাত্য এবং সাধারণ্যের পরিপোষক ছিল। খৃষ্ট মঠাধ্যক্ষের রাজজনোচিত মর্য্যাদা ও ক্ষমতা অতি সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকেরও লোভনীয় ছিল এবং সাধারণতঃ তাহাদেরই হস্তগত হইত। পক্ষান্তরে মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস, বর্ব্বরদের যুদ্ধে হৃত সর্ব্বস্ব কৃষক, অত্যাচারপিষ্ট নাগরিক, পলাতকসৈন্য খৃষ্টমঠে আপনাদের অভীষ্টানুরূপ আশ্রয় লাভ করিত। Monastic orderএ বিপুল অর্থসুলভ সমস্ত প্রভাব বিদ্যমান ছিল, তাদৃশ অর্থের অধিকাংশই দারিদ্র্য নিবারণ জন্য প্রদত্ত হইত, করুণার ধারায় চারিদিক সিক্ত হইত। মঠাধ্যক্ষ তাদৃশ বিপুল অর্থের অধিকারী হইয়াও পবিত্র দারিদ্র্যের উজ্জ্বল ছটায় শোভিত থাকিতেন। যাহাদের হৃদয় পরদুঃখকাতর এবং ভাবপ্রবণ, তাহারা এখানে ধর্ম্ম, সভ্যতা এবং করুণা বিস্তার জন্য বিপুল কর্ম্মক্ষেত্র প্রাপ্ত হইতেন। কুসংস্কারপ্রাপ্তদের নিকট উহা স্বর্গের দ্বার স্বরূপ ছিল। দুরাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তি Monastic order ভুক্ত হইয়া লোভনীয় বিশপপদ প্রাপ্তির আশা করিতেন। বিদ্যার্থীর নিকট খৃষ্টমঠই তাঁহাদের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণের একমাত্র স্থান ছিল। ভীরু ও নির্জ্জনতাপ্রিয় লোকের নিকট খৃষ্টমঠ আরামের স্থান ছিল। এইরূপ নানা কারণে দ্রুত গতিতে Monastic order পরিপুষ্ট হইয়া উঠে। যদিও সহস্র সহস্র লোক খৃষ্টমঠে আশ্রয় গ্রহণ করিত, তাহা হইলেও ইহার ধনভাণ্ডার কখনও শূন্য হয় নাই। শত শত ধনী পারলৌকিক মঙ্গলকামনায় খৃষ্টমঠের পোষণ জন্য অর্থ উৎসর্গ করিয়া কৃতার্থ হইতেন। কৃষি হইতেও মঠের প্রভূত অর্থাগম হইত।

একজন শ্রেষ্ঠ ইতিহাসবেত্তা মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, খৃষ্টধর্ম্মমণ্ডলী তিনটি স্বতন্ত্র আকারে বিভক্ত হইতে পারে। প্রথম যুগে ধর্ম্ম ও নীতিপরায়ণতা একার্থ জ্ঞাপক ছিল; দ্বিতীয় যুগে ধর্ম্ম গোঁড়ামির নামান্তর মাত্র ছিল, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে এই যুগের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। তারপর সপ্তম শতাব্দী হইতে তৃতীয় যুগের আরম্ভ হয়। এই যুগে খৃষ্টমঠে দান দ্বারাই ধর্ম্মলাভ হইত। খৃষ্টধর্ম্মের অধিনায়কদের স্বেচ্ছাচার এবং বর্ব্বরগণ কর্ত্তৃক লব্ধ-বিজয়ের ফল স্বরূপ অজ্ঞানতা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় তর্ক-বিতর্কের কণ্ঠ অবরোধ করিতে সমর্থ হয়। ইতিপূর্ব্বে ধর্ম্মাচার্য্যদের যে উৎসাহ, উদ্যম ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মতভেদের উচ্ছেদসাধনে অপচিত হইত, এখন তাহা অর্থ অর্জ্জনে প্রযুক্ত হইয়াছিল। খৃষ্টান জনপুঞ্জের এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, অনেক মঠধারী মধ্যবর্ত্তিতা দ্বারা লোকের পাপ বিমোচন করিতে পারেন এবং তাঁহাদিগকে অর্থদান করিলেই অতি গুরুতর দুষ্কার্য্য জনিত পাপ হইতে মুক্তি পাওয়া যায়।

সন্দেহবাদীরা নির্য্যাতিত হওয়াতে মঠধারিগণ ধর্ম্মোৎসাহহীন হইয়া পড়েন, অতঃপর দুষ্কর্ম্মীদের অর্থ তাহাদের হৃদয়ে ভোগলালসা জাগ্রত করিয়া তোলে, তাঁহারা দুর্নীতিস্রোতে নিমগ্ন হন। তৎকালে যে সমস্ত লোক মঠের আশ্রয় লইতেন, তাঁহারা সকলেই ধর্ম্মকর্ত্তৃক প্রণোদিত হইতেন, এরূপ নির্দ্দেশ করিলে সত্যের অপলাপ হইবে। অনেকে আরামে জীবন যাপন উদ্দেশ্যে, অনেকে সম্মান লাভের আশায়, অনেকে অর্থলোভে সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেন। একদিকে ধর্ম্মবলের অভাব, অন্যদিকে ধর্ম্মাচার্য্যদের নির্য্যাতনে সমালোচনার পথ অবরুদ্ধ, এবং জন সাধারণের দানের ফলে বিপুল অর্থ অধিকৃত, এরূপ অবস্থায় স্বভাবতঃই পাপ মোহন-দৃশ্য উন্মুক্ত করিয়া সংসারত্যাগীদের কৌমার্য্যব্রত ভঙ্গ করিয়াছিল, ব্যভিচারের স্রোত চারিদিকে প্রবাহিত হইয়াছিল।

খৃষ্টনীতির বিশুদ্ধতা, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদের পবিত্র জীবন এবং রাজার উৎসাহ খৃষ্টধর্ম্মের পথ পরিষ্কৃত করিয়াছিল, অসংখ্য নরনারী দলে দলে সে ধর্ম্মের শরণাপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু অপর পক্ষে খৃষ্টধর্ম্মের যাজকগণ রোমকদের দেবার্চ্চনা এবং ক্রিয়াকর্ম্মের চাকচিক্য ও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সুখপ্রবণতা দর্শন করিয়া তৎসমুদয়ের পক্ষপাতী হইয়া উঠেন। রোমক দেবতা, রোমক অবতার এবং রোমক বীরের স্থান খৃষ্টান সাধু এবং খৃষ্টান ধর্ম্মবীর অধিকার করেন। রোমের সেণ্টপিটার, জেনোয়ার সেণ্ট জন দি ব্যাপটিষ্ট, কম্পোষ্টেলার সেণ্টজেমস্ এবং নেপালসের সেণ্ট জন্যুরিয়াস নূতন খৃষ্টানদের পূজা অর্চ্চনা গ্রহণ করিতেন। তাঁহারা এই নূতন দেবত৷ লাভ করিয়া প্রাচীন মূর্ত্তির অভাব বিস্মৃত হইয়াছিল। সর্ব্বোপরি মাতা মেরীর আসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নূতন খৃষ্টানগণ উৎসাহ ও অনুরাগ সহকারে তাঁহার পূজা অর্চ্চনা আরম্ভ করিয়াছিল। সমগ্র ইউরোপ আফ্রিকা ও এসিয়ায় মেরীর মূর্ত্তি লক্ষ লক্ষ নর নারীর হৃদয়ে উচ্ছ্বাস তুলিত, মেরীর মূর্ত্তি অথবা চিত্রের অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে লোকের মনে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল।

সম্রাট কনষ্টানটাইনের খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণের পরেই খৃষ্টধর্ম্মের তত্ত্ব সম্বন্ধে অনৈক্য উপস্থিত হইয়া দারুণ বিদ্বেষের সূচনা করে। আমরা যে মতভেদের উল্লেখ করিলাম, তাহা পরমেশ্বর ও যিশুর পারস্পারিক সম্পর্ক বিষয়ক। অতঃপর Lord's Supper লইয়া অনৈক্য উপস্থিত হইয়াছিল। এইদিন খৃষ্টানেরা যে মদ ও রুটী ব্যবহার করিতেন, তাহা অতি পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত, কিন্তু একদল লোক বলিতেন, উহা যিশুখৃষ্টের প্রকৃত রক্ত ও মাংস। এখানেই অনৈক্যের শেষ হয় নাই। একদল লোক রোমক ও গ্রীক-দর্শনের সহিত খৃষ্টধর্ম্মের সমন্বয় সাধনজন্য উত্থিত হন, ইঁহারা Scoool men আখ্যা লাভ করেন। এই School menও আবার পাঁচ ছয় দলে বিভক্ত হইয়া পড়েন। আমরা অনৈক্যের যে সমস্ত কারণ লিপিবদ্ধ করিলাম, তাহার প্রত্যেক তত্ত্বই অতি সূক্ষ্ম, সাধারণের বোধগম্য নহে। সহস্র সহস্র নরনারী আপনাদের বুদ্ধির অনধিগম্য ধর্ম্মতত্ত্বের সমর্থন অথবা প্রতিবাদ জন্য চারিদিকে অশান্তি ছড়াইয়া দেয়।

খৃষ্টধর্ম্মের ইতিহাসবেত্তা জন্ আরল্ রাসেল গভীর মর্ম্ম বেদনায় লিখিয়াছেন, নানাকারণে খৃষ্টধর্ম্মের মূর্ত্তি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া ছিল। যিশুখৃষ্ট শিষ্যবৃন্দকে পরমেশ্বরের একত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব মূলক সরল তত্ত্বজ্ঞান, বিশুদ্ধ নীতি এবং মানব জাতির ঐক্য সাধক প্রেম ও দয়া প্রদান করেন। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মমণ্ডলী তৎপরিবর্ত্তে জটিল ও সাধারণের বুদ্ধির অনধিগম্য এবং বহু দেবতাবাদ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বজ্ঞান, অর্থবল-সাধ্য নীতি এবং ধর্ম্মমণ্ডলীর বিরোধী উৎপীড়ন আরম্ভ করেন।

এতৎ-সম্পর্কে দার্শনিক পণ্ডিত লেকি লিখিয়াছেন,

ইউরোপে খৃষ্টধর্ম্মের বীজ বপনের পর দুইশত বৎসর পর্য্যন্ত তৎ-ধর্ম্মাবলম্বীরা বিশুদ্ধনীতির পরিচয় প্রদান করেন,ইহার তুল্য নীতিপরায়ণতার দৃষ্টান্ত আরও থাকিতে পারে, কিন্তু এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত অপ্রাপ্য। খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহা মলিন হইতে আরম্ভ করে। প্রথম খৃষ্টান সম্রাট রোম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন নগরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এই ভাবে রোমক সাম্রাজ্যের পূর্ব্বাংশ লইয়া যে অভিনব সাম্রাজ্যের সূচনা হয়, তাহা শতাধিক সহস্র বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। এই সাম্রাজ্যের ইতিহাস ধর্ম্মযাজক, খোজা ও মনস্বিনী নারীর ষড়যন্ত্রের বিবরণ পূর্ণ, রাজ সিংহাসনের চতুর্দ্দিগবর্ত্তী অবিরত দুষ্কার্য্য ও ষড়যন্ত্রের কাহিনী কর্ত্তৃক কলুষিত। অবশেষে মুসলমান-বিজয় পূর্ব্ব সাম্রাজ্যের দীর্ঘব্যাপী নৈতিক জড়তার অবসান করে। কনষ্টান্টিনোপল মুসলমানের অর্দ্ধচন্দ্রশোভিত বিজয়পতাকার দণ্ডভারে অবনত হইয়া পড়ে। ইহার পূর্ব্বেই এসিয়াস্থ ধর্ম্মমণ্ডলীর প্রাণান্ত হইয়াছিল। এসিয়া মাইনরের উচ্ছৃঙ্খল নগরসমূহে খৃষ্টধর্ম্মের বীজ উপ্ত হইলে অনেক ধর্ম্মোন্মত্ত সাধক ও তত্ত্বজ্ঞানীর আবির্ভাব হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহাদের ধর্ম্মানুরাগ ও ধর্ম্মতত্ত্ব জনসাধারণকে বিশেষরূপে স্পর্শ করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। খৃষ্টধর্ম্ম তত্ত্ব লইয়া যে অনৈক্য উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা ইহাদের মধ্যে দারুণ ঈর্ষ্যা ও দ্বেষ আনয়ন করে। কিন্তু এই ধর্ম্মের সম্পর্কে যে বিশুদ্ধনীতি প্রচারিত হয়, তাহা তাহাদের বিলাসিতা ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা দমিত করিতে পারে নাই। ভোগ স্পৃহা অপ্রতিহত বেগশালিনী ছিল, এবং খৃষ্ট ধর্ম্মের বিজয়নিশান প্রোথিত হইবার পরই অনেক স্থানে পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল।

পশ্চিম সাম্রাজ্যের অবস্থা ভিন্নরূপ হইয়াছিল। কনষ্টানটাইনের খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণের কিঞ্চিন্ন্যূন এ[illegible] বৎসর মধ্যে রোমনগরী বর্ব্বরগণ কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছিল, এবং তাহাদের পুনঃপৌনিক আক্রমণে রোমক সমাজ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু পক্ষান্তরে বর্ব্বরগণ স্বয়ং খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে এবং সম্পূর্ণরূপে খৃষ্টিয় যাজক সম্প্রদায়ের করধৃত হয়। এই সুযোগে এক অভিনব ধর্ম্মসাম্রাজ্যের উদ্ভব হয়। এই সাম্রাজ্যের অধিপতি পোপেরা সুদীর্ঘকাল পশ্চিম ইউরোপের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করেন এবং তৎফলে যে সভ্যতার উৎপত্তি হয়, তাহার সর্ব্বাঙ্গে ধর্ম্মচিহ্ন অঙ্কিত ছিল। এই নূতন সভ্যতা উচ্ছৃঙ্খলতা, অবিচার অরাজকতা ও যুদ্ধ দমন করিতে অসমর্থ হইয়াছিল, যাহারা এই সভ্যতার পতাকা হস্তে দণ্ডায়মান ছিলেন, তাঁহারাই অনেক সময় ঐ সকল ব্যাপারে লিপ্ত হইতেন।

পোপের শাসনাধীন ধর্ম্মমণ্ডলী সর্ব্বপ্রকার বিরোধীর মুখবন্ধন অথবা ধ্বংস সাধন করেন। শিক্ষাবিভাগের সমস্ত কর্ত্তৃত্ব তাঁহার হস্তগত ছিল। সমস্ত দর্শনশাস্ত্র ও শিল্পকলা তাহার গ্রাসে পতিত হইয়াছিল। সমস্ত ধন, পদমর্য্যাদা এবং সামরিক শক্তি তাহার প্রভুত্বাধীন অথবা হস্তগত ছিল। খৃষ্টধর্ম্মমণ্ডলী এরূপ শিক্ষার বিস্তার করিয়াছিলেন, যাহার ফলে মানব সমাজ আপদে পতিত হইলে খৃষ্ট যাজক সম্প্রদায়ের শরণ গ্রহণই একমাত্র মুক্তির পথ বলি[illegible] করিত এবং তাঁহাদের আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ [illegible]। সমগ্র ইউরোপের আপাদমস্তক পোপের ক্ষমতা রক্ষক বা বর্দ্ধক প্রতিষ্ঠান সমূহে আস্তীর্ণ হইয়াছিল। ফলতঃ পোপ আপন ক্ষমতা ও আধিপত্যের মূল সুদৃঢ় করিবার জন্য সুকৌশলে সর্ব্ব প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। খৃষ্টধর্ম্মের তত্ত্ব সকল সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ প্রকাশ করিলেই তাহা পাপরূপে কলঙ্কিত হইত, সর্ব্বপ্রকার অনুসন্ধিৎসার ফল গভীর মনস্তাপ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। যদি কোন উপাসক কোন ধর্ম্ম বিধির ন্যায্যতার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ অথবা কোন ধর্ম্মাচার নিরর্থক বলিয়া জ্ঞাপন করিতেন, তবে তাঁহার নয়ন সমক্ষে নরকের যে দৃশ্য প্রদর্শিত হইত, তাহার সম্মুখীন হইবার কল্পনা করিতেও অতি

সাহসীর হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িত।

এতৎসম্পর্কে ঐতিহাসিক কুলতিলক গিবন লিখিয়াছেন, রোমক সাম্রাজ্যের পশ্চিম অংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে যে অজ্ঞানতা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার সুযোগে রোম নগরীর বিশপকুল লাটিন ধর্ম্মমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত যাজক সম্প্রদায় ও জনসাধারণের উপর আধিপত্য স্থাপন করেন। তাঁহারা কুসংস্কারের সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মিত করিয়াছিলেন, যুক্তি ও তর্কের সমস্ত শক্তি এই দুর্গে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। অবশেষে একদল দুঃসাহসী ধর্ম্মোন্মত্ত ব্যক্তি এই দুর্গ আক্রমণ করেন। রোমের ধর্ম্মমণ্ডলী প্রতারণা দ্বারা যে সাম্রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন, তাহা পাশবিক বলে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন। শান্তির প্রতিষ্ঠা ও জনহিতসাধন যে মণ্ডলীর উদ্দেশ্য ছিল, তাহা বহিষ্করণ, যুদ্ধ, হত্যা, পবিত্র উপাধি বিক্রয়দ্বারা কলুষিত হইল। রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি, সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা এই সকল সংস্কারকের উদ্দেশ্য ছিল; এজন্য রাজা ও পুরোহিত এক সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন এবং অগ্নি ও তরবারির সাহায্যে ধর্ম্মদণ্ড প্রদান করিতেন। একমাত্র নেদারল্যাণ্ডেই নরপতি পঞ্চম চার্‌লসের একলক্ষ প্রজা ঘাতক হস্তে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিল।

ঈদৃশ লোমহর্ষক অত্যাচার কাহিনী গিবনের ন্যায় ধীরচিত্ত এবং ন্যায়দর্শী ঐতিহাসিক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন জন্যই আমরা তাহাতে আস্থা স্থাপন করিলাম। ঈশ্বর যাহাদের হস্তে ধর্ম্ম, সত্য ও ন্যায়ের পতাকা প্রদান করেন, তাঁহারা সে পতাকা বহন করিবার বলও তাঁহার নিকট হইতেই প্রাপ্ত হন এবং সমস্ত বেদনা তাঁহারই দান বলিয়া মস্তকে ধারণ করেন। তাই খৃষ্টধর্ম্মের সংস্কারপ্রার্থীর দল আমাদের বর্ণিত সমস্ত অপমান, সমস্ত উৎপীড়ন, সমস্ত রক্তপাত তুচ্ছ করিয়া অবিচলিত চিত্তে সাধনার পথে অগ্রসর হন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে এই দলের অভ্যুদয়ে রোমের ধর্ম্মমণ্ডলী ইউরোপে যে অগ্নি প্রজ্বলিত করেন, তাহা সুদীর্ঘ চারিশত বৎসর ব্যাপিয়া লক্ষ লক্ষ নরনারীর সুখ শান্তি দগ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু ধর্ম্ম, সত্য ও ন্যায় স্পর্শ করিতে পারে নাই। আগ্নেয়গিরির অগ্নি উদ্গিরণ শেষ হইলে পৃথিবী আবার শ্যামলশ্রী ধারণ করে। এরাস্‌মাস, লুথার এবং কাল্‌ভিন প্রমুখ সাধকগণের অক্লান্ত সাধনা ও অনন্ত বিশ্বাস তাঁহাদিগকে অবশেষে জয়যুক্ত করে। লুথার প্রমুখ সংস্কার প্রার্থীর দল রোমের পোপ এবং তাঁহার অনুগত ধর্ম্মমণ্ডলীর বিনাশ সাধন করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন; এখনও পোপ ও তাঁহার ব্যাখ্যাত ধর্ম্মকে প্রায় অর্দ্ধ ইউরোপের নরনারী পরিত্রাণের উপায়রূপে মান্য করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু পূর্ব্বকালীন সেই ব্যভিচার, কুসংস্কার ও বিদ্বেষ এখন নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িয়াছে। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী হইতে লুথার, এরাসমাস ও কাল্‌ভিনের প্রাণগত সাধনায় সকল শ্রেণীর নিকট বাইবেল উদ্ঘাটিত হইয়াছে, বাইবেল বর্ণিত প্রেম ও দয়ার ধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে প্রচারিত হইতেছে, ইহার ফলে মানুষের মনে ধর্ম্মচিন্তার উদ্ভব হইয়াছে, উন্নততর নৈতিক আদর্শ স্থাপিত হইয়াছে। বাইবেলের শিক্ষার ফলে ইউরোপীয় সমাজ হইতে দাসত্ব প্রথা দূরীকৃত হইয়াছে; ঐ শিক্ষার ফলেই দণ্ডবিধি কোমল হইয়াছে, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিদ্বেষ ও সঙ্কীর্ণতা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে, এখন সকলেই যদৃচ্ছামত নিরুপদ্রবে ধর্ম্ম চর্চ্চা করিতে পারেন।

লুথার প্রমুখ আত্মত্যাগীর সাধনার সাফল্য সত্ত্বেও ইউরোপে ঈশ্বরে ভক্তি ও মনুষ্যে প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। খৃষ্টধর্ম্মের ইতিহাসবেত্তা জন আরল্‌রাসেল লিখিয়াছেন, সেণ্টপলের মতে খৃষ্টধর্ম্মের অর্দ্ধেক গ্রহণ করিলে ঘৃণা, অনৈক্য, ক্রোধ, কলহ, বিদ্রোহ, ঈর্ষা, নরহত্যা, মাদকতা, কুৎসা প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত হয়। Fatherদের কাল্পনিক তত্ত্ব অথবা রোমক ধর্ম্মমণ্ডলীর অতিরিক্ত দুরাকাঙ্ক্ষা অথবা লুথার প্রমুখ সংস্কারকদের

জ্ঞানগর্ভ ভ্রান্তি,—যে কারণেই খৃষ্টধর্ম্মের মলিনতা ঘটিয়া থাকুক, তাহার ফলে এইরূপ হইয়াছে। ইংলণ্ডের মুখোজ্জ্বলকারী দার্শনিক পণ্ডিত স্পেনসার বলিয়াছেন—দুই সহস্র বৎসর অবধি শত সহস্র ধর্ম্মযাজক সমগ্র ইউরোপে খৃষ্টের নীতি প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি পৌত্তলিকদের মত ও ভাব রাজা প্রজা সকলেরই চিত্ত অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ইউরোপ মুখে যে নীতি গ্রহণ করে, কার্য্যকালে তাহা অবজ্ঞাত হয়। ক্ষমা কাপুরুষতার লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। অপমান রক্তধারায় ধৌত করা আবশ্যক, এই কার্য্য সাধন জন্য এরূপ কঠোর হস্তে বাধ্য করা হয় যে, যদি কোন সৈনিক পুরুষ ইহার ন্যায্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিতে সাহস করে, তাহা হইলেই তাহাকে সৈন্য শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। যে প্রতিহিংসা বর্ব্বর সমাজেই সুলভ, তাহা অন্তর্জ্জাতীয় ব্যাপারে তথাকথিত সভ্য সমাজেও প্রধান্য লাভ করে। *

এই সকল মতের সত্যতা উপলব্ধি করিতে হইলে ফরাসীবিপ্লবের প্রাক্কালে যে গুরুতর বৈষম্য ও স্বেচ্ছাচার উপস্থিত হইয়াছিল এবং তৎপর মহাবীর নেপোলিয়ান কর্ত্তৃক সমগ্র ইউরোপে যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা আবশ্যক। যদি কেহ সুদূর অতীতের সাক্ষ্যে আস্থা স্থাপন করিতে দ্বিধা বোধ করেন, তবে তিনি বৎসহারা গাভী যেমন সজল-নেত্রে দীনভাবে অপহারকের প্রতি চাহিয়া দেখে, তদ্রূপ একবার বর্ত্তমান ইউরোপের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম পুরোহিত জেনারল স্মাট্ সম্প্রতি এক বক্তৃতা উপলক্ষে বলিয়াছেন, "বর্ত্তমান যুদ্ধ লক্ষ লক্ষ নরনারীর হৃদয়ে উৎকৃষ্টতর অবস্থা আনয়ন জন্য প্রবল আগ্রহ জাগ্রত করিয়াছে। প্রাচীন প্রথা অকর্ম্মণ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর সমস্ত সন্ধিপত্র এবং হিতবাদ লোকের বর্ণনাতীত যন্ত্রণা এবং ক্ষতিতে পরিসমাপ্ত হইয়াছে, বর্ত্তমান যুদ্ধে অশীতিলক্ষ মনুষ্য জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছে, এতদপেক্ষাও অধিক সংখ্যক মনুষ্য চিরকালের জন্য বিকলাঙ্গ ও অকর্ম্মণ্য হইয়াছে। এই যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীর সংখ্যার তুল্য হইয়াছে। যদি পুনর্ব্বার এইরূপ আপদ উপস্থিত হয়, তবে সমস্ত সভ্যতা সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। এখন কর্ম্মের সময়, অবনত মস্তকে বসিয়া থাকিবার সময় নহে। যুদ্ধে পরিচালন জন্য যে বিপুল উৎসাহ উদ্যম অপচিত হইতেছে, তাহার শতাংশ শান্তি সংস্থাপনজন্য প্রয়োগ করিলে যুদ্ধ একেবারে অসম্ভব হইবে। এই যুদ্ধের ফলে মানবজাতির হৃদয়ে শান্তি সংস্থাপন জন্য প্রবল আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছে, আমার বিশ্বাস এরূপ প্রবল আগ্রহ, আর পৃথিবীতে উপস্থিত হয় নাই। চিরশান্তি সংস্থাপন জন্য মানব মনের ও হৃদয়ের আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে। আমার বিশ্বাস যে, এই পরিবর্ত্তন আসন্ন হইয়াছে। প্রত্যেক জাতি আপন ভাগ্যের নিয়ন্তা হইবে, কেহই শক্তিশালীর প্রীতিবর্দ্ধন জন্য খণ্ডিত অথবা সঙ্কুচিত হইবে না"।* জেনারল স্মাটের আশা ফলবতী হইলে ঈশ্বরে ভক্তি ও মনুষ্যে প্রেম প্রতিষ্ঠিত হইবে।

কি মধুর দৃশ্য! এই দুঃখদিগ্ধ জগৎ সেই সুদিনে পবিত্র অমরাবতীর ন্যায় শোভান্বিত হইবে। মনুষ্য মাত্রেই নিজ নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য করিতেছে, কেহ কাহার প্রতি বিদ্বেষ করিতেছে না। জাতি জাতির প্রতি লোভ কটাক্ষ করিতেছে না। চতুর্দ্দিকে শান্তি পরিশ্রম, সুখ, স্বচ্ছন্দতা!! আমরা ও টেনিসেনের সঙ্গে বলিতেছি—

---

* বঙ্গ দর্শন, তৃতীয় খণ্ড, নবপর্য্যায়।

* Bengalee, May 19 1917

† নবজীবন।

"ঐ বাজে হোরা, দিয়ে অশ্রুধারা,
প্রাচীনে বিদায় দেও।
বাজে সুখ হোরা আনি আত্মহোরা
নূতনে ডাকিয়ে নেও।
গত আয়ুপ্রায়, গতবর্ষ প্রায়,
যাক্—দেও গত হতে।
হৃদয়-মন্দিরে, অসতে নিবারি
শিখহ পূজিতে সতে।
হোরা বাজে ঘন, ধনাঢ্য নির্ধন,
কলহ করহ দূর।
ধরণীর শেল দৌরাত্ম্য আচার,
ভাঙ্গিয়ে করহ চূর।
ধরণীর বিষ পরহিংসাদ্বেষ,
পরদুঃখে কর খেদ।
ঐ বাজে হোরা পুরাতনের সরা,
ঘুচায়ে অবনী ক্লেদ।
সহস্র বৎসর উৎকট বিগ্রহ,
উত্তাপে ধরণী জরা।
সহস্র বৎসর, শান্তির সলিলে,
শীতল হউক ধরা।*

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

(টাঙ্গাইল সাহিত্য-সংসদে পঠিত)

* নবজীবন।

† নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল হইতে সাহায্য গৃহীত হইয়াছে।

1. Oriental Christ (Pratap Majumdar)
2. History of Rome (C. Puller)
3. Martin Luther (Christian Literary Society)
4. Essays on the Progress of Christian Religion (John Earl Russel)
5. Worthies of the world (H. W. Dullken)
6. Roman Empire (Gibbon)
7. Middle ages (Hallam)
8. Religion and Authority in the middle ages (Hallam)
9. History of England (Green)
10. History of Civilisation in England (Buckle)
11. History of European morals (Lecky)

রাজসাহী চাষার গান।

(১)

আজ, বাদ্‌লা দিনের উদ্‌লা হাওয়ায়
এমোন্ হৈলাম ক্যান্!
ওরে, হুহু কৈরা হিদয় কাঁদে, হারায়ে যায় জ্ঞান!
আজ, ইদিক্ উদিক্ শুধা তাকাই, তাঁই তো কাছে নাই!
তাক্, বুকের কাছে আজ্‌কা পা'লে সত্যি বাঁচে যাই।

(২)

ওই, বড় বড় চোক দুটা আজ ক্যাবল্ মনে পড়ে!
তার, প্রেমের কথা বোল্‌তে গেলে প্রাণ থাকে না ধড়ে!
যখন, সাড়ী পৈরা চুলটা ছাইড়া সমুখ দিয়া যায়,
তখন, বুকের ভিতর প্রাণটা আমার খাড়া আছাড় খায়।

(৩)

তাঁই, আদর কৈরা গলা ধৈরা গালেৎ খাইতো চুমা!
কে যে বোল্‌তো তখন মনের কানেৎ 'ঘুমা রে তুই ঘুমা'!
আজ, অনেক তফাৎ পৈড়া আছি, পাইনা বুকেৎ বল!
তাই, আকাশ ফাইটা বিষ্টি পড়ে, নয়ন ফাইটা জল।

(৪)

আজ, এমোন্ দিনে না জানিরে ক্যামোন্ আছে সে!
ওরে, কোন্ঠি গেলে বুক্ জুড়াবে একবার বৈলা দে!
তার, বুকের ছোঁওয়া বুকটা দিয়া একটু খানিক চাই!
তোরা, বুঝ্‌বু কিরে, তাঁই ছাড়া আর আমার তো কেউ নাই!

(৫)

তাই, বাদ্‌লা দিনের উদ্‌লা হাওয়ায় হা-হুতাশে মরি!
আজ, ইচ্ছা করে ছুইটা গিয়া বুকেৎ চাইপা ধরি!
আর, চুমা খায়ে হাঁসে বোলি তোকি ভালোবাসি!
তুই, ক্যামোন্ কৈরা কোর্‌লু এমোন্ ওরে সব্বনাশী।

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

ভারতীয় সৌন্দর্য্য বিজ্ঞান।

অনেকেই জানেন যে, প্রসিদ্ধ দার্শনিক প্রফেসার নাইট 'সৌন্দর্য্যের দর্শন' (Philosophy of the Beautiful) নামক একখানা পুস্তক লিখিয়াছেন। ঐ পুস্তক রচনার সময় সৌন্দর্য্যতত্ত্ব বিষয়ে ভারতীয় পণ্ডিতগণের মত জানিবার জন্য তিনি পণ্ডিত প্রবর প্রফেসার মেক্‌স মূলারের নিকট একখানা পত্র লিখেন। তদুত্তরে প্রফেসার মেকসমূলার তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে হিন্দুগণের প্রকৃত সৌন্দর্য্যবোধ কখনও ছিল না। তাঁহারা ভাস্কর্য্যে বা চিত্রে কখনও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারেন নাই। হিন্দুজাতির কোন গ্রন্থ হইতে তাঁহাদের সৌন্দর্য্য বিষয়ক মত জানা যায় না। প্রফেসার নাইট বলেন:—"But there is scarcely a trace of a feeling for the Beautiful in the Brahmanical or Buddhistic writing". প্রফেসার নাইটের মতে ব্রাহ্মণ কি বৌদ্ধগ্রন্থে সৌন্দর্য্যতত্ত্বের কোন চিহ্নই নাই। প্রফেসার নাইটের 'সৌন্দর্য্যের দর্শন' নামক গ্রন্থ সৌন্দর্য্য বিজ্ঞান বিষয়ে য়ুরোপের একখানা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। প্রফেসার নাইটের গ্রন্থে একটা ভ্রমাত্মক মত লিপিবদ্ধ হওয়ায় য়ুরোপে ও আমেরিকায় এই ভ্রমাত্মক মতই প্রসার লাভ করিয়াছে। প্রফেসার নাইট সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই। সুতরাং তাঁহার পক্ষে এইরূপ ভ্রমাত্মক মত প্রচার করা অসম্ভব নহে। কিন্তু প্রফেসার মেক্‌সমূলার, যিনি আজীবন সংস্কৃতশাস্ত্র ও সাহিত্য আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে এইরূপ ভ্রমে পতিত হওয়া নিতান্তই আশ্চর্য্যের বিষয়। ইহা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, বৈদেশিক প্রবীণ পণ্ডিতের পক্ষেও হিন্দুজাতির ভাব পরিগ্রহ করা সহজ সাধ্য ব্যাপার নহে। প্রফেসার মেক্‌সমূলার ও অন্যান্য পণ্ডিতগণের মতে ঋগ্বেদ পৃথিবীর আদি গ্রন্থ। য়ুহুদী জাতির প্রাচীন ধর্ম্মকাহিনী (Old Testament), মিশরদেশের মৃতদিগের কাহিনী (The Book of the Dead), বেবিলনীয় জাতির সংহিতা (The Code of Hammurabi), পার্শী জাতির জেন্দাবেস্তা (Zend-Avesta) এবং চীনদেশীয় কনফিচুর মূলবচন (Texts of Confucius) প্রভৃতি ঋগ্বেদের পরবর্ত্তী সময়ের গ্রন্থ। এই প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে পৃথিবীর আদি-গ্রন্থ ঋগ্বেদ ও অন্যান্য ভারতীয় শাস্ত্র ও সাহিত্য গ্রন্থ আলোচনার দ্বারা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব যে, ভারতীয়গণ আদিম কাল হইতেই সৌন্দর্য্যের উপাসক এবং সৌন্দর্য্যের মূলতত্ত্ব সর্ব্বপ্রথমে ভারতেই জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। ঋগ্বেদ আলোচনায় আমরা দেখিতে পাই যে, ঋগ্বেদের সমস্ত দেবতাবর্গই মধুর উৎস, অমৃতের খনি। অগ্নি সুন্দর তেজোবিশিষ্ট, তাঁহার রূপ অতি সুদর্শনীয়, তাঁহার জিহ্বা মধুময়ী। ইন্দ্রের রূপ অতি বিচিত্র। উষা মধুময়ী, মধুময় আস্যে নিত্যই হাসিতে হাসিতে জীবের তন্দ্রা আলস্য দূর করেন ও পাপান্ধকার তিরোহিত করিয়া থাকেন।

অহোরাত্র দেবতা শোভন আভরণযুক্ত ও সুন্দর রূপবিশিষ্ট ; অশ্বিদ্বয় মধুর ভাণ্ডারস্বরূপ, তাঁহারা মধুবর্ষণ দ্বারা যজ্ঞ আপ্লাবিত করেন। দ্যাবা-পৃথিবী মধু-কোষ হইতে মধুক্ষরণ করিয়া থাকেন। সোমে মধু নিহিত আছে। বরুণ অমৃতের রক্ষক। বায়ুর গৃহে মধুর কলস সংস্থাপিত রহিয়াছে। মেঘ, ওষধি ও জল— মধু বিতরণ করিতেছে। পূষা বহু লোকের বন্দনীয়, মনোহর মূর্ত্তি। আদিত্য সুন্দর, তাঁহার স্বরূপ অতি নিগূঢ়। মরুৎগণ সর্ব্বদাই প্রীতিকর মনোহর লাবণ্য ধারণ করেন। অপাং নপাৎ হিরণ্যরূপ, হিরণ্যবর্ণ; তাঁহার শরীর সুন্দর, নামও সুন্দর। রুদ্র উজ্জল-রূপধারী। দেবতাশ্রেষ্ঠ উরুক্রম বিষ্ণুর পরম পদ মধুর উৎস। তাই বৈদিক ঋষিগণ নির্নিমেষ নয়নে সেই বিষ্ণুর পরম পদের সৌন্দর্য্য পান করিতেন। ঋগ্বেদে আছে,—

"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যংতি স্বরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততং॥

১ মণ্ডল, ২২ সূক্ত, ২০ ঋক্।

আকাশে সর্ব্বতোবিসারী চক্ষু যেরূপ দৃষ্টি করে, সেইরূপ জ্ঞানিগণ সর্ব্বদা বিষ্ণুর সেই পরম পদ দর্শন করিয়া থাকেন। ঋগ্বেদ নানা ভাষায় ও ছন্দে দেবতাগণের মনোহর মূর্ত্তির কথা বর্ণন করিয়াছেন, বৈদিক ঋষিগণ ইহা পরিষ্কাররূপে বুঝিয়াছিলেন। সমস্ত আনন্দ, সমস্ত সৌন্দর্য্য এক পরম পুরুষ হইতে সমুদ্ভূত। যখনি এই পরম পুরুষের আবির্ভাব অনুভূত হয়, তখনি সমস্ত ভূতজাত সুন্দর হয়, মধুময় হয়। শ্রাদ্ধসময়ে যে মধুদানের মন্ত্র পঠিত হয় উহা ঋগ্বেদীয় মন্ত্র। ঐ মন্ত্রটি ভালরূপে পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, ভূতগণের অন্তর্নিহিত আনন্দময় পুরুষের বার্ত্তা বৈদিক ঋষিগণ কিরূপ পরিষ্কারভাবে অনুভব করিয়াছিলেন। উক্ত অপূর্ব্ব মন্ত্রটী এই,—

"মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বী র্নঃ সংত্বোষধীঃ॥ ৬
মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥ ৭
মধুমান্নো বনস্পতি র্মধুমা অস্তু সূর্য্যঃ।
মাধ্বী র্গাবো ভবন্তু নঃ॥ ৮
শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নো ভবত্বর্য্যমা।
শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ॥ ৯॥

১ মণ্ডল, ৯০ সূক্ত

বায়ু মধুবর্ষণ করে, নদীসমূহ মধু ক্ষরণ করে। ওষধিসকল মাধুর্য্যযুক্ত হউক্।

রাত্রি ও উষা মধুর হউক্, পার্থিব জনপদ মাধুর্য্য বিশিষ্ট হউক্। সকলের জনক আকাশ মধুযুক্ত হউক্। বনস্পতি, সূর্য্য ও ধেনুসকল মধুর হউক্।

মিত্র, বরুণ অর্য্যমা, বৃহস্পতি, ইন্দ্র ও বিপুল-বিক্রম বিষ্ণু আমাদের পক্ষে সুখকর হউন্।

অথর্ব্ববেদ ও অন্য ভাষায় এক কাহিনীই বিবৃত করিতেছে। আথর্ব্বণ ঋষিগণের নিকট বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জীবন্ত, জাগ্রৎ। সমস্ত-ই প্রাণময়। তাঁহাদের মতে প্রাণেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত। প্রাণই বিরাট্, প্রাণই সকলকে পথ দেখাইয়া চলিয়াছেন, সেই প্রাণকেই সকলে উপাসনা করেন। প্রাণশক্তি মহীতে বিদ্যমান বলিয়া মহী বর্ণ ও রূপবৈচিত্র্যে পূর্ণ, রসে টলটলায়মান। অথর্ব্ববেদে আছে,—

"গিরয়স্তে পর্ব্বতা হিমবন্তোরণ্যং তে পৃথিবি স্যোনমস্তু।
বভ্রুং কৃষ্ণাং রোহিণীং বিশ্বরূপাম্ ধ্রুবাং ভূমিম্ পৃথিবীমিন্দ্রগুপ্তাম্।
অজিতোহহতো অক্ষতোধ্যষ্ঠাং পৃথিবীমহম্॥
(অ ১২, ১।)

হে পৃথিবী, তোমার গিরি, তোমার তুষারাবৃত পর্ব্বত, তোমার অরণ্য আমার সুখকর হউক। এই ধ্রুবা ভূমিই পিঙ্গলবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, অরুণবর্ণ,

বিচিত্ররূপ। এই দেবরক্ষিত ভূমির উপর অজিত, অহত ও অক্ষত হইয়া আমি প্রতিষ্ঠিত আছি।

আথর্বণগণ প্রকৃতির শোভায় মুগ্ধ হইয়া প্রকৃতির রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। রাত্রির শোভা দেখিয়া তাঁহাদের নিকট মনে হইত, রাত্রি যেন একটি রত্ন-খচিত পাত্র। দেখুন রাত্রির শোভা তাঁহাদিগকে কিরূপ আবিষ্ট করিত,—

ভদ্রাসি রাত্রি চমসো ন বিষ্টঃ।
চক্ষুষ্মতী মে উশতী বপূংষি প্রতি ত্বং দিব্যা ন ক্ষামমুক্থাঃ।

হে কল্যাণি রাত্রি, তুমি অলঙ্কৃত পান পাত্রের ন্যায় মনোরম। চক্ষুযুক্তা তুমি কত রূপই আমাকে দেখাইতেছ! কি উজ্জ্বল দিব্য বসন তুমি পরিধান করিয়াছ!

সমস্ত প্রকৃতির অন্তরালে এক অপরিবর্তনীয় সৌন্দর্যের উৎস বিদ্যমান। তাঁহারা অতি পরিষ্কাররূপে বুঝিয়াছিলেন, এই সনাতন উৎসই প্রকৃতিকে নানা সাজে সাজাইতেছে। অথর্ব্বেদ বলেন,—

সনাতন মেনমাহুরুতাদ্য স্যাৎ পুনর্ণব।
অহোরাত্রে প্রজায়েতে অন্যো অন্যস্য রূপসো॥

(অ, ১০, ৮, ২৩)

তাঁহাকে সনাতন বলা হইয়াছে এবং প্রতিদিনই বার বার নব নব রূপ হইতেছেন। দিন এবং রাত্রি একে অন্যের রূপকে পূর্ণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছেন।

অন্য স্থলে আছে,—

"পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে পূর্ণং পূর্ণেন সিচ্যতে
উতো তদদ্য বিদ্যাম যতস্তৎ পরিষিচ্যতে॥ (অ, ১০,৮,২৯)

পূর্ণ হইতে পূর্ণই বিনির্গত হইতেছে, পূর্ণ পূর্ণকে অভিসিঞ্চিত করিতেছে। আজ ইহাও জানিতে পারিয়াছি, কোন্ রস দ্বারা সেই সেচন চলিতেছে।

বাহুল্যভয়ে এস্থলেই আমরা বেদালোচনা হইতে বিরত হইলাম। ঋগেদ আলোচনায় আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে, ঋগ্বেদের সমস্ত দেবতাই সুন্দর ও মধুবর্ষী। সমস্ত ভূতজাতের অন্তরালে এক মধুময় আনন্দময় সত্তা বিদ্যমান। এই মধুময় সত্তার প্রকাশেই ভূতজাত মধুর, সুন্দর। অথর্ব্ববেদ হইতেও আমরা প্রকৃতির অন্তর্ব্বর্ত্তী এক পূর্ণ রসের উৎসের সংবাদ পাইতেছি। ঐ রসপূর্ণ সনাতন সত্তাই প্রকৃতিকে নানারূপে সজ্জিত করিতেছে, সমস্ত রস, সমস্ত সৌন্দর্য্য এই সনাতন সত্তা হইতেই উৎসারিত হইতেছে। তবে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, আনন্দময়ের আনন্দই যে সমস্ত আনন্দের খনি, রসময়ের রসই যে সমস্ত রসের উৎস, এই কথা আমরা পরিষ্কার ভাষায় সর্ব্বপ্রথমে উপনিষদেই সূত্রাকারে দেখিতে পাই।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মানন্দ বল্লীতে আছে,—

১। "যদ্ বৈ তৎ সুকৃতং রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।" (দ্বিতীয় বল্লী সপ্তম অনুবাক) যিনি সুকৃত তিনিই রসস্বরূপ। রসস্বরূপের রস প্রাপ্ত হইয়া জীব আনন্দিত হয়।

উক্ত বল্লীর অন্য স্থানে আছে,—"এষ হ্যেবানন্দয়তি"। (দ্বিতীয় বল্লী সপ্তম অনুবাক)—এই পরমাত্মাই সমস্ত ভূতের আনন্দের হেতু।

মুণ্ডকোপনিষদে আছে,—

"তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি"।

যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে, তাহাই তাঁহার আনন্দ-রূপ, অমৃতরূপ। যোগিগণ বিজ্ঞান দ্বারা তাঁহার ঐরূপ দর্শন করেন।

মুণ্ডকোপনিষদের অন্য স্থলে আছে,—

"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥"

পরমাত্মার প্রকাশেই সমস্ত অনুপ্রকাশিত, তাঁহার জ্যোতিতেই সমস্ত জ্যোতিষ্মান্।

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ বলেন,—

এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পদেষোঽস্য

পরমোলোক

এষোঽস্য পরম আনন্দ এতস্যৈবানন্দস্য অন্যানি

ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।

৪র্থ অধ্যায়, ৩য় ব্রাহ্মণ

ইহাই জীবের পরম গতি, ইহাই পরম সম্পদ, ইহাই পরম লোক, ইহাই পরম আনন্দ। অন্য ভূতসকল এই আনন্দের কণামাত্র লাভ করিয়া আনন্দিত হয়।

পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিসমূহ হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, অতি প্রাচীন কালেই ঋষিগণ সমস্ত ভূতের আনন্দের কারণ, ভূতের সৌন্দর্য্যের মূলতত্ত্ব নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, রসস্বরূপের রসই আনন্দময়ের আনন্দই সমস্ত সৌন্দর্য্যের প্রস্রবণ; নিখিল সৌন্দর্য্য সেই আনন্দময় পুরুষের আনন্দের প্রকাশ মাত্র।

য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন যে, মানুষ যখন কোন বিষয়ের মূলকারণ জানিতে চায়,কোন বিষয়ের'কেন' নির্ণয় করিতে অগ্রসর হন, তখনই দর্শনশাস্ত্র জন্ম পরিগ্রহ করে। ভারতীয় ঋষিগণ শুধু সৌন্দর্য্যের 'কেন' নির্ণয় করিয়া যান নাই, তাঁহারা ইহার শেষ মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং সৌন্দর্য্যের দর্শন ঔপনিষদ যুগেই ভারতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে—ইহা অসন্দিগ্ধ চিত্তে বলা যাইতে পারে। সৌন্দর্য্যতত্ত্বের ধীরভাবে চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে, প্রাচীন ঋষিগণ, যে মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন, উহা শুধু দার্শনিক মীমাংসা নহে, উহা সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের চরম মীমাংসা। বিংশ শতব্দীর সভ্যতা উহার নিকট হার মানিয়াছে। ঔপনিষদ দর্শন ব্রহ্মসূত্রেও এই তত্ত্বই সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের ১৩ সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ২০ সূত্র পর্য্যন্ত সূত্রসমূহ আনন্দময় অধিকরণের অন্তর্গত। এই অধিকরণের সূত্র সমূহের ব্যাখ্যান সম্বন্ধে আচার্য্য-গণের মধ্যে বিশেষ কোন মতভেদ পরিদৃষ্ট হয় না। আমরা সূত্রসমূহ উদ্ধৃত করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতেছি। শ্রোতৃবর্গ একটু ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া শ্রবণ করিলে অনুগৃহীত হইব।

১৩ সূত্রটি এই—আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ ॥

শ্রুতি আনন্দময় শব্দ পরমাত্মবিষয়ক আনন্দকে লক্ষ্য করিয়া পুনঃ২ ব্যবহার করিয়াছেন। সুতরাং পরমাত্মা আনন্দময়, জীব আনন্দময় শব্দের বাচ্য নহেন। এক্ষণ আপত্তি হইতে পারে, যে আনন্দময় শব্দ ময়ট্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ। ময়ট্ প্রত্যয় বিকারার্থ বোধক। সুতরাং অধিকারী পরমাত্মা আনন্দময় শব্দের বাচ্য হইতে পারেন না। এই আপত্তির উত্তরে ব্রহ্মসূত্রে বলিতেছেন,—

বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ ॥১৪॥

বিকার প্রত্যয়ান্ত ময়ট্ শব্দের প্রয়োগ হেতু পরমাত্মা আনন্দময় নহেন,—এ আপত্তি গ্রহণীয় নহে। কারণ প্রাচুর্য্যার্থেও ময়ট্ প্রত্যয়ের প্রয়োগ আছে। প্রকৃত পক্ষে আনন্দময় শব্দ প্রাচুর্য্যার্থক ময়ট্ প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। আনন্দময় শব্দের অর্থ—প্রচুর আনন্দের আলয়। সুতরাং পরমাত্মাই আনন্দময়।

১৫ সংখ্যক সূত্রটি এই—

তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ ॥

শ্রুতি পরমাত্মাকে জীবানন্দের হেতু বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। সুতরাং পরমাত্মাই আনন্দময় পদবাচ্য।

ভাষ্যকারগণ এই সূত্রের ভাষ্যে "রসং হ্যেবায়ং লব্ধা-নন্দী ভবতি" "এষ হ্যেবানন্দয়াতি" ইত্যাদি শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

১৬ সংখ্যক সূত্রটি এই—"মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে"

মন্ত্রোক্ত "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ই আনন্দময় শব্দে গীত হইয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্মই আনন্দময় পদ বাচ্য।

১৭ সংখ্যক সূত্রটি এই—

নেতরোঽনুপপত্তেঃ ॥

তৈত্তিরীয় শ্রুতি আনন্দময়কে লক্ষ্য করিয়া যে সকল অসাধারণ ধর্ম্মের উক্তি করিয়াছেন, তাহা জীবে উপপন্ন হইতে পারে না। তদ্ধেতু ব্রহ্মই আনন্দময়, জীব আনন্দ-ময় নহেন।

১৮ সংখ্যক সূত্রটি এই—

ভেদব্যপদেশাচ্চ ॥

রসং হ্বেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি—এই শ্রুতি লব্ধব্য আনন্দময় ব্রহ্ম ও লব্ধা জীবের ভেদ প্রদর্শন করাতে পরমাত্মাই আনন্দময় শব্দের বাচ্য, জীব আনন্দময় শব্দের বাচ্য হইতে পারেন না।

১৯ সংখ্যক সূত্রটি এই—

কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা ॥

অন্য কোন উপাদানের সাহায্য না লইয়াই আনন্দময় নিজ ইচ্ছাতে এই সৃষ্টি বিস্তার করিয়াছেন বলিয়া শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন। জীব উপাদানের সাহায্য ব্যতীত কিছুই রচনা করিতে পারেন না। সুতরাং জীব কখনই এই আনন্দময় শব্দ বাচ্য নহেন।

২০ সংখ্যক সূত্রটি এই—

অস্মিন্নস্য চ তদ্যোগং শাস্তি ॥

পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করিয়া জীব আনন্দযোগ লাভ করে ইহা শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন। সুতরাং জীব কখনই আনন্দময় হইতে পারে না, পরমাত্মাই আনন্দময়।

প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ২২ সংখ্যক সূত্রটি এই—

অনুকৃতেস্তস্য চ ॥

এই সূত্রটি দহর অধিকরণের সূত্র। দহর নিত্য আবির্ভূত স্বরূপ। "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং" এই শ্রুতি বলেন যে, অন্যান্য ভূতসমূহ তাঁহার প্রকাশেই প্রকাশ পাইতেছে। সুতরাং জীব কখনই সেই নিত্যাবির্ভূতস্বরূপ দহর হইতে পারেন না।

দেখা যায় যে, আমরা ইতঃপূর্ব্বে যে সব শ্রুতি উপনিষৎ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি সমস্তই সূত্রাকারে ব্রহ্মসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্র হইতে আমরা পাইতেছি যে পরমাত্মা আনন্দময়, অসীম আনন্দের খনি। জীবের নিজের কোন আনন্দ নাই, জীব সেই পরমাত্মার আনন্দে আনন্দিত হয়েন। পরমাত্মা রসের সাগর, জীব সেই রসের ভোক্তা। পরমাত্মার রসে রসযুক্ত হইয়া জীব আনন্দযোগ প্রাপ্ত হয়েন। সমস্ত ভূতই তাঁহার প্রকাশেই প্রকাশবান্। আর একটি সূত্রের উল্লেখ করিয়া আমরা ব্রহ্মসূত্রের নিকট বিদায় গ্রহণ করিব।

সূত্রটি এই—পটবচ্চ ॥ ২য় অধ্যায়, ১ম পাদ, ১৮ সূত্র।

এই সূত্রের নিম্বার্কভাষ্য এই—"যথা চ সংবেষ্টিতঃ পশ্চাৎ প্রসারিতঃ পটস্তদ্বদ্বিশ্বমিতি।" সংবেষ্টিত বস্ত্র যেমন প্রসারিত হয়, তদ্বৎ বিশ্বও অপ্রকাশ্য অবস্থা হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর একটি গভীর তত্ত্বাত্মক, নিগূঢ় ভাবব্যঞ্জক উক্তি কোন দেশের কোন দর্শনে আছে কি না, আমরা জানি না। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কারুকার্য্য খচিত ভাঁজ করা বস্ত্রের ন্যায় ছিল। ভাঁজ করা বস্ত্রের কোন কারুকার্য্য, কোন সৌন্দর্য্যই লোক দৃষ্টির বিষয়ীভূত হয় না। কিন্তু সেই ভাঁজ করা বস্ত্র যখন প্রসারিত করা হয়, তখন সকলেই তাহার কারুকার্য্য দেখিয়া মোহিত হন। অপ্রকট অবস্থায় এই বিশ্বের কোন সৌন্দর্য্য থাকে না; কিন্তু সেই বিশ্বশিল্পী কারুকার্য্যখচিত এই ভাঁজ করা বস্ত্রকে প্রসারিত করিলেন, অমনি এই বিশ্বের সৌন্দর্য্য, কারুকার্য্য সমস্ত প্রকাশিত হইয়া পড়িল। যে বিষয় লুকায়িত ছিল তাহা জীবমাত্রের প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হইয়া পড়িল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিশ্বশিল্পীর রসখচিত পট। তাই জনগণ এই বিশ্বপটের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। সর্ব্বপ্রধান জার্ম্মান্ দার্শনিক কাণ্ট এই বিশ্বপটের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছেন,—

"Two things there are, which, the oftener and the more steadfastly we consider them, fill the mind with an evernew and everrising admiration and reverence; the starry heaven above and the Moral Law within."

দুইটী বস্তুর বিষয় আমি যতই চিন্তা করি, ততই আমার মন বিস্ময় ও ভক্তিরসে আর্দ্র হয়, সেই দুইটি বস্তু—নক্ষত্র-খচিত সুনীল আকাশ ও অন্তরস্থিত কর্ত্তব্যবুদ্ধি।

যিনি এই বিশ্বপট প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহাকে শত শত নমস্কার। পরবর্ত্তী শাস্ত্র ও সাহিত্য গ্রন্থে এই রসতত্ত্ব আরো অধিকতর বিকাশ লাভ করিয়াছে। সুন্দর বলিতে রসযুক্ত বস্তুকে লক্ষ্য করা হয়। যাহাতে রস নাই তাহা ভারতবাসীর নিকট সুন্দর নহে। প্রাচীন অভিধানকার অমরসিংহের উক্তি হইতে আমাদের কথার যাথার্থ্য পরিষ্কাররূপে উপলব্ধ হইবে। অমরসিংহ বলেন,—

"সুন্দরং রুচিরং চারু সুষমং সাধু শোভনং।
কান্তং মনোরমং রুচ্যং মনোজ্ঞং মঞ্জু মঞ্জুলং॥
বিশেষ্য নিঘ্নবর্গ।

অমরসিংহের মতে সুন্দর শব্দের অর্থ কান্ত, চারু ইত্যাদি। কান্ত শব্দের অর্থ কান্তিযুক্ত বা রসযুক্ত। হিন্দুর নিকট রসযুক্ত বস্তুই সুন্দর। রস ব্যতীত হিন্দুর সৌন্দর্য্যের আর কোন ধারণা নাই। এক্ষণে দেখা যাক্ রস কাহাকে বলে? রস্যন্তে আস্বাদ্যন্তে রসাঃ রসাৎ ক আস্বাদে ঘঞ্। যাহা আস্বাদ করা যায় তাহাই রস। কবিরাজী শাস্ত্রে মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষায় রসনেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য এই ছয়-প্রকার আস্বাদকে রস সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু অলঙ্কার শাস্ত্র ও ভক্তিশাস্ত্রের রস ভিন্ন লক্ষণযুক্ত। অলঙ্কারশাস্ত্রমতে রত্যাদি স্থায়ী ভাব-সমূহ বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া আনন্দজনক হইলে উহা রসরূপে পরিণত হয়। কবিরাজী শাস্ত্রের রসের রসনেন্দ্রিয়ের সহিত যোগ, আর অলঙ্কারশাস্ত্র-কথিত রসের চিত্তের সহিত যোগ। মানবের চিত্তে রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময়, শম ও বাৎসল্য এই দশটি স্থায়ীভাব স্বতঃই বিদ্যমান আছে। বিভাবানুভাবাদির যোগে তাহা রসরূপে পরিণমিত হইয়া প্রকাশ পায় মাত্র। আলঙ্কারিকগণের মতে বিভাব অর্থাৎ রসাস্বাদনের হেতু দুইটি—আলম্বন, ও উদ্দীপন। যে বিষয়কে অবলম্বন করিয়া আমাদের মনে রস উদ্দীপ্ত হয় তাহাই আলম্বন বিভাব। পুত্র দেখিলে আমাদের মনে বৎসল রস জাগিয়া উঠে। সুতরাং পুত্র বৎসল রসোদ্বোধের কারণ বা আলম্বন। যে সব চেষ্টা, চিন্তা ও ভাব রসোদ্দীপনের সহায়তা করে, তাহারাই উদ্দীপন বিভাব। পুত্রের বিদ্যা, শৌর্য্য, দয়া, আলিঙ্গন প্রভৃতি আমাদের মনে বৎসল রসের উদয় করিয়া দেয়। অতএব পুত্রের ঐ সব চেষ্টা, চিন্তা ও ভাব বৎসলরসের উদ্দীপন বিভাব। রস মানবের মনে সঞ্চারিত হইলে শরীরে কতগুলি বিকার প্রকাশ পায়। ঐ সব বিকার হইতে আভ্যন্তরিক রসের অনুভব হয় বলিয়া ইহাদিগকে অনুভাব বলা হইয়া থাকে। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয় এই আটটি সাত্ত্বিক অনুভাব। এই আটটি অনুভাবের সঙ্গে২ সময় সময় নির্বেদ, আবেগ, দৈন্য প্রভৃতি কতকগুলি সাময়িক মানসিক ও শারীরিক বিকার মানবে প্রকাশ পায়। এই সব অস্থায়ী মানসিক ও শারীরিক বিকার সমূহ ব্যভিচারী বা সঞ্চারী নামে অভিহিত হয়। ভক্তিশাস্ত্রকারগণ এই রসতত্ত্বে আরো একটু গভীর ভাবে প্রবেশ করিয়াছেন। আলঙ্কারিকগণ কাব্যের হিসাবে রসতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন, অপিচ ভক্তিশাস্ত্রকারগণ ভগবানের দিক্ হইতে রসতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। ভক্তিশাস্ত্রমতে মুখ্য ও গৌণভেদে রতি দুই প্রকার। শুদ্ধ সত্ত্ব বিশেষরূপ রতিসমূহ মুখ্য, এবং ধারাবাহিকত্ব বিহীন, অস্থায়ী রতি সমূহ গৌণ, বলিয়া কথিত হয়। গৌণ রতি সমূহ সময়ে সময়ে মুখ্যরতির আশ্রয়ে স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হয়। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটি মুখ্য, এবং হাস্য, বিস্ময়, উৎসাহ, শোক, ক্রোধ, ভয় ও জুগুপ্সা বা নিন্দা এই সাতটি গৌণ রতি। স্থায়ীভাব কৃষ্ণরতি, বিভাব, অনুভাব সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী দ্বারা ভক্তজনের হৃদয়ে আস্বাদনীয়

রূপে আনীত হইলে, উহা ভক্তিরস বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। মুখ্যরতি সমূহ মুখ্য ভক্তিরসরূপে পরিণমিত হয় এবং গৌণ রতি সমূহ গৌণ ভক্তিরসরূপে পরিণমিত হয়। ভক্তিরস মুখ্য ও গৌণ ভেদে দুই প্রকার। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটি মুখ্য ভক্তিরস, হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, এবং বীভৎস এই সাতটি গৌণ ভক্তিরস।

সাহিত্যদর্পণকার বলেন 'বাক্যং রসাত্মকম্ কাব্যম্'। রসাত্মক বাক্য কাব্য। আলঙ্কারিকগণের মতে রসাত্মকতার উপরই কাব্যের কাব্যত্ব নির্ভর করে। রসশূন্য কাব্য কাব্যই নয়। রসই কাব্যের সৌন্দর্য্যের মূলীভূত কারণ। শুধু রস থাকিলেই কাব্য সুন্দর হয় না, রসাঙ্গ সমূহের যথাযোগ্য সন্নিবেশের উপরই কাব্যের কাব্যত্ব নির্ভর করে। ভক্তিশাস্ত্রমতেও রসই সৌন্দর্য্যের জীবন। রসবিহীন বস্তু কখনই সুন্দর হইতে পারে না। রসোদ্দীপনের ক্ষমতার উপর বস্তুর সৌন্দর্য্য নির্ভর করে। সুন্দর বস্তুতে যে শুধু রস বিদ্যমান থাকে তাহা নহে, সুন্দর বস্তুতে রসাঙ্গ সমূহের যথোচিত সন্নিবেশ দ্বারা আমাদের মনে রস জাগায়। শ্রীমদ্রূপগোস্বামীপাদ সৌন্দর্য্যের এই সংজ্ঞা দিয়াছেন,—

"ভবেৎ সৌন্দর্য্যমঙ্গানাং সন্নিবেশো যথোচিতম্।"

অঙ্গসমূহের যথাযোগ্য সন্নিবেশই সৌন্দর্য্য।

কাব্য সুন্দর হইতে হইলে কাব্যের রস যথাস্থানে স্থাপিত হওয়া চাই। সঙ্গীত সুমিষ্ট, চিত্তাকর্ষক হইতে হইলে সঙ্গীতের রসাঙ্গ সমূহ যথাযথরূপে প্রকাশিত হওয়া চাই। স্থাপত্য বল, ভাস্কর্য্য বল, চিত্র বল অঙ্গসমূহের যথাযোগ্য সন্নিবেশের উপরই তাহাদের সৌন্দর্য্য নির্ভর করে। কি প্রাকৃত, কি অপ্রাকৃত, উভয় জগতেই সৌন্দর্য্যে অঙ্গসমূহের যথাযোগ্য সন্নিবেশ পরিদৃষ্ট হয়। প্রাকৃত জগতে সৌন্দর্য্যের উপকরণ বা অঙ্গসমূহ স্থূল। তাহাদের স্থূলতা রসোদ্ভবে কণ্টক। বাধা জন্মায়। প্রাকৃত পদার্থের মধ্যেও সূক্ষ্ম পদার্থ আছে। এই সব সূক্ষ্ম পদার্থ স্থূল পদার্থ অপেক্ষা অধিক রস প্রদানক্ষম। স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য অপেক্ষা চিত্র, সঙ্গীত, কাব্যের উপকরণ সূক্ষ্ম। তাই সৌন্দর্য্য বিষয়ে তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব একরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত। অপ্রাকৃত জগতে কোন প্রাকৃত উপকরণ নাই। সেখানে রস—আনন্দই সৌন্দর্য্যের অঙ্গ, রস—আনন্দই সৌন্দর্য্যের গঠন। তথায়ও রসের যথোচিত সন্নিবেশই সৌন্দর্য্য।

আমরা "সৌন্দর্য্যতত্ত্ব" নামক গ্রন্থে প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, সৌন্দর্য্যের প্রাকৃত উপকরণ সমূহেও রস বিদ্যমান আছে বলিয়াই প্রাকৃত উপকরণ সমূহের সাহায্যে রস উদ্দীপ্ত করা সম্ভব হয়। শ্রীমদ্ দণ্ড্যাচার্য্য কাব্যাদর্শে যথার্থই বলিয়াছেন,—

মধুরং রসবৎ বাচি বস্তুন্যপি রসস্থিতিঃ।

যেন মাদ্যন্তি ধীমন্তো মধুনেব মধুব্রতাঃ॥

১ম পরিচ্ছেদ, ৫১

রসবিশিষ্ট বাক্যকে মাধুর্য্যগুণযুক্ত বলে। বাক্য ও বস্তু উভয়েই রস অবস্থান করে। ভ্রমরগণ যেমন মধুপানে মত্ত হয়, পণ্ডিতগণ তদ্রূপ রসপানে উন্মত্ত হইয়া থাকেন।

আমরা যে রসতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিলাম উহা আধুনিক নহে। বেদে এই রসতত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। রসই সৌন্দর্য্যের জীবন, ইহা উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্রে ঘোষণা করা হইয়াছে। রসের প্রকার ভেদ কোন্ শাস্ত্রে প্রথমতঃ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা আমরা নির্ণয় করিতে সমর্থ হই নাই। তবে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই ভারতে রসের শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে, এরূপ আমাদের দৃঢ় প্রতীতি। রামায়ণের বালকাণ্ডে প্রথমতঃ রসের শ্রেণীবিভাগের বিষয় উল্লিখিত পরিদৃষ্ট হয়। তথন উক্ত হইয়াছে,—

রসৈঃ শৃঙ্গারকরুণ হাস্যরৌদ্রভয়ানকৈঃ। বীরাদি-

তীরসৈবুক্তং কাব্যমেতদগায়তাম্ ॥" রামায়ণের টীকাকার বলেন যে "বীরাদীত্যাদিনা বীভৎসাদ্ভুতশান্ত সংগ্রহঃ"।

রামায়ণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, রামায়ণের সময়ে ভারতীয় আর্য্যসমাজে স্ত্রী-পুরুষ মধ্যে কথা-বার্ত্তায় সংস্কৃত ভাষাই প্রচলিত ছিল। ভাষাতত্ত্ব-বিদ্‌গণ স্বীকার করেন যে, ভগবান্ বুদ্ধদেবের জন্ম-কালে সাধারণে কথাবার্ত্তায় লৌকিক সংস্কৃত ব্যবহার করিতেন না। সুতরাং রামায়ণ যে ভগবান্ বুদ্ধ-দেবের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। রামায়ণে শৃঙ্গার, করুণ, হাস্য, রৌদ্র, ভয়ানক, বীর, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত রসের কথা পাই। প্রাচীন অভিধানকার অমরসিংহ বলেন,—

> শৃঙ্গার-বীর-করুণাদ্ভুত-হাস্য ভয়ানকাঃ।
> বীভৎস রৌদ্রে চ রসাঃ শৃঙ্গারঃ শুচিরুজ্জ্বলঃ॥"
>
> অমরকোষ, স্বর্গবর্গ।

অমরকোষের টীকাকার ভরত বলেন,—"চ শব্দাৎ শান্তবৎসলাবপি সংগৃহীতাবিতি কেচিৎ॥" সুতরাং অমরসিংহের পূর্ব্ব হইতেই ১০টী রসের কথাই আলঙ্কারিকগণ ও কবিগণ জানিতেন, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। পরবর্ত্তী সময়ে অলঙ্কার গ্রন্থে ও ভক্তিশাস্ত্রে এই রসতত্ত্ব বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে মাত্র। রসাঙ্গসমূহের যথোচিত সন্নিবেশই যে সৌন্দর্য্যের মূলতত্ত্ব, মহাকবি কালিদাস পরিষ্কার ভাষায় তাহা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। মহাকবি কালিদাস পার্ব্বতীর রূপবর্ণনা কালে বলিয়াছেন,—

> "সর্ব্বোপমাদ্রব্যসমুচ্চয়েন,
> যথাপ্রদেশং বিনিবেশিতেন।
> সা নির্ম্মিতা বিশ্বসৃজা প্রযত্না
> দেকস্থ-সৌন্দর্য্যদিদৃক্ষয়েব॥ ৪৯, কুমারসম্ভব, প্রথম সর্গ।

বিধাতা সমস্ত উপমার দ্রব্যরাশিকে যথাস্থানে বিনিবেশিত করিয়া একস্থানে সৌন্দর্য্য দেখিবার উদ্দেশ্যে পার্ব্বতীকে যত্নসহকারে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মহাকবি কালিদাস সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর লোক ছিলেন। কালিদাসের বর্ণনা হইতে আমরা সৌন্দর্য্যের মূলতত্ত্ব বুঝিতে পারি। কালিদাস বলিয়াছেন সমস্ত উপমার দ্রব্যরাশিকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া বিধাতা পার্ব্বতীকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পদ্ম, চন্দ্রমা, হরিণীর নেত্র ইত্যাদি উপমার দ্রব্য। উপমার দ্রব্য মাত্রেই রসের আধিক্য দৃষ্ট হয়। অন্য কথায় বলিতে গেলে রসাঙ্গ সমূহের যথাযোগ্য সন্নিবেশ দ্বারা বিধাতা আদর্শ সুন্দরী পার্ব্বতীকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অঙ্গ-সমূহের যথাযোগ্য সন্নিবেশই যে সৌন্দর্য্য, ইহা মহাকবি কালিদাস পার্ব্বতীর সৌন্দর্য্যের বর্ণনা উপলক্ষ্যে জগৎকে বুঝাইয়াছেন।

ভক্ত বৈষ্ণব কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য-চরিতামৃতে এই রসতত্ত্ব সুন্দরভাবে বুঝাইয়াছেন। এই অপ্রাকৃত রসতত্ত্ব ভক্তের জীবনসর্ব্বস্ব। যিনি মজিয়াছেন, যিনি ডুবিয়াছেন তিনিই জানেন এই রসতত্ত্ব কি। আমরা উক্ত গ্রন্থরাজ হইতে নিম্নে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিলাম,—

> "এই সব কৃষ্ণভক্তিরস স্থায়ী ভাব।
> স্থায়ী ভাবে মিলে যদি বিভাব অনুভাব॥
> সাত্বিক ব্যভিচারী ভাবের মিলনে।
> কৃষ্ণ ভক্তিরস হয় অমৃত আস্বাদনে॥
> যৈছে দধি সিতা ঘৃত মরিচ কর্পূর।
> মিলনে রসানা হয় অমৃত-মধুর॥
> ভক্তভেদে রতিভেদ পঞ্চ পরকার।
> শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি আর॥
> বাৎসল্যরতি, মধুররতি এ পঞ্চ বিভেদ।
> রতিভেদে কৃষ্ণ ভক্তিরস পঞ্চ ভেদ॥
> শান্তদাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুররস নাম।
> কৃষ্ণ ভক্তিরস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান॥

হাস্যাদ্ভুত বীর করুণ রৌদ্র বীভৎস ভয়।
পঞ্চবিধ ভক্তে সপ্ত গৌণ রস হয় ॥
পঞ্চরস স্থায়ী ব্যাপী রহে ভক্ত মনে।
সপ্ত গৌণ আগন্তুক পাইয়া কারণে ॥

মধ্যলীলা, ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

তাই বলিতেছিলাম, প্রাকৃত জগতে রসাঙ্গসমূহের যথাযোগ্য সন্নিবেশই সৌন্দর্য্য। কবি, কলাবিৎ, ভক্ত সকলেই রসের কাঙ্গাল, রস খোঁজেন। কেহ প্রাকৃত জগতে খোঁজেন, কেহ অপ্রাকৃত জগতে খোঁজেন। অপ্রাকৃত জগতের সৌন্দর্য্য, রসই প্রাকৃত জগতের সৌন্দর্য্যের ভিত্তি। এই রসতত্ত্ব ভারতের গোপ্য ধন। এই ধনে ভারত প্রাচীন কাল হইতেই ধনী।

আর একটি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। য়ুরোপে সৌন্দর্য্য-মতবাদিগণের মধ্যে Impressionist school অর্থাৎ উদ্দীপনবাদী বলিয়া একটা নূতন সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ের মত এই যে, যে পরিমাণে বস্তু আমাদের চিত্তে ভাব জাগাইতে পারে উহা সেই পরিমাণে সুন্দর। বস্তুর ভাবোদ্দীপনের ক্ষমতার উপর বস্তুর সৌন্দর্য্য নির্ভর করে। এই সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণের ভাব উদ্দীপনের ক্ষমতাই বস্তুর সৌন্দর্য্যের মূলতত্ত্ব বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

ইটালীদেশীয় প্রসিদ্ধ দার্শনিক ক্রচে (Croce) অল্প দিন হইল সৌন্দর্য্যতত্ত্ব সম্বন্ধে যে পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতে পরিষ্কার ভাবে প্রচার করিয়াছেন, যে তাহাই সুন্দর যাহাতে আমরা আমাদের ভাবের প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া থাকি। ক্রচের মতে ব্যক্তিগত উচ্চভাবই (Emotion) সৌন্দর্য্যের মূলতত্ত্ব।

কেম্ব্রিজের ললিতকলার প্রফেসার সিড্‌নি কল্‌বিন্‌ ললিতকলা বিষয়ে ইংলণ্ডের মধ্যে একজন প্রবীণ ব্যক্তি। তিনি Encyclopaedia Britannica অভিধানে ললিত-কলা (Fine Arts) শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

Encyclopedia Britannicaর নবম সংস্করণে তিনি ললিতকলার এই সংজ্ঞা দিয়াছেন :—

"Fine Arts are those of which the results afford to many permanent and disinterested delight, and of which the performance, calling for premeditated skill, is capable of regulation up to a certain point, but, that point passed, has secrets beyond the reach and a freedom beyond the restraint of rules."

কিন্তু Encyclopaedia Britannicaর একাদশ সংস্করণে তিনি ললিতকলার এই সংজ্ঞা দিয়াছেনঃ—

"Fine Art is everything which man does or makes in one way rather than another, freely and with premeditation, in order to express and arouse emotion, in obedience to laws of rhythmic movement of utterance or regulated design, and with results independent of direct utility and capable of affording to many permanent and disinterested pleasure."

পূর্ব্বোদ্ধৃত দুইটি সংজ্ঞা তুলনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, একাদশ সংস্করণে "in order to express and rouse emotion" এই কয়েকটি কথা যোগ করা হইয়াছে। সিড্‌নি কল্‌বিন বুঝিতে পারিয়াছেন যে, উচ্চভাবের প্রকাশ ও উদ্দীপনের ক্ষমতার উপরই ললিত কলার বিশেষত্ব নির্ভর করে। তাই বৃটেনের বিশ্বকোষের একাদশ সংস্করণে এই কয়েকটি অত্যাবশ্যক কথা যোগ করিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ লেখক কেরিট (Carritt) ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে যে সৌন্দর্য্যতত্ত্ব বিষয়ক মত (Theory of Beauty) নামক গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহার উপসংহারে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন :—

"If any point can be thought to have

emerged from the foregoing considerations, it is this: that in the history of aesthetic, we may discover a growing consensus of emphasis upon the doctrine that all beauty is the expression of what may be generally called emotion, and that all such expression is beautiful."

পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা হইতে যদি কোন স্থির সিদ্ধান্ত পাওয়া গিয়া থাকে, তাহা এই, সৌন্দর্য্য বিজ্ঞানের ইতিহাস পর্য্যালোচনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, অধিকাংশ পণ্ডিতই বর্ত্তমানে সৌন্দর্য্যকে উচ্চশ্রেণীর ভাবের প্রকাশক বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, এবং তাঁহারা ইহাও বলিতেছেন যে, উচ্চশ্রেণীর ভাবের প্রকাশই সৌন্দর্য্য।

উচ্চশ্রেণীর ভাবের প্রকাশই সৌন্দর্য্য, ইহা য়ুরোপের অনেক পণ্ডিত ধরিতে পারিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের অনেকের ইহাই মত যে, ব্যক্তিগত উচ্চ-ভাবের প্রকাশই সৌন্দর্য্য। ব্যক্তিগত মানসিক উচ্চ ভাব ব্যতীত বস্তুগতভাবে উচ্চভাব থাকিতে পারে, ইহা তাঁহাদের কল্পনায়ই আসে নাই। নিখিল-রসের প্রস্রবণ-বস্তুগতভাবে বিদ্যমান, ব্যক্তিগত উচ্চ ভাব ও রসের তিনিই মূলতত্ত্ব, এ কথা এ পর্য্যন্ত তাঁহারা ধরিতে পারেন নাই। রসস্বরূপ ভগবান্ ওতপ্রোতভাবে সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তাঁহার আনন্দ, তাঁহার রসই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৌন্দর্য্যের মূল কারণ— ইহা তাঁহাদিগের অনেকের নিকট বাতুলের প্রলাপ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। বস্তুগত জীবন্ত আনন্দময় পুরুষের সংবাদ না পাইয়াই অনেক জার্ম্মান্ দার্শনিক এমন কি হেগেল পর্য্যন্ত ললিত কলাই প্রত্যক্ষ ঈশ্বর একথা প্রচার করিয়াছেন। যাঁহারা অখিল রসামৃত মূর্ত্তির খবর পাইয়াছেন, তাঁহারা জানেন পার্থিব সমস্ত ললিত কলার সৌন্দর্য্য, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পদার্থ রাশির সৌন্দর্য্য, সেই পর সৌন্দর্য্যের এক কণিকা মাত্রও প্রকাশ করিতে পারে না। এই সৌন্দর্য্যের খবর পাইয়াই ভক্তকবি চণ্ডীদাস বলিয়াছেন,—

জনম অবধি হাম, রূপ নেহারনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সেহি মধুর বোল, শ্রবণহি শুনমু,
শ্রুতিপথে পরশ না গেল।
কত মধু যামিনী, রভসে গোঁয়ায়নু
না বুঝনু কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ, হিয়ে হিয়ে রাখনু,
তবু হিয়া জুড়ান না গেলি॥"

এই পর সৌন্দর্য্যের খবর পাইয়াই ভক্ত হাফেজ বলিয়াছেন,—"কখন আমার প্রাণ হইতে তোমার প্রতি অনুরাগ স্খলিত হইবে না, কখন সেই সরল তরু আমার স্মৃতি হইতে বিচ্যুত হইবে না। তোমার প্রেম আমার মন প্রাণে এরূপ বদ্ধমূল হইয়াছে, যে, যদি শিরশ্ছেদও হয় তথাপি প্রাণ হইতে তোমার প্রেমের বিচ্ছেদ হইবে না।" এই পরসৌন্দর্য্যে নিজকে বিকাইয়া মহাত্মা গোস্বামিপাদ "বক্তৃতা ও উপদেশ" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন,—

"বস্তুতঃ যত দিন সেই সুন্দরতমের দর্শন না হয়, ততদিন লোক প্রলোভনে পতিত হয়। একবার তাঁহাকে দেখিতে পাইলে, আর কি মন অন্যদিকে ফিরিতে পারে? তখন ইচ্ছা করিয়াও আর পাপ-পথে যাওয়া যায় না, লোক পাপবিষয়ে অক্ষম হইয়া পড়ে। তাঁহার সৌন্দর্য্য বর্ণনার কোন ভাষা নাই—কোন উপমা নাই। এই যে ব্রহ্মাণ্ডের চন্দ্র তারা ফুল ফল, এ সকল সুন্দর পদার্থ দেখিয়া আমরা ইহাদিগের প্রশংসা করিয়া থাকি, ইহা মিথ্যা, অসারের অসার; সে সৌন্দর্য্যের কণামাত্রও ইহাতে প্রকাশ পায় না; সে স্বতন্ত্র অন্যবিধ পদার্থ

প্রাণেই আছে, একটু আড়াল ভাঙ্গিলে দেখা যায়।”

অখিল রসামৃতের মূর্ত্তি ভগবানেই ভারতীয় সৌন্দর্য্য বিজ্ঞানের পরিসমাপ্তি। ব্যক্তিগত উচ্চভাব কি ব্যক্তিগত প্রজ্ঞার জ্যোতির সহিত ইহার সম্বন্ধ নাই। রসময়ের রসের সহিত এই সৌন্দর্য্যতত্ত্বের যোগ। পঞ্চদশী বলেন যে, প্রতিবিম্বানন্দ, বাসনানন্দ ব্যতীত জগতে আর কোন আনন্দ নাই। কিন্তু প্রতিবিম্বানন্দ ও বাসনানন্দ এই ব্রহ্মানন্দ হইতে সমুদ্ভূত।

সৌন্দর্য্য বিজ্ঞানে ভারতের বিশেষত্ব দৃষ্ট হয়। ইহা ভারতের গোপ্য ধন, পর ধন। ভারতবাসীর সৌন্দর্য্য বোধ ছিল না—এ কথার মূল্য নাই। অপিচ এ কথাই সত্য যে, প্রাচীনকালে হিন্দুগণের যে সৌন্দর্য্য বোধ ছিল, তাহা পৃথিবীর অন্য কোন জাতির ছিল না। প্রকৃত সৌন্দর্য্যবিজ্ঞান ভারতেই বিকসিত হইয়াছে, ভারতই উহার মাতৃভূমি। ঈশ্বরতনয় খৃষ্টের জন্মের অন্ততঃ দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রসই সৌন্দর্য্যের মূলতত্ত্ব—এ কথা উপনিষদে ঘোষিত হইয়াছে। ঔপনিষদ দর্শন ব্রহ্মসূত্রে এই তত্ত্ব সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী সময়ে ইতিহাস, পুরাণ, কাব্য, অলঙ্কার ও ভক্তিশাস্ত্রে এই তত্ত্ব বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রাচীন মিশরীয়, এসেরীয়, বেবিলনীয় জাতিগণ স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে এবং চিত্রে সমধিক সমুন্নত হইয়া থাকিলেও তাঁহারা ললিতকলার সৌন্দর্য্যের মূলে নিজের প্রতিভা, নিজের ভাবরাশিকে দেখিয়াছেন মাত্র, পরসৌন্দর্য্যের তাঁহারা কোন খোঁজ পান নাই। প্রাচীন গ্রীসে প্লেটো যুক্তিতর্কে এক আদর্শ সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই আদর্শ সৌন্দর্য্যকে আপনার প্রভু, আপনার সুহৃৎ, আপনার সর্ব্বস্ব ধন বলিয়া প্রচার করিতে সমর্থ হন নাই। একমাত্র ভারতই সমস্ত সৌন্দর্য্যের মূলে “রসো বৈ সঃ” ভগবান্‌কে দেখিতে পাইয়াছেন। হিন্দুজাতির রসশেখর ভগবান্ শুধু প্রাকৃত ললিতকলা ও জীব সৌন্দর্য্যের মূলতত্ত্ব নহেন, তিনি জীবের সর্ব্বস্ব ধন, অমূল্য রত্ন। তিনি জীবের প্রভু, সখা ও স্বামী। তাঁহাকে দেখিলে, তাঁহাকে বুঝিলে জীবের সমস্ত দুর্গতি দূর হয়, সৌন্দর্য্যের পিপাসা নির্ব্বাপিত হয়, বাসনার গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সমস্ত কর্ম্মক্ষয় হয় এবং সর্ব্বপ্রকার সংশয় অপনীত হয়। তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই, তাঁহা অপেক্ষা সুন্দর কেহ নাই। উপসংহারে পঞ্চদশীর অমৃতময়ী বাণী শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে অমৃতধারা সিঞ্চন করুক,—

“ব্রহ্মজ্ঞঃ পরমাপ্নোতি শোকং তরতি চাত্মবিৎ।
রসো ব্রহ্ম রসং লব্ধানন্দী ভবতি নান্যথা ॥

ব্রহ্মজ্ঞ পরমানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন, আত্মবিৎ শোক হইতে উত্তীর্ণ হন। রস স্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করিয়া জীব আনন্দিত হয়—ইহার অন্যথা নাই।*

শ্রীঅভয়কুমার গুহ।

মিনতি।

(গান)

তুমি, করুণ-কোমল-কনক-পরশে
সন্তানগণে জাগায়ে দিও।
শঙ্কিত ভীত বেদনা আহত
লজ্জিত জনে শকতি দিও।
নিন্দিত যারা বিশ্ব মাঝারে,
লাঞ্ছিত চির গঞ্জনা ভারে,
নিদ্রিত গাঢ় দুঃখ আঁধারে,—
তাহাদেরে প্রভু আলোক দিও।
তুমি, করুণ-কোমল-কনক-পরশে
সন্তানগণে জাগায়ে দিও।
নির্ম্মল শুভ নিষ্কল তুমি,
উজ্জ্বল-ধ্রুব-কান্তি হে,
তপ্ত হৃদির তৃপ্তির লাগি,
বিতরিছ সুধা শান্তি হে!
তব আলো যারা পারে নি লভিতে,
অন্ধেরি মত পন্থা ভ্রমিতে
পড়ে আছে চির পঙ্কিল পথে,—
তাহাদেরে প্রভু সুপথে নিও।
তুমি, করুণ-কোমল-কনক-পরশে
সন্তানগণে জাগায়ে দিও।

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

---

* ঢাকা সাহিত্য সম্মিলনে দর্শন শাখায় পঠিত।

শক্তি ও শাক্ত।

কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ বিচারপতি সার জন উড্রফ যে আজকাল তন্ত্র শাস্ত্রের আলোচনায় মনোনিবেশ করিয়াছেন, তাহা ঢাকা সাহিত্য পরিষদের সভ্য ও 'প্রতিভা'র পাঠকবর্গের অবিদিত নাই। সম্প্রতি তিনি 'শক্তি ও শাক্ত'নামক এক নূতন গ্রন্থ আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার ১১টী প্রবন্ধ সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে অধিকাংশ প্রবন্ধ কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতির অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের একটী প্রবন্ধের অনুবাদ ইতিপূর্ব্বে প্রতিভায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, সমস্ত প্রবন্ধই সারগর্ভ এবং বিশেষ গবেষণা ও অধ্যয়নের পরিচায়ক। সার জন উড্রফের তন্ত্রশাস্ত্র সম্পর্কিত মতামত ইতিপূর্ব্বে তৎকৃত নানা পুস্তকে বিক্ষিপ্ত ছিল। কোন একখানি গ্রন্থ পাঠে তাহার মতের সহিত পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ের সম্ভাবনা ছিল না। এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া তিনি সে অভাব কিয়ৎ পরিমাণে দূরীকৃত করিয়াছেন। সুতরাং এই গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা সহজেই উপলব্ধ হইবে।

তন্ত্ররহস্য অতি দুর্ভেদ্য ও জটিল, তাহা সকলেই জানেন। এই দুরূহ বিষয় সরল ভাবে সাধারণের সহজবোধ্য ভাষায় বিবৃত করাই গ্রন্থকারের প্রধান উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য সাধনে তিনি বহুল পরিমাণে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। আমরা আশা করি, এই গ্রন্থ সাধারণ্যে বহুল প্রচার লাভ করিবে।

এই গ্রন্থে শক্তিবাদের দার্শনিক ভিত্তি ও সাধন প্রণালী, এই উভয়েরই বিশদ আলোচনা আছে। এই দুরূহ বিষয় এরূপভাবে একজন বৈদেশিক যে আয়ত্ত করিতে পারেন, ইতিপূর্ব্বে কেহই বোধ হয় তাহা বিশ্বাস করিতেন না। তান্ত্রিক সাধক ব্যতীত অপর ভারতবাসীগণও এই গুহ্য বিষয়ের কোন খবরই রাখেন না। আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এই বিষয় এতই অবহেলা করিয়াছেন যে, এ বিষয়ে বৈদেশিকগণের সহিত তাঁহাদের কোনই পার্থক্য নাই। কারণ, সার জন উড্রফ যেমন বলিয়াছেন, তাঁহারা ইংরেজদিগেরই মানস পুত্র *। এই জন্য ক্রমে২ এই শাস্ত্র লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। কিন্তু ইহা লুপ্ত হইলে ক্ষতি হইবে কি না তাহা একবার তলাইয়া দেখা উচিত নয় কি? সার জন উড্রফ তাহাই করিতেছেন। তজ্জন্য আমাদের সকলেরই তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

এই গ্রন্থ পাঠ করিলে সকলেই সার জন উড্রফের ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রে কিরূপ অসাধারণ অধিকার, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। কেবল মাত্র শাক্ত দর্শন নয়, সাংখ্য, বেদান্ত ও শৈব দর্শনও তিনি গভীর ভাবে অনুশীলন করিয়াছেন। ভারতীয় দার্শনিক পরিভাষা তাঁহার সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন। গ্রন্থের যে কোন পৃষ্ঠা পাঠ করিলেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়,—অনেক সময়ে মনে হয় যেন কোন হিন্দু দার্শনিক ও সাধকের গ্রন্থ পাঠ করিতেছি। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমার একজন শিক্ষিত বন্ধু বলিয়াছেন যে, সার জন উড্রফ পূর্ব্ব জন্মে হিন্দু ছিলেন। তাহা না হইলে হিন্দু সভ্যতা ও সাধনার অন্তর্নিহিত ভাব (spirit) তিনি এরূপ ভাবে আয়ত্ত করিতে পারিতেন না। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

"In giving an account of Indian belief, we who are foreigners must place ourselves in the position of a Hindu and not look at them through Western glasses"—(*Shakti & Shakta.* Preface)

ভারতীয় ধর্ম্মের যথাযথ বিবরণ দিতে হইলে বিদেশীয়গণকে হিন্দুর আসনে বসিতে হইবে, পাশ্চাত্য চশমাদ্বারা তাহা দেখিলে চলিবে না।

বস্তুতঃ হিন্দু সভ্যতা ও শাস্ত্রের প্রতি এরূপ গভীর শ্রদ্ধা বিদেশীয় লেখকগণের গ্রন্থে অল্পই দৃষ্ট হয়। তিনি এই গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন।—

"I protest and have always protested against unjust aspersions upon the civilisation of India and its peoples." (Shakti & Shakta p. 15.)

ভারতীয় সভ্যতা ও ভারতবাসীগণের উপর অযথা কলঙ্ক ক্ষেপের বিরুদ্ধে আমি সর্ব্বদাই প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছি।*

ভারতীয় শিল্পের আলোচনায় শ্রীযুক্ত ই, বি, হাভেল (E. B. Havell.) মহাশয় যেরূপ ভারতীয় সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির পরিচয় দিয়াছেন, সার জন উড্রফও তন্ত্রালোচনায় তদ্রূপ বা তদপেক্ষা

* "They (the English-educated people of this country) were, and some of them still are, the *Manasaputra* of the English."—*Shakti & Shakta.* p. 11.

* তিনি আরেক স্থানে লিখিয়াছেন।—
The Indian who has lost his Indian soul, must regain it if he would retain that

অধিক সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই উভয় মহাত্মার নিকট ভারতবাসীগণের চির কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। ইঁহারা উভয়েই ভারতবর্ষের অকৃত্রিম বন্ধু।

কিন্তু তিনি হিন্দুর চক্ষে হিন্দু শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন, একথা বলিলেও সব কথা বলা হয় না। তিনি হিন্দু সাধকের চক্ষে হিন্দুধর্ম্মের আলোচনা করিয়াছেন, একথা বলিলে বরং তাঁহার বিশেষত্বের যথার্থ পরিচয় দেওয়া হয়। অন্য কোন বৈদেশিক লেখকের যে এই বিশেষত্ব দৃষ্ট হয় না, তাহা বলাই বাহুল্য।

বৈদেশিক প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণও তাঁহাদের ভারতীয় শিষ্যবর্গ বলেন যে, শাক্ত ধর্ম্ম অনার্য্যপ্রভাব সম্ভূত। করালবদনী কালী নিশ্চয়ই অনার্য্য দেবতা। সার জন উড্রফ ইহার উত্তরে বলেন যে, ইহার উৎপত্তি কিরূপে হইয়াছিল তাহা আমরা জানি না; কিন্তু ইহার বর্ত্তমান পরিণতি আমরা জানি। তাহা দেখিলে বুঝা যায়, বর্ত্তমান কালের শাক্তধর্ম্ম বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। বেদের অন্তর্ভাগকেই বেদান্ত বলা হয়। বেদের অন্তর্ভাগ কি? না, আরণ্যক ও উপনিষদ। সুতরাং উপনিষদই মুখ্যতঃ বেদান্ত। শঙ্কর প্রচারিত মায়াবাদ বেদান্তের বিভিন্ন ব্যাখ্যার মধ্যে একটী ব্যাখ্যা মাত্র। রামানুজ প্রচারিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ উহার অপর ব্যাখ্যা। ইহার কোনটাই মুখ্যতঃ বেদান্ত নহে। উপনিষদই মুখ্যতঃ বেদান্ত; উহাই শ্রুতি। 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ইহা বেদান্তের একটী প্রসিদ্ধ বচন। এই শ্রুতি বচনের উপরই তন্ত্রের দার্শনিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। সকলই যখন ব্রহ্ম তখন জগৎও ব্রহ্ম। সুতরাং জগৎ পরমার্থতঃ মিথ্যা হইতে পারে না। সুতরাং জগৎ পরিত্যাগ করার আবশ্যকতা নাই। বরং ইহাকেই দৃঢ়ভাবে ধারণ করিতে হইবে এবং এই পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতির মধ্যেই মহাপ্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। এবং তজ্জন্য সাধন প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। ইহাই শাক্ত ধর্ম্মের শিক্ষা। ইহার সহিত শ্রুতির কোন বিরোধ দৃষ্ট হয় না। বরং শ্রুতির সুদৃঢ় ভিত্তির উপরেই এই ধর্ম্ম দণ্ডায়মান সুতরাং ইহাতে অনার্য্য প্রভাব কোথায়?

তার পর বলা হয় যে, পঞ্চতত্ত্ব প্রভৃতি অনার্য্যদিগ হইতেই গৃহীত হইয়াছে। সার জন দেখাইয়াছেন যে, তাহাও ভুল। কারণ অথর্ব্ববেদে ইহার অনুরূপ সাধনা দৃষ্ট হয়। সুতরাং এবিষয়েও অনার্য্য প্রভাব কল্পনার অবসর নাই।

'চিৎশক্তি','মায়াশক্তি','শক্তি ও মায়া'এই তিন প্রবন্ধে তিনি শক্তিবাদের দার্শনিক ভিত্তির বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। 'মন্ত্রের উৎপত্তি', 'বর্ণমালা' এই দুই প্রবন্ধে তিনি মন্ত্রতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং 'শাক্ত সাধনা' ও 'কুণ্ডলিনী শক্তি' প্রবন্ধে তিনি পঞ্চতত্ত্ব প্রভৃতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া নিরপেক্ষভাবে উহার বিচার করিয়াছেন। আমরা স্থানাভাবে তাঁহার সকল কথার আলোচনা করিতে পারিলাম না। কিন্তু পাশ্চাত্য লেখকগণ খুব লম্বা গলায় যে মদ্য মৈথুনের নিন্দা করিয়া থাকেন, তাহার উত্তরে সার জন উড্রফ যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া আবশ্যক মনে করি—

After all when everything unfavourable has been said, the abuses on this head are not to be compared either in nature or extent with those of the west with its wide-spread sordid prostitution, its drunkenness and gluttony, its sexual perversities and its demoniacal pathological enormities. p. 106.

পাশ্চাত্যদেশের ব্যাপক ও জঘন্য বেশ্যাবৃত্তি, মাতলামি ও পেটুকতা এবং নানা প্রকার কৃত্রিম, অস্বাভাবিক ও পৈশাচিক ব্যভিচারের সহিত তান্ত্রিক ব্যভিচারের তুলনা করা যাইতে পারে না। তান্ত্রিক ব্যভিচারের যতদূর নিন্দা করা সম্ভব ততদূর নিন্দা করিয়াও একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, উহা পাশ্চাত্য ব্যভিচারের ন্যায় তত নিকৃষ্ট ও ব্যাপক নহে।

শিক্ষিত হিন্দুমাত্রেরই এই গ্রন্থ যত্নপূর্ব্বক পাঠ করা উচিত। গ্রন্থের মূল্যও অতি সুলভ,—১৲ এক টাকা মাত্র। বহুল প্রচারের জন্যই এরূপ বৃহৎ গ্রন্থের মূল্য এইরূপ সুলভ করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থে মুদ্রাকর প্রমাদ আছে; কিন্তু বোধ হয় এরূপ সুলভ মূল্যের পুস্তকে তাহা অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ।

independence in his thought which is the mark of man; that is, of one who seeks Svarajya-siddhi. How can an imitator be on the same level as his original? Rather he must sit as a Chela at the latter's feet. Whilst we can all learn something from another, yet some in this land have yet to learn that their cultural inheritance with all its defects (and none is without such) is yet a noble one, an equal in rank, (to say the least), with those great past civilizations which have moulded the life and thought of the west.—pp. 13. 14.

সম্পাদকীয়।

সমর ঋণ।—আমাদের পাঠকবর্গকে জানাইবার জন্য সরকার হইতে আমরা সমর ঋণ সম্বন্ধে এক খণ্ড লিপি প্রাপ্ত হইয়াছি। ইংরেজী লিপির বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

"ভারতবর্ষে প্রত্যেকের মনে আজ যে প্রশ্ন উদিত হওয়া উচিত, তাহা এই—'যুদ্ধজয়ে আমি কিসে সাহায্য করিতে পারি?' ফ্রান্সে, মেসোপটেমিয়ায়, মিশরে, প্যালেষ্টাইনে এবং অন্যত্র সহস্র সহস্র ভারতীয় সৈন্য ব্রিটিশ সৈন্যের পাশাপাশি বীরের মত লড়াই করিয়াছে, এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশ হইতে সংগৃহীত ভারতীয় লস্কর এবং শ্রমজীবীরা যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। সকলেই যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া যুদ্ধ করিতে পারে না, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত আমাদের সৈন্যদিগকে কোন না কোন রকমে সহায়তা করিতে পারে না, এমন লোক খুবই অল্প। ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে সংগৃহীত সৈন্যসমূহ ভারতবর্ষকে যে শত্রু হইতে রক্ষ করিতেছে, সে যদি সফলকাম হয়, তবে এ দেশের জন-সাধারণের উপর নানা রকম অত্যাচার করিবে এবং তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইবে; সুতরাং প্রকৃত ভারতবাসীর প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য, যত রকমে পারা যায়, যে সকল সাহসী সৈন্য তাহার জন্য লড়াই করিতেছে, তাহাদের সহায়তা করা। আশ্চর্য্যের বিষয় হইলেও ইহা সত্য যে, এমন অনেক লোক ভারতবর্ষে আছে যারা বরং সৈন্যদের উদ্যমে বাধা দিতেছে; এমন কি প্রকারান্তরে শত্রুর সহায়তাও করিতেছে। তারা যে অনিষ্ট করিতেছে, তাহা তারা বুঝিতে পারিতেছে না; আহাদের কার্য্য দ্বারা যুদ্ধজয় এবং জগতের জাতিসমূহের মধ্যে শান্তি স্থাপন কঠিন হইয়া দাঁড়াইতেছে। আজকালকার যুদ্ধে সৈন্যদিগকেই যে কেবল খাটিতে হয়, তাহা নয়। যারা লড়াই করে, তাহাদিগের জন্য বন্দুক, কামান, গুলি, বারুদ, রসদ এবং আরও বহুবিধ জিনিস যোগাইতে হয়, যাহা ঘরে যারা বসিয়া থাকে তাহাদিগকে তৈয়ার করিতে হয়, এবং যাহা জাহাজে করিয়া দীর্ঘ সমুদ্রপথ অতিক্রম করিয়া দূরে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিতে হয়। যারা এই সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদনে এবং জাহাজে করিয়া সে গুলির প্রেরণে সহায়তা না করে, তারা প্রকাশ্যে শত্রুর পক্ষে যুদ্ধ করিলে যেমন জার্ম্মণী ও তাহার মিত্রবর্গকে সহায়তা করিত, প্রকারান্তরে তেমনই সহায়তা করিতেছে।

"একথা বলা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষে কেহই ইচ্ছা করিয়া তাহার স্বদেশের সৈন্যদের—যাহারা তাহারই জন্য লড়াই করিতেছে, তাহাদের—অনিষ্ট করিবে না, কিংবা সেই সকল সৈন্যদের কষ্টের মাত্রা বাড়াইতে চাহিবে না। ইহা বোধ হয় সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সত্য যে, যারা এই যুদ্ধের দিনে টাকা পয়সা মাটীর নীচে পুতিয়া রাখিয়া কিংবা বাক্সে আটকাইয়া রাখিয়া অথবা গলাইয়া গয়না করিয়া সঞ্চিত রাখে, তারা নিজের দেশের এবং যে সব জাতি মানব জাতির স্বাধীনতার জন্য লড়াই করিতেছে তাহাদের প্রভূত অনিষ্ট করিতেছে। যারা নিশ্চিন্তভাবে রূপার গয়না কিনে, তারাও সেই হেতু রূপা গলাইতে সহায়তা করে, কেন না,—গয়নায় ব্যবহৃত রূপা আর অন্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না। এই সকল ব্যক্তিরা হয় ত জানে না যে, যদি রূপা গোপনে সঞ্চিত থাকে, তবে সরকারকে দেশের কাজ চালাইবার জন্য দূর বিদেশে রূপা কিনিতে হয় এবং দীর্ঘসাগর পথ বহন করিয়া তাহা এ দেশে আনিতে হয়। ইহা হইতেই সঞ্চয়ের মানে

বুঝা যাইবে। বিগত দুই বৎসরে ভারতবাসী নির্ব্বোধের মত যে টাকা সঞ্চিত এবং লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার স্থানে চালাইবার জন্য অন্যূন ৫০ কোটী টাকা মুদ্রিত করিতে হইয়াছে। অধিকন্তু, বর্ত্তমানে আবার আমাদের বিশিষ্ট সুহৃদ্ এবং মিত্র আমেরিকা হইতে আরও ৫০ কোটী টাকা মুদ্রণের উপযোগী রূপা কিনিবার বন্দোবস্ত করা সরকার প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছেন। ইহার বেশীর ভাগই ভারতে আসিবার পথে, এবং অবশিষ্ট অংশও শীঘ্রই প্রেরিত হইবে।

"এত অধিক পরিমাণে রূপা ক্রয় এবং সংগ্রহ করা নানা প্রকারেই অপব্যয়-জনক। প্রথমতঃ, এই সকল ক্রয়ের অর্থ এই যে, ভারতবর্ষ কতকগুলি ধাতব পদার্থের পরিবর্ত্তে তাহার আবশ্যকীয় দ্রব্য বিদেশে পাঠাইয়া দিতেছে। এই রূপা কিনিতে যে টাকা ব্যয় হয়, ভারত সরকার যদি তাহা সুদে খাটাইতে পারিতেন, তবে, বৎসরে ৫ কোটী টাকার অধিক সুদ পাওয়া যাইত। এই অতিরিক্ত আয় হইলে গবর্ণমেণ্ট হয় ত টেক্স কমাইতে পারিতেন কিংবা দেশের শিক্ষা বা স্বাস্থ্য বা অন্যবিধ উপকারের জন্য অধিকতর ব্যয় করিতে পারিতেন।

"অধিকন্তু, এই বিষয়ে আমরা আমাদের শত্রুর নিকট একটা বিষয় শিখিতে পারি। জার্ম্মণী যে এতকাল যুদ্ধ চালাইতে পারিয়াছে, তাহার কারণ, সে বরাবরই 'কিছুই অপব্যয় করিও না' এই নীতি অনুসরণ করিয়াছে। ভারতে রৌপ্যসঞ্চয় যুদ্ধের একটী অতি প্রয়োজনীয় বস্তুর স্পষ্ট অপব্যয় মাত্র। স্বর্ণ সঞ্চয় সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। গোলা বারুদ শত্রুর বিরুদ্ধে না চালাইয়া মাটীতে পুতিয়া রাখিলে যা হয়, এ ও প্রায় তাই। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন যে, রূপার গুলিই এই যুদ্ধ জয় করিবে, অথচ ভারতে আমরা রূপা এবং সোণা সঞ্চিত রাখিয়া রূপার এবং সোণার গুলিসকল লুকাইয়া রাখিতেছি, যাতে সেগুলি যুদ্ধজয়ের পক্ষে কোন কাজে না আসিতে পারে।

"ইহাও বলা প্রয়োজন যে,ভারতবর্ষ ছাড়া সব দেশেই মুদ্রার জন্য ব্যবহৃত ধাতুদ্রব্যের পরিমাণ কমাইবার জন্য নোট প্রচলন পরিণত এবং জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। জাপানে ইহা বিশেষ ভাবে সত্য। সেখানে অতি অল্প দামের নোটও এখন চলিতেছে। ভারতে নোটের পরিবর্ত্তে যে পরিমাণে ধাতু মুদ্রা এখন ব্যবহৃত হয়, তাহা অনন্যসাধারণ। ফলে, অন্য দেশের লোক ইহার সুবিধা ভোগ করিতেছে, তারা ভারতের ব্যয়ে ধনী হইতেছে।

"ভারতের ধনের উপর সঞ্চয় নীতির যা ফল, তাহা ছাড়া ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, আমেরিকার খনি হইতে রূপা তুলিয়া আনিতে যে সকল লোকের দরকার তারা এ কাজের প্রয়োজন না হইলে যুদ্ধের কাজে ব্যাপৃত থাকিত; কেননা, আমেরিকা আমাদের পক্ষে লড়াই করিতেছে, এবং তারা যে সকল সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইয়াছে তাহাদের যুদ্ধজয়ের জন্য প্রচুর খাদ্যদ্রব্য এবং যুদ্ধের সরঞ্জাম দরকার। আমেরিকা ভারতে যে রূপা পাঠাইতেছে তাহা ট্রেণে সমুদ্রতীরে পাঠাইতে হয়, তার ফলে রেল গাড়ীর কাজ কঠিন হইয়া পড়ে অথচ এই যুদ্ধের সরঞ্জাম বহন করার জন্য রেল গাড়ীর প্রয়োজন; তার পর, সমুদ্রতীর হইতে এই রূপা হাজার হাজার মাইল জাহাজে করিয়া বহন করিয়া আনিতে হয়, অথচ এই সময়ে যুদ্ধের কাজের জন্য এবং ভারতবাসীদের বিশেষ প্রয়োজনীয় যে সকল দ্রব্য যথা তুলা, কাপড় লবণ ইত্যাদি সরবরাহ করিবার জন্য প্রত্যেকটী জাহাজের প্রয়োজন এবং ভারতবর্ষে যে এই সকল জিনিসের দাম বাড়িয়া গিয়াছে, তাহার কারণ জাহাজ সকল অন্য কাজে ব্যাপৃত থাকায় আগের মত মাল আর এ দেশে আসিতেছে না। জাহাজ কমিয়া যাওয়ার দরুণ কাপড়, লবণ এবং ভারতবাসীর ব্যবহারী অন্যান্য জিনিসের মজুত পরিমাণ অনেক কমিয়া গিয়াছে এবং দাম বাড়িয়া গিয়াছে।

"দেখান হইয়াছে যে, গত দুই বৎসরে গবর্ণমেণ্ট প্রচুর রূপা কিনিয়াছেন। কিন্তু যদি সঞ্চয় চলিতে থাকে তবে ইহাতেও কুলাইবে না, এবং ইহাতে ভারতের সৈন্যদের যে কি অনিষ্ট হইতেছে তাহা অতিরঞ্জিত করিয়া বলা অসম্ভব। প্রথমতঃ, রূপা কিনিবার জন্য টাকা খরচ না করিয়া সরকার সেই টাকার উপর সুদ পাইতে পারিতেন, এবং তখন সৈন্যদের জন্য বন্দুক, কাপড়, এবং খাদ্য ক্রয় করিবার জন্য এবং এদেশে সকলই যা চায়, যেমন, কাপড় ও লবণ—তাহা আনিবার জন্য আরও জাহাজ তৈয়ার করিবার জন্য এই টাকাটা ব্যয় করা যাইত। দ্বিতীয়তঃ, সঞ্চয় হইতে লবণ ও কাপড় পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিতেছে বলিয়া এই সকল জিনিসের, খাদ্যদ্রব্যের এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বাড়িয়া যাইতেছে, সুতরাং যারা সঞ্চয় করে তারা এই প্রকারে নিজেদের এবং বন্ধুবান্ধবদের অনিষ্ট করে। এদেশের লোকের টাকা সঞ্চিত রাখিবার কোনই কারণ নাই। গবর্ণমেণ্ট ন্যায়পরায়ণ এবং শক্তিশালী এবং যে টাকাটা বর্ত্তমানে খরচের জন্য দরকার নাই, তাহা খাটাইবার নানাপ্রকার সুবিধা রহিয়াছে, যাহাতে সুদ পাওয়া যায় এবং টাকার মালীকের আয় বাড়ে। অন্যান্য ধনী এবং সম্পন্ন দেশে, লোকে ব্যয়ের অতিরিক্ত টাকাটা সঞ্চিত না রাখিয়া আরও উপার্জ্জনের জন্য ব্যবহার করে এবং তাহাতে নিজেদের তথা সমাজেরও উপকার করে। পোষ্ট আফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক এবং কোম্পানীর কাগজে টাকা রাখা যায়; আর এ ভাবে টাকা রাখিলে চোরে নিবার আশঙ্কা থাকে না। ভারতবর্ষেও এরূপ সুবিধা যথেষ্ট রহিয়াছে, যাহাতে নিরাপদে টাকা রাখা যায় এবং সুদও পাওয়া যায়। কাহারও হাতে যদি এমন টাকা থাকে যাহা তাহার সহসা দরকার হইতে পারে, তবে সে উহা ডাকঘরে ব্যাঙ্কে কিংবা ক্যাস সার্টিফিকেট কিনিয়া রাখিতে পারে; আর যদি টাকাটার তার শীঘ্র দরকার পড়িবার সম্ভাবনা না থাকে, তবে সে সমর ঋণে দিতে পারে, তাতে যথেষ্ট সুদ পাওয়া যাইবে। এ উভয় প্রকারেই তার নিজের স্পষ্ট লাভ হয়। দেশেরও ইহাতে প্রচুর লাভ, কারণ সরকারকে যে টাকা ধার দেওয়া হয়, তাহা সৈন্যদের জন্য গম, চাউল এবং অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য এবং পাট, তুলা, চামড়া, এবং জুতা কিনিবার জন্য এ দেশেই ব্যয়িত হয়। এ সকল জিনিস বহুল পরিমাণে কিনিতে চাওয়ার অর্থই রায়তদের লাভ, এবং তার ফলে সমস্ত দেশের সম্পত্তি ও ধনের বৃদ্ধি।

"বুদ্ধিমানের মত বিচার করিলে স্পষ্ট দেখা যাইবে যে, সঞ্চয় প্রথা খারাপ এবং নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। সঞ্চয় হইতে ভারতীয় সৈন্যদের অনিষ্ট হয় এবং শত্রুপক্ষের সহায়তা হয়। ইহা হইতে সুদ রূপ লাভের হানি হয়, এবং সরকারের পক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রের সৈন্যদের ব্যবহারের জন্য ভারতে উৎপন্ন দ্রব্যজাত ক্রয় করা দুষ্কর করিয়া দেওয়া হয়।

"বিচারের অভাব হইতে পৃথিবীর প্রভূত অনিষ্ট হয়। ভারতে টাকা সঞ্চয় এই সত্যের একটি দৃষ্টান্ত। কিন্তু ইহা বোধ হয় দুরাশা নয় যে, একবার যদি আসল কথা বুঝাইয়া বলা হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক স্বদেশ-প্রাণ ভারতবাসীই শুধু নিজে যে সঞ্চয় প্রথা পরিত্যাগ করিবেন, তা নয়, যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া অন্যকেও তাঁহার দেশের নৃশংস শত্রুর পক্ষে হিতকর এবং সাহায্যজনক প্রথা হইতে বিরত করিবেন।"

আমরা নিম্ন লিখিত চিঠিখানি পাইয়াছি। আমাদের পাঠকবর্গের নিকট ইহার বিবৃতি অনাবশ্যক। বঙ্গীয় জনসাধারণের সাহায্যে এই কল্পনা কার্য্যে পরিণত হউক ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির,
২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।
বঙ্গাব্দ ১৩২৫, ১৭ই আষাঢ়।

মান্যবর শ্রীযুক্ত 'প্রতিভা' সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন,

অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নলিখিত বিবরণটি আপনার পত্রের আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করিলে এবং সম্পাদকীয় স্তম্ভে আপনাদের মন্তব্য প্রকাশ করিলে বাধিত হইব। ইতি—

বশংবদ
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হইবে। আনুমানিক কিঞ্চিদধিক দুই সহস্র টাকা ব্যয় করিলে উক্ত মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইতে পারিবে। ভাস্করকে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে বলা হইয়াছে। প্রোক্ত উদ্দেশ্যের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে আমি পরিষদের সদস্যগণের নিকট এবং সহৃদয় বঙ্গবাসী মাত্রেরই নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। যিনি যাহা দিবেন তাহা সাদরে গৃহীত হইবে এবং যথারীতি সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপিত হইবে। সাহায্যের টাকা নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইতে হইবে। ইতি—

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

৮ম বর্ষ ভাদ্র ১৩২৫ ৫ম সংখ্যা

"ভারতীয় ইতিহাস সঙ্কলনে প্রাচীন লেখের মূল্য"।*

যে দেশের প্রাচীন ইতিহাস নাই—সে দেশ পৃথিবীর সভ্যজাতির সমক্ষে একরূপ নগণ্য। আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাস আছে—কিন্তু, তাহা "লিখিত" ইতিহাস নহে। কতকটা উপাদানের অপ্রচুরতায়, কতকটা অনুসন্ধিৎসু উপাদান-সংগ্রহকারীর স্বল্প-সংখ্যকতায়, আর কতকটা উপযুক্ত উপাদান-ব্যাখ্যাতার একরূপ অভাবে, তাহা এ যাবৎ সম্যগ্‌ভাবে লিখিত হইতে পারে নাই। ভারতীয় বিভিন্ন প্রদেশের ইতিহাস-রচনার সূত্রপাত হইয়াছে মাত্র। প্রায় শতাধিক বৎসর হইতে চলিল—ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান-সংগ্রহের কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে—কিন্তু, অদ্যাবধি ভারতের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হয় নাই—হইতে পারে নাই। কেবল সম্প্রতি ঐতিহাসিক চিত্রের রেখাপাত হইতে পারিয়াছে—কবে যে সেই চিত্র সম্পূর্ণ হইবে বা হইতে পারিবে, তাহা বিধাতাই জানেন। তবে বিধাতার অনুগ্রহ ভরসা করিয়া দেশের প্রাচীন ইতিহাস জানিবার সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। নিজকে, জাতিকে, দেশকে সম্যক চিনিতে আরম্ভ করিতে হইলে এ যাবৎ-লব্ধ উপাদানের সাহায্যেই সম্প্রতি ইতিহাস রচনা করিয়া তাহার বিস্তার করিতে হইবে; আবার ক্রমে ক্রমে নূতন তথ্যের আবিষ্কার হইলে তদনুযায়ী পরিবর্ত্তনাদির বিধান করিতে হইবে। সর্ব্বপ্রকার উপাদান সংগৃহীত হইলে ইতিহাস-রচনার কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে, এরূপ মনে না করিয়া, দেশের লুপ্ত ইতিহাসের প্রারব্ধ উদ্ধারচেষ্টা অব্যাহত গতিতে চালাইতে হইবে। স্বদেশের ইতিহাস না জানিলে কাহারও উচ্চশিক্ষা

* ঢাকা সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

পূর্ণ হইতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করি না। প্রতীচ্য বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে ব্যবস্থা আছে যে, প্রত্যেক বিদ্যার্থীকে স্বদেশের ইতিহাস অধ্যয়ন করিতে হয়। আমরা বঙ্গবাসী—ভাবুন দেখি—মুসলমান-রাজত্বের পূর্ব্বের—সমগ্র ভারতের কথা দূরে থাকুক, বাঙ্গালার ইতিহাস-সম্বন্ধেই আমরা কে কতটা জানি বা জানিবার ইচ্ছা করি? ইহা আমাদের দেশের পরম দুর্ভাগ্য। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস উদ্ধার করিবার জন্য যে সকল বিদেশীয় মনীষী আমাদের পথপ্রদর্শক রূপে উপাদান-সংগ্রহে প্রথমতঃ হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন—তাঁহাদের নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ। বিগত এক শতাব্দীর চেষ্টায় যে সমস্ত উপাদান সংগৃহীত হইতে পারিয়াছে, তদবলম্বনে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতগণ যে যে গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, সংখ্যায় তাহা নিতান্ত কম হইলেও সে সমস্তের উপর নির্ভর করিয়াই দেশে পুরাতত্ত্ব পাঠের কুতুহল অধিকতর উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষীয়গণ "প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও জ্ঞান" ("Ancient Indian History and Culture") সম্বন্ধে এম, এ, পরীক্ষার ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। আশা করি বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণ দলে দলে অগ্রসর হইয়া, ভারতের প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধান কার্য্যে ব্যাপৃত হওয়ার যোগ্যতা লাভ করিবার জন্য, এই বিষয়ে এম্, এ, পড়িতে যাইবেন। সে যাহা হউক, এখন প্রকৃত বিষয়ের অবতারণা করা হউক।

যে দেশের "লিখিত" ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সে দেশের প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্কলন-ব্যাপারে প্রাচীন লেখের সর্ব্ববিধ চর্চ্চার প্রয়োজন যে কত অধিক, তাহা সুধীসমাজে বিশেষভাবে বলা বাহুল্য। তবে এই সম্বন্ধে কয়েকটি কথা সভাসমিতিতে স্পষ্ট করিয়া না বলিলে, ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাসের উদ্ধারকার্য্যে সর্ব্বশ্রেণীর লোকের সহায়তার প্রয়োজন থাকিলেও তাহা পাওয়া কঠিন হইবে, এই জন্য তাহার বিবরণ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। ভারতীয় প্রাচীন আর্য্যগণের সম্বন্ধে একটি দোষের বা কলঙ্কের কথা কেহ কেহ কহিয়া থাকেন,—তাহা এই যে, বিচার-তর্ক-বহুল ইতিহাস লিখিবার শক্তি বা প্রতিভা তাঁহাদের ছিল না, অর্থাৎ তাঁহাদের "Critical historical Sense" এর অভাব ছিল। কিন্তু এই অখ্যাতি বিচার-সহ কি না তাহা বিবেচ্য। যাঁহারা বহু-বিচার-পরিপূর্ণ দর্শনবিজ্ঞান সাহিত্যাদি-সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া জগদ্বাসীকে বিস্ময়াপ্লুত করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের ঐতিহাসিক-প্রতিভা ছিল না, ইহা সকলে স্বীকার করিতে চাহিবেন না। কিন্তু, কি অজ্ঞাত কারণে তাঁহারা স্বদেশে সংঘটিত নানা ঘটনাবলীর পারাবাহিক বর্ণনারূপ তথা-কথিত ইতিহাস-গ্রন্থ রচনা করিয়া রাখিয়া যান নাই—তাহা বলা কঠিন। পুরাণ-গ্রন্থে ভারতের বিভিন্নযুগের রাজবংশের ও শাসনকারী রাজবৃন্দের পারম্পর্য্য লিখিত পাওয়া যায় সত্য, কবি কহ্লাণ রাজতরঙ্গিনী নামে কাশ্মীরের ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন সত্য, সত্য বটে মহাকবি বাণভট্ট শ্রীহর্ষচরিত নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং "মহাবংশ", "দ্বীপবংশ" ও বৌদ্ধ অবদানাদি সম্বন্ধে নানা প্রকার গ্রন্থ লিপিবদ্ধ পাওয়া গিয়াছে সত্য,—কিন্তু, বর্ত্তমানযুগে যাহাকে বিজ্ঞান-সম্মত-প্রণালীতে রচিত ইতিহাস বলা যায়, এইগুলি সেরূপ ইতিহাস গ্রন্থ নহে। প্রাচীন ভারতে কোন হেরোডোটস্ বা থিউসিডাইডিস্, লিভি্ বা ট্যাসিটস্ ছিল না বলা যাইতে পারে। কাযেই "লিখিত" ইতিহাস না পাইবারই কথা। কিন্তু তথাপি আমাদের দেশে ইতিহাস উদ্ধারের নানা-প্রকার উপাদানের সম্পূর্ণ অভাব নাই। যতপ্রকার উপাদান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তন্মধ্যে প্রধানভাবে গৃহীত হইতে পারে—প্রথমতঃ হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈনগণের প্রাচীন সাহিত্য, দ্বিতীয়তঃ পাষাণে ও পাতুপট্টে উৎকীর্ণ লিপিমালা, প্রাচীন মুদ্রা ও মোহর; এবং তৃতীয়তঃ গ্রীশ, রোম ও চীন প্রভৃতি

দেশের পর্যটকগণের ভ্রমণবৃত্তান্ত। উত্তরকালে আবিষ্কৃত প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শনও যে ইতিহাসের উপাদান, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। গভর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ও প্রাদেশিক সভাসমিতি ও অনুসন্ধান সমিতিসমূহের চেষ্টায় উত্তরোত্তর উপরি-উল্লিখিত সর্বপ্রকার উপাদানের ও নিদর্শনের সংগ্রহ-সংখ্যা বৃদ্ধিলাভ করিতেছে। তাঁহাদের অদম্য ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আজ উত্তরাপথে ন্যূনকল্পে দুইসহস্র ও দক্ষিণাপথে দশ সহস্র প্রাচীন লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। যদিও প্রাচীন যবন বা গ্রীকজাতীয়গণের শাসিত এসিয়া মাইনর, আসাইরিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশে আবিষ্কৃত অনেক প্রাচীনলিপি ভারতীয় প্রাচীনলিপির বহুপূর্ব্বে রচিত বা সম্পাদিত হইয়া থাকুক—তথাপি আমাদের নিকট ভারতীয় প্রাচীন লেখমালার মূল্য প্রতীচ্য দেশের লেখমালার মূল্য হইতে অনেক অধিক, কারণ আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্যগ্‌ভাবে লিখিতে হইলে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও বিশ্বাসযোগ্য উপাদানই হইবে এইসকল প্রস্তর ও ধাতুপট্টে ও প্রাচীন মুদ্রায় ক্ষোদিত লিপিমালা। তাই পাষাণপন্থিগণ এই সকল পাষাণ আশ্রয় করিয়া কার্য্যে ব্রতী আছেন। নিপুণভাবে প্রাচীন সাহিত্যের পাঠ হইতে ভারতবর্ষের প্রাচীন লোকসমাজের দৈনন্দিন অবস্থা, সেই সময়ে প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি, লোকের ধর্ম্মকর্ম্ম, আচার ব্যবহার প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বিষয়ের আভাস পাওয়া গেলেও তাহাতে রাজকীয় ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বড় একটা উল্লেখ লক্ষিত হয় না। পৌরাণিক সাহিত্যের স্থানে স্থানে রাজবংশের ও রাজনামের পর্য্যায় বা তালিকা পাওয়া গেলেও তৎপাঠে তাঁহাদের রাজত্বকালের পরিমাণ ও রাজত্বের পারম্পর্য্য বিশুদ্ধভাবে জানা যায় না। অনেক সময় তাহাতে সমসাময়িক ঘটনাগুলিকে পূর্ব্বাপর করিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই প্রকার দোষ সন-তারিখ-যুক্ত প্রাচীন লিপির সাহায্যে দূরীভূত হইয়াছে। একাদশ শতাব্দাতে মুসলমান অভ্যুদয়ের পূর্ব্বের ইতিহাস, অনেক কাল পর্য্যন্ত উপাদান ও নিদর্শনের আবিষ্কারের অভাবে ঘোর-তমসাচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু গিরিগাত্রে ও পাষাণময় ও ধাতুময় স্তম্ভে, ও তাম্রাদি ধাতুফলকে অশোকাদি সম্রাটের অনুশাসন লিপি প্রভৃতির আবিষ্কারের পরে, ভারতের প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সময় নির্দ্দেশ কার্য্যে মনীষিগণ ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহার ফলে ভারতেতিহাসের প্রধান অতীত ঘটনার অর্থাৎ চাণক্যমতিপরিগৃহীত মৌর্য্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়া পড়িয়া পরবর্ত্তী অনুসন্ধিৎসুগণের অনুসন্ধানকার্য্য অধিকতর সুকর করিয়া দিয়াছে। "দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা অশোকের ত্রয়োদশ-শিলালিপি-পাঠে ভারত সম্রাটের সমসাময়িক সিরিয়া, মিশর, কাইরিনি, মেশিডন ও এপিরাস এই পঞ্চ দেশের "যবনরাজগণের" নাম জানিতে পারায় গ্রীস দেশের প্রাচীন ইতিহাসের সাহায্যে মৌর্য্যনরপতি অশোকেরও রাজত্ব কাল নির্দ্দিষ্ট হইতে পারিয়াছে। প্রাচীন মালবদেশের দশপুরে আবিষ্কৃত শিলালিপির সাহায্যে গুপ্ত সাম্রাজ্যের কাল নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এইরূপে প্রাচীন লিপির সাহায্যেই বিক্রমাব্দ, শকাব্দ, চেদিসংবৎ, হর্ষসংবৎ প্রভৃতি অব্দও সংবতের কালনির্ণয় হইয়াছে। ইহা ত অল্প কথা। ভারতের প্রাচীন শিল্পকলা, বাস্তুবিদ্যা, সংস্কৃত-প্রাকৃত সাহিত্যের প্রাচীনতা, ধর্ম্ম ও দর্শনের ক্রমবিকাশ নির্ণয় প্রভৃতি নানাবিষয়ের অনুসন্ধানকার্য্যে প্রাচীনলেখমালা সহায়তা প্রদান করে।

এখন দেখা যাউক, প্রাচীন লেখসমূহে বর্ণিত বিষয়গুলিকে প্রধানতঃ কয়টি প্রধান বিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। তাহাতে উল্লিখিত বিষয়ের মর্ম্ম হইতে ভারতীয় লোক-ইতিহাস রচনার ও রাজকীয় ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর পারম্পর্য্য নির্দ্দেশে কতদূর সহায়তা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার বিচার করা যাউক। কতকগুলি লেখের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, অতীত ঘটনার

অবিমিশ্র বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা। তাহাতে গৌণভাবে যে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বা অন্য কোন দানাদি-সৎ-ক্রিয়াসম্বন্ধীয় কোন কথা উল্লিখিত নাই, তাহাও নহে; কিন্তু তাহা লেখের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। উদাহরণরূপে এই প্রকার কয়েকটি প্রধান লিপির উল্লেখ করা হইতেছে। খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগের কলিঙ্গাধিপতি মহারাজ শ্রীখারবেলের উদয়গিরির হাতিগুম্ফার প্রস্তর লিপিতে কলিঙ্গরাজ তাঁহার রাজত্বের প্রথম ত্রয়োদশ বর্ষের প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। কলিঙ্গের প্রজাগণের হিতার্থে এই জৈন নরপতি কি কি কল্যাণকর কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন—তিনি কতবার উত্তরাপথে বিজয়-অভিযানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; দক্ষিণাপথের আন্ধ্ররাজ শাতকর্ণির সহিত তাঁহার কিরূপ সম্বন্ধ ছিল—ইত্যাদি ঘটনার স্পষ্ট উল্লেখই এই প্রাকৃত ভাষায় রচিত গুহা লিপির উদ্দেশ্য। মৌর্য্যকুলতিলক অশোকের প্রয়াগ-স্তম্ভে উৎকীর্ণ অগুপ্ত-গুণরাশি গুপ্ত সম্রাট ভারতীয় নেপোলিয়ন চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের পুত্র মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্তের বিজয়-প্রশস্তিকে আমরা এই শ্রেণীর লেখ-মালার মধ্যে গণনা করিতে পারি। গুপ্ত সম্রাটের প্রধান প্রধান বিজয়ের কথা ভবিষ্যদ্‌বংশীয়গণের স্মরণ পথ হইতে অপসৃত না হয়, এইজন্য সেই সমস্ত অবদান-কথা এই পাষাণপ্রশস্তিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। গুপ্তরাজবংশের রাজনাম তালিকা, উত্তরাপথের কোন্ কোন্ দেশে সম্রাটের বিজয় নিশান উত্থাপিত হইয়াছিল তাহাদের নাম, কোন্ কোন্ প্রত্যন্ত নৃপতির সহিত গুপ্তরাজের কিরূপ রাজনৈতিক সম্বন্ধ ছিল তাহাদের নাম, এবং দক্ষিণাপথের বিভিন্ন দেশের সমসাময়িক অবস্থা ইত্যাদি ঐতিহাসিক বিষয়ের নানা তথ্য এই প্রস্তর লিপিপাঠে অবগত হওয়া গিয়াছে। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথার উল্লেখ আবশ্যক। এই সংস্কৃত লিপির রচয়িতা মহাকবি হরিষেণের রচনাপটুতা পর্য্যালোচনা করিলে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে অর্থাৎ মহাকবি কালিদাসের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে সংস্কৃত-সাহিত্যে অলঙ্কারের প্রভাব কতটা বর্ত্তমান ছিল এবং সংস্কৃত-গদ্য-রচনা তখনই কতদূর উন্নত পদবীতে আরোহণ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণও এই প্রশস্তি হইতে উদ্ধৃত হইতে পারে। সংস্কৃতের অধ্যাপকগণ যেন অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপনা-কালে এই প্রাচীন লেখের মূল্য বিস্মৃত না হন। শিবের পাদপঙ্কজ ব্যতীত যিনি কখনও মানুষের পাদ-প্রান্তে মস্তক অবনত করেন নাই বলিয়া দর্পিত ছিলেন, হূণাধিপতি সেই মিহিরকুলের গর্ব্ব যিনি খর্ব্ব করিয়া-ছিলেন সেই নরপতি যশোধর্ম্মের মন্দোসর বা দশপুরের বিজয়স্তম্ভযুগলও এই শ্রেণীর লিপির অন্তর্ভুক্ত। জনসাধারণের উপকারার্থে রাজার, রাজপুরুষের বা অন্য কোন কারুণিক ব্যক্তির কার্য্যাবলী যে সব লিপিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে সেগুলিকেও এই শ্রেণীতে আনা যাইতে পারে, যথা সুরাষ্ট্রের সুদর্শন হ্রদের সেতুসংস্কার সম্বন্ধে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মহাক্ষপত্র রুদ্রদামের গির্ণার প্রস্তর লিপি। দেবমন্দিরের নিকট পুষ্করিণী খনন, যুদ্ধক্ষেত্রে স্বর্গগত রাজার সমাধি নির্ম্মাণ, পথমধ্যে পথিকের আবশ্যকীয় দ্রব্যসম্ভার প্রাপ্তির সুবিধার জন্য বড় বড় যানপথের সঙ্গমস্থলে ভাণ্ডার-গৃহ-স্থাপন, দুই রাজ্যের সীমানির্দ্দেশ, রাজপত্নীর স্বর্গগত পতির শ্মশানাগ্নিতে তনুত্যাগ, ফৌজদারী দণ্ডবিধির ব্যবস্থা, রাজ্যের রক্ষণ ও আক্রমণ সম্বন্ধে রাজনৈতিক সন্ধি-স্থাপন প্রভৃতি নানা বিষয়ের উদ্দেশ্য করিয়া বহু বহু লেখ রচিত হইয়াছিল। এই ত গেল পার্থিব বা ঐহিক-উপকার বিষয়ক কতকগুলি লিপির কথা। এখন আর এক শ্রেণীর লিপির উল্লেখ করা যাইতেছে—যাহা অপার্থিব বা পারমার্থিক বা পারলৌকিক বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয় উদ্দেশ্য করিয়া সম্পাদিত হইয়াছিল। পূর্ব্বো-ল্লিখিত পার্থিব-বিষয়ক লিপির সংখ্যা নিতান্ত কম না হইলেও ধর্ম্মবুদ্ধির প্রণোদনেধর্ম্মার্থদানাদির নিদর্শনরূপে

রচিত লিপির সংখ্যাই অধিক। এই শ্রেণীর অন্তর্গত লিপির মধ্যে মৌর্য্যরাজ অশোকের ধর্ম্মলিপিই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। স্ব-পর-রাজ্যে ধর্ম্মলিপির প্রচার করিয়া তিনি ধর্ম্মের অনুশাসন বিস্তার করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্ম মহামাত্র নামে ধর্ম্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া প্রজাবর্গের চরিত্রনীতির উন্নতিসাধনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

উত্তরে গান্ধার—দক্ষিণে মহীশূর, পূর্ব্বে কলিঙ্গ—পশ্চিমে সুরাষ্ট্র—এই চতুঃসীমার মধ্যে অবস্থিত ভারতবর্ষে তিনি যে ধর্ম্মোক্ত প্রণালী অনুসরণ করিয়া প্রজাবর্গের ঐহিক ও পারত্রিক হিতসুখ লক্ষ্য করিয়া রাজধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন কেবল তাহা নহে; তাঁহার "ধর্ম্ম-বিজয়ের" প্রভাব সুদূর গ্রীক বা যবনগণের রাজ্যমধ্যেও বিস্তার লাভ করিয়াছিল। "অংতিয়োক" (Antiochus II of Syria) "তুরময়" (Ptotemy Philadelphus of Egypt), "অংতিকিনি" (Antigonus of Macedonia), "মক" (Magas of Cyrene) ও "অলিকসুন্দর" (Alexander of Epirus) এই পঞ্চ যবনরাজের রাজ্যে অশোকের ধর্ম্মদূতগণ যাইয়া ধর্ম্মানুশাসন প্রচার করিতেন। আর ভারতের অতি দাক্ষণের চোর-চের-পাণ্ড্য প্রভৃতি দেশ অতিক্রম করিয়া তাম্রপর্ণী বা সিংহলদ্বীপ পর্য্যন্ত যাইয়া তাঁহার প্রেরিত ধর্ম্মযাজকগণ "সদ্ধর্ম্মের" প্রচার করিতেন। খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে ভারতবর্ষের সঙ্গে এসিয়া মাইনর প্রভৃতি প্রতীচ্য দেশের রাজনৈতিক সম্বন্ধের আভাস এই সকল প্রস্তর লিপির সাহায্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে আর একটি নূতন লিপির আবিষ্কারের কথা না বলিয়া থাকা যায় না। এসিয়া মাইনরে প্রাপ্ত মিটন্নিরাজবংশের একখানি অতিপ্রাচীন লেখ হইতে জানা গিয়াছে যে, খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চদশ-চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে, অর্থাৎ বর্ত্তমান কাল হইতে প্রায় ৩৫০০ শত বৎসর পূর্ব্বে, এই সুদূর পশ্চিমের হিটাইট জাতীয় রাজগণ যে আর্য্যনামধারী ছিলেন কেবল তাহা নহে—লিপি হইতে আরও অবগত হওয়া গিয়াছে যে, তাঁহারা বৈদিক দেবতা ইন্দ্র-বরুণ-মিত্র ও অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের পূজাও করিতেন। বৈদিক আর্য্যগণের সঙ্গে সেকালের এসিয়ামাইনরের এই মিটন্নিরাজবংশের রাজগণের কিরূপ সংবন্ধ ছিল তাহা সম্প্রতি পরিষ্কাররূপে না জানিতে পারা গেলেও এরূপ আশা করা যায় যে, এই পশ্চিম প্রদেশে যে সমস্ত স্থান এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে, সেখানে প্রাচীন লেখাদি প্রত্নতত্ত্বের উপাদান ভবিষ্যতে অনেক আবিষ্কৃত হইতে পারিবে। মনীষিগণ বিশ্বাস করেন যে, উপযুক্ত অনুসন্ধান চেষ্টায় পুরাতত্ত্বের এই উর্ব্বরক্ষেত্র যখন ফলপ্রসূ হইতে থাকিবে, তখন প্রতীচ্যের সহিত প্রাচ্যের পূর্ব্বসম্বন্ধ বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইতে পারিবে। পূর্ব্বোল্লিখিত অশোক-অনুশাসনের কোনস্থানেই সম্রাট্ নিজের নাম অশোকরূপে প্রকাশ করেন নাই—তিনি নিজকে "দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা" বলিয়াই সর্ব্বত্র অভিহিত করিয়াছেন। সুতরাং এই "দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা" ও মৌর্য্য নরপতি অশোক অভিন্ন ব্যক্তি কি নন—তাহা লইয়া বিগত ৭৫ বৎসরমধ্যে পণ্ডিতগণের মধ্যে বহু তর্ক বিতর্ক চলিতেছিল। কিন্তু প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে নিজামরাজ্যে আবিষ্কৃত মাস্কি অনুশাসনের পাঠোদ্ধার হইলে দেখা গেল যে, রাজা সেই লিপিতে নিজকে "দেবানং পিয়স অসোকস" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা ও অশোক এক ব্যক্তি কি নন—এই তর্কের অবসান হইল। কাযেই এরূপ লেখের মূল্য যে কত তাহা বলা যায় না।

ধর্ম্মবুদ্ধিতে প্রণোদিত হইয়া বৌদ্ধ-জৈন-ধর্ম্মাবলম্বিগণের বিভিন্ন-সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রমণ বা উপাসকগণ ধর্ম্মশাস্তা বুদ্ধ ও বর্দ্ধমানের স্মরণার্থ সাঁচি, ভরহুত, ভিলসা, রাজগৃহ, নালন্দা, তক্ষশিলা, মথুরা প্রভৃতি প্রসিদ্ধস্থানে কত স্তূপ, কত চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া ধর্ম্মের ধ্বজা যাবচ্চন্দ্রদিবাকর উড্ডীন রাখিবার চেষ্টা

করিয়া গিয়াছিলেন তাহার পরিচয়ও তত্তৎস্থানলব্ধ প্রাচীন প্রস্তর-লিপির সাহায্যে জানা যায়। ভগবান্ বুদ্ধের জন্মস্থান বলিয়া লুম্বিনীগ্রামে মহারাজ অশোক স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তথায় পূজাদান করিয়াছিলেন এবং সেখানে স্মৃতিস্তম্ভ উত্থাপন করিয়া দিয়া তাহাতে লিপি উৎকীর্ণ করাইয়া এই আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন যে, যেহেতু—"হিদ ভগবং জাতেতি লুম্বিনিগামে উবলিকে কটে"—এই পুণ্যস্থানে ভগবান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—অতএব এই লুম্বিনীগ্রামকে উদ্বলিক করা হইল, অর্থাৎ এই গ্রামের অধিবাসিগণকে রাজগ্রাহ্য করাদি দিতে হইবে না। আবার বুদ্ধের শরীর-নিধানবার্ত্তার স্মরণ করাইবার অভিপ্রায়ে অনেক প্রাচীন লিপি সম্পাদিত হইয়াছিল—এতৎসম্বন্ধে ১৫ খৃষ্টাব্দে মথুরায় মহাক্ষত্রপ রাপূলের দুহিতার প্রদত্ত স্তূপলিপির কথা উদাহৃত হইবার যোগ্য। নেপালে আবিষ্কৃত পাডরিয়া-লিপি হইতে যেমন বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনীগ্রামের প্রাচীন অবস্থান নির্ণীত হইয়াছে—সেইরূপ পিপ্রাওয়াতে বুদ্ধের সগোত্র শাক্যগণের স্মৃতিরক্ষার্থে প্রদত্ত বুদ্ধ-শরীর-বিধান-পেটিকা ও তৎস্থিত লিপির আবিষ্কার হইতে শাক্যসিংহ বুদ্ধের বাল্য-লীলাক্ষেত্র কপিলবস্তুর অবস্থান পরিজ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। মৌর্য্যাধিকারের অব্যবহিত পরে উত্তরাপথে যে শুঙ্গবংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল ও তাঁহাদের আধিপত্য প্রায় শতাধিকবৎসর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল—সেই শুঙ্গরাজবংশের অস্তিত্বসম্বন্ধে একমাত্র ঐতিহাসিক চাক্ষুষ প্রমাণ ভারহুত স্তূপের এক তোরণ-দ্বারের নির্ম্মাণ-বিজ্ঞাপক লিপি হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে আর্য্যব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ বর্ত্তমান বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত নানাঘাট গিরিবর্ত্মের গুহাতে উৎকীর্ণ দক্ষিণাপথপতি আন্ধ্ররাজ-রাজমহিষী নায়নিকার আদেশে সম্পাদিত প্রাকৃত-ভাষায় লিখিত প্রস্তর লিপি। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অবস্থা-বর্ণনা-সম্বন্ধে এই লিপিই প্রাচীনতম। রাজমহিষী অগ্ন্যাধেয়, অন্বারম্ভনীয়, রাজসূয়, অশ্বমেধ, গবাময়ন, গর্গত্রিরাত্র, আঙ্গিরসত্রিরাত্র আপ্তোর্য্যাম প্রভৃতি কত কত যজ্ঞ ও সত্র সম্পাদন করাইয়াছিলেন এবং সেই সেই যজ্ঞে ও সত্রে বহুসংখ্যক হস্তী, অশ্ব, গো, ধেনু, শকট, রথ, সৎপট্ট, গ্রাম প্রভৃতি কত কত বহুমূল্য সামগ্রী দক্ষিণারূপে ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ এই নানাঘাট লিপিতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের ধর্ম্ম ও সভ্যতার ইতিহাস লেখকগণের নিকট এই লিপির মর্য্যাদা ও মূল্য অত্যন্ত অধিক। এই লিপির প্রথম শিক্ষা এই যে, প্রাচীন আন্ধ্র নরপতিগণ অপর্য্যাপ্ত দানাদিদ্বারা বৌদ্ধ-ভিক্ষুকগণের বর্ষাবাসের সুব্যবস্থা ও তাঁহাদের আহার—আচ্ছাদনের নানারূপ সুবিধা বিধান করিয়া থাকিলেও—স্বয়ং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন। যাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, দাক্ষিণাত্যের অনার্য্যগণের সভ্যতার মূল বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম—তাঁহাদের এইরূপ উক্তি যে যুক্তিযুক্ত নহে— এই নানাঘাট লিপিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আর এক কথা এই যে, কৃষ্ণপূজা যে খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল— "নমো সংকংসন-বাসুদেবানং" নানাঘাট লিপির নান্দীতে উল্লিখিত এই উক্তিই প্রমাণরূপে উদাহৃত হইবার যোগ্য।

বুদ্ধের বোধিসত্ত্বগণের জৈনঋষি বর্দ্ধমান ও জৈন তীর্থঙ্করগণের প্রতিমাস্থাপনাদি ধর্ম্মকার্য্যে কনিষ্ক হুবিষ্ক প্রভৃতি শকনরপতিগণও যে সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান করিতেন, তাহার প্রমাণও প্রাচীন লেখ-মালা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। আর এক কথা এই যে, পূর্ব্বকালে ভূমির দেবোত্তর বা ব্রহ্মোত্তর বিধানের জন্যই প্রায় অধিকাংশ তাম্রশাসন সম্পাদিত হইত। সেগুলি যে কেবল রাজার সম্পাদিত তাহা নহে, প্রজার মধ্যে কেহ রাজদরবারে ভূমিপ্রার্থী হইয়া

তাহা যথামূল্যে ক্রয় করিয়া ভূমিদানপত্র তাম্রফলককে দলিলরূপে রাজার আদেশে সম্পাদন করিয়া লইতে পারিতেন। রাজার বা রাজবংশের পরিচয় ব্যতীত এই সমস্ত তাম্রশাসনাদি হইতে রাজ্যশাসন প্রণালীরও অনেক তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার প্রমাণরূপে এইস্থানে আর একটি অচিরাবিষ্কারের কথা উল্লিখিত হইতেছে। গুপ্তযুগে বাঙ্গালাদেশ কোন্ রাজার শাসনাধীন ছিল গুপ্তসাম্রাজ্যের সহিত সেকালের বাঙ্গালার অর্থাৎ পুণ্ড্রবর্দ্ধনভূমির কিরূপ রাজনৈতিক সম্বন্ধ ছিল। বাঙ্গালাদেশই বা তখন কি ভাবে শাসিত হইত, ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এযাবৎ বড়ই দুরূহ ছিল। কিন্তু দিনাজপুরের অন্তর্গত দামোদরপুর গ্রামের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন পঞ্চকের প্রাঠোদ্ধার করিয়া আমরা জানিয়াছি যে, সেকালের বাঙ্গালাদেশ গুপ্ত-সাম্রাজ্যভূক্ত ছিল এবং পুণ্ড্রবর্দ্ধনের অধিপতিগণ গুপ্তসম্রাট্‌কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইতেন। বাঙ্গালার বিষয়পতি-গণ (District officer) আবার ভুক্তিপতিগণ-কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইতেন। এই তাম্রশাসন পঞ্চক হইতে আর একটি নূতন ঐতিহাসিক তথ্য পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা এতকাল মনে করিতেন যে, স্কন্দ-গুপ্তের সঙ্গে সঙ্গেই গুপ্তসাম্রাজ্যের অধঃপতন হইয়া-ছিল তাঁহাদের মত যে ভ্রান্ত মত, তাহা এই নবাবি-ষ্কৃত লিপিপঞ্চকের সাহায্যে জানা গিয়াছে। স্কন্দ-গুপ্তের পরেও ন্যূনকল্পে অর্দ্ধশতাব্দীর অধিককাল পর্য্যন্ত উত্তরাপথে গুপ্তপ্রভাব অব্যাহত ছিল, তাহা এই লিপি মর্ম্ম হইতে অবগত হওয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার বিষয়পতিগণ সপরিষৎ "বিষয়" বা জেলার ও নগরের শাসন কার্য্য সম্পাদন করিতেন, তাহার আভাসও এই প্রাচীন লিপিপঞ্চক হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সেকালের ভূমির মূল্য, ভূমির পরিমাপ প্রণালী, ভূমির বিক্রয়-প্রথা, ভূমির-সত্ত্ব-নির্ণয়, পুস্ত-পাল বা দলিলরক্ষকের কর্ত্তব্য প্রভৃতি নানাবিষয়ের জ্ঞানলাভ করিতে হইলে এই সমস্ত লিপির সাহায্য না লইলে চলিবে না। তাম্রাদিশাসনের সম্পাদন-বিধি স্মৃতিশাস্ত্রে নিবদ্ধ আছে। সেই শাস্ত্রীয় রীতি অবলম্বনে যে সমস্ত শাসন সম্পাদিত হইয়াছে তাহা হইতে আমরা দাতা ও প্রতিগ্রহীতার বংশ পরিচয়, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অবদান ও কীর্ত্তিকথার অনেক পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অতীতের ইতিহাস লিখিয়া রাখিবার সঙ্কল্প করিয়া না হউক, প্রাচীন ভারতবাসিগণ রাজাই হউক, আর প্রজাই হউক অবোধপূর্ব্বক ইতিহাস-রচনার অনেক উপাদান এই সমস্ত পাষাণ লিপিতে ও ধাতুপট্টলিপিতে প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা উত্তরপুরুষগণ এই সমস্ত হইতেই অতীতের চিত্র আঁকিয়া লইবার চেষ্টা করিব। এই কার্য্য যে কত কষ্টকর তাহা অনুসন্ধিৎসুমাত্রেই অবগত আছেন। বক্তব্যের প্রচুরতাসত্ত্বেও আমার সময়াভাবে এস্থানেই প্রবন্ধের উপসংহার করিতে বাধ্য হইয়াছি। কিন্তু সর্ব্বশেষে আরও একটি কথা না বলিয়া পারা যাইতেছে না। ইতিহাসের ও তদ্রচনার লক্ষ্য কি? একাদশ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের ঢাকা অধিবেশনের ইতিহাস-শাখার সভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয় এই প্রশ্নের উত্তর তাঁহার অভিভাষণে পরিষ্কাররূপে প্রদান করিয়াছেন। তদীয় মতের অনুসরণ করিয়া বলা যাইতেছে যে, অতীতের যথাযথ চিত্র অঙ্কণ করিয়া তদ্দ্বারা "মনুষ্যের সম্মুখে জীবনের উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করা" ইতিহাসের লক্ষ্য। অতীতের যথাযথ চিত্র অঙ্কণ করিতে হইলে কাহাকেও সত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিলে চলিবে না। "সত্য"-তথ্য-সঙ্কলন যদি ইতিহাস-রচনার লক্ষ্য হইল তাহা হইলে, সত্যের উদ্ধার কার্য্য বিজ্ঞান-সম্মত-প্রণালীতে পরিচালিত করিতে হইবে। প্রমাণের উদাহরণ দ্বারা তথ্য-নির্দ্ধারণ-প্রথাকে আমরা বিজ্ঞান-সম্মত-প্রণালী

বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকি। এই প্রণালীতে কেবল কল্পনার স্থান নাই। বিচার-নিষ্ঠ অপ্রমাদী প্রাড্-বিবাকের ন্যায় প্রমাণাবলীর সম্যক্ অবধারণের সঙ্গে সঙ্গে সত্যের উদ্ধার করিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। যাঁহারা এই প্রকৃষ্ট ও অনন্য পন্থা অবলম্বন না করিয়া, কেবল কল্পনা ও অপ্রামাণ্য দলিলের উপর নির্ভর করিয়া ঐতিহাসিক তথ্যের উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন বা হইবেন, তাঁহাদের চেষ্টা কখনও সফল হইতে পারে নাই, পারিবেও না। সমালোচকের তীব্র কশাঘাত তাঁহারা কেমন করিয়া এড়াইতে পারিবেন? বাস্তবিক তাঁহারা অনেক স্থলে উপকারের ছলে দেশের অপকার সাধন করিতেছেন। সুতরাং কেহ তাঁহাদের যথেচ্ছ ইতিহাস-উদ্ধার-চেষ্টার নিন্দা করিলে আমাদের কোন দুঃখ বা ক্ষোভ নাই; কিন্তু দেশে বিদেশে যাঁহারা সত্যনিষ্ঠ হইয়া যথারীতি অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকিয়া ঐতিহাসিক সত্যের উদ্ঘাটন কার্য্যে ব্রতী থাকেন—যাঁহারা সেই সকল উদ্যোগী পুরুষগণের কার্য্যকলাপের উপর কটাক্ষ করিয়া থাকেন, তাঁহারা দেশদ্রোহী, কেন না, তাঁহারা দেশের অতীতের চিত্র দর্শন করিয়া নিজের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ গঠন করিতে বিমুখ। আমার মনে হয়, সত্যনিষ্ঠ অনুসন্ধানকারিগণই ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাসরূপ নিবিড় অরণ্যে আশার পথরেখা নির্ম্মাণ করিতেছেন। পূর্ব্বে অনেকবার বলা হইয়াছে যে, প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উদ্ধার কার্য্যে শ্রেষ্ঠ ও বিশ্বাসযোগ্য উপাদান প্রাচীন লেখমালা। এই সমস্ত লেখের মূলানুগত পাঠ ও ব্যাখ্যাকার্য্যে যে যে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় মনীষিগণ হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন ও করিতেছেন, তন্মধ্যে আমরা জার্ম্মেণীর বুলহার, কিলহর্ণ, লুডারস্ ও হুলস্, ফ্রান্সের সেনার ও সিল্ভ্যান্ লিভি, ইংলণ্ডের ফ্লিট্, হরণ্লি, পার্জ্জিটার্, টমাস, র‍্যাপসন্ ও স্মিথ, বোম্বাইয়ের ভাণ্ডারকার ও ভগবান্‌লাল, ও আমাদের বাঙ্গালার রাজেন্দ্রলাল, হরপ্রসাদ, অক্ষয়কুমার প্রভৃতি মহাত্মার নাম স্মরণ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিলাম।

——— শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক।

প্রাচীন ভারতে বিবাহবিধান*

বিবাহব্যাপার সমাজে যে ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা কয়েকটি স্বতন্ত্র মূলের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার আদিমূল সেই শারীর প্রবৃত্তি যাহা পুরুষ ও নারীকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করে। সেই মূল হইতে পুরুষ নারীর সঙ্গ কামনা করে, কিন্তু বিবাহের তাৎপর্য্য প্রধানতঃ নারীর উপর পুরুষের আধিপত্য। স্ত্রীকে নিজের আজ্ঞাবহ এবং নিজের স্বতন্ত্রভাবে উপভোগ্য করিবার চেষ্টায়ই বিবাহানুষ্ঠানের সৃষ্টি। এই আধিপত্য লাভের চেষ্টাই বিবাহানুষ্ঠানের দ্বিতীয় মূল। তাহা ছাড়া পুত্রলাভের আকাঙ্ক্ষাও ইহার একটি মূল এবং হয়তো এই আকাঙ্ক্ষাই স্ত্রীর উপর প্রাধান্য লাভের চেষ্টাকে অনেকটা প্রবল করিয়া রাখিয়াছে। পুত্র লাভের আকাঙ্ক্ষার দুই দিক আছে, একটা স্বাভাবিক স্নেহ, আর একটা পুত্রের শরীরের উপর অধিকার। এই উভয় দিক হইতেই এই আকাঙ্ক্ষা পুত্রের উপর অব্যাহত এবং অবিসম্বাদী শক্তি লাভের চেষ্টায় প্রকাশিত হয়। কেবল পুত্রের উপর স্বত্ব প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায়ই বিবাহ অনুষ্ঠানের সৃষ্টি হয় নাই, কিন্তু, বিবাহ সমাজে প্রচলিত হইয়া গেলে পরে এই আকাঙ্ক্ষা বিবাহ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থার উপর প্রবল ভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা", এ আদর্শ কেবল ভারতের নয়, প্রাচীন রোম, গ্রীস ও অন্যান্য সকল দেশেই পুত্রোৎপাদনই বিবাহের প্রধান প্রয়োজন বলিয়া কালে কল্পিত হইয়াছে। এই ধারণা হইতে বিবাহের সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা অনেকটা নিয়মিত হইয়াছে। ইহার ফলে আদিম

*ঢাকা-সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

ব্যবস্থার কঠোরতা ও সঙ্কীর্ণতা ক্রমে দূর হইয়া বিবাহের পথ অনেকটা পরিসর হইয়া গিয়াছে। সন্তানের জননী স্বরূপে নারী সমাজে ও ব্যবহারে প্রতিষ্ঠা ও অধিকার লাভ করিয়াছে।

এই তিনটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ছাড়া আর এক শ্রেণীর ব্যাপার বিবাহের স্বরূপ এবং প্রকৃতি নির্দ্ধারিত করিয়াছে; তাহার মধ্যে প্রাচীন ব্যবহারের ইতিহাসে খুব স্পষ্টরূপে প্রকাশ, স্বামী ও স্ত্রীর আধ্যাত্মিক সম্পর্ক। এই সম্বন্ধ যে কেবল লৌকিক নহে, ইহা যে অদৃষ্টফল এবং দেবনির্দ্দিষ্ট এ ধারণা অন্ততঃ কতকটা সভ্য প্রাচীন সমাজে সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মের হিসাবে যে স্বামী ও স্ত্রী মিলিয়া এক আত্মা হইয়া যায়, ইহা প্রাচীন রোমেও যেমন, প্রাচীন ভারতেও তেমনি সুস্পষ্ট ভাবে দেদীপ্যমান।

তাহা ছাড়া, যে শারীর প্রবৃত্তি হইতে বিবাহের উৎপত্তি, তাহা মার্জ্জিত ও সংস্কৃত হইয়া একটা আধ্যাত্মিক বা অন্ততঃ খুব উন্নত মানসিক প্রবৃত্তিরূপে দেখা দিয়াছে, তাহার নাম প্রেম। ইহাও অতি প্রাচীন কাল হইতে পরিপুষ্ট দেখিতে পাই। সীতা বা দময়ন্তীর যে প্রেমের আদর্শ, তাহা বর্ত্তমান কালের আদর্শ হইতে কোনও অংশে ন্যূন নহে। এই প্রেম যে বহু পুরাতন যুগ হইতে বিবাহবিধানের ভাঙ্গন গড়নে অনেকটা শক্তি বিস্তার করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় বিবাহ সম্বন্ধের গঠনপ্রণালী। ইহা প্রাচীন ভারতে আদৌ কিরূপে কল্পিত হইয়াছিল এবং যুগে যুগে কিরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার কতকটা স্পষ্ট ধারণা করিবার চেষ্টা করিব। এই বিবাহসম্বন্ধের উৎপত্তি বিধান বিষয়ে এই কয়েকটি স্বতন্ত্র শক্তির মধ্যে খুব প্রত্যক্ষ ভাবে দুইটি শক্তির ক্রিয়া দেখিতে পাই—প্রথম, পত্নীর উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এবং দ্বিতীয়, পতিপত্নীর আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ জ্ঞান। এই দুইটি শক্তির পরস্পর সংমিশ্রণের তারতম্যেই বিবাহ বিধানের বৈচিত্র্য দেখা যায়। কিন্তু ইহা ছাড়া প্রেম, সঙ্গম-লিপ্সা এবং সর্ব্বোপরি পুত্রলাভের আকাঙ্ক্ষা এই ইতিহাসের উপর সর্ব্বত্র প্রচ্ছন্ন-ভাবে কার্য্য করিয়াছে। এই সমুদয় প্রবৃত্তির প্ররোচনায় যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রে পতির প্রাধান্য অথবা পতিপত্নীর ধর্ম্ম সম্বন্ধের যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও সমীকৃত হইয়াছে।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস যতদূর আমরা আলোচনা করিতে পারি, তাহাতে সর্ব্বত্রই পতিপত্নীর আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ কল্পিত দেখিতে পাই। বিবাহ যে একটা ধর্ম্মসম্বন্ধ, কেবল মাত্র লৌকিক ব্যাপার নহে, ইহা গৃহ্যোক্ত বিবাহ বিধিতে এবং বৈদিক বিবাহ মন্ত্রে সুস্পষ্ট-রূপে দেখিতে পাই। অপর পক্ষে ধর্ম্মশাস্ত্রের ভিতর সর্ব্বত্রই আবার স্ত্রীর উপর আধিপত্য সংস্থাপন চেষ্টা সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাই। পত্নী যেন দাসীর তুল্য। বৎস বৃদ্ধির জন্য যেমন গবী প্রয়োজনীয়, পুত্রোৎপাদনের জন্য স্ত্রী তেমনি প্রয়োজনীয় উপায়বিশেষ, এই লৌকিক আদর্শও খুব স্পষ্টরূপে ব্যবহারশাস্ত্রে দেখা যায়।

এই দুইটি স্বতন্ত্র ধারার পরস্পর প্রতিঘাতে সমস্ত প্রাচীন ইতিহাসে বিবাহবিধানের প্রকৃতি নিরূপিত হইয়াছে। সামাজিক অবস্থার তারতম্যে এই দুইটি ধারার মিশ্রণে তারতম্য হইয়াছে, কখনও একটি, কখনও আর একটি প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। আদৌ ধর্ম্মবিধান প্রবল দেখিতে পাই; মধ্যে লৌকিক বিধান ক্রমশঃ ধর্ম্মবিধানের পরিসর সঙ্কুচিত করিতেছে দেখিতে পাই, কিন্তু শেষে ধর্ম্মবিধানের পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং সম্পূর্ণ বিজয় দেখা যায়।

এই ইতিহাসের ধারার সঙ্গে কতকদূর পর্য্যন্ত রোমের ব্যবহারের ইতিহাসের নিকট সাদৃশ্য আছে। রোমে বিবাহবিধান প্রথমে ধর্ম্মবিধান রূপে আবির্ভূত হইয়া ক্রমে লৌকিক বিধানে পরিণত হইয়াছিল; সুতরাং রোমে বিবাহবিধানের ইতিহাস স্মরণ করিলে আমরা প্রাচীন

ভারতের বিবাহবিধানের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেকটা স্পষ্ট ধারণা করিতে পারিব।

প্রাচীন রোমের ব্যবহার শাস্ত্রের ইতিহাস যেরূপ আলোচিত হইয়াছে, অন্য কোনও দেশের ব্যবহারের ইতিহাস তেমন ভাবে আলোচিত হয় নাই, হইতে পারেও না। সেখানকার প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, ব্যবহার শাস্ত্রে স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধের মধ্যে একমাত্র স্বামীর প্রভুত্বটাই প্রকাশ, বিবাহের অপরাপর অঙ্গের কোনও পরিচয়ই আমরা তাহাতে পাই না। প্রাচীন রোমে গৃহপতির গৃহান্তর্গত সমুদয় ব্যক্তি ও বস্তুর উপর অসীম ক্ষমতা ও প্রাধান্য ছিল। এই ক্ষমতা ও যথেচ্ছচারিতার উপরই অতিপ্রাচীন ব্যবহার শাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত। এই আধিপত্যের নাম ছিল Potestas--যাহার যৌগিক অর্থ 'শক্তি', অথবা Manus যাহার আদিম অর্থ শক্তির লিঙ্গ 'হস্ত'। কালক্রমে এই Potestas পদার্থ সামান্য হইতে বিশেষের দিকে অগ্রসর হইলে, পরবর্ত্তী ব্যবহার শাস্ত্রে ইহার ত্রিবিধ আকৃতি স্বতন্ত্র ভাবে গৃহীত হইয়াছে। দাসদাসী ও গবাদি অপরাপর সামগ্রীর উপর যে Potestas তাহার স্বতন্ত্র নাম হইল Dominium বা Dominica Potestas ; স্ত্রীর উপর যে আধিপত্য তাহার নাম হইল Manus বা Manus viri এবং পুত্রকন্যার উপর যে আধিপত্য তাহার নাম হইল Patria potestas বা শুধু Potestas।

প্রাচীন রোমের ব্যবহারে গৃহপতির (Paterfamilias) গৃহান্তর্গত সকল বিষয়ের উপর যথেচ্ছ বিনিয়োগের শক্তি স্বীকৃত ছিল। তিনি পুত্র বা কন্যাকে ঠিক দাস দাসী বা পশ্বাদির ন্যায় বধ বা বিক্রয় করিলে বাহিরের কাহারও তাহাতে কিছু বলিবার অধিকার ছিল না। এইরূপ বিনিয়োগ সম্বন্ধে নিয়ম বিষয়েও দাস গবাদির সহিত পুত্রকন্যার কোনও পার্থক্য ছিল না। যদিও Confarreatio নামক ধর্ম্মবিবাহ সেখানকার আর্য্য বা patrician গণের মধ্যে আদৌ প্রচলিত ছিল, তথাপি যাহারা সেই ধর্ম্মাচারে অধিকারী ছিল না, সেই pleb গণের মধ্যে আর একপ্রকার বিবাহ প্রচলিত ছিল, তাহা এই কথা স্পষ্ট প্রমাণ করে। সে বিবাহের নাম Co-emtio. সে সময়ে রোমে কোনও সম্পত্তি বিক্রয় করিতে হইলে যে অনুষ্ঠান করিতে হইত, তাহার নাম ছিল Mancipatio ; কন্যাকে এইরূপ mancipatio দ্বারা যদি বরের নিকট বিক্রয়ের অভিনয় করা হইত, তবে, তাহাতেই স্বামীস্ত্রী সম্বন্ধ সৃষ্ট হইত। পত্নী গ্রহণ ব্যাপারের একমাত্র তাৎপর্য্য যেন পিতার নিকট হইতে কন্যার উপর অধিকারটা কিনিয়া নেওয়া।

তাহা ছাড়া প্রাচীন রোমের আইনে আর এক উপায়ে স্বত্বের উৎপত্তি হইত, তাহাকে সংস্কৃত ব্যবহার শাস্ত্রের নাম দিতে হইলে বলিতে হয় ভুক্তি—তাহার রোমক নাম Usus—যে কেহ প্রকাশ্য ভাবে এক বৎসর কাল কোনও সম্পত্তি দখল করিয়াছে, তাহার সেই সম্পত্তিতে আইনানুসারে স্বত্ব জন্মে, ইহাই এই নিয়মের অর্থ। যখন বিবাহ ব্যাপারে কন্যার উপর আধিপত্য লাভটাই একমাত্র লক্ষ্য, তখন কাজে কাজেই এ আইনও সে বিষয়ে খাটিতে লাগিল। যদি কেহ কোনও কন্যার সহিত প্রকাশ্য ভাবে স্বামী স্ত্রী ভাবে এক বৎসর বাস করে, তবে তাহারা আইনের চক্ষে বিবাহিত হইয়া যায়, তাহা স্থির হইয়া গেল—ইহার নাম হইল Usus দ্বারা বিবাহ। ইহা হইতে পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, বিবাহ ব্যাপারের আদি কথাটা স্ত্রীর উপর একাধিপত্য সংস্থাপন। ইহাই ছিল বিবাহের আদিম লক্ষ্য এবং বিবাহের অপরাপর অঙ্গ ক্রমে ইহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। আদিকালে দাসী ও পত্নীর ভিতর বড় বিশেষ তারতম্য ছিল না।

কেবল রোমের ব্যবহার শাস্ত্রের ইতিহাস ধরিলেও একথা ঠিক বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কারণ একথা স্পষ্ট যে Co-emtio এবং Usus অপেক্ষাও প্রাচীন বিবাহ পদ্ধতি Confarreatio—ইহা ধর্ম্ম

বিবাহ। সত্য বটে যে Confarreatio কেবল মাত্র Patres দিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল, কিন্তু স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, এই Patres গণই আদি রোমান,—Plebs ছিল কেবল কতকগুলি জাতিকুলশূন্য ছোটলোক যাহারা রোমনগরের সমৃদ্ধিদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সেখানে আসিয়া বাস করিতেছিল; তাহাদের কোনও একটা কুলগত ধর্ম্ম বা সংস্কার তাহারা সঙ্গে করিয়া আনে নাই। সুতরাং Patres গণের মধ্যে যে আচার প্রচলিত ছিল, তাহাই আদিম আচার বলিয়া ধরিতে হইবে। আরও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, প্রাচীন রোমের ব্যবহারে Co-emtio বিবাহ বলিয়াই স্বীকৃত হয় নাই, Confarreatioই আদি ব্যবহারে একমাত্র justum matrimonium বা বৈধবিবাহ; এইConfarreatio ধর্ম্ম বিবাহ। ইহাতে রোমের প্রধান পুরোহিত (Pontifex maximus, এবং জুপিটারের অগ্নিহোত্রী পুরোহিত (Flamen dialis) উপস্থিত থাকিতেন, বেদীতে অগ্নি প্রজ্বলিত হইত, পিষ্টক ভোগ দেওয়া হইত এবং স্বামী স্ত্রী একখানা প্রসাদী পিষ্টক ভাগ করিয়া খাইতেন। ইহার দ্বারা স্বামী স্ত্রীর আত্মার একত্ব সূচিত হইত। বিবাহ কালে ইহা ছাড়া অন্যান্য ধর্ম্মানুষ্ঠানও হইত, তাহার মধ্যে গৃহদেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ বা পূজা একটি।

যাহা হউক, এ অনুষ্ঠানের এই টুকুই এ সম্পর্কে জানা প্রয়োজন যে, বিবাহ সম্বন্ধ ইহাতে একটা ধর্ম্মসম্পর্ক রূপে পরিগণিত হইত, এবং দেবসাক্ষাৎকারে স্বামীস্ত্রীর এই ধর্ম্মবন্ধন বাঁধা হইত। সুতরাং ব্যবহারের অতি আদি কালেও যে রোমক বিবাহের মধ্যে ধর্ম্মের সংস্পর্শ ছিল না, এবং তাহা কেবল মাত্র নারীর উপর প্রভুত্ব হিসাবে পরিগণিত হইত, একথা বলা চলে না।

তাহা ছাড়া Pleb গণের বিবাহপদ্ধতি ধরিলেও একথা বলা চলে না যে, পত্নীর উপর প্রভুত্বই বিবাহ সম্বন্ধের একমাত্র উপকরণ বলিয়া কোনও কালে পরিগণিত ছিল। কারণ, ব্যবহার রোমকগণের বা অন্য কোনও জাতিরই সমগ্র জীবনের পরিচয় নহে। ব্যবহার বা jus কেবল বাহ্যিক অধিকার সম্বন্ধ লইয়া ব্যাপৃত, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের নিয়ামক অন্য ধর্ম্ম-নীতিগুলি ছিল, যাহা জীবনের অন্ততঃ বার আনা ব্যাপারে ব্যবস্থা বিধান করিত। রোমে এই সামাজিক ধর্ম্মনিয়মের নাম ছিল Fas; যদিও আইনের চক্ষে বিবাহসম্বন্ধ কেবলমাত্র অধিকার ও প্রভুত্বের সম্পর্ক ছিল, তথাপি নৈতিক জীবনে তাহা পরস্পরের একটা স্বতন্ত্র রকমের ধর্ম্ম ও সমাজনীতি-নিয়মিত সম্পর্ক রূপে বিবেচিত হইত। এই ধর্ম্ম ও সমাজের বিধিনিষেধের অস্বীকারে আইনে কোনও শাস্তি ছিল না বটে, কিন্তু পাতিত্য প্রভৃতি বিবিধ সামাজিক শাস্তির বিধান ছিল। সুতরাং এই Fas হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কেবল মাত্র jus এর ব্যবস্থা হইতে আমরা যদি সিদ্ধান্ত করিয়া বসি যে, আদি কালে বিবাহ কেবলমাত্র প্রভুত্বমূলক ছিল, তাহাতে ধর্ম্ম-নীতি কি প্রেমের কিছু স্থান ছিল না, তবে আমরা বড় ভুল করিব।

ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল বিবাহ পদ্ধতির কথা আছে তাহা বর্ব্বর জাতিগণের আচারাদির সহিত আলোচনা করিয়া পণ্ডিতগণ সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, ভারতে রাক্ষস বিবাহই আদিম এবং ব্রাহ্ম বিবাহ সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা পরিণত অবস্থার ফল। অপরাপর প্রকার বিবাহ এই অভিব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন স্তর মাত্র। আমার মনে হয়, এই সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত, এবং ভারতের ইতিহাসে ব্রাহ্মবিবাহ একহিসাবে আদিম বিবাহ এবং রাক্ষস পৈশাচাদি ইতর বিবাহ পরবর্ত্তী কালে আর্য্য সমাজে সঞ্চারিত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে সেমিটিক জাতীয় Babylonian, Assyrian, Hebrew ও Arab জাতির মধ্যে কেবল মাত্র কন্যা ক্রয়দ্বারা বিবাহ প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মবিবাহে

বিবাহ সম্বন্ধের যে উচ্চ ধর্ম্মের আদর্শ কল্পিত হইয়াছে, তাহা যে ভারতীয় আর্য্যগণের আদিম অবস্থার পরিচায়ক, আর্য্যজাতির নানা শাখার বিবাহ বিধান আলোচনা করিলে ইহাই মনে হয়। রোমের বিবাহ বিধানের কথা আলোচনা করিয়াছি। প্রাচীন গ্রীসের বিবাহ বিধিও অনেকটা সেইরূপ ছিল, তাহার মধ্যেও বিবাহ ধর্ম্মবন্ধন এবং তাহার লক্ষ্য আধ্যাত্মিক সম্মিলন এবং সমবেত ধর্ম্মচর্চ্চা। ইহা হইতে একথা অনুমান করা যাইতে পারে যে, বিবাহ ব্যাপার যে একটা ধর্ম্মসম্বন্ধের সূচক এই ধারণা আর্য্যজাতির পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ার পূর্ব্ববর্ত্তী কালে তাহাদের ভিতর পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। সুতরাং কেবল ধর্ম্মসম্বন্ধসূচক ব্রাহ্মবিবাহ যে ভারতীয় আর্য্যগণের আদিম ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল, একথা অনেকটা সাহসের সহিত বলা যাইতে পারে।

বর্ব্বর জাতির আচার অনুষ্ঠান আলোচনা করিয়া পণ্ডিতগণ এই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন যে, বলপূর্ব্বক কন্যাহরণই আদিম বিবাহ, কন্যাক্রয় তাহার পরবর্ত্তী এবং স্বচ্ছন্দ বিবাহ তাহারও পরবর্ত্তী। আমার সিদ্ধান্তের সহিত ইহার কিছুমাত্র বিরোধ নাই। হইতে পারে যে আর্য্যজাতিকে ব্রাহ্মবিবাহ কল্পনার পূর্ব্বে সভ্যতার এই সকল নিয়ক্রম পার হইতে হইয়াছিল; কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে, ভারতে আর্য্য-সভ্যতার বিস্তারের পূর্ব্বে আর্য্যগণ এই সব স্তর অতিক্রম করিয়াছিলেন এবং রোমে যেমন আদিকালে কেবলমাত্র Confarreatioই justum matrimonium বলিয়া পরিগণিত ছিল, ভারতের আর্য্যসমাজেও তেমনি আদি কালে ব্রাহ্মবিবাহই একমাত্র বৈধ বিবাহ বলিয়া পরিগণিত ছিল। পরবর্ত্তী কালে রোমে যেমন সামাজিক অবস্থার তাড়নায় Co-emptio ও usus বৈধ বিবাহ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল, ভারতেও তেমনি অন্যান্য জাতির সঙ্গে সংঘর্ষে এবং সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থার গতিকে অন্যান্য নিকৃষ্ট বিবাহ সামাজিক বিধিতে স্থান পাইয়াছিল। এই ব্রাহ্মবিবাহ হইতে আরম্ভ করিয়া নানাবিধ বিবাহের পরিণতি ক্রমে আমি আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

ইহা করিতে হইলে ধর্ম্মশাস্ত্রে আলোচিত বিবিধ বিবাহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া সঙ্গত হইবে। মনুসংহিতায় এই সমুদয় বিবাহ পদ্ধতির সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত বর্ণনা আছে আমি এস্থলে তাহা উদ্ধার করিয়া তাহার সংক্ষিপ্ত টীকা করিব। মনু বলিয়াছেন,—

"ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষস শ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমাধমঃ" ॥ ৩অ, শ্লো ২১।

এই কয় প্রকার বিবাহ আছে। তন্মধ্যে প্রথম ব্রাহ্ম। তৎসম্বন্ধে মনু বলেন, (অ ৩, শ্লো ২৭)

"আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ম্।
আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মো ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

'আহূয়' বা আহ্বান করিয়া এবং 'স্বয়ং' এই দুইটি কথা ইহার মধ্যে বিশেষ প্রয়োজনীয়। কন্যার পিতা স্বয়ং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া দান করিবেন, এবং বরকে আহ্বান করিয়া সম্বর্দ্ধনা করিয়া দান করিবেন, ইহাই ব্রাহ্ম বিবাহের মূল কথা। পিতার অনিচ্ছায় বা বল বা উৎকোচজনিত ইচ্ছায় যে কন্যা ঊঢ় হয়, তাহার ব্রাহ্ম বিবাহ হয় না। এবং বর যদি প্রার্থীভাবে কন্যার পিতার নিকট উপস্থিত হয়, তবেও ব্রাহ্মবিবাহ হয় না।

সমাজের যে অবস্থায় এইরূপ বিবাহ সম্ভব, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কন্যার সংখ্যা যদি অধিক হয়, তবেই কন্যা অপেক্ষা বরই বেশী খুঁজিবার জিনিষ হয়। বর্ব্বর সমাজে ঠিক ইহার উল্টা ব্যবস্থা, কন্যাকে কাড়িয়া বা যাচিয়া বা কিনিয়া লইতে হয়। কন্যার মূল্য বরের অপেক্ষা অধিক।

দৈব বিবাহও সমাজের এইরূপ অবস্থার সূচক। সে সম্বন্ধে মনুর ব্যবস্থা এই (অ ৩ শ্লো ২৮)—

যজ্ঞে তু বিততে সম্যগৃত্বিজে কর্ম্ম কুর্ব্বতে।
অলঙ্কৃত্য সুতাদানং দৈবং ধর্ম্মং প্রচক্ষতে॥

ব্রাহ্ম হইতে এই বিবাহের প্রভেদ শুধু এই টুকু যে, ইহাতে বরকে আহ্বান করিয়া আনিতে হয় না, যজ্ঞের ঋত্বিক্‌কেই বর করিয়া কন্যাদান করা হয়। ইহা ব্রাহ্মবিবাহের রূপান্তর মাত্র, যজ্ঞের ঋত্বিকের সম্মান ও দক্ষিণার প্রকার বিশেষ।

আর্ষ বিবাহে কন্যাই প্রার্থিত হয় এবং তাহার মূল্য স্বরূপ এক জোড়া কি দুই জোড়া গরু দিতে হয়। মনু বলেন (অ-৩, শ্লো ২৯)—

একং গোমিথুনং দ্বে বা বরাদাদায় ধর্ম্মতঃ।
কন্যাপ্রদানং বিধিবদার্ষো ধর্ম্মঃ স উচ্যতে॥

মনু এক বা দুই গো মিথুনের কথা বলিয়াছেন, যাজ্ঞবল্ক্য (অ ১, শ্লো ৫৯) গোদ্বয়ের কথা বলিয়াছেন। কন্যার পিতার প্রণামী বিষয়ে এরূপ মতভেদ আছে। কিন্তু যাহাই হউক প্রণামীর পরিমাণটা নিয়মে বাঁধা, কমি বেশী হইবার জো নাই।

এই গোমিথুন যে কন্যার মূল্য স্বরূপ নয় এবং ইহা লইয়া যে কন্যার পিতা অপত্য বিক্রয়ী হয় না, মনু তাহা বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন (৩—৫২)। তথাপি ঐতিহাসিক হিসাবে এই গো মিথুন যে কন্যাশুল্কেরই পরিণতির রূপান্তর মাত্র সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এ কথা লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, মূল্য দ্বারা কন্যা ক্রয় হইতে এ বিবাহের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য বলা হইয়াছে যে, গোদ্বয় বা গোমিথুন লইয়া পিতা বিধিপূর্ব্বক জল দিয়া কন্যা দান করিলে তবেই এরূপ বিবাহ হইতে পারে। কন্যাদানটাই এস্থলে স্বাম্যের কারণ—গোদান নহে। প্রাজাপত্য বিধানের যে কি বিশেষত্ব তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। মনু বলিয়াছেন,

সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মং ইতি বাচানুভাষ্য তু।
কন্যাপ্রদানমভ্যর্চ্য প্রাজাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ॥

ইহাতেও কন্যাপ্রদান আবশ্যক, তবে ব্রাহ্ম হইতে ইহার স্বাতন্ত্র্য কিসে? মনু এবং যাজ্ঞবল্ক্যের বচন (১—৫৯) কেবলমাত্র প্রাচীন গৌতমাদির শাস্ত্রের প্রতিধ্বনি মাত্র; ইহা হইতে মনে হয় যেন "সহোভৌ চরতাং ধর্ম্ম" এইরূপ পারিভাষিক শব্দ ব্যবহারেই ইহার স্বাতন্ত্র্য। মেধাতিথিও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মেধাতিথির এবং তাহার বহু পূর্ব্ববর্ত্তী কাল হইতেই এই প্রকার বিবাহ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং টীকাকারেরও এবিষয়ে খুব স্পষ্ট ধারণা ছিল না।

আমার মনে হয় যে, প্রাজাপত্য বিধির বিশেষত্ব ছিল বরকন্যার পরস্পর অভিলাষে। যেখানে পিতা বরকন্যার পরস্পর প্রীতি লক্ষ্য করিয়া তাহাদিগকে সম্মিলিত হইবার অনুমতি দিয়া বরকে কন্যা সমর্পণ করিতেন, সেখানে বিবাহের নাম প্রাজাপত্য হইত। ইহা আনুমানিক সিদ্ধান্ত মাত্র, কিন্তু ইহা ছাড়া "সহোভৌ চরতাং ধর্ম্ম" কথাটার কোনও বিশেষ তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার Marriage and Stridhanএ বলেন যে প্রাজাপত্যের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে বর উপযাচক হইয়া আসে। কিন্তু কোনও স্মৃতিতে এরূপ কোনও ইঙ্গিত দেখিতে পাওয়া যায় না।

সকল শাস্ত্র মতেই এই চারি প্রকার বিবাহ দ্বিজাতিগণের প্রশস্ত, যদিও মনু নানা বচনের অবতারণা করিয়া বিবিধ বিধানে কেবল মাত্র পৈশাচ ভিন্ন সকল বিবাহই এক রকম বৈধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই চারি প্রকার বিবাহের সমান ধর্ম্ম এই যে, ইহার সবগুলিতেই পিতা বরকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া কন্যা দান করেন। কন্যাদান বিবাহ বিধির একটা অত্যাজ্য অঙ্গ এবং তাহার প্রণালী বিবাহের অপরাপর অনুষ্ঠানের সহিত গৃহ্যে নিরূপিত আছে। সুতরাং এই দানের উল্লেখ দ্বারা গৃহ্যোক্ত সমগ্র বিবাহ পদ্ধতি উপলক্ষিত হইয়াছে, একথা অনুমান করা যায়। সুতরাং এই সমুদয় বিবাহে পূরাপূরি বিবাহ সংস্কার হইত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সম্প্রদানের পর পাণিগ্রহণ হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তপদী-গমন পর্য্যন্ত সমুদয় অনুষ্ঠান করিতে হইত।

আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহ এবিষয়ে সম্পূর্ণ অন্য প্রকার। আসুর সম্বন্ধে মনু বলেন

'জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্ত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ।
কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যা দাসুরো ধর্ম্মউচ্যতে॥

দ্রবিণ বা উপহার বা উৎকোচদান এ বিবাহের মূল কথা। 'কন্যাপ্রদানং' মানে কন্যা+আপ্রদানং বা কন্যা গ্রহণ। মূল্য দিয়া কন্যা গ্রহণ করায় ইহাতে পিতা কর্ত্তৃক দানের অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং জলের দ্বারা সম্প্রদান ইহাতে নাই। সুতরাং একথা অনুমান করা যাইতে পারে যে, সম্প্রদান-মূলক যে গৃহ্যোক্ত বিবাহ সংস্কার তাহা ইহাতে হয় না। মেধাতিথি বলেন যে, আসুরাদি নিকৃষ্ট বিবাহেও সংস্কার আবশ্যক, এবিষয়ে, মেধাতিথি উল্লেখ না করিলেও তাঁহার সপক্ষে স্মৃতির বচনও অন্য নিবন্ধে উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মেধাতিথির যুক্তির যে সমুদয় মূল কথা তাহার ঐতিহাসিক হিসাবে কোনও মূল্য নাই। এই সমুদয় বিবাহ যে আদৌ সংস্কারবিহীন ছিল, সে পক্ষে অনেক যুক্তি আছে; তাহার মধ্যে একটি এই যে, বিবাহ সংস্কার সম্প্রদানমূলক, সুতরাং সম্প্রদান যেখানে নাই সেখানে সংস্কার হইতে পারে না। এই সমুদয় বিবাহ সম্বন্ধে আর একটি কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্মৃতিচন্দ্রিকা-কার দেবান্ন ভট্ট বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মাদি বিবাহে গোত্রান্তর হয়, কিন্তু আসুরাদি বিবাহে গোত্রান্তর হয় না, কন্যা পিতৃগোত্রে থাকে। দেবান্ন ভট্ট এ কথার প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই, আমিও কোথাও একথার প্রমাণ পাই নাই। কিন্তু স্মৃতিগ্রন্থের যেরূপ বিলোপ হইয়াছে তাহাতে প্রমাণ না পাইলেও দেবান্নভট্টের মত সর্ব্বজন-প্রশংসিত পণ্ডিতের মতকে অশ্রদ্ধা করা চলে না। এ কথা যদি ঠিক হয়, তবে ইহাতে আমার মত সমর্থন করে, কারণ গোত্রান্তর একটি অদৃষ্ট কার্য্য, তাহার অদৃষ্ট ফল বিবাহ সংস্কারের দ্বারা সাধিত হয়। এই সংস্কার নাই বলিয়াই আসুরাদি বিবাহে গোত্রান্তর হয় না।

'স্বাচ্ছন্দ্যাৎ' কথাটা প্রণিধানযোগ্য, বরের ইচ্ছাই এখানে নিয়ামক, কন্যার পিতার ইচ্ছা নয়। গান্ধর্ব্ব সম্বন্ধে মনুর বিধান এই,

ইচ্ছয়ান্যোন্যসংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ।
গান্ধর্ব্বো স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যো কামসম্ভবঃ॥

এই বিবাহ যে কন্যার পিতার মতের অপেক্ষা রাখে না, তাহা সুস্পষ্ট এবং ইহাতে যে সংস্কার আবশ্যক হয় না তাহার অন্য প্রমাণের অভাব নাই। এই গান্ধর্ব বিবাহ বিধান সম্বন্ধে মনুর বচনে "মৈথুন্যঃ" এবং "কাম সম্ভবঃ" কথা দুইটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। অন্য কোনও স্মৃতিতে একথা না থাকিলেও মনুর এই বচন হইতে বলা যায় যে, বর কন্যাতে উপগত হওয়াই বিবাহ বন্ধনের প্রকৃত হেতু। পৈশাচ বিবাহেও তাহাই বিবাহের হেতু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। কেবল মাত্র অনুরক্তিতে গান্ধর্ব বিবাহ হয় না, কন্যাত্ব বিনষ্ট হইলেই পতি পত্নীর সম্বন্ধ স্থাপিত হয় ইহাই শাস্ত্র-কারগণের ব্যবস্থা। রাক্ষস বিবাহ সম্বন্ধে মনু বলেন,

"হত্বা ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ
প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে॥"

প্রসহ্য অর্থাৎ বলপূর্ব্বক কন্যাহরণই রাক্ষস বিবাহ। "হত্বা ছিত্ত্বা ভিত্ত্বা" প্রভৃতি অনুবাদ মাত্র, বলপূর্ব্বক হরণ করিলে যদি কেহ বাধা না দেয় তথাপি বিবাহ রাক্ষসই হইবে। ইহার আর একটি বিশেষত্ব কন্যার অনিচ্ছা, ইহা "ক্রোশন্তীং রুদতীং" এই বিশেষণদ্বয় দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে। যদি কন্যার ইচ্ছা থাকে, যেমন সুভদ্রা বা রুক্মিণী হরণে, তবে সেটাকে খাঁটি রাক্ষস বিবাহ বলা যায় না, সে একরকম মিশ্র বিবাহ। (মনু ৩—২৬)

পৈশাচ বিবাহ বিধি এই—

"সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপগচ্ছতি।
স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচো প্রথিতোঽষ্টমঃ॥"

গান্ধর্বের ন্যায় এ বিবাহেও উপগমন বিবাহের কারণ, কিন্তু প্রভেদ কন্যার অসম্মতিতে। এই প্রকার বিবাহের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? ইহা কি সত্য সত্যই জীবনব্যাপী বিবাহসম্বন্ধ বলিয়া পরিগণিত হইত? না, ইহা অত্যাচারিত রমণীর কন্যাত্বাপহারকের উপর একটা দাবীর সৃষ্টি করিবার জন্য কল্পিত হইয়াছিল। কেহ কি কোনও কন্যাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিবার জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক এইরূপ প্রণালী অবলম্বন করিত, না কেহ ছল পূর্ব্বক কন্যার কৌমার্য্য হরণ করিলে তাহার প্রতি শাস্তি স্বরূপ এই ব্যবস্থা প্রযুক্ত হইত, একথা বলা কঠিন। যদি সত্য সত্যই ইহা রাক্ষসাদি বিবাহের মত একটা বিবাহ পদ্ধতি বলিয়া কল্পিত হইয়া থাকে, তবে ইহা মনে করিতে হইবে যে, সে সময়ে অকন্যার বিবাহ সম্ভব ছিল না বলিয়া কন্যা কাহারও দ্বারা দূষিত হইলেই তাহার সহিত বিবাহ কল্পনা করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

মনু যে এই অষ্ট প্রকার বিবাহের কথা বলিয়াছেন, তাহা সকল স্মৃতিসম্মত নহে। গৌতম কেবল ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, আর্ষ ও দৈব বিবাহ বৈধ বলিয়াছেন এবং অপর কাহারও মত উল্লেখ করিয়া গান্ধর্ব্ব ও আসুর বিবাহের নাম করিয়াছেন। রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহের তিনি উল্লেখ করেন নাই। আপস্তম্ব প্রাজাপত্য ও পৈশাচ ব্যতীত অপর ছয় প্রকার বিবাহের উল্লেখ করিয়াছেন। বশিষ্ঠও আপস্তম্বের মত ছয় প্রকার বিবাহের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা, ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, গান্ধর্ব্ব, ক্ষাত্র (রাক্ষস), মানুষ (আসুর)। বৌধায়ন আট প্রকার বিবাহেরই নাম করিয়াছেন। এই সমুদয় স্মৃতি হইতে দেখা যায় যে, ব্রাহ্ম, দৈব ও আর্ষ বিবাহ সম্বন্ধে স্মৃতিগুলির যেরূপ ঐকমত্য আছে, অপরাপর বিবাহ সম্বন্ধে সেরূপ সাদৃশ্য নাই। শুধু এই কথা হইতেই বলা যাইতে পারে যে, এই তিন প্রকার বিবাহই সম্প্রদায় আর্য্য সমাজে প্রচলিত ছিল। তবে কন্যাক্রয় দ্বারা বিবাহও যে অতি প্রাচীন কালে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ স্বরূপ বশিষ্ঠধৃত শ্রুতি বচনের উল্লেখ করা যাইতে পারে; যথা,

"অনৃতং বা এষা করোতি যা পত্যুঃ" ক্রীতা সতী অথান্যৈশ্চরতি। (১)

রাক্ষস বিবাহ ক্ষত্রিয়গণের বিশেষ অধিকার বলিয়া খুব প্রাচীন কাল হইতেই স্বীকৃত হইয়াছে এবং বশিষ্ঠ ইহাকে ক্ষাত্র বিবাহ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বশিষ্ঠের আমলেই প্রশ্ন উঠিয়াছিল যে, ক্ষাত্র বিবাহে সংস্কারের প্রয়োজন আছে কি না? এ প্রশ্ন যেরূপভাবে আলোচিত হইয়াছে, তাহাতেই মনে হয় যে, অন্ততঃ আদিতে ইহা সংস্কারহীন ছিল।

নিকৃষ্ট বিবাহ পদ্ধতিগুলির মধ্যে সংস্কার বিহীন গান্ধর্ব্ব ও পৈশাচ বিবাহ যে অন্ততঃ আদিতে বৈধ বিবাহ বলিয়া পরিগণিত হইত না, তাহার আর একটি প্রমাণ পাই শাস্ত্রোক্ত গৌণ পুত্র গণনায়। সকলেই জানেন যে, ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বাদশবিধ পুত্রের উল্লেখ আছে; তন্মধ্যে কানীন গূঢ়জ ও সহোঢ় পুত্রের নাম আছে। কৌমার্য্য হরণ মাত্র যদি বিবাহ বলিয়া পরিগণিত হইত, তবে কানীন ও সহোঢ় পুত্র জনয়িতার পুত্র বলিয়া পরিগণিত হইত। অতি প্রাচীন কাল হইতে এই প্রকার গৌণপুত্র ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে স্বীকৃত হইয়াছে। আমার মনে হয় যে, যখন এইরূপ বিধি প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় অন্ততঃ তখন কন্যাত্বহরণ মূলক বিবাহ প্রচলিত ছিল না।

অবশ্য, মেধাতিথি প্রভৃতি টীকাকারের মতে কন্যাত্ব হরণ মাত্রই বিবাহের কারণ নহে, সকল বিবাহেই স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ সংস্কার হইতে উৎপন্ন হয়। এই বিবিধ বিধান কেবল কন্যাসংগ্রহের প্রকার ভেদ, এইরূপে কন্যা

(১) এই বচন বুলার মৈত্রায়ণীয় সংহিতা ১, ১০, ১১ বলিয়া বিবেচনা করেন। বশিষ্ঠ শাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্রেরও মত উদ্ধার করিয়াছেন।

সংগৃহীত হইলে সংস্কার দ্বারা তাহার সহিত বিবাহ নিষ্পন্ন হয়। একথা স্বীকার করিলে কানীন, সহোঢ়াদি পুত্রের সম্ভাবনা থাকে এবং ঐরূপ গৌণ সম্ভাবনা হইতে গান্ধর্ব পৈশাচাদি বিবাহের অর্ব্বাচীনত্ব প্রমাণ হয় না। কিন্তু স্মৃতির বাক্য সমূহ নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনা করিলে পৈশাচাদি বিবাহ যে আদৌ সংস্কারযুক্ত ছিল না, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। (১)

সুতরাং ভারতীয় আর্য্য সমাজে যে ধর্ম্ম-বিবাহই আদি বৈধ বিবাহ ছিল এবং রাক্ষস আসুরাদি বিবাহ পরবর্ত্তী কালে কতক সামাজিক আভ্যন্তরীণ অবস্থার পীড়নে, কতক বা সমীপবর্ত্তী জাতিগণের সংস্পর্শে আর্য্যগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছিল, তাহা অনেকটা সাহসের সহিত বলা যাইতে পারে। একথা নিশ্চিত যে, রাক্ষস ও আসুর বিবাহ আর্য্যগণের পার্শ্ববর্ত্তী জাতি সমূহের মধ্যে সুপ্রচলিত ছিল। রাক্ষস বিবাহ বা তাহার অভিনয় অদ্যাপি মুণ্ডা, খাসিয়া প্রভৃতি ভারতের আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে একমাত্র বৈধ বিবাহ স্বরূপে প্রচলিত আছে; আর্য্য উপনিবেশ কালেও যে ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার নাম রাক্ষস বিবাহ যে কেন হইয়াছিল, তাহা বলা কঠিন। পাশব শক্তি প্রয়োগে এ বিবাহ নিষ্পন্ন হয় বলিয়া ইহা রাক্ষস বিবাহ বলিয়া পরিচিত হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। কিন্তু আর্য্যগণের নিকট রাক্ষস নামে পরিচিত কোনও জাতি হইতে এই বিবাহ পদ্ধতি গৃহীত হওয়ায়ও ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়া থাকিতে পারে।

(১) পরবর্ত্তী কালে বৌধায়ন ও বশিষ্ঠের আমল হইতেই এইরূপ বিবাহে সংস্কার যুক্ত হইয়াছিল, সে কথা আমি অস্বীকার করি না। এ সম্বন্ধে নানা নিবন্ধ ধৃত দেবল বচন,

> গান্ধর্ব্বাসুর পৈশাচাঃ বিবাহাঃ রাক্ষসশ্চ যঃ।
> পূর্ব্বং পরিগ্রহ স্তেষু পশ্চাদ্ধোম বিধীয়তে॥

এবং বশিষ্ঠ ১৭ অ ৩ সূ এবং বৌধায়ন (৪, ১৫)।

আসুর বিবাহ যে এইরূপ অন্যজাতির নাম হইতে নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। সকলেই জানেন যে, ভারতে আর্য্য উপনিবেশের নিকটেই অসুর (Assyrian) জাতি বাস করিত। এই জাতির যে সকল বিবরণ এক্ষণে পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে কন্যা ক্রয়ই একমাত্র বিবাহ পদ্ধতিরূপে এ দেশে প্রচলিত ছিল। এই অসুরগণ সভ্যতায় আর্য্যগণের অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না, সুতরাং তাহাদের সংস্পর্শে আর্য্য জাতির বিবাহ পদ্ধতি গ্রহণ করা কিছুই বিচিত্র নহে। আর্য্যগণের মধ্যে এইরূপ বিবাহ যে আসুর নামে পরিচিত হইয়াছিল, তাহাতেই এইরূপ একটা ইতিহাসের ইঙ্গিত করে।

রোমে যেরূপে Co-emtio বৈধ বিবাহ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল, ভারতে আসুরাদি বিবাহের সেইরূপ একটা ইতিহাস থাকা অসম্ভব নয়। প্রাচীন কালে ধর্ম্ম ও ব্যবহার দেশগত ছিল না, কুল ও জাতিগত ছিল। একই রাজ্যে নানাজাতীয় লোক বাস করিলেও প্রত্যেকের স্বধর্ম্মানুসারে অধিকার সম্বন্ধ নিরূপিত হইত। এই কারণে রোমের আদিম বিধিতে Confarreatio একমাত্র বৈধবিবাহ বলিয়া বিবেচিত হইলেও, যে সকল ভিন্ন জাতীয় লোক রোমে বসতি করিয়াছিল তাহারা নিজ নিজ ধর্ম্মানুসারে বিবাহ অনুষ্ঠান করিত। এই বিজাতীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে কন্যাবিক্রয় দ্বারা বিবাহ সম্ভবতঃ প্রচলিত ছিল, কিন্তু ক্রমে রোমের উন্নত আদর্শের সংঘর্ষেই হউক বা অন্য কারণেই হউক এই ক্রয় বিক্রয়টা শেষে একটা অনুষ্ঠান মাত্রে দাঁড়াইয়াছিল। নামমাত্র মূল্যে কন্যাক্রয়ের অভিনয় মাত্র হইত। রোমের ব্যবহারে যখন এই বিধি স্থান পাইয়াছিল, তখন ইহা Mancipatio বা ক্রয়বিক্রয়ের অভিনয় দ্বারা নিষ্পন্ন হইত।

ভারতেও ঠিক সেইরূপে আসুর বিবাহ সমাজে সঞ্চারিত হইয়া থাকা বিচিত্র নহে। কোনও আর্য্য

নগরে অসুর জাতীয় ব্যবসায়ীরা উপনিবিষ্ট হইলে তাহাদের মধ্যে বিবাহাদি ক্রয় বিক্রয় দ্বারা অনুষ্ঠিত হওয়া স্বাভাবিক। এইরূপে কন্যাক্রয় বিবাহের একটা সম্ভবপর প্রণালী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকিতে পারে। পরে যখন আবশ্যক হইল তখন আর্য্যগণের পক্ষেও এই প্রণালীতে বিবাহ সম্পন্ন করা কাজেই সহজ হইয়া উঠিল। এই প্রয়োজন হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ব্রাহ্মাদি বিবাহ কেবল সেই সমাজেই চলে যেখানে কন্যার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক এবং কন্যা অপেক্ষা বরই অধিক অন্বেষিত হয়। কিন্তু আর্য্যগণের নূতন উপনিবেশ সমূহে এ অবস্থার বিপর্য্যয় হওয়া খুবই সম্ভব, সুতরাং কোনও আর্য্য যুবক, কবে কোন কন্যার পিতা আসিয়া তাহাকে বরণ করিয়া লইবে সেই শুভ সুযোগের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিলে হয় তো চিরদিন তাহাকে বসিয়া থাকিতে হইত। কাজেই মহম্মদকেই পর্ব্বতের কাছে যাইতে হইত, এবং চাই কি উৎকোচ দিয়া কন্যা সংগ্রহ করিতে হইত।

আমার মনে হয় যে, আর্ষ বিবাহ এই আসুর বিবাহেরই মার্জ্জিত সংস্করণ। ইহাও অসম্ভব নয় যে আর্য্যগণের অতি আদি অবস্থায় তাহাদের মধ্যে কন্যাক্রয়ের পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, পরে তাহার সহিত ধর্ম্মসংস্কার যুক্ত হইয়া আর্ষ বিবাহের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং তাহা কোনও কোনও বিশিষ্ট আর্য্য সমাজে প্রচলিত ছিল। কিম্বা ইহা অসুর জাতির সংস্পর্শ হইতেও উদ্ভূত হইয়া থাকিতে পারে। কন্যাক্রয়ের সঙ্গে একটা ধর্ম্মসংস্কার জুড়িয়া আর্য্যগণ এই অসুর জাতির বিধানকে জাতে তুলিয়া লইয়াছিলেন। আসুর বিবাহের সহিত এবিবাহে সংস্কারগত ভেদ ছাড়া কেবল এই টুকই প্রভেদ যে ইহাতে কন্যার মূল্য স্বরূপ যাহা দেওয়া হয় তাহা সামান্য। কিন্তু সমাজের যে অবস্থায় এই বিধান আর্য্য সমাজে গৃহীত হইয়াছিল তাহাতে গরুর দাম হয়তো নিতান্ত কম ছিল না এবং কন্যার পিতা হয়তো দুইটি গরুকে সানন্দে কন্যার উপযুক্ত মূল্য স্বরূপে গ্রহণ করিতেন। পরবর্ত্তী কালে যখন সমাজ অধিক সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল তখন গোমিথুন অপেক্ষাকৃত অকিঞ্চিৎকর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু পরম্পরাগত নিয়ম সেজন্য পরিবর্ত্তিত হয় নাই। তাই যেখানে কন্যার পিতা ঠিক মূল্য চাহিতেন সেখানে আর্ষ বিবাহ হইত না। এই কারণেই হয়তো খাঁটি আসুর বিবাহ ক্রমে আর্য্য সমাজে প্রচলিত হইয়া গেল।

একটা আধুনিক দৃষ্টান্ত দ্বারা একথা একটু স্পষ্ট ভাবে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। বহুকাল পূর্ব্বে আমাদের দেশে কৌলিন্য অনুসারে বরপণ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। সে পণের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্প, অথচ বরের মূল্য আজ কাল এত অধিক যে সুবর্ণ বণিক প্রভৃতি জাতির মধ্যে যেরূপ পণ দেওয়া হয় তাহার সঙ্গে কুলীনের পণের কোনও তুলনাই হয় না। সে কালের সমাজে এই কুলীনের পণের পরিমাণ যথেষ্টই বিবেচিত হইত, কিন্তু এখন তাহা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া গণ্য। কাজেই এখন কুলমর্য্যাদার অনুসারে পণ লইয়া বিবাহ করা কুলীন সমাজেও উঠিয়া গিয়াছে এবং বণিক্ সমাজে যেমন চুক্তি করিয়া বরের মর্য্যাদার পরিমাণ ঠিক হয়, সেই পদ্ধতি কুলীন অকুলীন সবাই গ্রহণ করিয়াছে।

দৈব বিবাহ কিরূপে উদ্ভূত হইয়াছিল তাহা বলা কঠিন, কিন্তু ঋত্বিকের সম্বর্দ্ধনার প্রকার ভেদ স্বরূপ ইহা পরিগণিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ইহার একটি পৌরাণিক দৃষ্টান্ত ঋষ্যশৃঙ্গের শান্তার সহিত পরিণয়। সম্মানার্থে কন্যাদান যে পূর্ব্ব কালে সমাজে বেশ প্রচলিত ছিল, তাহার বহু দৃষ্টান্ত আছে। অর্জ্জুনের তীর্থ পর্য্যটনের ইতিহাসে তাঁহার একাধিকবার এইরূপ সম্বর্দ্ধনা হইয়াছিল, ইহা মহাভারতে দেখিতে পাই। শ্রৌত যজ্ঞাদি ক্রমে অপ্রচলিত হইয়া যখন পৌরাণিক ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়া পড়িল তখন কাজে কাজেই এই বিবাহ অপ্রচলিত হইয়া গেল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, খুব সম্ভবতঃ প্রাজাপত্য বিবাহ

বরকন্যার পরস্পর অনুরাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি এই সিদ্ধান্ত সত্য হয়, তবে প্রাজাপত্যের উদ্ভব অনেকটা আর্ষ বিবাহের উৎপত্তির মত হওয়া সম্ভব। গান্ধর্ব বিবাহ আর্য্য সমাজে আদি কালে প্রচলিত ছিল না, ধর্ম্ম বিশ্বাসী আর্য্যগণ এই কামসম্ভব পরিণয়কে বিবাহ বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। অথচ সমাজের যে অবস্থায় গান্ধর্ব বিবাহ হয় অর্থাৎ যখন বর ও কন্যা বয়স্থ হইয়া বিবাহ করে, সে অবস্থায় বরকন্যার পরস্পর অনুরাগ ঠেকাইয়া রাখা যায় না। কাজেই সে অনুরাগমূলক বিবাহকে একটা ধর্ম্মসংস্কারে পরিণত করিয়া আর্য্যগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহাই প্রাজাপত্য বিবাহরূপে পরিচিত হইয়াছিল। গান্ধর্ব বিধান, যাহা কেবল কন্যার কৌমার্য্য হরণের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা যে ব্রাহ্মবিবাহপরায়ণ আর্য্যগণ অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবেন, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। গান্ধর্ব ও পৈশাচ বিবাহও যে আসুর ও রাক্ষস বিবাহের মত পার্শ্ববর্ত্তী সমাজের বিধান হইতে ক্রমে আর্য্য সমাজে সঞ্চারিত হইয়াছিল, এরূপ মনে করা যাইতে পারে।

পণ্ডিতগণের প্রচলিত সংস্কার অনুসারে রাক্ষস, আসুর, গান্ধর্ব ও পৈশাচ বিবাহ ব্রাহ্মাদি ধর্ম্ম বিবাহের পূর্ব্বে সমাজে প্রচলিত ছিল। এবং ধর্ম্ম বিবাহের প্রবর্ত্তনের পরই আর্য্যগণ এইরূপ বিবাহকে অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করেন। এ সিদ্ধান্ত যে ঠিক নয় আসুর ও রাক্ষস বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনায় তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। যদি ইহা ঠিক হইত, তবে আমরা দেখিতে পাইতাম যে, আর্য্যগণের প্রাচীনতম ধর্ম্মশাস্ত্র অপেক্ষা অর্ব্বাচীন শাস্ত্রে এই অশ্রদ্ধার পরিমাণ বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রাচীন সূত্র গ্রন্থগুলিতে এই সমুদয় নিকৃষ্ট বিবাহ অনেক স্থলে স্বীকৃতই হয় নাই এবং স্বীকৃত হইলেও অত্যন্ত নিন্দিত হইয়াছে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তীকালে মনুসংহিতায় যে সমুদয় বিধান দেখিতে পাই, তাহাতে এই সমুদয় নিকৃষ্ট বিবাহ বরং বেশী পরিমাণে গৃহীত হইয়াছে। একথা সত্য যে, ইহারও পরবর্ত্তীকালে এই সমুদয় নিকৃষ্ট বিবাহ সমাজ হইতে একেবারে উন্মূলিত হইয়াছে এবং বর্ত্তমানকালে ব্রাহ্ম বিবাহই সর্ব্ববর্ণের প্রায় একমাত্র বৈধ বিবাহ স্বরূপে প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা পরবর্ত্তীকালে হিন্দুধর্ম্মের আত্মরক্ষার চেষ্টা এবং ধর্ম্মব্যবসায়ী ব্রাহ্মণের প্রাধান্য বিস্তারের ফল। এই Renaissanceএর ফলে অনেক অর্ব্বাচীন আচার পরিত্যক্ত হইয়া যে প্রাচীন পদ্ধতি অনেক স্থানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা ব্যবহার শাস্ত্রের ইতিহাস আলোচনা করিলে নানাস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

সুতরাং গান্ধর্ব ও পৈশাচ বিবাহ বিধিও যে আদৌ আর্য্যেতর কোনও জাতির আচার হইতে আর্য্য সমাজে সঞ্চারিত হইয়াছিল, এইরূপ অনুমান স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। আমার অনুমান হয় যে, রাক্ষসাদি বিবাহ প্রথমতঃ আর্য্য রাজ্যবাসী আর্য্যেতর জাতিগণের ধর্ম্ম স্বরূপে আর্য্যদেশে আবির্ভূত হয় এবং পরে আর্য্যগণের স্বেচ্ছাচারিতার ফলে এইরূপ বিবাহ আর্য্য সমাজে ক্রমশঃ প্রচলিত হয়। সমাজ তখন এই সমুদয় বিবাহের বৈধতা কতকটা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়, এই বিবাহ নিন্দনীয় হইলেও বৈধবিবাহ বলিয়া স্বীকৃত হয়। পরে ক্রমে এ বিবাহগুলির প্রসার বৃদ্ধি হয়। স্বেচ্ছাচারিতাকে যতটুকু স্বীকার না করিলে চলে না, ততটুকুই প্রথমে স্বীকার করা হইয়াছিল, পরে ক্রমে বাধাগুলি ক্রমশঃ সরিয়া গিয়াছিল।

প্রাচীনতম স্মৃতিগ্রন্থগুলির সহিত মনু যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায় অর্ব্বাচীন স্মৃতির তুলনা করিলে এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে যুক্তি পাওয়া যায়। আমি কেবল মাত্র দুইটি গ্রন্থ লইয়া তুলনা করিয়া এই যুক্তি সুস্পষ্ট করিতে চেষ্টা করিব।

-- বৌধায়নের ধর্ম্মসূত্রে একটি প্রাচীন স্মৃতি গ্রন্থ। সূত্রকারদিগের মধ্যে বশিষ্ঠ ও বৌধায়ন নিকৃষ্ট বিবাহ যে পরিমাণ প্রশ্রয় দিয়াছেন, তেমন আর কেহ দেন নাই। কিন্তু বৌধায়নও গান্ধর্ব এবং পৈশাচ বিবাহ কেবল বৈশ্য শূদ্রের পক্ষে বৈধ বলিয়াছেন, আর আসুর ও রাক্ষস কেবল ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে বৈধ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের বেলায় কেবল ব্রাহ্ম প্রাজাপত্য আর্ষ ও দৈব বিবাহ বৈধ বলিয়াছেন এবং তাহার মধ্যেও "পূর্ব্বপূর্ব্বঃ শ্রেয়ান্" বলিয়া ব্রাহ্ম বিবাহকেই শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছেন। (বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্র ১১—১-১৪)।

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের বেলায় বৌধায়ন স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দিয়াছেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের বেলায় কড়া নিয়ম বজায় রাখিয়াছেন। ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে যে বলপূর্ব্বক কন্যাহরণ খুব চলিয়া গিয়াছিল, তাহার প্রমাণ ইতিহাস পুরাণে অনেক আছে। এইরূপ বল প্রদর্শন করিয়া পত্নীসংগ্রহ তাঁহারা বরং গৌরবের বিষয় মনে করিতেন। যোদ্ধারা যখন একটা বিশিষ্ট শ্রেণী হইয়া দাঁড়ায়, তখন তাহাদের কাছে শক্তিটাই একটা প্রকাণ্ড উপাস্য হইয়া উঠে এবং সেই শক্তিমূলক স্বেচ্ছাচার ধর্ম্মস্থানীয় হইয়া উঠে, তাহার দৃষ্টান্ত সকল দেশেই পাওয়া যায়। সমাজের কোনও বিশিষ্ট অবস্থায় এইরূপ স্বেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দেওয়া ছাড়া সমাজের গত্যন্তর থাকে না। এই কারণেই ক্ষত্রিয়ের বেলায় বিশেষ বিধি সমাজে স্বীকৃত হইয়াছিল। আসুর বিবাহ যে বিশেষ ভাবে বৈশ্যের না হইয়া ক্ষত্রিয়ের বিধি বলিয়া কেন পরিগণিত হইয়াছিল, তাহার কারণ নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, বৌধায়ন সূত্র যে দেশ ও কালে রচিত ছিল, সেখানে এই দুই প্রকার বিবাহ ক্ষত্রিয় সমাজে বিশেষভাবে প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল বলিয়াই বৌধায়নের গ্রন্থে এরূপ বিধান দেখিতে পাই।

বৈশ্য শূদ্রের বেলায় যথেচ্ছাচারের প্রশ্রয়টার কারণ অন্য। ক্ষত্রিয়ের স্বেচ্ছাচার সমাজে চলিয়া গিয়াছিল, ক্ষত্রিয় শক্তির সমাজের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল বলিয়া, বৈশ্য শূদ্রের যথেচ্ছাচার চলিয়া গিয়াছিল সমাজ তাহাদিগকে অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত বলিয়া। তাই বৌধায়ন গান্ধর্ব ও পৈশাচ বিবাহ বৈশ্য শূদ্রের বেলায় স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন "অযন্ত্রিতকলত্রা হি বৈশ্যশূদ্রাঃ ভবন্তি।" (১১—১৪) শূদ্র কি করে না করে তাহাতে সমাজের কিছু আসে যায় না, বৈশ্যের উপরেও সমাজের ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ভর করে না, তাই তাহারা যাহা খুসী করুক, এইরূপ অশ্রদ্ধার ভাব হইতে বৈশ্য শূদ্রের চলিত স্বেচ্ছাচার স্বীকার স্বরূপে তাহাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রচলিত গান্ধর্ব ও আসুর বিবাহ প্রচলিত হইয়াছিল।

কিন্তু যাহাদিগকে লইয়া ধর্ম্মসমাজের স্থিতি, যাহাদের উপর ধর্ম্মের নির্ভর, সেই ব্রাহ্মণগণ সম্বন্ধে বৌধায়ন কেবল চারিপ্রকার বিবাহই স্বীকার করিয়াছেন, এবং ব্রাহ্মাদি বিবাহের গুণাগুণ ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন, "বেদস্বীকরণশক্তি রপ্যেবংবিধানামেব পুত্রাণাং ভবতীতি।"

অপরাপর সূত্র গ্রন্থেরও এ বিষয়ে মত অনেকটা এইরূপই, বাহুল্য ভয়ে তাহার উল্লেখ করিলাম না।

কিন্তু বৌধায়নের সময়ই যে ভাঙ্গন আরম্ভ হইয়াছিল, স্বেচ্ছাচার যে ব্রাহ্মণের ভিতরেও সঞ্চারিত হইয়া অন্ততঃ গান্ধর্ব বিবাহ তাহাদের মধ্যে স্থানে স্থানে চলিতে আরম্ভ হইয়াছিল তাহার প্রমাণ বৌধায়নের বচন "গান্ধর্ব্বমপ্যেকে প্রশংসন্তি স্নেহানুগতত্বাৎ।" প্রেমের এভাব শাস্ত্রের বাঁধ ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছিল বলিয়াও কোনও কোনও লোক গান্ধর্ব বিবাহকে সর্ব্বজাতির পক্ষে প্রশস্ত বলিয়া স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

প্রাচীন কালের আচারানুষ্ঠানের বাঁধা বাঁধির সম্বন্ধে সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে, নিয়মের ব্যতিক্রম সমাজের ভিতর

শুঁচ হইয়া ঢুকিয়া ফাল হইয়া বাহির হয়। একখানে একটু রাস্তা পাইলেই স্বভাব নিয়মের প্রাকার ভাঙ্গিয়া ক্রমেই রাস্তাটা চওড়া করিয়া লয়। রোমে তাই হইয়াছিল। Pleb গণের মধ্যে সংস্কার শূন্য Co-emtio ও Ususকে বৈধ বিবাহ বলিয়া স্বীকার করিয়া রোমান Patresগণ নিজেদের সমাজে একটা বিপ্লবের বীজ আনিয়া দিলেন। Plebএর বেলায় যদি ধর্ম্মসংস্কার শূন্য বিবাহ চলে, তবে Patresএর বেলায় চলিবে না কেন? এই যুক্তিতে স্বভাব সমাজের বন্ধনটা আলগা করিতে আরম্ভ করিল এবং Confarreatio সমাজ হইতে প্রায় উঠিয়া গিয়া Co-emtio এবং usus চলিয়া গেল। যাঁহারা সমাজের শীর্ষস্থানীয় তাঁহাদের মধ্যে এইরূপ স্বেচ্ছাচার দীর্ঘকাল প্রশ্রয় পায় নাই। কিন্তু কালক্রমে যদিও Flamen dialis প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পুরোহিত দিগের বেলায় Confarreatio ছাড়া অন্য বিবাহ বৈধ বলিয়া কখনও স্বীকৃত হয় নাই, তথাপি সমাজের উচ্চতম স্তরেও Usus, Confarreatio এমন কি Co-emtio কে পর্য্যন্ত একেবারে স্থানচ্যুত করিয়াছিল। বৌধায়নের সময় যে স্বেচ্ছাচারকে আট ঘাট বাঁধিয়া ধর্ম্ম ব্যবস্থায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হইয়াছিল, তাহা যে ক্রমে ক্রমে নিজের প্রসার বর্দ্ধিত করিয়া ব্রাহ্মণে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হইয়াছিল তাহা মনু সংহিতার বিধান হইতে দেখিতে পাই। কোন্ কোন্ জাতির মধ্যে কোন্ কোন্ বিবাহ বৈধ, তৎসম্বন্ধে মনুর বচনে তারতম্য আছে। তিনি একবার বলিয়াছেন—

ষড়ানুপূর্ব্বা বিপ্রস্য, ক্ষত্রস্য চতুরো হবরান্।
বিট্‌শূদ্রোয়োস্তু তানেব বিদ্যাদ্ধর্ম্মান্ রাক্ষসম্॥ III ২৩

ইহাতে দাঁড়ায় এই যে, ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য,আসুর ও গান্ধর্ব বিধান বৈধ, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে গান্ধর্ব, আসুর, রাক্ষস ও পৈশাচ। বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে গান্ধর্ব, আসুর ও পৈশাচ। কিন্তু ঠিক ইহার পরবর্ত্তী শ্লোকেই তিনি বলিয়াছেন,

চতুরো ব্রাহ্মণস্যাদ্যাৎ প্রশস্তান্ কবয়ো বিদুঃ।
রাক্ষসং ক্ষত্রিয়স্যৈকমাসুরং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ॥

ইহাতে ব্রাহ্মণের পক্ষে, ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে রাক্ষস এবং বৈশ্যশূদ্রের পক্ষে আসুর প্রশস্ত বলা হইয়াছে। এই দুই বচনের পরস্পর সামঞ্জস্য করা চলে,—প্রথম শ্লোকে যে যে বিবাহের কথা বলা হইয়াছে তাহা বৈধ হইলেও অপ্রশস্ত, কিন্তু শেষ শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই প্রশস্ত। কিন্তু পরবর্ত্তী শ্লোকে তিনি বলিতেছেন,

পঞ্চানাং তু ত্রয়ো ধর্ম্ম্যা দ্বাবধর্ম্মৌ স্মৃতাবিহ।
পৈশাচশ্চাসুর শ্চৈব ন কর্ত্তব্যো কদাচন॥

পূর্ব্ব শ্লোকে যে আসুর বিবাহ বৈশ্যশূদ্রের পক্ষে প্রশস্ত বলা হইয়াছে, এখানে তাহা বিশেষ রূপে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, পৈশাচ তো হইয়াছেই।

শ্লোকান্তরে মনু বলিয়াছেন,

অদ্ভিরেব দ্বিজাগ্র্যাণাং কন্যাদানং প্রশস্যতে
ইতরেষাং তু বর্ণানাং ইতরেতরকাম্যয়া। III, ৩৫

ইহাতে দাঁড়ায় এই যে, ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রাহ্ম বিবাহ প্রশস্ত অপরের পক্ষে যথেচ্ছ বিধি। "ইতরেতরকাম্যয়া" কথাটার মেধাতিথি দুই অর্থ করিয়াছেন, একটি এই যে, ব্রাহ্মণতের জাতির মধ্যে পরস্পরের অনুরাগ দ্বারা বিবাহ হয়;—এ অর্থ করিলে তাহাদের মধ্যে গান্ধর্ব বিবাহ প্রশস্ত বলিয়া স্বীকার করা হয়। অপর অর্থ এই যে, বিবাহ পদ্ধতি সম্বন্ধে যাহার যেরূপ অভিরুচি সেইরূপ পদ্ধতি অবলম্বিত হইবে। এই অর্থই সমীচীনতর মনে হয়।

এই সকল বচন হইতে মনে হয় যে, ব্রাহ্মাদি বিবাহ যে কেবল ব্রাহ্মণের ভিতর প্রচলিত ছিল তাহা নহে, কেবল ব্রাহ্মণই ঐরূপ বিবাহে অধিকারী ছিল, অপর জাতির ঐরূপ বিবাহে কোনও অধিকার ছিল না। তাহাদের পক্ষে নিকৃষ্ট বিবাহগুলিই একমাত্র বিবাহ পদ্ধতি। বৌধায়নের বচন হইতেও অনেকটা সেইরূপ অর্থই

পাওয়া যায়, কিন্তু গৌতম বা আপস্তম্বে এরূপ নির্দ্দেশ নাই, তাঁহারা স্পষ্ট ভাবেই ব্রাহ্মাদি বিবাহ অন্ততঃ দ্বিজাতিগণের সাধারণ ধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কিন্তু মনু আবার এইরূপে ক্ষত্রিয়াদির পক্ষে রাক্ষসাদি বিবাহই একমাত্র প্রশস্ত বিবাহ বলিয়া বিধান করিয়া নিন্দাশ্রুতি দ্বারা সকল জাতির পক্ষেই ঐরূপ বিবাহ প্রতিষিদ্ধ করিয়াছেন। ব্রাহ্মাদি বিবাহের গুণ বর্ণনা করিয়া তিনি বলিয়াছেন,

> ইতরেষবশিষ্টেষু নৃশংসানৃতবাদিনঃ।
> জায়ন্তে দুর্ব্বিবাহেষু ব্রহ্মধর্ম্মদ্বিষঃ সুতাঃ॥
> অনিন্দিতৈঃ স্ত্রীবিবাহৈরনিন্দ্যা ভবতি প্রজা।
> নিন্দিতৈ র্নিন্দিতা নৃণাং তস্মান্নিন্দ্যান্বিবর্জয়েৎ॥

মেধাতিথি প্রভৃতি টীকাকার মনুর এই নানা বাক্য পরস্পরের সহিত এবং অপর স্মৃতিবচনের সহিত সমন্বয় করিবার চেষ্টায় হিমসিম খাইয়া গিয়াছেন। আমার মত অজ্ঞ ব্যক্তি যে এগুলি সমন্বয় করিতে সমর্থ হইবে না, তাহা আর বিচিত্র কি?

কিন্তু সকল বাক্যকে একসময়ে সমানরূপ প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া এ সমুদয় বাক্যসমন্বয় অসম্ভব হইলেও ঐতিহাসিক হিসাবে এগুলির বেশ সুসঙ্গত ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। মনুর গ্রন্থ বর্ত্তমান আকারে মনুর নামে প্রচলিত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বাক্যাবলির সঙ্কলন মাত্র, একথা আমি স্থানান্তরে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। Jolly তাঁহার Tagore Law Lectures এ ভিন্নমত প্রচার করিলেও তাঁহার পরবর্ত্তী গ্রন্থ Recht and Sitteতে কতকটা এই মতের অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন, যদিও তিনি ইহাতেও Max Muller প্রবর্ত্তিত মতের মোহ একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। একথা যদি সত্য হয়, তবে মনুর এই বিবিধ বচনকে বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন কালে মনুর নামে প্রচলিত গাথা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। সেই হিসাবে দেখিলে ইহাদের পরস্পর ঐতিহাসিক ভাবে সমন্বয় সহজ হইয়া পড়ে।

গান্ধর্বাদি বিবাহ যে সর্ব্বজাতির পক্ষে নিন্দিত ও অপ্রশস্ত, এই মর্ম্মের বচনগুলি অতি প্রাচীন কালের। এই গুলি যে ব্রাহ্মণেতর জাতির পক্ষে প্রশস্ত ও বৈধ তাহা পরবর্ত্তীকালের বিধান। এই বিধান সম্বন্ধেও দেশ কাল ভেদে বৈচিত্র্য দেখিতে পাই; ব্রাহ্মণের পক্ষেও যে গান্ধর্ব ও আসুর বিবাহ বৈধ এ বিধান সর্ব্বাপেক্ষা অর্ব্বাচীন স্তরের। কোনও দেশে ও কোনও কালে বা রাক্ষস বিবাহই ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে ও আসুর বৈশ্য শূদ্রের পক্ষে একমাত্র ধর্ম্ম্য বিধান বিবেচিত হইয়াছে, কোথাও বা রাক্ষস ভিন্ন চতুর্ব্বিধ বিবাহই ব্রাহ্মণেতর জাতির পক্ষে বৈধ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে; কোথাও ব্রাহ্মণেতর জাতির পক্ষে কোনও বাঁধাবাঁধি নিয়মই নাই।

এই নানা স্তরের মধ্যে আমি যাহাকে সর্ব্বশেষ স্তর মনে করি, তাহাতে মনুর ব্যবস্থায় দাঁড়াইয়াছে এই যে, ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য গান্ধর্ব ও আসুর বিবাহ বৈধ, যদিও শেষ দুইটি নিন্দনীয় এবং ব্রাহ্মই বিশেষরূপে প্রশস্ত। ব্রাহ্মণেতর জাতির এইরূপ সসংস্কার বিবাহে কোনও অধিকার নাই, এবং তাহারা সকলেই নিকৃষ্ট চতুর্ব্বিধ উপায়ে বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু, বোধ হয়, রাক্ষস বিবাহ ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য জাতির পক্ষে চলিত ছিল না। মনুর এই যে বিধান, তাহা তাৎকালিক সামাজিক অবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল,—ইহা সমাজে যে নিয়ম চলিয়া গিয়াছিল তাহারই স্বীকার মাত্র। যে ধর্ম্ম বিবাহ পূর্ব্বকালে একমাত্র বৈধ বিবাহ বলিয়া পরিগণিত ছিল, তাহা এই কালে কেবল ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে আবদ্ধ ছিল, তাও সকল ব্রাহ্মণ এমতে বিবাহ করিতেন না। ক্ষত্রিয়াদির বেলায় লৌকিক বিবাহ বা বিবিধ Civil Marriage ই এক মাত্র পদ্ধতি হইয়া উঠিয়াছিল।

কোনও এক সময়ে যে গান্ধর্ব্ব রাক্ষস প্রভৃতি বিবাহেও সংস্কারের প্রয়োজন স্বীকৃত হইয়াছিল, সে বিষয় সন্দেহ নাই। বশিষ্ঠের আমলেই এ বিষয় মতদ্বৈধ ছিল দেখিয়াছি, কিন্তু মনুর সময়, অর্থাৎ তাঁহার সংহিতা সঙ্কলনের সময়, কোন্ মত প্রচলিত হইয়াছিল তাহা বলা অসম্ভব। গান্ধর্ব্বাদি বিবাহে যে কোনও রূপ সংস্কারের প্রয়োজন আছে, এরূপ কোনও ইঙ্গিত মনুসংহিতায় কোথাও পাই না। পরবর্ত্তী কালেও যে এবিষয় মতদ্বৈধ ছিল, মেধাতিথি প্রভৃতি টীকা ও নিবন্ধকার দিগের রচনায় তাহার পরিচয় আছে। পরবর্ত্তী যুগে যে এবিষয়ে নানা দেশে নানা আচার জন্মিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু শেষে যাহাই হউক, গান্ধর্ব্বাদি বিবাহ যে সংস্কারবিহীন অনুষ্ঠান স্বরূপ আর্য্য সমাজে প্রথম গৃহীত হইয়াছিল এ অনুমান সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহাদের সমাজ হইতে এই সমুদয় পদ্ধতি ধর্ম্মসম্পর্কবিহীন ভাবে উদ্ভূত হইয়াছিল এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। John D Mayne তদ্রচিত Hindu Law গ্রন্থে আর্য্য বিবাহের ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, রাক্ষসাদি বিবাহ হইতে ক্রমে সংস্কার দ্বারা গান্ধর্ব্ব বিবাহ উদ্ভূত হয় এবং সেই গান্ধর্ব্ব বিবাহ প্রথমে একটা সম্পূর্ণ ধর্ম্মনিরপেক্ষ ব্যাপার ছিল। পরে পুরোহিত জাতির ক্ষমতা বৃদ্ধির সহিত ইহার সহিত ধর্ম্মসংস্কার জড়িত হইয়া গান্ধর্ব্ব ও আসুর বিবাহ হইতে বিবিধ ধর্ম্ম বিবাহের উৎপত্তি হইয়াছে। এই ইতিহাস যে সমীচীন নহে, এরূপ মনে করিবার কারণ পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। এখানে এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে এই কথাটা বলিতে চাই যে, এই যে মতবাদ যাহাতে, ধর্ম্মসম্পর্কযুক্ত বিবাহাদি অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে ধর্ম্মনিরপেক্ষ বিবাহ, গৌণ পুত্র গ্রহণ প্রভৃতি প্রচলিত ছিল বলে, ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। যে কোনও প্রাচীন সমাজের ব্যবস্থার আলোচনা করিতে গেলে দেখিতে পাই যে, আদৌ সাংসারিক প্রত্যেক ব্যাপার ও অনুষ্ঠানই ধর্ম্মের সহিত জড়িত থাকে, ধর্ম্ম সম্পর্ক ক্রমে খসিয়া পড়িয়া অনুষ্ঠানটি লৌকিক হইয়া পড়ে। বর্ব্বর জাতিদিগের মধ্যেও দেখিতে পাই যে, এই সমুদয় অনুষ্ঠানের ভিতর ধর্ম্ম বা Magic খুব বেশী পরিমাণেই জড়িত আছে। অদৃষ্টফল মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ছাড়া বর্ব্বর জাতিদিগের মধ্যে কোন ও সামাজিক বা পারিবারিক ক্রিয়াই নিষ্পন্ন হয় না। সুতরাং রাক্ষসাদি বিবাহও যে যে সমাজ হইতে ক্রমে আর্য্য সমাজে সঞ্চারিত হইয়াছিল, সেই সেই সমাজে যে তাহা ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত সম্পৃক্ত ছিল, এ অনুমান সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

প্রবন্ধের প্রারম্ভে যে তিনটি বা চারিটি মূলের উপর বিবাহ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত বলিয়াছি, তাহার মধ্যে পতিপত্নীর আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ যে আদি হইতেই আর্য্য বিবাহে প্রবল ছিল এবং তাহা ইহার ভিতর অনুপ্রবিষ্ট ছিল বলিয়াই যে বিবাহ ধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়াছিল, একথা বোধ হয় এখন স্পষ্টভাবে উপলব্ধ হইবে। তাহা ছাড়া শরীর বা মানসিক আকর্ষণ যে আগা গোড়াই বিবাহের ইতিহাসে প্রবল ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছে এবং এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির ফলেই যে লৌকিক নিন্দিত বিবাহ ক্রমশঃ সমাজে প্রসার লাভ করিয়াছিল, তাহাও স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। অবশ্য, সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা, বিবাহযোগ্য বরকন্যার সংখ্যার অনুপাত, প্রতিবেশী জাতিগণের দৃষ্টান্ত প্রভৃতি আনুসঙ্গিক কারণে এই পরিণতির আকৃতি নিরূপিত হইয়াছে, কিন্তু এই পরিণতির মূল এই প্রবৃত্তি। কিন্তু যে বিশেষরূপে এই প্রবৃত্তি ব্যবহারের ইতিহাসে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নারীর উপর পুরুষের আধিপত্য লাভের চেষ্টা। বিবাহ পদার্থের মধ্যে এই বস্তু ব্যবহারের আদি হইতে সুস্পষ্ট ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমাদের প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে বিবাহের যে আদর্শ কল্পিত দেখিতে পাই, তাহাতে দুইটি idea র ধারাই স্পষ্টভাবে পাশাপাশি প্রবাহিত দেখিতে পাই—একটি পুরুষের নারীর উপর প্রভুত্ব, অপরটি

পুরুষ ও নারীর আধ্যাত্মিক একত্ব। এই দ্বিতীয় ধারার প্রভাবে কালক্রমে নারীর স্থান ক্রমশঃ উন্নীত হইয়াছে, তাহার অধিকার প্রসারিত হইয়াছে, তাহার আদিম বন্ধনাবস্থার মোচন হইয়াছে, কিন্তু ইহা যে আদৌ একেবারে ছিল না এরূপ নহে। পক্ষান্তরে গৃহ্যোক্ত বিবাহ পদ্ধতিতে এবং তাহা অপেক্ষাও প্রাচীন বৈদিক মন্ত্রে এই নারীর আধ্যাত্মিক গৌরব বিবাহ ব্যাপারে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। কিন্তু ধর্ম্ম জীবনে যাহাই হউক ব্যবহারিক জীবনে যে নারী অধ্যধীন, স্বামীর ইচ্ছার দাসী এবং তাহার দ্বারা যথেচ্ছ বিনিযুজ্য ছিল, লৌকিক হিসাবে যে বিবাহ সম্বন্ধ কেবল নারীর উপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা হিসাবে কল্পিত হইয়াছিল তাহা সুস্পষ্ট। প্রাচীন ভারতের ব্যবহারের ইতিহাসে এই দুইটি ধারা যে কিরূপে কার্য্যকরী হইয়াছে তাহার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব।

বিবাহে আধিপত্যের Idea আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্ততঃ ব্যবহার অংশে সুস্পষ্ট। বশিষ্ঠ ধৃত শ্রুতিবচন "অনৃতং বা এষা করোতি যা পত্যুঃ ক্রীতা সতী অথান্যৈশ্চরতি"র ভিতর যে যুক্তি আছে তাহা এই, যে ক্রয়ের দ্বারা নারীর উপর স্বামীর আধিপত্য জন্মে, এবং সেই জন্যই নারীর পুরুষান্তরচর্য্যা দূষণীয়, ইহা স্বামীর অধিকারের বিরোধী। এই প্রাচীন বাক্যের ভিতর যে যুক্তি অনুস্যূত আছে তাহা ব্যবহার শাস্ত্রে আগাগোড়া সুস্পষ্ট। বেদের একটি বাক্য শবর স্বামী উদ্ধার করিয়াছেন। বাক্যটি এই, "বিশ্বজিতি সর্ব্বস্বং দদ্যাৎ, ভার্য্যাং পুত্রং চ ন দদ্যাৎ।" ভার্য্যা ও পুত্রের বেলায় এই বিশেষ বিধি থাকিবার কারণ স্পষ্টই এই যে, "স্বং" বলিতে ভার্য্যা ও পুত্র তাহার ভিতর আসিয়া পড়ে। পরবর্ত্তি কালে এ কথা খাটিত না এবং নিবন্ধকারগণ এই যুক্তি কাজেই অস্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু সহজবুদ্ধিতে এইবাক্য আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, পত্নীকে অধ্যধীনা এবং স্বামীর প্রভুত্ব হিসাবে দাস গবাদির তুল্য বিনিয়োগার্হা বলিয়াই এই বাক্যে কল্পিত হইয়াছে।

পত্নীর উপর যে স্বামীর এইরূপ যথেচ্ছ বিনিয়োগের অধিকার বিবাহসম্বন্ধের অঙ্গস্বরূপ এককালে বর্ত্তিত হইত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের ঋণ পরিশোধের জন্য ভার্য্যা বিক্রয় করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় পত্নীকে পণ রাখিয়া হারিয়াছিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি দ্রৌপদী আপনার দাসীত্ব অস্বীকার করিবার চেষ্টায় নানা যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, যুধিষ্ঠির তাঁহাকে পণ রাখিবার পূর্ব্বে নিজে দাস হইয়াছিলেন কি না,—কেন না, তিনি নিজে যদি দাস হইয়া থাকেন, তবে আর তিনি দ্রৌপদীর উপর অধিকার পরিচালনা করিতে পারিতেন না, কিন্তু একথা তাঁহার খেয়ালই হয় নাই যে স্বামীর স্ত্রীর শরীরের উপর যথেষ্ঠ বিনিয়োগের অধিকার অস্বীকার করা যাইতে পারে—এই অধিকার সে সময়ে এতই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।

স্ত্রীর উপর যে এইরূপ স্বাম্য পতির ছিল তাহার আর একটি উদাহরণ পাই নিয়োগ সম্বন্ধীয় বিধিতে। মনুসংহিতায় এবং অন্যান্য অর্ব্বাচীন গ্রন্থে নিয়োগের নিন্দার দ্বারা প্রতিষেধ দেখিতে পাই, এবং নিয়োগ সম্বন্ধে বিধি যাহা আছে তাহাও খুব সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর ইহা স্বীকার করিয়াছে। অপুত্রা বিধবা স্বামীর সন্তানার্থে শ্বশুর বা জ্ঞাতি কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া দেবর বা তদভাবে অন্য পুরুষ দ্বারা পুত্রোৎপাদন করাইতে পারে। এই ব্যবস্থাও নানা নিষেধের দ্বারা বেষ্টিত। কিন্তু অতি প্রাচীন স্মৃতিতে নিয়োগের যে আকৃতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাহা ইহা অপেক্ষা অনেকটা ভিন্ন। গৌতমের ধর্ম্মসূত্রে নিয়োগের এই ব্যবস্থা আছে, "বাকচক্ষুঃ কর্ম্মসংযতা পত্যুরপত্য লিপ্সু র্দেবরাৎ গুরুপ্রসূতা নর্ত্তুমতীয়াৎ, পিণ্ডগোত্রর্ষিসম্বন্ধিভ্যো যোনিমাত্রাদ্বা"। কিন্তু ইহা যে মন্বাদি উক্ত নিয়োগ

হইতে ভিন্ন তাহার প্রমাণ এই যে: গৌতমের মতে "জনয়িতুরপত্যং"। এই প্রকার নিয়োগ Old Testament এর Ruth এর গল্পে যে বিধি দেখিতে পাই তাহার ন্যায়। ইহার দ্বারা পুত্রহীনা বিধবা পুত্রলাভ করিতে পারিত কিন্তু সে পুত্রের পিতা হইত জনয়িতা।

ইহা বিধবা সম্বন্ধীয় বিধান, কিন্তু বিধবা ছাড়া সধবারও নিয়োগ হইতে পারিত, সে স্থলে নিয়ম এই "সময়াদন্যত্র জীবতশ্চ ক্ষেত্রে পরস্মাৎ তস্য, দ্বয়োর্বা; রক্ষণাত্তর্ত্তুরেব"। পুত্রকন্যাবতী হইলেও যে স্ত্রীর এইরূপ নিয়োগ হইতে পারিত তাহার প্রমাণ বশিষ্ঠসূত্রে আছে। আপস্তম্ব বেদ হইতে একটী প্রাচীন গাথা উদ্ধার করিয়া নিয়োগের অবিধেয়তা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য; এই গাথায় এক ব্যক্তি বলিতেছে "আমি এতদিন নিজেকে পিতা মনে করিয়াছি; কিন্তু এখন আর আমি কাহাকেও আমার স্ত্রীর নিকট আসিতে দিব না, কারণ উক্ত হইয়াছে যে যমের রাজ্যে জনয়িতা অপত্য বলিয়া গৃহীত হয়," ইত্যাদি। এই সমুদয় প্রমাণ হইতে দেখা যায় যে, স্বামী অপর পুরুষকে স্ত্রীর সহিত সহবাস করিতে অনুমতি দিতে পারিতেন এবং এই অনুমতির সময় পুত্রের পিতৃত্ব সম্বন্ধে সময় বা চুক্তিও হইত। এই ব্যবস্থা স্ত্রীর উপর স্বামীর প্রভুত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। দাসী পশ্বাদির ন্যায় স্ত্রীরও অপত্যোৎপাদন একটা চুক্তির বিষয় হইতে পারিত।* কিন্তু স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার যে এই আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহার কারণ পুত্রলাভের আকাঙ্ক্ষা।

স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকারের এইরূপ দৃষ্টান্ত অন্য কোনও আর্য্য জাতির ভিতর দেখিতে পাওয়া যায় না এবং ভারতেও অতি আদি কাল হইতে এই ব্যবস্থার অতি সঙ্কীর্ণ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। আরও দেখিতে পাই যে অতি অল্পকাল মধ্যেই এই নিয়োগ বিধি নানা নিষেধের সীমায় আবদ্ধ করিয়া ফেলা হইয়াছে এবং ক্রমে একেবারে বিদূরিত হইয়াছে। আর্য্য জাতি ঋগ্বেদের আমল হইতে বিবাহের যে ধর্ম্মের আদর্শ কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহার সহিত এ ব্যবস্থার স্পষ্ট বিরোধ ছিল বলিয়াই ক্রমে এ ব্যবস্থা উঠিয়া গিয়াছিল। সুতরাং অনুমান হয় যে, আর্য্যগণ ভারতের উপনিবেশ স্থাপনের পর সমাজের কোনও বিশেষ অবস্থার পীড়নে এই ব্যবস্থা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অপত্যের প্রয়োজন এবং নারীর সংখ্যাল্পতা বশতঃ এইরূপ বিধান সমাজে চলিয়া গিয়া থাকিবে। অন্যত্রও নারীর সংখ্যাল্পতা বশতঃ সমাজে যৌনসম্বন্ধের বিধি শিথিল হইতে দেখা গিয়াছে। Professer Vinogradoff আধুনিক ইউরোপের কোনও কোনও স্থানের বিশেষ নিয়ম দেখাইয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, এইরূপ সামাজিক ব্যবস্থার পীড়নে নারীর সতীত্বের আদর্শ খর্ব্ব হইয়া বহুচর্য্যা স্বীকৃত হইতে পারে।

ভারতে নারীর পক্ষে একাধিক পুরুষচর্য্যা এইরূপ কোনও কারণে আর্য্যসমাজে গৃহীত হইয়াছিল, একথা অনেকটা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে। কিন্তু যে বিশিষ্ট আকারে ইহা ভারতীয় আর্য্যসমাজে দেখা দিয়াছিল, তাহা অন্য কোনও জাতির অনুষ্ঠানের অনুকরণের ফল বলিয়া মনে হয়। বিধবার বেলাই নিয়োগ প্রথম স্বীকৃত হইয়াছিল, এসম্বন্ধে সন্দেহ নাই, পরে ক্লীবাদির পত্নীর বেলায় এই বিধি প্রযুক্ত হইয়া ক্রমে আরও প্রসারিত হইয়া থাকিবে। বিধবা সম্বন্ধে যে বিধি তাহার আদিম মূর্ত্তি আমরা গৌতমের ধর্ম্ম সূত্রে দেখিতে পাই। Book of Ruth এর কাহিনীর

* য়িহুদী গণের প্রাচীন ইতিহাসে ঠিক ইহার উল্টা ব্যবস্থাও ছিল। বন্ধ্যানারী বন্ধ্যাত্বের পাপহইতে মুক্ত হইতেন; তাঁহার দাসীর গর্ভে স্বামীর দ্বারা সন্তান জন্মাইয়া—সে সন্তান স্ত্রীর সন্তান হইত।

বিধির সহিত ইহার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য। একথা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, আর্য্যগণের প্রতিবেশী সেমেটিক জাতিগণের মধ্যেও এইরূপ বিধি প্রচলিত ছিল এবং তাহাদেরই আদর্শেই আর্য্যগণের পুত্রলাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষার ফলে নিয়োগ ব্যবস্থা আর্য্যসমাজে গৃহীত হইয়াছিল।

কিন্তু এইরূপ নিয়োগ ব্যবস্থা আর্য্য সমাজে যে স্বীকৃত হওয়া সম্ভব হইয়াছিল, তাহার কারণ এই যে, স্ত্রীতে স্বামীর Propietory right অর্থাৎ স্বাম্য লৌকিক ব্যবহারে স্বীকৃত ছিল। এই জন্যই স্বামীর আজ্ঞায় বা তদভাবে শ্বশুর বা অপর জ্ঞাতির আজ্ঞায় স্ত্রীকে যাহা খুসী তাই করিতে হইত। স্ত্রী যে এইরূপ নিতান্ত স্বত্বশূন্য দাসী, গবাদির তুল্য বস্তু বিশেষ স্বরূপে কল্পিত ছিল, তাহার প্রমাণ ধর্ম্মশাস্ত্রে থাকিলেও তাহার সহধর্ম্মিণীত্বের আদর্শের সংমিশ্রণে এই ভাবটা পরবর্ত্তী শাস্ত্রে অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। স্ত্রীর প্রতি স্বামী ও স্বামীর জ্ঞাতিবর্গের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এই ধর্ম্মসম্বন্ধের দিক হইতে মন্বাদি শাস্ত্রে যে ব্যবস্থা আছে, তাহা বেশ উচ্চ। মনু বলেন

> পিতৃভি র্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভি র্দেবরৈস্তথা।
> পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ॥
> যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্রদেবতাঃ।
> যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥

ইহার পরবর্ত্তী কালে কাত্যায়ন বলিয়াছেন,

> আম্নায়ে স্মৃতিতন্ত্রে চ লোকাচারে চ সূরিভিঃ।
> শরীরার্দ্ধং স্মৃতা জায়া পুণ্যাপুণ্যফলে সমা॥

কিন্তু অতি প্রাচীন কালে যে স্ত্রীর এই পূজা তাহার বস্তুত্বের দ্বারা অভিভূত হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। "তস্মাৎ স্ত্রিয়ঃ নিরীন্দ্রিয়া অদায়াদাঃ" এই শ্রুতিবচন নানা নিবন্ধে ধৃত রহিয়াছে। মনুর শাস্ত্রেও একটি বচনে স্ত্রীকে পুত্র ও দাসের সহিত সমান করিয়া বলা হইয়াছে যে,

> ভার্য্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ ত্রয় এবাধনাঃ স্মৃতাঃ।
> যত্তে সমধিগচ্ছন্তি যস্য তে তস্য তদ্ধনম্॥

ভার্য্যার পদবী যে ক্রমশঃ উন্নত হইয়াছিল তাহা তাহার সহধর্ম্মিত্বের ফলে। এই সহধর্ম্মিত্বের আদর্শও অতি প্রাচীন কালেই কল্পিত হইয়াছিল। বৈদিক বিবাহমন্ত্রে ইহা সুস্পষ্ট। ক্রমে পুরুষের ঔদ্ধত্য সভ্যতার বিকাশের সহিত সমতা প্রাপ্ত হওয়ায় এবং স্বাভাবিক স্নেহ, পুত্রের মাতৃভক্তি প্রভৃতি বিবিধ কারণে এই ধর্ম্মের আদর্শ লৌকিক আদর্শকে ক্রমশঃ বশীভূত করিয়াছিল। নারী যে দাসী গবাদির ন্যায় বিনিয়োগার্হা নয়, তাহার যে একটা স্বাধীন সত্তা আছে এবং সে যে একটি Person ইহা ক্রমে স্বীকৃত হইল। তাহার ধনাধিকার ও দায়াধিকার তাহার সহধর্ম্মিত্বের ফলে প্রতিষ্ঠিত হইল, এবং যদিও স্মৃতি শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই ব্যবহারে নারীর পুরুষের অধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে, তথাপি ধর্ম্মের ভিতর স্ত্রীর অনেকটা স্বাধীনতা ক্রমে স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। ক্রমে ব্যবহারেও স্বামীর প্রভুত্বের মাত্রা ক্রমশঃ কমিয়া আসিয়াছে। যে যে উপায়ে স্ত্রীর ব্যক্তিত্ব ক্রমে ব্যবহার শাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা সেই উন্নতির প্রতিস্তর দেখাইয়া প্রকাশ করিতে গেলে একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বৃহৎ ইতিহাসের অবতারণা করিতে হয়। এ প্রবন্ধে তাহা করা অসম্ভব।

ভারতের ধর্ম্মশাস্ত্রে নিয়োগ ব্যবস্থার উপর কোনও কোনও পণ্ডিত সাব্যস্ত করিয়াছেন যে ভারতীয় আর্য্যসমাজে এবং অন্যান্য সকল সমাজেই বর্ত্তমান প্রণালীর বিবাহ প্রণালী প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে নারীর বহুচর্য্যা (Polyandry) প্রচলিত ছিল, নিয়োগ ব্যবস্থা তাহার শেষ নিদর্শন মাত্র। ক্রমে পুরুষ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া নারীর একচর্য্যা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ মতবাদ অনেকে খণ্ডন করিয়াছেন, সুতরাং আমার পক্ষে ইহার খণ্ডনের চেষ্টার প্রয়োজন নাই। ভারতের প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে যে নিয়োগ ব্যবস্থা দেখা যায়, তাহাতে নারীর বহুচর্য্যার নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহা আমি পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। কিন্তু এই

বহুচর্য্যা আর্য্যসমাজের আদি বিধি ছিল না, সমাজের আভ্য-ন্তরীণ অবস্থার পীড়নে এবং সম্ভবতঃ কোনও প্রতিবেশী সমাজের আদর্শে এই অনুষ্ঠান নিয়োগধর্ম্ম স্বরূপে অপেক্ষাকৃত অল্প কালের জন্য ভারতীয় আর্য্যসমাজে স্থান পাইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু নারীর একপতি-পরায়ণতা আর্য্য সমাজের আদি কালেই আদর্শ রূপে কল্পিত হইয়াছিল। স্বভাবতঃ নারী বহুসঙ্গমলিপ্সু এ ধারণা অবশ্যই খুব আদিকালে ছিল; কিন্তু বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া তাহাদিগের এই কল্পিত বা সত্য স্বাভাবিক বহুপরায়ণতাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য আট ঘাট বাঁধা হইয়াছিল নিয়োগ ধর্ম্মের উৎপত্তির বহু পূর্ব্বে। গৃহপতির স্বামিত্ব অন্ততঃ আর্য্য সমাজে এবং সম্ভবতঃ সমস্ত মনুষ্য সমাজের আদি বিধান, নারীর পুরুষ সাহচর্য্যে স্বচ্ছন্দতা, এ আদর্শের সমাজে থাকা সম্ভব নয়।

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত।

সভাপতির অভিভাষণ।*

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তন্দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তং
বিদাম দেবং ভুবনেশ মীড্যং॥
যোঽন্তঃ প্রবিশ্য মম বাচ মিমাং প্রসুপ্তাং
সঞ্জীবয়ত্যখিলশক্তিধরঃ স্বধাম্না,
অন্যাংশ্চ হস্ত-চরণ-শ্রবণ-ত্বগাদীন্
প্রাণান্নমো ভগবতে পুরুষায় তুভ্যং।
অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যো র্মামৃতং গময়॥

টাঙ্গাইল সাহিত্য সংসদের প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে চিরদাসের বিনীত নিবেদন।

যে মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতার কৃপায় এই সাহিত্য সংসদ এক বর্ষ নিরাপদে অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল, আমরা সর্ব্বাগ্রে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে ভক্তি সহকারে প্রণাম করি এবং এই সংসদের জন্য তাঁহার শুভাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া অদ্যকার এই মধুময় কার্য্যে প্রবৃত্ত হই।

অনন্ত লীলাময় ঈশ্বরের বিচিত্র করুণায় বর্ত্তমান সময়ে ভারতে একটা অভূত-পূর্ব্ব নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছে। বসন্তের সমাগমে প্রকৃতি যেমন নববেশ ধারণ করে, বৃক্ষ লতা নব পত্র পুষ্পে সুসজ্জিত হয়, বিহঙ্গের কাকলী ধ্বনিতে, ভ্রমরের গুঞ্জনে, চারিদিক মুখরিত হয়, সর্ব্বত্রই আনন্দের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়, তেমনি নব যুগের সমাগমে সমগ্র ভারত বিশেষতঃ বঙ্গভূমি জাতীয় জীবনের নব পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া নবভাবে জগতের নিকট সমু-পস্থিত হইয়াছে। প্রাভাতিক সূর্য্যকিরণ যেমন বীচিমালা পরিপূর্ণ সমুদ্র নীরে প্রতিবিম্বিত হইয়া অতুল শোভার সৃষ্টি করে, তেমনি নব যুগের নবীন প্রভা বঙ্গবাসীর জাতীয় জীবনে কি সামাজিক, রাজনৈতিক সাহিত্যিক সকল বিভাগেই প্রতিফলিত হইয়া আশ্চর্য্য শক্তি সঞ্চার করিতেছে। কি শুভক্ষণেই এদেশে ইংরেজ রাজত্ব প্রচ-লিত এবং ইংরেজী শিক্ষা প্রচলিত হইয়াছিল, কি শুভ-ক্ষণেই ঈশ্বর প্রেরিত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই হইতে বঙ্গবাসীর জীবন পটে, বিধ নিয়ন্তা নূতন আলেখ্য অঙ্কন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সেই হইতে "মরা গাঙ্গে" জোয়ার আসি-য়াছে, শুকতরু মঞ্জরিত হইতেছে এবং আশার নবীন হিল্লোল সকলের প্রাণে প্রাণে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাকেই বলে ভগবানের নবলীলা, তাঁহার নূতন বিধান।

খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মহাত্মা রাজা রাম মোহন রায়ের সময় হইতে বঙ্গভাষার যে নব বিকাশ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা ক্রমাগত শতদল পদ্মের ন্যায় প্রস্ফু-টিত হইয়া এক্ষণে সমুদয় বঙ্গদেশকে তাঁহার সৌরভে মুগ্ধ ও আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে। যে বঙ্গভাষা পূর্ব্বে

* টাঙ্গাইল সাহিত্যসংসদের প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসবে।

প্রাকৃত ভাষা বলিয়া অভিহিত হইত, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ যাহাতে গ্রন্থ লিখিতেও লজ্জা বোধ করিতেন, ইংরেজী শিক্ষিত নব্য বঙ্গ সম্প্রদায় যে ভাষাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, আজ সেই ভাষা লোকপূজ্যা, বিবিধ সাহিত্য সম্পদে পরিপূর্ণা, নানা অলঙ্কারে বিভূষিতা। যে ভাষা পূর্ব্বে কয়েক খানি কাব্য গ্রন্থেরই মাত্র অধিকারিণী ছিলেন, আজ তাহা সুবিশাল কাব্য কাননের রাজ্ঞী। বঙ্গের আদরের সন্তান স্যার রবীন্দ্রনাথ সমস্ত কাব্য জগতের সম্মান ও ভক্তির পাত্র বঙ্গের ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত, মধুসূদন হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, গোবিন্দদাস, দীনেশচন্দ্র, শ্রীমতী-কামিনী রায় প্রভৃতি যে কোন সভ্য দেশে জন্ম গ্রহণ করিলেই সর্ব্বজন সমাদৃত হইতে পারিতেন। যে ভাষায় গদ্য সাহিত্যের একান্ত অভাব ছিল, আজ তাহা বর্দ্ধনশীল বিশাল গদ্য সাহিত্যের জননী। ধর্ম্মগ্রন্থ, প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস, উপন্যাস, নাটক, বিজ্ঞান, দর্শন, ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রভৃতি বিবিধ শ্রেণীর গদ্য গ্রন্থে বঙ্গভাষা অমূল্য সম্পদশালিনী হইয়াছেন। অক্ষয়কুমার, ঈশ্বরচন্দ্র, বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বঙ্গভাষাকে নবীন হইতে নবীনতর রাজ্যে আনয়ন করিয়াছেন। এক্ষণে বঙ্গের সুশিক্ষিত সুসন্তানগণ মাতৃভাষার সেবায় প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গসাহিত্য প্রচলিত হইয়াছে, মুসলমান ভ্রাতৃগণও বঙ্গভাষার প্রতি মনোযোগী হইয়াছেন। বঙ্গভাষায় দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক বহু সংবাদ পত্র বাহির হইতেছে। সর্ব্বত্রই জীবনও উন্নতির চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে। মাতৃভাষার এতাদৃশ উন্নতি দর্শনে কোন্ স্বদেশভক্ত বাঙ্গালীর প্রাণ আনন্দে নৃত্য না করে? কোন্ সহৃদয় বঙ্গসন্তান আশানয়নে বঙ্গের ভাবী কল্যাণের দিকে দৃষ্টিপাত না করেন? ভাষার এপ্রকার উন্নতির লক্ষণ দেখিয়া হৃদয়ে সহজেই এই ভাব সমুদিত হয়, মঙ্গলময় ঈশ্বরের কৃপায় বঙ্গের ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল ও আশাপূর্ণ।

প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় যতদূর অবগত হওয়া গিয়াছে, অহিংসাব্রত-পরায়ণ নির্ব্বাণ সাধক বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বিগণ বঙ্গভাষার আদিম নির্ম্মাতা। যদিও তাহাদের আগমনের পূর্ব্বেও বঙ্গভাষা কোন না কোন আকারে বঙ্গে প্রচলিত ছিল, তথাপি সে সময়ের ইতিহাস অতীতের গভীর অন্ধকারে আবৃত। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রকাশিত "বৌদ্ধগাথা" বঙ্গভাষার প্রাচীন তত্ত্ব অবগত হইবার পক্ষে অমূল্য সহায় সন্দেহ নাই। কেন এবং কোন্ সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম এদেশ হইতে বিলুপ্ত হইল, তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস এখন পর্য্যন্তও আবিষ্কৃত হয় নাই। এমন সময় ছিল, যখন বঙ্গের গ্রামে গ্রামে বৌদ্ধনিবাস ছিল. বৌদ্ধমন্দির, ধর্ম্মশালা, বৌদ্ধ বিহার বঙ্গমাতার ক্রোড় সুশোভিত করিত, বৌদ্ধ ভিক্ষু, শ্রমণ ও আর্হতগণ দেশে বিদেশে নির্ব্বাণ ধর্ম্মপ্রচার করিতেন, তখন বাঙ্গালা ভাষাই এদেশে ধর্ম্মপ্রচারের মুখ্য উপায় ছিল। কত রাশি রাশি বৌদ্ধগ্রন্থ এদেশে ছিল, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? বঙ্গবাসী প্রতিভায় এবং গ্রন্থ প্রণয়নে জগতের কোন সভ্যজাতি হইতে ন্যূন নহেন। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য! কি অসীম পরিতাপ! ধর্ম্মপুরাণ প্রভৃতি দুই চারিখানি বৌদ্ধগ্রন্থ ভিন্ন আর সকলই বিলুপ্ত হইয়াছে। আমার মনে হয় চট্টগ্রাম, তিব্বত, ব্রহ্মদেশবাসী বৌদ্ধদিগের নিকট অনুসন্ধান করিলে, সম্ভবতঃ অনেক বাঙ্গালা বৌদ্ধ পুস্তক আবিষ্কৃত হইতে পারে। কেন না, অত্যাচরিত বৌদ্ধগণ নিরুপায় হইয়া প্রধানতঃ এই তিন স্থানেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের অবসানের পর ভক্তাবতার মাহাত্মা শ্রীগৌরাঙ্গের সময় বঙ্গসাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি লক্ষিত হয়। এই সময়ে এবং তৎপরবর্ত্তী বহুবর্ষ পর্য্যন্ত সুললিত পদ্যে জীবন চরিত, নাটক, সঙ্গীত এবং বিবিধ ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। এসকল

বঙ্গভাষার অতুল সম্পদ। বলিতে কি, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রবর্তিত বৈষ্ণব বিধান বঙ্গবাসীর হৃদয়ে নূতন জীবনী শক্তি প্রদান করিয়াছে। বঙ্গভাষাকে জীবিত রাখিয়া বর্ত্তমান যুগে আমাদিগের নিকট উপস্থিত করিয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের বিলক্ষণ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। উভয় ধর্ম্মেই অহিংসা, জাতিভেদহীনতা এবং বৈরাগ্য প্রধান। আমার মনে হয়, বঙ্গের বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমে বৈষ্ণব ধর্ম্মে বিলীন হইয়াছিল। এই বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপঘাতে বঙ্গদেশে আরও কতগুলি ক্ষুদ্র ধর্ম্মসম্প্রদায় উৎপন্ন হইয়াছে,—কর্ত্তাভজা, গুরুসত্য, বাউল দরবেশ প্রভৃতি। এই সকল সম্প্রদায়ের সংখ্যা এখনও দিন ২ বর্দ্ধিত হইতেছে। সঙ্গীত ইহাদিগের সাধনের বিশেষ অঙ্গ। হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীস্থ বহুলোক ইঁহাদের দলভুক্ত। নানাভাবের রাশি ২ সঙ্গীত ইঁহারা রচনা করিয়া গান করিয়া থাকেন। এই সঙ্গীত বঙ্গভাষার একটী সম্পদ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সকল সঙ্গীত এ পর্য্যন্ত সংগৃহীত হইয়া গ্রন্থবদ্ধ হয় নাই। এই সকল সঙ্গীত গ্রন্থবদ্ধ হইলে নিশ্চিতই, বঙ্গভাষার অঙ্গ সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিবে এবং দেখা যাইবে, এই সকল সঙ্গীতে কতটা বৌদ্ধ এবং মুসলমান ভাব সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

বঙ্গভাষা বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব যুগের নিকট যেমন ঋণী, সংস্কৃত সাহিত্য এবং ইংরেজী ভাষার নিকটও তেমনি ঋণী। যিনি যাহাই বলুন, সংস্কৃত বঙ্গভাষার জননী। বঙ্গভাষার অস্থি মজ্জা শোণিত মাংস সমস্তই সংস্কৃত ভাষার বিচিত্র উপাদানে গঠিত। বঙ্গভাষা যত কেন সমুন্নত হউক না, সংস্কৃতের সহিত ইহা চিরদিন নিত্য সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকিবে। কোন ২ সাহিত্যিক বঙ্গভাষাকে সংস্কৃত হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা আত্মহনন ভিন্ন আর কিছুই নহে। বাঙ্গালা ভাষার প্রায় সমস্ত সম্পদই সংস্কৃত হইতে গৃহীত। বিশেষতঃ বৈদিক সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে সংস্কৃত এতদূর সহজ ও প্রাঞ্জল হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাকে প্রকারান্তরে বাঙ্গালা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের মোহমুদ্গর এবং মহাকবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এই সত্যের সাক্ষী। সুতরাং সংস্কৃতের সহিত বঙ্গভাষার যোগ যতই প্রকৃত ও ঘনিষ্ঠ হয়, তাহাই বঙ্গভাষার কল্যাণ এবং ভাবী উন্নতির কারণ।

প্রত্যক্ষ ভাবে না হউক, পরোক্ষ ভাবে বর্ত্তমান বঙ্গভাষা ইংরেজী সাহিত্যের নিকট অপরিশোধ্য ঋণে ঋণী। বর্ত্তমান বঙ্গভাষার উন্নতির ইতিহাস বিশ্লেষণ করিলে, তাহাতে ইংরেজী সাহিত্যের বিলক্ষণ প্রভাব দৃষ্ট হইবে। প্রাথমিক বঙ্গভাষা একদিকে সংস্কৃত অপর দিকে ইংরেজী দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে। মহাত্মা অক্ষয় কুমার, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর উভয়েই এই দুই মহাসাগর হইতে রত্ন সংগ্রহ করিয়া বঙ্গবাসীকে উপহার প্রদান করিয়াছেন। তৎপরবর্ত্তী সাহিত্যিকগণ কি কাব্য, কি ইতিহাস, কি উপন্যাস, কি বিজ্ঞান দর্শন—সকল বিষয়ে ইংরেজী ভাষার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। ইংরেজী ভাষা সাহিত্য-সম্পদে জগতে অতুলনীয়। বিধাতার কৃপায় এই ভাষার জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার বঙ্গবাসীর সমক্ষে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। সুতরাং এ ভাষার যথোপযুক্ত সমাদর করা বঙ্গবাসীর একান্ত কর্ত্তব্য।

সুমার্জ্জিত ধর্ম্ম এবং সুসংস্কৃত সাহিত্য এই দুইটী জীবন গঠন এবং জাতীয় উন্নতি সংসাধনের প্রধানতম উপায়। কথিত আছে, যখন মিসরবাসী ইহুদীগণ তৎকালীন ফেরেয়োর অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়াছিল, তখন ঈশ্বরের আদেশে মহাপুরুষ মুসা অশীতি সহস্র ইহুদী নরনারী ও সন্তান সন্ততি লইয়া ঈশ্বরের অঙ্গীকৃত পুণ্যভূমি প্যালেষ্টাইন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। 'পথ অজ্ঞাত এবং

দেশ অপরিচিত। তাই ভগবান্ দিবাভাগে মেঘস্তম্ভ রচনা করিয়া এবং রজনীতে আলোকস্তম্ভ সৃজন করিয়া যাত্রীগণের অগ্রে২ স্থাপন করিলেন এবং এই নিদর্শনের অনুসরণ করিয়া তাঁহারা অঙ্গীকৃত দেশের উপকণ্ঠে উপনীত হইলেন। ধর্ম্ম ও সাহিত্যও এই দুইটী স্বর্গীয় নিদর্শনের ন্যায় প্রত্যেক জাতিকে চরম উন্নতির দিব্য আদর্শের দিকে লইয়া যায়। ধর্ম্মের কথা এস্থলে বক্তব্য নহে, সাহিত্যই আমাদের আলোচনার বিষয়। এই সাহিত্যই জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্বল। যে জাতির সাহিত্য নাই, সে জাতি অসভ্যতার অন্ধকারে এখনও নিপতিত রহিয়াছে; যে জাতির সাহিত্য বিনষ্ট বা বিলুপ্ত হইয়াছে, সে জাতির আয়ু নিঃশেষিত হইয়াছে, পৃথিবীর বক্ষ হইতে তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত-প্রায় হইয়া গিয়াছে। যে দিন হইতে আলেকজেন্দ্রিয় ও কেইরোর বিশাল পুস্তকালয় দগ্ধ হইল, সেইদিন হইতে প্রাচীন মিসর জাতির ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ভারতীয় আর্য্যজাতির উপর সহস্র২ বৎসর ব্যাপিয়া কত অমানুষিক অত্যাচার হইয়াছে, তথাপি যে এ জাতি পৃথিবীতে সসম্মানে জীবিত থাকিয়া সমুদয় সভ্যজগতের শ্রদ্ধালাভ করিতেছে, তাহার কারণ, ভারতের সাহিত্য রক্ষা। এক মাত্র পুত্রের জননীর ন্যায়, কৃপণের ধনের ন্যায় বহু যত্নে আমাদের আর্য্য পূর্ব্বপুরুষগণ প্রাচীন সাহিত্যগুলি অনেক পরিমাণে সংরক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহারই জন্য আমরা আজও পৃথিবীর বক্ষে জীবিত আছি। বিশুদ্ধ অন্নজল যেমন মনুষ্যকে জীবিত রাখে, দেহের বল ও সৌন্দর্য্য সঞ্চার করে, তেমনি কদন্ন কুপানীয় মনুষ্য জীবনের ঘোর অনিষ্ট সাধন করে, এমন কি তাহাকে রোগাগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া অকালে তাহার জীবন দগ্ধ করে। সাহিত্য মনুষ্যসমাজের অন্নজলের ন্যায়; সৎসাহিত্য ইহার জীবন, আর অসৎ সাহিত্য ইহার মৃত্যুর কারণ। গ্যারিবল্ডী ও ম্যাটসিনীর সাহিত্য-প্রভাবে ইটালী তাহার স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্ত হইল, আর রুসো ও ভলটেয়ারের লিখিত গ্রন্থের ফলে ফ্রান্সে বিপ্লববাগ্নি প্রজ্বলিত হইল। ব্যক্তিগত জীবনেও ইহার প্রভাব কম নহে। একটী পাশ্চাত্য খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, আমি আমার বাল্য জীবনে একবার কুভাব উদ্দীপক এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা পাঠ করিয়াছিলাম, সে কতকালের কথা, তাহার পর আমি শিক্ষালাভ করিয়াছি, কত ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িয়াছি এবং কত সাধু সঙ্গে বাস করিয়াছি এবং প্রচার কার্য্য করিতেছি, কিন্তু আমার বাল্য জীবনের কুগ্রন্থ পাঠের কুফল আমি এখনও ভোগ করিতেছি। সেই গ্রন্থের কুভাব এখনও প্রেতের ন্যায় আমার মনে আসিয়া আমার মনোবৃত্তিকে কলুষিত করে। যদি কেহ এই কুভাব আমার হৃদয় হইতে বিদূরিত করিয়া দিতে পারেন, তবে আমি তাহাকে আমার অর্দ্ধেক সম্পত্তি প্রদান করিব। ধর্ম্মযাজকের এই আক্ষেপ উক্তির ভিতরে গভীর সত্য নিহিত রহিয়াছে। কত যুবক যুবতী, কত বালক বালিকা কুগ্রন্থ পাঠ করিয়া জীবন চির-কলঙ্কিত ও আপনাদিগকে দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বঙ্গভাষায় যে সকল প্রণয়-সঙ্গীত প্রচলিত আছে, আমার মনে হয় উহা বাঙ্গালী জাতির নীতি-দৌর্ব্বল্য ও ভীরুতার অন্যতম কারণ।

আমাদের ভক্তিভাজন আচার্য্যদেব ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র তাঁহার শেষগ্রন্থ নবসংহিতায় যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহার পদ্যানুবাদ প্রদত্ত হইল।

গ্রন্থাবলি মানবের প্রিয় সহচর।
সংসর্গের দোষগুণ তাহাতে বিস্তর॥
দূষিত পুস্তক দুষ্ট সঙ্গীর সমান।
গুপ্ত ভাবে কলুষিত করে মন প্রাণ॥
সদ্‌গ্রন্থ সকল সাধু বন্ধুদের সম।
দেহ মনে স্বাস্থ্যবল বিতরে অসীম॥
সত্য যত্ন জ্ঞানপ্রদ গ্রন্থ হিতকর।
আমার নির্জ্জন বন্ধু আচার্য্য সুন্দর॥
মুখ নাই, তবু দেয় বহু উপদেশ।
কর নাই অশ্রু মুছি দূর করে ক্লেশ॥

সাহিত্যের এতাদৃশ শক্তি যখন স্মরণ করি, তখন সাহিত্যসেবীদিগের দায়িত্বের কথা আপনা হইতে হৃদয়ে উদিত হয়। জাতীয় জীবনকে ক্রমাগত সত্যের পথে, নীতি ও ধর্ম্মের পথে, প্রেম ও উদারতার পথে সংক্ষেপে সর্ব্ববিধ উন্নতির পথের পরিচালনের ভার অনেক পরিমাণে সাহিত্যিকদিগের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। সমুদ্রযাত্রী অসংখ্য যাত্রী পরিপূর্ণ অর্ণবপোতের সুবিবেচক কাণ্ডারী যেমন পোতকে নিরাপদে কূলে আনিয়া উপস্থিত করেন, আর কু অনভিজ্ঞ কাণ্ডারী তাহাকে জলধিগর্ভে নিমজ্জিত করে, সৎ ও অসৎ সাহিত্যিকদিগের মধ্যেও সেইরূপ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। তাই একান্ত অনুরোধ যাহারা সাহিত্যচর্চ্চায় প্রবৃত্ত, তাঁহারা যেন তাঁহাদের এই দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সর্ব্বদা স্মরণ রাখেন। সাহিত্যসেবীগণের আর একটী গুরুতর কর্ত্তব্য উচ্চ ও পবিত্র আদর্শ জনসমাজের নিকট ধরা এবং তাহা সর্ব্বদা নির্ম্মল রাখা। যে জাতির আদর্শ যত উচ্চ ও সেই আদর্শানুসারে জীবন গঠনের চেষ্টা অধিক, সেই জাতিই নিশ্চয়ই সভ্যতার তত উচ্চমঞ্চে আরোহণ করিবে।

বঙ্গ সাহিত্য যদিও ভগবানের কৃপায় দ্রুতগতিতে উন্নতির অভিমুখে ধাবিত হইতেছে, তথাপি ইহা এখনও কৈশোর অবস্থা অতিক্রম করে নাই। জাগতিক প্রধান প্রধান সাহিত্যের সহিত এখনও ইহার তুলনা হয় না। ইহার আশা যেমন উচ্চ, ইহার অভাবও তেমনি বহুল। মৌলিক গবেষণা ও বিজ্ঞান চর্চ্চায় ইহা অতীব দীনা, স্বাধীন উদার অসাম্প্রদায়িক চিন্তাপূর্ণ গ্রন্থ ইহাতে বিরল, জীবন চরিত, ইতিহাস, ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রভৃতি সম্পর্কে ইহার ভাণ্ডার পূর্ণ নহে, স্ত্রী পাঠ্য বালক বালিকাদিগের উপযোগী সৎগ্রন্থ ইহাতে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রধান ২ ভাষা হইতে মূল্যবান্ গ্রন্থাদি অনুবাদ করিয়া বঙ্গ সাহিত্য ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিবার চেষ্টা কি স্পৃহা সাহিত্যসেবী দিগের মধ্যে অধিক দৃষ্ট হয় না। বঙ্গবাসী হিন্দুদিগের অধিকাংশ ধর্ম্মগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ থাকায়, তাহা হইতে গ্রন্থাদি অনুবাদিত হইতেছে সন্দেহ নাই কিন্তু অন্যান্য ভাষা হইতে তেমন অনুবাদ কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে না। ইংরেজী সাহিত্যিকগণ পৃথিবীর যে কোন ভাষায় ভাল গ্রন্থ প্রাপ্ত হইলেই, তাহাই অনুবাদিত করিয়া তাহার মাতৃ ভাষাকে শ্রীসম্পন্ন করেন, কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণ সে দিকে তেমন মনোযোগী নহেন। বলিতে দুঃখ ও লজ্জা বোধ হয় যে, বঙ্গ দেশের সাড়ে চারি কোটী অধিবাসীর মধ্যে ২॥ আড়াই কোটী মুসলমান, যাঁহাদের ধর্ম্ম আরবী ভাষায় লিখিত। যে দেশে অল্পদিন পূর্ব্বে পারস্য ভাষা প্রচলিত ছিল, সেই দেশে আরব্য ও পারস্য গ্রন্থ যথাযোগ্য রূপে অনুবাদিত হইতেছে না। কেবল মাত্র পূর্ব্ববঙ্গ স্থিত পাঁচদোনা নিবাসী নববিধান ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রেরিত প্রচারক মহাত্মা গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় কোরান হদিশের পূর্ব্বভাগ, তকছিব হেদায়ত, দেওয়ান হাফেজ প্রভৃতি কতকগুলি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রন্থ অনুবাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম সাহিত্যের সঙ্গে আমাদিগকে পরিচিত করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গভাষার এবং বঙ্গবাণীর ভাবী জাতীয় জীবনের বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে। তাঁহার রচিত তাপসমালা (মুসলমান সাধক দিগের জীবনী) এমনই উদার অসাম্প্রদায়িক ভাবে অনুবাদিত হইয়াছে যে, তাহা পাঠ করিয়া হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর পাঠক বর্গ উপকার ও আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয়, এই মহাত্মা বঙ্গ সাহিত্য সমাজে তেমন উচ্চ স্থান লাভ করিলেন না অথবা হিন্দু কি মুসলমানগণের মধ্যে আর কেহ তাহার পদানুসরণ করিয়া আরব্য ও পারস্য গ্রন্থ অনুবাদ কার্য্যে জীবন সমর্পণ করিলেন না।

পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার উৎকৃষ্ট গ্রন্থের অনুবাদের কথা দূরে থাকুক, ভারতের প্রাদেশিক ভাষা, হিন্দি, গুরুমুখি মহারাষ্ট্রীয়, তামিলী তেলিগু উর্দ্দু প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে অনুবাদ কার্য্য আরম্ভই হয় নাই বলিলেও চলে। বাঙ্গালীগণ চাকরী ও ব্যবসায় উপলক্ষে ভারতের নানা স্থানে

বাস করেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে অত্যল্প যত্ন সহকারে তদ্দেশীয় প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষা করিয়া অনেক গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া মাতৃভাষার চরণে অঞ্জলি অর্পণ করিতে পারেন। সুতরাং আমাদিগকে দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে, অনুবাদিত সৎগ্রন্থ সম্বন্ধে বঙ্গ ভাষা দরিদ্রা।

বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে আর একটী কথা বলা প্রয়োজন। আমাদের সাহিত্যে তরল-ভাবুকতায় পূর্ণ, গভীর চিন্তা ও দূরদর্শিতা শূন্য গ্রন্থের আধিক্য কিছু অধিক দৃষ্ট হয়। আমাদের জাতি ভাবপ্রধান, ভাবাতিশয্যবশতঃ আমরা কর্ত্তব্যের ভূমি হইতে অনেক সময় স্খলিত হই, ইতিহাসের শিক্ষা ভুলিয়া, ন্যায়ের ভূমি অতিক্রম করিয়া কল্পনার রাজ্যে আসিয়া পড়ি। আমাদের উপন্যাস, নাটক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প প্রভৃতিতে এই তারল্য বিশেষভাবে প্রকাশিত হয় এবং তদ্দ্বারা বাঙ্গালা চরিত্র গঠনের অন্তরায় উপস্থিত হয়। আমাদের সাহিত্যে সাম্প্রদায়িক ভাবপূর্ণ গ্রন্থের বহু প্রচার দৃষ্ট হয়, তদ্দ্বারা উদারতার ব্যাঘাত জন্মে। এসকল গ্রন্থের তীব্র সমালোচনা হওয়া প্রয়োজন। ইংরেজীতে যাহাকে Healthy tone বলে ভাষার মধ্যে তাহা সঞ্চারিত হওয়া আবশ্যক।

ভাষার পরিপুষ্টির অনেক আয়োজন ও উপাদান আছে। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতায় যাহা সম্ভব, অদ্য বিনীত ভাবে আপনাদের সমীপে নিবেদন করিলাম। আমরা বঙ্গভাষার সম্পদের কথাও বলিলাম, অভাবের কথাও বলিলাম, কিন্তু কেহ যেন ইহাতে নিরাশ না হন। বিধাতার কৃপাপবন বঙ্গভূমির উপর প্রবাহিত হইতেছে, তাহারই কৃপায় বঙ্গসাহিত্য দিন দিন সমুন্নত হইতেছে এবং আমরা বিশ্বাস চক্ষে দেখিতেছি, ইহা পৃথিবীর আদরের সাহিত্য রূপে পরিণত হইবে। তাই জননী বঙ্গভাষার সেবকদিগের নিকট আমার বিনীত নিবেদন যাহাতে বাঙ্গালী জাতি অবিশ্রান্ত ধর্ম্মের পথে, ন্যায়, প্রেম ও পুণ্যের পথে, সত্য ও সভ্যতার পথে, একতা ও স্বাধীনতার পথে অবিশ্রান্ত অগ্রসর হইতে পারে, সর্ব্বপ্রকার বিলাস, অপবিত্রতা হিংসা বিদ্বেষ সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করিয়া সমস্ত বাঙ্গালীজাতি এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় জাতীয় জীবনলাভ করিতে পারে, তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখিয়া আপনারা সাহিত্য সেবায় ব্রতী হউন। ভগবানের শুভাশীর্ব্বাদ আপনাদের মস্তকে বর্ষিত হইবে, ভবিষ্যৎ বংশীয়গণ আপনাদিগকে কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ এবং আপনাদিগকে ভক্তি কুসুমাঞ্জলি অর্পণ করিবে।

আর একটী কথা বলিয়া আমার এই নিবেদন শেষ করিব। যখন বঙ্গদেশের নানাস্থানে সাহিত্য চর্চ্চার জন্য সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপিত হইতে লাগিল, তখন টাঙ্গাইলেও এইরূপ একটী সমিতি স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা আমাদের অন্তরে বলবতী হইয়াছিল, এবং তজ্জন্য ক্ষীণ চেষ্টাও হইয়াছিল। কিন্তু তৎকাল উক্ত চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। কিন্তু শুভক্ষণে আমাদের প্রিয়দর্শন বন্ধু শ্রীযুক্ত ভূপাল কুমার দত্ত মহাশয় এখানে আগমন করেন, বিধাতার কৃপায় তাঁহারই উদ্যোগ যত্নে এক্ষণে বর্ষাধিক কাল এই সাহিত্য সংসদ্ স্থাপিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা টাঙ্গাইলের অশেষ উপকার সাধিত হইবার সম্ভাবনা। এই শুভ অনুষ্ঠানের জন্য টাঙ্গাইলবাসী শিক্ষিত সম্প্রদায় শ্রদ্ধেয় ভূপাল বাবুর নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিবে।

এই সভার সভাপতিত্ব কার্য্যে আমি একান্ত অযোগ্য, সুতরাং এই অভিভাষণে নানা প্রকার দোষ ত্রুটী লক্ষিত হইবে। ভরসা করি তজ্জন্য আপনারা কৃপা করিয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন।

আসুন আমরা আমাদের আর্য্য ঋষিদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া বলি "ব্রহ্মকৃপা হি কেবলং ন তু বিচারবাগ্বলং"।

শ্রীশশিভূষণ তালুকদার।

ঘাটু গান।

আবার ভরা ভাদরের শুভাগমন হইয়াছে। বর্ষার জলে, বঙ্গের ঘাট, মাঠ, বাট তল হইয়া পড়িয়াছে। সমুন্নত পল্লী বা সহরের কথা বলিতে চাই না;—সেখানে দিন রাত্রিই কর্ম্ম,—সেখানে কেবলই মূর্ত্তিমান্ পুরুষকারের পুরস্কার! আমি বলিতেছি,—আমাদের নিম্ন বঙ্গের ভাঁটি মুল্লুকের কথা। 'ঘন ঘোর বরিষার' বিরাট শ্রাবনের ছায়াতলে প্রায় চারিমাস ধরিয়া এই ভাঁটির মানুষগুলা বিশ্রাম করে। তাহাদের কাজ নাই,—ঘর ছাড়িয়া বাহিরে যাওয়ার পন্থা নাই,—অনেকের ভিটায় হাঁটু জল, কাহারও বা ঘরে মাচার উপর বসতি,—ঘরে জল। বাড়ীর আশে পাশে, কানাচে জল থৈ থৈ করে।

এই একটা মস্ত অসুবিধা মনে করা 'উজান' দেশের মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। সহরবাসীর ত কথাই নাই। চলা ফিরা বন্ধ, ঘরে দুয়ারে জলের ঢেউ, পুকুর পাড়ে জল—পায়খানায় জল—মহা উৎপাত! অমন দেশে কি কেউ যায়? ওই সব দেশের মানুষ কেন যে স্থানান্তরে যায় না—এমন ভাবনাও কেহ কেহ ভাবেন! কিন্তু—

"তথাপি সুধাও তার নিবাসীর কাছে;
অমন সুখের দেশ আরো না কি আছে?"

শুধু কি তাই? বর্ষার জলে যখন সারা দেশ জলের নীচে—তখন মানুষ ছাড়া আর আর প্রাণীর কি উপায় হয়, সে কথাও চিন্তা করিতে হইবে। গরু বাছুর, হাতী ঘোড়া, কুকুর বিড়াল প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তুর যা হয় একটা মোটামুটি ব্যবস্থা প্রত্যেক প্রতিপালকই করিয়া থাকেন। কিন্তু কথা হইতেছে—অন্য ইতরপ্রাণীর সম্বন্ধে। সে সকল প্রাণীর কথা শুনিলে উজান দেশের মানুষ বা সহরের বন্ধুগণ শিহরিয়া উঠিবেন। শিয়াল, খট্টাস প্রভৃতি উচ্চভূমির জঙ্গলে বা মাঠে আশ্রয় লয়,—ব্যাং বা দুর্ব্বল প্রাণী তখন তাহাদের ভক্ষ্য। বেচারীরা বা আধমরা অস্থি চর্ম্ম সার হইয়া তখন জীবন ধারণ করে। বিরাট মাঠে—জলরাশির উপর যে দুই একটা হিজল গাছ দেখা যায়—তাহার শাখায় শাখায়—সাপের বাসস্থান। এক একটা গাছে দুই দশ কুড়ি ছোট বড় সাপ নিশ্চিন্তে শুইয়া আছে। আর গৃহস্থের ঘরের চালেও দশ পঁচিশটা সাপের আশ্রয় হইয়াছে। চৌকী বা মাচার নীচে, ধানের মরাইয়ে, এমন কি ভাতের হাঁড়িতে, অগ্নিহীন চুল্লীতে, হাঁড়ি পাতিল কলসীতে সাপের আড্ডা! বিছানার পার্শ্বে লম্বমান কৃষ্ণসর্প অনেক সময় দেখা যায়। কত যে ভয়, কত যে বিপদ তাহা বর্ণনীয় নহে। সাপের ঘাড়ে পা দিয়া অনেকে প্রাণ হারায়! আর অনেকে মা বিষহরির শ্রীচরণ ভরসায় পাঁঠা কবুতর 'মানসিক' করিয়া থাকে।

শুধু শুধু নিষ্কর্ম্মা হইয়া শাওন ভাদ্রের লম্বা দিনগুলি কাটান বড় সোজা কথা নয়। তাস পিটিয়া, পাসা খেলিয়া সময় নষ্ট করার মরশুম পাড়াগাঁয়ে আগে তেমন ছিল না! রামায়ণ, মহাভারত পাঠ হইত আর পাড়ার সকলে সেই 'অমৃত সমান' কাহিনী শ্রবণ করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিত। রামায়ণ বা মহাভারত একজনে পড়ে—সকলে শোনে! এই ব্যবস্থা সর্ব্বত্র সব্বকালে পছন্দসই হয় না! অনেক রাগ রাগিনী ওয়ালার গলা কুচ্ কুচি করে। তাই এক আধটু কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিবার আকাঙ্ক্ষা হইল। তারই ফলে সারা শ্রাবণ মাস ধরিয়া পদ্মাপুরাণ গানের ব্যবস্থা। এই গেল এক শ্রেণীর লোকের জন্য। একটু বেশী ধর্ম্মপরায়ণ, একটু বয়স ভারী হইলেই পদ্মাপুরাণ গানে মন মজে। 'ধুয়া' ধরিয়া লাচাড়ী, পয়ার, মালসী গানে পদ্মাপুরাণের আসর মসগুল হইয়া উঠে।

যুবকের দল, ছেলে ছোকরার দল—যাহারা সারা বছর ধরিয়া মাঠে গরু চরায়, হাল চষে—ঘরে গৃহস্থালীর কাজ করে, তাহাদের পক্ষে 'নিতুই দিন' পদ্মাপুরাণ বা মহাভারতের আড্ডায় হাজিরি দেওয়া পছন্দসই হয় না। যে বয়সে বুকের ভিতর একখানি রঙিন মুখ, দুটি পটল

চেরা চোখের ছবি ভাসিয়া থাকে—তাহার কথাই আলোচনা করিতে ভাল লাগে,—সেই সকল প্রসঙ্গই আরামদায়ক হয়। এই শ্রেণীর প্রসঙ্গে কানুর কীর্ত্তনের মত মুখরোচক, অমন মোলায়েম আর দুটী নাই। শ্রীরাধার মান, বিরহ, প্রেম প্রভৃতি যুবক-প্রাণে যে আনন্দ সঞ্চার করে—আর কিছুতেই তাহা হয় না। এই সময়ের উপযোগী করিয়া 'ঘাটু' গানের সূত্রপাত হয়। শ্রীহট্টবাসী লালা আনন্দীরাম অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ বা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ঘাটু গানের সৃষ্টি করেন।

বর্ষাকালে ভাঁটীমুলুকের প্রত্যেকেরই দুয়ারে নৌকার প্রয়োজন। হাটবাজার করিতে, পাড়া বেড়াইতে, নিমন্ত্রণ খাইতে, আত্মীয় স্বজনের বাড়ী যাতায়াত করিতে নৌকার দরকার। নেহাৎই গরীব কাঙ্গালেরা কলাগাছের ভেলায় কতক কাজ করিয়া লয়। হাটবাজার করিতে বা একটু দূরে যাইতে হইলেই পরের নৌকার সাহায্য লইতে হয়। এমনকি কোনও কোনও গ্রামের দুই দশখানা নৌকায়ই সারা পাড়ার মানুষ লইয়া বাজার করিতে যায়।

ঘাটে ঘাটে নৌকা ভিড়াইয়া মানুষ তুলিয়া লওয়া হয়। হাটে বাজারে যাইবার পথে সমাজের কথা, পর নিন্দা প্রভৃতির আলোচনা অপেক্ষা ভাটিয়াল রাগিনীতে "বাহাত্তর বছরের পাড়ি বেলা আছে দণ্ড চারি" যে বেশী আরামদায়ক তাহাতে আর সন্দেহ নাই। লালা আনন্দীরাম নির্দ্দিষ্ট গানের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ করিয়া ঘাটু গানের প্রবর্ত্তন করিলেন। ঘাটে ঘাটে গানকারী সংগৃহীত হয় বলিয়া 'ঘাটু' গান নামকরণ হইয়াছে।

প্রথমে হয়ত ঐ ভাবেই ঘাটুগান গীত হইত। তারপর উহার বিস্তৃতি হইয়াছে। ক্রমে ঘাটুগান আর হাটে বাজারের পথে আবদ্ধ রহিল না। শুধু গানের উদ্দেশ্যেই গায়ক সংগ্রহ করা হইত এবং নৌকার উপর দস্তুর মত আসর জমান হইতে লাগিল। পাটনীর বড় নৌকা বা দুই নৌকা একত্রে বাঁধিয়া তাহাতে চাঁদোয়া খাটাইয়া—রং বেরঙের নিশান উড়াইয়া, ঘাটুর আসর তৈরী হইতে লাগিল। ঢোলক, মন্দিরা তাহাতে তাল যোগাইল। ঘাটু গানের মজলিস এই ভাবে মস্‌গুল হইয়া উঠিল। কিন্তু ইহাতে একটু অসুবিধা হইয়া উঠিল। নৌকায় নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মানুষ লওয়া হয়; সুতরাং সকলের আকাঙ্ক্ষা মিটে না। এজন্য একদল সৌখিন গায়ক ঘাটুকে স্থলচর করিয়া লইতে চেষ্টা করিল। ইহাদের চেষ্টা ফলবতী হইতে বেশী বেগ পাইতে হইল না। ফলে ঘাটুগান—স্থল ঘাটু ও জলঘাটু—এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। একই গান—একই রীতিনীতি—কেবল স্থানের বিভিন্নতা মাত্র। জল ঘাটুতে বাছা বাছা গায়কগণের সম্মিলন স্থান। স্থলে ঘাটুরদলে চেঁচাইবার সুযোগ অনেকেরই হইল।

ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঘাটুগানে "ছোক্‌রার" আবির্ভাব হইল। একটী সুকণ্ঠ ছেলেকে (এই ছোক্‌রার বয়স ৮।৯ হইতে ১৫।২০ পর্য্যন্ত হইতে পারে। তবে ১২।১৫ বৎসরের ছোক্‌রারই কদর বেশী) সম্পূর্ণরূপে মেয়েলী পোষাকে সাজাইয়া লওয়া হয়। তাহার মাথায় দীর্ঘ কেশ (পরচুলা বা আপন দীর্ঘ কেশ), হাতে, নাকে, কাণে উপযুক্ত অলঙ্কার, গলায় হার, পায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগণিত ঘুঙ্‌ঘুর, পরণে ঘাগরী, গায়ে সেমিজ ও উড়্‌নী। ঐ ছেলের প্রধান কার্য্য উপযুক্ত অঙ্গভঙ্গী দ্বারা গান 'বাতাইয়া' দেওয়া। তাহার চক্ষুর ভঙ্গী, মুখে কখন প্রফুল্লতা, কখন বিষাদ, কখন গাম্ভীর্য্য, কখন চঞ্চলতার ভাব পরিস্ফুট করা, অথচ কখনও বিকৃত মুখভঙ্গী না করাই ছোক্‌রার ওস্তাদী। হাতে, অঙ্গুলীতে, অঙ্গভঙ্গীতে, চক্ষুর ভঙ্গীতে ও 'মুখের ভাব' পরিবর্ত্তনে যে ছেলে গানটীর ভাব হুবহু বাতাইতে পারে, তাহার দর খুব চড়া। ঘাটুর ছেলের মাসিক বেতন দশ-পনর টাকা হইতে তিনশত টাকা পর্য্যন্ত শোনা গিয়াছে। ছোক্‌রা গান 'বাতাইতে' সুপটু হইলে, বাস্তবিকই তাহার অঙ্গভঙ্গীতে সঙ্গীতের মাধুর্য্য বাড়ে,—সঙ্গীতের অর্থ স্পষ্ট হয়। কখন কখন ঐ ছোক্‌রা, গায়কগণের সঙ্গে উচ্চতম সুরে গান ধরে। শত কণ্ঠের সম্মিলিত গানের উপর ছোক্‌রার উচ্চ ও মিহি সুর বড়ই মধুর হয়। ইহাকে "জিল্ রাগিনীতে গান ধরা" বলা হয়। কখন কখন ঘাটুর

ছোক্‌রার কণ্ঠস্বর ও 'বাতানের' নিকট পেশাদার নর্ত্তকীরাও হার মানে। আমরা এমন দুইএকটী ছোক্‌রার গান ও 'বাতানের' খবর রাখিতাম, যাহার নিকট নর্ত্তকী-গণের হার মানিতেই হইবে।

ঘাটুর ছোক্‌রা নবাবপুত্র বিশেষ। তাহাকে মাটিতে পা ফেলিতে হয় না। কোলে, ঘাড়ে, পিঠে তাহার স্থান। গায়কদলের প্রাণপণ যত্নে তাহার জন্য সুখাদ্য সম্ভার সংগৃহীত হয়। পাড়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠা বেশকারিণী তাহার বেশবিন্যাস, অন্ততঃ কেশবিন্যাস করিয়া দেন। আওয়াজ খারাপ হওয়ার ভয়ে ছোক্‌রাকে জলে নামিতে দেওয়া হয় না,—তোলা জলে স্নান করাইতে হয়। নদী নালা বা কাদার পথ সে অপরের ঘাড়ে চড়িয়া পাড়ি দেয়। দধি ও অন্য অম্লদ্রব্য তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ। তাহার সুনিদ্রার ব্যবস্থা, সুসজ্জা, সু-শয্যা, সুপথ্য প্রভৃতির সু-ব্যবস্থা দেখিলে ঈর্ষ্যা হয়। কত যুবক মা বাপকে লুকাইয়া দেবতার জন্য আনীত দ্রব্যাদি ঘাটুর ছোক্‌রাকে সমর্পণ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভকরে। ছোক্‌রা পুষিতে অনেক টাকাওয়ালা মানুষ দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে। ছোক্‌রার বেতন ১৫ দিনে, ২০ দিনে একমাস হিসাবে ধরা হয়। যে সকল ছোক্‌রা এই বিলাসিতার মধ্যে স্বর-সাধনের সঙ্গে সঙ্গে বাদ্য যন্ত্রে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করে, তাহাদের ভবিষ্যৎ একরকম কাটে,কিন্তু অন্যান্য ছেলেদের ভবিষ্যৎ বড় মন্দ। তাহারা একুল ও কূল দুকূল হারাইয়া বড় কষ্টে জীবনযাপন করে।

ঘাটুগান—আরম্ভ, তালফের, মিল ও ছম এই চারি অংশে বিভক্ত। ছম্ বা সম্ ই গানের মধুরতম অংশ। ছমের মোহন তান মনোমুগ্ধকর। ছম্ গানের 'বাতানই' ছোক্‌রার বাহাদুরী এবং তখন যে ছেলে সুর-সপ্তকে তান ধরিতে পারে, তাহারই প্রশংসা বেশী।

কানু ছাড়া কীর্ত্তন নাই। ঘাটুগানেও কানুর একাধিপত্য। সুতরাং প্রথমে কানুর বন্দনাগীতি গাহিতে হয়। ইহার নাম গৌর বা গৌরবন্দনা। এই হিসাবে ঘাটুগান (১) গৌর, (২) বংশী (৩) সাজন (৪) রূপ (৫) জলভরা প্রভৃতি অংশে বিভক্ত। প্রত্যেক গানই সময়োপযোগী তাল মানে রচিত। বংশী, বিরহ ও মান এর গান অধিকতর চিত্তাকর্ষক। বিরহের কোন কোন গানেও বাতানের ওস্তাদিতে সময় সময় অশ্রুসংবরণ কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে।

(১) গৌর।

সোনার গৌরাচান্দ উদয় হৈল নদীয়ায়।
শচীমায়ের কোমল কোলে সোনার গৌরা হরিবলে
মধুর গানে নদে ভেসে যায়। ইত্যাদি।

(২) গৌর।

গৌর আমার ঐ সুন্দরিয়া—নয়নেরি তারা,
রাত্র নিশা কালেরে—গৌরে হয়েছি হারা।
যে অবধি গৌর গেল, সোনার নদে আঁধার হৈল,
বিপদ ঘটিল।
সেই অবধি শচীরাণী জীয়ন্তে মরা॥

(ছম)

নদীর কিনারে নাচে দেখ সই গো একি শোভা
গৌর কিশোরা।
ভক্তগণে সঙ্গে করি নাচে গৌর বাহুতুলি
রাধার ভাবে মগ্ন হয়ে—দুনয়নে বহে ধারা,
গৌর কিশোরা॥

(১) বংশী।

মুরলী বাজাইয়া রামা! যায়রে গহন বনে,
(শুনে) ধৈর্য্য না মানে।
ধৈর্য্য না মানে, ধৈর্য্য না মানে—গো প্রাণে—
বাঁশরী শু'নে।
বাঁশরী বাজাইয়া কালা ভুলায় যত কুল বালা
আকুল করে মোহন বাঁশীর গানে,
ধৈর্য্য না মানে।

(ক)বংশী।

মধুর আওয়াজ শুনি, জিউ মোর উদাসিনী
কোন্ বন্ মে বাজে (হায়রে) মোহন বন্‌শী,
কোন্ বন্ মে গিয়ে বন্‌শী নাগিনী
আওয়াজে দংশিল যেমন শোন লো সজনি,
বিষে আমি জর জর—সহিতে না পারি।
মধুর আওয়াজ—ইত্যাদি

(ছম)

এয়সা বন্‌শী বাজিল সই মধুর সুতানে
শুনিয়া অভাগিনী ঘটিছে নিদান।
চল সখি বন মাঝে কোন্ বনে বন্‌শী বাজে,
(আরে সখিরে)
ও সেই বংশী রবে যোগী ছাড়ে যোগধ্যান,

এইরূপ (৩) সাজনে—শ্রীরাধার সাজ সজ্জা (৪) রূপে—রাধার এবং কৃষ্ণের রূপ বর্ণন (৪) জল ভরায়—সখিগণ সহ 'বিনোদিনী রাইকামিনী' যমুনায় জল আনিতে গিয়া কদম্ব তরুতলে মদনমোহন সন্দর্শন (৬) সেজুয়ায়—ফুলে ফুলে বাসর সজ্জা তার পর (৭) বিরহ, (৮) ভোর এ—সারা নিশি চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে যাপন করিয়া আগত কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া সখিগণের উক্তি।

* বিরহই ঘাটুগানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অংশ। এই অংশ গাইবার সময় গায়ক-মণ্ডলী এমন করুণ সুরে গান ধরে, ছোক্‌রা এমন করিয়া গান 'বাতাইয়া' দেয় এবং মধ্যে মধ্যে 'জিল সুরে' একান্ত করুণ রাগিণীতে তানধরে যে অতিবড় পাষাণ হৃদয় ও গলিয়া যায়। ছোক্‌রার চক্ষু দুটী যেন সত্যসত্যই বিরহে কাতর হইয়া হৃদয়ের কত ব্যথা, কত যাতনা প্রকাশ করে, তাহার মুখ-ভঙ্গী যেন প্রাণের কত ব্যথার ছবি ফুটাইয়া তোলে! এ করুণসঙ্গীতে. এই করুণ বাতান-দৃশ্যে—শ্রোতৃমণ্ডলীর নয়ন-কোণায় অশ্রুবিন্দু দেখা দেয় এবং বুক ফাটিয়া একটা দম্‌কা দীর্ঘ নিশ্বাস ছুটিয়া আইসে। সুগন্ধি কুসুম-রাশি-সজ্জিত শয্যায় শ্রীরাধা প্রতিপলে প্রাণকান্তের প্রতীক্ষা করিতেছেন, প্রতি পলে দয়িতের অঙ্গ-সৌরভ, তাঁহার পদধ্বনি, তাঁহার নিশ্বাস পর্য্যন্ত অনুভব করিয়া চমকিয়া উঠিতেছেন আবার পর মুহূর্ত্তে নিরাশ হইয়া এলাইয়া পড়িতেছেন। কখন চাঁদকে, কখন জ্যোৎস্নাকে, কখন কুসুম সৌরভকে, কখন বা "আধো-ঘুম চোখে কোকিলার 'কুহু' ধ্বনি শুনিয়া তাহাকেই প্রিয়তমের নিকট আপন আক্ষেপ জ্ঞাপন করিতে বলিতেছেন। এবং "যদি আমি মরি, তবে তোমরা আমার 'প্রাণবন্ধুকে' আমার দুঃখের সকল কথা বলিও" এই বলিয়া অশ্রুপাত করিতেছেন। কখন বা সখিগণের গলায় ধরিয়া বড় হা হতোস্মি করিতেছেন। বিরহ-বিধুরা শ্রীরাধার এই করুণ উক্তিগুলি নিম্নবঙ্গের নিরক্ষর বা সামান্য শিক্ষিত কবির রচিত হইলেও প্রায় সকল বিরহ সঙ্গীতই পবিত্র—'কামগন্ধ নাহি তায়'। বৈষ্ণব কবিগণের অতি পবিত্র রচনার সহিত তুলনীয়। তবে কোনও কোনও কবি শ্রীরাধার বিরহ বর্ণনায় বাসনার প্রবল উচ্ছ্বাসও প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রাম্য নিরক্ষর কবির প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহা ক্ষমা করা যায়। আমরা একটী মাত্র বিরহ সঙ্গীত উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

বিরহ জ্বালায় মরি, [illegible] গেল আমায় ছাড়ি
দুখের কথা বলরে শুনি।
(ও সজনী) আমি অভাগিনী জনম দুখিনী
কার কুঞ্জে রইল প্রাণনাথ।
সজনি, বিচারিলাম নগরে না পাইলাম প্রিয়রে
প্রিয়রে বিচারি* মাথায় কেশে।
আমি বিরহিনী. একাকিনী, ঝাঁপ দিব যমুনার জলে
কার কুঞ্জে রইল প্রাণনাথ।
(ছুম্)
বিরহ আগুনে জ্বলি, আরে সখি আনরে কাটারী।
দেখ বুক বিদারী,
কেয়া লেখা করবে হামারি।
বিরহ আগুনে জারি, জ্বলে হিয়া ধীরি ধীরি
দুনয়নে বহে মেরে বারি।
আরে সখি—আনরে কাটারি। (সখিরে)

মান, মিলন প্রভৃতি সঙ্গীতেও যথেষ্ট মাধুর্য্য বর্ত্তমান। ঘাটুগান সাধারণতঃ শেষ-রাত্রিতে আরম্ভ হয়। শেষ হইতে বেলা অপরাহ্ণ হইয়া আইসে। দুইদল দুই পক্ষে প্রশ্ন উত্তর করিয়া গান করিলেই বেশ জমাট বাঁধে। এক পক্ষ রাধার সমর্থক, অপর পক্ষ শ্রীকৃষ্ণের মোক্তার। কখন কখন এই দ্বন্দ্ব মাত্রা অতিক্রম করিয়া অশ্লীলতার চূড়ান্ত সীমায় পৌছায়। তবে সুখের বিষয় এই যে তেমন দুর্ঘটনা কদাচিৎ দেখা যায়। সাধারণ নিরক্ষর লোকের গান বলিয়া দেশের ভদ্র সম্প্রদায় এই গানের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন না। এই উপেক্ষার দৃষ্টিতলে ঘাটুগান দ্রুত লয় পাইয়া আসিতেছে। এই সুন্দর, সরল এবং প্রায় বেখরচার আমোদ রক্ষা করার জন্য শিক্ষিত ও ভদ্র মহোদয়গণের যত্নকরা উচিত বলিয়া মনে হয়।

ঘাটুগানের বিশেষ প্রচলন—বড় বড় হাওর, বিল, খাল প্রভৃতির তীরবর্ত্তী স্থানে। বড় নদীর তীরে

* খুঁজি।

অপেক্ষাকৃত কম প্রচলন। নদীতীরবর্ত্তী লোকদের বর্ষাকালেও কাজ করিবার, চলাফিরা করিবার সুবিধা থাকে, কিন্তু হাওরের পাড়ের মানুষ বর্ষাকালে বন্দী। তাই তাহাদের চিত্ত-বিনোদনের জন্য সঙ্গীতের সুব্যবস্থা। যে সামান্য ব্যয়ে ঘাটুগান হয়, বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজের যাত্রা, থিয়েটার সে ব্যয়ে হওয়ার সম্ভাবনা নাই। ঘাটুগান কবিগান, দুর্গাপুরাণ, পদ্মাপুরাণ প্রভৃতি পল্লীর নির্দ্দোষ আমোদ। জীবন-সংগ্রামের নিষ্পেষণে এগুলি মরিবার পথে পড়িয়াছে। যদি শিক্ষিত জনগণ পূজার অবকাশে দেশে পদধূলি দেন আর এই খাঁটী দেশী জিনিসগুলির প্রতি সহানুভূতি দেখান, তবেই কিন্তু এগুলি বাঁচে। একটী শিক্ষিত ভদ্রলোকের আগমন দেখিলে ঘাটুর আসর কত উৎসাহিত হয়, তাহা বর্ণনীয় নহে। সিলেট, কুমিল্লা, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ সদরের কোনও কোনও স্থানে ঘাটুগান বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। আমরা ভরসা করিতে পারি, ঘাটুগান অকালে মাঠে মারা পড়িবার আগে, স্থানে স্থানে তাহার রক্ষার ব্যবস্থা হইবে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সপ্তর্ষি।

সংস্কারক

হ্যাট কোট, দমকল,
বার্ডসাই, দুর্ব্বল ;
জল-ভাত, খুব কম,
বিফ্-গোট্ হর্দম্।

পুরুৎ

নোংরা কাপড়, নামাবলী,
নেমন্তন্ন, দলাদলি ;
অল্প পঠন, বেশী কথা,
আঁধার জীবন, বিফলতা !

বক্তা

হাত পা ছোড়া, "নাই কি কেহ ?"
অরুণ-আঁখি, রুগ্ন দেহ ;
সোনার ঘড়ি, চশ্মা দামী,
প্যান্ত্‌লা তি দিবস যামীখু।

নেতা

টাউন্ হল্, মফস্বল্,
অনর্গল মুখের বল ;
চালাক-ধীর, পায়েস-ক্ষীর,
শোভন শির, লোকের ভিড়।

বরের বাবা

"আসুন মশাই !"—ভদ্র কসাই ;
"সতীশ, তামাক ; বিষম বালাই !
ছয়টি হাজার, নিমাই আমার !
চাইনি তেমন, বুঝুন এবার।"

ধনীর ইয়ার

"হুজুর-হুজুর ! আম্‌রা মজুর !"
নখর কুক্কুর, বচন মধুর !
ওঠন্ বসন চরণ্ চাটন্,
যখন্ তখন্ মুর্গী-মাটন্।

ধর্ম্ম প্রচারক

পুতুল-পূজা ? হরি হরি !
হিন্দুয়ানী ? লাজে মরি !
সাত্ত্বিকতা ? মাটি কাদা !
দেব্‌তা গোঁসাই ? পাজি গাধা !

শ্রীসতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

শ্রীবৃন্দাবন।

ধর্ম্মভূমি, কর্ম্মভূমি, যে বলে বলুক
আমি জানি তুমি প্রেমভূমি,
ধ্যান দিয়ে প্রাণ দিয়ে আঁখি জল দিয়ে
ভক্তি নবনীতে গড়া তুমি।
গৌরাঙ্গের অঙ্গ সম তুমি নিরমল
স্নিগ্ধ যেন ভাগবত শ্লোক,
সুলভে দুর্লভ তুমি যেন হরিনাম,
শান্ত যেন ত্যাগের পুলক।
আপনারে বিকায়েছ শ্রীপদে কানুর
সব তুমি দেহ বিলাইয়া,
চক্ষে নহ, বক্ষে তুমি, আশা আকাঙ্ক্ষার
গন্ধে গীতে গেছ মিলাইয়া।
নিত্যকবি উদাসীন বৈরাগীর দল
নৃত্য করে গাহি তব নাম,
তুমি অভয়ের কথা আশ্বাসের বাণী
রাস রসময় ব্রজধাম।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

কণিকা ও ক্ষণিকা।

কিছুদিন পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম চুটকি কখনও সাহিত্য নয়। কথাটা নিয়া লড়াই করিতে গেলে চুট্‌কিরই সৃষ্টি হইবে, সাহিত্য হইবে না; সুতরাং তাহাতে স্থায়ী লাভ কিছু নাই। তবে চুটকির পক্ষে এই বলা যাইতে পারে যে, তাহাতে সাময়িক বিষয়ের প্রতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা চলে। মানুষের বুদ্ধি সর্ব্বদাই বিশাল বস্তুর চিন্তার ব্যাপৃত থাকে না; ক্ষুদ্র বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি দিতে হয়। না হইলে, ক্ষুৎপিপাসাদি নিবৃত্তির ন্যায় প্রাত্যহিক ব্যাপার বন্ধ হইয়া যাইবে: এবং হস্তপদাদি উদরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করায় যেমন উদরেরই কেবল ক্ষতি হয় নাই, সমস্ত দেহেরই অনিষ্ট হইয়াছিল, তেমনই চুটকিকে গলা টিপিয়া মারিলে, অন্তিমে হয়ত চুট্‌কিরই কেবল অনিষ্ট হইবে না, সাহিত্যেরও অনেক উপাদান লুপ্ত হইয়া যাইবে। ছোট কখনও বড় নয়, চুট্‌কি ও কখনও সাহিত্য নয়; কিন্তু ছোট হইতেই বড়র উৎপত্তি হয়, এবং চুট্‌কি হইতে ও সাহিত্য জন্মিতে পারে। উদাহরণ, মনুর মতে ব্রহ্মের অণ্ড হইতে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি।

বিশ্ববিদ্যা ও বাংলা বিদ্যা। কোনও একটা জাতিকে যদি কেহ ছেলে ছোকড়ার মত মনে করে এবং সেইমত ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহাকে অনেক সময় বিপদে পড়িতে হয়। কারণ, সমষ্টির গায়ের জোর ব্যষ্টির চেয়ে অনেক বেশী। সকলে যদি নিতান্ত বেকুব ও হয়, তবুও গায়ের জোরে হাজার বড় বুদ্ধিমানকেও পিষিয়া মারিতে পারে। উদাহরণ, সোক্রেটিসের মৃত্যু। সোক্রেটিস যে এথেন্সবাসী আর সকলের চেয়ে বুদ্ধিমান্ ছিলেন, একথা আমরা আজ দুই হাজার বৎসর ধরিয়া মানিয়া লই-য়াছি। যে কয়েক শত লোক সোক্রেটিসের বিচার করিয়া-ছিল এবং তাঁহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছিল, তাহাদের সকলের বুদ্ধি নিয়া যদি একটা পুঁটুলি বাঁধা যাইত, তাহা হইলে তাহা সোক্রেটিসের মস্তিষ্কের এক কোণার বেশী জায়গা লইত না। কিন্তু গায়ের জোরে বড় বলিয়া তাহারা অতি সহজেই সোক্রেটিসকে মারিয়া ফেলিতে পারিয়াছিল। কেননা, সোক্রেটিস মনে করিতেন এবং বলিতেন যে, তাহাদের আক্কেল পসন্দ অত্যন্ত কম ছিল। ইতিহাস ও অবশ্যই ইহাদিগকে খুব বুদ্ধিমান্ মনে করে নাই এবং অবশ্যই ইহা অতি খাঁটি কথা; কিন্তু এই মতের নীচে একটা ফুটনোট এই থাকা দরকার যে, তাহারা একটা অতি মস্ত বুদ্ধির কসরৎ দেখাইয়াছিল; সেটা হইতেছে, সোক্রেটিসকে [illegible]। ইহা করিয়াই তাহারা অমর হইয়া রহিয়াছে; নইলে কে তাহাদিগকে চিনিত? কেই বা তাহাদের কথা ভাবিত?

ব্যষ্টির উপর সমষ্টির গায়ের জোরের আর একটা উদাহরণ সেই সকল য়ীহুদী পণ্ডিত, যারা ফয়তা দিয়া যীশুকে হত্যা করিয়াছিল। সেখানেও ব্যক্তির আক্রমণে ক্রুদ্ধ হইয়া সমাজ তাহার উপর নিজের শারীর শক্তির মাহাত্ম্য দেখাইয়া দিয়াছিল। বেশী দৃষ্টান্ত দেওয়ার প্রয়োজন নাই। কারণ, এ বিষয়ে শাস্ত্রের সাক্ষ্য রহিয়াছে। শাস্ত্র অথবা বহুজনদের মত বলে, যে, 'প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রে মিত্রবদাচরেৎ'। ষোল বছর বয়স হইলেই ছেলেকে আর 'খোকা' মনে করিবে না; কেননা, তখন তাহার গায়ে শক্তি হয় এবং ষোল বছর যাহার পুত্রের বয়স, তাহার শারীরিক শক্তি কমিবার সময় নিকটে আসিতে থাকে; কাজেই, সেই সময় পুত্রকে 'নিতান্ত বোকা', 'গাধা' ইত্যাদি বলিলে সে গায়ের জোরে বাপকে জব্দ করিয়া দিতে পারে।

সুতরাং প্রমাণ হইল যে, যেখানে গায়ের জোর বেশী দেখ, সেখানে তোমার বুদ্ধি যতই কেন বেশী হউক না, দেখাইতে চেষ্টা করিও না। বহু লোক যদি ভুল পথে চলিতে থাকে, তুমি ইচ্ছা করিলে তাহাদের সঙ্গে না চলিতে পার, কিন্তু গায়ে পড়িয়া পথ দেখাইতে যাইও না, কারণ, "মুখরস্তত্র হন্যতে"।

একজন একটা প্রসিদ্ধ সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছিলেন, যে, 'যে পণ্ডিত, তাহার সকলই গুণ, দোষের মধ্যে কেবল সে মূর্খ।' কথাটা একে-বারে মিথ্যা নয়। কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে যাঁহারা ব্যাসের মত বিশাল বুদ্ধি তাঁহারাও শিশুর মত ভুল করিয়া বসেন। সোক্রেটিসের, যীশুর ও মোহম্মদের লাঞ্ছনার কথা যাহারা জানেন, তাঁহারাও অনেক সময় একা হইয়া ও বহুর ভুল দেখাইতে অগ্রসর হয়েন। "দুঃসাহসে দুঃখ হয়;" ইহাদের ভাগ্যেও হয় তাহাই!

বাঙ্গালীকে যে বুদ্ধিমান্ বলে, তাহার অন্যতম কারণ সে কখনও এমন কর্ম্ম করে না। সে জানে "ন গণস্যাগ্রতো গচ্ছেৎ।" এটা আমাদের কম বড়াই-য়ের কথা নয়। রাষ্ট্রে বল, সমাজে বল, ধর্ম্মে বল, কর্ম্মে বল, সাহিত্যে বল, যা কিছুতে বল, দেখিবে বাঙ্গালী কখনও বহুর বিরুদ্ধে কথা কইতে চায় না। আগে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া দল পাকায়, পরে সভায় মুখ খুলে। যারা বলে বাঙ্গালীর অতীত ইতিহাস নাই, সে জানেনা বর্ত্তমানে বাঙ্গালী কত বড়। অতীতের

কবরে সে শব-সাধনা করুক, বর্ত্তমানে আমরা বড় একটা ছোট দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

বিশ্বের বিদ্যার সঙ্গে বাংলা বিদ্যা মিশিয়া কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় হইয়াছে, তাই নিয়া দেশে খুব উল্লাস দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপনা হয়, বিমাতার গৃহে সপত্নী পুত্রের স্থান হইয়াছে, ইহা আনন্দের কথা বই কি?

কিন্তু বাজারে যখন মারপিট আরম্ভ হয়, তখন যে ব্যক্তি কীল খাইতে আরম্ভ করে, সকলেই তার উপর দুই এক ঘা বসায়; তার পর অবশ্যই প্রশ্ন উঠে, 'ভাই সাহেব, ব্যাপার খানা কি? কেন ওকে মারিতেছ'। উৎসাহের নিয়মই এই,—তা সেটা সৎকর্ম্মের উৎসাহই হউক, আর অসৎকর্ম্মেরই হউক।

গৃহে সন্তান জন্মিলে সকলে মিলিয়া আগে চেঁচামেচি করে, উলুধ্বনি দেয়—তারপর জিজ্ঞাসা করে, কি হয়েছে, ছেলে না মেয়ে'? বাঙ্গালার অধ্যাপনা নিয়াও আমরা খুব একটা সোর গোল করিয়াছি। কিন্তু এখন জিজ্ঞাসা করিবার সময় আসিয়াছে, 'অধ্যাপনা হয় কি? না. শুধু একটা পরীক্ষা? আর সে অধ্যপনা বা পরীক্ষাটা কি বাংলা সাহিত্যের হয়, না ভাষার? বিশ্ববিদ্যালয় ত কয়েক খানা বইয়ের নাম করিয়া দেন as models of style অর্থাৎ রচনা পদ্ধতির আদর্শ স্বরূপ। অর্থাৎ ছেলেদিগকে একটু মাতৃভাষা লিখিতে শিখান ছাড়া, বিমাতা বিশ্ববিদ্যা আর বেশী কিছু চান না। একথা কিন্তু সকলেই জানে, তবুও বলে না; কেন না, বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনও 'ন গণস্যাগ্রতো গচ্ছেৎ'। আর, রচনার যে নমুনা দেখান হয়, সেটাও সাবেক কালের। এখন যারা বাংলা লেখে. তাদের রচনা অন্যরূপ। বিশ্ববিদ্যা ত আর বাংলা বিদ্যা নয়, সুতরাং ভুল হওয়া বিচিত্র নহে। ইহাও সকলেই জানে, অথচ বলে না; কারণ ঐ একই।

বাংলা ভাষায় এম এ পড়ান নিয়াও তেমনই একটা বাহবা বনাম 'ছিঃ ছিঃ' আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু কেহই বলিতে চায় না, এবং জানিতেও চায় না বিষয়টা কি।

এর পরেও যদি কেহ বলে, বাঙ্গালী গণতন্ত্র অর্থাৎ ডিমোক্রেসীর অনুপযুক্ত, তবে সে বাংলাদেশের কোনও খবরই রাখে না; কারণ, আমরা 'গণ' ভিন্ন আর কিছু জানি না; আমাদের শাস্ত্র বলে, 'ন গণস্যাগ্রতো গচ্ছেৎ।'

কেহ হয়ত এখন বলিবেন, 'এতক্ষণ ফেনাইয়া ফেনাইয়া বলা হইল কি না বাঙ্গালী মাঝে মাঝে সাহিত্য ও ভাষার এই দুইটার প্রভেদ ভুলিয়া যায়। এই টুকুর জন্য এত কথা বলার কি প্রয়োজন ছিল?' এরূপ যদি কেহ মনে করেন, তবে তাহাকে জয়দেব পড়িতে বলিব। জয়দেব বলেন 'বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধর'—উমাপতিধর কেবল কথা ফেনায়।

লেখকের যশোলিপ্সা।—মিল্টন মনে আছে? তিনি যশোলিপ্সাকে বলিয়াছেন, The last infirmity of noble minds বড় হৃদয়ের সকলের চেয়ে বড় দুর্ব্বলতা। তাহার দৃষ্টান্ত, অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাক ঢাকা সাহিত্য-পরিষদে যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন এবং যাহা 'প্রতিভার' বর্ত্তমান সংখ্যার প্রথমে গেল, তাহা 'সাহিত্যেও' ছাপাইয়াছেন। বেশী লোকে পড়িতে পাইল, সুতরাং ইহাতে শিষ্টাচারের কোন তর্ক নাই। যিনি 'বাচঃ পল্লবয়তি,' তিনিও এখানে স্তব্ধ হইলেন।

শ্রীউমাপতি ধর।

শিক্ষার ভাব ও বস্তু। বাংলা দেশে যে শিক্ষার খুব বিস্তার হইতেছে, তাহা সরকারী খাতাপত্রের নকল লইলেই বুঝা যাইবে। আগে যেখানে ছেলেটী এণ্ট্রান্স ইস্কুলে পড়ে বলিলেই ছেলের পক্ষে বড় সার্টিফিকেট হইত, এখন সেখানে শুধু ইস্কুলে পড়া দূরে থাকুক, এণ্ট্রাস পাশ করা হইলেও ছেলেরা রাস্তায় ঘাটে কুলী মজুরের দরেও বিকায় না। আর, আগে যেখানে বি এ পাশ করিলে লোকে দেখিতে যাইত মানুষটী কেমন, এখন সেখানে বি, এ পাশ করিয়া লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া দেখা দিলেও গ্রাসাচ্ছাদনের বন্দোবস্ত করিতে পারে না। সুতরাং খুব সহজেই প্রমাণিত হয় যে, শিক্ষার বেশ বিস্তার হইতেছে।

আর একটা লক্ষ্য করিবার জিনিস এই যে, যতই শিক্ষার বিস্তার হইতেছে, যতই ইহার আর্থিক মূল্য কমিতেছে। যতই ইহার নূতনত্ব কমিয়া যাইতেছে—লোকে ততই ইহার পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেছে, ততই এই শিক্ষার জন্য এক উৎকট লালসার সৃষ্টি হইতেছে। ইহার কারণ, দেশের লোকের একটা ধারণা জন্মিয়াছে, ইহা দ্বারা দেশের এবং নিজের প্রভূত উন্নতি হয়। কিন্তু মজার কথা এই যে, শিক্ষা সমাপ্ত হইলে নিজের যখন চল্লিশ টাকা মাহিনা হয়, তখন দেশের যে কি লাভ হয়, তাহা আর ভাবিবার ফুরসুৎ থাকে না।

ফেরু কুলের একটা রীতি আছে। একটা যদি সঙ্গীত আরম্ভ করে, তবে তখনই বাকী সকলে আর কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া তাহাতে যোগ দেয়। বাংলা দেশে

ফেরুর সংখ্যা ঠিক কত, কাগজ পত্র প্রস্তুত না হইলে বলা চলে না ; তবে, এটা ঠিক যে, সংখ্যাটা নিতান্ত কম নহে। আর, ক্রমবিকাশ শাস্ত্রের একটা অনুশাসন বোধ হয় এই যে, একই প্রকার আব্‌হাওয়ার মধ্যে যে সকল উদ্ভিদ্ বা প্রাণীর উৎপত্তি ও স্থিতি হয়, তাহাদের সকলের মধ্যেই কোন কোন গুণ বা ধর্ম্ম সাধারণ থাকে। সুতরাং বাংলা দেশের ফেরুর সঙ্গে সেই দেশের মানুষের যেমন প্রভেদ আছে, তেমনই সাম্যও যে না আছে, তাহা নয়। এবং এই জন্যই গণতন্ত্রবাদী বাঙ্গালী একলা কিছু ঠিক করিতে না পারিলেও গোলে হরিবোল বলিতে ছাড়ে না।

কে যেন একজন সুর ধরিয়াছিল, শিক্ষায় দেশের খুব লাভ হইতেছে ; আর সেই অবধি দেশ শুদ্ধ লোকে ঐ সুরই ধরিয়া আছে, এবং কেহ একটু কিছু বদলাইতে বলিলেই তাহাকে শিক্ষার শত্রু মনে করা হয়। ইহা তাজ্জবের ব্যাপার সন্দেহ নাই ; কিন্তু তথাপি সত্য। সুর টানিবার সময় কেহ যদি গায়ককে ডাক দিয়া বলিতে যায় যে, তাহার তালে কিংবা মানে কিংবা লয়ে ভুল হইতেছে, তাহা হইলে গায়কের সমাধি ভঙ্গ হয় বটে, কিন্তু তাহার কোন অপকার হয় না ; এবং যে উহা করে, তাহাকে শত্রু মনে করিবার কোন ন্যায্য কারণ গায়কের নাই।

মুচি বলিয়াছিল, চামড়ার মত আর কোন জিনিসই নয় ; আমরা ও সুর ধরিয়া আছি, শিক্ষার মত আর কিছু নাই। এখন যদি কেহ বলে, সুর ঠিক হইতেছে না, কোনও জায়গায় ভুল হইতেছে, তবে তাহাকে রাক্ষসকুলে বিভীষণ মনে করিবার কোনই হেতু নাই। তাহারও ভুল হইতে পারে, কিন্তু আমাদেরও যে পারে, একথা মনে রাখিব না কেন ?

জিনিসের মূল্য নিরূপণ করিবার একটা মাপক থাকে। মানুষের জীবনের পক্ষে কোন জিনিসের কি মূল্য তাহা তাহার সমগ্র জীবনের উপর সেই জিনিসের কার্য্য দেখিয়া ঠিক করিতে হয়। শিক্ষার বেলায়ও এই নিয়ম খাটে। শিক্ষাও 'ফলেন পরিচীয়তে'। রাজবাড়ীতে নিমন্ত্রিত ক্ষুধার্ত্ত ভিক্ষুকের মত আমরা 'আরও চাই' 'আরও চাই' হাঁকিতেছি বটে, কিন্তু আমরা ভাবিবার অবসর পাইতেছি না যে, ইহাদ্বারা বাস্তবিক আমাদের দেহের পুষ্টি হইবে, না উদরাময়ের সৃষ্টি হইবে।

শিক্ষার যে দুইটা স্তর আছে, এই কথাটাই আদৌ আমাদের গোল হইয়া যায়। আগে যখন এদেশে সংস্কৃত ভাষায়ই সকল শিক্ষা দেওয়া হইত, তখন ব্যাকরণের জ্ঞানটা সকলেরই অপরিহার্য্য ছিল। কাব্যই পড়ুক, আর কবিরাজীই পড়ুক আর দর্শনই পড়ুক, ব্যাকরণ জানাটা ছেলের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক ছিল। কতকটা জ্ঞান আছে, যাহা সকলেরই প্রয়োজন। দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান মূঢ়েরও দরকার ; কোন্‌টা আহার্য্য আর কোন্‌টা নয়, এ জ্ঞানটা পশু পক্ষীরও দরকার। কিন্তু আবার এমন জ্ঞান ও আছে যাহা সকলের কাজে আসে না। এই জন্য শিক্ষা বা জ্ঞানদানের দুইটা শ্রেণী ভাগ করা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় শুধু এমন সাধারণ জ্ঞান দেওয়া হয়, যাহা মানুষের জীবনে সর্ব্বদা কাজে আসে ; আর উচ্চ স্তরে এমন শিক্ষা দেওয়া হয় যাহার দরকার শুধু বিশিষ্টদের। এ কথাটা আমাদের প্রায়ই গোল হইয়া যায় এবং সেই জন্যই আমরা যে পরিমাণে ইস্কুল চাই, কলেজ ও তার অনুপাতে চাই। যেন, পথে ঘাটে কলেজ হইলেই দেশ উন্নত হইল। শিক্ষার সোজা রাস্তা যেমন বরাবর উপর দিকে যাইবে, তেমনই যাহারা অত উপরে উঠিবার যোগ্য নয়, তাহাদের সরিয়া পড়িবার জন্য ডাইনে বামে অলিগলিও থাকা দরকার। এখন আমরা করিতেছি কি ? সকলকেই উপর দিকে ঠেলিয়া তুলিবার বৃথা চেষ্টায় উচ্চকে পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া নীচু করিয়া লইতেছি। উচ্চ-শিক্ষাকে সংক্ষিপ্ত সার করিয়া রবি বাবুর 'তোতা পাখী' সৃষ্টি করিতেছি।

এই হইল একটা ভুল। আর উচ্চ শিক্ষার বিচারের সময় আমরা কত যে ভুল করি, তাহার অন্ত নাই। সত্য সত্যই মনে কোন ভাবনা, কোন আদর্শের চিন্তা আমাদের আছে কিনা, জানি না। কাজ দেখিয়া মনে হয়, যেন, আমরা কতকগুলি কথার মানে জানিলেই পণ্ডিত মনে করিতে প্রস্তুত। জ্ঞানলিপ্সা মানুষের একটা বিশিষ্ট প্রবৃত্তি ; ইহার পরিতৃপ্তিতে সব সময় পয়সা না পাওয়া গেলেও হানি কিছু নাই। এবং শব্দের জ্ঞানও কখনও কাহারও ঘর বাড়ী ভাঙ্গিয়া দেয় না। শব্দের অর্থ ছাড়া উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয় আছে, বিকাশ ও পরিবর্ত্তন আছে, এবং কাজেই ইতিহাসও আছে। সুতরাং শব্দজ্ঞান জিনিসটা মন্দ নয়। কিন্তু আমাদের ভুল হয় শব্দজ্ঞানকে বস্তুজ্ঞান মনে করি বলিয়া—অথবা শব্দজ্ঞানকে বস্তুজ্ঞানের চেয়ে বড় মনে করি বলিয়া। এরূপ যে করি, তাহার প্রমাণ—আমাদের শিক্ষাপ্রণালীতে মুখস্থ করার প্রাবল্য বেশী।

এ সব পুরাণ কথা, প্রায় সকলেই জানে এবং অনেকেই বলে। কিন্তু একটা ভুল আমরা করিয়া

আসিতেছি, যাহা সব সময় চোখে পড়ে না; কারণ ইহা অতি সূক্ষ্ম ভুল—অর্থাৎ সূক্ষ্ম বিষয়ে ভুল;—এবং ভুলের বেলায় যদি 'গভীর' বিশেষণ অপ্রযোজ্য না হয়, তবে বলিব—ইহা অতি গভীর ভ্রান্তি।

আমরা জ্ঞানের দিক্‌টায় যত দৃষ্টি দেই, ভাবের দিকে তত দেই না। ভাব-সৃষ্টির কথা বলি না; এটা ভাব-প্রবণ দেশ, কাজেই ভাবের অভাব নাই। এদেশের নদী যেমন সহজেই উপচিয়া উঠিয়া দেশ ভাসাইয়া দেয়, ভাবের গাঙ্গেও তেমনই সহজেই জোয়ার আসিয়া থাকে। 'স্বদেশী'ই বল আর বিদেশীই বল, ধর্ম্মই বল আর পাপই বল, ভাবের বন্যা যখন ছুটে, তখন সমস্ত দেশ ভাসাইয়া দিয়া তবে ক্ষান্ত হয়। চৈতন্য-যুগ হইতে স্বদেশী যুগ পর্য্যন্ত কত যে ভাবের বন্যা এ দেশের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, তাহার ইতিহাস এখনও সঙ্কলিত হয় নাই। সুতরাং ভাব যে এদেশে আছে এবং খুব প্রবল ভাবেই আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যাহা নাই তাহা ভাবের শিক্ষা।

কোন্ ভাব কি পরিমাণে থাকা উচিত, কোন্ ভাব একেবারেই থাকা উচিত না, এবং সকল ভাবেরই যে সংযম আবশ্যক,—এই কথাটা বাংলাদেশের লোকে ভাবিতে চায় না। আর আমরা ইহাও মনে রাখি না যে, আমাদের মনে যে ভাব আপনা হইতেই জাগে না চেষ্টা করিয়া হইলেও তাহা জাগাইয়া দেওয়া দরকার হইতে পারে। দৃষ্টান্ত না হইলে কথাটা পরিষ্কার হইবে না।

ধর্ম্ম ভাবটা যে ভাল, এ কথা কে না বলিবে? কিন্তু ইহারও যে সংযম প্রয়োজন—অন্ততঃ অন্য সব ভাব বিলোপ করিয়া যে কেবল ইহাকেই পুষ্ট হইতে দেওয়া উচিত নয়, একথা সকলে বলে কি? যারা একান্ত ধর্ম্ম-ভাবাপন্ন, অর্থাৎ ধর্ম্ম যাহাদের নেশা হইয়া গিয়াছে, অন্যান্য নেশার কতক কতক দোষ যে তাহাদের সংক্রামিত হইবে, তাহা আমাদের জানা উচিত। ধর্ম্মোন্মাদের চিকিৎসা বিষ্ণুতৈল দ্বারা না হইতে পারে, কিন্তু তথাপি উন্মাদের অনেক লক্ষণ তাহাতে বর্ত্তমান থাকে। তাহার প্রধান একটী সমাজের প্রতি অবজ্ঞা—আর দশজনের মতে অনাস্থা এবং সেই হেতু চরিত্রনীতিতে অবহেলা। ধর্ম্মের চর্চ্চাটা যারা অতি মাত্রায় করে, তারা অনেক সময় মনে করে, খোদার সঙ্গে তাহাদের গোপনে একটা সন্ধি হইয়া গিয়াছে; অতঃপর তারা মানুষের সঙ্গে যে ভাবেই ব্যবহার করুক না কেন, ভগবান্ তাহাদের সহায় হইবেন। মধ্যযুগে ইউরোপের পাদ্রীরা তাহাই মনে করিত—অন্য দেশেও এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

এই গেল—আছে যে ভাব তাহার সংযমের কথা। নাই যে ভাব তাহাও যে সৃষ্টি করিতে হয়,—ইহাও স্মর্ত্তব্য। যেমন ভক্তি। সকল জাতির মধ্যেই ইহা সমান পরিমাণে থাকে না, এবং এমন জাতিও আছে যাহার ইহা একেবারেই নাই। পশুপক্ষীর যে ভক্তি নাই, তাহার প্রমাণ দুর্লভ নহে। আর একটী ভাব দেশাত্মবোধ। এমন অনেক জাতি এখনও পৃথিবীতে দেখা যায়, যাহাদের এই জিনিসটার অভাব রহিয়াছে। তাহাকে জাতি না বলিয়া জন-সমষ্টি বলাই বোধ হয় অধিক সঙ্গত। আর একটা জিনিস সৌন্দর্য্য বোধ। লেখায় পড়ায়, অশনে বসনে চলনে, যে একটা সৌন্দর্য্য—যে একটা graceful-ness থাকিতে পারে এবং থাকা উচিত—ইহা সকল জাতি সমান বুঝে না। গ্রীকদের সৌন্দর্য্যবোধের কথা কত শুনি! তাহাদের সাহিত্যে ও শিল্পে সৌন্দর্য্য—আকৃতির পারিপাট্য—কেমন ফুটিয়া আছে। আর ফরাসী দেশ ফ্যাশনের দেশ। দর্শনের গূঢ়তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে বসিয়া ফরাসীরা সুন্দর করিয়া বলার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে।

বাঙ্গালীর যে এই সকল একেবারেই নাই—এমন বলা কঠিন। সকলেরই যে আছে এমনও নয়। সুতরাং শিক্ষায়—এই সকলের কথা ভাবা উচিত। আর বাস্তবিক সাহিত্যচর্চ্চার ত ইহাই একটা বড় উদ্দেশ্য। আমরা কিন্তু সাহিত্যচর্চ্চা করিতে গিয়া শব্দের অর্থই বেশী করিয়া শিখি।

মনে হয়, সময় আসিয়াছে, যখন আমরা বিশেষ করিয়া ভাবিব, কিসে শিক্ষিতের মনে যথাযোগ্য ভাব সমূহ যথেষ্ট পরিমাণে উদ্দীপ্ত হইবে, কিসে তাহাদের পরস্পর সামঞ্জস্য রক্ষিত হইবে এবং কিসে শিক্ষিতের জীবনে সৎ, সুন্দর এবং শিবের সমন্বয় ঘটিবে।

ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ

পঞ্চম সাংবৎসরিক কার্য্যবিবরণী

সন ১৩২২।

১৩১৮ সনে ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ প্রথম সংস্থাপিত হয়। সুতরাং ১৩২২ সনের চৈত্র মাসে পরিষদের পঞ্চম বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। উক্ত সনে পরিষদের সভ্য সংখ্যা এইরূপ ছিল:—

আজীবন সভ্য——১০
সাধারণ সভ্য———৩২২
ছাত্র সভ্য————১৯
বিশিষ্ট সভ্য———১

৩৫৩

১৩২২ সনে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ পরিষদের আজীবন সভ্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন:-

(১) শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী।
(২) ,, জগদীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
(৩) ,, সারদাচরণ ঘোষ।
(৪) ,, মিঃ জে, এন, রায়।

পরিষদের সভাপতি দেশমান্য শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস বার-এট-ল মহাশয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও প্রতিমাসে ৫০৲ টাকা করিয়া অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। ১৩২১ সনে মোট সভ্য সংখ্যা ছিল ৩৮৬; আলোচ্য বর্ষে ঐ সংখ্যা কিঞ্চিৎ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। যাঁহাদের চাঁদা বাকী পড়িয়াছিল তাঁহাদের নাম কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন যাঁহারা ভি পি ফেরৎ দিয়াছিলেন তাঁহাদের নামও সভ্যতালিকা হইতে অপসৃত করা হইয়াছে। কিন্তু সভ্য সংখ্যা কিঞ্চিৎ হ্রাস প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও পরিষদের মোটের উপর আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহার কারণ এই যে, সভ্যবর্গের চাঁদা এ বৎসর অধিকতর নিয়মিতরূপে আদায় হইয়াছে। নিয়মিতরূপে চাঁদা আদায়ের জন্য এবৎসর বিবিধ উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির নির্দ্ধারণ অনুসারে মফঃস্বলস্থ সভ্যগণের নামে বর্ষশেষে ভিপি না পাঠাইয়া প্রত্যেক তিন মাসের জন্য অগ্রিম ভি পি পাঠান হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত এই বৎসরের শেষভাগে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সম্মতি মতে অতিরিক্ত আদায়ের জন্য পিয়নের নির্দ্দিষ্ট বেতন ভিন্নও পিয়নকে একটা কমিশন দেওয়া হইয়াছে। এই সমস্ত কারণে উক্ত বৎসর আদায়ের কার্য্য অধিকতর সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

আলোচ্য ১৩২২ সনের আয়-ব্যয় এইরূপ হইয়াছিল:—

মোট প্রাপ্তি———২২৫৬৷/৬ পাই
মোট ব্যয়————১৩৫৩৲

উদ্বৃত্ত ৯০৩৷/৬ পাই মাত্র

১৩২১ সনে আয় ব্যয় এইরূপ ছিল:—

মোট প্রাপ্তি———১৫৬০৷৷৶৯ পাই
মোট ব্যয়———১০৮৬৷৶৬ পাই

উদ্বৃত্ত ৪৭৪৷৩ পাই মাত্র

[illegible] দেখা যাইতেছে যে ১৩২১ সন অপেক্ষা ১৩২২ সনে মোট প্রাপ্তি অনেক অধিক হইয়াছে। [illegible] অপেক্ষা ১৩২২ [illegible] খরচও বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হইবে; কিন্তু

৮ম বর্ষ | আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩২৫ | ৬ষ্ঠ-৭ম সংখ্যা

শ্রাদ্ধে শ্রব্য পাঠ।

(আখ্যান)

ওঁ যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু
যো বিশ্বং ভুবন মাবিবেশ।
যো ওষধিষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ ॥

শ্রাদ্ধে পবিত্র অন্ন পানীয় উৎসর্গের যেরূপ ব্যবস্থা শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে, তদ্রূপ পিতৃলোকের তৃপ্তির নিমিত্ত শাস্ত্র নানা প্রকার মনোরঞ্জক, উপদেশব্যঞ্জক এবং জ্ঞানবর্দ্ধক বিষয় শ্রবণ করাইবার জন্যও আদেশ দিয়াছেন। শ্রাদ্ধ সময়ে কি কি বিষয় পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য তৎসম্বন্ধে শ্রীশ্রীমনু মহারাজ বলিতেছেন,—

"স্বাধ্যায়ং শ্রাবয়েৎ পিত্র্যে ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চৈব হি। আখ্যানানীতিহাসাংশ্চ পুরাণান্যখিলানি চ ॥ ২৩২ ॥" *

মনুসংহিতা, তৃতীয়াধ্যায়ে ॥

অর্থাৎ শ্রাদ্ধে বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, আখ্যান, ইতিহাস এবং সমগ্র পুরাণ শ্রবণ করাইতে হয়। এই অনুশাসন অনুসারে শ্রাদ্ধে বেদের "মধুবাতা" ইত্যাদি মন্ত্র, গায়ত্রী, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার দুই একটি শ্লোক, মহাভারতের "দুর্য্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ" ইত্যাদি, "বিরাটপর্ব্ব," শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রভৃতি পঠিত হইয়া থাকে। ঐ সকল পাঠের সাধারণ নাম "শ্রব্য পাঠ"। যজুর্ব্বেদীয় কঠোপনিষদের প্রথমাধ্যায় অর্থাৎ নচিকেতার উপাখ্যান শেষেও কথিত হইয়াছে,—

"নাচিকেতমুপাখ্যানং মৃত্যুপ্রোক্তং সনাতনম্।

* "পুরাণানি খিলানি চ"—পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। "খিল" শব্দে কেহ কেহ শ্রীসূক্ত, শিবসঙ্কল্পাদি শুনাইবার ব্যবস্থা দেন।

উক্ত। শ্রুত্বা চ মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥১৬॥
য ইমং পরমং গুহ্যং শ্রাবয়েদ্ ব্রহ্মসংসদি।
প্রযতঃ শ্রাদ্ধকালে বা তদানন্ত্যায় কল্পতে
তদানন্ত্যায় কল্পত ইতি ॥১৭॥"

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই ঔপনিষদিক উপাখ্যানও শ্রাদ্ধে পাঠ করা কর্ত্তব্য। সাধারণতঃ শ্রাদ্ধে কিন্তু এই উপাখ্যান পড়া হয় না; তাহার পরিবর্ত্তে—
"ওঁ সপ্তব্যাধা দশার্ণেষু মৃগাঃ কালঞ্জরে গিরৌ।
চক্রবাকাঃ শরদ্বীপে হংসাঃ সরসি মানসে ॥
তেঽভিজাতাঃ কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
প্রস্থিতা দূরমধ্বানং যূয়ং তেভ্যোঽবসীদত ॥"

এই দুইটি শ্লোক পাঠ করা হইয়া থাকে। প্রচলিত ছাপার পুথিগুলিতেও এই শ্লোক দুইটি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহার উপাখ্যান কি, তাহা পুথিতেও পাওয়া যায় না এবং শ্রাদ্ধে তাহা শুনানও হয় না। পুরোহিত ঠাকুরেরাও "যথাদৃষ্ট" পাঠ করিয়া যান এবং জিজ্ঞাসা করিলে কোনও সদুত্তর দিতে পারেন না। কলিকাতা "ভিক্টোরিয়া" প্রেসের অধিকারী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয় আজ কয়েক বৎসর হইতে "আহ্নিক-কৃত্যম্" নাম দিয়া পুরোহিতগণের ব্যবহারের এক পুস্তক ছাপাইতেছেন। ঐ পুস্তকের চতুর্থ এবং পঞ্চম খণ্ডে অন্যান্য বিষয়ের সহিত শ্রাদ্ধ-বিধি প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহার ১৮২ পৃষ্ঠায় যথারীতি শ্রব্যপাঠের মধ্যে ঐ শ্লোক দুইটি উদ্ধৃত হইয়াছে। পণ্ডিত মহাশয় ঐ শ্লোক দুইটির সম্বন্ধে পাদটীকায় বলিয়াছেন,

"কোনও মুনির সাতজন শিষ্য ঐ মুনির গোচারণ করিতে গিয়া মাংসাষ্টকা শ্রাদ্ধদিন উপস্থিত দেখিয়া শ্রাদ্ধলোপভয়ে গুরুরই একটি গাভীহরণ পূর্ব্বক তাহাকে বধ করিয়া ঐ শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহাতে গুরু তাঁহাদিগকে শাপ প্রদান করেন যে 'তোমরা সাতজন দশার্ণ দেশে ব্যাধ হইয়া জন্মিবে, তারপর কালঞ্জর পর্ব্বতে হরিণ হইবে, তারপর শরদ্বীপে চক্রবাক হইবে, পরে মানস-সরোবরে হংস হইবে, তারপর সেই তোমরা কুরুক্ষেত্রে বেদপারগ ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মিয়া (তীর্থপর্য্যটনার্থে) দূরপথে গমন করিয়া সেই সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবে। [এতাবতা শিষ্যদিগের গুরুশাপ উপেক্ষা করিয়া শ্রাদ্ধ করায় শ্রাদ্ধের মাহাত্ম্য উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে]"

শ্রীযুক্ত কবিরত্ন মহাশয় এই উপাখ্যান কোথায় পাইয়াছেন, তাহা লেখেন নাই এবং এরূপ গোধনাপহারী এবং গোঘাতক শিষ্যগণের দ্বারা "শ্রাদ্ধমাহাত্ম্য" কিরূপে উদ্‌ঘোষিত হইল, তাহাও তিনি প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতের পুস্তকেও এই শ্লোক দুইটির প্রকৃত তত্ত্ব দেখিতে না পাইয়া আমরা কুতুহলপ্রযুক্ত মূল পুরাণাদিতে অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হই এবং আমাদের অনুসন্ধানের ফল পাঠক-মহাশয়দিগের নিকট নিবেদন করিতেছি। আশা করি ইহা তাঁহাদের বিশেষ বিরক্তি উৎপাদন করিবে না।

অগ্নিপুরাণের "শ্রাদ্ধকল্পবিবেক-কথন" নামক ১১৭ তম অধ্যায়ে—ঐ "সপ্তব্যাধা" প্রভৃতি দুইটি শ্লোকের পর লিখিত আছে,—

"শ্রাদ্ধাদৌ পঠিতে শ্রাদ্ধং পূর্ণং স্যাদ্‌ব্রহ্মলোকদম্।" *

অর্থাৎ শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে (অথবা শ্রাদ্ধাদিতে) ঐ শ্লোকদ্বয় পাঠ করিলে শ্রাদ্ধ সম্পূর্ণ হয় এবং ব্রহ্মলোকরূপ ফল প্রদান করে। এই অগ্নিপুরাণেও কিন্তু কোন উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে মৎস্য মহাপুরাণে এ সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত আখ্যায়িকা আছে,—আমরা বঙ্গানুবাদের সহিত সেই আখ্যায়িকাটি উদ্ধৃত করিতেছি:—‡

সূত বলিলেন,—

"রতিশক্তি, সুন্দরী স্ত্রী, উত্তম ভক্ষ্য ভোজ্য এবং

* "বঙ্গবাসী" সংস্করণ।

‡ সূত উবাচ। রতিশক্তিঃ স্ত্রিয়ঃ কান্তা ভোজ্যং ভোজনশক্তিতা।
দানশক্তিঃ সবিভবা রূপমারোগ্যমেব চ ॥১॥

তৎসমুদয়ের আহারশক্তি, প্রচুর ধনসম্পত্তি ও দানশক্তি, রূপ, আরোগ্য,—এই সমুদয় সৌভাগ্য শ্রাদ্ধরূপ কল্পতরুর ফুল এবং ব্রহ্মলাভই উহার মহান্ ফল। পিতৃগণ শ্রাদ্ধে প্রীত হইলে মনুষ্যগণকে আয়ু, পুত্র, ধন, বিদ্যা, রাজ্য, সুখ, স্বর্গ এবং মোক্ষ, অর্থাৎ ইহলোক অথবা পরলোকে মানুষের যত কিছু প্রার্থনার বিষয় থাকিতে পারে সমস্তই,—প্রদান করেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে পূর্ব্বকালে কৌশিক নামক এক মহর্ষির পুত্রগণ ক্রমশঃ পাঁচজন্মের পর ভগবান্ বিষ্ণুর পরমপদ—অর্থাৎ মোক্ষ—লাভ করিয়াছিলেন।

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কৌশিক ঋষির পুত্রগণ কি প্রকারে উত্তম যোগ সমূহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং কিরূপেই বা পঞ্চম জন্মে তাঁহাদের কর্ম্মক্ষয় হইল ?

সূত বলিলেন,—

"কুরুক্ষেত্রে কৌশিক নামে এক ধর্ম্মাত্মা মহর্ষি বাস করিতেন; তাঁহার সাতটি পুত্র ছিল, ঐ সকল পুত্রের কর্ম্মানুযায়ী সপ্তনাম ছিল,—যথা স্বসৃপ, ক্রোধন, হিংস্র, পিশুন, কবি, বাগ্দুষ্ট এবং পিতৃবর্ত্তী। এই সাতজনের সকলেই গর্গ মুনির শিষ্য ছিলেন। তাঁহাদের পিতার পরলোক গমনের পর তাঁহাদের দেশে অতি উৎকট দুর্ভিক্ষ এবং সর্বলোক বিনাশিনী মহতী অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইল। সেই সপ্ত ভ্রাতা গর্গঋষির আদেশানুসারে অরণ্যে গুরুর গাভী রক্ষায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং অনশন জনিত ক্ষুধায় আকুল হইয়া সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিলেন, 'দেখ, আমরা সকলেই ক্ষুধায় অ[illegible] হইয়াছি, এস আমরা সকলে মিলিয়া গুরুর এই কপিলা গাভীটিকে খাই'। ভ্রাতৃগণের এইরূপ পাপজনক পরামর্শের কথা শুনিয়া সর্ব কনিষ্ঠ ভাইটি বলিলেন, 'যদি এই কপিলাটিকে একান্তই বধ করিতে হয়, তবে এস ইহাকে মারিয়া পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করি; যদি এই গাভীটিকে শ্রাদ্ধের জন্য বধ করা হয়, তাহা হইলে ইনি নিশ্চয়ই আমাদিগকে পাপ হইতে উদ্ধার করিবেন।' পিতৃবর্ত্তীর কথায় সকলে 'তাহাই কর' এইরূপ অনুমতি প্রদান করিলে, পিতৃবর্ত্তী গাভীটিকে মারিয়া সকল ভ্রাতার সহিত মিলিত হইয়া শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিলেন। পিতৃবর্ত্তী দেবপক্ষে দুইভ্রাতাকে ও পিতৃপক্ষে তিনভ্রাতাকে শ্রাদ্ধভোজী ব্রাহ্মণরূপে নিযুক্ত করিয়া এক ভ্রাতাকে শ্রাদ্ধযজ্ঞের অতিথি পরিকল্পনা করিলেন এবং নিজে শ্রাদ্ধকর্ত্তা সাজিলেন। এবং শাস্ত্রমত মন্ত্র পড়িয়া যথাবিধি শ্রাদ্ধ সমাধা করিলেন। পরে সকলে মিলিয়া মাতৃহীন বৎসটিকে সঙ্গে লইয়া গিয়া গুরুকে বলিলেন, "গাভীটিকে বাঘে মারিয়াছে, বৎসটিকে লউন।" সেই সপ্ত তপোধন বৈদিক কার্য্য করিয়াছেন ভাবিয়া নির্ভয়ে এইরূপ নিষ্ঠুর কর্ম্ম অবলম্বন করিয়া গুরুর গাভীটিকে মারিয়া খাইয়া ফেলিলেন। কিন্তু এইরূপ ক্রূরকার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা মৃত্যুর পর সকলেই পরজন্মে দাসপুরে নিষ্ঠুরকর্ম্মা ব্যাধ

শ্রাদ্ধপুষ্পমিদং প্রোক্তং ফলং ব্রহ্মসমাগমঃ।
আয়ুঃ পুত্রান্ ধনং বিদ্যাং স্বর্গং মোক্ষং সুখানি চ।
রাজ্যঞ্চৈব প্রযচ্ছন্তি প্রীতাঃ পিতৃগণা নৃণাম্॥১১॥
শ্রূয়তে চ পুরা মোক্ষং প্রাপ্তাঃ কৌশিকসূনবঃ।
পঞ্চভির্জন্মসম্বন্ধৈর্গতা বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ॥১২॥
(একোনবিংশ অধ্যায়। মৎস্য পুরাণ)

ঋষয় ঊচুঃ। কথং কৌশিকদায়াদাঃ প্রাপ্তাস্তে যোগমুত্তমম্।
পঞ্চভির্জন্মসম্বন্ধৈঃ কথং কর্ম্মক্ষয়ো ভবেৎ ॥১॥
সূত উবাচ। কৌশিকো নামো ধর্মাত্মা কুরুক্ষেত্রে মহানৃষিঃ।
নামতঃ কর্মতস্তস্য সুতান্ সপ্ত নিবোধত ॥২॥

স্বসৃপঃ ক্রোধনো হিংস্রঃ পিশুনঃ কবিরেব চ।
বাগ্দুষ্টঃ পিতৃবর্ত্তী চ গর্গশিষ্যাস্তদা [illegible]॥৩॥
পিতর্য্যুপরতে তেষামভূদ্ দুর্ভিক্ষমুল্বণম্।
অনাবৃষ্টিশ্চ মহতী সর্বলোকভয়ঙ্করী ॥৪॥

দিগের গৃহে ব্যাধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন; এবং পিতৃভক্তি পরায়ণ হইয়া শ্রাদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে এই গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন বলিয়া সেই পুণ্যে তাঁহারা সকলেই জাতিস্মর হইলেন। গতজন্মের কথা স্মরণ হওযায় তাঁহারা সকলেই বৈরাগ্যযোগ অবলম্বন করিয়া অনশনব্রত দ্বারা দেহত্যাগ করিলেন এবং পুনশ্চ কালঞ্জর পর্বতে সাতটি জাতিস্মর মৃগ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। হরিণদেহেও তাঁহাদের মনে পূর্ব দুই জন্মের সমুদয় কথাই স্মরণ হওয়ায় এ জন্মেও পিতৃভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে জ্ঞান এবং বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া সর্বদা ভগবান্ নীলকণ্ঠের সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে সকল লোকের অজ্ঞাতে তীর্থস্থানে অনশনব্রত যোগে প্রাণত্যাগ করিলেন ও সেই সপ্তযোগী আবার মানস সরোবরে সাতটি চক্রবাক হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। তথায় তাঁহাদের কর্মানুযায়ী এই সকল নাম হইল,—যথা—সুমনা, কুমুদ, শুদ্ধ, ছিদ্রদর্শী, সুনেত্রক, সুনেত্র, এবং অংশুমান্।—ইহারা সকলেই যোগবিৎ হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে অল্পজ্ঞানবান্ তিন জন যোগভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীর নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং তাঁহারা একদা মহাবল পরাক্রম পঞ্চালরাজ বিভ্রাজকে তাঁহার দুই মন্ত্রীর সহিত নিজ অন্তঃপুরোদ্যানে নারীগণের সহিত নানাভাবে ক্রীড়া করিতে দেখিলেন। সেই চক্রবাকত্রয়ের মধ্যে যিনি পূর্বজন্মে পিতৃভক্ত শ্রাদ্ধকারী পিতৃবর্ত্তী ব্রাহ্মণ নামে বিদিত ছিলেন, তিনি এই পৃথিবীতে রাজ্যেশ্বর রাজা হইবার বাসনা করিলেন এবং তাঁহার আর দুই ভ্রাতা মন্ত্রীত্ব পাইবার কামনা করিলেন। যে চারিটি চক্রবাক নিষ্কাম অবস্থায় মানস সরোবরে ছিলেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং যোগভ্রষ্ট তিন জনের মধ্যে পিতৃবর্ত্তী স্বীয় কামনানুরূপ পঞ্চালরাজ বিভ্রাজের পুত্র ব্রহ্মদত্ত হইয়া এবং অপর দুই ভ্রাতা দুই মন্ত্রিপুত্র—পুণ্ডরীক এবং সুবালক—হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মদত্ত যথাসময়ে পণ্ডিত পুরোহিত দ্বারা পঞ্চাল রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। মহারাজ ব্রহ্মদত্ত

গর্গাদেশাদ্বনে দোগ্ধ্রীং রক্ষন্তস্তে তপোধনাঃ।
খাদামঃ কপিলা মেতাং বয়ং ক্ষুৎপীড়িতা ভৃশম ॥৫॥
ইতি চিন্তয়তাং পাপং লঘুঃ প্রাহ তদানুজঃ।
যদ্যবশ্যমিয়ং বধ্যা শ্রাদ্ধরূপেণ যোজ্যতাম ॥৬॥
শ্রাদ্ধে নিযোজ্যমানেয়ং পাপাৎ ত্রাসান্তি নো ধ্রুবম।
এবং কুর্ব্বিত্যনুজ্ঞাতঃ পিতৃবর্ত্তী তদানুজৈঃ ॥৭॥
চক্রে সমাহিতঃ শ্রাদ্ধ মুপযুজ্য চ তাং পুনঃ।
দ্বৌ দৈবে ভ্রাতরৌ কৃত্বা পিত্র্যে ত্রীনপ্যনুক্রমাৎ ॥৮॥
তথৈকমতিথিং কৃত্বা শ্রাদ্ধদঃ স্বয়মেব তু।
চকার মন্ত্রবজ্জুহ্বৎ স্মরন পিতৃপরায়ণঃ ॥৯॥
বিনা গবা বৎসকাঽপি গুরবে বিনিবেদিতঃ।
ব্যাঘ্রেণ নিহতা ধেনুর্বৎসোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥১০॥
এবং সা ভক্ষিতা ধেনুঃ সপ্তভিস্তৈস্তপোধনৈঃ।
বৈদিকং বলমাশ্রিত্য ক্রূরে কর্মণি নির্ভয়া ॥১১॥
ততঃ কালাবরুদ্ধাস্তে ব্যাধা দাসপুরে হভবন্।
জাতিস্মরত্বং প্রাপ্তাস্তে পিতৃভাবেন ভাবিতাঃ ॥১২॥
যৎকৃতং ক্রূরকর্মাপি শ্রাদ্ধরূপেণ তৈস্তদা।
তেন তে ভবনে জাতা ব্যাধানাং ক্রূরকর্মিণাম্ ॥১৩॥
পিতৄণাঞ্চৈব মাহাত্ম্যাজ্জাতা জাতিস্মরাস্তু তে।
তে তু বৈরাগ্যযোগেন আস্থায়ানশনং পুনঃ ॥ ১৪ ॥
জাতিস্মরাঃ সপ্তজাতা মৃগাঃ কালঞ্জরে গিরৌ।
নীলকণ্ঠস্য পুরতঃ পিতৃভাবমনুভাবিতা ॥ ১৫ ॥
তত্রাপি জ্ঞানবৈরাগ্যাৎ প্রাণানুৎসৃজ্য ধর্মতঃ।
লোকৈরবেক্ষ্যমানাস্তে তীর্থান্তে হনশনেন তু ॥ ১৬ ॥
মানসে চক্রবাকাস্তে সঞ্জাতাঃ সপ্তযোগিনঃ।
নামতঃ কর্মতঃ সর্বান শৃণুধ্বং দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ১৭ ॥
সুমনাঃ কুমুদঃ শুদ্ধশ্ছিদ্রদর্শী সুনেত্রকঃ।
সুনেত্রাশ্চাংশুমাংশ্চৈব সপ্তৈতে যোগপারগাঃ ॥ ১৮ ॥

মহাবলপরাক্রান্ত, সর্বশাস্ত্রবিশারদ, যোগজ্ঞ এবং সর্বজন্তুর কথাবার্ত্তা বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আর প্রথম জন্মে কৌশিকপুত্র পিতৃবর্ত্তী নিজ গুরু গর্গঋষির যে কপিলা গাভীটিকে বধ করিয়া পিতৃকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, সেই কপিলা পিতৃকার্য্যে আত্মসমর্পণরূপ পুণ্যহেতু সন্নতি নামে দেবলরাজার সর্বাঙ্গসুন্দরী এবং ব্রহ্মবাদিনী কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,—এইজন্মে তাঁহার সহিতই মহারাজ ব্রহ্মদত্তের—প্রথম-জন্মের কৌশিকপুত্র পিতৃবর্ত্তীর—বিবাহ হইল। রাজপুত্র ব্রহ্মদত্ত এই মহিষীর সহিত মহাসুখে রাজ্য করিতে লাগিলেন। একদিন মহারাজ নিজ মহিষীর সহিত অন্তঃপুরোদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন যে, একটী পিপীলিকা অত্যন্ত আকুলচিত্তে তাহার সঙ্গিনী পিপীলিকাকে কত কাকুবাদের সহিত অনুনয় বিনয় করিতেছে। রাজা শুনিতে পাইলেন যে, সেই কীট মদনশরাহতহৃদয়ে গদ্‌গদ স্বরে তাহার সেই সঙ্গিনী পিপীলিকাকে বলিতেছে,—"দেখ, পৃথিবীতে তোমার মত সুন্দরী নারী আর দ্বিতীয় নাই। আহা! তোমার বর্ণ সুবর্ণের ন্যায়, তুমি সুশ্রোণী মধুরভাষিণী এবং সুচারুহাসিনী, তোমার মধ্যদেশ অতিশয় ক্ষীণ অথচ জঘন সুপীন,—তুমি পীনোন্নতপয়োধরভারে মন্দ মন্দগামিনী, তোমার নয়নযুগল এবং রসনা অতি সুন্দর,—গুড় এবং শর্করা তোমার অতিশয় প্রিয়। আমার খাওয়া শেষ হইলে তবে তুমি ভোজন কর,—আমার স্নান হইলে তবে তুমি স্নান কর;—আমার বিরহে তুমি দুঃখিতা এবং আমি ক্রুদ্ধ হইলে ভয়বিহ্বলা হও,—তুমি এমন সুন্দর, এমন সৎস্বভাবা, এমন পতিব্রতা;—তবে হে কল্যাণি, আজ এমন ক্রোধে মুখভার করিয়া আছ কেন? বল, বল,—আমাকে তোমার ক্রোধের কারণ খুলিয়া বল।" পিপীলিকা রোষ ভরে উত্তর করিল, "শঠ, তুমি কেন বৃথা এত কথা বলিতেছ?—কাল তুমি যে মিষ্টান্ন চূর্ণগুলি মুখে করিয়া লইয়া যাইতেছিলে,—সে গুলি আমাকে না দিয়া অনুরাগ ভরে আর একজনকে দাও নাই?" পিপীলিকা বলিল,—'হে সুন্দরি, আমি ভ্রমবশে চিনিতে না পারিয়াই তোমাকেই দিতেছি এই ভাবিয়াই ঐ অন্য পিপীলিকাকে সেই মিষ্ট কণিকাগুলি দিয়াছিলাম।—হে কোপনে! জীবনে আমার এই এক মাত্র অপরাধ, তুমি তাহা ক্ষমা কর। আমি তোমার শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি যে, এরূপ কাজ আমি আর কখনও

যোগভ্রষ্টাস্ত্রয়স্তেষু বভ্রমুশ্চাল্পচেতনাঃ।
দৃষ্ট্বা বিভ্রাজমানমুদ্যানে স্ত্রীভিরন্বিতম্‌ ॥ ১৯ ॥
ক্রীড়ন্তং বিবিধৈর্ভাবৈ র্মহাবলপরাক্রমম্‌।
পাঞ্চালান্বয়সম্ভূতং প্রভূতবলবাহনম্‌ ॥ ২০ ॥
রাজ্যকামোঽভবচ্চৈকস্তেষাং মধ্যে জলৌকসাম্‌।
পিতৃবর্ত্তী চ যো বিপ্রঃ শ্রাদ্ধকৃৎ পিতৃবৎসলঃ ॥ ২১ ॥
অপরৌ মন্ত্রিণৌ দৃষ্ট্বা প্রভূতবলবাহনৌ।
মন্ত্রিত্বে চক্রতুশ্চেচ্ছামস্মিন্‌ মর্ত্ত্যে দ্বিজোত্তমৌ ॥ ২২ ॥
তন্মধ্যে যে তু নিষ্কামাস্তে বভূবু র্দ্বিজোত্তমাঃ।
বিভ্রাজপুত্রস্ত্বেকো ঽভূদ্‌ ব্রহ্মদত্ত ইতি স্মৃতঃ ॥ ২৩ ॥
মন্ত্রিপুত্রৌ তথা চোভৌ পুণ্ডরীকসুবালকৌ।
ব্রহ্মদত্তোঽভিষিক্তঃ সন্‌ পুরোহিতবিপশ্চিতা ॥ ২৪ ॥
পঞ্চালরাজোবিক্রান্তঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
যোগবিৎ সর্বজন্তূনাং রুতবেত্তাঽভবত্তদা ॥ ২৫ ॥

তস্য রাজ্ঞোঽভবদ্ভার্য্যা দেবলস্যাত্মজা শুভা।
সন্নতির্নাম বিখ্যাতা কপিলা যাঽভবৎ পুরা। ২৬ ॥
পিতৃকার্য্যে নিযুক্তত্বাদভবদ্‌ ব্রহ্মবাদিনী।
তয়া চকার সহিতং স রাজ্যং রাজনন্দনঃ। ২৭ ॥
কদাচিদুদ্যানগতস্তয়া সহ স পার্থিবঃ।
দদর্শ কীটমিথুনমনঙ্গকলহাকুলম্‌। ২৮ ॥
পিপীলিকামনুনয়ন্‌ পরিতঃ কীটকামুকঃ।
পঞ্চবাণাভিতপ্তাঙ্গঃ সগদ্‌গদমুবাচ হ। ২৯ ॥
ন ত্বয়া সদৃশী লোকে কামিনী দৃশ্যতে কচিৎ।
মধ্যক্ষামাতিজঘনা বৃহদ্বক্ষোঽতিগামিনী। ৩০ ॥

করিব না।— এই দেখ আমি তোমাকে প্রণাম করিতেছি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও"।

সূত বলিলেন, সহচর কীটের এবম্প্রকার বাক্যগুলি শুনিয়া সেই পিপীলিকা নায়িকা প্রসন্ন হইল এবং পিপীলিকাকে মোহিত করিবার অভিপ্রায়ে তাহার নিকটে সে আত্মসমর্পণ করিল। রাজা ব্রহ্মদত্ত এই ব্যাপার আমূল সমস্ত অবগত হইয়া বিস্মিত হইলেন,—তিনি ভগবানের প্রসাদে সকল প্রকার জীবেরই কথাবার্ত্তা যে বুঝিতে পারিতেন, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে সূত! ব্রহ্মদত্ত পৃথিবীপতি কিরূপে সর্বজীবের ভাষা বুঝিতে পারিতেন এবং সেই চারিটি চক্রবাকই বা কাহার কুলে জন্মগ্রহণ করিলেন, তাহা বলুন।"

সূত বলিতে লাগিলেন,—"সেই চারিটি চক্রবাক রাজা ব্রহ্মদত্তের রাজধানীতেই এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং তাঁহারা সকলেই জাতিস্মর হইলেন। সেই দরিদ্র এবং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের চারিপুত্রের যথানুযায়ী এই চারি নাম হইল যথা, ধৃতিমান্, তত্ত্বদর্শী, বিদ্যাচণ্ড এবং তপোৎসুক। সেই চারি ব্রাহ্মণপুত্রের মনে তপস্যা করিবার ইচ্ছার উদ্ভব হইল, তাঁহারা বলিলেন, 'আমরা তপস্যা দ্বারা পরমা সিদ্ধি লাভ করিব'। তাঁহাদের এই কথা শুনিয়া সুদরিদ্র ও বৃদ্ধ পিতা বিশেষ ভীত এবং উৎকণ্ঠিত হইয়া দীন ভাবে বলিলেন 'পুত্রগণ তোমরা এ কি বলিতেছ? এখন তোমাদের পক্ষে তপস্যা করিতে যাওয়া অধর্মের কার্য্য; বৃদ্ধ, দরিদ্র এবং বনবাসী পিতাকে ত্যাগ করিয়া গমন করিলে তোমাদের কি ধর্ম অথবা কোন্ গতি লাভ হইবে?' এইরূপে তিনি তাহাদিগকে বিরত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পুত্রগণ বলিলেন, 'পিতঃ, আপনার জীবিকার ব্যবস্থা হইয়াছে। আপনি প্রভাতে রাজসভায় গিয়া রাজার নিকট এই শ্লোকটি পাঠ করিয়া ধন চাহিলেই রাজা আপনাকে প্রচুর ধন এবং একসহস্র গ্রাম দিবেন। শ্লোকটির মর্ম এই, 'যে বিপ্রগণ কুরুক্ষেত্রে জন্মিয়া পরে দাসপুরে দাস, কালঞ্জরে মৃগ, মানস সরোবরে সপ্ত চক্রবাক হইয়া জন্মিয়াছিল, সেই আমরা এইখানে সিদ্ধিলাভ করিলাম।' পুত্রগণ এই বলিয়া তপস্যার নিমিত্ত বনগমন করিলেন এবং বৃদ্ধও অর্থলাভ আশায় রাজভবনে গমন করিলেন।

পূর্ব্বকালে পঞ্চালাধিপতি পুণ্যচরিত্র মহারাজ বৈভ্রাজ পুত্রলাভের নিমিত্ত কঠোর ব্রতাবলম্বন করিয়া সর্বশক্তিমান্, সর্বত্র বিদ্যমান ভগবান্ নারায়ণকে আরাধনা করিয়াছিলেন। বহুদিন পরে ভক্তবৎসল হরি নৃপতির তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া রাজার নিকটে আসিয়া বলিলেন, 'রাজন্, আপনার মঙ্গল হউক, আপনি অভিলষিত বর প্রার্থনা করুন।' ভগবান্ এইকথা বলিলে, রাজা এই অত্যুত্তম বর প্রার্থনা করিলেন,—'হে দেবদেব, আপনি আমাকে মহাবল পরাক্রমশালী, সর্ব শাস্ত্রপারগ, যোগবিৎ এবং ধার্মিক একটি পুত্র প্রদান করুন এবং সেই পুত্র

সুবর্ণবর্ণা সুশ্রোণী মঞ্জুক্তা চারুহাসিনী।
কুলক্ষ্য নেত্ররসনা গুড়শর্করবৎসলা। ৩১॥
ভোক্ষ্যসে ময়ি ভুক্তে ত্বং স্নাসি স্নাতে তথা ময়ি।
প্রোষিতে সতি দীনা ত্বং ক্রুদ্ধেঽপি ভয়চঞ্চলা। ৩২॥
কিমর্থং বদ কল্যাণি সরোষবদনা স্থিতা।
সা তমাহ সকোপা তু কিমালপসি মাং শঠ। ৩৩॥
ত্বয়া মোদকচূর্ণন্তু মাং বিহায় বিনেয্যতা।
প্রদত্তং মদতিক্রান্তে, [illegible] সমন্মথঃ। ৩৪॥

পিপীলিক উবাচ। ত্বৎসাদৃশ্যান্ময়া দত্তমন্যস্যৈ বরবর্ণিনি।
তদেকমপরাধং মে ক্ষন্তুমর্হসি ভামিনি।৩৫॥
নৈতদেবং করিষ্যামি পুনঃ কাপীহ সুব্রতে।
স্পৃশামি পাদৌ সত্যেন প্রসীদ প্রণতস্য মে।৩৬॥
সূত উবাচ। ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা সা প্রসন্নাভবৎ ততঃ।
আত্মানমর্পয়ামাস মোহনায় পিপীলিকা।৩৭॥

যেন সমস্ত জীবের ভাষা বুঝিতে পারে।' বিশ্বাত্মা পরমেশ্বর রাজার প্রার্থনায়, 'ইহাই হউক' বলিয়া সর্বদেবের সাক্ষাতে অন্তর্ধান করিলেন। সেই বর-ফলে পঞ্চালরাজ সকল জীবের প্রতি দয়ালু, সর্বজীবাপেক্ষা অধিক বলবীর্য্য সম্পন্ন সমস্ত জীবের ভাষাবিৎ, সর্বজীবের প্রভু মহা-প্রতাপী ব্রহ্মদত্ত নামে পুত্রলাভ করিলেন। মহারাজ-ব্রহ্মদত্ত যোগী এবং সকল জন্তুর ভাষা বুঝিতেন, তাই সেই পিপীলিক-পিপীলিকার প্রেমকলহ শুনিয়া হাস্য করিলেন। রাজমহিষী সন্নতি রাজাকে বিনা কারণে হঠাৎ হাসিতে দেখিয়া বিস্মিতা হইলেন এবং মনে মনে কিছু আশঙ্কা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'অকালে হঠাৎ আপনার এত হাসির ঘটা কেন; আমি ত আপনার এত হাসির কোন কারণই দেখিতেছি না'। সূত বলিলেন,—রাজকুমার তখন ঐ পিপীলিকার অনুরাগ-সূচক কথাগুলি বলিয়া রাণীকে কহিলেন, 'সুন্দরি, শুচিস্মিতে, এই পিপীলিকার মজার প্রেমের কথা শুনিয়া হাসিয়াছি, আমার হাসির আর কোন হেতু নাই,। মহিষী কিন্তু মানুষে যে পিপীলিকার কথা বুঝিতে পারে, তাহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, 'আপনার এ কথা মিথ্যা; আপনি আমাকেই উপহাস করিয়া হাসিয়াছেন,—আমি

ব্রহ্মদত্তোঽপ্যশেষং তং জ্ঞাত্বা বিস্ময় মাগমৎ।
সর্বসত্বস্য রুতজ্ঞত্বাৎ প্রসাদাচ্চক্রপাণিনঃ। ৩৮॥

বিংশ অধ্যায়॥

ঋষয়ঊচুঃ। কথং সত্বরুতজ্ঞোঽভূদ্ ব্রহ্মদত্তো ধরাতলে।
তচ্চাভবৎ কস্যকুলে চক্রবাকচতুষ্টয়ম্।১॥
সূতউবাচ। তস্মিন্নেবপুরে জাতাস্তে চ চক্রাহ্বয় স্তদা।
বৃদ্ধদ্বিজস্য দায়াদা বিপ্রা জাতিস্মরাঃ পুরা। ২॥
ধৃতিমাং স্তত্ত্বদর্শী চ বিদ্যাচণ্ডস্তপোৎসুকঃ।
নামতঃ কর্মতশ্চৈতে সুদরিদ্রস্য তে সুতাঃ।৩॥
তপসে বুদ্ধিরভবৎ তদা তেষাং দ্বিজন্মনাম্।
যাস্যামঃ পরমাং সিদ্ধিমিত্যূচুস্তে দ্বিজোত্তমাঃ।৪॥
ততস্তদ্বচনং শ্রুত্বা সুদরিদ্রো মহাতপাঃ।
উবাচ দীনয়া বাচা কিমেতদিতি পুত্রকাঃ।৫॥
অধর্ম এষ ইতি বঃ পিতা তানভ্যবারয়ৎ।
বৃদ্ধং পিতরমুৎসৃজ্য দরিদ্রং বনবাসিনম্।৬॥
কো-নু ধর্মোঽত্র ভবিতা মত্ত্যাগাদ্ গতিরেব বা।
উচুস্তে কল্পিতা বৃত্তিস্তব তাত বদস্ব তৎ।৭॥
বিত্তমেতৎ পুরো রাজ্ঞঃ সতে দাস্যতি পুষ্কলম্।
ধনং গ্রাম সহস্রাণি প্রভাতে পঠতস্তব।৮॥

যে বিপ্রমুখ্যা কুরুজাঙ্গলেষু
দাসাস্তথা দাসপুরে মৃগাশ্চ।
কালঞ্জরে সপ্ত চ চক্রবাকা
যে মানসে বয়মত্র সিদ্ধাঃ।৯॥

ইত্যুক্ত্বা পিতরং জগ্মুস্তে বনং তপসে পুনঃ।
বৃদ্ধোঽপি রাজভবনং জগামাত্মার্থসিদ্ধয়ে।১০॥
অনঘো নাম বৈভ্রাজঃ পাঞ্চালাধিপতিঃ পুরা।
পুত্রার্থী দেবদেবেশং হরিং নারায়ণং প্রভুম্।১১॥
আরাধয়ামাস বিভুং তীব্রব্রত-পরায়ণঃ।
ততঃ কালেন মহতা তুষ্টস্তস্য জনার্দ্দনঃ।১২॥
বরং বৃণীষ ভদ্রং তে হৃদয়েনেপ্সিতং নৃপ।
এবমুক্তস্তু দেবেন বব্রে স বরমুত্তমম্।১৩॥
পুত্রং মে দেহি দেবেশ মহাবলপরাক্রমম্।
পারগং সর্বশাস্ত্রাণাং ধার্মিকং যোগিনাং পরম্।১৪॥
সর্বসত্বরুতজ্ঞং মে দেহি যোগিনমাত্মজম্।
এবমস্ত্বিতি বিশ্বাত্মা তমাহ পরমেশ্বরঃ।১৫॥
পশ্যতাং সর্বদেবানাং তত্রৈবান্তরধীয়ত।
ততঃস তস্য পুত্রোঽভূদ্ ব্রহ্মদত্তঃ প্রতাপবান্।১৬॥
সর্বসত্বানুকম্পীচ সর্বসত্ববলাধিকঃ।
সর্বসত্বরুতজ্ঞশ্চ সর্বসত্বেশ্বরেশ্বরঃ।১৭॥
অহসৎ তেন যোগাত্মা স পিপীলিকয়াগতঃ।
যত্র তৎকীটমিথুনং রমমাণমবস্থিতম্।১৮॥
ততঃ সা সন্নতি দৃষ্ট্বা তং হসন্তং সুবিস্মিতা।
কিমপ্যাশঙ্ক্য মনসা তমপৃচ্ছন্নরেশ্বরম্।১৯॥

আর প্রাণধারণ করিব না। দেবতারা ভিন্ন মানুষে কি কখনও পিপীলিকার কথা বুঝিতে পারে? নিশ্চয়ই আপনি আমাকে উপহাস করিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা আমার পক্ষে আর কি অবমাননা হইতে পারে?" রাজা রাণীর কথার কোন সদুত্তর দিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিলেন এবং রাণীর এরূপ মনোবিকারের প্রকৃত কারণ জানিবার জন্য সপ্ত দিবারাত্র নিয়ম অবলম্বন করিয়া শ্রীভগবানের নিকট অবস্থিতি করিলেন। অবশেষে প্রভাতে নারায়ণ স্বপ্নযোগে রাজাকে জানাইলেন,"আগামী প্রভাতে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নগর ভ্রমণ করিবেন, তাঁহার কথা হইতেই তুমি সবই জানিতে পারিবে"। এই কথা বলিয়া বিষ্ণু অন্তর্ধান করিলে, রাজা প্রভাতে মন্ত্রী ও মহিষীর সহিত রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন, যে এক ব্রাহ্মণ বলিতে বলিতে আসিতেছে যে, যাঁহারা কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে যাঁহারা দাসপুরে দাস, কালঞ্জরে মৃগ ও মানস সরোবরে সপ্ত চক্রবাক হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই আমরা এখানে সিদ্ধিলাভ

রাজোবাচ। অকস্মাদতিহাসস্তে কিমর্থমভবন্নৃপ।
হাস্যহেতুং ন জানামি যদকালে কৃতং ত্বয়া ॥২০॥

সূত উবাচ। অবদদ্রাজপুত্রোঽপি স পিপীলিকভাষিতম্।
রাগবাগ্ভিঃ সমুৎপন্নমেতদ্ধাস্যং বরাননে ॥২১॥
ন চাস্যং কারণং কিঞ্চিদ্ধাস্যহেতৌ শুচিস্মিতে।
ন সামস্তৎ তদা দেবী প্রাহালীক মিদং বচঃ ॥২২॥
অহমেবাত্র হসিতা ন জীবিষ্যে ত্বয়াধুনা।
কথং পিপীলিকালাপং মর্ত্ত্যো বেত্তি বিনা সুরান্॥২৩
তস্মাৎ ত্বয়াহমেবেহ হসিতা কিমতঃ পরম্।
ততো নিরুত্তরো রাজা জিজ্ঞাসু স্তৎপুরো হরেঃ ॥২৪
আস্থায় নিয়মং তস্থৌ সপ্তরাত্রমকল্মষঃ।
স্বপ্নে প্রাহ হৃষীকেশঃ প্রভাতে পর্য্যটন্ পুরম্॥২৫॥
বৃদ্ধ-দ্বিজো যস্তদ্‌বাক্যাৎ সর্ব্বং জ্ঞাস্যস্যশেষতঃ।
ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে বিষ্ণুঃ প্রভাতেঽথ নৃপঃ পুরাৎ ॥২৬
নির্গচ্ছন্ মন্ত্রিসহিতঃ সভার্য্যো বৃদ্ধমগ্রতঃ।
গদন্তং বিপ্রমায়ান্তং তং বৃদ্ধং সন্দদর্শ হ ॥২৭॥

ব্রাহ্মণ উবাচ। যে বিপ্রমুখ্যাঃ কুরুজাঙ্গলেষু
দাসাস্তথা দাসপুরে মৃগাশ্চ।
কালঞ্জরে সপ্ত চ চক্রবাকা
যে মানসে বয়মত্র সিদ্ধাঃ ॥২৮॥

সূত উবাচ। ইত্যাকর্ণ্য বচস্তাভ্যাং স পপাত শুচা ততঃ।
জাতিস্মরত্বমগমৎ তৌ চ মন্ত্রিবরাবুভৌ ॥ ২৯ ॥
কামশাস্ত্রপ্রণেতা চ বাভ্রব্যস্তু সুবালকঃ।
পাঞ্চাল ইতি লোকেষু বিশ্রুতঃ সর্বশাস্ত্রবিৎ ॥ ৩০ ॥ *

পুণ্ডরীকোঽপি ধর্মাত্মা বেদশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকঃ।
ভূত্বা জাতিস্মরো শোকাৎ পতিতাবগ্রতস্তদা ॥৩১॥
হা বয়ং যোগবিভ্রষ্টাঃ কামতঃ কর্মবন্ধনাঃ
এবং বিলপ্য বহুশ স্ত্রয়স্তে যোগপারগাঃ ॥ ৩২ ॥
বিস্ময়াচ্ছ্রাদ্ধমাহাত্ম্যমভিনন্দ্য পুনঃ পুনঃ।
ততস্তস্মৈ ধনং দত্ত্বা প্রভূতগ্রামসংযুতম্ ॥৩৩॥
বিসৃজ্য ব্রাহ্মণং তঞ্চ বৃদ্ধং ধনমুদান্বিতম্।
আত্মীয়ং নৃপতিঃ পুত্রং নৃপলক্ষণসংযুতম্ ॥ ৩৪ ॥
বিষ্বক্‌সেনাভিধানন্তু রাজ্যে রাজ্যোঽভ্যষেচয়ৎ।
মানসে মিলিতাঃ সর্বে ততস্তে যোগিনো বরাঃ ॥ ৩৫ ॥

* বাৎস্যায়ন প্রণীত কামসূত্রে দেখা যায় যে পাঞ্চাল বাভ্রব্য অতিবিস্তীর্ণ কামশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন; যথা কামসূত্রে, "মহাদেবানুচরশ্চ নন্দী সহস্রেণাধ্যায়ানাং পৃথক্ কামসূত্রং প্রোবাচ ॥৮॥ তদেবতু পঞ্চভিরধ্যায়শতৈ রৌদ্দালকিঃ শ্বেতকেতুঃ সঞ্চিক্ষেপ ॥৯॥ তদেব পুনরপ্যর্দ্ধেনাধ্যায়শতেন সাধারণ-কন্যাসম্প্রযুক্তক-ভার্যাধিকারিক—বৈশিক—পারদারিক—সাম্প্রয়োগিকোপনিষদকৈঃ সপ্তভিরধিকরণৈর্বাভ্রব্যঃ পাঞ্চালঃ সঞ্চিক্ষেপ ॥ ১০ ॥ কামসূত্র, প্রথম অধিকরণ, প্রথম অধ্যায়। বাৎস্যায়নের অপর নাম চাণক্য। তিনি খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দের লোক বলিয়া য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। বাভ্রব্য তাঁহার পূর্বগামী।

করিয়াছি'। এই কথা শুনিবামাত্র রাজা এবং মন্ত্রিদ্বয় শোকে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহারা জাতিস্মরত্ব লাভ করিলেন। এই মন্ত্রিদ্বয়ের মধ্যে সুবালক সর্বশাস্ত্রবিৎ কামশাস্ত্র প্রণেতা পাঞ্চাল বাভ্রব্য বলিয়া পৃথিবীতে সুবিখ্যাত হইয়াছিলেন এবং কণ্ডরীক ধর্মাত্মা বেদশাস্ত্র প্রবর্ত্তক হইয়াছিলেন *। তাঁহারা দুইজন ঐ শ্লোকটি শুনিয়া যুগপৎ জাতিস্মরত্ব লাভ করিলেন এবং শোকবশে তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পতিত হইলেন। হায়! আমরা কামনার বশবর্ত্তী হইয়া কর্মের বন্ধনে পড়িয়া যোগভ্রষ্ট হইলাম। সেই যোগবিৎ মহাত্মগণ এইরূপে বহুতর বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং সবিস্ময়ে শ্রাদ্ধের মাহাত্ম্য পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাহার পর নৃপতি ব্রহ্মদত্ত ঐ বৃদ্ধব্রাহ্মণকে বহু গ্রাম এবং প্রভুতধন দান করিলেন ও তাহাকে বিদায় দিবার পর তাঁহার সর্বসুলক্ষণ-সম্পন্ন পুত্র বিষক্সেনকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং তৎপরে তিনজনেই মানস সরোবরের তীরে মিলিত হইলেন। তাঁহারা সকলেই দ্বেষহিংসাশূন্য ও পিতৃভক্ত। রাজমহিষী সন্নতি রাজ্যভ্রষ্টা হইযা রাজাকে বলিলেন, 'আমিই আপনার রাজ্যত্যাগের কারণ; আপনি যাহা অভিলাষ করিতেছেন, তাহা রাজ্যত্যাগের ফলেই ঘটিবে।' রাজাও রাজ্ঞীর বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিয়া কহিলেন, 'তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই ঠিক, তোমারই প্রসাদে আমি এই মহৎফল পাইলাম।' তৎপরে সকলেই বনবাস যোগ অবলম্বন পূর্ব্বক তপস্যায় নিরত রহিলেন এবং অন্তকালে তপোবলে মোক্ষলাভ করিলেন। এইরূপে পিতামহগণ প্রীত হইলে মানবদিগকে আয়ু, ধন, পুত্র, বিত্ত, রাজ্য, সুখ, স্বর্গ এবং মোক্ষ প্রদান করেন। এই ব্রহ্মদত্তের পিতৃমাহাত্ম্য যাঁহারা শ্রবণ করেন কিংবা দ্বিজগণকে শ্রবণ করান, অথবা পাঠ করেন, তাঁহারা শত শত কোটি কল্প কাল অত্যুত্তম ব্রহ্মলোকে বাস করেন।"

এইখানে আমাদের আখ্যায়িকা সমাপ্ত হইল।

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

---

* ব্রহ্মদত্তাদরস্তস্মিন্ পিতৃসত্তাংবমৎসরাঃ।
সন্নতিশ্চা ভবদ্ভ্রষ্টা ময়ৈতৎ কিল কারিতম্ ॥ ৩৬ ॥
রাজ্যত্যাগফলং সর্বং যদেতদভিলষ্যতে।
তথেতি প্রাহ রাজাতু পুনস্তামভিনন্দয়ন্ ॥ ৩৭ ॥
ত্বৎপ্রসাদাদিদং সর্বং ময়ৈতৎ প্রাপ্যতে ফলম্।
ততস্তে যোগমাস্থায় সর্ব এব বনৌকসঃ ॥ ৩৮ ॥
ব্রহ্মরন্ধ্রেণ পরমং পদমাপুস্তপোবলাৎ।
এবমায়ুর্ধনং বিদ্যাং স্বর্গং মোক্ষং সুখানি চ ॥৩৯॥
প্রযচ্ছন্তি সুতান্ রাজ্যং নৃণাং প্রীতাঃ পিতামহাঃ।
য ইদং পিতৃমাহাত্ম্যং ব্রহ্মদত্তস্য চ দ্বিজঃ ॥ ৪০ ॥
দ্বিজেভ্যঃ শ্রাবয়েদ্ যো বা শৃণোত্যথ পঠেত বা।
কল্পকোটিশতং সাগ্রং ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ৪১ ॥
(একবিংশ অধ্যায়। বঙ্গবাসী সংস্করণ। মৎস্যপুরাণ।)

সাংখ্যের মূল কথা *

সাংখ্য দর্শনের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে প্রথমে তাহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা করা আবশ্যক। কান্টের পূর্ব্ববর্ত্তী ইউরোপীয় দর্শনের ন্যায় সাংখ্য কেবল speculative নহে। বুদ্ধির পরিতৃপ্তির জন্য ইহার উদ্ভব নয়। ইহার লক্ষ্য practical—তাহা জীবনের নিয়ম নিরূপণ ও মোক্ষের উপায় নির্দ্ধারণ। এই লক্ষ্য সাংখ্য দর্শনের সকল গ্রন্থেই সর্ব্বাগ্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

"দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদবঘাতকে হেতৌ" বলিয়া ঈশ্বর কৃষ্ণ সাংখ্য কারিকার সূত্রপাত করিয়াছেন।

---

* ঢাকা সাহিত্য সম্মিলনে দর্শনশাখায় পঠিত।

এবিষয়ে তিনি পূর্ব্বাচার্য্যদিগের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়।

কিন্তু কেবল এইরূপে লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিয়াই সাংখ্যকার নিবৃত্ত হন নাই। মোক্ষের সন্ধান করিতে গেলেই প্রথম কথা উঠে যে, কোন্ বন্ধন হইতে মোক্ষ ও সে বন্ধনের স্বরূপ কি? কোন্ বস্তর মোক্ষ? কাহা হইতে এবং কিরূপে তাহার বন্ধন ইত্যাদি। এই সব তত্ত্ব আলোচনা করিয়া সাংখ্যকার স্থির করিয়াছেন যে, এক নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব পুরুষ আমাদের আত্মা ও সার, অব্যক্ত প্রকৃতি মহদাদি নানা পদার্থে ব্যক্ত হইয়া তাহার বন্ধন সম্পাদন করিয়া রাখিয়াছে। এই বন্ধনের স্বরূপ জ্ঞান লাভ হইলে, পুরুষ প্রকৃতি হইতে নিজেকে স্বতন্ত্র বলিয়া জানিলেই মোক্ষলাভ হয়। এই কথা প্রমাণ করিয়া সাংখ্য শাস্ত্র মোক্ষলাভের উপায় কি কি, তাহার বাধা কি কি, কোন্ কোন্ প্রণালীর সাধনা দ্বারা উত্তরোত্তর মোক্ষ লাভের পথে অগ্রসর হওয়া যায়, এই সকল বিষয় অত্যন্ত সূক্ষ্ম ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। সমগ্র সাংখ্যশাস্ত্র অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মোক্ষপথে ক্রমোন্নতি ও শেষে মোক্ষলাভের উপায় নির্দ্ধারণ, ও মোক্ষের মানদণ্ডে জীবনের কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্যের মূল্য নিরূপণই সাংখ্যদর্শনের প্রধান লক্ষ্য ও প্রতিপাদ্য। পুরুষ প্রকৃতি প্রভৃতি তত্ত্বের নির্ণয় গৌণভাবে, অথবা এই practical দর্শনের আনুষঙ্গিক ভাবে আসিয়া পড়িয়াছে।

অথচ ঠিক যেমন কাণ্টের practical philosophy অপেক্ষা তাঁহার speculative philosophy অধিক আলোচিত হইয়াছে, সেইরূপ সাংখ্যেরও জীবনের নিয়ামক রহস্যগুলির চেয়ে তাহার তত্ত্বগুলির আলোচনাই অনেক বেশী হইয়াছে।

সাংখ্যে যে কয়েকটি তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে পুরুষ ব্যতীত প্রায় আর সকল তত্ত্বেরই প্রকৃত তাৎপর্য্য সম্বন্ধে গুরুতর মতভেদ আছে। এগুলি স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে হইলে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, এগুলি সাংখ্যকারের খাম খেয়ালীর ফল নহে। Experience বা বিজ্ঞানে যাহা পাওয়া যায় তাহারই বিশ্লেষণ ও আলোচনা দ্বারা সাংখ্যকার এই সমুদয় তত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং আমাদের ইহাই নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিতে হইবে যে, যখন তিনি এই সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তখন তিনি কি ভাবিয়া, কোন্ যুক্তি বা সাক্ষাৎ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া এই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। যদি ইহা আমরা নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারি, তবে আর তত্ত্বের প্রকৃত তাৎপর্য্য সম্বন্ধে কোনও দ্বন্দ্ব থাকিবে না।

এই প্রণালীর বিচারে প্রথম বিচার্য্য এই যে, কোন্ বস্তু আশ্রয় করিয়া সাংখ্যকার গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন,—তাঁহার starting point কি ছিল? ইউরোপীয় দর্শনের আরম্ভ হইতে প্রায় আধুনিক কাল পর্য্যন্ত তাহার আরম্ভের স্থান ছিল বহির্জগৎ। Thales, Anaximander, Heracleitus, Anaxagoras প্রভৃতি গ্রীক দার্শনিক, সকলেই বহির্জগৎ লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য ছিল, এই জগতের মূল কি? কিন্তু অতি আদি কাল হইতেই ভারতীয় দার্শনিকের দৃষ্টি ছিল অন্তর্জগতে। উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন, "আত্মা বা অরে জ্ঞাতব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাত ইদং সর্ব্বং বিদিতম্।" আমার বিবেচনায় সাংখ্যকারেরও দৃষ্টি অতীন্দ্রিয় বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়াছিল এই অন্তর্জগতের বিস্ময়কর রহস্যের কথা চিন্তা করিয়া।

সে রহস্য কি? এক কথায় বলিতে গেলে তাহা অন্তর্জগতের দ্বৈত। আমার ভিতর এমন একটা বস্তু আছে যাহা নিষ্পাপ ও শুদ্ধ, অথচ আমার ভিতর পাপ ও অশুচিতা রহিয়াছে, এমন একটা কিছু আছে যাহা অসীম, অথচ আমি সীমাবদ্ধ, এমন একটা জিনিষ আছে "যাহা শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম, মনসো মনঃ বাচোহবাচং" অথচ যাহা ইহাদের সকল হইতেই পৃথক্। তাহা ছাড়া আর এক দিক হইতে দেখিতে পাই যে পাপ, অজ্ঞান

ও দুঃখ আমাদিগের সকলকেই অল্প বিস্তর অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে। ইহা হইতে কি মুক্তি সম্ভব নয়? আর্য্য ঋষিগণ এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, মুক্তি অবশ্যই আছে। যদি মুক্তি সম্ভব হয়, তবে আমার ভিতর এমন একটা কিছু আছে যাহার স্বরূপের ভিতর পাপ তাপ অজ্ঞান প্রবেশ করিতে পারে না। অথচ আমাদের আন্তরিক জীবনের যে অংশ আলোচনা কর না কেন তাহাতেই দেখিতে পাইবে, পাপ তাপ ও অজ্ঞানের বীজ রহিয়াছে।

ইহা হইতে ভারতীয় দার্শনিক বলেন যে, আমার যে অন্তরাত্মা যাহা স্বরূপতঃ 'আমি' তাহা আমার আভ্যন্তরীণ সমুদয় বস্তু হইতে পৃথক্। ইহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে যাইয়া সাংখ্যকার বলিয়াছেন ইহা দ্রষ্টা, সাক্ষী, কেবল, মধ্যস্থ ইত্যাদি। এই জ্ঞাতৃত্ব, দ্রষ্টৃত্ব, সাক্ষীত্ব অথবা subjectivity—ইহাই আমাদের বিশেষ অনুধাবনের বিষয়। যে কেবল মধ্যস্থ, নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত পদার্থের সন্ধানে ভারতীয় দার্শনিক প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এই সাক্ষী, দ্রষ্টা, বা পুরুষ বা pure subject এই সেই পদার্থ ইহা তাঁহারা সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। Pure subject বা জ্ঞ, বলিয়াই উপনিষদ ইহাকে বলিয়াছেন "বিদিতাদথ অবিদিতাদধি" কেন না, "বিজ্ঞাতারং কেন বিজানীয়াৎ"। তবে ইহার সম্বন্ধে দুএকটা গুণ বলা যাইতে পারে—ইহা সৎ, কেন না ইহা আছে। আর ইহা চিৎ—বা বিশুদ্ধ চৈতন্য। এই চিৎ বস্তুটার প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক।

আমাদের যাহাকে চেতনা বলি তাহার ভিতর ভারতীয় দর্শনমতে চৈতন্য ব্যতীত অপর বস্তুও আছে। ইহা বিশিষ্ট চৈতন্য; অবিদ্যা বা প্রকৃতির উপর চিৎ-সঞ্চারিত হইয়া ইহা উৎপন্ন হয়। যে টুকু প্রকৃতি বা অবিদ্যা সেটুকু চিৎ নহে, কিন্তু তাহার ভিতর যে সারবস্তুর সত্তায় তাহা জ্ঞান বলিয়া প্রতীত হয়, সেই অনির্ব্বচনীয় পদার্থের নাম চিৎ—এবং সেই চিৎ পুরুষ বা আত্মার গুণ। এ কথাটা সাধারণ অভিজ্ঞতার ভাষায় তরজমা করিতে গেলে দেখা যায় যে, ভারতীয় দার্শনিকদিগের প্রতিপাদ্য কি ছিল। আমাদের সমুদয় জ্ঞানে দুইটি অঙ্গ আছে, subject বা জ্ঞাতা ও object বা জ্ঞেয়। জ্ঞ ও জ্ঞেয়ের সন্নিকর্ষে যে জ্ঞান জন্মায় তাহাই আমাদের বিশিষ্ট জ্ঞান। কিন্তু জ্ঞাতার সাক্ষীত্ব ব্যতীত জ্ঞেয়ের জ্ঞানরূপতা থাকে না। জ্ঞাতার সন্নিকর্ষ হইলেই সেই জ্ঞেয় পদার্থে এক অনির্ব্বচনীয় গুণ সঞ্চারিত হইয়া তাহা জ্ঞান হইয়া উঠে—এই অনির্ব্বচনীয় গুণ, যাহাতে জ্ঞানের জ্ঞানত্ব তাহাই চিৎ। যাহাতে এই চিৎ আছে, সে জ্ঞাতা বা পুরুষ বা আত্মা। যাহাতে এই চিৎ নাই সে অজ্ঞান, অচেতন, এবং সেই হিসাবে জড়।

জড় ও চেতনের এই বিশেষ অর্থ ভারতীয় দর্শনের সাধারণ সম্পত্তি, ইহা স্মরণ না রাখিলে, ভারতীয় কোনও দর্শনেরই সম্যক্ উপলব্ধি হইবে না। সাংখ্য দর্শনের আলোচনায় এ কথা স্মরণ না রাখিলে যে কিরূপ মহা-ভ্রান্তিতে পড়িতে হয় তাহা পরে বুঝাইব।

আত্মার সম্বন্ধে সাংখ্য এবং ভারতীয় সকল দর্শনের এই যে সাধারণ বিশ্বাস, তাঁহাদের দার্শনিক আলোচনার মূল যে লক্ষ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহাই ইহার হেতু। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ইউরোপীয় ও ভারতীয় দর্শন দুইটি স্বতন্ত্র পথে বিশ্বরহস্য উদ্ঘাটন কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিল। ইউরোপীয় দর্শন বাহ্যজগৎ লইয়া আরম্ভ হইয়াছিল। বাহ্যজগতের বিস্ময়কর রহস্য আলোচনা করিতে করিতে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক Anaxagorasই সর্ব্ব প্রথমে আত্মা বা nous [illegible] কল্পনা করেন। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকেরা জগতের মূলহেতুকে কেহ বা জল কেহ বা বায়ু কেহ [illegible] কেহ বা ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও মরুৎ এই [illegible] বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলেন। Anaxagoras এই [illegible] কল্পনার দ্বারা জগৎকে ব্যাখ্যা করা যায় [illegible] বুঝিয়া বিশ্বের মূলীভূত এক আত্মার [illegible] কল্পনা

করিয়াছিলেন। তাঁহার পর অন্যান্য গ্রীক দার্শনিক আত্মতত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিয়া দার্শনিক আলোচনার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু Anaxagoras এবং পরবর্ত্তী পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের জিজ্ঞাস্য ছিল জগতের, বস্তুময় objective জগতের হেতু কি? সেই জিজ্ঞাসা হইতে তাঁহারা আত্মার কল্পনায় উপনীত হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে ভারতীয় দার্শনিকের চিন্তার মূল বিষয় ছিল অন্তর্জগৎ, জীবনের অজ্ঞান ও দুঃখ ও তাহা নিবারণের উপায়, প্রভৃতি। তাঁহারা এই জিজ্ঞাসায় প্রথমেই স্থির করিয়াছিলেন যে, আমার যে সারভূত পদার্থ আত্মা তাহা এই পাপ তাপ অজ্ঞানের উর্দ্ধে এবং এই সকল দোষের সংস্পর্শশূন্য। কাজে কাজেই উভয় দর্শনের আত্মার কল্পনা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিশ্বের বিচিত্রতার হেতুর সন্ধানে যে আত্মার কল্পনা করা হইয়াছে তাহা কাজে কাজেই বুদ্ধিমান্ আত্মা বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু পাপ তাপের অতীত, অজ্ঞানের সম্ভাবনা বহির্ভূত যে আত্মা, তাহার সন্ধান করিতে গেলে যাহা কিছু আত্মার অসীমতার খর্ব্বতা সম্পাদন করে যাহা কিছু জড়তাস্পৃষ্ট, যাহা কিছু পাপ বা দুঃখ দূষিত তাহা পরিত্যাগ করিতে হয়। কাজেই স্বভাবতঃ লোকে এই সমুদয় জ্ঞান-বুদ্ধি-ভোগের অন্তরালে অবস্থিত চিদালোকময় আত্মার কল্পনা করে।

এই চিন্ময় পুরুষ, এই জ্ঞ, যদি আমাদের আভ্যন্তরীণ জীবন হইতে বাদ দেওয়া যায়, তবে আমাদের ভিতর যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহার মূল হেতু কোথায়? যাহাই হউক, তাহা চিৎযুক্ত বা চেতন নয়। তাহা অচেতন বা জড়। এ কথার তাৎপর্য্য ইহা নহে যে তাহা matter. চিৎ বলিতে আমরা যদি consciousness বুঝিয়া বসি তবে আমাদের এই ভ্রান্তি হইবেই। কিন্তু ভারতীয় দর্শনে চিৎ অর্থ কি তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি সুতরাং যাহাতে pure subjectivity নাই তাহাই জড় বা অচেতন বলিয়া বুঝিতে হইবে। Matter বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা ভারতীয় দর্শনে পঞ্চ ভূত। কিন্তু সাংখ্য বা বেদান্ত কেহই পঞ্চভূত হইতে আমাদের জ্ঞাতৃত্ববিযুক্ত সত্তার উদ্ভব স্বীকার করেন নাই; সুতরাং এই যে আমাদের জ্ঞ-বিযুক্ত ব্যবহারিক সত্তার মূল ইহাকে matterবলিয়া সাংখ্যকে materialistic or realistic সাব্যস্ত করিলে ভুল করা হইবে। পাশ্চাত্য দর্শনে materialism ও idealism লইয়া যে বিবাদ, সে বিবাদের ভিতর ঠিক এ প্রশ্ন কোথাও উঠে নাই। বিজ্ঞান হইতে ভৌতিক বস্তু উদ্ভব হয়, না ভৌতিক বস্তু হইতে বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়, না বিজ্ঞান ও ভূত সম্পূর্ণ পরস্পর নিরপেক্ষ বস্তু একথার আলোচনা ভারতীয় দর্শনে না হইয়াছিল তাহা নহে। কিন্তু সে সমস্যার সমাধানের সহিত আমাদের এখনকার বক্তব্য বিষয়ের কোনও সম্পর্ক নাই। যে কথা লইয়া বর্ত্তমানে প্রসঙ্গ, সে কথা পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্রে উঠে নাই। বিজ্ঞান ও ভূত প্রপঞ্চকে এক দিকে ফেলিয়া আত্মাকে তাহা হইতে স্বতন্ত্র ভাবে ধারণা ইউরোপীয় দর্শনে অত্যন্ত আধুনিক কালে দেখা দিয়াছে।

এই যে ভূতরূপী ও বিজ্ঞানরূপী আমি, ইহা হইতে সাক্ষী আত্মাকে বিয়োগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহার মূল সাংখ্য মতে প্রকৃতি বা প্রধান—এই উভয় শব্দেরই অর্থ, যাহা আপনা হইতে অন্য বস্তুর জন্ম দেয় বা উদ্ভব সম্পাদন করে; ইহাই সেই মূলের এক মাত্র সংজ্ঞা। সাংখ্যকার বলেন যে, আত্মা কেবল সাক্ষী ও দ্রষ্টা, তাহা কোনও কিছুর উপাদান হইতে পারে না। সুতরাং সমুদয় বস্তুই অন্য কোনও মূল হইতে ক্রমশঃ ব্যক্ত হয়। সেই মূল কি? সাংখ্যকারের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে বলিতে হয় যে, সে মূল কি তাহা আমরা জানি না, কেবল ইহাই জানি যে তাহা সকলের মূল এবং তাহার মূল নাই। দেখিতে পাই, এক বস্তু আর এক বস্তু হইতে, এক পদার্থ আর এক পদার্থ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। আমরা যতদূর জানি বা বুঝিতে পারি,

তাহাতে সকল পদার্থের আদি মূল দেখিতে পাই—বুদ্ধি। কিন্তু বুদ্ধি পরিচ্ছিন্ন পদার্থ, তাহারও কারণ থাকিতে হয়। সে কারণ বা মূল কি একথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে হয় যে সে এক অজ্ঞেয় অব্যক্ত বস্তু যাহার সম্বন্ধে আর কিছুই আমরা জানি না, কেবল জানি যে সেটা বুদ্ধিরও মূল, সুতরাং সকল পদার্থের মূল। যদি বল এই যে বস্তু যাহাকে বুদ্ধির মূল বলিতেছ, তাহারই বা মূল থাকিবে না কেন? তাহার উত্তর এই যে, থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা আমাদের জ্ঞানের অতীত। যদি থাকে তবে আমরা তাহাকেই মূল প্রকৃতি বলিব। কিন্তু সে সম্বন্ধে প্রমাণের অভাব, সুতরাং বুদ্ধির যে মূল তাহাকেই আমরা মূল বলিয়া ধরিতে বাধ্য। যাহাই হউক একটা শেষ মূল থাকিবেই। নচেৎ অনবস্থা দোষ হয়। বীজাঙ্কুরের পারম্পর্য্যের ন্যায় যে অনবস্থার প্রমাণ আছে তাহা ছাড়া অন্যত্র অনবস্থা স্বীকার করা যায় না; কাজেই একটা শেষমূল আছেই বলিতে হইবে—সেই শেষ মূলকে বলি প্রকৃতি। ইহা সংজ্ঞামাত্র—"পারম্পর্য্যেঽপ্যেকত্র পরিনিষ্ঠেতি সংজ্ঞামাত্রং।"

সুতরাং প্রকৃতি বলিতে সাংখ্য যাহা বুঝেন তাহা বুদ্ধির অজ্ঞাত উপাদান the unknown substance of intellect. সেটাকে পাশ্চাত্য হিসাবে জড় বা matter কিছুতেই বলা চলে না। পরে দেখা যাইবে যে সাংখ্যের মতে matter বা "ভূত বুদ্ধি হইতে উদ্ভূত।"

কিন্তু সাংখ্যের বুদ্ধিও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে ভূতময় or material. Max Muller ইহাকে Cosmic intellect বা বিশ্ববুদ্ধি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, ইহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম matter হইতে উদ্ভূত। Garbe বুদ্ধিকে Cosmic বলেন না; ইহা ব্যক্তিগত বা individual কিন্তু তাঁহার মতে ইহা ঠিক ব্যাহায়ক intellect বলে তাহা নহে, ইহা একটা শারীর বস্তু—Die Buddhi ein physisches Ingrediens des Organisms ist,—বুদ্ধি শরীরের একটি ভূতময় উপাদান (১)।

বুদ্ধিকে ভূতময় মনে করিবার একমাত্র কারণ এই যে, প্রকৃতি matter এবং ইহা হইতে বুদ্ধি উদ্ভূত। এই কারণেই গার্বে, অহঙ্কারকেও আত্মপ্রত্যয় (selfstbewnsstsein) বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াই বলিয়াছেন যে ইহাকেও একটা মানসিক শক্তি, বা বস্তু বলিয়া মনে করা চলিবে না, ইহা ভৌতিক শারীরিক একটা সূক্ষ্ম যন্ত্র বিশেষ। কিন্তু আমি পূর্ব্বে প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহা যদি সত্য হয়, তবে প্রকৃতিকে matter বা material বলা চলে না, কাজে কাজেই বুদ্ধিকেও material বলা চলে না। বুদ্ধি, চিৎ নয় কিন্তু চিতের আলোকে উদ্ভাসিত—ইহা intellect বা reason বলিতে যাহা বুঝি তাহাই, অন্য কিছু নয়। চিৎযুক্ত নয় বলিয়া বুদ্ধিকে স্থানে স্থানে জড় বলা হইয়াছে কিন্তু জড় অর্থ material নহে। প্রকৃতির স্বরূপ জানি না বটে, তবু তার সম্বন্ধে একটা কথা বলা যায়, যে তাহা ইহার ক্রিয়া বা সর্গের অনুরূপ। কার্য্য ও কারণ যে একরূপ হইবে এই বিশ্বাস সাংখ্যের সৎকার্য্যবাদ হইতে পাওয়া যায়। সুতরাং একথা বলা যায় যে জগতে যাহা কিছু দেখিতে পাই, যত প্রকারের গুণ আছে, তাহাদের সকলের মূল প্রকৃতিতে আছে।

এই সিদ্ধান্ত করিয়া সাংখ্য একটা প্রকাণ্ড generalisation করিয়াছেন। এই জগতের যত গুণ, ক্রিয়া বা ভাব আছে, তাহাকে তিনটি মৌলিক বস্তু বা principle হইতে উদ্ভূত করা হইয়াছে। ভাল মন্দ এবং না ভাল না মন্দ; প্রকাশ, প্রবৃত্তি, নিয়ম; লঘু, গুরু, চল; সাদা কালো লাল; প্রভৃতি নানা শ্রেণীর গুণ ক্রিয়া ও ভাবকে তিনটির পরস্পর সংমিশ্রণ ও প্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপে

(১) Garbe, Dr., Samkhya Philosophie p. 207.

প্রতিষ্ঠিত করিয়া এই প্রত্যেকটী ত্রয়ীর মূল সাব্যস্ত করা হইয়াছে এক মূল তিন, যাহা প্রকৃতিতে আছে—সত্ত্ব রজঃ তমঃ। এই ত্রিগুণ তত্ত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও আলোচনা একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধের বিষয় হইতে পারে, সুতরাং এখানে আমি তাহা করিব না। কিন্তু আমি শুধু এই কথা বলিতে চাই যে, এই ত্রিগুণ তত্ত্বের আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে প্রথমে এই তিনের তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইযাছিল ভূত জগতে নয়, অন্তর্জগতে। প্রকাশ যে প্রবৃত্তি হইতে স্বতন্ত্র এ কথা সহজে মনে হইতে পারে মানসিক অবস্থা গুলির আলোচনায়, সুতরাং সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ প্রধানতঃ এবং বিশেষ ভাবে psychological তত্ত্ব, এবং মনস্তত্ত্বের আলোচনা হইতে মানসিক জীবনের মূল প্রকৃতির উপাদান স্বরূপ এগুলি কল্পিত হইয়াছিল।

আধুনিক জর্ম্মাণ দার্শনিক Eucken আমাদের মধ্যে বুদ্ধিময় জীবন হইতে স্বতন্ত্র ভাবে একটা চিন্ময় বা Noetic সত্তা স্বীকার করিয়াছেন। আমাদের দেশের দার্শনিকগণও আমাদের আভ্যন্তরীণ জীবনে এইরূপ বুদ্ধিময় সত্তা ও চিন্ময় সত্তার প্রভেদ স্বীকার করিয়াছিলেন। চিন্ময় আত্মা বা পুরুষই আমাদের সারবস্তু, তাহার সত্তা ব্যতিরেকে বুদ্ধির কোনও সত্তা থাকে না, তাই বলিয়া বুদ্ধি ও আত্মা এক নহে। আত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে যে বুদ্ধি থাকিতে পারে না, একথা সাংখ্যদর্শনের মতের অবশ্যম্ভাবী ফল। কেন না, পুরুষের সান্নিধ্য না হইলে প্রকৃতির বিকৃতিই হয় না। পুরুষের ভ্রান্তি উৎপাদনের জন্য প্রকৃতি ক্রমে বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন ইত্যাদি আকারে দেখা দেয়; আবার পুরুষের বিবেক জ্ঞান হইলেই এ সমুদয় প্রকৃতি বা অব্যক্তে বিলীন হইয়া যায়। এই কথার সহজ অর্থ আমি এই বুঝি যে, পুরুষ প্রকৃতিকে জানিতে আরম্ভ করিলেই সেই জ্ঞানচেষ্টার প্রকৃতির বিকৃতি সমূহের আবির্ভাব হয়, পুরুষের সান্নিধ্য না থাকিলে প্রকৃতির স্বরূপ অবস্থায় বুদ্ধি অহঙ্কারাদির কোনও সত্তা থাকে না।

এ কথা যদি সত্য হয় তবে, বুদ্ধি cosmic intellect বা বিশ্ববুদ্ধি হইতেই পারে না। কারণ individual, ব্যক্তি বা পুরুষ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে বুদ্ধির বুদ্ধিরূপে কোনও অস্তিত্বই থাকে না। এবং সাংখ্যমতে পুরুষ এক নহে, বহু। সুতরাং বুদ্ধি সকলেরই এক মূল প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত হইলেও বুদ্ধি স্বরূপে ইহা বহু, এক নয়। এ কথা সত্য যে, এই বুদ্ধি বা মহান্ আমাদের দেশের শাস্ত্রেই একটা বিশ্বশক্তি রূপে কল্পিত হইয়াছে—তাহার প্রমাণ মনুসংহিতা প্রভৃতি নানা স্থানে আছে। কিন্তু আমি যতদূর সাংখ্য দর্শনের অভিব্যক্তির ইতিহাস বুঝিয়াছি, তাহাতে এ সমুদয় মত এবং তান্ত্রিক মত সাংখ্য দর্শনের বিকৃতি বা adaptation, মূল সাংখ্যের মত নহে। একথাও বলা যাইতে পারে যে, সাংখ্যদর্শন যে সমুদয় প্রাচীন মূলের সংস্কার হইযা উদ্ভূত হইয়াছিল সেই প্রাচীন চিন্তার অন্য একটি স্বতন্ত্র ধারা প্রবৃদ্ধ ও পরিণত হইয়া এই সমুদয় মতবাদ রূপে আবির্ভূত হইয়াছে। কিন্তু যে বিশিষ্ট দর্শন সাংখ্যদর্শন নামে পরিচিত, তাহার মত অনুসারে যে মহান্ বা বুদ্ধি ব্যক্তিগত বা individual ব্যাপার, cosmic নহে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহা পূর্ব্বোক্ত যুক্তি হইতেই প্রমাণ হইবে। তাহা ছাড়া ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকায় স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে যে, প্রকৃতি এক কিন্তু বুদ্ধি আদি বিকৃতি অনেক (১)

(১) সাংখ্য কারিকা ১০—হেতুমদনিত্যমব্যাপী সক্রিয়মনেকমাশ্রিতং লিঙ্গং। সাবয়বং পরতন্ত্রং ব্যক্তং বিপরীতমব্যক্তম্।

স্থানান্তরে ৪০—পূর্ব্বোৎপন্নমসক্তং ইত্যাদি। তত্ত্বকৌমুদী ইহার ব্যাখ্যায় বলিতেছেন—প্রধানেনাদিসর্গে প্রতিপুরুষমেকৈক মুৎপাদিতম্।

সুতরাং বুদ্ধি, অহঙ্কার মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতি যে সকল তত্ত্ব সাংখ্যে স্বীকৃত হইয়াছে, সে সমুদয়ই বহু এবং কাজেই ব্যক্তিগত। তাহাদের মূল এক প্রকৃতি হইলেও তাহাদের তারতম্য আছে, সে তারতম্য পুরুষ-বহুত্ব হেতুক। ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের সান্নিধ্যে বুদ্ধ্যাদি বিকৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়। এই কথা যদি স্বীকৃত হয়, যদি আমরা বুঝি যে সাংখ্য দর্শনের বুদ্ধি অহঙ্কারাদি সমুদয় পদার্থই প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তর্নিহিত তত্ত্বমাত্র, তবে এই সমুদয় পদার্থ কল্পনার অন্তর্নিহিত যুক্তি পরিষ্কার বুঝা যায়। তাহা হইলে সাংখ্যের দর্শন বা ontology মনস্তত্ত্ব বা psychologyর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

আচার্য্য Max Muller স্বীকার করিয়াছেন যে, সাংখ্যদর্শনের তত্ত্ব সমুদয়ের অন্তর্নিহিত যুক্তি আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। কি ভাবিয়া, আমাদিগের বিজ্ঞানের (experience) কোন্ কোন্ প্রকাশের দিকে দৃষ্টি করিয়া সাংখ্যকার এই সকল তত্ত্ব কল্পনা করিয়াছেন, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। বুদ্ধিকে cosmic ভাবে কল্পনা করিলে এবং বুদ্ধি অহঙ্কার ও মন material এই মূল তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিলে, এ সকল কথা বুঝিয়া উঠা যায় না। কিন্তু যদি আমরা এগুলিকে ব্যক্তিগত ও মানসিক (psychic) তত্ত্ব বলিয়া বুঝি, তবে এই তত্ত্ব কল্পনার হেতু বাহির করা কিছুই কঠিন হয় না। আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে ইহা আমাদিগের ব্যক্তিগত বিজ্ঞানের বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। সাংখ্য তত্ত্ব কৌমুদীতে বাচস্পতি মিশ্র এই ভাবেই তত্ত্বের প্রমাণ করিয়াছেন।

আমি তত্ত্ব-কৌমুদী হইতে কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, কোন্ যুক্তির উপর সাংখ্যের এই সমুদয় তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যায় তত্ত্ব-কৌমুদী নিম্নলিখিত বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন—

"সম্মুগ্ধং বস্তুমাত্রন্তু প্রাক্ গৃহ্ণন্ত্যবিকল্পিতং।
তৎসামান্য বিশেষাভ্যাং কল্পয়ন্তি মনীষিণঃ।
তথাহি
অস্তি হ্যালোচনজ্ঞানং প্রথমং নির্ব্বিকল্পকং।
বালমূকাদিবিজ্ঞান সদৃশং মুগ্ধবস্তুজম্।
ততঃ পরং পুনর্বস্তুধর্ম্মৈর্জাত্যাদিভির্যয়া।
বুদ্ধ্যাবসীয়তে সাহি প্রত্যক্ষত্বেন সম্মতা॥

প্রত্যক্ষজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের এইরূপ বিশ্লেষণ দ্বারা বুদ্ধীন্দ্রিয় ও মনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রমাণিত হইল। তাহা ছাড়া এই বিশ্লেষণের ফলে বুদ্ধিরও ক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু বুদ্ধি অহঙ্কার ছাড়া কার্য্য করিতে পারে না। এসম্বন্ধে বাচস্পতি মিশ্র বলেন,

"যৎ খল্বালোচিতং মতঞ্চ তত্রাহমধিকৃতঃ. শক্তঃ খল্বহমত্র, মদর্থা এবামী বিষয়াঃ, মত্তো নান্যোঽহত্রাধিকৃতঃ কশ্চিদস্ত্যতোঽহমস্মীতি যোঽভিমানঃ সোঽসাধারণ-ব্যাপারত্বাদহঙ্কারঃ তমুপজীব্য হি বুদ্ধিরধ্যবসতি "কর্ত্তব্য-মেতন্ময়েতি।"

অপিচ

"সর্ব্বো ব্যবহর্ত্তা আলোচ্য মত্বা অহমত্রাধিকৃত ইত্যভিমত্য কর্ত্তব্যমেতন্ময়েতি অধ্যবস্যতি, ততশ্চ প্রবর্ত্ততে ইতি লোকপ্রসিদ্ধং। তত্র যোঽয়ং কর্ত্তব্যমিতি বিনিশ্চয়শ্চিতিসন্নিধানাদাপন্নচৈতন্যায়াঃ বুদ্ধেঃ সোঽধ্যব-সায়ো বুদ্ধেরসাধারণো ব্যাপারঃ।"

অবশ্য ইহাতে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের মত প্রত্যক্ষ জ্ঞান (perception) বা অধ্যবসায় (conation) এর সূক্ষ্ম সম্পূর্ণ ও সুসঙ্গত বিশ্লেষণ নাই, কিন্তু ইহা হইতে আমরা এই দেশে প্রাচীন কালে গৃহীত psychology র একটা ধারণা করিতে পারি। মোটা মুটি ধরিতে গেলে তাহার মতে যে কোনও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিতর চারিটি ধাপ আছে। প্রথমতঃ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা বস্তুর একটা অবিকল্পিত অস্পষ্ট ছায়া পাই; দ্বিতীয়তঃ এই অস্পষ্ট জ্ঞান বিশিষ্ট বা defined হয়; ইহা পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্বের discrimina-

tion, assimilation, localisation প্রভৃতি ক্রিয়া বলিয়া ধরা যাইতে পারে; তৃতীয়তঃ, এই যে বিশিষ্ট জ্ঞান ইহা আমার নিজের সঙ্গে কতকগুলি বিশিষ্ট সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া জানা যায়; চতুর্থতঃ, ইহা আমা হইতে স্বতন্ত্র একটি বস্তুজাত্যাদি ধর্ম্মদ্বারা বিশিষ্ট বস্তু বলিয়া পরিজ্ঞাত হয় এবং তৎসম্বন্ধে কর্ত্তব্য নিশ্চিত হয়।

বিজ্ঞান ও অধ্যবসায়ের ভিতর এই চারিটি ধাপ চারিটি স্বতন্ত্র principle বা তত্ত্ব হইতে উদ্ভূত বলিয়া বিবেচনা করিয়া সাংখ্যএই চতুর্ব্বিধ ক্রিয়া যথাক্রমে ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধির কার্য্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আমাদের ভিতর এই চারিটি তত্ত্ব আছে বলিয়াই এইরূপ চারিস্তরে আমরা জ্ঞান লাভ করি, এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে। কিন্তু এই চারিটি তত্ত্ব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নহে। এই ক্রিয়াগুলির পারম্পর্য্য অনুসারে তাহাদের যে পারম্পর্য্য তাহা তাহাদিগের উদ্ভবের পারম্পর্য্য বলিয়া কল্পিত হইয়াছে এবং একটি হইতে অপরটি উদ্ভূত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। বুদ্ধিই হইল মূল। বিশিষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে গেলে বুদ্ধিকে অহঙ্কার স্বরূপে বিকৃত হইতে হয়, "এই আমি," এইজ্ঞান না হইলে জ্ঞানই সম্ভব পর হয় না কিন্তু এই আত্মনিশ্চয়, বুদ্ধিরই প্রকার ভেদ বা একটি moment বুদ্ধি যখন নিজেকে "আমি" বলিয়া বুঝে তখন তা অহঙ্কার হইয়া দাঁড়ায়।

অহঙ্কার মানে "আমি" এই জ্ঞান। ইহা হইতে গেলেই আমি হইতে স্বতন্ত্র একটা কিছু—যাহা আমি নয় এমন একটা কিছু আসিয়া পড়ে, কাজে কাজেই অহঙ্কার হইতে বিজ্ঞানের দৈধ আসিয়া পড়ে। একদিকে অহঙ্কার ও তাহার যন্ত্র-স্বরূপ মন ও ইন্দ্রিয়, অপর দিকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় পঞ্চতন্মাত্র, সুতরাং অহঙ্কার হইতে এই দ্বিবিধ সৃষ্টি হয়, একথা বলা যায়। পঞ্চতন্মাত্র রূপরস শব্দ গন্ধ স্পর্শ, ইহা হইতে পঞ্চভূতের উৎপত্তি। একথা বলিবার কারণ এই যে, পঞ্চভূত যাহাকে বলি তাহা কেবল স্পর্শ শব্দরূপ রস গন্ধেরই সমষ্টি মাত্র।

এই যুক্তির উপর যদি সাংখ্য দর্শনের তত্ত্বগুলি প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বিবেচনা করা যায়, তবে ইহার একটা বেশ সুসঙ্গত ব্যাখ্যা ও হেতু পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতিকে matter এবং প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত সমুদয় বস্তুকে material সাব্যস্ত করিলে কিম্বা বুদ্ধিকে cosmic বলিয়া সাব্যস্ত করিলে এইরূপ কল্পনার কোনও বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

সাংখ্য দর্শনের যুক্তির আরম্ভ স্থান ব্যক্তিগত বিজ্ঞান, একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি; ইহার লক্ষ্য মোক্ষ, ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি। সুতরাং ইহা যে আমাদের আভ্যন্তরীণ জীবনের বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহা আর বিচিত্র কি? কারণ এই সমুদয় আলোচনার একমাত্র উদ্দেশ্য মোক্ষলাভের উপায় নির্দ্ধারণ। আত্মার স্বরূপ কি? ইহার বন্ধ কোথা হইতে? মোক্ষ লাভের উপায় কি? ইহার কি কি অন্তরায় আছে? এই সকল নিরূপিত করিয়া মোক্ষলাভের প্রণালী এবং মোক্ষের উদ্দেশ্যে জীবন নিয়মিত করিবার প্রণালী নির্দ্ধারণ করাই সাংখ্যের শেষ লক্ষ্য। সুতরাং বহুপুরুষের প্রত্যেকের ভিতর আত্মার যে যে বন্ধন আছে এবং মোক্ষলাভের যে যে অন্তরায় আছে, তাহাই বিশ্লেষণ করা ইহার প্রথম কার্য্য।

সাংখ্যের practical philosophy বিবৃত করিবার আগে একটি কথা বলিতে চাই, তাহার ইঙ্গিত আগেই করিয়াছি। সাংখ্য কি materialistic? Materialism ও idealism এর মধ্যে তর্কের বিষয় এই যে, আমাদের চিত্তের অবস্থাগুলি, আমাদের বিজ্ঞান, ভাব ও প্রবৃত্তিগুলি সমস্ত জড় পদার্থের ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হয়, না জড় পদার্থ আমাদের বিজ্ঞানের সৃষ্টি। যদি প্রকৃতিকে matter বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তবে সাংখ্য materialistic; কেন না, বুদ্ধি অহঙ্কার মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সমুদয়ই সেই প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত। কিন্তু সাংখ্যের প্রকৃতি যে matter, সে বিষয়ে প্রমাণ নাই; তাহা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। অপর পক্ষে, যে পঞ্চভূতকে বাস্তবিক matter বলা যায়, তাহাকে সাংখ্য শব্দ রূপরস গন্ধের সংযোগ জনিত বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন।

এখন এই শব্দগন্ধরূপরসস্পর্শ sensation এবং তাহা বাস্তবিক ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান মাত্র, একথা বলিয়া অনায়াসে সাংখ্যকে Berkely র মত idealist বলা যায়, কেন না সাংখ্যকার Locke এর মত শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধকে কোনও অতীন্দ্রিয় বস্তুর গুণ বলিয়া কল্পনা করেন নাই।

কিন্তু এরূপ মনে করিবার অন্তরায় আছে। প্রথমতঃ সাংখ্য-প্রবচনে বিজ্ঞানবাদীর এই সিদ্ধান্তকে ভ্রান্ত বলা হইয়াছে এবং এই পঞ্চতন্মাত্রকে ইন্দ্রিয় জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বলা হইয়াছে। সাংখ্য প্রবচনের সকল সূত্রকে সাংখ্য মতের অভ্রান্ত প্রমাণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না সত্য, কিন্তু এ মত যে সাংখ্যের মূল মত সেকথা স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ, ইন্দ্রিয়-জ্ঞান ও সে জ্ঞানের বিষয় যে শব্দ স্পর্শাদি তাহা স্বতন্ত্র, একটি আর একটি হইতে উদ্ভূত হইতেই পারে না। একটি subjective জ্ঞান ও অপরটি তাহার object. যাহা object বা জ্ঞানের বিষয় তাহা জ্ঞান স্বরূপ হইতে পারে না।

সুতরাং শব্দস্পর্শাদি বস্তু—সাংখ্যমতে ইহাদিগকে গুণ বলা চলে কিনা সন্দেহ; তদ্ঘটিত বিজ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র এবং ইহার একটি অপরটি হইতে উদ্ভূত নহে। কিন্তু এই উভয় তত্ত্বই অহঙ্কার হইতে উদ্ভূত। সুতরাং 'আমি' বলিয়া যাহাকে মনে করি তাহা হইতে এবং বুদ্ধি হইতে ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র উভয় তত্ত্বই উদ্ভূত। অতএব সাংখ্যের মতে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান ও তাহার বিষয়স্বরূপ যে তন্মাত্র তাহা পরস্পর নিরপেক্ষ হইলেও অহঙ্কার হইতে উভয়েরই জন্ম। কাজেই বিজ্ঞানবাদী না হইলেও সাংখ্য idealist, কেন না ইহার মতে ভূত বুদ্ধি হইতে উদ্ভূত।

আর একদিক হইতে দেখিলেও একথা প্রমাণিত হইতে পারে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রকৃতি এক হইলেও বুদ্ধ্যাদি সর্গ পুরুষ ভেদে ভিন্ন হয়। এবং এই সমুদয় সর্গই ব্যক্তিগত। সুতরাং আমার যে পঞ্চভূত তাহা আমার বিশিষ্ট অহঙ্কার হইতে উদ্ভূত এবং তোমার পঞ্চভূত হইতে ভিন্ন। Object of perception হিসাবে পঞ্চতন্মাত্র ও ভূতের ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষতা থাকিলেও তাহা আমারই জ্ঞানের বিষয়, তোমার জ্ঞানের বিষয়ের সঙ্গে মূলতঃ এক হইলেও ইহা তাহার একটা স্বতন্ত্র বিকাশ। সুতরাং এই পঞ্চভূতও প্রত্যেক বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে পৃথক্ সৃষ্ট হইতেছে। সেই বিশিষ্ট পুরুষের সাক্ষিত্বে তাহার যে বিশিষ্ট আকার হইয়াছে, সেই পুরুষের সাক্ষিত্ব না থাকিলে সেরূপ আর থাকিবে না, সে পঞ্চভূত প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যাইবে।

সুতরাং পঞ্চভূতের একটা দ্রষ্টানিরপেক্ষ absolute সত্তাই নাই। ইহা ব্যক্তিবিশেষের সাক্ষিত্ব-সাপেক্ষ। এ কথা materialism অপেক্ষা idealism এরই অনুকূল।

সাংখ্য দর্শনে বুদ্ধি অনেকটা স্থান জুড়িয়া আছে। ইহা যেমন একদিকে আত্মার বন্ধনের কারণ, অপর দিকে ইহাই আবার আত্মার মোক্ষের হেতু। অন্যান্য সর্গ অপেক্ষা বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতার কারণ চিতের সান্নিধ্য। বুদ্ধির নানা গুণ ও ক্রিয়া আছে, সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের তারতম্যে এই গুণ বা ক্রিয়া মোক্ষের অনুকূল বা প্রতিকূল বা নিরপেক্ষ হয়। সাংখ্যের practical philosophy এই অধ্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির গুণক্রিয়া ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে।

বুদ্ধির গুণ ও ক্রিয়া আমি সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া দুই একটি আবশ্যকীয় বিষয়ের একটু বিস্তৃত আলোচনা করিব। বুদ্ধির আটটি ভাব আছে; ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য এবং তাহার বিপরীত অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য এসকলই বুদ্ধির ভাবভেদ। জ্ঞানের দ্বারা অপবর্গ লাভ হয়, জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইয়া আমরা ক্রমশঃ বন্ধন হইতে মুক্ত হই। অজ্ঞানের পথে ক্রমশঃ বন্ধন বৃদ্ধি হয়। ধর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্মকার্য্যে প্রবৃত্তির দ্বারা মুক্তি হয় না, কিন্তু ইহার দ্বারা উন্নত হইতে পারি; পরজন্মে উৎকৃষ্টতর এবং মোক্ষের পক্ষে অধিক অনুকূল দশা

প্রাপ্ত হইতে পারি; অধর্ম্মে আমাদের অধোগমন হয়। বৈরাগ্য বা অনাসক্তি হইতে প্রকৃতির লয় হয় এবং সম্পূর্ণ অনাসক্তি হইলে জন্মমৃত্যু হইতে মুক্ত হওয়া যায়; রাগ বা আসক্তি হইতে সংসার অর্থাৎ জন্মমৃত্যুর আবর্ত্তন হয়।

বুদ্ধি হইতে আর একপ্রকার বিষয়ের সৃষ্টি হয়, সেগুলির নাম বিপর্য্যয়, অশক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধি। বিপর্য্যয় চতুর্ব্বিধ; অনুরাগ দ্বেষ ও অভিনিবেশ বা মৃত্যু ভয়—এগুলিও বুদ্ধির সৃষ্টি। অশক্তি, মূঢ়তা, মত্ততা প্রভৃতি বুদ্ধির বৈকল্য উৎপাদন করে।

তুষ্টিও বুদ্ধির ক্রিয়া ইহাতে মানুষের চিত্তকে লোভ দিয়া মোক্ষানুসন্ধান হইতে প্রতিনিবৃত্ত করে। ইহার নয়টি প্রকার ভেদ সাংখ্যে অতিশয় সূক্ষ্মতার সহিত দৃষ্ট হইয়াছে।

সিদ্ধি অষ্টবিধ, এগুলিতে মোক্ষলাভ না হইলেও মোক্ষের পক্ষে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়।

বুদ্ধির এই সকল ভাবক্রিয়াদির ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে সাংখ্য দর্শনে যে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা কেবল মাত্র সেই জাতীয় দার্শনিকেরই সম্ভব, যাহাদের সমস্ত দৃষ্টি যুগযুগান্ত ধরিয়া পড়িয়াছিল—আপনার অন্তরের দিকে, আত্মার মোক্ষের সন্ধানের উপর। বুদ্ধির ভিতর মোক্ষলাভের যে সমুদয় অন্তরায় আছে, তাহা ত্যাগ করিয়া যাহা মোক্ষলাভের অনুকূল তাহার অনুশীলন করিতে হইবে, ইহাই সাংখ্য-শাস্ত্রের উপদেশ।

পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে কেহ কেহ বড় আপশোষ করিয়া গিয়াছেন, আমাদের ভারতবর্ষের নৈতিক অবনতির কথা মনে করিয়া, এবং এই নৈতিক অবনতির হেতু তাঁহারা ধরিয়াছেন আমাদের দেশের দর্শনশাস্ত্র। আমাদের দর্শনে যখন সমস্তই বর্জ্জনীয় বন্ধন বলিয়া স্বীকার করে, তখন একথা আসিয়া পড়ে যে ভাল বা মন্দ কাজের মধ্যে কোনও তফাৎ আমরা স্বীকার করিতে পারি না, পাপ পুণ্য অব্যাস্ম দৃষ্টিতে সকল সমান হয়। মুড়ি মিছরির একদর হইয়া দাঁড়ায়।

যাঁহারা এ আপশোষ করিয়াছেন তাঁহারা অবশ্য হিন্দুর দর্শনশাস্ত্র কিছুই জানেন না, তাঁহারা কেবল শুনিয়াছেন—ইহার মোদ্দা কথাটুকু। সুতরাং যাঁহারা এই মত ধারণ করেন তাহাদিগকে দর্শনশাস্ত্র অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিতে বলা ছাড়া অন্য উত্তর দেওয়া চলে না। সাংখ্য কি বেদান্ত কেহই পাপ পুণ্যের এক মূল্য দেন নাই। "ধর্ম্মেণ গমন মূর্দ্ধং গমনমধস্তাৎ ভবত্যধর্ম্মেণ,"—পাপ কার্য্য মাত্রই মোক্ষ লাভের অন্তরায় ধর্ম্মকার্য্য তাহার অনুকূল, ইহা সকল শাস্ত্রের উপদেশ। পাপপুণ্যের প্রভেদ তাঁহারা স্বীকার করেন; কিন্তু তাঁহারা একথা বলেন, যে, কেবল আমাদের ব্যবহারিক জীবনের বা প্রাকৃত জীবনের পক্ষে এই প্রভেদ স্বীকার্য্য—ইহা চরম ভেদ নয়।

ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রে সর্ব্বত্রই, ভাল ও মন্দ, পাপ ও পুণ্যকে একেবারে চরম বস্তু বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। পরমেশ্বরের গুণ দিতে গিয়াও পাশ্চাত্য দার্শনিক তাঁহাকে Good, Just, Benevolent, Love প্রভৃতি আখ্যা দেন। ভারতীয় দর্শন একথা স্বীকার করে না। ভারতীয় দর্শনের মতে পুরুষের এমন অবস্থা হইতে পারে যাহাতে পাপপুণ্য সমান হয় অর্থাৎ পুরুষ পাপ ও পুণ্য দুইয়ের অপেক্ষাই উচ্চে বিচরণ করিতে পারে। সে অবস্থা আমাদের মত প্রকৃতিবদ্ধ জীবের নয়, সে মুক্ত পুরুষের, যাঁহার বিবেক জ্ঞান হইয়াছে, তাঁহার। আমাদের পক্ষে ধর্ম্ম যে অবশ্য কর্ত্তব্য, এ কথায় ইহাতে কোনও বাধা হয় না। আমার মনে হয় যে, অতিমানুষিক আত্মা সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তই বোধ হয় পাশ্চাত্য দর্শনের সিদ্ধান্ত অপেক্ষা সমীচীনতর।

বুদ্ধির আর একটি ভাব সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব, সেটি ঐশ্বর্য্য। ইহা বুদ্ধির গুণ, ইহা সপ্তবিধ—অণিমা, লঘিমা,

মহিমা, প্রাপ্তি, প্রকাম্য, বশিত্ব ও ঈশিত্ব। একথাগুলির অর্থ সকলেই জানেন। প্রত্যেক পুরুষের বুদ্ধি সম্বন্ধে এতগুলি বড় বড় কথা বলা খুব স্পর্দ্ধার কথা, এবং ইহা কেবলি গাঁজাখুরী বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয় যে, দার্শনিক মত হিসাবে এ মতটি অশ্রদ্ধেয় নহে এবং ইহা বিজ্ঞান বা Experience এর উপর প্রতিষ্ঠিত। বুদ্ধির যে অণিমা শক্তি আছে একথা বলিবার হেতু এই যে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অণুপর্য্যন্ত আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিতে না পারিলেও বুদ্ধির দ্বারা পরিগ্রহ করিতে পারি। সূক্ষ্মতম অণুতে প্রবিষ্ট হইবার ক্ষমতার অর্থ বুদ্ধির পক্ষে সেই অণুর আকৃতি ধারণ করা বলিয়া সাংখ্যে কল্পিত হইয়াছে।—তাহা যদি হয়, তবে বুদ্ধির অণিমা স্বীকার করিতে হয়। লঘিমা, মহিমা ও প্রাপ্তিও এইরূপ বুদ্ধির অশেষ প্রসার, যাহা আমরা সকলেই অল্পবিস্তর অনুভব করিয়া থাকি তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত। যাহার বুদ্ধির সম্যক্ অনুশীলন হইয়াছে, সে অনুভব করে যে ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে যে যত কিছু করিতে পারে বা জানিতে পারে, তাহার ভিতর এমন কিছু আছে যাহার শক্তি তাহার চেয়ে অনেক বেশী, যার এ বিষয় শক্তির সীমা নাই।

প্রাকাম্য, বশিত্ব ও ঈশিত্ব—এগুলিও এইরূপ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। বুদ্ধির দ্বারা আমরা কল্পলোকে না করিতে পারি এমন জিনিষ নাই, যাহা ইচ্ছা তাহাই করা, প্রকৃতিকে ভাঙ্গা গড়া ইহা আমরা নিত্যই করিয়া থাকি। বাস্তব জগতে তাহা করিতে পারি না সত্য, কিন্তু সুধু বুদ্ধির জগতে, ideaর জগতে এ শক্তির কোনও সীমা বা বাধা নাই। এই অবিতর্ক্য সত্যের উপর সাংখ্যের এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, বাস্তবিকই বুদ্ধির এ সকল শক্তি আছে কেবল ইন্দ্রিয়াদি করণের সসীমতা ও অশক্তির জন্যই বুদ্ধির এ শক্তির পরিচয় আমরা বাস্তব জগতে পাইতে পারি না। সাংখ্যাদির মতে সম্যক অনুশীলন দ্বারা চিত্তকে ইন্দ্রিয়াদি হইতে বিযুক্ত করিতে পারিলে আত্মা সেইরূপ ইন্দ্রিয়াদিবিযুক্ত অবস্থায় যখন আত্মা বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত থাকে, তখন বাস্তব [illegible] শক্তির পরিচয় দিতে পারে। এই [illegible] যোগাভ্যাসের প্রতিষ্ঠা।

এ মত সত্য কি মিথ্যা, যোগের দ্বারা [illegible] বস্তুজগতে প্রতিষ্ঠিত করা যায় কি না, সে বিচার নিষ্প্রয়োজন। আমাদের ব্যাবহারিক বিজ্ঞানে যাহা দেখিতে পাই, সেই উপাদানের উপর এমন একটা মতবাদের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে এবং তাহা শ্রদ্ধার সহিত বিচার করিবার যোগ্য, এবিষয়ে সন্দেহ নাই।

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

শারদশ্রী।

কালো আঁধারের অধর চিরিয়া
আলোক উঠিছে ফুটি,
বক্ষে ধরার লক্ষ ধারায়
সে আলো পড়িছে লুটি।
বঞ্জুল বনে মঞ্জুবীথিকা
পুলকিত মধুগন্ধে,
বন্দনা গীতি চন্দনা গায
উচ্ছল প্রীতিছন্দে।
স্বর্গ যে সুধা যক্ষের মত
বক্ষে রেখেছে ভরি,
সে মধুগন্ধ পবমানন্দে
বিশ্বে পড়িছে ঝরি।
করুণার ধারা জ্যোছনার মাঝে
ঝরিয়া পড়িছে সে,—

[illegible]মাঝারে নিঃস্ব যাহারা
সে সুধা ভথিয়া নে।

[illegible]দের বুকে শেফালিকা ফুটে
সুধার গাগরী বক্ষে,
[illegible] গন্ধ বিতরে
কুঞ্জ-কানন-কক্ষে।
উর্ম্মি ফেনিল সিন্ধু-সলিল
কল্লোল কল মাঝে,
বাঞ্ছিত চির মিলনের গীতি
রঞ্জিত সুরে বাজে।
বঙ্গের শ্যাম অঞ্চল খানি
উজ্জ্বল ধানে ভরা,
তারি মাঝে আজ বিশ্বের ধাতা
লক্ষ্মী পড়েছে ধরা।
পর্ণ-কুটীরে স্বর্ণের ধারা
ঝর ঝর ঝর ঝরে,
চিরবাঞ্ছিত শান্তির মত
লক্ষ শিরের'পরে।
চিরনিদ্রিত পল্লীর বুকে
একি জাগরণ আজি,
মন্দিরে পুনঃ আরতির ধ্বনি
মুহু মুহু উঠে বাজি।
উজ্জ্বল শত ভক্ত-হৃদয়
উৎসবে মাতোয়ারা,
উজ্জ্বল শিশু অন্তর খানি
উল্লাসে আজি হারা।
পল্লীর বুকে বল্লীবিতানে
ঝরিছে আলোক রাশি
সে আলোধারার আঁখিদুটি মাজি
উঠ গো পল্লী-বাসী।
সঞ্চিত যত আঁখি-লোর আজ
মৌন সমাধিমগ্ন,
চারিদিকে একি মধুজাগরণ—
জগৎ সুষমা লগ্ন।

চন্দ্র সবিতা গ্রহ তারকায়
আলোক যাঁহার রাজে,
জাহ্নবী কল কল্লোলে যাঁর
বন্দন-গীতি বাজে;
যাঁহার চরণ শতদল হতে
স্নেহ ধারা পড়ে ঝরি,
যে করুণাধারা নিয়াছে ধরার
দুঃখবেদনা হরি;
সেই চরণের শতদল হতে
একটি পর্ণ আসি,
বিশ্বের বুকে শরতের রূপে
আজিকে উঠিল ভাসি।

* * *

জয় জয় জয় বিশ্ব বিজয়
উজ্জ্বল ধ্রুব কান্তি,
সুন্দর চির বন্দ্য পরম
জয় জয় জয় শান্তি।

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

কাব্যসমালোচনায় আমিত্ব। *

যাঁহারা পাশ্চাত্য সাহিত্যের খোঁজ রাখেন, তাঁহারা জানেন যে, প্রাচীন আলঙ্কারিকদিগের সমালোচনা আর আধুনিক সমালোচনা দুইয়ের মধ্যে কোন যোগাযোগ নাই। আধুনিক সমালোচনার রীতি প্রাচীন রীতি হইতে উদ্ভূত হয় নাই। আমাদের নব্য সাহিত্যকদের কাব্য সমালোচনা প্রণালীর মূল খুঁজিতে

* ঢাকা সাহিত্য সম্মিলনে সাহিত্য শাখায় পঠিত।

গেলে কাব্যাদর্শ ও কাব্যপ্রকাশ ছাড়িয়া ইংরাজি বই ঘাঁটিতে হইবে।

এই নূতন সমালোচনা প্রণালীর বিশেষত্ব কি? বিশেষত্ব ইহার মধ্যে আমিত্বের প্রভাব। ভালমন্দের বিচার এখন বাহিরের মাপকাটিতে নয়, অন্তরের অনুভূতিতে। আমার যাহা ভাল লাগে, তাহাই আমি ভাল বলিয়া প্রচার করিব—বর্ত্তমান সমালোচনার এই স্পর্দ্ধা। কিন্তু প্রাচীন সমালোচকেরা এ স্পর্দ্ধা রাখিতেন না।

এ স্পর্দ্ধা কাব্যে ও কাব্যসমালোচনায় প্রথম প্রবেশ করিল বোধ হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে ফরাসি দেশ হইতে। রুসোর আমিত্বের গৌরবে ইহার সূত্রপাত দেখি। আমি ভাল লোক কি মন্দ লোক, সে কথা ছাড়িয়া, আমি যে আমি, এই স্পর্দ্ধা রুসো তাহার জীবন কাহিনীতে প্রথম ঘোষণা করেন। রুসোর Confessionsএর প্রথম লাইনেই সেই কথার সূত্রপাত—তিনি জগৎকে ডাকিয়া বলিতেছেন,আমি যে অন্য লোক হইতে পৃথক্,এই আমার গৌরব। এমন নির্ভয়ে, নিঃসঙ্কোচে আত্মপ্রকাশ রুসোর পূর্ব্বে কেউ করিতে পারেন নাই। এই আমিত্বের গৌরব সমাজে ও সাহিত্যে বর্ত্তমান যুগের মূল মন্ত্র। Matthew Arnold এই আমিত্বের গৌরবকেই modern spirit বলিয়াছেন—যে modern spirit এর প্রধান মুখপাত্র Goethe. "Goethe's profound, imperturbable naturalism is absolutely fatal to all routine thinking ; he puts the standard once for all inside every man instead of outside of him ; when he is told such a thing must be so. it has been held to be so for a thousand years, he answers with Olympian politeness, 'But *is* it so ? is it so to me ?"

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে কাব্য ও কাব্যসমালোচনায় যে অভাবনীয় বৈচিত্র্যের লীলা সম্ভব হইয়াছে,তাহার কারণ সংস্কারের বিরুদ্ধে স্বাতন্ত্র্যের এই জয় ঘোষণা। এখন সাহিত্য জগতে "সবাই স্বাধীন সবাই প্রধান, দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান।"

এই আমিত্ব-স্পর্দ্ধা কাব্যসমালোচনায় তথা কাব্যে যেমন ইউরোপে তেমন আমাদের দেশে প্রাচীন প্রথা-গুলি উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া দিতেছে। আমি কাব্য ছাড়িয়া বিশেষভাবে কাব্য-সমালোচনার কথাই বলিতে বসিয়াছি।

আমার ভাল লাগে, আমার মন্দ লাগে, এই লইয়া কি কাব্য সমালোচনা সম্ভব হয়? এই প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়। সংসারে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে দেশগত, কালগত, বংশগত কত প্রভেদ! আমি ভারতবর্ষীয় লোক; আমি একটি বিশেষ সমাজ ও সভ্যতার মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছি। বংশানুক্রমিক কতগুলি দোষগুণ আমার মধ্যে বর্ত্তিয়াছে। এই যুগের বিশেষ কতগুলি ভাব আমার উপর প্রসার স্থাপন করিয়াছে। আমার মনের অবস্থা মুহুর্মুহু বাহিরের শত শত ক্ষুদ্রবৃহৎ ঘাত প্রতিঘাতে বদলাইয়া যাইতেছে। ইহার মধ্যে অন্যের সঙ্গে আমার মিলনের সূত্রই বা কোথায়, আর আমার আমিত্বেরই বা স্থিরতা কোথায়,! আমার এইটি ভাল লাগে, এই সামান্য কথাটির মধ্যে কত যুগ যুগ ব্যাপী জটিল মনস্তত্ব ও মনোবিজ্ঞানের রহস্য নিহিত আছে, তাহা একবার বিবেচনা করা যাইতে পারে। আমার ভালমন্দ লাগার মধ্যে static elements দুইটি—প্রথম ধরুন আমার বংশানুক্রমিক ভাব। আমার নৈতিক, মানসিক ও দৈহিক জীবন এখন যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহা লক্ষ যুগ ধরিয়া আমার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধ প্রপিতামহ, অতিবৃদ্ধ-প্রপিতামহ হইতে আমার প্রথম বংশধর anthropoid পর্য্যন্ত সকলে গড়িয়া, পিটিয়া ঠিক করিয়া দিয়াছেন। এই Heredity শক্ত করিয়া অচল হইয়া আমার মধ্যে খুঁটা গাড়িয়া বসিয়াছে। ব্যক্তির মধ্যে এই একটা বংশগত static element. কেবল ইহাই নয়। আমার

এই বংশব্যাপী সঞ্চরমাণ ব্যক্তিত্ব একটি বিশেষ সমাজ ও সভ্যতার কালস্রোতে উপলখণ্ডের মত নানাপ্রকারের ঘসা খাইয়া একটি আকৃতি পাইয়াছে। এই sociology ও আমার মধ্যে অচল হইয়া আছে। ব্যক্তির মধ্যে এই আর একটা সমাজগত static element. কিন্তু এইবংশের অনুক্রম ও সমাজের অনুক্রম দুই মিলিয়া আমায় যে ব্যক্তি পড়িয়াছে, তাহাও পরিবর্ত্তনশীল। যুগধর্ম্ম বা কাল-প্রভাব বলিয়া একটা কথা আছে। শুধু static elements ধরিলে আমার মধ্যে ও আমার পিতার মধ্যে ব্যক্তিত্বগত প্রভেদ খুব বেশী হওয়া উচিত নয়। কিন্তু এই কালের প্রভাব ক্রমাগতই বংশের মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পরবর্ত্তীকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দিতেছে। তার পর বংশ ও সমাজ হইতে চিরাগত ভাবগুলির মধ্যে যুগ ধর্ম্ম অনুপ্রবিষ্ট হইয়া যে আমার আমিত্বকে একটি স্বতন্ত্র আকার দিয়াছে, তাহারই বা স্থিরতা কোথায়? বাল্যে যাহা ছিলাম, যৌবনে তাহা নাই, যৌবনে যাহা ছিলাম, বার্দ্ধক্যে তাহা নাই। কাল যাহা ছিলাম, আজ তাহা নাই, আজ যাহা আছি, আগামীকাল তাহা থাকিব না। এই সকল factorএর যোগাযোগ করিতে পারে অঙ্কশাস্ত্রে এতবড় calculus আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কাজেই ব্যক্তিত্ব বড় দুরধিগম্য। একজন লোক আমাকে বলিল 'মহাশয়, এই কবিতাটি আমার বিশেষ ভাল লাগিয়াছে'। এই ভাললাগার রহস্য কত জটিল হইয়া দাঁড়ায়। এই রহস্যের সমাধান কতগুলি কূট প্রশ্নের উপর নির্ভর করে—যথা আপনার আদিবংশধর হইতে সকলের নৈতিক, মানসিক ও শারীরিক জীবনের ইতিহাস কি? আপনি যে সমাজ ও সভ্যতার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার বিশেষ ধারাটি কি? আপনি যে যুগে শিক্ষা, সংস্কার লাভ করিয়াছেন তাহার বিশেষত্ব কি? কবিতাটি আপনার জীবনের কোন্ দশায় ভাল লাগিয়াছে? কোন্ দিন ভাল লাগিয়াছে? তখন আপনি কোথায় ছিলেন? আকাশ, পাতাল ও পৃথিবীর অবস্থা কি রকম ছিল? ইত্যাদি, ইত্যাদি। প্রশ্নগুলি ফৌজদারী আদালতে মোক্তারী জেরার মত শুনাইলেও ভাললাগার রহস্য নির্দ্ধারণের ইহা ভিন্ন পন্থা নাই। ভাললাগা মন্দলাগা যখন এত জটিল, পরিবর্ত্তনশীল, অনির্দ্দেশ্য, অসমঞ্জস তখন তাহা কোনো মাপকাটি হইতে পারে না। বোধ হয়, এইজন্য একদল সমালোচক সাহিত্য সমালোচনা হইতে ভাললাগা মন্দলাগা, একেবারে নির্ব্বাসিত করিতে চান।

তাঁহারা বলেন, সাহিত্য সমালোচনা একটা Science; বিজ্ঞানবিদের বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে যে রকম সম্বন্ধ, সমালোচকের সাহিত্যের সঙ্গে সেই রকম সম্বন্ধ হওয়া উচিত। বৈজ্ঞানিক যেমন বাহ্যজগতের পর্য্যবেক্ষক মাত্র, সমালোচকও তেমনি সাহিত্য জগতের পর্য্যবেক্ষক হইবেন। সাহিত্যের আগাগোড়া তিনি দেখিয়া যান, কোন্ রকম সামাজিক অবস্থায় কোন্ প্রকার সাহিত্যের উদ্ভব হয়, তাহা তিনি আলোচনা করুন; কোন্ মূল হইতে কোন্ শ্রেণীর সাহিত্য পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার তিনি অনুসন্ধান করুন। বৈজ্ঞানিকের মত সমালোচক আমিত্ব-বর্জ্জিত হউন। আজকালকার সাহিত্য সমালোচনায় এই একটা School উঠিয়াছে। এই ইতিহাস ও বিজ্ঞান মূলক সমালোচনার কাছে মুড়ী মুড়কির সমান কদর, Sackville, ও Shakespere এর সমান আদর, ভাস ও কালিদাসের সমান কদর, গ্রাম্য বাউল ও রবীন্দ্র ঠাকুর উভয়ের সমান স্থান! এই মতাবলম্বীরা সংক্ষেপতঃ বলেন, সমালোচকের কাজ সাহিত্যের হাটে দর যাচাই নয়, দোকান সাজান। এই Scientific view of literary criticism এর গোড়ার গলদ এই যে, মনোজগতের অভিব্যক্তি ও বাহ্যজগতের অভিব্যক্তি দুইয়ের মধ্যে মূলগত প্রভেদ আছে। জড় প্রকৃতির গতি আমার কোন তোয়াক্কা রাখে না। আমি তাহা হইতে আমাকে দ্রষ্টারূপে পৃথক্ করিয়া ফেলিতে পারি, কিন্তু মনোজগতের গতি যে আমাকেও ভাসাইয়া লইয়া

চলিয়াছে। নিউটনের Laws of Gravitation এ গ্রহ উপগ্রহের গতির কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই ; কিন্তু Aristotle এর Laws of Dramatic Unities ইউরোপের নাট্যসাহিত্যের গতিতে অনেক পরিবর্ত্তন করিয়াছে। Romantic Dramaর উদ্ভবের পরও তাহার প্রভাব লুপ্ত হয় নাই। সাহিত্য সম্বন্ধে সমালোচকের বৈজ্ঞানিক-সুলভ নির্ব্বিকার ত্রিগুণাতীত অবস্থা অসম্ভব।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, জগতের কতগুলি কবি ভাললাগা মন্দলাগার এই অস্থির জলস্রোতেও ভাসিয়া যান নাই। কেন যে Goethe এর কালিদাসকে ভাল লাগিত, কেন যে Swedish Academyর রবীন্দ্রনাথকে ভাল লাগিল, কেন যে ভারতবর্ষীয় পাঠকের Shakespeare ভাল লাগে,তাহার রহস্যভেদ কে করিবে? কোথায় প্রাচীন ভারতের শান্ত আশ্রমপদ আর কোথায় ঊনবিংশ শতাব্দীর বাণিজ্যপর জার্ম্মাণী। কিন্তু সেই তপোবনের শকুন্তলার মধ্যে একজন জার্ম্মাণ দেখিলেন, বর্ষারম্ভের মুকুলোদ্গম আর বর্ষশেষের ফলসম্ভার,—সকল সৌন্দর্য্যের সমন্বয়। কেমন করিয়া আশ্রমবাসিনীকে জার্ম্মাণ কবির ভাল লাগিল—তাহার রহস্য কে উদ্‌ঘাটন করিবে? ইহার মধ্যে ত কোন সংস্কারগত পক্ষপাতিত্ব থাকিতে পারে না।

একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। লোকের মন কতগুলি সাময়িক অবস্থায়ই সচল হইয়া উঠে। এই ভাললাগা মন্দলাগার ব্যাপারও মনের সচলতার ফল। এই সাময়িক অবস্থা মনকে কি রকম, কতখানি সচল করিবে, তাহা এই মনের সঙ্গে বাহ্যিক অবস্থার যে কতকটা যোগাযোগ আছে, তাহার উপর নির্ভর করে। দেবদেবী মূর্ত্তি হিন্দুর যতটা ভাললাগে, মুসলমানের তাহা লাগিবে না। কারণ ঐ মূর্ত্তির সঙ্গে হিন্দুর মনের গড়নের (constitution এর) সমাজ সভ্যতা ও সংস্কার গত একটি গভীর সম্পর্ক আছে। কিন্তু দেবদেবীমূর্ত্তি না হইয়া তাহা যদি এমন কিছু হইত, যাহাতে দ্রষ্টার মনের গড়ন যে রকমই হউকনা কেন, তাহার সঙ্গে গূঢ় ভাবে একটা সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে, তাহা হইলে তাহা হিন্দুরও যেমন ভাল লাগিবে, মুসলমানেরও তেমনই ভাল লাগিবে। আলো, বাতাস, সূর্য্য, চন্দ্র সকলেরই ভাল লাগে, কারণ তাহার সঙ্গে সকলের মনেরই সমান যোগাযোগ—সংস্কারে কি সভ্যতায় নয়, তাহার অপেক্ষা দৃঢ় কিছুর মধ্য দিয়া। সেই রকম,রাম বলিতেছে এই কবিতা আমার ভাললাগে, শ্যামও সেই কথাই বলিতেছে, যদুও তাহার সমর্থন করিতেছে, অথচ রাম, শ্যাম ও যদুর মনের গঠন পৃথক্ পৃথক্। তবে বুঝিতে হইবে যে, কবিতাটির এমন কোন সার্ব্বজনীনতা আছে,যাহাতে সমস্ত পার্থক্যের তলে যে মানব মনের একতা সূত্র আছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া কবিতাটি পাঠকদিগের মনের সঙ্গে একটা যোগ স্থাপন করিতে সমর্থ। অথবা কবিতাটি এমন একটা সাময়িক অবস্থার সৃজন করিতে পারে, যাহাতে দশ রকমের মন সমান সচল হইয়া উঠে। দশজনই একসঙ্গে বলে 'হাঁ, ভাল লাগে, খুব ভাললাগে'।

শ্রেষ্ঠ কবিতামাত্রই এইরকম একটা সাময়িক অবস্থার সৃজন করে, যাহা সকল মনকে সমান সচল করিয়া দেয়। বংশ,সমাজ,দেশ,কাল, সংস্কার সভ্যতাগত সকল পার্থক্যের মূলগত ঐক্যের সূত্র অবলম্বন করিয়াও সেই সূত্রে একটি নিগূঢ় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া কবির মনের সঙ্গে পাঠকের মন গাঁথিয়া দেয়। তাহা না হইলে শত শতাব্দী পূর্ব্বের কবিতা এখন আর চলিতে পারিত না। শ্রেষ্ঠ কবিতার এই গুণের মধ্যেই কেন যে কতগুলি কবিকে সকল দেশের সকল জাতির সকলযুগের পাঠকের ভাল লাগে, তাহার রহস্য নিহিত আছে। কবিতা কল্পনাবলে পাঠকের চারিদিকে একটা অপূর্ব্ব মায়িক অবস্থা সৃজন করিয়া ফেলে ও পাঠকের মনের সঙ্গে একটা অভূতপূর্ব্ব যোগ স্থাপন করে। পাঠকের মনকে,সেই সম্বন্ধের বলে সচল করিয়া তাহার ভাললাগা মন্দলাগা নির্দ্ধারিত

করে। সাহিত্যের এই মায়িক অবস্থা সৃজনের শক্তিকে Power of suggestion কিম্বা imagination বলিতে পারি।

"বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল
পুরাণো সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে
কোথা সে অশথ গাছ, কোথা সে জল"—

এই কয়টি কথায় যেন মায়াবলে কবি একটি অবস্থার সৃজন করিয়া গেলেন। ইহা কেবল ছবি নয়, ইহাতে যে কেবল ম্লান অপরাহ্নের ছায়ায় গ্রাম্য বধূগণের অশ্বত্থতলের পুষ্করিণীতে জল আহরণের জন্য দূর হইতে আগমনের ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা নয়। ইহার মধ্যে একটা গূঢ় power of suggestion আছে।'পুরাণো সেই সুরে কে ডাকে দূরে, কোথা সে অশথ গাছ.কোথা সে জল'। অতীত স্মৃতি যে মুছিয়া গিয়া আবার কল্পনা হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, নূতন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে তাহার যে আর স্থান নাই, সেই বিষাদময় অনুভূতি যেন কথার ছলে মনের চারিদিকে একটি অপূর্ব্ব মায়িক অবস্থা সৃজন করিয়া গেল। দিনের পর দিনের কম্মকোলাহলের মধ্যে সকল মানুষেরই মনে যে একটি নিবিড় শান্তির আকাঙ্ক্ষা ঘুমন্ত থাকে, কবির এই কল্পনায় সেই আকাঙ্ক্ষা জাগরূক হইয়া কবিতার সঙ্গে পাঠকের মনের একটি গাঢ় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দিল।

তানসেন যখন মেঘ মল্লার রাগিণী ধরিতেন, তখন নাকি আকাশ মেঘে ছাইয়া যাইত। তেমনি সকল শ্রেষ্ঠ কবিতার সঙ্গে সঙ্গে ভাবের মেঘ পাঠকের মনে ঘনাইয়া আসে। যখন যে অবস্থায়ই আপনি মেঘদূত পড়ুন, মনে হয় প্রথম শ্লোকের সঙ্গে সঙ্গেই মন্দাক্রান্তা ছন্দ যেন মন্ত্রের মত জানকীর স্নানপুণ্যোদক স্নিগ্ধচ্ছায়তরু রামগিরি আশ্রমকে ডাকিয়া আনিল। সেই স্নিগ্ধ শান্ত আশ্রমপদের মধ্যে একটি সম্ভোগ-বঞ্চিত বিরহী চিত্ত কাঁদিয়া উঠিল। সে ক্রন্দন গিয়া পৌঁছিল আষাঢ়ের সানু-আশ্লিষ্ট মেঘদূতের কানে। তারপরে কবির কল্পনারথে চড়িয়া রামগিরি হইতে উজ্জয়িনী ঘুরিয়া অলকা পর্য্যন্ত কত নদ নদী গিরি পল্লী নগর পার হইয়া গেলাম—অতীত যুগের সুখ দুঃখ মিলন বিরহের নানা ছবি দেখিলাম; মনে হইল, এই স্বাধিকার-প্রমত্ত যক্ষের বেদনা আমার নিজের হৃদয়ের মধ্যেই বাজিতেছে।

"ছয় ঋতু সহচরী
ফেলিয়া চামরছত্র সভাভঙ্গ করি
সহসা তুলিয়া দিল রঙ্গ যবনিকা—
সহসা খুলিয়া গেল যেন চিত্রে লিখা—
আষাঢ়ের অশ্রুপ্লুত সুন্দর ভুবন!
দেখা দিল চারিদিকে পর্ব্বত কানন
নগর নগরী গ্রাম, বিশ্বসভামাঝে
তোমার বিরহবীণা সকরুণ বাজে!"

পাঠকের মনের সঙ্গে কবির কাব্যের একটা অপূর্ব্ব সংযোগ হইয়া গেল। সংস্কৃত সাহিত্যে আপনারা মেঘদূতের নকলে লেখা কতগুলি কাব্য পাইবেন। তাহার মধ্যে কোন একখানা 'পদাঙ্কদূত' 'হংসদূত' কিম্বা 'উদ্ধব দূত' কালিদাসের কাব্যের সঙ্গে তুলনা করুন। বিরহোন্মত্ততা এই সকল নকল কাব্যেরও বিষয় বটে। কিন্তু কালিদাসের কল্পনা-শক্তি কোথায়? পাঠকের মনে কাব্যগ্রহণোপযোগী একটা ভাবের অবস্থা সৃজনের ক্ষমতা কোথায়?

গীতি কাব্যই হউক, আর মহাকাব্যই হউক, আর যে কোন রকম কাব্যই হউক, সকল কাব্যের মধ্যেই একটি নাটক প্রচ্ছন্ন থাকে। দেশকাল পাত্র সকলই তাহার মধ্যে পরিব্যাপ্ত থাকে। কবিতার সঙ্গে সঙ্গে সেই নাটকের লীলা ফুটিয়া উঠে। ছন্দের তালে তালে যতির ফাঁকে ফাঁকে যেন কথোপকথনের ভাব উঁকি ঝুঁকি মারে। শ্লোকে শ্লোকে পট পরিবর্ত্তন হয়। নটেরা উপস্থিত হইয়া কথা বলিয়া যায়, আবার আরেক দল আসিয়া উপস্থিত হয়। যে কোন একটি গীতিকবিতা বিশ্লেষণ করিয়া কথাটা বুঝান যাইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা'র একটি কবিতার স্বল্পশেষ,—

অধিক কিছু নেই গো কিছু নেই,
কিছু নেই।
যা আছে তা এই গো শুধু এই,
শুধু এই।
যা ছিল তা শেষ করেছি
একটি বসন্তেই।

এখানে একজন প্রেমিকের প্রবেশ। সে তার সমস্ত পুষ্পসম্ভার একটি বসন্তেই খোয়াইয়া ফেলিয়াছে। তবু ভাবিতেছে খরচের আর একটু বাকি আছে, কোন্ পুঁজি এখন খরচ করিব?

আজ যা কিছু বাকি আছে
সামান্য এই দান,
তাই নিয়ে কি রচি দিব
একটি ছোট গান?

এখানে একজন নায়িকার উদ্দেশ পাওয়া গেল। তাহাকে সামান্য জিনিষ দান করিতে প্রেমিকের সঙ্কোচ হইতেছে। তবু এই সামান্য দানের মধ্যে যে সোহাগটুকু আছে—তাহারই গৌরবে দানের দৈন্য গৌরবান্বিত হইবে। যথা—

একটি ছোট মালা, তোমার
হাতের হবে বালা,
একটি ছোট ফুল, তোমার
কানের হবে দুল;
একটি তরুতলায় বসে
একটি ছোট খেলায়
হারিয়ে দিয়ে যাবে মোরে
একটি সন্ধ্যা বেলায়।

এই যে সোহাগের সামান্য দান তাহার কেবলমাত্র অর্পণ-গ্রহণ ক্রিয়া হইবে না। ইহার মধ্যে একটু প্রণয়-লীলা থাকিবে। তরুতলে বসিয়া সন্ধ্যায় একটু প্রেমের অভিনয় হইবে। তাহাতে নায়িকারই জয় হইবে। এই গেল প্রথম দৃশ্য।

দ্বিতীয় দৃশ্যে পট পরিবর্তন হইল। এবার বসন্ত সম্ভোগে রিক্তহস্ত প্রেমিক চলিয়া গিয়াছে। বসন্ত গিয়া বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে। নদী কূলে কূলে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। এবার প্রেমিক খেয়ামাঝি সাজিয়া একলা ঘাটে বসিয়াছে। একখানি ভেলা তার সম্বল। এবার সে কোনো বিশেষ একজন প্রেমাস্পদকে আহ্বান করিতেছে। যে সাহস করিয়া অনুগ্রহ করিয়া তাহার ভেলায় পা দিবে তাহাকে সঙ্গে লইয়াই সে নদী পাড়ি দিতে রাজি আছে।

অধিক কিছু নেই গো কিছু নেই,
কিছু নেই।
যা আছে তা এই গো শুধু এই,
শুধু এই।
ঘাটে আমি একলা বসে রই,
ওগো আয়।
বর্ষা নদী পার হবি কি ওই?
হায় গো হায়।
অকূল মাঝে ভাসবি কে গো
ভেলার ভরসায়?

এমন সামান্য ভেলায় বর্ষার নদী কেমন করিয়া বাওয়া যাইবে?

আমার তরীখান
সৈবে না তুফান;
তবু যদি লীলাভরে
চরণ কর দান,
শান্ত তীরে তীরে, তোমায়
বাইব ধীরে ধীরে;

তখন আবার প্রেমের অভিনয় আরম্ভ হইবে।

একটি কুমুদ তুলে, তোমার
পরিয়ে দেব চুলে।
ভেসে ভেসে শুনবে বসে
কত কোকিল ডাকে
কূলে কূলে কুঞ্জবনে
নীপের শাখে শাখে।

কিন্তু প্রেমিকের এই প্রণয় স্বপ্ন টিঁকিল না। যখন পথিক আসিল, তখন প্রেমিক বুঝিল এযে বর্ষার নদী। বর্ষায় কি বসন্তের সম্ভোগ সম্ভব হয়? তাই প্রেমিক বলিতেছে—

ক্ষুদ্র আমার তরীখানি—সত্য করি কই.
হায় গো পথিক হায়,
তোমায় নিয়ে একলা নায়ে পার হব না, ওই
আকুল যমুনায়।

এই সমস্ত গীতি কবিতাটির মধ্যে কোন একটি বিশেষ ভাবের বিকাশ নাই। ইহার যে টুকু কবিত্ব, তাহা কেবল নাট্যলীলায়। এই নাট্যলীলা আপনারা গীতি-মাল্য ও গীতাঞ্জলির অনেক কবিতায়ই অনুভব করিবেন।

সকল কবিতার মধ্যেই একটি অন্তর্নিহিত নাট্যলীলা যত গভীর, কবিতার ভাবও তত গভীর হইবে। কবিতার মূলগত এই নাটকটি ধরিবার ক্ষমতাই পাঠকের রস বোধের ক্ষমতা। সাধারণ নাট্যকাব্য ও কবিতা শাস্ত্রেরই অন্তর্নিহিত নাটকে তফাৎ এই যে, কবিতায় নিহিত যে নাটক তাহার দেশ, কাল ও পাত্র বিশেষত্ব-বর্জ্জিত। যে দেশে এই ঘটনাবলী সংঘটিত হইতেছে, তাহা মনোরাজ্য। যে কালে হইতেছে, তাহা চিরন্তন। পাত্রেরা কোন ব্যক্তি নয়, ভাবের মূর্ত্ত প্রকাশ।

সকল কাব্যের মধ্যেই যে নাটক আছে, তাহা নাট্য কাব্যেও অবশ্য আছে। King Lear বহুপূর্ব্বে ইংলণ্ডে Celt দের রাজা ছিলেন। আমি ভারত বর্ষীয় হিন্দু পাঠক। আমার সঙ্গে সে কালের, সে দেশের ও সে সময়ের সভ্যতার কোন সংস্কারগত সম্বন্ধ নাই। কিন্তু Shakespear এর কল্পনা বলে King Lear আমার কাছে প্রাচীন কালের Celt রাজা সাজিয়া আসেন নাই। দেশ কাল পাত্রগত সকল সংস্কারের আবরণের মধ্যদিয়া King Lear এর মানুষমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাকে পরিষ্কার চিনিতে পারিতেছি—হাঁ আমাদের মতই দোষেগুণে মানুষ। কিন্তু Ben Jonson এর নাটকে এই গুণটি পাইবেন না। তাহার Humour কোন বিশেষ কালের ও বিশেষ ব্যক্তির। তাহার নাট্যকাব্যের পাত্রেরা নিজ-নিজ বিশেষত্বের গণ্ডীতে আবদ্ধ। তাহারা মানুষমূর্ত্তি ধরিয়া কল্পনাচক্ষের সম্মুখে দাঁড়ায় না, তাহারা যে মূর্ত্তিতে আসিয়া দাঁড়ায়, তাহা ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক ভিন্ন অন্যের নিকট অপরিচিত। এই মনুষ্যত্ব (Humanity) বিকাশেই Elizabethan drama র উৎকর্ষ। দুঃখের বিষয় আজ কালকার নাট্য সাহিত্যে সকল কাব্যের অন্তর্নিহিত এই প্রচ্ছন্ন নাটকটিকে টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা হইতেছে। যাঁহারা আধুনিক নাট্য সাহিত্যের খোঁজ রাখেন, তাঁহারা জানেন এই চেষ্টা বেলজিয়মের কবি মেটারলিঙ্কের নাটকে ও রবীন্দ্রনাথের আধুনিক কতগুলি নাটকে পরিস্ফুট। এই সকল Symbolical drama র উদ্দেশ্য সকল নাটকের মূলেই যে Symbol নিহিত থাকে, তাহাকে বাহিরে টানিয়া তোলা। আমার মনে হয়, তাহার ফল হইতেছে এই যে—যে রং নাটকের জীবন্ত ঘটনাবলীর অন্তরালে গাঢ় ও নিবিড় দেখাইতেছিল, তাহাকে শূন্য আলোতে বাহির করিয়া ফিকা করিয়া ফেলা হইতেছে।

কাব্যের এই power of suggestion, এই গূঢ় নাট্যলীলা পাঠকের মনকে ছাইয়া ফেলে। সমাজ সংস্কার ও সভ্যতার নানা স্তরের তলে মানবের যে Humanity আছে, সেইখানে এই নাট্যলীলা পৌঁছায়। কাজেই ইহা সকল দেশের, সকল জাতির, সকল রকমের পাঠকের মনের চারিদিকে একটা কাল্পনিক, মায়িক অবস্থা গড়িয়া তোলে। তখন যেন পাঠকের পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলি মুহূর্ত্তে বদলাইয়া যায়। পাঠক অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করে—'স্বপ্নো নু মায়া নু মতি-ভ্রমো নু'।

কবির কল্পনাশক্তির যদি এমন প্রভাব থাকে যাহা মুহূর্ত্তে দেশকাল সমাজ সংস্কার প্রভৃতির বৈষম্যগুলি ঠেলিয়া ফেলিতে পারে, তবে তাহা চিরকালই সকল মানুষের মনকে সমান সরস করিতে থাকিবে। কোনো কবিতা বা কাব্য সম্বন্ধে পাঠকের ভাললাগা মন্দলাগা কাব্যের এই কল্পনা শক্তিরই ফল। তবে এই কল্পনা শক্তির অনুভব সকল পাঠকের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে না বটে। অস্বচ্ছ পদার্থে যেমন সূর্য্যালোক প্রবেশ করিতে পারে না, তেমনই অনেকের মন এমন অস্বচ্ছ যে তাহাতে কল্পনালোক প্রবেশ করে না। একজন অঙ্ক-শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত নাকি Homer পড়িয়া বলিয়াছিলেন—what does it prove after all? অঙ্কপাতের মেঘে তাঁহার মন এমন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, যে, কল্পিত

হোমারের কল্পনাও সে মেঘ কাটিতে পারে নাই। এমন করিয়া কত মেঘ যে আমাদের মনের আকাশ ছাইয়া আছে, তাহার গণনা নাই। দিনের পর দিন কেবল বিষয় কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া মনকে আবরণের পর আবরণে ঢাকিয়া কল্পনার স্নিগ্ধ সূর্য্যালোক হইতে আবৃত করিয়া রাখিয়াছি। আমাদের এই মানসিক অস্বচ্ছতাই কাব্য গ্রহণের একমাত্র বাধা। দেশ কাল সংস্কার প্রভৃতি কবিতা সম্ভোগের কোন বাধাই নয়। সমজ্দার পাঠকের কাছে এসব লইয়া কবির কোন জবাবদিহি করিতে হয় না।

এখন আবার আগের দিকে ফিরিয়া যাই। কাব্য সমালোচনায় যে individual preference এর প্রভাব আসিয়া পড়িতেছে, তাহাতে কোন ভয়ের কারণ নাই। বরং ইহাতে কাব্যের আসল গুণেরই যাচাই হইবে। কেবল অলঙ্কার ও নবরস লইয়া কাব্য সমালোচনা করায়, কাব্যের যাহা প্রাণ—কল্পনাশক্তি বা সৃজন শক্তি বা পাঠকের মনোরাজ্যে একটা সাময়িক অবস্থা সম্পাদনের শক্তি—তাহা ধরা পড়িবে না। এইরূপ প্রাণহীন বিশ্লেষণপর কাব্য সমালোচনা করিয়া প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ কি ভারতবর্ষে কি ইউরোপে কত যে বিষম ভ্রমে পড়িয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। যখন সমালোচক পণ্ডিত বলেন—

'উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থ গৌরবং
নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়োগুণাঃ—

তখন তিনি একথাটা ভুলিয়া যান যে, উপমা, অর্থগৌরব ও পদলালিত্য সকলি বাহ্যিক, কিন্তু কাব্যের প্রাণ সৃজন-শক্তি—কল্পনাবলে একটা মায়িক অবস্থা সংঘটনের ক্ষমতা। এই শক্তিতে শক্তিমান্ বলিয়াই কালিদাস কবিসম্রাট্। একবার যিনি কালিদাসের কাব্য পড়িয়াছেন, 'তিনি কুমার-সম্ভবের বিশ্বব্যাপী বসন্তচাঞ্চল্যের মধ্যে স্থির-প্রতিষ্ঠ ভূতনাথের আশ্রম—

নিষ্কম্পবৃক্ষং নিভৃতদ্বিরেফং
মূকাণ্ডজং শান্তমৃগপ্রচারং

প্রভৃতি, কিম্বা মেঘদূতের সান্ধ্য-আরতিমুখর মহাকাল মন্দিরের চারিদিকে বিস্তীর্ণ সম্ভোগরত বিলাসপরায়ণ উজ্জয়িনী—

স্বল্পীভূতে সুচরিতফলে স্বর্গিণাং গাং গতানাং।
শেষৈঃ পুণ্যৈর্হৃতমিব দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকম্

প্রভৃতি, কিম্বা অভিজ্ঞানশকুন্তলের বনবাসী ঋষি কণ্বের অননুভূতপূর্ব্বস্নেহানুসিক্ত শকুন্তলার আশ্রম হইতে বিদায়—

যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্টমুৎকণ্ঠয়া

প্রভৃতি—কখনও ভুলিতে পারিবেন কি ? ইহার মধ্যে যে অপূর্ব্ব সৃজনীশক্তি বা কল্পনাশক্তি আছে, তাহার তুলনায় কালিদাসের উপমা, ভারবির অর্থগৌরব, নৈষধের পদলালিত্য ও মাঘের ত্রিগুণসমন্বয় সকলি তুচ্ছ।

কাব্যের যাহা প্রাণ, একটি গূঢ় নাট্যলীলায় তাহা ফুটিয়া বাহির হয়। সেই অপূর্ব্ব রঙ্গমঞ্চে রসজ্ঞ পাঠক ভিন্ন অন্য কেউ পৌঁছিতে পারেন না। সেই রঙ্গমঞ্চের কল্পনালোকে সকল রসভোক্তাকেই আত্মীয় বলিয়া চিনিতে পারি। সাধুবাদের সমস্বরে শুনিতে পাই গেটে করিতেছেন মল্লিনাথের প্রতিধ্বনি, Swedish করিতেছে বাঙ্গালীর প্রতিধ্বনি। এইখানেই কাব্যের সার্ব্বজনীনতা।

শ্রীসুকুমার দত্ত।

নাম-বৈচিত্র্য।

(স্বস্তিবাচন)

আমাদের নামকরণ প্রণালীতে একটু বৈচিত্র্য আছে কি না, তাহার আলোচনা করাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

একটু ধীর ভাবে চিন্তা করিলে আমরা দেখিতে পাই, এই পরিদৃশ্যমান জগতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে নামের মাহাত্ম্য একান্তই প্রবল। ছোট রেণু কণা হইতে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড—সর্ব্বত্রই নামের বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। সামান্য ব্যবসায়ীর পক্ষে সে সকল জাহাজের সংবাদ লওয়ার পূর্ব্বে ক্ষুদ্র কয়েকটা কথা বলিয়া, অদ্যকার বক্তব্য শেষ করাই শ্রেয়।

নাম পরিচয়-বোধক। নাম বলিলেই বস্তুটার চেহারা প্রকৃতি সমুদয়ই মনের উপর অঙ্কিত হয়। এই জন্যই প্রধানতঃ নামের প্রয়োজন। এক একটা নাম এক একটা বস্তুর স্বাতন্ত্র্য-বোধক। নামটি বলিলে তাহা জগতের আর সকল হইতে পৃথকরূপে চিহ্নিত হইয়া পড়িল।

(নাম-মাহাত্ম্য)

সাধক বলেন, 'নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি' অর্থাৎ যেখানে নাম সেখানেই তাঁহার অস্তিত্ব। স্বয়ং শ্রীভগবান্ দেবর্ষি নারদকে বলিয়াছিলেন—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ,
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।"

সুতরাং স্পষ্টই জানা গেল নামের সূতায় টানিলে তাঁহার আসিতেই হইবে। এই জন্যই বৈষ্ণব মহাত্মাগণ 'নামেরুচি' জন্মাইতেই ব্যস্ত। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, নামে অনুরক্তি হইলেই তাঁহার সম্পূর্ণ করুণা পাওয়া যাইবে। সেখানেই ভক্তের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়। ভগবদ্ভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধিকা শ্রীমতী রাধা বলিয়াছেন, 'সে নাম কাণের ভিতর দিয়া মর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছে। তাহাতেই আমি আকুলা হইয়াছি'। তারপর

জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো,

নাম জপিয়াই তিনি তন্ময়, আত্মহারা। নামে যে তৃপ্তি, যে শান্তি, যে সুখ, প্রাপ্তিতে তাহা নাই। থাকিত যদি, তবে ত তিনি বলিতেন না—

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়ে জুড়ান না গেল।"

দর্শনে স্পর্শনে যেন আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রহিয়া গেল। কেবল বাসনায় ঘৃতাহুতি ছাড়া আর ত কিছুর সন্ধান তাহাতে পাওয়া গেল না। কিন্তু নামে পরিতৃপ্তির অবসর সম্পূর্ণই বর্ত্তমান। দশম দশায় শ্রীরাধা বলিতেছেন—

"কৃষ্ণনামটী শুধাইও কাণে।"

তাহাই তাঁহার অন্তিম কামনা। নামের শক্তি, নামের প্রভাব সর্ব্বত্র এমনই দেখা যায়।

যখন সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণ দান করিয়াছিলেন, তখন অগণিত রোরুদ্যমান নরনারী আপনাদের সমুদয় সম্পত্তি তৌলে দিয়াও শ্রীকৃষ্ণকে রাখিতে পারিল না। কিন্তু একটি মাত্র কৃষ্ণনাম মূল্য দিয়া উদ্ধব গোটা কৃষ্ণ রাখিয়া দিয়াছিলেন। নারদ নাকি কৃষ্ণের চেয়ে কৃষ্ণনামটীর মূল্য বেশী মনে করিয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণের বদলে নাম লইয়া গেলেন।

মন্ত্রশক্তি যেমন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাগিণীতে এক এক শব্দে বিভিন্ন শক্তির বিকাশ দেখায়, নাম-শক্তিও তেমনই। যথা

"অগ্নিমীলে পুরোহিতম্"

না বলিয়া "ঈলে বহ্নিংপুরোহিতম্' বলিলে অর্থ হইয়াও মন্ত্র শুদ্ধ হয় না। তেমনি এক একটী নামে এক একটী কার্য্য সুসিদ্ধ অসিদ্ধ হয়। যেমন—ভূতের ভয়ে রাম নাম, বিপদে মধুসূদন, শয়নে পদ্মনাভ, প্রভাতে দুর্গানাম। বিপদে

'পদ্মনাভ' নাম লইলে হয়ত অশুদ্ধ হইবে। অন্তিম সময়ে কর্ণমূলে তারকব্রহ্ম নাম, কালী, দুর্গা, রাম, শিব প্রভৃতি নাম শুনাইবার ব্যবস্থা। সেখানে ত্রিবিক্রম বা নরসিংহ নাম, ছিন্নমস্তা কিম্বা ষোড়শী নামের স্থান নাই। রাম-নামে জলে শিলা ভাসিত, কৃষ্ণনামে শুষ্কতরু মঞ্জরিত হইত, দুর্গানামে আপদ বালাই দূর হইয়া যায়। যাত্রা-কালে সিদ্ধিদাতা গণপতি, দুর্গা, কালী, নারায়ণ প্রভৃতির নাম স্মর্তব্য। কিন্তু সর্ব্ব কার্য্যে 'মাধব' নাম। মরা পোড়াইতে মুহুর্মুহু হরিধ্বনি! সর্পভয় নিবারণে মনসা, আস্তিক, গরুড় নাম ফলপ্রদ। কর্কোটক নাগ, দময়ন্তী, নল ও ঋতুপর্ণ রাজার নাম স্মরণ করিলে 'কলি' ভয় নাশ হয়। 'হরিনাম কীর্ত্তন' গ্রামে কলেরার প্রকোপের সময় মস্ত বড় প্রতিষেধক। চৌবাচ্চার জলে বা কূপোদকে স্নান করিয়াও 'গঙ্গা গঙ্গা' বলি; তাহাতেই যেন বড় আত্মপ্রসাদ লাভ হয়। মৃত্যুকালে নিজ পুত্র 'নারায়ণ'কে ডাকিয়া মহাপাপী অজামিল স্বর্গে গেল। দস্যু রত্নাকর 'মরা মরা' জপিতে জপিতে 'রাম' নাম লাভ করিল, তাহাকে অমর বাল্মিকী রূপে আমরা প্রাপ্ত হইলাম। প্রহ্লাদ হরিনাম সার করিয়া কত বিপদে ত্রাণ পাইল। সাধক রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী চিনিসপুরের জঙ্গলে বসিয়া গাইলেন—

'জংলার মাঝে ভাঙ্গা ঘরে,
এক্‌লা গো মা থাকি পড়ে,
ইঁদুরে হ্যালিয়া, পড়ে আছি কালীর নামের জোরে"।

নামের মধ্যে এতখানি জোর, এত ভরসা! সাধক নির্ভীক চিত্তে "নাম নিয়া তরী ভাসাইয়া দেন" কারণ তরী যদি ডুবে তবে নামের কলঙ্ক হইবে। সুতরাং স্বয়ং নামের মালীক সেই তরী রক্ষা করিতে বাধ্য। কেন না "নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি।" নিরুপায় তৃষ্ণার্ত্ত পথিক যখন নদী বা পুকুরে হাতের অঁজলায় জল পান করে, তখন সে মায়ের নামটী স্মরণ করিয়া 'মায়ের দুধ' খাই বলিয়া সেই জল পান করে। তাতেই জলের দোষ কাটিয়া যায়।

আমরা সহরে যখন থাকি, তখন ঝড় তুফানকে তত ডরাই না, কিন্তু গ্রামে থাকা কালীন ঝড় তুফানের সময় উচ্চৈঃস্বরে 'রামচন্দ্রজীর' দোহাই দিয়া থাকি। কারণ পবনদেব রামচন্দ্রজীর ভক্ত হনুমানের পিতা; অতএব সে ক্ষেত্রে রামনামের প্রভাব কম হইবে না। বিদ্যুৎ চমকিল আমরা তৎক্ষণাৎ "জৈমিনি, জৈমিনি" বলি। তাহাতে বজ্রাঘাতের ভয় থাকে না; নামটীর নাকি এতাদৃশী ক্ষমতা আছে!

নামে বিভীষিকা

বৈষ্ণবগণের মধ্যে এমন লোক আজিও দেখা যায়, যাঁহারা 'বিল্বপত্রের রসে মৃত্যুঞ্জয় বড়ি মারিয়া' খাওয়ার ব্যবস্থা শুনিয়া কবিরাজকে বলেন 'ও পত্রের রসে ও বড়ি ওরকমের খাওয়ার চেয়ে মৃত্যুই ভাল'। কেবল নামের জন্যই যে এই মৃত্যু কামনা, তাহাতে সন্দেহ নাই। "হাতী শুঁড়ার মায়ের পুরের মাঠে, তিন্ কারস্থি গাছের ডালে, প্রভুকে বানাইবার" গল্প সকলেই জানেন। দুর্গা-পুরে মাঠে বেলগাছের শাখায়' কথাটা বলা একান্ত আপত্তিজনক বলিয়াই শিষ্য ঐরূপ কৌশলে বলিয়াছিল। কেবল নামের বিরোধ। অনেক বৈষ্ণব ছেলেমেয়ের নাম রাখিতে শাক্ত দেবতার ছায়া স্পর্শও করেন না; শুধু নামবিভীষিকার জন্য।

পক্ষান্তরে কতকগুলি নাম গ্রামবিশেষে বা নির্দ্দিষ্ট স্থানমধ্যে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে বা জঘন্যরূপে পরিচিত হইয়া পড়ে। কতকগুলি নাম মধ্যাহ্ন ভোজনের পূর্ব্বে উচ্চারণ করিলে মেটে হাড়ি ত দূরের কথা, পিত্তলের পাড়ি পর্য্যন্ত চৌচির হইয়া আথায় পড়ে। অনেকে নাকি এইরূপ দুর্দ্দৈব পরীক্ষা করিয়াছেন। ঐ সকল ভাগ্যবান ব্যক্তির নাম দৈবাৎ উচ্চারিত হইলে তৎক্ষণাৎ জিভ কাটিয়া আপ্‌শোষ করিতে শোনা যায়। এই কুসংস্কার উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণকেও রেহাই দেয় নাই। কখন কখন ব্যক্তিবিশেষের নামের দোষে গ্রাম খানির নাম পর্য্যন্ত

লোকে সঙ্কেতে বলিয়া থাকে। কূর্ম্ম কচ্ছপ প্রভৃতি জন্তু, ধোপা নাপিত, তেলী প্রভৃতি মানবসম্প্রদায়ের নাম প্রাতঃকালে, যাত্রাদি সময়ে বা শুভকর্ম্মারম্ভে বিশেষ ভাবে নিষিদ্ধ। এজন্য কতকগুলি শুভকর নামের তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে। ঐসকল নাম নাকি বিশেষ ভাবে পরীক্ষিত। সেই গুলি শুভ অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়। এক সময় এদেশে জমিদারগণের 'নামে' বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাইত। আজিও সেই নাম-ভীতির সংস্কার স্বরূপ, অতি শান্ত সুশীল এবং আইনের নাগপাশে জড়িত জমিদার মহোদয়গণের নামে "প্রবলপ্রতাপেষু" লিখিত হওয়াই চাই। প্রতাপ যে আদৌ নাই, তাহা জমিদার ও জানেন, প্রজাও জানে,—কিন্তু অস্থি মজ্জায় মিশ্রিত পুরুষানুক্রমিক নাম বিভীষিকা চলিয়াছে,—তাহাকে ছাড়ান যায় না; কম্‌লী ছোড়ে না। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ বা দেবীসিংহের নামে আজিও পাষাণ গলিয়া যায়! আজিও উত্তর-বঙ্গের বিরাট শ্মশানে তাঁহাদের নাম দেদীপ্যমান। নবাব সিরাজদ্দৌল্লার নাম অক্ষয় বাবুর সাক্ষ্য সত্ত্বেও অগণিত নরনারীর হৃদয়ে ভীতি উৎপাদন করিতেছে। Nep comes বলিলে নাকি বিলাতের ছেলে মেয়েরা চক্ষু মুদিয়া থাকে। বর্গীর নামে এক সময় এদেশ অস্থির হইত। পল্লী-জননীরা আজিও বুড়ী, জুজু, মেকা, ঠোঁটা, প্রভৃতি কাল্পনিক নাম বলিয়া সন্তানকে শান্ত করেন। আমার সর্ব্বদমন ভ্রাতুষ্পুত্রটী দুনিয়ার মধ্যে একমাত্র 'কাঁকড়ার' নাম শুনিলে ঠাকুরটী হইয়া বসে। অথচ তাহাকে কখনও কাঁকড়া দেখান হয় নাই।

আমরা যে 'বাঙ্গাল' নামে বেশী খুসী হই না, তাহা সত্য। আবার যাঁহারা 'বাঙ্গাল' নহেন—তাঁহাদিগকে সাঁওতাল বলিলে চটে। 'ঘটিরাম' নামে কাহারও বেজায় আপত্তি। আমাদের অঞ্চলে 'রামলোচন' নামটী অতি আহম্মকের পরিচায়ক। রামদা, রাম ছাগল, রাম কলা, এমন কি রাম-চিম্‌টী পর্য্যন্ত পদ-গৌরবে শ্রেষ্ঠ,—কিন্তু একটী মাত্র ব্যক্তি 'রামলোচন' হইয়া, রামকে খাটো করিয়াছে।

(নাম মাহাত্ম্য—দ্বিতীয় দফা)

মহাকবি শেক্সপীয়র বলিয়াছেন—

"—নামেতে কি করে,
গোলাপ যে নামে ডাক—সৌরভ বিতরে."

কিন্তু উক্ত কবিই দেখাইয়াছেন, জুলিয়াস সীজারের হত্যাকারী সিনাকে হত্যা করিবার জন্য উন্মত্ত-প্রায় নাগরিক যখন কবি সিনার উপর খড়্গ তুলিল;—তখন কবি চীৎকার করিয়া কহিলেন,—আমি সীজারের হত্যাকারী নহি, নহি, নহি—আমি কবি সিনা! নাগরিকগণ বলিল—'হউক কবি সিনা' ইহাকে মারিয়া ফেল,—এই নামটাই পৃথিবী হইতে ঘুচাইয়া দাও। নাম-মাহাত্ম্য নহে কি?

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে যখন ফ্রান্সের প্রজা-সাধারণ সম্রাট লুই নেপোলিয়ন বোনাপার্টির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান, তখন একদিন প্রজাসভায় বসিয়া ভিক্টর হিউগো কেরাণীকে হুকুম দিলেন,—লেখ—"লুই নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বিদ্রোহী"।

তৎক্ষণাৎ জুলস ফেবার আপত্তি করিয়া কহিলেন, 'নেপোলিয়ন' নামটী কাটিয়া দাও,—কারণ ঐ নামটী প্রজাসাধারণের উপর বড় প্রভাবশালী। লেখ—"লুই বোনাপার্ট" বিদ্রোহী। এইত নাম মাহাত্ম্য।

আমাদের বাজারে চিচিঙ্গা নামে তরকারী বিক্রীত হইত,—একদিন জানা গেল উহার নাম চিচিঙ্গা নহে,—'গো-শিঙ্গা'। সেই নামের ফলে তরকারীটা দেশ হইতে প্রায় উঠিয়া গিয়াছে (আমাদের দেশের মুসলমানকে কদাচিৎ তরকারী কিনিয়া খাইতে হয়)। এমন লোক এখনও আছে, যাহারা ওল কচু প্রভৃতি খায় না; গলায় কুট্ কুট্ করে—এই ভয়ে। কিন্তু মেটে আলু বলিয়া ওল, কচু তাহাদিগকে খাওয়ান যায়; অপর দিকে মেটে আলু বা কাঁচকলার তরকারী খাওয়ার পর হয়ত আরও দুই

একটা তরকারী উদরস্থ করিয়াছেন,—এমন সময় কেহ সহসা বলিয়া উঠিল,—ওল আজ গলায় বড় ধরেছে। উনি তখন চেঁচাইয়া অস্থির হইবেন। এসকল দৃষ্টান্ত আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এস্থলে কেবল নামের দোষ—কেবল নামের মাহাত্ম্য।

নামে বিভ্রাট।

'মধুসূদন সিংহ' সহরে 'মধুসিংহ নামে' পরিচিত। তাঁহার বাসা খুঁজিতে একব্যক্তি আসল নামটা বিস্মৃত হইয়া 'গুড়ব্যাঘ্র' বাবুর কোন বাসা এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। কথাটায় অলঙ্কার বেশী থাকিতে পারে, কিন্তু মধুসিংহ যে সরাসরি "গুড়ব্যাঘ্র" নামে কথিত ছিলেন, তাহা মিথ্যা নহে।

কিছুদিন পূর্ব্বে এক শিক্ষিত যুবক ভদ্রলোক তীর্থ-ক্ষেত্র হইতে আসিয়া বড় ভাইএর স্ত্রীর নিকট জানাইলেন 'অমুকবাবুর কন্যা 'মিনুকে' আমি বিবাহ করিব,—আপনি সকল ঠিক করুন। এ বিবাহ না হইলে, আমি বাঁচিব না।' বরের পছন্দ অনুসারে মিনুর সঙ্গে তাহার বিবাহ স্থির হইল। বিবাহের বরণ মন্ত্রের সময় কলাতলায় যখন বরের প্রপিতামহ, পিতামহ ও পিতার নাম উল্লেখ করতঃ কন্যারও তিন পুরুষের নাম উল্লেখ করিয়া 'শ্রীকমলকামিনী' নামটী বলা হইল অমনি বর উন্মত্তের মত লম্ফ দিয়া আসন ত্যাগ করিল। এ নামটী তাহার মায়ের। এই ঘটনা খুব বেশী দিনের নহে। (অবশ্য সেই মেয়েটী সেই দিনই যোগ্যতর পাত্রে বিবাহিতা হইয়াছিল—অবান্তর হইলেও কথাটা বলিয়া রাখিলাম)।

আর এক বিভ্রাট হইয়াছিল নীলকমলকে লইয়া। কেবলমাত্র বাছা হনুমান নামটী শুনিলেই তাহার জ্ঞান থাকিত না। এখনও যাত্রার দলে নীলকমলের অভাব নাই। যে বেহালাদার স্বর্ণলতা পড়িয়াছে, তাহাকে যদি নীলকমল ডাকা যায়,—তাহার মেজাজ চটিতে গৌণ হইবে না। একচক্ষুহীন পদ্মলোচন নামে অভিহিত হইতে দেখা যায়। আর যে দুই দশটা নাম-বিভ্রাট আজকাল হয়, তাহার ভার সংবাদ পত্রের উপর দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারি।

নামে গুণ।

কতকগুলি নাম হয় গুণ অনুসারে—যেমন 'মিঠে দই' আবার কতকগুলি নামের ভিতর দিয়া গুণ প্রকাশ হওয়া চাইই চাই, গায়ের জোরে বা গলাবাজীর জোরে হউক আপত্তি নাই। সেগুলি ঢাক ঢোলের জোরে চলে, বিজ্ঞাপনে তাহাদিগকে বড় করিয়া রাখিয়াছে। গুণ নাও থাকিতে পরে,—কিন্তু নামের গুণে সেগুলি গুণী। সে সকল জিনিষের বা ব্যক্তির নাম উল্লেখ হয়ত নিরাপদ হইবে না। আমি এই মাত্র বলিতে পারি

"বুঝ লোক, যে জান সন্ধান।"

কতকগুলি নাম শুনিতে শুনিতে আমাদের গা সহা এবং অতিমাত্রায় পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। যেমন বঙ্গবাসী, হিতবাদী, বিজয়া বটিকা, জবাকুসুম, কুন্তলীন প্রভৃতি। এগুলির নাম মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। পল্লীগ্রামে বোতল ভরা জ্বরের ঔষধ মাত্রই ডিঃ গুপ্ত। ডিঃ গুপ্ত অর্থাৎ ডিঃ গুপ্তের ঔষধ। ডিঃ গুপ্তের এত নাম যে, জ্বরাসুর বা জ্বরাশনিও বাজারে ডিঃ গুপ্ত নামে চালান যায়—অবশ্য পাড়াগাঁয়ে। আমরা ছেলে বেলায় পিঃ ঘোষ অর্থে পাটীগণিত বুঝিতাম। এমন কি, যাদব বাবু দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যাদবের পিঃ ঘোষ নামে পরিচিত ছিলেন। ইংরেজী স্কুলে গৌরীশঙ্করের পিঃ ঘোষও কিছুদিন চলিয়াছে। জনৈক ব্যবসায়ী সজ্জন বলিয়াছিলেন—আমরা প্যাটেণ্ট জিনিসটার নাম এমন করিয়া দেশে বিস্তৃত করিব, যে সকল নরনারী তাহাকে চিনিতে পারে।—তারপর আমি টাকা ওয়ালা হইতে কেহ আটকাইবে না।

নামে রগড়।

নাম লইয়া অনেক রগড় অনেক স্থানেই হয়। সে সকল উল্লেখ করিলে পুথি বাড়িয়া যাইবে। দুই একটী নমুনা মাত্র দিব।

ট্রেণে এক ব্যক্তিকে অপর একজন জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"আপনার নাটি কি মশাই ?"

আমার নাম 'মহর্ষি শ্রীবেচারাম জোয়ারদার'। আপনার নাম ?' "আমার নাম অর্শি শ্রীকেনারাম ভাটীয়ালী।"

প্রথমোক্ত ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন 'অর্শি কেমন ?' "আজ্ঞে এই নুতন অর্শ হইয়াছে। রোগ পুরাতন হইলে মহর্ষি হইব।"

নাম লইয়া এই শ্রেণীর দুই দলের কয়েকটী দৃষ্টান্ত সংক্ষেপে উল্লেখ করিব মাত্র।—

দোল গোবিন্দ	রথ গোপীনাথ
ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী	বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থাবলী
সূর্য্যকান্ত দাম	চন্দ্রকান্ত পিঁপিঁ (পক্ষীবিশেষ)

ইত্যাদি।

(নামকরণের প্রথা)

নামকরণের অতীত ধারা আলোচনা করিলে দেখা-যায়, এদেশে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রকম নাম সৃষ্ট হইয়াছে। বৈদিক যুগের প্রাধান্য সময়ে বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক্য, ইন্দ্র, বরুণ, প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। ক্রমশঃ পুলস্ত, পুলহ, অঙ্গিরা, মরীচি, অত্রি, জনক, শাতাতপ, পরাশর, নারদ, বিশ্বামিত্র, দুর্ব্বাসা প্রভৃতি নাম দৃষ্ট হয়। ক্ষত্রকুলে ইক্ষ্বাকু, দিলীপ, অংশুমান, অসমঞ্জ, শান্তনু, যুধিষ্ঠির, ভীম, নল, দশরথ, দেবব্রত, ভীষ্ম, অজ, প্রভৃতি নাম ছিল। কার্ত্তবীর্য্য, কংস, রাবণ, কুম্ভকর্ণ নিবাতকবচ, মধু কৈটভ প্রভৃতি নামও সে কালের। অগস্ত্য ও কণ্ব প্রাচীন ব্যক্তি। তখন মেয়েদের মধ্যে মৈত্রেয়ী, গার্গী, অরুন্ধতী, কুন্তী, কৌশল্যা, আত্রেয়ী, সুমিত্রা, প্রভৃতির প্রচলন ছিল। ইহার পর দীর্ঘকাল নামের কোনও নিশানা পাওয়া দুষ্কর। তাহার পরে তান্ত্রিক যুগ। এই যুগে কালীভৈরব, কালীকিঙ্কর, দুর্গাদাস, দুর্গাশঙ্কর, চন্দ্রচূড়, চন্দ্রশেখর, মাতঙ্গিনী-শঙ্কর, কালীচন্দ্র প্রভৃতি নাম। মেয়েদের নাম বগলামুখী, মাতঙ্গিনী, ভৈরবী, ষোড়শী দুর্গা, তারাসুন্দরী প্রভৃতি। তারপর বৌদ্ধযুগ আসিল। এযুগে বিনায়ক, ধর্ম্মপাল, সত্যদাস, গৌতম, প্রভৃতি নামের প্রচলন হইল। আবার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের পতাকাতলে যখন সমগ্র ভারতের জনগণ দণ্ডায়মান হইল, তখন পুনরায় শাক্ত শৈবের নামে দেশ ভরিয়া গেল। দীর্ঘকাল শঙ্করের মত অনুসরণ করিয়াই এদেশে নাম বাছাই চলিল। অতঃপর প্রেম-অবতার শ্রীগৌরাঙ্গের বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্লাবনে বঙ্গদেশ ভাসিয়া গেল। ঘরে ঘরে নিমাই, নিতাই, গৌরাঙ্গ, হরিদাস, রামনারায়ণ, সনাতন, কৃষ্ণদাস, নরোত্তম, নবদ্বীপচন্দ্র, নদীয়ার চাঁদ, কানাইয়ালাল, গৌরসুন্দর, হরিদাসী, বিষ্ণুপ্রিয়া, শচীরাণী, গৌরবিনোদিনী, রাইরঙ্গিনী, রাধা-রাণী, কৃষ্ণকামিনী, নাম রাখা হইল। অনেক শাক্তও হরিনাম গানে মত্ত হইয়া গেলেন। শাক্তের ঘরে ঘরে গৌরাঙ্গের প্রেম হিল্লোল বহিল,—নামকরণে তাহা প্রকাশ পাইল। এ সময় তান্ত্রিকগণ বৈষ্ণবদের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই। আমাদের গ্রামেই যাঁহারা তান্ত্রিক-চূড়ামণি ছিলেন—তাঁহাদের মধ্যেই কৃষ্ণধন, কৃষ্ণচন্দ্র, কৃষ্ণকান্ত জন্ম গ্রহণ করিলেন। কেহ কেহ বা আপন অস্তিত্বের ক্ষীণরেখা বর্ত্তমান রাখিবার জন্য রামগঙ্গা, রামপ্রসাদ, চন্দ্রচূড়, ঈশানচন্দ্র, কালীচন্দ্র কালীভৈরব, শ্যামাশঙ্কর প্রভৃতি নামকরণ করিলেন। মোটের উপর এই সময় প্রভাবটা বৈষ্ণবদিগেরই বেশী। ঘোর্ শাক্ত বৈষ্ণবের পাশাপাশি দুইটী গ্রামে নিম্নলিখিত রূপে নবজাত ছেলে মেয়েদের নামকরণ হইয়াছিল। চৌকিদারের হাতের জন্ম মৃত্যুর তালিকা দেখিলে এরহস্য বড়ই উপভোগ্য হয়।

[সকল গুলি নামই পরস্পরবিরোধী না হউক, অন্ততঃ ২।৪।৬ মাস অগ্রপশ্চাৎ জন্ম হিসাবে নামের উপর যে প্রখর দৃষ্টি রাখা হইয়াছে, তাহাই এস্থলে লিখিত হইল।]

বৈষ্ণব পাড়া—	শাক্ত পাড়া—
হরিপদ, কৃষ্ণপদ	কালীপদ, তারাপদ
কৃষ্ণকুমার	কালীকুমার, শিবকুমার,
বৃন্দাবনচন্দ্র	কাশীচন্দ্র, কামাখ্যানাথ, কাশীনাথ
কৃষ্ণহরি	শিবশঙ্কর, তারাশঙ্কর
হরিসাধন	শক্তিকণ্ঠ
রামনারায়ণ	কালীভৈরব
বিষ্ণুপ্রিয়া	গঙ্গামরী, দুর্গাসুন্দরী
নারায়ণী	ত্রিপুরাসুন্দরী, ইত্যাদি

মোটামুটি দেখা যায়, প্রেমবিহ্বল বৈষ্ণব যুগ হইতেই এদেশে কোমলকান্ত মধুর মোলায়েম নামের সূত্রপাত। যথাস্থানে আমরা সে সকল নামের আলোচনা করিয়াছি। আমাদের সমাজের সংক্ষেপ নামকরণ প্রণালীর প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, প্রধানতঃ কয়েকটী বিষয়ের উপর নামকরণ নির্ভর করিত। (১) দেব দেবীর নাম অনুসারে,—দৃষ্টান্ত পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। (২) গুণের নামাদি অনুসারে,—যেমন—বিনয়কুমার, দয়ালচন্দ্র, কৃপানাথ, সাধুচরণ, প্রসন্নময়ী, দয়াময়ী ইত্যাদি। (৩) নৈসর্গিক পদার্থের নাম অনুসারে,—যেমন, চন্দ্রনাথ, সূর্য্যকান্ত, নক্ষত্র কুমার, তারানাথ, তারাসুন্দরী প্রভৃতি (৪) প্রাচীন আদর্শ ব্যক্তিগণের নাম অনুযায়ী, যেমন—রামচন্দ্র, রঘুনাথ, কৃষ্ণদাস, রাধারাণী, সাবিত্রী ইত্যাদি. (৫) কেহ কেহ সংযুক্ত নামের পক্ষপাতী। যেমন—কালীনারায়ণ, দুর্গারাম, কালীতারা, কালীকৃষ্ণ। (৬) তীর্থ স্থানের নাম অনুসারে, যেমন—বৃন্দাবনচন্দ্র, মথুরানাথ, কাশীনাথ, গয়ানাথ, বারাণসী কামাখ্যা, দ্বারকা ইত্যাদি। (৭) নদী প্রভৃতির নাম অনুযায়ী—গঙ্গা, যমুনা, নর্ম্মদা, কালিন্দী, সিন্ধুবালা।

বর্ত্তমান যুগে ঐরূপ আইন কানুনের আমলে থাকিয়া নাম রাখা হয় না। পশ্চাতে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

(নবযুগের নাম)

মহাত্মা রামমোহন রায়ের পরবর্ত্তী আমলে ব্রাহ্ম সমাজের নাম যথা—শ্রীশ, সত্যবন্ধু, সুকুমার, বিনয়, পরিমল, উৎপল, উৎসব, সত্যদাস, অশোক। সম্প্রতি কোনও ব্রাহ্ম ভদ্রলোক পুত্রের নামকরণ করিয়াছেন কানুসখা। ব্রাহ্ম মেয়েদের নাম—ভক্তিলতা, প্রীতিলতা, পুণ্যলতা, স্নেহলতা, ভক্তিসুধা, মিনতিবালা, অশোকা, বিজনবালা, শান্তিসুধা, শান্তিলতা, সুনীতি, ইন্দিরা, প্রতিভা প্রভৃতি। এসকল নাম হিন্দু সমাজেও সাদরে গৃহীত হইতেছে।

তারপর এদেশের নামের উপর বঙ্কিম চন্দ্রের প্রভাব একান্তই বেশী। বঙ্কিম নামটী গ্রামে গ্রামেই চলিল। 'বিমলা' পূর্ব্বেও ছিল এখন একটু বাড়িল। বীরেন্দ্র, নগেন্দ্র, সূর্য্যমুখী, কমল, কুন্দ, শৈবলিনী, সুন্দরী, এমন কি রোহিণীকেও বাঙ্গালী খুব ঘটা করিয়া আশ্রয় দিল; কালো ভ্রমরকে তাহার স্বামীই জিজ্ঞাসাটী পর্য্যন্ত করে নাই, আর কে তাহাকে তুলিয়া লইবে? প্রফুল্ল, নয়ন তারা, সাগর, ভবানী পর্য্যন্ত স্থান পাইল, কিন্তু "পিতা স্বর্গ পিতাধর্ম্ম" আওড়াইবার দোষে ব্রজেশ্বর প্রায় বাদই পড়িল। হেমচন্দ্র, গোবিন্দলাল, হরলাল, জীবানন্দ, সত্যানন্দ, মহেন্দ্র, কল্যাণী, শান্তি, চঞ্চল, নির্ম্মল, শ্যামাসুন্দরী, ইন্দিরা, মনোরমা, মৃণালিনী, মণিমালিনী, গিরিজায়া, জয়ন্তী ও রমায় দেশ ভরিয়া গেল। জন্মদুঃখিনী জানকী সীতাকে যেমন কেহ আদর করিল না, সীতা নাম রাখিলেই মেয়ের অদৃষ্ট মন্দ হইবে, এই আশঙ্কায় কেহ ঐ নামটীর ধারেও যায় না, তেমনই চির দুঃখিনী কপালকুণ্ডলাকে কেহ বরণ করিল না। আমাদের চিরদুঃখী কবিবর গোবিন্দ চন্দ্র দাস মহাশয় তাঁহার প্রথম পক্ষের কন্যার নাম রাখিয়াছিলেন মণিকুণ্ডলা। ঐ মেয়ের জন্ম হইতেই কবির দুঃখের সুরু হইয়াছিল বোধ হয়। বেচারী

দিগ্‌বিজয় ঝাঁটা খাইয়াছিল, সে সমাজে মুখ দেখাইল না। একটু গুপ্ত দোষ ছিল, তাই অভিরাম স্বামীও গৃহীত হইলেন না। গজপতি আর আশ্‌মানী দেশত্যাগ করিল। লবঙ্গলতা, রজনী, শচীন্দ্র, দেবেন্দ্র, হীরা তৃতীয় শ্রেণীতে ঠাঁই পাইল। এমনি করিয়া ছোট বড় সকলেই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস খুঁজিয়া নাম বাছিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে রমেশচন্দ্রের বিন্দু, সুধা, পুষ্প, সরযূরও আশ্রয় হইল। তেজস্বী বলিয়া তেজসিংহ বঙ্গদেশে বড় আমল পাইল না। হেমচন্দ্রের ইন্দুবালার গুণে দেশ মুগ্ধ হইল, নবীনচন্দ্রের শৈলজার খুব আদর হইল। জাতিভ্রষ্ট বলিয়া বুঝি মধুসূদন তেমন সহানুভূতি পাইলেন না। তাঁহার প্রমীলা, সরমা নিম্নশ্রেণীতে পড়িল। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের নামগুলির আদর হইল না, আদর হইল স্বয়ং লেখকের। হেম, নবীন, বঙ্কিমও খুব মর্য্যাদা লাভ করিলেন। কোনও কোনও বঙ্কিম-ভক্ত মেয়ের নাম রাখিয়া বসিলেন—"দেবী চৌধুরাণী, দুর্গেশ নন্দিনী"।

কতকগুলি নাম নির্ব্বাচনে আমরা ঔপন্যাসিকগণের অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শন করিয়া বিস্মিত হই। নামগুলি এমন মানান-সই যে তাহার পরিবর্ত্তন চলে না। পরিবর্ত্তন করিলেই সব মাটী। নামগুলি যেন বর্ণনীয় বিষয়ের হুবহু চিত্র। গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের নামে, উপাধিতে, চরিত্রে, চালচলনে ও বিদ্যাবুদ্ধিতে এবং বর্ণনীয় বিষয়ের সামঞ্জস্য-বিধানে অতি সুন্দর হইয়াছে। এই নামটী বদলাইয়া মনোমোহন বিদ্যাবিনোদ বা অন্য কিছু নাম রাখিলে উপন্যাসটাই মাঠে মারা পড়িত। বিশেষতঃ 'আশমানির' সহিত অন্বর্থ হয়, এমন আর একটী নাম কোথায় মিলিবে? মাধবীনাথ সরকার নামটী শুনিলেই মনে হয়,—লোকটা বেজায় খড়িবাজ, একটু মোটা সোটা, ভুঁড়িওয়ালা, একটু কালো মতন চেহারা, রাশভারী এবং সম্ভবতঃ একজোড়া আধাকাঁচা পাকা গোঁফও আছে। স্বর্ণলতার গদাধরচন্দ্রকে বদলাইয়া সুকুমার বা দেবনাথ নাম দিলে খাটিবে কি? ইন্দ্রনাথের 'পঞ্চানন্দ' দীনবন্ধুর 'রাম-মাণিক্য' চমৎকার। প্রভাত বাবুর 'জগদম্বা' অতি অপূর্ব্ব রকমের খাপ খাইয়াছে। এখানে লবঙ্গলতা বা কৃষ্ণমণি খাটিত না। 'নিদ্রাসিংহ জমাদার' নামটী বলিলেই লোকটার কার্য্যতা মালুম হইতে বিলম্ব হয় না। 'দেবী চৌধুরাণী' নাম শুনিলে সেকালে দাসী কেন—অনেক পুরুষেরও হাত পা কাঁপিত।

কতকগুলি নাম লইয়া সমগ্রজাতি, দেশ, সমাজ গর্ব্ব করে আবার কতকগুলি নামের কলঙ্ক কখনও যায় না। কতকগুলি নাম রাখিতে অভিভাবক ব্যস্ত,—কতকগুলি নাম যত্ন পূর্ব্বক বর্জ্জন করেন। রামমোহন, দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র, রাণী ভবানী, মহারাণী স্বর্ণময়ী, নবাব আবদুলগণি, নবাব আবদুল লতিফ, রাণা প্রতাপসিংহ বা সম্রাট আকবর প্রভৃতি নামের গৌরব কে না স্বীকার করিবেন? আবার অনেক নাম আছে, যে গুলি সর্ব্বদা নিন্দনীয়। সে সকল নাম উল্লেখ করা অনুচিত। আমরা মেয়েদের নাম রাখিতে চিরদুঃখিনী হওয়ার আশঙ্কায় বুঝি সীতা নামটী রাখি না—জানকী রাখি। কিন্তু সীতানাথ বা সীতাকান্ত রাখিতে আপত্তি করি না।

এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহাদিগকে চক্ষে দেখিনি,—অথচ তাঁহাদের নামেই হৃদয় শ্রদ্ধাভরে নুইয়া পড়ে। সুধু নাম মাহাত্ম্য নহে—কার্য্য মাহাত্ম্যও এস্থলে আছে বটে।

হাই তুলিতে, আয়েস করিতে হিন্দুরা 'হরি দয়াময়, কালী করুণাময়ী, গুরু তোমার ইচ্ছা' প্রভৃতি নাম নিতান্তই সহজ ভাবে বলিয়া যান। মুসলমানেরা বলেন-'আল্লা হো করীম' 'আল্লা হো আকবর'।

মাইকেল মধুসূদন হইতেই এদেশে বিদেশী নামের সূত্রপাত। অবশ্য দেশী খৃষ্টিয়ানদিগের মধ্যেই বিদেশী নাম চলিতেছে বেশীর ভাগ। আবার মাঝে মাঝে হিন্দুদের মধ্যেও সেই সকল নাম আসিয়া পড়িতেছে। নেলি বানার্জ্জি, ভিক্টোরিয়া মিত্র, ত্রিপুর-

চন্দ্র দাস, রেজিনা, লিলি, টমাস, অনেক আসিয়াছে। 'ফটিক চন্দ্র' খৃষ্টিয়ান হইয়া ফ্রেডারিক চোজন্ হউক আপত্তি নাই; কিন্তু বাঙ্গালা অভিধানে শব্দের দৈন্য না হওয়া পর্য্যন্ত, কেন যে হেলেন, রমলা, ডোরা, ষ্টার, ডেসি, হেনা, মীনা, রোজ, লিলি—আসিতেছে—বুঝি না। এই সকল নামের আমদানি শ্রুতি-সুখকর হিসাবে কি অন্য কারণে হইতেছে, নির্ণয় করিতে পারি না। একমাত্র বাঙ্গালী ভিন্ন ভারতের আর কোনও জাতি নামের উপর বিদেশী বার্ণিশ লাগাইয়াছেন, এরূপ শুনি নাই। পঞ্জাব হইতে মহারাষ্ট্র পর্য্যন্ত যে সকল নাম আমরা কাগজ পত্রে পাই, তাহাতে ত সকলেরই একটা স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়। ইংরেজেরা যেমন Mr Blackwood বা কৃষ্ণকাষ্ঠ মহাশয়, Mr. Smith, Mr. Carpenter প্রভৃতি নাম রাখেন—আমরা আজিও সেই সকল নাম আরম্ভ করি নাই।

আমার এক বন্ধু তাঁহার একটী মেয়ের নাম রাখিয়াছেন 'কবিতা,' একটীর নাম 'জ্যোৎস্না'। সেই দেখাদেখি আমিও মেয়ের নাম রাখিয়াছি হাসি এবং খুসী। বন্ধুবর কেদার বাবু 'আরতি' পত্রের পৃষ্ঠপোষকতার সময় জাত কন্যার নাম রাখেন "আরতি।" "সৌরভ" সম্পাদন কালে কেদার বাবুর একটী পুত্র হইয়াছিল—তাহার নামও 'সৌরভ' রাখা হয়। কবিবর গোবিন্দচন্দ্র দাস তাঁহার এক মেয়ের নাম রাখিয়াছিলেন "স্বাধীনতা"। তাঁহার আর দুইটী মেয়ের নাম শক্তি ও ভক্তি। আমার এক আত্মীয় বাড়ীর ছেলেদের নামকরণ হইয়াছে—দুর্গেশ, প্রণবেশ, স্বারোচিষ। স্বদেশী হুজুগের সময় স্বদেশরঞ্জন, স্বদেশসেবক প্রভৃতি নাম দেখা দিয়াছিল।

এখন আমরা স্থানভেদে নামকরণ ভেদ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। একটু লক্ষ্য করিলে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের নামে একটা পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রী-বোধক পুরুষের নাম পশ্চিম বঙ্গে অপেক্ষাকৃত কম,—পূর্ব্ববঙ্গে বেশী। কামিনী, যামিনী, নলিনী, রমণী, পদ্মিনী, কুমুদিনী, তরণী, মোহিনী, অবলা, সরোজিনী, বিমলা, শরৎশশী, প্রমীলা প্রভৃতি পুরুষের নাম পূর্ব্ববঙ্গে ঢের বেশী। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষীরোদাতীনাথ, গীষ্পতি, লাডলীমোহন চলে। এক সময় 'প্রদীপ' পত্রের কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন 'নিরপরাধচন্দ্র'। এ সকল নাম এদেশে বিকায় না। নামের উপর 'চন্দ্রের' জোর জোয়ার পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় বঙ্গে চলিয়াছে। চন্দ্র এমনই শোভন এবং প্রিয় যে তাহার এলাকা এড়াইয়া যাইতে বহু লোক নারাজ। ইন্দুক বিধু, সুধাংশু নিশাকর, অব্জ, সোম, মৃগাঙ্ক প্রভৃতি বিবিধ রকমে চন্দ্রের খাতির রাখা হইতেছে। কিন্তু ময়মনসিংহের জমিদার পাড়ায় কিশোরের জলুস। ভবানী কিশোর, জিতেন্দ্র কিশোর, সতীশ কিশোর, গিরীশ কিশোর, মহিম কিশোর হইতে ব্রজেন্দ্র কিশোর, যোগেন্দ্রকিশোর, উপেন্দ্রকিশোর, নরেন্দ্রকিশোর, ধীরেন্দ্রকিশোর, কেবলকিশোর হীরেন্দ্রকিশোর, পর্য্যন্ত। কোনও গ্রামে বা পরিবারে নারায়ণের অধিষ্ঠান। যেমন নগেন্দ্রনারায়ণ, অমরেন্দ্রনারায়ণ, প্রফুল্লনারায়ণ, গিরীন্দ্রনারায়ণ, সুরেশ নারায়ণ, হরেন্দ্রনারায়ণ 'কেবল নারায়ণ' ও আছেন। অধ্যাপক সারদারঞ্জনের পরিবারে সব-ছেলেই রঞ্জন। এমন কি শৈলজারঞ্জন, হৈমজারঞ্জন নীরজারঞ্জন পর্য্যন্ত। ভূ-কৈলাস রাজবাড়ীতে 'সত্য' যুক্ত নাম হওয়াই আবশ্যক। শেষটা নাকি 'সত্যসত্য ঘোষাল' হইতে বাধ্য হইয়াছেন। হেতমপুরের বাড়ীতে নিরঞ্জন দেখাযায়। রামনিরঞ্জন, মহিমানিরঞ্জন ইত্যাদি। কোনও স্থানে "দাসের" উপদ্রব বেশী। যেমন—রামদাস, সত্যদাস, গোপালদাস, হরিদাস, কালিদাস, বলাইদাস, বামনদাস, প্রভৃতি। বীরভূম জিলা, ঢাকা নবাবপুর ও শাঁখারি-বাজারে 'হরির' আধিপত্য বেশী। হরিরাম, রামহরি, হরিমাধব, রাধহরি, হরিমাণিক্য, রত্নহরি, যত্নহরি, হরিবল, বলহরি ইত্যাদি। কোনও পরিবারে 'কৃষ্ণ' অগ্রগণ্য; যেমন শিবকৃষ্ণ, কুমুদকৃষ্ণ, প্রমোদকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ, কালীকৃষ্ণ, সুধাকৃষ্ণ ইত্যাদি।

যুগ বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে নামে আর একটা পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে। পুরুষগণ যেমন বিনোদিনী বাবু, অবলা সেন, বিরজা দত্ত, কুমুদিনী দাস, হেমন্তশশী চক্রবর্ত্তী, সরলামোহন ভট্টাচার্য্য, ইন্দিরা প্রসন্ন গুহ, পঙ্কজিনী রায়, হইতেছেন; তেমনই গৃহলক্ষ্মীগণ নগেন্দ্রবালা, সুরেন্দ্র বিনোদিনী, যোগেন্দ্র মোহিনী, গোবিন্দসুন্দরী, কৈলাসকামিনী, পাঁচুবালা, শৈলেন্দ্র নন্দিনী নাম গ্রহণ করিয়া নগেন্দ্র, সুরেন্দ্র, যোগেন্দ্র, গোবিন্দ, কৈলাস, শৈলেন্দ্র নামে অভিহিত হইতেছেন। এই বন্দোবস্তটা ভাল কি মন্দ ঠিক ঠাহর করিয়া উঠিতে পারি না। তবে একটু লাভ এই যে, পৌরুষ নামগুলি একেবারে আলোচনার বাহিরে পড়িতেছিল,—সেগুলি টিকিয়া গেল।

"অনাথ বালক" লেখক শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর মহাশয় লিখিয়াছেন "আজকালের নামগুলি খুব মসৃণ হওয়া চাই।" বাস্তবিক ছেলের নামটা যথা সম্ভব মসৃণ হওয়া যে একান্তই অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ কি? অনেকদিন আগে সুবিখ্যাত নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়, এই ঢাকায়ই একদিন বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন "আমাদের জাতীয় দৌর্ব্বল্যের পরিচয় আমাদের নামগুলির ভিতর দিয়া যেমন বাহিরে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তেমনই আমাদের দৈহিক শীর্ণতায়ও তাহা পরিস্ফুট হইতেছে। আমাদের এই দুর্ব্বল দেহকে অপরের চক্ষে সবল বলিয়া ভ্রম জন্মাইবার জন্য আমরা ইস্ত্রি করা ডবল ব্রেষ্ট্, হাইকলার, ডবলকফ্ শার্ট গায়ে দিই, মোটা মোজা পরি। আর যাহারা বলিষ্ঠ জাতি, তাহাদের পরিধান পাঞ্জাবী; যাঁহা বাহিরে—তাঁহা ভিতরে।" এখন আর প্রতাপ, চন্দ্রশেখর, বীরেশ্বর, মধুসূদন, গঙ্গাধর, রুদ্রেশ্বর, প্রভৃতি নাম কেহ তেমন পছন্দ করিতে চাহে না; মেয়ের মধ্যে লক্ষ্মী, দুর্গা, রুক্মিণী, সত্যভামা, পদ্মাবতী, ত্রিপুরাসুন্দরী, কাত্যায়নী, শ্যামাসুন্দরী, বগলামুখীর বড় আমদানী নাই।

'দধীচি' নাম একালে কেউ বড় রাখে না। ময়মনসিংহের জনৈক ভদ্রলোক ছেলের ঐ নামটী রাখিয়া কৈফিয়ৎ দিয়া হয়রাণ হইয়াছেন। নাম রাখিতে, এখন আমরা বিশেষ বিবেচনা করিতে বাধ্য হইতেছি; ইহা কালধর্ম্ম।

জনৈক ভদ্রলোক তাঁহার পুত্রের নাম রাখিয়াছেন "শান্তিশতদলবিহারী"। সুতরাং অপর একজন তাঁহার ভাগিনেয়ের নাম রাখিয়াছেন—'গোপীজন-বল্লভ-পদরেণু-পঙ্কজ-রঞ্জন বাগচী' (নামটী আমার কল্পিত নহে—সত্য। তবে ছেলেটীর ডাকনাম টেনু কি টুনু। টেনু ইংরেজী Ten এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ নহে—টন্‌টনের সহজ সংস্করণ মাত্র)। 'ললিত লবঙ্গলতা' নাম এখনো দেখা যায়।

কতকগুলি নাম এদেশে নূতন আমদানী। নামগুলি কোমলকান্ত মধুর পদাবলীর রসভঙ্গ করিয়া দিয়াছে। যেমন—শাক্যসিংহ সেন, উপাসকচন্দ্র নন্দী, কৌশিকীচরণ মুখোপাধ্যায়, বিনয়েন্দ্রনাথ সরকার। সকল নামের মধ্যে অধুনা 'ন্দ্র'র জোর বেশী। স্যর রবীন্দ্র নাথ এই 'ন্দ্র' যুগের প্রবর্ত্তক কি না ঠিক ধরা যায় না—কিন্তু 'ন্দ্র' যেন চৌঘোড়ার গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়াছে। হেমেন্দ্র, ব্রজেন্দ্র, নীরেন্দ্র, দেবেন্দ্র, কৃষ্ণেন্দ্র, মনীন্দ্র, সুরেন্দ্র, সৌরান্দ্র, শৌরীন্দ্র, মহেন্দ্র, যোগেন্দ্র, যোগীন্দ্র, জ্যোতিন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্র, রথীন্দ্র, উপেন্দ্র, দীনেন্দ্র, বলেন্দ্র, গণেন্দ্র, গগণেন্দ্র, সুনৃতেন্দ্র ইত্যাদি—ওজন করিলে 'ন্দ্র' আজকাল বেশী ভারী প্রতীত হইবে।

কতকগুলি নাম উল্টাপাল্টা রকমেরও চলিতেছে। —মোহনলাল—লালমোহন। কালীকৃষ্ণ, কৃষ্ণকালী, কুমারকৃষ্ণ, কৃষ্ণকুমার, চন্দ্রভূষণ, ভূষণচন্দ্র, গঙ্গারাম, রামগঙ্গা।

যুধিষ্ঠির, ভীমাদি পঞ্চপাণ্ডবের নাম চলে, দুর্য্যোধনও একেবারে অচল নহে, কিন্তু শ্রীবৎস, নল, চলে না কেন? অদৃষ্টে দুঃখ ঘটিয়াছিল বলিয়া কি? রামচন্দ্রই

আর জীবনে কত সুখভোগ করিয়াছেন ?

ভাটীমুলুকে হিন্দু নরনারীর নামে এখনও আলোক প্রাপ্ত নাম অপেক্ষা—পুরুষদের সাধু, মুরারি প্রভৃতি নাম এবং মেয়েদের—পঞ্চমী, নবমী, দশমী, বিজয়া প্রভৃতি দেখা যায়। নিম্ন শ্রেণীতে ঢেকুরী, মুখুরী প্রভৃতি নামও আছে। মগ্নময়ী, উলঙ্গময়ী, হরিদাসী, ঠাকুরদাসী নামও পাওয়া যায়।

কতকগুলি নাম হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ে চলিতেছে। যেমন—বদন, কমল, সুন্দর, নয়ন, দানু, কানু, কানু, নানু, জীবন, ফটিক ইত্যাদি। আমাদের দেখাদেখি আমাদের অঞ্চলে মুসলমান পাড়ায় তারা, কুসুম, বেলী, বাণী, প্রভৃতি নাম চলিয়াছে। রাজধর জয়ধর ত বহুকাল হইতেই চলিত। একটী মুসলমান পরিবার 'ঠাকুর' পরিবার নামে পরিচিত। সেই বাড়ীতে একটী লোকের নাম "দামোদর ঠাকুর"।

দুই চারিটা নাম লইয়া সময় সময় একটু ধাধাঁয় পড়িয়া যাই। ঠিক ঠিক অর্থ বুঝিতে পারি না। যেমন—নিরপরাধচন্দ্র, গুরুবন্ধু, কালীবন্ধু, সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ প্রভৃতি। দুর্গাকান্ত, কালীকান্ত প্রভৃতি নামও আমাদের নিকট একটু কেমন কেমন ঠেকে।

কতকগুলি নাম বেশ প্রসাদ গুণ যুক্ত। নামগুলি শুনিলেই যেন মনে হয়—আহঃ! ছেলেটী বা মেয়েটী বেশ কিন্তু! জানা শুনা না থাকিলেও নাম শুনিয়া মনটা কেমন একটু হয়। মনে হয়—লোকটী ভাল। কতক গুলি নাম শুনিলেই লোকটার উপর অশ্রদ্ধার ভাব আইসে। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। আমরা উভয়ের মিশালে কতকগুলি আধুনিক নাম এখানে উল্লেখ করিব মাত্র। কে ভাল, কে মন্দ—বলিয়া হয়ত পার পাইব না। আপনারা ছেলে মেয়ের নাম রাখিতে যেটি পছন্দ করেন, বাছিয়া লইতে আপত্তি নাই।—

তরুণচাঁদ, অমিয়কান্তি, পীযূষকান্তি, পীযূষকিরণ, সুধাংশুকিরণ, মৃণালকান্তি, মৃণ্ময়, প্রভাতকুসুম, জ্যোৎস্না, পঙ্কজকুমার, সরোজনাথ, গোবর্দ্ধন, হীরালাল সুখময়, প্রিয়নাথ, প্রভাতকুমার, পরিমল, উৎপল, উৎসব, উপাসক, শাক্যসিংহ, অকিঞ্চন, অপূর্ব্ব, অখণ্ড-কুমার, বঙ্গেশ্বর, কুমারস্বামী, লাবণ্যকুমার, ইন্দ্রমোহন গদাধর, ভোলানাথ পঞ্চানন্দ ইত্যাদি।

ছেলেদের নামের মধ্যে কতকগুলি এমন যাহাতে বাপ মা'র কেন যে লজ্জা হয় না আমরা ঠিক ঠাহর করিয়া উঠিতে সমর্থ হই না। ছেলের নাম প্রমোদ রঞ্জন, প্রমদা রঞ্জন, কামদামোহন, অবলা মোহন, কামিনী বিহারী, অনঙ্গমোহন, রতিলাল, রাধারমণ, রাধাবিলাস প্রভৃতি নাম বাপ মায়ের মুখে কি ঠিক মানান-সই শুনায়? অভিসারিকামোহন নামটী এখনো আমদানী হয় নাই,—কিন্তু 'তেহি নো দিবসা গতাঃ'।

কখন কখন নামের অর্থ বুঝিতেও, আমরা বেকুব বনিয়া যাই। শিবেন্দ্র কিশোর তাঁহার পুত্রের নামকরণ করিয়াছেন 'জিনেন্দ্র'। এই পাথর কাটা প্রাত্নতাত্বিক বৌদ্ধ নাম ত ছোট খাট অভিধানে নাই-ই। সময় সময় এক এক দেশে এক একটা নাম যেন বাণ ডাকিয়া আসে। অহিভূষণের যাত্রা পালা যখন চলিল, তখন 'কনক' নামটী লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। কনক প্রভা, কনকসুন্দরী, কনকশশী, কনকবালা, কনক-সরোজিনী, কনক-কুমার, প্রভৃতি। একসময় হৈমবালা, হৈমবতী (খুবকম) হেমদা, হেমপ্রভা, হেমমালা, হেম-লতা হেমাঙ্গিনী, হৈমবালা, হেমকুমারী প্রভৃতি নামের বাহার পড়িয়া গিয়াছিল।

কোনো কোনো নামে অর্থগত এক আধটু গোলমালে পড়িতে হয়। 'প্রভাত' কালীন 'চন্দ্র' আদৌ মনোজ্ঞ নহে এবং প্রায় কাহারই মনোযোগের বিষয়ীভূত না হইলেও, দেশে 'প্রভাতচন্দ্র' নামের খুব বাড়াবাড়ি। বিরাজমোহন নাম কেন হয়? বিরজা কান্ত, বিরজা-মোহন নামই ত যেন শুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। যাহারা

ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া পৌত্তলিক-গন্ধি নামে বিতৃষ্ণ হন, তাঁহারা 'দুর্গাশঙ্কর স্থলে 'দুর্জ্জয়-সংহর' পর্য্যন্ত করিতে প্রস্তুত হন, এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে।

সদর্থযুক্ত কতিপয় নাম জন সাধারণের নিকট তেমন পছন্দ-সই বোধ হয় না। তাহারা নামগুলি ভারী বিশ্রী মনে করে। এমনকি ঐসকল নামের অর্থও হয়না বলিয়া তাহাদের ধারণা। যেমন প্রদ্যোৎ, প্রতুল, ত্রীভারী, গীপতি, লাডলীমোহন, সুনৃতেন্দ্র নাগ, গণেন্দ্র। কোন কোন ব্যক্তি প্রত্যেক নামের সঙ্গেই এক একটী লেজ জুড়িয়া দেওয়া অনিবার্য্য মনে করেন। সেই জন্য শশধর চন্দ্র রায়, কালিদাস চন্দ্র দত্ত, নরেশ্বর নাথ গুহ প্রভৃতি রকমের নামও আমরা শুনি। অতিরিক্ত এবং সরকারী উপাধি ছাড়াও এদেশে দোতালা তেতালা নাম দেখা যায়,—যেমন অক্ষয় কুমার দত্ত গুপ্ত চৌধুরী, অতঃপর যদি তিনি কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ-কবিরত্ন হন, তবে অনেক সময় মুস্কিল হইয়া দাঁড়ায়। ইনিই রায় বাহাদুর, সি, আই, ই প্রভৃতি উপাধি যুক্ত হইলে, তখন সরকারী এনভেলাপে তাঁহাকে পত্রলেখার স্থান কুলায় না।

কোন কোন পরিবার অনুপ্রাসযুক্ত নাম পছন্দ করেন। সুরেশ সমাজপতি, চারুচন্দ্র চৌধুরী, কামিনী কুমার কর, প্রভৃতির সীমা নাই। রাজা মহারাজরা মনোগ্রাম অব্যাহত রাখার জন্য নামের আদ্য-অক্ষর যথা সম্ভব মিলাইয়া রাখিতে চেষ্টা করেন। আমাদের শাস্ত্রেও এই বিধি অনুমোদন করিয়াছেন। এক্ষেত্রে একটু আশঙ্কার ব্যাপার এই যে, অক্ষরে নাম বেশী না হয়,—সেই অক্ষর যাহাদের নামের আদিতে, তাঁহাদিগকে লইয়া। উমেশ বাবুর ছয়টী ভাই যদি 'উ' কারাদি নামের হয়, এবং ছয় জনের গোটাকুড়ি ছেলে হয়, তবে মনোগ্রাম ঠিক রাখা দায় হইবে। খগেন বাবুর ও এক্ষেত্রে বিপদাশঙ্কা যথেষ্ট। 'অম্বর' যুক্ত নাম রাখিতেই হইলে, এক সময় মদেশ্বর, ডিসেম্বরের হাতে পড়িতে হয়, ইহা বাঞ্ছনীয় নহে।

আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালী সমাজে যাঁহারা দিকপালরূপে পরিচিত, তাঁহাদের নাম যেন একটু রাশভারী। অথচ সেই সকল নাম আজ কাল বাজারে বিকায় না। রামমোহন, কেশব, রামকৃষ্ণ, রামতনু, কৃষ্ণমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, ভূদেব, রাজনারায়ণ, রাজেন্দ্র লাল, চন্দ্রমাধব, রঙ্গলাল, মধুসূদন, কালীপ্রসন্ন, কৃষ্ণদাস, ঋষিবর, সংসারচন্দ্র, আনন্দমোহন—প্রভৃতি অনেক নামই প্রায় অচল। নামটা একটু টেরীচেরা, এসেন্স সুবাসিত, ফুর ফুরে হাওয়ার মত, কোকিলের গানের মত—শিশির-সিক্ত শেফালিকার মত হয়,—ছেলে মেয়ের মা বাপ বন্ধু বান্ধব সকলেরই এই ইচ্ছা। কেন?—কে উত্তর দিবে? মহেশ্বর সিদ্ধান্তরত্ন, যাদবেশ্বর তর্করত্ন, পঞ্চানন নিয়োগী বা গঙ্গাগোবিন্দরায় এখনকার স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের জিহ্বায় সরস ঠেকিতে পারে না।

অনেকগুলির নাম—উচ্চারণের সময় ইচ্ছায় হউক বা সহজ সাধ্য করিবার জন্যই হউক,-বড়বিকৃত করিয়া ডাকা হয়। যজ্ঞেশ্বর—যগু, জগদীশ জগা বা জগু, পঞ্চানন পঁচা, পঞ্চু; বলেন্দ্র—বলা, মেঘনাদ—মেঘু, সুরেন্দ্র—সুরু বা সুরিয়া, তারিণী তারু,—অনেকের এই নাম-দুর্দ্দৈব আজীবন ভোগ করিতে হয়।

নামের লাগিয়া গুনিয়া পাগল। নিজ নামটী জাহির করিবার জন্য মানুষের কত যে ব্যস্ততা, তাহা পরিমাণ করা দুষ্কর। কেবল আত্ম-প্রকাশ,—নিজের বিজ্ঞাপন জারী ব্যতীত ইহাতে আর কিছু নাই। শিক্ষা, দীক্ষা, প্রবন্ধ লেখা, ওকালতীকরা—সবারই মূলে ঐ নাম। 'রায়বাহাদুর' কে 'বাবু' বলিলে চটেন! ভূস্বামীকে 'মহারাজ' না বলিলে কার্য্যোদ্ধার হয় না। সংবাদপত্রের পত্রপ্রেরককে 'সাহিত্যিক' বলিলে খুসী হন। 'নাম' জাদা লেখকের প্রবন্ধ—পত্র সম্পাদকগণ মাথায় তুলিয়া নেন। 'নাম'জারী না করিলে গবর্ণমেণ্ট সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। উপাধি বৃদ্ধিতে নামের মাহাত্ম্য বাড়ে—এরূপ ধারণা সকলেরই আছে। শ্রীনিবাসকে 'ছেনু' ডাকিলে চটে,—

'শ্রীনিবাস বাবু' ডাকিলে খুসী হয়। ছাপার হরফে নিজ নামটী দেখিতে অনেকের সাধ। যত কিছু কাজ, টাকা পয়সা—সবই 'নামের' জন্য। সাধু সন্ন্যাসীরাও 'নাম' জারী করেন। কাহারও নাম তাঁহাদের শার্য্যের দেশ ময় ছাইয়া যায়।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দত্ত মহাশয় একদিন কথায় কথায় বলিয়াছিলেন—'বারবনিতাগণ যে জাতি হইতেই আসুক, তাহারা হিন্দু নাম গ্রহণ করে কেন?' আমাদের জাতির স্থিতি স্থাপকতা গুণই কি ইহার কারণ? 'পঞ্জাব গৌরব' নাটক রচিত হইতে পারিল না—কেবল ওক 'নানকের' নামটা তাহাতে ছিল বলিয়া, আর 'বোধনে বিসর্জনের' বোধ হয় কয়েক সংস্করণ পার হইয়া গিয়াছে। দেশলাই বাক্সে কালী, দুর্গা ত ট্রেড মার্ক হইয়াছেনই,—সম্প্রতি পরমহংসদেব সশিষ্য বাজারে উঠিয়াছেন। হিন্দুদের প্রশংসার কথা বটে।"

আমাদের ডাকনাম (Nick Name) ও উদ্দেশ্য-হেতুক নাম সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়া, আমার বক্তব্য শেষ করিতে প্রয়াস পাইব। ডাকনাম সাধারণতঃ নিম্নলিখিত কয়েকটা ভাগে বিভক্ত করিব।

(১) মৃতবৎসাগণ ছেলে মেয়েদের নাম রাখেন—অবিনাশ, অক্ষয়, নিবারণ, মরণচাঁদ বা মরণী, সাচুনা (ঝড়ু) ঝাঁটু (ঐ অর্থ বোধক) পঁচা, পোকরা, পোকন, ফালু বা ফেলু বা ফালানী, টোকানী (কুড়াইয়া পাওয়া), ভাসানী, থাক, অপ্রয়োজ্য তিনকড়ি, পাঁচকড়ি, নকড়ি, সাতকড়ি, কিনা, অমর, হারাণ, পলানী যা, মাগণ, ষষ্ঠীবর প্রভৃতি। এই নাম গুলির প্রত্যেকটী নামেই যেন যমরাজকে অনুরোধ করা হইতেছে—"ওগো—এইটীকে উপেক্ষা করিও।" স্নেহের কি মধুর নিদর্শন! এই শ্রেণীতে কেহ কেহ তুলসীদাস হরিবল, প্রভৃতি নাম রাখেন। তুলসী বা হরিবলকে রোগে ঔষধ খাওয়াইতে নাই, তুলসী তলার মাটীতে গড়াগড়ি দেওয়ান, সেই মাটী কপালে লেপন, ঠাকুরের চরণামৃত খাওয়ানই তাহাদের ঔষধ। মাথায় 'মানসিক' চুল রাখিতে হয়। কাহারও উচ্ছিষ্ট খাইতে পারে না। অনেকে মাছও খায় না—মাংস ত বলাই বাহুল্য।

(২) কতকগুলি নাম মূল্যবান্ পদার্থ-বোধক—চুণী, পান্না, মণি, হীরা, নীলকান্ত চন্দ্রকান্ত, সূর্য্যকান্ত—ইত্যাদি

(৩) ধাতু দ্রব্যবোধক—সোনা, স্বর্ণময়ী, রূপা, রজতনাথ, টাকার বাপ, লোহর খাঁ, লোহারাম শিরোরত্ন এখনও স্কুলপাঠ্য পুস্তকে দেখা যায়, তাম্রধ্বজ আগেকার দিনে ছিল, এখন দেখি বঙ্গরাজ, রঙ্গনাগর প্রভৃতি; বোধহয়, ধাতুবোধক নহে, আনন্দ সূচক। টিন, পিতল, পোস্ত নিকেল, প্লাটিনম বা রেডিয়াম, এলুমিনিয়াম প্রভৃতি এখনও আমরা 'নামে' ব্যবহার করিতে আরম্ভ করি নাই।

(৪) কতকগুলি ভক্তি পকাশক নাম—গুরুদাস, গুরুচরণ, গুরুপ্রসাদ, দেবদাস, দেবপ্রসাদ, দ্বিজদাস, তুলসীদাস, প্রসাদদাস।

(৫) চেহারার সাদৃশ্য ব্যঞ্জক নাম—যথা বুঁচি, পেঁচী (পেঁচারন্যায়), ভেবলা (বোকারাম)।

(৬) কান্নাকাটী যে ছেলে মেয়ে বেশী করে, তাহাদের নাম—কাউচা বা কাউচি, কান্দুরা, কুন্ত্রলীবা, (যাহাকে প্রবোধ মানান যায় না), কন্দলী (কলহ প্রিয়)।

(৭) জ্যামিতি অনুসারি নাম—যেমন 'রেখা', (এই নামটী ভদ্রলোকদের ব্যবহারের জন্য। কেহ কেহ বলেন নামটী কাব্যগন্ধি।)

(৮) মাছের নাম অনুসারে—পুঁটী, কাতলী, চিতলী বজরী।

(৯) ছিপছিপে পাতলা চেহারা যাহার, তারনাম—বাতাসী।

(১০) পাখীর নাম। যথা—পক্ষী (ময়মনসিংহে মস্ত কুলীন ব্রাহ্মণ পক্ষী খাঁ আজিও আছেন), পাখী, (আমার এক ডাক মা আছেন, তাঁহার মায়ের নাম পাখী), বিহঙ্গবালা কলি (কোকিলের অপভ্রংশ), চাতকিনী ময়না, টুনি, পারি, টিয়া, তোতা, টকু (বুলবুলকে টক্কা

বলে) বুলবুলি—ইত্যাদি

(১১) ক্ষুদ্রত্ব বোধক—পোকাই, কটি, ছোট্‌কা, টুরি, (সাপের ক্ষুদ্র কুনিকা) পোনা, মাকড়ি, রেণু, মেনী, টেপি, বেলা, ইন্দুরী ইত্যাদি

(১২) দুর্ভিক্ষের বর্ষে জন্মিলে নামটী হয় আকালী।

(১৩) ঝড় বৃষ্টি বাদলার দিনে জন্মিলে—মেঘা, মেঘী, তুফাণী, বাদল, বাতাসী, ডেওরিয়া (মেঘগর্জ্জনকে এদেশে দেওয়ার ডাক বা দেব ডাক বলে), বিজলী, প্লাবন।

(১৪) সৌন্দর্য্যবোধক—পটু (পটের আঁকা ইত্যর্থ) পটল, পটুলা সুন্দর, সুধমা, চান্দ ইত্যাদি।

(১৫) গ্রীষ্ম বর্ষা আমরা বোধহয় পছন্দ করি না। তাই ছেলে মেয়ের নামে উহাদিগকে বাদ দিয়া—শরৎ, হেমন্ত ও বসন্তকে আগ্রহ সহকারে বরণ করিয়াছি। শীতের ভয়ে সে দিকে ঘেঁসিতে সাহস না পাইলেও, এ দেশে "শীত বসন্ত" দুই ভাইএর প্রভাব খুব প্রচলিত। শিশির কুমার ত সচল নাম।

(১৬) জনৈক ডাক্তার তাঁহার ছেলেদের নাম রাখিয়াছেন পল্টু, বল্টু, মণ্টু ইত্যাদি। আমাদের জগদ্বড় চিত্র শিল্পী U. Ray তাঁহার বড় ছেলের ডাক নাম রাখিয়াছেন "তাতা" (ইনিই সুকুমার রায় নামে পরিচিত) "তাতা" নামটী কি বোধক, ঠিক করিতে পারি নাই।

(১৭) কতক গুলি নাম পিতামাতার মনে একান্ত আক্ষিপ্তক বলিয়া মনেহয়। যেমন—রাজেশ্বর (অবশ্য গরীবের ছেলে), পদ্মলোচন (ছেলেটী ট্যারা), রাজনন্দিনী (মেয়েটী কিন্তু কুশ্রী), সুরসুন্দরী (কুশ্রী), দয়ালচন্দ্র (অতিকৃপণ), সাধুচরণ (চুরি অপরাধে জেলে বাস করে)। এতদ্ব্যতীত, ভুপেন্দ্র, পৃথ্বীশ, জ্যোতিরিন্দ্র প্রভৃতি নাম এই পর্য্যায়ভুক্ত। স্নেহাতিশয্য ছাড়া আর কি হইতে পারে ?

(১৮) কোমলত্ব বোধক—ননী, মাখন, ছানা, মধু বা মধুর মা, অমিয়া।

(১৯) পশুবোধক—পশু, কুকুরী, মেকুরী।

(২০) একান্ত প্রীতিবোধক—মণি, মাণিক, জ্যোতিঃ, দেবু, পরাণ, রঙ্গী, রঙ্গণ, সাচু, রাজা, রাণী, ফটিক, মঞ্জু, টুক্‌টুক্‌, আহ্লাদী, আদরী, সোহাগী, মহারাণী।

(২১) পুষ্পবোধক—বেলা, গোলাপ, অতসী, পারুল, সূর্য্যমুখী, মল্লিকা, যূথিকা ইত্যাদি।

(২২) বার, মাস, নক্ষত্র প্রভৃতি। ভাদুরী, কার্ত্তিক, চৈতা, বুধিয়া, মঙ্গলা, শনিয়া বা হস্তা, রবিয়া, বিশাখা, অশ্বিনী, রোহিনী, রেবতী ইত্যাদি। 'মাঘ' কবির নামটী মাসের সংসৃষ্ট কি না জানি না,—প্রত্নতাত্বিক তাহার মীমাংসা করিবেন। তবে নক্ষত্র সংশ্রবে মহারীর পার্থ—ফাল্গুনী নামে পরিচিত। দিবা ও নিশি অনেক কাল হইতেই চলিতেছে।

(২৩) উৎসব-সূচক—জুবি (জুবিলি উপলক্ষে), বিজয়া, দুলু, উচ্ছব।

(২৪) বর্ত্তমান কন্যাদায় সংগ্রামের দিনে নিম্ন লিখিত নামগুলির দিকে হয়ত কাহারও এক আধটু দৃষ্টি পড়িবে। যাহাদের কেবল মেয়ের পর মেয়ের আগমন হয়,—তাঁহারা শেষটায় বীতশ্রদ্ধ হইয়া নাম রাখেন—ক্ষান্তকালী (অর্থাৎ হে মা কালী! অতঃপর ক্ষান্ত হ'তে দাও—আর চাহি না)। আন্নাকালী বা আর্ণাকালী, ক্ষেমা বা ক্ষেমী, থাক ইত্যাদি। ইহাতেও কালী মাতার কৃপা না হওয়ায়, আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক তাঁহার নয়, দশ ও একাদশ নম্বরের কন্যাত্রয়ের নাম রাখিয়াছেন—অরুচি, ত্যক্ত ও বিরক্তি। বিগত তিন বৎসর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ নাই,—সুতরাং পরবর্ত্তী জাত কন্যাগণের নাম অবগত হইতে পারি নাই। এতদ্ব্যতীত আমার কোন পরিচিত ভদ্রলোক, তাঁহার ৭।৮ নম্বরের মেয়ের নাম রাখিয়াছেন তুচ্ছি ও কুচ্ছি (কুৎসিত)। আমার মনে হয়, যদি আবার সাবেক দিন ফিরিয়া আসে, —মেয়ের বাজার আগের মতন চড়িয়া উঠে, তখন এ সকল নাম বদলাইতে হইবে না কি ? তখন ত মেয়ের

আদর হইবে। (আমরা ছেলে বেলায় মেয়ের বাজার অগ্নিমূল্য দেখিয়াছি; ১৭।১৮ শত টাকা পণ গ্রহণে মেয়ের বিবাহ ঢের হইত। তার উপরেও দু'একটা সংবাদ শুনিয়াছি)।—আর একবার সেই দিন দেখিতে পারিলে, অন্ততঃ এই নামগুলার কি রকমটা হয়, জানিবার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইত।

(ক) কোন কোন ছেলেমেয়ের জন্মের পর হইতেই বাড়ীতে অমঙ্গলের সূচনা হয়—তাহাদের নাম হয় উচ্ছন্না বা উছনীয়া, দুখীরা।

(খ) ছেলে মেয়ের জন্মে বিশেষ শুভ সূচিত হইলে নাম হয়—মঙ্গল, সর্ব্বমঙ্গলা, সর্ব্বজয়া, সুলক্ষণ।

(গ) 'স্বর্গ' নামে আনন্দ, নরক নামে ভয়। প্রেত পিশাচ নামে ঘৃণা। তীর্থ নামে পবিত্রতা কুনামে অশ্রদ্ধা স্বাভাবিক।

সব বিষয়েরই একটা 'বিবিধ' থাকে। আমার এই নাম বৈচিত্র্যেও একবিন্দু 'বিবিধ' উপহার দিয়া বিদায়ের আয়োজন করিব। কতক গুলি নাম লক্ষ্যহীন বলিয়া মনে হয়। যেমন—বিজন বালা, রাণুবাবু, বকুবাবু, দানী-বাবু, স্নুরি, হিরো ইত্যাদি। গঙ্গাসাগর সরকার, পঞ্চশিখ চক্রবর্ত্তী, ভববিভূতি রায়, কৈবল্যকুমার প্রভৃতি নাম একটু নূতন ধরণের বটে। ডাক নামের মধ্যে—খুতি, নেড়া, মেন্দী, গেন্দু, ভুলু, লেহু, লেছু, ধনা, মনা, নাড়ু, (নাড়ু-গোপাল অর্থে নহে), কিনা, বেচু, দাসু, কান্দু, স্যাঙো প্রভৃতিরও চল দেখা যায়।

(অতিরিক্ত বিষয়)।

গরু বাছুর, ঘোড়া, হাতী, নৌকা, গাছ প্রভৃতির পর্য্যন্ত ডাক নামের বন্দোবস্ত আছে।

(১) হাতী—যেমন যাত্রামঙ্গল, কুসুমকলি, ভোলা, শম্ভু, রাণী, জঙ্গবাহাদুর, রঙ্গরাজ ইত্যাদি

(২) ঘোড়া—প্রথমেই মনেহয় শ্রীকৃষ্ণের সুগ্রীবাদি হয় চতুষ্টয়ের কথা, তার পর রাণা প্রতাপের চৈতক; এতদ্ব্যতীত বিদ্যুৎ, বিজলী প্রভৃতি নাম রাখা হয়।

(৩) গাই—মঙ্গলী, বুধী, শ্যামলী, ধবলী, লালী।

(৪) কুকুর—বেলী, টেপী, বাউরা, বাঘা, কালুয়া, ভুলুয়া, টম্, জিমি ইত্যাদি।

(৫) বিড়াল—মেনি, হাবুল, চিকুকুর, চিত্রি, ধলী।

(৬) খাসী—হরিণা, বাতাসীয়া, ফটিয়া।

(৭) নৌকা—মধুকর, মনপবন, দেবীর আসন।

(৮) বৃক্ষ (ক) কাঁঠাল—ফুলতলী, হাজারী, আনারসী, সন্তোষী।

(খ) আম—ফজলী, লেংড়া, মধুমতী, পাতাচোরা।

(৯) ধান্য—দাদখানি, বালাম, বেতি, সাগর-ফেণা, গোপাল ভোগ, কালীজিরা, চিনিগুঁড়ি, আব-ছায়া।

আমরা শ্রোতৃ-মণ্ডলীর ধৈর্য্য পরীক্ষা করিয়া আর সময় নষ্ট করিব না। "নাম বৈচিত্র্যে" সংগৃহীত যাবতীয় নামই প্রকৃত। কল্পিত নাম ব্যবহার করি নাই।

বুকভরা স্নেহ ও ভরসা লইয়া ছেলে মেয়ের মা বাপ পরম আনন্দে তাহাদের নাম রাখেন। তাঁহাদের নিকট ছেলেমেয়ে কুশ্রী নয়। তাঁহাদের স্নেহের আবরণে নামগুলি অমৃতায়মান হয়। মা ছেলেকে বলেন,—'তুই বড় দুষ্টু'! ইহাতে যে স্নেহরস আছে, আর কেউ ছেলেকে দুষ্টু বলিলে তাহা পাওয়া যাইবে না। 'নামে বৈচিত্র্য' দেখান মাত্র আমাদের উদ্দেশ্য; কাহাকেও পীড়া দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা নাই। গরীবের ছেলের নাম ভূপতি, নৃপেন্দ্র হয়, মা বাপের উদ্দেশ্য, ছেলেটী আমার কুঁড়ে ঘরেই রাজত্ব করুক। ইহাই মায়ের সান্ত্বনা! নাম ব্রহ্ম—শব্দ ব্রহ্ম—উপসংহারে আমরা কলিপাবন 'নামটী' স্মরণ করিয়া 'নাম-বৈচিত্র্য' শেষ করিলাম।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ঢাকা সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

আলোকের যাত্রী

১

ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝরে বারি-ধারা, তুফানে মুখরা নিশি ;
থেকে থেকে নভে পাখোয়াজ বাজে, কেঁপে ওঠে দশদিশি।
একি হিল্লোলে দোলে প্রাণখানি জীবন-হিন্দোলায় ;
কে যেন আকুলি' ডাকিছে কেবলি 'আয় বাহিরিয়া আয়!'
অসীমের সাথে কোলাকুলি দিতে হৃদয় উঠিছে জেগে ;
মুক্ত বাতাসে নিশ্বাস ফেলি' মুক্তি লইব মেগে !
লয়ে দুরন্তপ্রাণ,
পৃথ্বী ও ব্যোম ধ্বনিয়া তুলিয়া গাহিয়া যাইব গান !

২

অতীতের শত দুঃখ কাহিনী কাঁদুক চরণে পড়ি' ;
বর্ত্তমানেরে বরিয়া লইয়া বাহিয়া যাইব তরী।
ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিতে আমরা আসিনি কেউ ;
ঊর্দ্ধে গরজে অশনি নিয়ে পর্ব্বত সম ঢেউ।
এরি মাঝখানে মহা অভিমানে ভাসায়ে দিয়েছি ভেলা ;
মরি আর বাঁচি ডরি নাকো তায়, এ যে জীবনের খেলা !
যখন ভেসেছি জলে,
দিবারাতি যাব বাহিয়া বাহিয়া উন্মাদ কুতুহলে !

৩

যুগে যুগে গেছে কত যাত্রীরা কত সঙ্গীত গাহি'
কেহ ডুবিয়াছে তটের নিকটে, কেহবা উঠেছে নাহি' !
কেহ আনন্দে ভেসে ভেসে গেছে, পেয়েছে অপর তীর ;
মাথার উপরে কাহারো নিয়ত ঝরেছে বাদল-নীর !
কেহ সারা পথে জ্যোৎস্না পেয়েছে, কেহবা তামসী রাতি;
তুফানের ফুঁ যে কাহারো আবার নিভেছে জীবনবাতি !
তবু চিরদিন ধরি,
চারিদিক থেকে আলোকের পথে ভাসিয়া চলেছে তরী !

৪

চল্ ওরে চল্, মুছে আঁখি-জল, অবসর নাহি আর ,
ফিরে যেতে কেহ পারেনি কখনো, বৃথা আয়োজন তার !
সকলের গতি সম্মুখ পানে, কেমনে রহিবি হেথা !
যেথা হতে নদী ছুটিয়া চলে গো আর তো ফিরেনা সেথা !
ঝড়-ঝঞ্ঝায় বৃষ্টি-বাদলে চল্ আনন্দে চল্,
ওই শোন্ দূরে ওই শোন্ কোটি যাত্রীর কোলাহল !
তুই কি রহিবি তীরে ?
ঝাঁপাইয়া পড়্ সিন্ধু-সলিলে না ভাসি' নয়ন-নীরে !

৫

সহ-যাত্রীরে পাই বা না পাই, বৃথা কেন ডাকাডাকি !
বিপুল বক্ষে বিধাতার বল—তাহারি ভরসা রাখি !
আমি যাব ওগো আমি যাব সেথা আমি যাব হেসে গেয়ে,
যাব যুগে যুগে বিদ্যুৎ বেগে সাধের তরণী বেয়ে !
পর্ণকুটীরে যে সুখ বিরাজে প্রাসাদে কণিকা নাই,
আমি সেই সুখ পুঁজি করিয়াছি, আর কিছু নাহি চাই !
কন্থা করেছি সার,
তাইতো পন্থা জাগিয়া রয়েছে বক্ষ পাতিয়া তার !

৬

তাহারি আশায় ভরিয়া রেখেছি আনন্দ-মদিরায়
হৃদয়-পেয়ালা; মশ্ গুল্ আছি, আশা আছে নিরাশায়।
এ নেশা আমার ছুটিবে না কভু আসুক্ না মহাদুখ ;
চুমুকে চুমুকে চুমিয়া লইব যেথা পাব যতটুক্।
আকাশ জুড়িয়া থাকুক্ না মেঘ, ঢাকুক্ না চারিদিক্ ;
ভাসায়ে যখন দিয়েছি তরণী ভাসিয়া যাইবে ঠিক।
ডুবি যদি মাঝখানে,
তবু সুখ আছে--পেয়েছি তো কিছু--ডুবে যাব অভিমানে !

৭

ভেসে যেতে যেতে অতলের তলে তলায়ে যাবার সুখ,
না হয় এবার ডুবিয়া দেখিব---সুখে তো নাচিবে বুক !
পর জনমের প্রথম হইতে আবার সেখান থেকে,
আবার তরণী ভাসিয়া চলিবে হেলে দুলে এঁকে বেঁকে !
হাসিয়া হাসিয়া গাহিয়া গাহিয়া বাহিয়া বাহিয়া তরী,
কত বন্দরে কত সম্ভারে লইব হৃদয় ভরি' !
যুগে যুগে যাব চলি'—
তবু বলি' বসি' বৃথা নিশিদিন করিব না বলাবলি !!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

বাঙ্গালী জাতির আদি।*

অতি প্রাচীন কালে জনবহুল একদল লোক উত্তর পশ্চিম অঞ্চল হইতে পঞ্চনদ ভূমে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহারা দেবোপাসক ছিলেন, দেবস্তুতিতে অর্থাৎ ঋগ্বেদ সংহিতায় আপনাদিগকে আর্য্য নামে খ্যাত করিতেন। ইঁহাদের সহিত আদিম অধিবাসীদের ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, এই সকল প্রতিবাসীর অনেকে পরাজিত হইয়া তাঁহাদের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। অনেকে বনে জঙ্গলে পলায়ন করিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করে। দেবোপাসকগণ পরাজিতদিগকে দাসত্বে নিয়োজিত করেন। এই সময় হইতে আর্য্য শব্দে প্রভু অর্থ বুঝাইতে লাগিল। ইহার পর দেবোপাসকগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন শ্রেণীর উদ্ভব হয় এবং আর্য্য শব্দ এই তিন শ্রেণীর জ্ঞাপক হইয়া পড়ে। দেবোপাসকগণ পূজনীয়, সভ্য ও সজ্জন ছিলেন, অতএব এই সকল অর্থ প্রকটিত করিবার জন্যও আর্য্যশব্দ ব্যবহৃত হইত। (১) আর্য্যশব্দ দীর্ঘকাল অবধি এই সকল অর্থ লইয়া চলিয়াছিল। তারপর খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে কুমারিল ভট্ট প্রভৃতি ধর্ম্ম-বেত্তৃগণ আর্য্যাবর্ত্তবাসী এবং আর্য্যাবর্ত্তের ভাষাভাষী অর্থে আর্য্য শব্দের প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করেন। মোসলমানের আমল পর্য্যন্ত এই অর্থেই আর্য্যশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। (২)

অতঃপর ইংরাজের আমলে আর্য্যশব্দ সাতিশয় ব্যাপকতা লাভ করিয়াছে। প্রসিদ্ধ-নামা জর্ম্মাণ পণ্ডিত ফ্রেডারিক স্লিগেল ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন, টিউটনিক, কেলটিক প্রভৃতি ভাষার একমূলত্ব অনুধাবন করেন এবং এই ভাষা গোষ্ঠীর ইণ্ডোজার্ম্মাণিক সংজ্ঞাদেন। পট, বেন ফি প্রভৃতি জর্ম্মাণ পণ্ডিত এই সংজ্ঞাই ব্যবহার করিয়াছেন। বপ ইণ্ডো ইউরোপীয় সংজ্ঞা প্রচলিত করেন। Japhetic Sanskritic, Mediterranan সংজ্ঞাও প্রদত্ত হয়। (১) কিন্তু কোন সংজ্ঞাই সুষ্ঠু বিবেচনা না করিয়া আচার্য্য ম্যাক্সমূলার আর্য্য সংজ্ঞা প্রদান করেন। আচার্য্য ম্যাক্সমূলারের নামকরণ হইতে অনর্থের সূচনা হইয়াছে। কারণ এই নামকরণের ফলে আর্য্যজাতি (Race) নামে একটি জাতি পরিকল্পিত হইয়াছে।

ঈদৃশ জাতির পরিকল্পনা তথ্যমূলক নহে। আর্য্য ভাষাভাষী অনেক জাতিতে বিভক্ত হইতে পারেন, এমন কি, ঋগ্বেদে যাঁহারা আপনাদিগকে আর্য্যনামে পরিচিত করিয়াছেন, তাঁহাদেরও মূল বীজ যে এক, তাহা কোনস্থানে বিবৃত হয় নাই। পক্ষান্তরে, তাঁহারা যে বিভিন্ন বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাহার ইঙ্গিত অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। বৈবস্বত মনু আদিপুরুষ রূপে স্বীকৃত হইলেও এক এক মুনির এক এক রূপ উৎপত্তি কাহিনী দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কাহিনী উপন্যাস বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু তৎসমুদয়ের মূলে এই সত্য নিহিত আছে যে, আর্য্য ঋষিগণ এক মূল বীজ হইতে উৎপন্ন হন নাই, অর্থাৎ বৈদিক কালে আর্য্যনামে কোন জাতি (Race) ছিল না। বৈদিক ঋষিকুলে অনেকে শ্বেতাঙ্গ, অনেকে আবার শ্যামাঙ্গ ছিলেন। বশিষ্ঠ গোত্রিয়গণ শ্বেতাঙ্গ ছিলেন, কণ্ব ঋষি শ্যামবর্ণ ছিলেন। আর্য্যগণের তাদৃশ বর্ণ বিভিন্নতা দেখিয়া শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, শ্বেতাঙ্গ আর্য্যগণ হয়ত কোন শীত প্রধান দেশ হইতে এবং শ্যামাঙ্গ আর্য্যগণ হয়ত গ্রীষ্মপ্রধান পশ্চিম এসিয়া হইতে আসিয়া ছিলেন। *

* টাঙ্গাইল সাহিত্য সংসদের প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসবে পঠিত।

(১) Chips from a German workshop Vol III Page 204.

(২) সাহিত্য, ১৩১৯। ২৮৩ পৃষ্ঠা।

Chips from a German workshop Vol III

* সাহিত্য ১৩১৯।

আচার্য্য ম্যাক্সমুলার তাঁহার Chips from a German workshop নামক পুস্তকের প্রথম খণ্ডের ২৫৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, 'আমি নিজেও ভাষাতত্ত্বের সংজ্ঞা নৃতত্ত্বের ভাব প্রকাশ জন্য ব্যবহার সম্বন্ধে একেবারে নির্দ্দোষ নহি। তাহা হইলেও এই কুসংস্কার আমাদের সমস্ত শক্তি সহকারে প্রতিরোধ করা আবশ্যক। নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ আর্য্য সোমাতক তুরাণীয়, দ্রবিড়, মুণ্ডা, বন্ধু প্রভৃতি শব্দ পুনঃ পুনঃ জাতির বিশেষণ রূপে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, তাদৃশ প্রয়োগ কালে তাঁহারা এই সকল শব্দের সহিত শোণিত অথবা অস্থি অথবা কেশ অথবা মুখাবয়বের কোন সম্পর্ক নাই, কেবল একমাত্র ভাষার সহিতই সম্পর্ক, ইহা ভুলিয়া যান। যাহারা আর্য্য ভাষাভাষী, তাহাদের বর্ণ ও শোণিত যাহাই হউক না কেন, তাহারাই আর্য্য। তাহাদিগকে আর্য্যনামে অভিহিত করিয়া তাহাদের ভাষার আর্য্যত্ব ব্যতীত তাহাদের সম্বন্ধে আর কোন তথ্যই আমরা প্রকটিত করি না। আর্য্য এবং সেমিতিকদের শ্রেণী বিভাগ ভাষাতত্ত্ব ব্যতীত আর কোন ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই'।

আচার্য্য ম্যাক্সমুলারের নিষেধ সত্ত্বেও ভাষাতত্ত্ববিদ এবং নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিত মণ্ডলী আর্য্য শব্দ জাতির বিশেষণ রূপে প্রয়োগ করিতেছেন এবং তজ্জন্য মহাবিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে। এই বিভ্রাট সম্বন্ধে আমরা কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। আর্য্য ভাষাভাষী মাত্রেই যদি এক মূল বীজ হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকেন, তবে তাঁহাদের বর্ণ এবং আকৃতি একরূপ হওয়া আবশ্যক, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। কেহ গৌরবর্ণ, কেহ শ্যামবর্ণ, কেহ বা কৃষ্ণবর্ণ, কাহারও মস্তক লম্বা, কাহারও মস্তক প্রশস্ত, কাহারও বা মস্তক স্থূল। এজন্য পণ্ডিত মণ্ডলী নৃতত্ত্ব-বিদ্যাবলে আর্য্যভাষীদের মধ্যে কাহাকেও আর্য্য-জাতীয় কাহাকেও বা আর্য্যেতর জাতীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। ভারতীয় সনাতন শাস্ত্রে আর্য্য নাম গৌরবমণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে। ইউরোপীয় সাহিত্যেও আর্য্য নাম গৌরবমণ্ডিত করা হইয়াছে। অতএব যে জাতির প্রতি আর্য্য বিশেষণ প্রযুক্ত হইতে পারে, সেই জাতিই শ্রেষ্ঠ। ফলতঃ যদি কোন পণ্ডিত প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক কোন দেশের লোকের আর্য্যত্ব অস্বীকার করেন, অমনি সে দেশীয়েরা ফোঁস করিয়া উঠেন। জাতি তত্ত্ব লইয়া ঘোর বিবাদ এবং তর্ক বিতর্ক চলিয়া আসিতেছে।

"জর্ম্মাণ পণ্ডিতেরা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন,—আদিম আর্য্যগণ আকারে দীর্ঘকায়, শ্বেতাঙ্গ ও দীর্ঘ করোটী বিশিষ্ট, অর্থাৎ জর্ম্মাণগণের অনুরূপ ছিলেন। ফরাসী পণ্ডিতেরা দেখাইতে চাহিতেছেন,—আদিম আর্য্যগণ আকারে ফরাসীদের অনুরূপ ছিলেন। অধ্যাপক বিজ্ঞোযে প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলেন,—ইউরোপের জর্ম্মাণ (টিউটন), ফরাসী ও গ্রীক, ইটালীয় ও স্পেন দেশীয়ের মধ্যে যে আকৃতিভেদ লক্ষিত হয়, তাহা বংশ-ভেদ মূলক নহে, বাসভূমির জলবায়ুর ভেদমূলক। সুতরাং আকার ভেদানুসারে বংশভেদ বা শোণিত ভেদের কল্পনা কর্ত্তব্য নহে। ভাষার হিসাবেই মানবের বংশবিভাগ সঙ্গত। যাঁহারা স্মরণাতীত কাল হইতে একরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে আকারগত ভেদ থাকিলেও তাঁহাদিগকে এক বংশোদ্ভব মনে করা উচিত। এই হিসাবে যাঁহারা চির-কাল আর্য্যভাষা ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারাই আর্য্য বংশোদ্ভব।" *

বিজ্ঞোযের এই Summary trial মান্য করিলে বলিতে হয় যে, সাঁওতাল প্রভৃতি এবং মুষ্টিমেয় উচ্চ শ্রেণীর মোসলমান ব্যতীত বঙ্গবাসীমাত্রেই কি হিন্দু, কি মোসলমান সংস্কৃত মূলক বাঙ্গালাভাষী বলিয়া আর্য্য। কিন্তু যদি বলা যায় যে, বাঙ্গালাভাষী মাত্রেই একজাতি সম্ভূত, তাহা হইলে সত্যের অপলাপ হইবে। ফলতঃ নৃতত্ত্ব অবলম্বনেই হউক, কি অন্য কোন পথেই হউক,

* শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ,—সাহিত্য।

বাঙ্গালীর জাতিতত্ত্ব নির্ণয় করা আবশ্যক।

নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ কি প্রণালীতে জাতি নির্ণয় করিয়া থাকেন এবং সে প্রণালী কি প্রকার সুষ্ঠু তাহা প্রদর্শন জন্য আচার্য্য ম্যাক্সমূলার ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে এতৎ সম্বন্ধে যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম প্রদান করিতেছি। এই বক্তৃতা ১৮৯১ খৃঃ অব্দে ব্রিটিশ এসো-সিয়সনের সভাপতির অভিভাষণরূপে প্রদত্ত হইয়াছিল।

সমগ্র ভাবে মানবজাতিকে শ্রেণী বিভক্ত করিবার চেষ্টার পরিবর্ত্তে বর্ত্তমান সময়ে অনুসন্ধানার্থিগণ মাথার খুলি এবং চুলও দাঁত এবং চামড়ার শ্রেণীবিভাগে ব্যাপৃত হইয়াছেন। এই সকল বিশেষ অনুসন্ধানের ফলে অনেক সারবান তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হইয়াছে। কিন্তু অদ্যাপি এই সকল বিশেষত্ব-মূলক কোন দুইটি শ্রেণীবিভাগ দ্বারা একই তত্ত্ব প্রতিপাদন করা যায় নাই।

নিঃসন্দেহে শরীরের বর্ণানুসারে শ্রেণীবিভাগই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্বাভাবিক। এইরূপ শ্রেণীবিভাগ করিলে আমরা কৃষ্ণ, শ্যাম পীত, লাল এবং শ্বেতজাতি (Race) প্রাপ্ত হই; এই সকল জাতির আবার উপবিভাগ আছে। কিন্তু তাদৃশ বিভাগ অনেক সময় অবৈজ্ঞানিক রূপে উপেক্ষিত হয়। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ইহা যতদূর মূল্যবান্ বিবেচিত হইয়া থাকে, তদপেক্ষা অনেক অধিক মূল্যবান্ প্রমাণিত হইতে পারে।

ইহার পর চক্ষুর বর্ণ দ্বারা শ্রেণীবিভাগ। চক্ষু নানা-প্রকার বর্ণ বিশিষ্ট, কাল, তাম্র, ধূসর, শ্যাম এবং নীল। সম্প্রতি চক্ষু দ্বারা মানব জাতির শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে। এতৎ সম্পর্কে কোন কোন বিষয়ে ইহার দ্বারা সুফল পাওয়া গিয়াছে।

মাথার খুলি অনুসারে মানবজাতির শ্রেণী বিভাগই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত হইয়াছে। যদি বহুসংখ্যক মাথার খুলি সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষা করা যায়, তাহা হইলে, সহজেই তৎসমুদয় তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। এইরূপ বিভাগ করিয়া যদি আমরা প্রত্যেক প্রকার মাথার খুলি অনুসারে জাতি নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হই, তবে মীমাংসার অতীত অসামঞ্জস্য দেখা যায়। গ্রে নারপি নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, এক মাতার গর্ভ হইতেই দীর্ঘ এবং প্রশস্ত করোটি বিশিষ্ট সন্তানের জন্ম হইয়া থাকে। মোঙ্গলিয়গণ ভারত, চীন এবং জর্ম্মাণী আক্রমণ কালে বহুসংখ্যক রমণীকে বন্দী করিয়া স্বদেশে লইয়া গিয়াছিল। যদি আমরা এই বিষয় বিবেচনা করি, তবে মধ্য এসিয়ার ঐ সকল দলের প্রশস্ত মাথার খুলির সঙ্গে লম্বা মাথার খুলি দেখিয়া বিস্মিত হইবার কারণ নাই। কোন কোন নৃতত্ত্ববিদ্ অসামঞ্জস্য দূরীভূত করিবার জন্য যেরূপ সহজ উপায় অবলম্বন করেন, তাহা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। এই সকল নৃতত্ত্ব-বিদ্ এক সমাধিতে লম্বা ও প্রশস্ত করোটি দেখিলে তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত করেন যে, এক সমাধিতে দুই জাতীয় লোক সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। আমরা একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। আলেকজেণ্ডারপুল নগরীর একটি সমাধিতে একসঙ্গে দুইটি লম্বা মথার খুলি এবং তিনটি প্রশস্ত মাথার খুলি পাওয়া যায়। এই আবিষ্কারের পর নৃতত্ত্ব-বিদ্‌গণ প্রচার করেন যে, উহা এক পরিবারের বিভিন্ন করোটির সমর্থক নহে, এবং তাহার বিপরীতই প্রমাণী-কৃত করিতেছে। তাঁহারা আমাদিগকে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিতে বলেন যে, লম্বা মাথার খুলি দুইটি আর্য্য প্রভুর এবং প্রশস্ত মাথার খুলি তিনটি অনার্য্য দাসের। দাস তিনজন নিহত এবং প্রভুর সঙ্গে একত্র সমাহিত হইয়াছিল। এইরূপ প্রথা হিরোডোটাসের পরিজ্ঞাত ছিল। ইহা গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সরল যুক্তির পরিচায়ক নহে।

নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের শেষ উপায় চুল দেখিয়া জাতি নির্ণয়। চুল দেখিলে মানব জাতিকে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। কুঞ্চিত কেশ, পরিপাটী কেশ। এই দুই মূল বিভাগেরও আবার নানা উপবিভাগ আছে। এতদ্ব্যতীত নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ নাসিকার, আকৃতি এবং ওষ্ঠ-

দেশের গঠনেরও শরণাপন্ন হইয়া থাকেন। কিন্তু এক প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, অন্য উপায় অবলম্বন করিয়া ঠিক সেইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দুরূহ। দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতেছে। এরূপ কথিত হয় যে, যাহাদের লম্বা মাথার খুলি, তাহারা Proguathic এবং কুঞ্চিত কেশ। কিন্তু সকল স্থলেই এই নিয়ম প্রযোজ্য নহে। এরূপ অনেক জাতি দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের মাথার খুলি লম্বা, কেশ কুঞ্চিত নহে। যথা, এস্কিমস জাতি"।

আমরা আচার্য্য ম্যাক্সমূলারের যে মত উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতে জানা যায় যে, চামড়ার বং জলবায়ুর গুণে পরিবর্ত্তনশীল জন্য তাহার সাহায্যে জাতি বিভাগ করা অবৈজ্ঞানিক। চক্ষু এবং চুলের সাহায্যে জাতি নির্ণয়ের চেষ্টা এখনও শৈশব অবস্থায় রহিয়াছে। নাসিকা ও গুহ্যদেশ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লেখা হয় নাই। মাথার খুলির সাহায্যে জাতি বিভাগই প্রধান উপায়, কিন্তু ইহাতে তিনি আস্থা স্থাপন করেন নাই। আচার্য্য ম্যাক্সমূলারের ন্যায় অশেষবী শক্তিশালী মহামহোপাধ্যায় বিশেষজ্ঞ যে বিদ্যায় আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই, তাহাতে আস্থা স্থাপন কতদূর সমীচীন, তাহা বিবেচনার বিষয়। কিন্তু অনেক মহাপণ্ডিত নৃতত্ত্বের আলোচনায় ব্যাপৃত আছেন এবং তাঁহারা নানা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এজন্য বাঙ্গালীর জাতি নির্ণয় সম্পর্কে সেই সকল সিদ্ধান্তের বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। শ্রীযুক্ত রিজলী সাহেব একসময় প্রথমতঃ বাঙ্গলা দেশের, তারপর সমগ্র ভারতের অন্যতম ভাগ্যবিধাতা ছিলেন। তিনি বাঙ্গালীর জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাই উপস্থিত করিতেছি।

শ্রীযুক্ত রিজলী সাহেব প্রধানতঃ ভারতীয় জাতি সকলের মস্তক, নাসিকা এবং দেহ পরিমাণ ও চক্ষু এবং বর্ণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ভারতীয় জাতি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি সাত শ্রেণীতে ভারতবর্ষীয়দিগকে বিভক্ত করিয়াছেন Imperial Gazetteer ধৃত রিজলীর প্রবন্ধ আমাদের অবলম্বন।

প্রথম, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ এবং বেলুচিস্থান। এই স্থানের অধিবাসী বেলুচি এবং আফগান প্রভৃতি তুর্কি এবং ইরাণী জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইরাণী রক্তই বেশী। আকার মধ্যম অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ দীর্ঘ বর্ণ গৌর অধিকাংশ লোকের চক্ষু কৃষ্ণতার, কদাচিৎ কাহারও তাম্রাভ, মুখমণ্ডল শ্মশ্রুল, মস্তক প্রশস্ত, নাসিকা মধ্যমরূপ সঙ্কীর্ণ, উচ্চ এবং অতিশয় দীর্ঘ, তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মধ্যে লম্বা নাসিকাই সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

দ্বিতীয়, পঞ্জাব কাশ্মীর এবং রাজপুতনা। এই সকল স্থানের অধিবাসী রাজপুত, জাঠ এবং ক্ষত্রীগণ ভারতীয় আর্য্যবংশসম্ভূত। ইহাদের অধিকাংশের আকার দীর্ঘ, বর্ণ গৌর, চক্ষু কৃষ্ণতার, মুখমণ্ডল শ্মশ্রুল, মস্তক লম্বা, নাসিকা সঙ্কীর্ণ এবং উচ্চ, কিন্তু নাতিদীর্ঘ। ইহাদের সম্বন্ধে এইটি বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় যে, উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর লোকেরই আকৃতি প্রায় একরূপ দেখা যায়, যাহা কিছু তারতম্য, তাহা আহার, আচার ব্যবহার এবং ব্যবসায়ের ফল।

তৃতীয়, পশ্চিম ভারত অর্থাৎ গুজরাট, মহারাষ্ট্র, সিন্ধু এবং কুর্গ, এইসকল প্রদেশের অধিবাসীবর্গ সম্ভবতঃ শক ও দ্রবিড় জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে। তুর্কি ইরাণী অপেক্ষা ইহাদের আকার খর্ব্ব, মস্তক লম্বা, এবং নাসিকা ক্ষুদ্র। এস মস্তই দ্রবিড় জাতির সহিত সংমিশ্রণের ফল। সমস্ত অধিবাসীর দেহে সম পরিমাণে দ্রাবিড়ী রক্ত প্রবাহিত নহে। ব্রাহ্মণাদি উচ্চশ্রেণীর মধ্যে শকশোণিত প্রবল, নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে দ্রাবিড়ী-রক্ত প্রবল।

চতুর্থ, যুক্ত প্রদেশ ও বিহার এবং রাজপুতনার কিয়দংশ। এই সকল স্থানের অধিবাসীদের দেহে আর্য্য ও দ্রাবিড়ী শোণিত প্রবাহিত হইতেছে। এই দেশের

উচ্চশ্রেণী ব্রাহ্মণ এবং নীচ শ্রেণী চামার। সকলের দেহেই ঐ দুই রক্ত প্রবাহিত। তবে মাত্রা ন্যুনাধিক। মস্তক লম্বা হইলেও অপ্রশস্ত নহে। বর্ণ নানা প্রকার, তাম্রাভ হইতে ঈষৎ কৃষ্ণ। নাসিকাও নানাপ্রকার, মধ্যম পরিমিত হইতে স্থূল। কিন্তু সর্ব্বত্রই আর্য্যনাসিকা অপেক্ষা স্থূল। উচ্চশ্রেণীয়দিগকে একরূপ আর্য্যই বলা যাইতে পারে। নিম্নশ্রেণীতে আর্য্যরক্তের প্রভাব অতি সামান্য।

পঞ্চম—বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যা। বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ কায়স্থ এবং কেবল বঙ্গদেশে দৃষ্ট অন্যান্য জাতি, পূর্ব্ববঙ্গবাসী মোসলমান এবং উড়িয়া, দ্রাবিড়ী এবং মোঙ্গোলীয় সংমিশ্রণে উৎপন্ন। সম্ভবতঃ উচ্চশ্রেণীতে আর্য্যরক্তের দাগমাত্র আছে। ইহাদের মস্তক প্রশস্ত, বর্ণ শ্যাম বা ঈষৎ কৃষ্ণ, মুখমণ্ডল স্বভাবতঃ শ্মশ্রুল, আকার মধ্যম, নাসিকা মধ্যম হইলেও অপ্রশস্ত নহে। চট্টগ্রামের রাজবংশী মগ এবং পূর্ব্ববঙ্গের ভদ্রলোকের মধ্যে সৌসাদৃশ্য এরূপ যে, তীক্ষ্ণদর্শী ব্যতীত আর কেহ তাহাদের প্রভেদ লক্ষ্য করিতে সমর্থ নহে। কেবল ব্রাহ্মণদের নাসিকা অধিকতর উৎকৃষ্ট। এজন্য মস্তকের সুপ্রকট প্রশস্ততা সত্ত্বেও তাহাদের বহুদূরবর্ত্তী পূর্ব্ব পুরুষের আর্য্যরক্তের সংস্রব ঘটিয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

ষষ্ঠ,—হিমালয় প্রদেশ,নেপাল,আসাম এবং ব্রহ্মদেশ। এই সকল স্থানের অধিবাসীরা মোঙ্গলীয়। ইহাদের মস্তক প্রশস্ত, বর্ণ পীতাভ শ্যাম, মুখ মণ্ডলের শ্মশ্রু সামান্য, নাসিকা স্থূল এবং মুখের প্রশস্ততা সুপ্রকট।

সপ্তম,—সিংহল হইতে অনুগাঙ্গ প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত সিংহল, মান্দ্রাজ, হাইদ্রাবাদ মধ্য প্রদেশ, মধ্যভারতের অধিকাংশ এবং ছোটনাগপুর। এই সকল অধিবাসীরা দ্রাবিড়ী। মালবের পনিয়ন এবং ছোটনাগপুরের সাঁওতাল এই জাতির মৌলিক দৃষ্টান্ত। আর্য্য, শক এবং মোঙ্গোলীয় রক্তের সংমিশ্রণে সকলস্থানেই ন্যুনাধিক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। দ্রবিড় জাতির প্রতিরূপ এই যে, আকৃতি খর্ব্ব, বর্ণ প্রায় ঘোর কৃষ্ণ, চুল পর্য্যাপ্ত, কখন কখন কুঞ্চিত, চক্ষু কৃষ্ণতার, মস্তক লম্বা, নাসিকা অতিশয় স্থূল।

ভারতবর্ষীয়দের শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে। এক জাতীয় লোকের বাসভূমির মানচিত্র প্রস্তুত করিলে এরূপ বলিবার উপায় নাই যে, তাহার বহির্ভাগে আর সে জাতীয় লোকের আবাস নাই। এক জাতির প্রতিরূপ অতি সূক্ষ্ম ক্রমিক পরিবর্ত্তন দ্বারা অন্য প্রতিরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত এক প্রদেশ হইতে অন্য এক প্রদেশে এক দিনের পথ অতিবাহিত করিলে অধিবাসীদের আকৃতির পরিবর্ত্তন সুস্পষ্ট রূপে অনুভূত হইয়া থাকে। এক জাতির প্রদেশে অন্য জাতীয় লোকও পরিদৃষ্ট হয়। মান্দ্রাজ দ্রবিড় জাতির এবং বাঙ্গালা দ্রাবিড়ী মোঙ্গোলিয় জাতির বাসভূমি রূপে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার অর্থ ইহা নয় যে, বঙ্গদেশ অথবা মান্দ্রাজে অন্য জাতির বাস নাই। স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে এবং উত্তর হইতে দক্ষিণে লোক সমাগম হইয়াছে। উচ্চশ্রেণীয়গণ নিম্নশ্রেণীর অধিকৃত দেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছেন। তাদৃশ লোক প্রবাহের ফলে আর্য্যগণ বিজেতা বণিক্ ভূম্যধিকারী এবং ধর্ম্মাচার্য্য রূপে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বসতি স্থাপন করিয়াছেন।

আমরা রিজলীর ভারতীয় জাতিতত্ত্ব বিষয়ক মত সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম। তিনি আপন মতের সমর্থন জন্য ঐতিহাসিক নানা তথ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভারতবর্ষে আর্য্য ভাষাভাষী জাতির আবির্ভাবের পূর্ব্বে সম্ভবতঃ সমগ্রদেশে দ্রবিড় জাতির বসতি ছিল। কোন কোন ঐতিহাসিক এরূপ মতও পরিব্যক্ত করিয়াছেন যে, একদল দ্রবিড় উত্তর পশ্চিম এসিয়া হইতে এবং অপর একদল উত্তর পূর্ব্ব এসিয়া হইতে ভারতবর্ষে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। প্রথম দল বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তর ভাগে এবং দ্বিতীয়দল পঞ্জাবে উপ-

নিবিষ্ট হইয়াছিল। শেষোক্ত দল ক্রমে ক্রমে দক্ষিণ ভারতে অগ্রসর হইয়াছিল। ছোট নাগপুরের অধিবাসীদের আচার ব্যবহারে মোঙ্গোলিয় আভাসই প্রথমোক্ত সিদ্ধান্তের কারণ। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের মূল এই যে, কোন কোন ভাষাতত্ত্ববিদের নিকট বেলুচিস্থানের ব্রাহুই জাতির ভাষার সহিত দ্রবিড় ভাষার সাদৃশ্য লক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু ডাক্তার হল এই তথাকথিত প্রমাণ হইতে অন্যরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, রাখালদাসবাবুর গ্রন্থ হইতে এখানে তাহা উদ্ধৃত হইতেছে। ভারতবর্ষই দ্রবিড় জাতির প্রাচীন আবাসস্থান এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগে দ্রবিড় জাতি উত্তর পশ্চিম সীমান্তের গিরিসঙ্কট সমূহ অবলম্বনে পারস্য এবং ব্যাবিলন প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছিলেন এবং তৎকালে বেলুচিস্থানে যে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, আধুনিক ব্রাহুই জাতি সেই দ্রবিড় উপনিবেশিকগণের বংশধর। দ্রবিড় জাতির অন্যস্থল হইতে ভারতবর্ষে আগমনের প্রমাণ অতি সঙ্কীর্ণ। ফলতঃ দ্রবিড়দিগকে ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী রূপে বিবেচনা করাই সঙ্গত।

* দ্রাবিড়ীয়েরা হ্রস্ব-নাসিক ও কৃষ্ণবর্ণ। বেদে ইহারা নাসাহীন ও কৃষ্ণবর্ণ দস্যু নামে অভিহিত হইয়াছে। এই জাতিকে পরাভূত ও বিতাড়িত করিয়া আর্য্যগণ কাশ্মীর ও পঞ্জাব প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন। কালক্রমে তাঁহারা বর্ত্তমান রাজপুতনার শেষসীমা পর্য্যন্ত আপনাদের অধিকার ও উপনিবেশ বিস্তার করেন। দ্রাবিড়ীয়েরা তাঁহাদিগের নিকট পরাস্ত হইয়া পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই ঘটনার কয়েক শতাব্দী পরে মধ্য এসিয়া হইতে আর এক দল আর্য্য বীরবেশে গিলঘিট ও চিত্রলের দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া গঙ্গা যমুনার অন্তর্ব্বেদীতে প্রবেশ করেন। * ইঁহাদের আগমন কালে পঞ্জাবে সুগঠিত আর্য্য উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত ছিল; এজন্য ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম দ্বারপথ স্ত্রী পুত্র পরিবারসহ প্রবেশের পক্ষে রুদ্ধ হইয়াছিল, কেবল বীরপুরুষ তরবারী হস্তে এই পথ পরিষ্কার করিয়া পঞ্জাবে প্রবেশ করিতে পারিতেন। নির্ব্বিবাদ উপনিবেশের পরিবর্ত্তে সশস্ত্র আক্রমণকারী যত বড় বীরই হউন না কেন, তাঁহার পক্ষে স্ত্রীপুত্র কন্যা লইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ একরূপ অসম্ভব ছিল। ভারতবর্ষের জাতিতত্ত্ব বুঝিতে হইলে, এই ঐতিহাসিক তথ্য স্মরণ রাখা আবশ্যক। ঐরূপ হইত বলিয়া গ্রীক, শক, আরব, আফগান, মোগল যে জাতিই তরবারী হস্তে ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াছে, সে জাতিই ন্যূনাধিক পরিমাণে ভারতীয় মৌলিক জাতির সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। প্রাগুক্ত কারণে এই "পশ্চাদাগত আর্য্যগণের সঙ্গে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অতি অল্প ছিল বলিয়া অনুমান করিবার কারণ আছে। এই কারণে তাঁহারা অন্তর্বেদী নিবাসী অনার্য্য দ্রাবিড়ীয় সমাজ হইতে স্ত্রী সংগ্রহে বাধ্য হন। এইরূপে আর্য্য ও দ্রাবিড়ীয়দিগের সংমিশ্রণে বর্ত্তমান যুক্তপ্রদেশ ও বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে আর্য্য দ্রাবিড়ীয় বংশের সৃষ্টি হইল। প্রথমে যে সকল আর্য্য বেলুচিস্থানের সুগম পথ দিয়া পঞ্জাবে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সঙ্গে স্ত্রীলোকের অভাব না থাকায় তাঁহাদিগের অনার্য্য দ্রাবিড়ীয় সমাজ হইতে স্ত্রী সংগ্রহ করিতে হয় নাই। এই হেতু নরদেহতত্ত্ববিদেরা তাঁহাদিগের বর্ত্তমান বংশধরগণের দৈহিক গঠনে দ্রাবিড়ীয় প্রভাবের নিদর্শন দেখিতে পান নাই। *

বিহার পরিত্যাগ করিয়া শস্যশ্যামল বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার অভিমুখে অগ্রসর হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, আর্য্য শোণিত দ্রুত বেগে অদৃশ্য হইয়াছে, কেবল কদাচিৎ কোন স্থানে তাহার রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গ দেশের অধিকাংশ লোক দ্রাবিড়া, ইহাদের সহিত মোঙ্গোলিয় শোণিত

* ৺ সখারাম গণেশ দেউস্কর। এতৎ সম্বন্ধে ডাক্তার হর্ণলি ও ডাক্তার গ্রিয়ারসনের প্রবন্ধে বহু যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে।

* ৺ সখারাম গণেশ দেউস্কর। সাহিত্য ১৩১৮।

মিশ্রিত হইয়াছে। মোঙ্গলিয় শোণিত পূর্ব্বাপেক্ষা পশ্চিম অংশে অনেক কম। এই মিশ্রিত জাতির অধিকাংশ হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু আচার গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমান বঙ্গীয় ও উড়িয়া সমাজের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাদের মস্তকের প্রশস্ততা ও নাসিকার স্থূলতা এই সিদ্ধান্তের অনুকূল। বঙ্গীয় ও উড়িয়া সমাজে আর্য্যরক্তের চিহ্ন দৃষ্টির একরূপ গোচরীভূত না হইলেও কোন কোন বংশে আর্য্য রক্ত প্রবাহিত আছে বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। মহারাজ আদিশূর কর্ত্তৃক পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আনয়নের যে প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে, তাহা এই দুই বঙ্গীয় কুলের দৈহিক পরিমাপ দ্বারা সমর্থিত হয়। তবে এই দুই কুলেও দ্রাবিড়ী ও মোঙ্গোলিয় রক্তের মিশ্রণ ঘটিয়াছিল।

ভারতবর্ষের মৌলিক রক্তে আর্য্য, মোঙ্গোলিয় এবং শক শোণিত মিশ্রিত হইয়াছে। আর্য্য এবং মোঙ্গোলিয় শোণিতের বিষয় লিখিত হইল, এখন শক শোণিতের সম্বন্ধ বিবৃত হইতেছে। ভারতবর্ষে দুইবার শক জাতির আবির্ভাব হইয়াছিল। খৃষ্টের জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রথমবার, খৃষ্টের জন্মের পাঁচশত বৎসর পরে দ্বিতীয়বার শকগণ ভারতবর্ষে আগমন করেন। পঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, রাজপুতনা এবং মধ্য ভারত তাহাদের দ্বারা মথিত হইয়াছিল। দ্বিতীয়বার গুপ্ত সাম্রাজ্য তাহাদের তাণ্ডবে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং সে সুবিশাল সাম্রাজ্যের কিয়দংশ তাহাদের হস্তে পড়িয়াছিল। বর্ত্তমান ভারতে শকদের কোন চিহ্ন নাই। তাহারা কোথায় গেল, তাহা দেখিতে হইবে। অনেকের মতে তাহারা রাজপুত ক্ষত্রিয় এবং জাঠ জাতিতে পরিণত হইয়াছে। এরূপ নির্দ্দেশের যুক্তি প্রমাণ অতি নগণ্য এবং গ্রহণের অযোগ্য। আর একটি অনুমানের ভিত্তি এতদপেক্ষা সুদৃঢ়। শকগণ প্রথমতঃ পশ্চিম পঞ্জাবে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল, তারপর অন্য বৈদেশিক আক্রমণকারীর তাণ্ডবে তাহারা সে উপনিবেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, এবং পূর্ব্ব অঞ্চল আর্য্যগণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ দেখিয়া দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ইহার ফলে দ্রাবিড়ী জাতির সহিত তাহাদের মিশ্রণ হয় এবং মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি সঙ্কর জাতি সৃষ্ট হয়।

রিজলী সাহেব আপনার জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় মত সমর্থন জন্য যে সকল ঐতিহাসিক তথ্যের অবতারণা করিয়াছেন, আমরা তাহা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম। এতৎসম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে কয়েকটি বিষয় স্পষ্টীকৃত করা আবশ্যক।

রিজলী সাহেব জর্ম্মাণ পণ্ডিতগণের অনুসরণ করিয়া আদিম আর্য্যদের শরীর দীর্ঘ, বর্ণ শ্বেত, মাথার খুলি লম্বা এবং নাসিকা তীক্ষ্ণ ছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জর্ম্মাণ পণ্ডিতদের নির্দ্দেশের উত্তরে আচার্য্য ম্যাক্সমূলার যাহা লিখিয়াছেন আমরা এখানে তাহার মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিতেছি। *

আর্য্য আদি-নিবাস সম্বন্ধে এই মাত্র জানা যায় যে, আর্য্য ভাষা ভাষী একদল অজ্ঞাত লোক পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্ব্বে এক সময় এসিয়ার কোন স্থানে বাস করিতেন। ভাষা তত্ত্ববিদ পণ্ডিত এতদপেক্ষা আর বেশী কিছু বলিতে অসমর্থ। এই অতি সামান্য বিবরণ সাতিশয় অতৃপ্তিকর হইতে পারে, কিন্তু এতদপেক্ষা অধিক বলিবার উপায় নাই। পাঁচ হাজার কি দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা বিবৃত করিবার সময় কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করা অস্বাভাবিক নহে। এজন্য পূর্ব্বোক্ত বিবরণও সতর্কতার সহিত অনুধাবন করিতে হইবে। সেই আর্য্য ভাষা ভাষী অজ্ঞাত লোকদের বর্ণ, চুল এবং চক্ষু কিরূপ ছিল তৎসম্বন্ধে পণ্ডিতবর্গ নির্ব্বাক রহিয়াছেন। যদি আমরা বিজ্ঞানের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী পরিত্যাগ পূর্ব্বক বহির্ভাগে গমন করি, তবে যাহা ইচ্ছা তাহাই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। তখন আমরা পিক্টের অনুসরণ করিয়া বলিতে পারি যে, সমস্ত আর্য্যই দীর্ঘশীর্ষ ও নীলাক্ষ ছিলেন, অথবা পিট্রেমেন্টের মতানুসারে তাঁহাদিগকে প্রশস্ত মস্তক, তাম্রাভনেত্র এবং কৃষ্ণকেশরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে।

* Chips from a German Workshop Vol No I.

আচার্য্য ম্যাক্সমুলারের প্রাগুক্ত মত নৃতত্ত্ববাদের মূলে সাংঘাতিক আঘাত করিতেছে। তারপর আর একটি প্রধান বিবেচনার বিষয় এই যে, কেবল মোঙ্গোলিয় এবং শক জাতিরই প্রশস্ত মাথা নির্দ্দেশ করিবার কোন হেতু নাই। ফরাসীদেশ এবং আয়ারল্যাণ্ডের অধিবাসীদের মস্তকও স্থূল। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী তাহাদের দেহে বিশুদ্ধ আর্য্য শোণিত প্রবাহিত বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু নৃতত্ত্ববাদ বিসর্জ্জন করিবার পূর্ব্বে জাতিতত্ত্ব নির্ণয়ে মস্তক এবং নাসিকার পরিমাপ কতদূর গ্রহণযোগ্য তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক। বঙ্গদেশীয় সিভিলিয়ান উইলিয়ম ক্রুক বি, এ, The Natives of Northern India নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, প্রথমতঃ ভারতবাসীদের মাথার খুলি পরিমাপের সম্পূর্ণ ধারা প্রাপ্ত হই নাই, দ্বিতীয়তঃ কেবল করোটি এবং নাসিকা পরিমাপ করিয়াই কার্য্য শেষ করা হইতেছে। মস্তক ও নাসিকার মাপই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় হইলেও কেবল এই দুই অংশের পরিমাপ দ্বারা মানবদেহের ন্যায় জটিলযন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ করা দুঃসাহসের কার্য্য। করোটি এবং নাসিকার পরিমাপ দ্বারা কোন জাতির শারীরিক আদর্শ কিরূপ তাহা নির্ণয় পক্ষে অনেক আনুকূল্য হয় বটে, কিন্তু ভারতবাসীদের অধিকাংশই সঙ্কর বলিয়া তাঁহাদের জাতিত্ব নির্ণয় কল্পে তাদৃশ পরিমাপ নিষ্ফল বলিয়া বোধ হয়।

ক্রুক সাহেব যেরূপ কার্য্য দুঃসাহসিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, রিজলী সাহেব তাহাই বা কি প্রকার সুষ্ঠুভাবে নির্ব্বাহিত করিয়াছেন, আমরা তাহার আলোচনা করিতেছি।

শ্রীযুক্ত রিজলী সাহেব বলেন যে, কোনও জাতীয় একশত জন লোকের মস্তক ও নাসিকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের পরিমাণ সংগ্রহ করিলেই সেই জাতীয় লোকের মূল বংশ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা চলে। কিন্তু কার্য্যকালে তিনি প্রত্যেক জাতি হইতে গড়ে ৬৭ জন মাত্র (উত্তর ভারতের ১২ কোটী লোকের মধ্যে ৬০ হাজার মাত্র) লোক বাছিয়া লইয়া তাহাদের দৈহিক বিশেষত্ব অনুসারে সমগ্র জাতির বংশ নির্ণয় করিয়াছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, এক বংশের বা পরিবারেরই সকল লোকের, এমন কি এক পিতা মাতারই সকল সন্তানের মস্তক ও নাসিকাদির পরিমাপ যখন সকল সময় এক প্রকার দৃষ্ট হয় না, তখন এক এক জাতীয় এত স্বল্প সংখ্যক লোকের দৈহিক বিশেষত্বের উপর নির্ভর করিয়া সেই সেই জাতির মূল বংশ নির্ণয়ে মত প্রকাশ কি দুঃসাহসের কার্য্য নহে?*

রিজলী সাহেব গুজরাটী এবং মহারাট্টা ব্রাহ্মণকে শক দ্রাবিড় আর্য্য সম্মিলনের ফল, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকে দ্রাবিড় মোঙ্গলিয় ও আর্য্য সম্মিলনের ফল এবং বিহারী ব্রাহ্মণকে আর্য্য দ্রাবিড় সম্মিলনের ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রিজলী সাহেবের পরিমাপ অনুসারে গুজরাটী ব্রাহ্মণের মস্তকের প্রশস্ততা দৈর্ঘ্যের শতাংশের ৭৯৮০ অংশ, মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণের ৭৭ অংশ, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের ৭৯ অংশ মাত্র, বিহারী ব্রাহ্মণের ৭৫ অংশ মাত্র। এইরূপ সামান্য ইতর বিশেষের জন্য বিহারী ব্রাহ্মণের সহিত গুজরাটী, মহারাট্টা এবং বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের প্রভেদ নির্দ্দেশ করিলে তাহার যৌক্তিকতা কখনও স্বীকৃত হইতে পারে না।

এই স্থানে আবার একটি বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। আচার্য্য ম্যাক্সমুলারের মতে আদিম আর্য্যগণের বর্ণও আকারের বর্ণনা করিলে তাহা বিজ্ঞানের গণ্ডির বহির্ভাগে গমন রূপে পরিগণিত হইবে। শক জাতির মস্তক প্রশস্ত ছিল বলিয়া বর্ণনা করিলে তাহাও সেইরূপ কাল্পনিক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ঐতিহাসিক কুলতিলক গিবনের গ্রন্থে হুণ জাতীয় শকদের যে বীভৎস বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেও তাহাদের প্রশস্ত মস্তকের উল্লেখ নাই। তারপর মোঙ্গলিয় মাত্রেরই মস্তক প্রশস্ত, ইহাও ঠিক নহে। তাঁহাদের মধ্যেও দীর্ঘশীর্ষ অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়; এইরূপ অধ্যাপক নব টংলিয়ম কাউনার নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

* ৺ সখারাম গণেশ দেউস্কর। ১৩১৮ সনের সাহিত্য।

এখন আমরা রিজলী সাহেবের ঐতিহাসিক প্রমাণের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। ডাক্তার হর্ণলি এবং ডাক্তার গ্রিয়ারসন ভাষাতত্ত্ব মূলক অনেক প্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা ভারতবর্ষে আর্য্যগণের দুইবার উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেও দ্বিতীয় বারের আর্য্যগণ যে ভারতবর্ষে স্ত্রী পুত্র কন্যাদিগকে আনয়ন করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই, ইহা অনুমান মাত্র। গ্রীক ও শকদের সময় কিরূপ হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কিন্তু মুসলমানগণ তরবারি হস্তে প্রবল বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং রাজ্য সংস্থাপন করিয়াই স্ত্রী পুত্র কন্যাদিগকে আনয়ন করিয়াছিলেন। মোগলসম্রাট আকবরের পূর্ব্বে হিন্দু মুসলমানে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই। বিশেষতঃ ঐ সম্বন্ধ কেবল রাজপরিবারেই আবদ্ধ ছিল। পাদশাহ আকবর কর্ত্তৃক বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে এবং পরে সাধারণ হিন্দু মুসলমানে কদাচিৎ কখনও পরিণয় ঘটিত এবং তাহা ভোগ লালসা এবং অর্থলোভের ফল ছিল, তাহা কখনও জাতীয় মিশ্রণরূপে নির্দ্দেশিত হইতে পারে না। ফলতঃ দ্বিতীয় বার আগত আর্য্যগণ তরবারি হস্তে পথ পরিষ্কৃত করিয়া ভারতবর্ষে অধিকার স্থাপন পূর্ব্বক আদিবাস হইতে স্ত্রী পুত্র কন্যাদিগকে আনয়ন করেন, এই স্বাভাবিক অবস্থার বিপরীত প্রমাণ ও যুক্তি কিছুই নাই।

এখন শকদের কথা। অন্য বৈদেশিক আক্রমণকারীর তাণ্ডবে শকগণ পশ্চিম পঞ্জাব এবং কাশ্মীর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ইহা সত্য নহে। পার্থিয়ায় আশ্রিত শক রাজাদের কেবল কতক গুলি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহাদের কথা লইয়া প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিত মণ্ডলীতে ঘোর বাগ্বিতণ্ডা চলিয়া আসিতেছে; এপর্য্যন্ত কিছুই নিশ্চিত হয় নাই। কুশান শকদের রাজ্য ধ্বংস সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ভিনসেন্ট স্মিথ লিখিয়াছেন, প্রাচ্য নিয়ম অনুসারে কনিষ্কের রাজ্য খণ্ড খণ্ড হইয়া যায় এবং ধ্বংসমুখে পতিত হয়। পূর্ব্ব দিকে শকদের গতি রুদ্ধ হইয়াছিল, ইহাও ঠিক নহে। পার্থিয়ায় আশ্রিত শকগণ পূর্ব্বমুখে গমন জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ নাই। দ্বিতীয়তঃ কুশান বংশীয় শকনরপতি কনিষ্ক কর্ত্তৃক বারাণসী পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তৃত হইবার প্রমাণ আছে। পার্থিয়ায় আশ্রিত শকদের রাজত্ব প্রধানতঃ তক্ষশিলা, মথুরা এবং মালব প্রভৃতি স্থানে আবদ্ধ ছিল, এরূপ নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। কাশ্মীর ও পঞ্জাব কুশান বংশীয় শক্তির কেন্দ্রস্থল ছিল। কুশান বংশীয় শকদের অবনতির সময় তাহাদের সেনাপতিগণ আপনাদের জন্য রাজ্য স্থাপনে অগ্রসর হন। এই সময় গুজরাট অধিকৃত হয় এবং সে অধিকার তিনশত বৎসর পর্য্যন্ত স্থায়ী থাকে। তৎকালে অর্থাৎ খৃষ্টীয় প্রথম শতকের শেষে ঐসকল সেনাপতি মহারাষ্ট্রের উত্তরাংশে আধিপত্য স্থাপন করেন। কিন্তু দ্বিতীয় শতকের প্রথম পাদেই অন্ধ্র বংশীয় নরপতিগণ তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দেন।

দ্বিতীয়বার যে শক (হুন) গণ ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া অধিকার স্থাপন করেন, পঞ্জাবের অন্তর্গত শাকল নামক স্থানে তাঁহাদের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। ৪৫৮ খৃষ্টাব্দে স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালে ইহারা প্রথমে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন এবং ৪৮০ খৃষ্টাব্দের সম সময়ে গুপ্ত-সাম্রাজ্য বিনষ্ট করিতে সমর্থ হন। ইহার পর ৫৩৩ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষের সমবেত রাজন্যবর্গের চেষ্টায় কোরুরের যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাঁহাদের শক্তি পর্য্যুদস্ত হয়। কিন্তু তৎ সত্ত্বেও তাঁহারা রাজপুতনার একাংশ ভিন্নমলে এবং পশ্চিম ভারতের ব্রোচে অধিকার স্থাপন করিয়া দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন।

এখন আমাদের বক্তব্য এই যে, শক শক্তির কেন্দ্রস্থল কাশ্মীর পঞ্জাব এবং রাজপুতনা ছাড়িয়া তাঁহাদের শোণিত প্রবাহ কিরূপে তাঁহাদের সহিত একরূপ সম্পর্ক শূন্য মহারাষ্ট্রে প্রবেশ করিল, তাহা বিস্ময়ের বিষয় বটে। শকগণ দীর্ঘকাল গুজরাটে আধিপত্য করেন, সেখানে তাঁহাদের শোণিতের অস্তিত্ব দেখিলে, তাহাতে তাদৃশ বিস্ময়ের কারণ নাই।

রিজলী মহোদয় মহারাষ্ট্রে শক-শোণিত সপ্রমাণ করিবার জন্য আর একটি প্রমাণ বা যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।

তাঁহার মতে আধুনিক মহারাষ্ট্রা জাতি শকদের ন্যায়ই লুণ্ঠন-প্রিয়, অশ্বারোহণে পটু, দীর্ঘ অভিযান প্রিয়, অব্যবস্থিত সমরে দক্ষ, শক্র মিত্রের সহিত ব্যবহারে সাধুতা বর্জ্জিত, কূটচক্রী ও অধ্যবসায়শীল। এইরূপ প্রমাণ বা যুক্তি এংলো ইণ্ডিয়ান সংবাদ পত্রের উপযুক্ত। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন এই যে, রিজলী সাহেবের মতে গুজরাটে শক শোণিত প্রবাহিত থাকিলেও সেখানে অধিবাসীদের চরিত্রে ঐ সকল বিশেষত্ব কি তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন?

বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যার জাতিতত্ত্ব নির্ণয় কালে রিজলী সাহেব কোন ঐতিহাসিক এবং চরিত্রগত যুক্তি প্রমাণ আনয়ন করেন নাই, কেবল মস্তক সম্বন্ধীয় এবং দৈহিক পরিমাপের উপর নির্ভর করিয়াছেন। বাঙ্গালী এবং উড়িয়াদের মস্তকের প্রশস্ততাই তাঁহার প্রধান অবলম্বন। কিন্তু প্রশস্ত কপোল মোঙ্গোলীয়দের বিশেষ লক্ষণ নহে, অথবা মোঙ্গোলিয়দের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। মোঙ্গোলিযদের বিশেষ লক্ষণ অতি নিম্ন নাসিকার মূল, গণ্ডস্থলের অস্থির উচ্চতা, শ্মশ্রুর অভাব অথবা অল্পতা এবং বঙ্কিম ছাঁদের নেত্র। বাঙ্গালী এবং উড়িয়াগণের মধ্যে এই সকল লক্ষণ মোটেই দেখা যায় না। *

রিজলী প্রমুখ পণ্ডিতবর্গের বাঙ্গালীর জাতিতত্ত্ব বিষয়ক মত অগ্রাহ্য করিতে পারিলেই তাহাদের উচ্চস্তরের আর্য্যত্ব প্রতিপন্ন হয় না। তজ্জন্য প্রমাণ প্রয়োগ করিতে হইবে। তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গলার ভূতত্ত্ব বিষয়ক একটি কথা বলা আবশ্যক।

শতপথ ব্রাহ্মণ নামক বৈদিক গ্রন্থের এক স্থানে লিখিত আছে যে, সদানীরা বা গণ্ডকের পর পারস্থিত দেশগুলি জলে প্লাবিত হইত। অতএব এই সকল স্থান যে, সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী ছিল, তাহা প্রমাণিত হইতেছে। * ভূতত্ত্ববিদেরা প্রমাণ দিয়াছেন যে, অতি পূর্ব্বকালে বঙ্গদেশ ছিল না, হিমালয়ের মূলপর্য্যন্ত সমুদ্র ছিল। অদ্যাপি সমুদ্রবাসী জীবের দেহাবশেষ হিমালয় পর্ব্বতে পাওয়া গিয়া থাকে। কি প্রকারে গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রের মুখানীত কর্দ্দমে বঙ্গদেশের সৃষ্টি, তাহা সার চার্লস লায়েল প্রণীত Principles of Geology নামক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। (২) বঙ্গদেশে আর্য্য উপনিবেশ স্থাপিত হইবার সময় সমগ্র দেশ গঠিত হয় নাই এবং যশোহর পাবনা এবং ফরিদপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যশোহর, পাবনা এবং ফরিদপুরের দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিগ্বর্ত্তী স্থান অপেক্ষাকৃত আধুনিক, তৎকালে সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল।*

বঙ্গদেশের একাংশ পুরাকালে পৌণ্ড্র দেশ নামে খ্যাত ছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সমকালে এই দেশে যে অনার্য্য নরপতি রাজত্ব করিতেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন এবং আপনাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়া বিষ্ণুর চিহ্ন সকল ধারণ করিয়াছিলেন। এই অনার্য্য নরপতি পৌণ্ড্রক বাসুদেব নামে খ্যাত হন। এই ঐতিহাসিক তথ্য হইতে আমরা দুইটি বিষয় জানিতে পারি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সমকালে অর্থাৎ খৃষ্টের জন্মের অন্যূন দেড় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পৌণ্ড্রদেশে আর্য্যগণ প্রবেশ করেন এবং আপনাদের প্রভাব, অন্ততঃ বিষ্ণুপূজা পবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হন। তৎকালে তথায় বিষ্ণু পূজা প্রবর্ত্তিত না থাকিলে অনার্য্য নরপতির পক্ষে আপনাকে বিষ্ণুর অবতার রূপে প্রচার করা নিরর্থক ছিল।

বস্তুতঃ মহানন্দা এবং করতোয়া নদীর মধ্যবর্ত্তী দেশে অর্থাৎ পৌণ্ড্রদেশে আর্য্যগণের প্রথম উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার পশ্চিমে প্রাচীন মিথিলা দেশ এবং গঙ্গার অপর পারে মগধ এবং অঙ্গরাজ্য অবস্থিত ছিল। এই আর্য্য ভূমি হইতে আর্য্যগণ আগমন করিয়াছিলেন। প্রাচীন মগধের (কীকটের) নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পরিত্যক্ত পুত্রগণ মহানন্দা এবং করতোয়ার মধ্যবর্ত্তী স্থানে আগমন করিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে তাঁহাদের আগমন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়।

* শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ। সাহিত্য, ১৩২১।

* বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত (পরেশ বাবু)

(২) বঙ্কিমবাবুর বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার।

* J—A—S—B. Ancient countries in Eastern India

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের একশত বৎসর পূর্ব্বে এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। এইভাবে খৃষ্টপূর্ব ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান বঙ্গদেশে আর্য্য অধিকারের সূত্রপাত হয়।

বহুমানাস্পদ রমেশ চন্দ্র দত্ত মহোদয় বৌধায়ন সূত্র আলোচনা পূর্ব্বক খৃষ্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দী আর্য্যগণ কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ বিজয়ের সমাপ্তি কাল রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। * গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে বঙ্গদেশের অন্তর্গত প্রভূত সামরিক বল সম্পন্ন গঙ্গারিডি নামক এক জনপদের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। (২)

প্রথম আর্য্য উপনিবেশ স্থাপিত হইবার সময় বঙ্গদেশ চারিচক্রে বিভক্ত ছিল। প্রথম চক্র মহানন্দা ও করতোয়ার মধ্যবর্ত্তী স্থান। পুণ্ড্র, চান্ডাল এবং পোদ নামক তিনটি জাতি এই চক্রের অধিবাসী ছিল। কোচ, মেচ, লেপচা প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতির তাণ্ডবে এই চক্র বিধ্বস্ত হইত। তৎকালে পুণ্ড্র জাতির অনেকে ধ্বংস প্রাপ্ত হন। পোদেরা ভাগীরথীর পূর্ব্ব তীরে গমন করে। চান্ডালেরা পূর্ব্বদিকে সমুদ্র তীরে উপনিবিষ্ট হয়। বর্ত্তমান সময়েও মহানন্দার উভয়তীরে পুণ্ড্ররা (পুঁড়া) বস বাস করিতেছে। ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে পোদদের বাস দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গে বহু চান্ডাল বাস করিতেছে।

দ্বিতীয় চক্র, রূপনারায়ণ নদের উভয় তটে বিস্তৃত ভূমি। কেওট (কৈবর্ত্ত) নামক জাতি এই চক্রের অধিবাসী ছিল। অদ্যাপি মেদিনীপুর, হুগলী ও হাওড়া অঞ্চলে এই জাতীয় লোকদের বস বাস দেখিতে পাওয়া যায়।

তৃতীয় চক্র, দারুকেশ্বর ও দামোদর নদের মধ্যবর্ত্তী স্থান। বাগদী নামক জাতি এই চক্রে বস বাস করিত। অদ্যাপি বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলার পশ্চিম খণ্ডে বাগদীদের বাস দেখিতে পাওয়া যায়।

চতুর্থ চক্র, বর্দ্ধমানের কিয়দংশ, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলা; এই ভূমি রাঢ় দেশ নামে পরিচিত।

চতুর্থচক্রের পশ্চিমবর্ত্তী পর্ব্বতমালার অপরপারে মগধদেশে আর্য্য জাতির বসতি ছিল। আর্য্যগণ পর্ব্বতমালা উত্তীর্ণ হইয়া এই চক্রে প্রবিষ্ট হন। কোন্ সময় আর্য্য জাতির তাদৃশ অভিযান হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। বঙ্গদেশ মধ্যে এই অংশেই আর্য্যগণের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয় কিন্তু ব্রাহ্মণেতর আর্য্যগণের অনেকে রাঢ়ের পূর্ব্বতম অধিবাসী সাঁওতাল, কোল প্রভৃতি বর্ব্বর জাতির সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। সকলেরই এই অবস্থা হয় নাই। যাহারা আপনাদের জাতীয়তা রক্ষা করিতে সমর্থ হন, তাঁহারা সদ্গোপ আখ্যা লাভ করেন।

শাস্ত্রেতে সুপণ্ডিত উমেশচন্দ্র বটব্যালের প্রবন্ধ অবলম্বনে আমরা বাঙ্গলার আদি জাতি সমূহের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম। * এতৎসম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১২৯৪ সনে 'বিভা' নাম্নী মাসিক পত্রিকার জাতিভেদ শীর্ষক প্রবন্ধে যে মত জ্ঞাপন করিয়াছেন, আমরা এখানে তাহা সঙ্কলিত করিতেছি।

পুণ্ড্র, কৈবর্ত্ত, বাগদী, ধীবর, রাজবংশী, তীবর (কোচ) প্রভৃতি জাতি আর্য্যদিগের প্রান্তবাসী জাতি ছিল। বঙ্গের উত্তর ভাগে সব রাজবংশী কোচ, রাঢ় দেশময় কেবল বাগদী। দক্ষিণ দেশে কেবল পোদ ও কৈবর্ত্ত। পুণ্ড্র বা পুঁড়োদের রাজ্য ছিল। অন্যান্য জাতিরও রাজ্য ছিল। উচ্চশ্রেণী, নিম্ন শ্রেণী ছিল, পুরোহিত ছিল, সব ছিল। বিষ্ণুপুরের বাগদী রাজাদের কথা সকলের নিকট বিদিত। রংপুর ও কোচবিহার অঞ্চলে অনেক রাজবংশী কোচ রাজ্য করিয়া গিয়াছেন।

আর্য্যগণ এই সকল জাতির মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন। এই ভাবে কয়েক শত বৎসর গত হইলে বৌদ্ধপ্রচারকগণ বঙ্গদেশে প্রবেশ করেন। বৌদ্ধধর্ম্ম বঙ্গদেশে সাতিশয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল। ঐ সকল স্বতন্ত্র জাতিকে বৌদ্ধধর্ম্ম আপন অঙ্কে স্থান দান করিয়াছিল। অতঃপর বঙ্গদেশে

* Ancient India (২) Megasthenes (Mc Rindle) প্রচার, ১ম খণ্ড।

* সাহিত্য ১৩০৯।

সনাতন ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইল। বঙ্গদেশের আদিম জাতিরা বৌদ্ধ হইয়াছিল। এখন আবার নূতন ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। এই ভাবে বঙ্গদেশে অন্ত্যজ জাতির সৃষ্টি হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, আমাদের দেশে বদ্ধমূল সংস্কার এই যে, বল্লাল সেন অন্ত্যজ জাতিদিগকে ব্রাহ্মণ দেয়া হিন্দু করিয়া লইয়াছিলেন।

মোঙ্গোলিয় কোচেরা পুণ্ড্রদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া উত্তর অংশের কিয়দংশে বসতি স্থাপন করিয়াছিল এবং পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। পুণ্ড্র, পোদ, চাণ্ডাল, কৈবর্ত্ত, বাগদী, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতি বাঙ্গলার আদিম অধিবাসী, ইহারাই দেশের অধিকারী ছিল। বাঙ্গালার জাতিতত্ত্ব নির্ণয় করিতে হইলে এই সকল কোন জাতি ভুক্ত ছিল, তাহাই অনুসন্ধান করিতে হইবে।

পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্র অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চাতুর্ব্বর্ণ্য ঈশ্বর সৃষ্ট। কিন্তু জাতি অসংখ্য। এজন্য স্মৃতিকারগণ ঈশ্বরবাক্য সার্থক রাখিবার জন্য বর্ণসঙ্কর ও ক্রিয়ালোপ এই দুইটিমাত্র উপায় অবলম্বন করিয়া জাতির উৎপত্তি স্থির করিয়া দিয়াছেন। মনুর মতে পুণ্ড্রগণ বৃষল অর্থাৎ ব্রাহ্মণের আদর্শ জনিত ক্রিয়াশূন্য ক্ষাত্রিয়। মনু এইরূপ আর একটি ক্রিয়াশূন্য বৃষল জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার নাম দ্রবিড়।

ইউরোপীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর সিদ্ধান্ত অনুসারে আর্য্য-প্রবাহের পূর্ব্বে এই দ্রবিড় জাতি (Race) সম্ভূতগণ কর্তৃক সমগ্র ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ ছিল। সমগ্র ভারতবর্ষের বিবরণ আমাদের আলোচ্য নহে। দক্ষিণ ভারত এবং বাঙ্গালার কথাই আমাদের আলোচ্য। আমাদের দেশীয় সুধীগণও বাঙ্গালার আদিম অধিবাসীদিগকে দ্রবিড় জাতি সম্ভূত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বঙ্গদেশের আদিম অধিবাসী দ্রাবিড়দের পূর্ব্বের কোন বিবরণ লিপিবদ্ধ নাই। কিন্তু ইহাদের জ্ঞাতিরা দক্ষিণ ভারতের আদিম অধিবাসীরূপে সর্ব্বজন কর্তৃক স্বীকৃত, এবং তাঁহাদের কিঞ্চিৎ বিবরণও লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। সুবিখ্যাত মহারাষ্ট্র পণ্ডিত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর Early History of Deccan নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ঐ সকল প্রদেশে আর্য্যগণ উপনীত হইয়া আপনাদের সভ্যতা বিস্তার করেন। কিন্তু এই সকল স্থানের আদিম অধিবাসীরা আর্য্য সভ্যতা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করে নাই। আর্য্যগণ তাহাদের ভাষা ও সামাজিক রীতিনীতি আমূল পরিবর্ত্তন করিতে অসমর্থ হন এবং অগত্যা বাধ্য হইয়া তাহাদের ভাষা শিক্ষা করেন, ফলতঃ তাহাদের সামাজিকতাও কিয়ৎ পরিমাণে আর্য্য জাতির মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। তেলিগু তামিল এবং অন্যান্য দক্ষিণী ভাষা সংস্কৃত মূলক নহে। মহারাষ্ট্রের দক্ষিণ এবং পূর্ব্ববর্ত্তী স্থানে আর্য্য-সভ্যতা তাদৃশ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইবার কারণ এই যে, আর্য্য আগমনের পূর্ব্বে ঐ সকল স্থানে সুশৃঙ্খল সমাজ ও রাজ্য সকল প্রতিষ্ঠিত ছিল। রামায়ণে সীতা দেবীর অন্বেষণার্থী বানরদিগের প্রতি যে উপদেশ লিপিবদ্ধ আছে, তাহাতে তেলিগু, পাণ্ড্য, চোল কেবল জাতির আর্য্য সংশ্রব শূন্য সমৃদ্ধির চিত্র অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারতে আর্য্য সভ্যতার কেবল আংশিক সাফল্য লাভের দ্বিতীয় কারণ মহামতি রাণাডে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। দক্ষিণ ভারতে যে সকল আদিম জাতি বাস করিত, তাহাদের সংখ্যা এত অধিক ছিল যে, যে অল্প সংখ্যক ব্রাহ্মণ কয়েকজন যোদ্ধা ও বণিক সঙ্গে হইয়া সে প্রদেশে বাস করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা দেশবাসীর উপর প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন নাই। *

যে সকল জাতি দক্ষিণ ভারতে শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজ ও রাজ্য স্থাপন করেন, তাহাদের জাতিরাই বাঙ্গালা দেশে বাস করিত, তাহাদেরও রাজ্য ও সমাজ ছিল বলিয়া সন্ধান পাওয়া যায়। এই সকল রাজ্য ও সমাজ দক্ষিণী রাজ্য ও সমাজের ন্যায় শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল কি না, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার কোন উপায় নাই। কিন্তু সমজাতীয়দের রাজ্য ও সমাজ এক প্রদেশে শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং অন্য প্রদেশে একেবারে বিশৃঙ্খল ছিল,

* Dr P. C Roy's Presidential speech, Social Conference 1917.

এরূপ নির্দ্দেশ করাও সঙ্গত নহে। বঙ্গদেশীয় এই সকল রাজ্য ও সমাজে আর্য্যগণ প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিলেন; আপনাদের ভাষা দিয়াছিলেন, আপনাদের ধর্ম্ম দিয়াছিলেন। তাঁহারা সংখ্যার অল্পতা নিবন্ধন দক্ষিণ ভারতে প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। আর্য্যগণের কেন্দ্রস্থান সমূহ হইতে দক্ষিণ ভারতের দূরত্ব সে দেশে তাঁহাদের সংখ্যার অল্পতার কারণ ছিল। কিন্তু বঙ্গদেশের পার্শ্বেই আর্য্যভূমি মগধ ও মিথিলার অবস্থিতি বশতঃ তাঁহারা সহজেই বঙ্গদেশে সংখ্যায় প্রবল হইয়া উঠেন এবং তজ্জন্য ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণরূপে আপনাদের প্রাধান্য স্থাপন করিতে সমর্থ হন। পৌণ্ড্রক বাসুদেবের আখ্যানে আমরা বাঙ্গালা দেশে আর্য্য প্রভাবের সূচনা দেখিতে পাই। বাঙ্গালা দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে এই প্রভাব কতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই। তবে কিয়ৎ পরিমাণে যে উহা বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহার আনুসঙ্গিক প্রমাণ পাওয়া যায়। মনু-সংহিতায় অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ এবং সৌরাষ্ট্রে তীর্থ যাত্রা ব্যতীত অন্য কারণে গমন নিষিদ্ধ হইয়াছে। খৃষ্টের জন্মের ৪র্থ শতাব্দীতে মনুসংহিতার রচনা কালে ঐসকল দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম বা জৈনধর্ম্ম প্রবল ছিল। ইহাই সংহিতাকারগণের বিরাগের কারণ। উক্ত শ্লোক একদিকে ঐ সকল দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বা জৈন ধর্ম্মের প্রবলতার সাক্ষ্য দিতেছে, অন্য দিকে বৌদ্ধধর্ম্ম বা জৈন ধর্ম্ম প্রবল হইবার পূর্ব্বেই তথায় আর্য্য-প্রভাব প্রদর্শন করিতেছে। কারণ বৌদ্ধধর্ম্ম বা জৈন ধর্ম্মের প্রবলতার সময় অপেক্ষা তাহার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম অনুগত তীর্থের উদ্ভব সমধিক যুক্তিযুক্ত।

কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেই আর্য্য প্রভাব বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিলেও চাতুর্ব্বর্ণ্যবাদী অদৃশ্য দেবোপাসক ব্রাহ্মণেরা বঙ্গদেশের অধিবাসীগণের মধ্যে যাদৃশ সমাদৃত না হইয়াছিলেন, সাম্যবাদী প্রতিমা পূজক বৌদ্ধেরা তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে লোকের চিত্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন। বৌদ্ধ প্রচারক গণের দ্বারাই আর্য্যজাতির সভ্যতা বাঙ্গালা দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বৌদ্ধ ভিত্তির উপরেই ব্রাহ্মণদের দ্বারা বাঙ্গালাদেশে হিন্দুয়ানী গঠিত হইয়াছে।*

এই হিন্দুয়ানী অবলম্বনে যে বাঙ্গালী জাতি গঠিত হইয়া উঠিয়াছে, তৎ সম্বন্ধে আমরা শূলপাণির প্রণীত প্রায়শ্চিত্ত-বিবেক গ্রন্থ হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রামাণিক বিবরণ জ্ঞাত হইতে পারি। শূলপাণির মত বঙ্গদেশে আদরণীয়, তিনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারিজাতি স্বীকার করিয়াছেন; তদ্ব্যতীত নানা শ্রেণীর অন্ত্যজ জাতিরও অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন।* ব্রাহ্মণ, শূদ্র এবং অন্ত্যজ জাতি আমাদের চোখের সম্মুখে দেখিতেছি। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য কোথায় গেল? বাঙ্গালা দেশে ক্ষত্রিয় দুই চারি ঘর যাহা স্থানে স্থানে দেখা যায়, তাঁহারা ঐতিহাসিক কালে, অধিকাংশই মোসলমান দিগের সময়ে আসিয়াছেন। বৈশ্য সম্বন্ধেও ঐরূপ। মুর্শিদাবাদ যখন মোসলমান রাজধানী, তখন জন কয় বৈশ্য আসিয়া তাহার নিকটে বাণিজ্যার্থ বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের বংশ আছে। এইরূপ অন্যত্রও অল্পসংখ্যক বৈশ্য আছেন। তাঁহারা আধুনিক কালে আসিয়াছেন (১)

ফলতঃ শূলপাণি যাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বলিয়াছেন, তাঁহাদের অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই অনুসন্ধানের নিমিত্ত বাঙ্গলার বৌদ্ধ প্রভাব সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। বঙ্গদেশে প্রবল বৌদ্ধ প্লাবন উপস্থিত হইলে, তাহার প্রবাহে আর্য্যজাতির বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ভাসিয়া গিয়াছিল। আর্য্যগণ বৌদ্ধধর্ম্মের অনুরাগী হইয়া চাতুর্ব্বর্ণ্য বিস্মৃত হন। ফলতঃ তখন চাতুর্ব্বর্ণ্য একেবারে উঠিয়া না গেলেও ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহাদি চলিত এবং আর্য্য অনার্য্যে মিশ্রণ হইয়াছিল। কিন্তু এই সম্পর্কে একটি কথা মনে রাখা কর্ত্তব্য। স্বভাবতঃই সর্ব্বত্র এবং সর্ব্ব সময়ে উচ্চশ্রেণীর লোককে নিম্নশ্রেণীর সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক সংস্থাপনে অনিচ্ছুক দেখিতে পাওয়া যায়। জাত্যাভিমান দূর করিতে পারিলেও বংশের, বিদ্যার বা ধনের গৌরব পরিত্যাগ দুষ্কর

*৺ উমেশ চন্দ্র বটব্যাল।

* বিভা, ১ম খণ্ড।

(১) বঙ্গদর্শন, ১২৮২, বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার।

সমাজের পক্ষে সহজ নহে। উদার ইউরোপীয় সমাজেও উচ্চশ্রেণী, নিম্নশ্রেণী আছে এবং উচ্চশ্রেণীর লোক নিম্ন-শ্রেণীর সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপন বিষয়ে উৎসাহী নহেন। আমাদের দেশেও বর্ত্তমান সময়ে যাহারা জাতি বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তাহাদিগকেও পৈত্রিক কুলে বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপন জন্যই মনোযোগী দেখিতে পাওয়া যায়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তত্ত্ব-কৌমুদী পত্রিকায় এবিষয়ে আক্ষেপোক্তিও প্রকাশিত হইয়াছিল। উদার সমাজ সমূহেরই যখন এইরূপ অবস্থা, তখন যে আধুনিক পণ্ডিত মণ্ডলীর মতে আদিম অধিবাসীর প্রতি অপ্রসন্ন আর্য্যসমাজ তাহাদের সহিত অবাধ বিবাহ প্রথা অনুমোদন করিয়াছিল, তাহা সম্ভব নহে। এই সকল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সহিত, বৈশ্য ক্ষত্রিয়ের সহিত, আর্য্য অনার্য্যের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতেন, সময় সময় ধনলোভে বা স্ত্রীলোভে এই প্রকার বিবাহ সংঘটিত হইত। বর্ণসঙ্কর ছিল, আছে এবং হইতেছে। বর্ণসঙ্কর অবস্থানুসারে পিতা অথবা মাতার বর্ণ প্রাপ্ত হইত। ইহাই ভারতবর্ষের সনাতন প্রথা। অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল। বেদব্যাস ধীবর-কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াও ব্রাহ্মণ ছিলেন। বিদুর দাসীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াও ক্ষত্রিয় ছিলেন। ভীমের পুত্র ঘটোৎকচ রাক্ষসী হিড়িম্বার গর্ভজাত হইয়াও ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। জরৎকারু ঋষি অনার্য্য রাজা বাসুকীর ভগিনীকে বিবাহ করেন, তাঁহার পুত্র ছিলেন, আস্তিক ঋষি। এইরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতে পারে। বর্ত্তমান সময়েও এইরূপ প্রথাই দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীহট্ট জেলায় বৈদ্য কায়স্থে বিবাহ ঢাকা কুমিল্লা ময়মনসিংহেও বৈদ্য কায়স্থে বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রচলিত আছে। তাঁহাদের উৎপন্ন সন্তান পিতার বর্ণই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ফলতঃ শাস্ত্রবাক্যে আস্থাস্থাপন করা দুরূহ। শাস্ত্রে আছে যে, নিষাদ এবং অযোগব জাতির মিশ্রণে কৈবর্ত্ত জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। কৈবর্ত্ত জাতির জনসংখ্যা ২০লক্ষ। এইরূপ জনবহুল একটী জাতিকে দুইটী ক্ষুদ্র সঙ্কর বর্ণের মিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়া বিশ্বাস করা অসম্ভব। আমরা আর একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। মনু বলেন, শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে চণ্ডালের জন্ম। কিন্তু সমস্ত বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ইহাদের সংখ্যা অনেক বেশী। সংখ্যা ১৮ লক্ষ। ব্রাহ্মণের সংখ্যা ১১ লক্ষের বেশী নহে। এরূপ অবস্থায় কিরূপে চণ্ডালের উৎপত্তি নির্ণয় করা যাইতে পারে? আমরা কি অনুমান করিব যে স্ফূর্ত্তিবান্ শূদ্রেরা একটি নূতন জাতি সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায়ে সহস্র সহস্র সুন্দরী অথচ দুর্ব্বল চিত্ত ব্রাহ্মণ কন্যাকে কুপথে আনয়ন করিয়াছিল? অথবা আমরা ইহাই অনুমান করিব যে, রাজানুগৃহীত ও পৌরহিত্য ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ সন্তান অপেক্ষা এই নূতন জাতীয়েরা মৎসবহুল জলাভূমি ও গণ্ডগ্রামে নানাবিধ দুঃখ কষ্টের মধ্যে থাকিয়াও সংখ্যায় বেশী হইয়া পড়িয়াছিল? এই অনুমান গুলিও যেমন অসম্ভব, মনুর প্রচারিত সঙ্কর জাতির বিবরণও সেইরূপ অসম্ভব।*

আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রাচীন বঙ্গের ন্যায় শৃঙ্খলা-বদ্ধ এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ সমাজে বর্ণ সঙ্করের উৎপত্তি স্বভাবতঃই সীমাবদ্ধ ছিল। এবং বর্ণ সঙ্কর লইয়া কোন পৃথক্ জাতি গঠিত হয় নাই। শাস্ত্রে যাহাদিগকে বর্ণসঙ্কর রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই দেশের আদিম অধিবাসী ছিল। (১) দ্বিতীয়তঃ বৌদ্ধযুগে চাতুর্ব্বর্ণ্য মূলক বঙ্গ সমাজে সময় সময় অসবর্ণ বিবাহ সংঘটিত হইয়া থাকিলেও এজন্য পৃথক্ জাতি গঠিত হয় নাই।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্লাবনে বাঙ্গালার ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম নিমজ্জিত হইয়াছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ অনেক পরিমাণে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উপনিষদের সময় হইতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ে একটি বিবাদ চলিয়া আসিতেছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তক একজন ক্ষত্রিয় রাজ

---

* Ancient India (R. C. Dutt) জাতিভেদ (শ্রীদিগেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য)।

(১) Ancient India (R. C. Dutt.)

কুমার ছিলেন। ব্রাহ্মণকুল বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়কে আপনাদের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয় কুলের অভ্যুত্থান রূপে গণ্য করিয়া ছিলেন। তারপর শাক্যসিংহ বলিয়াছিলেন, "ব্রাহ্মণ শূদ্র সমান, বর্ণ-বৈষম্য মিথ্যা"। বৈষম্য-পীড়িত ভারতবর্ষ এই মহাবাক্য শুনিয়া বিচলিত হইয়াছিল; ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সাম্যবাদী হইলেন। ব্রাহ্মণকুলের প্রভুত্ব বিলুপ্ত হইতে লাগিল। এই সকল কারণে তাঁহারা বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী হইতে পারেন নাই। স্বধর্ম রক্ষা তথা আত্মরক্ষার জন্য অবহিত ছিলেন। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই এইরূপ হইয়াছিল। বঙ্গদেশেও তাহার অন্যথা হয় নাই।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন থ-সঙ্গ এদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি শ্রমণের পার্শ্বেই ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব দেখিতে পাইয়াছিলেন। পালরাজাদের সময় একজন ব্রাহ্মণ প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী তিন চারি পুরুষও এই পদে নিয়োজিত ছিলেন। একখানি তাম্রফলক হইতে জানা গিয়াছে যে, পালবংশীয় মদন পালের মহিষী মহাভারতের শ্লোক সমূহের আবৃত্তির জন্য কয়েক জন ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। পালবংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে বঙ্গদেশে সেন রাজ্য এবং আরও নানা রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। এই সকল রাজ্যের মধ্যে অনেক গুলির অধিপতি সনাতনধর্ম্মী ছিলেন। এই সময় বঙ্গদেশে অনেক ব্রাহ্মণ আইসেন।* তাঁহাদের অসাধারণ সাধনা অপূর্ব্ব মনস্বিতার সহিত মিলিত হইয়া বঙ্গদেশে হিন্দুধর্ম্ম আবার গড়িয়া তুলিয়াছিল। তাঁহারা সে ধর্ম্মের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার জন্য নূতন সমাজ নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হন; নূতন ধর্ম্ম, নূতন সমাজের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার জন্য বর্ণভেদ কঠোর হইতে কঠোরতর করেন। তৎকালে সমাজের একদিকে বৌদ্ধপ্রভাবে সংক্ষুব্ধ এবং ক্ষমতা সম্পন্ন ব্রাহ্মণকুল, অপর দিকে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে বর্ণ গৌরব সম্বন্ধে উদাসীন ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যসমাজ। সেই ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যসমাজ আবার ব্যবসায় ভেদে নানা উপভাগে বিভক্ত এবং ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। নূতন শাস্ত্রকর্ত্তৃগণ কাণ্ডের দিকে লক্ষ্য না করিয়া শাখা প্রশাখা বিস্তার পূর্ব্বক সমাজ তরু একেবারেই জটিল করিয়া তোলেন এবং স্ব স্ব গণ্ডীর বহির্ভাগে বিবাহ ও আহারাদি পাতক রূপে নির্দ্দেশ করেন। এই সময় হইতে বঙ্গের সমাজ-শরীর শূদ্র, সৎশূদ্র আর বর্ণসঙ্করে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যসমাজ তখন হৃততেজা এবং বর্ণ গৌরব সম্বন্ধে উদাসীন, আপনাদের বর্ণগৌরব বলবৎ করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। শূদ্র ও ক্ষত্রিয়ের সঙ্করে কুম্ভকার এবং তন্তুবায় উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে তাহাদের বৃত্তি কোন্ জাতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাহিত হইত? তাহারা কি নির্ব্বংশ হইয়াছে? অথবা স্বেচ্ছায় স্ববৃত্তি ত্যাগ করিয়াছে? বঙ্গদেশের অন্যান্য শিল্পীদের সম্বন্ধেও আমরা এই প্রশ্নই করিতেছি। তৎকালে কোন কোন সম্প্রদায় আপনাদের বংশ মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য উত্থিত হইয়াছিল, কিন্তু নানা প্রকার প্রবল বাধায় তাহাদের উদ্যম বিফল হইয়াছিল, তাহারা সমাজের আরো নিম্নস্তরে নিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কিম্বদন্তী এই যে, তাহারা ব্রাহ্মণের কোপগ্রস্ত হওয়াতে বল্লালসেনের অনুশাসনে তাহাদের সামাজিক মর্য্যাদা হীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ সুবর্ণ বণিক, সূত্রধর এবং যোগী জাতির উল্লেখ করিতেছি। (১)

আমরা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অনুসন্ধানের সুবিধার জন্য বাঙ্গলার জাতি মাত্র কতিপয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিতেছি- (১) ব্রাহ্মণ (২) ক্ষত্রী, বৈদ্য ও কায়স্থ (৩) নবশাক এবং অন্যান্য সৎশূদ্র এবং শূদ্র, যথা, বারুই, গন্ধবণিক, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, মালাকর, মোদক, নাপিত, সৎগোপ,

* বৈদিক ব্রাহ্মণ।

বিশ্ব ১ম খণ্ড, সম্বন্ধ নির্ণয়

(১)	ব্রাহ্মণ—	১১ লক্ষ
	ক্ষত্রী—	১১৩ হাজার
	বৈদ্য—	৮২ হাজার
	কায়স্থ—	১৩ লক্ষ

তাম্বুলি, তন্তুবায়, তেলী ইত্যাদি, (৪) চাষী কৈবর্ত্ত এবং পশ্চিম বঙ্গের গোয়ালা, (৫) বৈষ্ণব এবং যোগী (৬) সুবর্ণ বণিক, সাহা, সূত্রধর, (৭) বাগ্‌দী, চাষাতী, ধোপা, জেলিয়া, কৈবর্ত্ত, কুম্, কপালী, মাল, নমশূদ্র (চণ্ডাল), পলিয় রাজবংশী, পাটনী, পোদ, শুঁড়ী, টুপরা ইত্যাদি, (৮) বাউরী, চামার, ডোম হাড়ি, ভূঁইমালী, মুচি ইত্যাদি।

উক্ত তালিকা অভিনিবেশ সহকারে প্রণিধান করিলে সেই ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে। ভারতীয় আর্য্যগণ চতুর্ব্বর্ণ। যেখানে তাঁহারা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন, তথায়ই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য গমন করিয়াছেন। আমরা মহামহিম বাবুদের যে বাক্য পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে সুদূর দাক্ষিণ ভারতেও আর্য্য পুরোহিত, আর্য্য যোদ্ধা, আর্য্য বণিকের একত্রে গমন স্বীকৃত হইয়াছে। কেবল বঙ্গদেশে ইহার অন্যথা হইয়াছিল বলিয়া নির্দ্ধারণ করিবার কারণ নাই।

আমরা বঙ্কিম বাবুর প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া আমাদের বক্তব্যের উপসংহার করিতেছি। "আর্য্যেরা বাঙ্গলায় আসিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় অনার্য্যদের বাস ছিল। তার পর দেখিয়াছি যে, সেই অনার্য্যগণ এক বংশীয় নহে। কতকগুলি কোলবংশীয়, কতকগুলি দ্রবিড় বংশীয়। আর্য্যগণ আসিয়া বাঙ্গলা অধিকার করিলে কোলীয় ও দ্রাবিড়ী অনার্য্যগণ। তাহাদিগের তাড়নায় পলায়ন করিয়া বন্য ও পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু সকল অনার্য্যেরা আর্য্যের তাড়নায় বাঙ্গালাদেশ হইতে পলাইয়া বন্য ও পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় লইয়াছিল, এমত নহে। আমরা দেখিয়াছি যে, অনার্য্যগণ আর্য্যের সংঘর্ষণে পড়িলে আর্য্যধর্ম ও আর্য্যভাষা গ্রহণ করিয়া হিন্দুজাতি বলিয়া গণ্য হয় ও হিন্দু সমাজভুক্ত হয় বা হইতে পারে, হইয়াছিল এবং হইতেছে, *।"

এক্ষণে যাহাদিগকে আমরা বাঙ্গালী বলি, তাহাদিগের মধ্যে চারিপ্রকার বাঙ্গালী পাই। এক আর্য্য, দ্বিতীয় অনার্য্য হিন্দু, তৃতীয় আর্য্যানার্য্য হিন্দু, আর তিনের বাহির এক চতুর্থ জাতি বাঙ্গালী মুসলমান। উপরের স্তরে প্রায় কেবলই আর্য্য। এইজন্য দূর হইতে দেখিতে বাঙ্গালী জাতিকে আর্য্যমিশ্র আর্য্যজাতি বলিয়াই বোধ হয় এবং বাঙ্গালার ইতিহাস এক আর্য্যবংশীয় জাতির ইতিহাস বলিয়া লিখিত হয়।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত

নবশাখ, ব্রাহ্মণান্য সৎশূদ্র এবং শূদ্র ৩ লক্ষ
চাষী কৈবর্ত্ত ১০ লক্ষ
গোয়ালা— ৬ লক্ষ
বৈষ্ণব, যোগী, সুবর্ণ বণিক, সাহা এবং সূত্রধর ৭ লক্ষ
বাগদী— [illegible]৩০ হাজার
জালিয়া— ৪৪৭ হাজার
নমশূদ্র— ১৮৬০ হাজার
পোদ— ৪৬৪ হাজার
রাজবংশী— ২০৬৫ হাজার
বাউরি, চামার ইত্যাদি ১৭ লক্ষ

*বঙ্গদর্শন ১২৮৭

প্রাণী-পরিচয় প্রণালী।

প্রাণীবৃত্তান্ত সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করিতে হইলে প্রথমতঃ প্রাণীর কি কি লক্ষণ, তাহা সুপ্রকট ভাবে নির্দ্দেশ করা প্রয়োজন। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিতে গেলে যে কোনও পদার্থের প্রাণ আছে, তাহাই প্রাণী-পদবাচ্য। এই সংজ্ঞানুসারে উদ্ভিদবর্গও প্রাণী আখ্যা পাইতে পারে, কারণ, উহাদেরও আমাদের মত জন্ম, মৃত্যু ও হ্রাস বৃদ্ধি হয়। উদ্ভিদবর্গও আমাদের মত খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করে, প্রচুর বা প্রয়োজনীয় খাদ্যাভাবে দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং খাদ্যের সম্পূর্ণ অভাব হইলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। উদ্ভিদের যে প্রাণ আছে, তদ্বিষয়ে আধুনিক বৈজ্ঞানিক-

গণের মধ্যে কোনও মতদ্বৈধ নাই। চেতনাশক্তিকে প্রাণময় পদার্থ অর্থাৎ প্রাণিত্বের নিকষ স্বরূপ গ্রহণ করা পক্ষেও নানা অন্তরায় বিদ্যমান। আমাদেরই দেশের একজন বিশ্রুতনামা বৈজ্ঞানিক স্বাবিষ্কৃত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্র সাহায্যে প্রত্যক্ষরূপে প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, উদ্ভিদেরও সুখদুঃখানুভব শক্তি রহিয়াছে। উহাদিগকে উদ্দীপক ঔষধ দ্বারা উদ্দীপিত এবং মাদকদ্রব্য প্রভাবে নিস্পন্দ অর্থাৎ অজ্ঞান করা যায়। কাজেই চৈতন্যের অনুভূতি ও অভাবদ্বারা প্রাণী ও উদ্ভিদের পার্থক্যসাধন করাও ভ্রান্তিমূলক। আমরা সাধারণতঃ যে সকল প্রাণীর সহিত সুপরিচিত, তাহাদের একটী বিশেষত্ব এই যে, উহারা প্রকৃতি-প্রদত্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি বা শক্তি সাহায্যে একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াত করিতে পারে। উদ্ভিদ্ ও জড় পদার্থে এই শক্তির অভাব। সরল ও সংক্ষিপ্ত ভাষায় প্রাণীর মোটামুটি নিম্নোক্ত সংজ্ঞা প্রদান করা যাইতে পারে,—"প্রাণী, জীবনশক্তি, চেতনাশক্তি ও গতিশক্তি-সম্পন্ন দেহী পদার্থ।" *

বিজ্ঞানের যে শাখা প্রাণী-রাজ্যের অধ্যয়নে ব্যাপৃত তাহার নাম প্রাণী-বিজ্ঞান। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে প্রাণী বিজ্ঞানের উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু এই অল্পকাল মধ্যেই পাশ্চাত্য মনীষীগণের এষণার ফলে এত অজ্ঞাতপূর্ব ও সুন্দর সুন্দর তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, বর্ত্তমান সময়ে প্রাণী-বিজ্ঞান একটি উচ্চ অঙ্গের ও উন্নত বিজ্ঞানরূপে পরিগণিত হইয়া পড়িয়াছে। নিখিল প্রাণীবর্গের সম্যক পরিচয় প্রদান করা প্রাণী বিজ্ঞানের প্রধান কাজ। কি উপায়ে উহা সম্ভবপর, তাহার একটা মোটামুটি আভাস দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা।

আমরা সাধারণতঃ বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীকে বিভিন্ন নামে আখ্যাত করিয়া পরিচিত করি।—এবং নামটীই হইতেছে একমাত্র পরিচয়। কিন্তু এইরূপ পরিচয় প্রণালী কখনও সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন ও অনবদ্য হইতে পারে না। কারণ,—(১) বিশাল প্রাণীরাজ্যস্থিত ইতরাবরের প্রাণীর সংখ্যা অগণিত। একমাত্র গিরগিটির অনুরূপ প্রাণীর বিভিন্ন জাতির সংখ্যা সপ্তদশ সহস্র। কাজেই পৃথক্ পৃথক্ জাতিবাচক নাম দ্বারা সমগ্র প্রাণী-বর্গের পরিচয় প্রদানের প্রয়াস পাইলে বৃহত্তম অভিধানেও কুলাইয়া উঠিবে না। প্রকৃত পক্ষে, অধিকাংশ জাতীয় প্রাণীরই কোনও প্রচলিত নাম নাই। যে সকল প্রাণী আমাদের দৃষ্টি অধিকতর আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহাদেরই এক একটা নামকরণ হইয়াছে মাত্র। (২) আমরা সাধারণতঃ যে সকল নাম দ্বারা বিভিন্ন প্রাণীকে চিহ্নিত করিয়া থাকি, তাহার অধিকাংশই প্রাদেশিক; ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল এই যে, অনেক স্থলে একই প্রাণী একই দেশের বিভিন্ন অংশে বিসদৃশ ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত। কিন্তু জীব সৃষ্টিটাকে সম্যক্ জানিতে হইলে প্রাণী পরিচয়ের এমন কোনও প্রণালী অবলম্বন করা দরকার, যাহা সার্ব্বভৌমিক অর্থাৎ সকল দেশেই সমান প্রযোজ্য। (৩) চলিত নামদ্বারা কখনও কোনও প্রাণীর প্রকৃত পরিচয় অর্থাৎ উহার মৌলিক ধর্ম্ম, জীবন প্রণালী, দৈহিক গঠন প্রভৃতির সংবাদ পাওয়া যায় না। এই শ্রেণীর নাম সাধারণতঃ অব্যঞ্জক ও দ্যোতনাহীন। যে ব্যক্তি কখনও ব্যাঘ্র দেখে নাই সে ব্যাঘ্র শব্দটি শুনিলে উক্ত নামে চিহ্নিত প্রাণীর ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতার পরিচয় পাইবে মাত্র; কিন্তু প্রাণীটির অন্যান্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছুই ধারণা করিতে পারিবে না। (৪) প্রাণীনিচয়ের গতানুগতিক নামকরণ প্রণালী বহু স্থলেই অসম্পূর্ণ বা ভ্রান্তিজনক। অনেক স্থলে একই নামে একাধিক জাতীয় প্রাণী নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে; অথবা প্রাণী বিশেষকে এমন কোনও নামে আখ্যাত করা হয় যে,

* "An organised being endowed with life, sensation, and voluntary motion."

উহার প্রকৃত পরিচয় আরও গুপ্ত হইয়া পড়ে। কতিপয় বিশিষ্ট লক্ষণ যুক্ত প্রাণীমাত্রকেই আমরা বানর বলি; কতকগুলা সাধারণ লক্ষণের বর্ত্তমানতা হেতু উহাদের অনৈক্য সমূহ উপেক্ষিত হইয়া, বিভিন্ন ধর্ম্মবিশিষ্ট বহুজাতীয় প্রাণী একই নামে পরিচিত হইতেছে। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে 'বানর' জাতিবাচক নাম হইতে পারে না। বাঘ ও নেকরা বাঘ (Wolf) নাম দুইটির সাদৃশ্য হইতে স্বতঃই মনে হয় যে, উহারা অনুরূপ জন্তু। কিন্তু ওরূপ হওয়া দূরে থাকুক, উহারা এক বংশ (Genus) সম্ভূতও নহে। বিড়াল ও কুকুরে যতটা প্রভেদ, বাঘ ও নেকরা বাঘেও ঠিক সেইরূপ বৈসাদৃশ্য। (৫) প্রাণীবর্গের প্রাকৃত-জনপ্রদত্ত নাম সমূহ সাধারণতঃ কাল্পনিক হওয়ায় পূর্ব্বে অবিদিত কোনও নূতন প্রাণীর পরিচয় প্রদান করা এক প্রকার অসম্ভব। কারণ, কোনও দেশে হঠাৎ একটি পূর্ব্বে অপরিচিত অজ্ঞাত-নামা প্রাণীর আবির্ভাব হইলে,হয় তদ্দেশবাসীগণের একটা সভা আহুত করিয়া প্রাণীপুঙ্গবের কোনও নির্দ্দিষ্ট নাম ঠিক করিতে হইবে, নতুবা যাহার যেরূপ খেয়াল সেইভাবেই প্রাণীটি অভিহিত হইবে। উপকথায় বর্ণিত হবচন্দ্ররাজার দেশে নবাগত শূকরদৃষ্টে উহা হস্তীক্ষয় অথবা মূষিকবৃদ্ধি তদ্বিষয়ে রাজ্যব্যাপী গভীর গবেষণা ও তুমুল আন্দোলনের গল্প বোধ হয় অনেকেই জানেন। বলা বাহুল্য, শূকর একদিকে হস্তী অপরদিকে মূষিক ইহার কোনওটিরই অনুরূপ জন্তু নহে। পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে দেখা যাইবে যে, শুধু একটা নামদ্বারা প্রাণী পরিচয় করার প্রণালীটিতে অপূর্ণতা, প্রাদেশিকতা, অব্যঞ্জকতা, ভ্রমজনকতা ও কাল্পনিকতা প্রভৃতি বহু দোষ বর্ত্তমান।

একটু মনোযোগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকস্থ প্রাণী সমূহের দেহসংস্থানের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, উহাদের মধ্যে কতকগুলার দেহে অস্থি বর্ত্তমান এবং উহা একটি মেরুদণ্ড অবলম্বনে সজ্জিত—; অপর-গুলার দেহ অস্থিহীন। পশু, পক্ষী, মৎস প্রভৃতি প্রথম প্রকারের ও কীট, পতঙ্গ, কৃমি প্রভৃতি দ্বিতীয় প্রকারের জীব। পূর্ব্বোক্ত একটি মাত্র, বিশেষত্বকে ভিত্তি করিয়া সমগ্র প্রাণী মণ্ডলীকে 'পঞ্জরী' ও 'অপঞ্জরী' এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। মেরুদণ্ডী বা পঞ্জরী (Vertebrate) ও অমেরুদণ্ডী বা অপঞ্জরী (Invertebrate) এই দুইটি বিস্তৃত উপরাজ্য (Sub-kingdom) লইয়া বিশাল প্রাণীরাজ্য (Animal kingdom) গঠিত।

মেরুদণ্ডী প্রাণীবর্গের সহিতই আমরা অধিকতর সুপরিচিত। সাধারণ দৃষ্টিতেই দেখা যায় যে, উহাদের মধ্যে কতকগুলাতে হস্তপদাদি বাহ্যাঙ্গের অভাব, কতকগুলা ডানা সাহায্যে উড়িতে পারে, কতকগুলা বুকে ভর করিয়া যাতায়াত করে, কতকগুলার স্তন্যদান করার ক্ষমতা আছে। এই রূপ ধর্ম্মের প্রত্যকটিই কতকগুলা প্রাণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। ঐরূপ ধর্ম্মবিশেষকে অবলম্বন করিয়া মেরুদণ্ডী প্রাণীবর্গকে নিম্নলিখিত চারিটি সম্প্রদায়ে (Class) বিভাগ করা যাইতে পারে।

(১) স্তন্যপায়ী সম্প্রদায় (Mammalia); লক্ষণ—রক্ত উষ্ণ ও লোহিতবর্ণ; শ্বাসগ্রহণ ফুসফুস্ (Lungs) সাহায্যে; জনন-প্রণালী—পূর্ণাঙ্গপ্রাপ্ত সন্তানপ্রসব ও স্তন্যদানে সন্তানের পরিপুষ্টি সাধন। অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন স্থলচর জীবনিচয়ের প্রায় সকলগুলাই এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

(২) পক্ষী বা বিহগ সম্প্রদায় (Birds); লক্ষণ—রক্ত উষ্ণ ও লোহিত; দেহ পালকাবৃত, সপুচ্ছ ও ডানাযুক্ত; শ্বাস গ্রহণ ফুস্ ফুস্ সাহায্যে; চঞ্চু বা মুখের অবস্থান মস্তকের সম্মুখস্থ নিম্ন প্রদেশে; গতি প্রণালী উড্ডয়ন, পদব্রজে গমন বা সন্তরণ; জনন-প্রণালী ডিম্ব-প্রসব ও ডিম্বে তা প্রদানদ্বারা শাবকোৎপাদন। পক্ষী সম্প্রদায়ের আরও একটি গুণবৈশিষ্ট্য বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। ইহারা নিপুণ শিল্পীর মত দক্ষতার সহিত

কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। পক্ষী সম্প্রদায় ব্যতিরেকে মানবেতর অন্য কোনও প্রাণী সূক্ষ্মবুদ্ধি পরিচালনা করিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করার কৌশল জানে না। কোনও কোনও মৎস ও মূষিকাদি জীব তাহাদের বাসস্থানে খড় কুটা জড় করিয়া থাকে বটে, কিন্তু উহাদের আবাস নির্ম্মাণে উদ্ভাবনী শক্তি বা শিল্পচাতুর্য্যের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

(৩) মৎস্য সম্প্রদায় (Fishes); লক্ষণ—রক্ত শীতল ও লোহিত বর্ণ; দেহ গোলাকার ও সূক্ষ্মাগ্র (Elongated) এবং হস্ত পদাদি বহিরঙ্গ ও ফুস্ ফুস্ যন্ত্র রহিত; মস্তক প্রত্যক্ষভাবে দেহের সহিত সংবদ্ধ অর্থাৎ দেহে গ্রীবা নামক অংশের অভাব; চর্ম্ম মসৃণ অথবা চিক্কণ শল্কাবৃত; গতি প্রণালী—পৌচ্ছপ্রান্তের পুরশ্চালন দ্বারা সন্তরণ; শ্বাস গ্রহণ প্রণালী সূক্ষ্ম-কেশবৎ উপাঙ্গ-(Ciliated) যুক্ত, স্তবকাকারে অথবা পত্রের ন্যায় দ্বিপাটিত ভাবে সজ্জিত, কানসাবা বা কানকো (Gills) নামক যন্ত্র সাহায্যে জলে দ্রব বায়ুগ্রহণ; জনন ডিম্বোৎপাদন দ্বারা এবং ক্ষমতা অসাধারণ। মৎস্য সম্প্রদায়ের অধিকাংশ জাতিই নীরব অর্থাৎ শব্দ করার ক্ষমতাহীন। জলে দ্রব বায়ু গ্রহণ করার শক্তি ইহাদের বিশেষত্ব।

(৪) সরীসৃপ সম্প্রদায় (Reptiles); লক্ষণ—রক্ত শীতল ও লোহিত বর্ণ; শ্বাসগ্রহণ ফুস্ ফুস্ সাহায্যে; গতিপ্রণালী সন্তরণ ও উরোগমন; আবাস সচরাচর স্থলে, কতক জাতি জলেও বাস করে; দেহ প্রায়শঃই নগ্ন; চর্ম্ম একপ্রকার ক্লেদময় পদার্থদ্বারা আবৃত; কতিপয় শ্রেণীর চর্ম্মের বাহ্যাচ্ছাদন অস্থিময় খোলা (Shell) অথবা শল্কযুক্ত আবেষ্টন দ্বারা গঠিত; জনন-প্রণালী সাধারণতঃ ডিম্বোৎপাদন; শীত ঋতু অতিবাহন আড়ষ্ট অবস্থায়; জীবন অত্যন্ত সংলাগশীল (Tenacious); জীবন সম্বন্ধে সরীসৃপ সম্প্রদায়ের অত্যাগধর্ম্মিতা এত অধিক যে, দেহের প্রয়োজনীয় অংশ সমূহ ধ্বংস বা বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরেও ইহাদের প্রাণ থাকে। যাঁহারা কূর্ম্মবধ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার সাক্ষ্য দিবেন। দেহ হইতে মস্তক বিচ্যুত হওয়ার পরেও কূর্ম্ম দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে, প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই এমন ২।৪ টা নিজস্ব ধর্ম্ম আছে যাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কোন্ প্রাণী কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত তাহা সহজেই নির্দ্ধারণ করা যায়। এস্থলে কোনও সমালোচক হয়ত বলিতে পারেন যে, মেরুদণ্ডী প্রাণি-বর্গের উপরোক্তরূপ সম্প্রদায় বিভাগে কোনও বৈজ্ঞানিক-কত্ব নাই অর্থাৎ উহাতে এমন কিছু নূতনত্ব নাই যাহা জানিবার জন্য বৈজ্ঞানিকের দ্বারে উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন। হস্তী ও ইলিষ মৎস্যে যেএকটা মৌলিকপ্রভেদ আছে, অথবা কুম্ভীর ও কাকাতুয়া যে অনুরূপ প্রাণী নহে, ততটুকু স্থূলবুদ্ধি নিরক্ষর অসভ্যতম ব্যক্তিতেও বর্ত্তমান। ইহার উত্তরে দুইটি কথা বলা যাইতে পারে। প্রথম, সম্প্রদায়বিভাগ প্রাণীপরিচয়ের প্রথম সোপান মাত্র। দ্বিতীয়তঃ পশু পক্ষী মৎস্য ও সরীসৃপে কি প্রভেদ, তাহার একটা মোটামুটি ধারণা থাকিলেও উহাদের প্রকৃতি নির্দ্দেশক বা লাক্ষণিক ধর্ম্মসমূহ না জানা হেতু অনেক সময় আমরা ভ্রমে পতিত হইয়া থাকি। নিম্নে ইহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।—(১) আমরা চিংড়িকে মৎস বলি। কিন্তু চিংড়ির কানসারা নাই এবং উহার দেহে অস্থির অভাব। মৎস মাত্রেরই কানসারা থাকিবে এবং মৎস কখনও মেরুদণ্ডহীন হইতে পারে না। কাজেই চিংড়ি মৎস হওয়া দূরে থাকুক,মেরুদণ্ডী প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত পর্য্যন্ত নহে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, চিংড়িকে মৎস আখ্যায় অভিহিত করা অর্থাৎ চিংড়ি 'মাছ' কথাটা ব্যবহার করা সম্পূর্ণ ভুল। (২) বাদুর সাধারণতঃ পক্ষী বলিয়াই পরিচিত। কিন্তু যদিও উহা উড়িতে পারে, প্রকৃত পক্ষে পক্ষিসম্প্রদায়ের সহিত বাদুরের কোনও সাদৃশ্য নাই। বাদুরের ডানা নাই এবং দেহ পালকাবৃত নহে। পক্ষী

মাতারই দেহে পালক থাকিবে। ডিম্বোৎপাদন করা বাদুড়ের ধর্ম নহে; উহারা শাবক প্রসব করে এবং স্তন্য প্রদান পূর্ব্বক সন্তানের পরিপোষণ করে। পাখীর ন্যায় কুলায় প্রস্তুত করিতে জানে না। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, বাদুড় পক্ষিসম্প্রদায় ভুক্ত জীব নহে, পক্ষান্তরে স্তন্যপায়ী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। (৩) দেখিবা না থাকিলেও সকলেই তিমি মাছের নাম শুনিয়াছেন এবং অনেক সাধারণ পাঠ্য পুস্তকাদিতেও তিমি মৎস্য' বলিয়া বিবৃত। দৈহিক আকার ও জীবন যাপন প্রণালীতে মৎসের অনুরূপ এবং জলচর জীব হইলেও তিমি মৎস্য নহে। তিমির কানসারা ও ডিম্বোৎপাদন ক্ষমতা নাই, পক্ষান্তরে উহারা ফুস্ ফুস্ সাহায্যে বায়ুগ্রহণ করে এবং পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত সন্তান প্রসব করে। কাজেই তিমিকে মৎস বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। তিমি স্তন্যপায়ী সম্প্রদায়ভুক্ত জলচর প্রাণী।

কোনও নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায়স্থিত প্রাণীবর্গকে নানা শ্রেণীতে (Order) ভাগ করা হইতেছে প্রাণী পরিচয়ের দ্বিতীয় সোপান। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, গৃহ পালিত কুকুর বিড়াল হইতে আরম্ভ করিয়া আরণ্য সিংহ, ব্যাঘ্র পর্য্যন্ত অধিকাংশ স্থলচর প্রাণীই স্তন্যপায়ী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। সূক্ষ্মভাবে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, উহাদের মধ্যে যদিও কতকগুলি সাম্প্রদায়িক লক্ষণ সাধারণ অর্থাৎ সকল প্রাণীতেই বর্ত্তমান, উহাদের কতক জাতীয় প্রাণীর হয়ত এমন কোনও বিশেষ লক্ষণ বা ধর্ম্ম আছে, যাহা সম্প্রদায় স্থিত অন্যান্য প্রাণীতে দৃষ্ট হয় না। এইরূপ ২।১ টি লক্ষণ বা ধর্ম্মকে অবলম্বনে স্তন্যপায়ী প্রাণীবর্গকে পুনরায় কতিপয় শ্রেণীতে (Order) ভাগ করা যাইতে পারে। যথা:—(১) মাংসাশী শ্রেণী (Carnivora), মৌলিক লক্ষণ,—শিকারী ও হিংস্রজীব,—দন্ত-সূক্ষ্মাগ্র, সবল ও ধারাল এবং পাশাপাশি বা ঘনসজ্জিত নহে, পক্ষান্তরে এমন-ভাবে বিন্যস্ত যে মুখ বন্ধ করিলে ঊর্দ্ধহনুস্থিত দন্তরাজি অধোহনুর দন্তপাটির উপরে স্থাপিত না হইয়া উহাদের মধ্যস্থিত ফাঁকে ঢুকিয়া পড়ে; অর্থাৎ উপরের দন্ত-সমূহ নিচের চুয়াল এবং নীচের দন্ত উপরের চুয়াল স্পর্শ করে। বাম হস্তের পাঁচটী অঙ্গুলি ফাঁক করিয়া ঐ ফাঁক মধ্যে দক্ষিণ হস্তের পাঁচটি অঙ্গুলি সমতল (সোজা) ভাবে প্রবেশ করাইয়া দিলে যেরূপ সংবিধান হয়, মুখ বন্ধ করিলে মাংসাশী প্রাণীবর্গের দন্তের অবস্থানও সেইরূপ হইয়া থাকে। খাদ্য:—অন্যান্য জাতীয়প্রাণী, কদাচিৎ উদ্ভিদ্।

(২) কীটভুক শ্রেণী (Insectivora):—মৌলিক লক্ষণ:—ভূমিখনক, অগপদ—অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব; পায়ের অঙ্গুলি মাটি আঁচড়াইবার উপযোগী, বাসস্থান—স্বখোদিত গর্ত্ত, খাদ্য—ভূমির উপর বা নিম্নস্থ উরোগমনশীল কীটসমূহ। ইহারা নিশাচর জীব। কাঁটাচুয়া (Hedgehog) ও ছুঁচা ইন্দুর (Shrew-mouse) প্রভৃতি এই শ্রেণীর প্রাণীর উদাহরণ।

(৩) দ্বিগর্ভ বা দ্বিজরায়ুক শ্রেণী (Marsupials); মৌলিক লক্ষণ:—ইহাদের সংজনন প্রণালী একটু অসাধারণ ও অভিনব প্রকারের। ইহারা অপরিণতা-বস্থায় সন্তান প্রসব করিয়া উদরের নিম্নে চর্ম্মের স্থায় একটা থলিয়ার আবরণে সন্তানকে আবৃত করিয়া রাখে। চুচুকও ঐ থলিয়া বা উপজরায়ুর ভিতরে থাকে এবং ঐ স্থানেই সন্তান পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। অবশ্য ইচ্ছামত উক্ত থলিয়া প্রসারিত বা সঙ্কুচিত করিবার ক্ষমতা ইহাদের আছে। অতএব দেখা যায় যে, এই শ্রেণীর গর্ভধারণ কাল দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অবস্থায় সন্তান প্রকৃত জরায়ুতে অবস্থান করে; দ্বিতীয়াবস্থায় সন্তান আভ্যন্তরীণ জরায়ু হইতে বহির্গত হইয়া বহিঃ জরায়ু বা উপজরায়ুতে পরিপুষ্ট হয়। আভ্যন্তরীণ জরায়ুতে বাসকাল উপজরায়ুতে অবস্থান কালের তুলনায় অতি সংক্ষিপ্ত। প্রকৃত পক্ষে এই শ্রেণীর প্রাণীর দুইবার জন্ম হয়। যখন প্রথম জন্ম হয়, তখন উহাদের দেহ অনেকটা অঙ্গহীন মাংসপিণ্ডের

মত থাকে এবং সন্তানের স্তনা গ্রহণ করার শক্তি থাকে না। কিন্তু উপজঠরে সন্তানকে পুরিবার সময়ই প্রসূতি চুচুকের সহিত সন্তানের মুখ এরূপ ভাবে আবদ্ধ করিয়া দেয় যেন প্রয়োজনানুসারে চুচুকস্থিত পেশিবিশেষের আকুঞ্চন দ্বারা সন্তানের মুখে দুগ্ধ অন্তর্নিক্ষেপ করিতে পারে। পূর্বোক্ত অদ্ভুত সংরক্ষণ প্রণালী এই শ্রেণীর প্রাণীর মৌলিক বিশেষত্ব। অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ও পূর্ব্বভারত দ্বীপপুঞ্জ ইহাদের বাসস্থান। কেঙ্গারু প্রভৃতি প্রাণী উপজঠরী।

(৪) কৃন্তদন্তী শ্রেণী (Rodentia); মৌলিক লক্ষণ, উদ্ভিদ্ ভোজী ও সাধারণতঃ নিশাচর, কর্ত্তনদন্ত (Incissor teeth) কাষ্ঠ প্রভৃতি কঠিন পদার্থ কাটিবার উপযোগী, পশ্চাদ্ পদ সম্মুখের পা অপেক্ষা অধিকতর দীর্ঘ; পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিস্তৃত; অনেক জাতিতে শ্রোণিফলকের (Hip-bone) অভাব। সজারু, খরগোস, পার্ব্বত্যমূষিক (Marmot), কাঠ বিড়াল, নেংটে ইন্দুর প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত। কঠোর পদার্থ দন্তদ্বারা কট্ কট্ করিয়া কাটিবার ক্ষমতা অন্য কোনও শ্রেণীর প্রাণীতে লক্ষিত হয় না।

(৫) অদন্তী শ্রেণী (Edentata), মৌলিক লক্ষণ, দন্ত অকিঞ্চিৎকর ও আংশিক বিকাশ প্রাপ্ত অথবা উহার সম্পূর্ণ অভাব। অন্যান্য লক্ষণ বিভিন্ন শ্রেণী ভুক্ত সাধারণ প্রাণীর মত। বর্ম্মিল (Armadilla) বজ্রকীট (Pangolin) ও বিভিন্ন জাতীয় পিপীলিকাভুক্ প্রাণী অদন্তী। দক্ষিণ আমেরিকা ইহাদের আদি ও প্রাকৃতিক লীলাক্ষেত্র। ভারতবর্ষে এই শ্রেণীর কোনও প্রাণী পাওয়া যায় না।

(৬) স্থূলচর্ম্মীশ্রেণী (Pachidermata):—মৌলিক লক্ষণ—চর্ম্ম স্থূল এবং কখনও কখনও নির্লোম, দেহ—স্থূল; পদ—শক্তিশালী, পদনখ—একাধিক ও খুরের ন্যায় প্রশস্ত; কতিপয় জাতির ঊর্দ্ধচুয়ালে দীর্ঘ দন্ত বিদ্যমান; ২।১ জাতির শুণ্ড আছে। হস্তী, গণ্ডার, তথাকথিত জলহস্তী (Tapir), নদীঘোটক (Hippopotamus), শূকর প্রভৃতি এই শ্রেণীর উদাহরণ।

(৭) রোমন্থী শ্রেণী (Ruminantia):—মৌলিক লক্ষণ—খুর থাকে, মস্তক—২।১ জাতি ব্যতিরেকে সকলেরই শৃঙ্গাবিশিষ্ট, কোন কোন জাতি কৃশতনু, অন্যান্য জাতির দেহ বলবান্ ও সতেজ। খাদ্য—উদ্ভিদ্; এই শ্রেণীর খাদ্যদ্রব্য দুইবার চর্ব্বণ করিবার ক্ষমতা আছে। অসম্পূর্ণভাবে জীর্ণখাদ্য খাদ্য পাকস্থলী হইতে পুনচর্ব্বিত হওয়ার জন্য পুনরায় মুখে ফিরিয়া আসে। এই ধর্ম্মটী রোমন্থীশ্রেণীর পরিচায়ক।

(৮) উভচর স্তন্যপায়ী শ্রেণী (Amphibious mammalia),—মৌলিক লক্ষণ:—জলে ও স্থলে বাস করিবার ক্ষমতা সমভাবে বিদ্যমান, আবাস—মেরুপ্রদেশ; হস্ত পদ অদার্ঘ এবং জলক্রীড়ার উপযোগী। সন্তরণঝিল্লি—বর্ত্তমান, খাদ্য—মৎস সম্প্রদায়, স্বভাব—নিরীহ; গতি—জলে সন্তরণ ও স্থলে উরাগমন।—সিন্ধুঘোটক (Walrus) ও সীল (Seal) এই শ্রেণীর উদাহরণ।—

(৯) তিম্যাদি শ্রেণী (Cetacea); মৌলিক লক্ষণ,—ইহাদের জীবন যাপন প্রণালী প্রায় সর্ব্বতোভাবে মৎস্যের জীবন পদ্ধতির অনুরূপ। আবাস—মেরু প্রদেশের নিকটবর্ত্তী শীতল জলধি; দেহ—সপুচ্ছও হস্তপদাদি বাহ্যাঙ্গহীন। জলচর জীব হওয়া সত্ত্বেও মৎস্যের ন্যায় জলে মিশ্রিত দ্রব বায়ু গ্রহণ করার ক্ষমতা না থাকায় ইহারা উক্ত কার্য্যের জন্য প্রতিনিয়ত জলের উপরে উঠিয়া থাকে। তিমি, ডলফিন্ (Dolphin), ও নবহল (Narwhal) মৎস্যাকৃত স্তন্যপায়ী প্রাণী। তিমি অধুনা প্রাপ্ত প্রাণীসমূহের বৃহত্তম আদর্শ। এক একটি তিমির দেহের ওজন ৩০০,০০০ (তিনলক্ষ) পাউণ্ড এবং একটি মাত্র তিমির দেহ হইতে নিষ্কাষিত তৈলের ওজন ১২০ টন বা ২৬৮৮০০ পাউণ্ড। (৮২ পাউণ্ড = ১ মণ)।

(১০) করপক্ষীশ্রেণী (Cheiroptera) মৌলিক

লক্ষণ নিশাচর; দেহ পালক বিহীন ও হস্তদ্বয়ের সহিত পাতলা চামড়া দ্বারা একত্র সংবদ্ধ; এই আবরণ সাহায্যে ইহারা পক্ষীর মত উড়িতে পারে। পদদ্বয়ের অগ্রভাগে বড়শীর কাটার মত বক্রনখ বিদ্যমান থাকায় ঐ নখে ভর করিয়া ইহারা বৃক্ষাদি অবলম্বনে ঝুলিয়া থাকিতে পারে। বাদুর এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ আদর্শ।

(১১) চতুষ্করী শ্রেণী (Quadrumana):— বানর ও তুল্যজাতীয় প্রাণী সমূহ লইয়া এই শ্রেণী গঠিত। যৌগিক লক্ষণ, দেহ লোমাবৃত; মুখমণ্ডল সাধারণতঃ নির্লোম ও কঠোর রঙ্গিল চর্ম্মাবৃত; ইন্দ্রিয়—ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও রসনেন্দ্রিয় প্রখর ও পূর্ণবিকাশ প্রাপ্ত; ইহাদের ঠিক পা না থাকিলেও হস্তচতুষ্টয় মানবজাতির হস্তের ন্যায় দীর্ঘ অঙ্গুলিযুক্ত এবং কোনও কিছু মুঠ করিয়া ধরার বা আরোহণ করার জন্য ও ঝুলিয়া থাকার উপযোগী। মুখমণ্ডলের আকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া রাগদ্বেষাদি মানসিক আবেগ প্রকাশ করার ক্ষমতা এই শ্রেণীর প্রাণীতে বিদ্যমান। বলা বাহুল্য, শব্দ না করিয়া হৃদয়বৃত্তি বা আভ্যন্তরীণভাব মুখমণ্ডলে অঙ্কিত করিয়া ব্যক্ত করার শক্তি একমাত্র মানব জাতিতেই সীমাবদ্ধ।

এ স্থলে কেহ হয়ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, নিখিল প্রাণীবর্গের এই যে সম্প্রদায় ও শ্রেণী বিভাগের বিষয় বিবৃত হইল, তাহাতে মানব জাতির স্থান কোথায়? দৈহিক গঠন ও সাধারণ লক্ষণ হিসাবে যদি কোনও প্রাণীর সহিত মানব জাতির তুলনা করার অনুজ্ঞা প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে আমরা বানরের সহিত এক শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়ি। অনেকেই বোধ হয় জানেন যে, ক্রমোন্নতি-বাদের (Evolution theory) অন্যতম প্রবক্তা পণ্ডিত প্রবর ডারউইন (Darwin) বানরকে আমাদের পূর্ব্বতন বংশধর বলিয়া প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। * ডারউইনের মতানুসারে বানর যুগ যুগান্তরের বিবর্ত্তনের ফলে ক্রমে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া মানব রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। অবশ্য ডারুইনের সিদ্ধান্ত বা যুক্তির মূলে যতই বৈজ্ঞানিক সত্য পুঞ্জীভূত থাকুক না কেন, প্রাণীরাজ্যের রঙ্গমঞ্চে বিভিন্ন প্রাণীর স্থান নির্দ্দেশের ভার যাহার হস্তে ন্যস্ত, প্রাণিত্বের উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা সেই মানবজাতি যে নিজেকে বিকটনাদী, উলঙ্গদেহ, লাঙ্গুলযুক্ত, অরণ্যবাসী বানরের সঙ্গে একশ্রেণী ভুক্ত বলিয়া মানিয়া লইবার পূর্ব্বে যথাসাধ্য তুমুল আপত্তি উত্থাপন করিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। কাজেই ডারুইনের অভিমত প্রচারের পর নানা দিক হইতে উহার অসঙ্গতি বা অনন্বয় প্রতিপাদনকল্পে প্রাণীশাস্ত্রজ্ঞ-গণের চেষ্টার কোনও ত্রুটি হয় নাই। বিষয়টি বিনোদক হইলেও অপ্রাসঙ্গিক বিধায় সে সকল যুক্তি রাশির আলোচনায় বিরত হওয়া গেল। বর্ত্তমান সময়ে বৈজ্ঞানিকগণের গৃহীত মত যে, মানব জাতির সহিত অন্য কোনও প্রাণীর তুলনাই হইতে পারে না। মানবজাতি বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন (Rational) জীব। মানবেতর প্রাণীতে প্রজ্ঞার অভাব। অতএব মানব জাতিকে অন্য কোনও প্রাণীর সহিত এক শ্রেণীভুক্ত না করিয়া, উহাকে জীবধর্ম্মের পরিপূর্ণতার উচ্চতম শিখরে প্রতিষ্ঠিত, দ্বিকরী শ্রেণী (Bi-manna) নামে চিহ্নিত, একাই এক বিশিষ্ট শ্রেণীর আদর্শ ধরিতে হইবে।

উপরে স্তন্যপায়ী প্রাণীসমূহের শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতি সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রত্যেক শ্রেণীরই এমন ২।১ টা মৌলিক ধর্ম্ম আছে, যাহা অপর শ্রেণীতে দৃষ্ট হয় না; কাজেই কোন্ প্রাণীটা কোন্ শ্রেণীভুক্ত তাহা নির্ণয় করা সুকর। কিন্তু কোনও প্রাণীর শ্রেণীনির্দ্দেশ হইলেই উহার যথেষ্ট পরিচয় হয় না, কারণ বহুজাতীয় প্রাণী লইয়া এক একটী শ্রেণী গঠিত। শ্রেণী নির্দ্দেশদ্বারা প্রাণীবিশেষের কতকগুলা ধর্ম্ম মা

* স্বনামখ্যাত বৈজ্ঞানিক লিনিয়স (Linnaeus) সর্ব্বপ্রথম মানব জাতিকে বানরের সহিত এক শ্রেণীভুক্ত করেন।

লক্ষণ সূচিত হয় মাত্র। শ্রেণীবিভাগের মূল সূত্রটাকে আরও একটু সূক্ষ্ম ও বিস্তৃতভাবে প্রয়োগ করিয়া প্রাণী বিশেষের বিশদতর পরিচয় প্রদান করা সম্ভবপর। কোনও নির্দিষ্ট শ্রেণীভুক্ত প্রাণীবর্গের প্রকৃতি নির্দেশক বা স্বধর্ম্মসূচক লক্ষণসমষ্টি প্রণিধান পূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, একই শ্রেণীস্থিত প্রাণীর মধ্যেও এমন সকল পার্থক্য আছে, যাহা অবলম্বনে উহাদিগকে পুনরায় কতিপয় বংশে বিভক্ত করা সহজসাধ্য। মাংসাশী শ্রেণীসম্বন্ধে এই প্রণালী কি ভাবে প্রযোজ্য নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইল।

কুকুর ও বিড়াল উভয়ই মাংসাশী; অথচ উহাদের দৈহিক বিশেষতঃ মুখমণ্ডলের গঠনে একটা সুস্পষ্ট বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান। এইরূপ ২।১ টি অবধারিত বৈষম্য অবলম্বনে মাংসাশী প্রাণীনিচয়কে নিম্নবর্ণিত কএকটি বংশে (Genus) ভাগ করা যায়।

(১) পদতলচারী বংশ (Plantigrades)। ইহারা পায়ের তলায় ভর করিয়া চলে। বিশেষ লক্ষণঃ—দেহ মাংসল ও স্থূল; খাদ্য অন্য প্রাণীর মাংস, কদাচিৎ উদ্ভিদ্; চর্ব্বণদন্ত (Molar teeth) অশাণিত; চর্ম্ম সাধারণতঃ লোমাবৃত; চলন প্রণালী অভব্য। ইহারা শীত কালটা হিমশয়নে (Hibernation) অতিবাহিত করে। শ্বেত ভল্লুক, রিজ্জু (Badger), ও সাধারণ ঋক্ষ (Common Bear) পদতলচারী জন্তু।

(২) উদ্বিড়াল বংশ (Mustelae); বিশেষ লক্ষণ—খাদ্য সাধারণতঃ মাংস, অত্যন্ত ক্ষুধিতাবস্থায় কদাচিৎ উদ্ভিদ্; দেহ দীর্ঘ, ক্ষীণ ও মসৃণ; গতি সহজ ও অনায়াস; পদচতুষ্টয় অদীর্ঘ। ইহারা সাহসী ও নিশাচর জীব এবং আক্রান্ত প্রাণীর প্রতি অত্যন্ত নির্দ্দয় ব্যবহার করে। মার্টেন (Marten), নকুল (Weasel), ও উদ্বিড়াল (otter) গোষ্ঠী এই বংশের সন্তান।

(৩) গন্ধগোকুলাদিবংশ (Civet animals,) বিশেষ লক্ষণ—তনু ক্ষীণ; নখর আচ্ছাদিত; গুহ্যদ্বারের পার্শ্বে অতি বদ্‌গন্ধময় রস পূর্ণ ২টি মাংসপিণ্ড বিদ্যমান। বাঘডাসা বা খট্টাস ও বেজি (Ichneumon) এই বংশের অন্তর্গত।

(৪) শৌনাদিবংশ Canidae—Dog-like animals of prey. বিশেষ লক্ষণ—চলন অঙ্গুলিতে ভরপূর্ব্বক; অঙ্গুলি সম্মুখ পদে পাঁচটি ও পশ্চাৎপদে চারিটি করিয়া; নখর অনাচ্ছাদিত; পেষণদন্ত উর্দ্ধ চুয়ালে ছয়টি ও নিম্নচুয়ালে সাতটি; নাসিকা প্রলম্বিত; জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহ পূর্ণ অভিব্যক্ত। শৃগাল, কুকুর, নেকরা বাঘ (Wolf) এই বংশভুক্ত।

(৫) মার্জ্জার বংশ (Felidae)। বিশেষ লক্ষণ, মস্তিষ্ক গোলাকার, মুখমণ্ডল প্রশস্ত; কর্ণ সরু ও সঞ্চলনশীল; অক্ষিতারা গভীরতম অন্ধকারেও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন; চুয়াল অতি দৃঢ় ও ক্ষমতাশীল; পেষণদন্ত প্রবল; কৃন্তন দন্ত (Incissor teeth) তীক্ষ্ণ ও ধারাল; জিহ্বা অস্থি হইতে মাংস চাটিয়া বাহির করিবার উপযোগী ধারাল; গুম্ফ দীর্ঘ; কণ্ঠপ্রদেশ খর্ব্ব ও পেশীসম্পন্ন; অঙ্গুলি সম্মুখ ও পশ্চাদ্‌পদে চারিটি করিয়া; নখর টানিয়া আনার উপযুক্ত বক্র; চর্ম্ম কোমল ও মসৃণ; শ্রবণেন্দ্রিয় প্রখর; চরিত্র রক্তপিপাসু, হিংসাপরায়ণ, দুষ্টবুদ্ধি ও সঙ্গবিমুখ; অপহার সময় সাধারণতঃ নিশাকাল; লুণ্ঠন প্রণালী লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক হঠাৎ আক্রমণ। সিংহ, ব্যাঘ্র চিতাবাঘ, বনবিড়াল ও গৃহপালিত মার্জ্জার এই পরিবারের প্রতিনিধি।

(৬) তরক্ষু বংশ (Hyenas)। বিশেষ লক্ষণ—দন্ত অসাধারণ রকম শক্তিশালী; মস্তক লম্বিত নাসা যুক্ত; দৃষ্টি দ্রোহশীল; রসনা সকণ্টক; কর্ণ দীর্ঘ সরল ও সূক্ষ্মাগ্র; পৃষ্ঠদেশ বক্র ও শূকরলোমবৎ কেশাবৃত কেশর বিশিষ্ট; সম্মুখ ও পশ্চাদ্‌পদ চতুরঙ্গুলিযুক্ত; গমন মন্থর; উচ্চতা ২ হইতে ২½ ফিট; দৈর্ঘ ৪½ ফিট; বাস দলবদ্ধভাবে; শীকারান্বেষণ সময় রাত্রিকাল; আবাস এসিয়া ও আফ্রিকা। ইহাদের গুহ্যদ্বারের নিম্নে তীব্রগন্ধিচর্ব্বিলিপ্ত শ্যানদ্রব্য (Jelly). নিঃসরণকারী মাংসপিণ্ড বিদ্যমান। ইহারা কবর হইতে শব উত্তোলন পূর্ব্বক শব মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। তরক্ষু এই বংশের আদর্শ।*

* অনেক বৈজ্ঞানিক মাংসাশী প্রাণী সমূহকে উহাদের পায়ের গঠন অনুসারে নিম্ন প্রকারের তিনটি উপশ্রেণীতে ভাগ করিয়া থাকেন। (১) লিপ্তপাদশ্রেণী (Pinnigrade) : ইহাদের পায়ের অঙ্গুলি সমূহ, হাঁসের পায়ের অঙ্গুলির ন্যায়, ঝিল্লিদ্বারা সংযুক্ত। সিল, ওয়ালরাস প্রভৃতিকে একটি পৃথক শ্রেণীভুক্ত না করিয়া এই উপশ্রেণীতে ফেলা হয়। (২) পদতলচারীশ্রেণী (Plantigrade) : ইহারা পায়ের তলায় ভর করিয়া হাটে; যথা ভল্লুক। (৩) পদাঙ্গুল্যপরিচলনশীল শ্রেণী (Digitigrade) : ইহারা পায়ের অঙ্গুলিতে ভর করিয়া চলে। বিড়াল, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি এই উপশ্রেণীভুক্ত। পরে এক একটি উপশ্রেণীকে বিভিন্ন বংশে ভাগ করা হয়।

কোনও প্রাণীর বংশনির্দেশ হইলে উহাকে একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর আনিয়া ফেলা গেল। ২।১ টি সাধারণ ধর্ম্ম বা লক্ষণ অবলম্বনে একাধিক জাতীয় (Species) প্রাণীকে যতদূর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতরে আনা যায়, বংশনির্দ্দেশ হইতেছে তাহার শেষ সীমা। প্রকৃত পক্ষে একটি প্রাণীর বংশ নির্ণয় হইলে উহার পরিচয় সম্বন্ধে মোটামুটি সকল সংবাদই পাওয়া গেল। কারণ, প্রাণীটিতে সাম্প্রদায়িক লক্ষণ, শ্রেণীগত মৌলিক লক্ষণ ও বংশগত বিশেষ লক্ষণ—ইহার সকল গুলাই বর্ত্তমান থাকিবে। কাজেই প্রাণীবিশেষের বংশ স্থির হইলে, উহার জাতীয় নাম যাহাই কেন হউক না, নামের পূর্ব্বে বংশের নাম সন্নিবিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। এরূপ করার সুবিধা এই যে, প্রাণীটির নাম শুনিবা মাত্র উহার প্রায় সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য প্রাণীবর্গের কোন্ বংশ কোন্ শ্রেণীভুক্ত এবং কোন্ শ্রেণী কোন্ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, তাহা জানা থাকা দরকার। একাধিক জাতীয় প্রাণী লইয়া এক একটি বংশ গঠিত। এমত স্থলে কোনও প্রাণীর চূড়ান্ত পরিচয় দিতে হইলে প্রথমে উহার বংশ নির্ণয় করিয়া পরে জাতিগত লক্ষণ, যাহা অপরবিধ প্রাণীর সহিত উহার পার্থক্য প্রতিপাদন করিতেছে, তাহা বর্ণনা করিতে হইবে। মার্জ্জার বংশীয় উদাহরণ দ্বারা প্রতিপাদ্য বিষয়টি বুঝাইবা সুগম করার চেষ্টা করা গেল। সিংহ, ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ, বনবিড়াল, মার্জ্জার, আমেরিকার পেনথার (Panther) ও জগার (Jaguar) জাতীয় ব্যাঘ্র প্রভৃতি বহুজাতি মার্জ্জার বংশের অন্তর্ভুক্ত। ইহার কোনও টির পরিচয় প্রদান করিতে হইলে, উহার নাম যাহাই কেন হউক না, নামের পূর্ব্বে বংশের নামটি জোর দিয়া দেওয়া হয়। ব্যাঘ্রের বৈজ্ঞানিক নাম Felix Tigris। এস্থলে Felix শব্দটির সংযোগহেতু নাম শুনিয়াই বুঝা যায় যে, ব্যাঘ মার্জ্জার বংশের জীব। মার্জ্জার বংশ স্তন্যপায়ী সম্প্রদায়ভুক্ত মাংসাশী শ্রেণীর অন্তর্গত। কাজেই ব্যাঘ্রে (১) স্তন্যপায়ী সম্প্রদায়ের সকল ধর্ম্ম, (২) মাংসাশী শ্রেণীর লক্ষণ সমূহ, এবং (৩) মার্জ্জার বংশের বিশেষত্বগুলা সবই বর্ত্তমান থাকিবে। অবশ্য ব্যাঘ্রের চূড়ান্ত পরিচয় করিতে হইলে উহার জাতীয় লক্ষণ কি কি তাহার অন্বেষণ করিতে হইবে। ব্যাঘ্র যে সিংহ বা বিড়াল নহে তাহার নিশ্চয়ই কোনও প্রমাণ আছে অর্থাৎ ব্যাঘ্রে এমন ২।১ টি ধর্ম্ম বা লক্ষণ আছে, যাহা মার্জ্জার বংশীয় অন্যান্য জাতিতে—অতএব ব্যাঘ্রেতর কোনও প্রাণীতেই দৃষ্ট হয় না। যে লক্ষণ বা ধর্ম্ম কোনও জাতির নিজস্ব তাহা দ্বারাই প্রাণীবর্গের জাতি (Species) নির্ণয় হয়। মার্জ্জার বংশীয় অন্যান্য প্রাণীর চূড়ান্ত পরিচয় করিতে হইলেও ব্যাঘ্রের বেলা যে প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে, ঠিক তাহাই অনুসরণ করিতে হইবে।

প্রাণীবর্গের সম্প্রদায়, শ্রেণী ও বংশ পরিচয় প্রণালীটা সার্ব্বভৌমিক অর্থাৎ সকল দেশেই সমান প্রযোজ্য। জাতীয় নামাকরণের বেলা ঠিক সে কথা খাটে না। কারণ, জাতীয় নাম রাখার বেলা কোনও সাধারণ রীতিবদ্ধ প্রণালীতে অগ্রসর হওয়া যায় না। কাজেই কোনও প্রাণীর জাতীয় বা ডাক নাম বিভিন্ন দেশে স্বতন্ত্র হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তাহাতে কিছু যায় আসে না। কারণ, কোনও প্রাণীর জাতীয় পরিচয় সংগ্রহ করিতে হইলে, উহার প্রাদেশিক বা ডাকনাম যাহাই কেন হউক না, প্রথমতঃ একটা নির্দ্দিষ্ট প্রথার অবলম্বনে বংশ পর্য্যন্ত নির্দ্ধারণ করিয়া, পরে জাতিটির স্বাতন্ত্র্যনির্দ্দেশক ধর্ম্মগুলা স্থির করিতে হইবে।—অবশ্য বৈজ্ঞানিকগণ প্রত্যেক জাতীয় প্রাণীর নিজ স্বধর্ম্ম সমূহ নির্দ্ধারণ করিয়া, উহাদের প্রত্যেকটির এক একটি নির্দ্দিষ্ট বিজ্ঞানানুমোদিত নাম রাখিয়াছেন। ঐ নামগুলা সাধারণতঃ লেটিনভাষা হইতে নির্ব্বাচিত, কাজেই সর্ব্বত্র গৃহীত হওয়ার পক্ষে অনুকূল নহে।

পূর্ব্বে প্রাণীপরিচয়ের যে ধারা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে, প্রণালীটির মূল সূত্র হইতেছে, প্রাণী নিচয়ের ধর্ম্ম ও লক্ষণ সমূহ ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ভাবে অনুসন্ধান করিয়া উহাদিগকে সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর গণ্ডীর ভিতর আনিয়া ফেলা। প্রকৃত পক্ষে কার্য্যটি বিশেষ কৃচ্ছসাধ্য নহে। কারণ, হয় ত একটি মাত্র লক্ষণদৃষ্টে প্রাণীটি কোন সম্প্রদায়ভুক্ত তাহা নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। প্রাণীটিতে সম্প্রদায়ের অন্যান্য সকল লক্ষণই বিরাজ করিবে। এস্থলে প্রাণীটির একটি মাত্র লক্ষণদৃষ্টে উহার সম্বন্ধে বহু সংবাদ পাওয়া যায়। শ্রেণী ও বংশ পরিচয়ের বেলাও এই কথাটা খাটে। মোট কথা, বৈজ্ঞানিক পন্থায় প্রাণীপরিচয় প্রণালীটা এমন কিছু দুর্ব্বোধ বা জটিল নহে যে, সাধারণ চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষে অনুসরণ করা অসম্ভব।

পঞ্জরী প্রাণীবর্গ যেরূপ চারিটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত, অপঞ্জরী প্রাণী নিচয়ও ঠিক সেই রূপ কতিপয় সম্প্রদায়ে

বিভক্ত। এবং স্তন্যপায়ী প্রাণী সমূহকে যে ভাবে নানা শ্রেণীতে এবং প্রত্যেক শ্রেণীকে নানা বংশে ভাগ করা হয়, অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত প্রাণীরাজিকেও ঠিক সেই ভাবে নানা শ্রেণীতে এবং উহাদের প্রত্যেক শ্রেণীকে বিভিন্ন বংশে ভাগ করা যায়। উপসংহারে মার্জ্জার বংশীয় প্রাণীর চূড়ান্ত পরিচয় যে ভাবে সাধিত হয়, অপরাপর প্রত্যেক বংশের প্রাণী পরিচয়ও ঠিক সেই রূপে হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে, বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিলে সহজেই নিখিল প্রাণীবর্গের সম্যক্ পরিচয় প্রদান করা যাইতে পারে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রাণীবর্গকে যে ভাবে ভাগ করা হইয়াছে, তাহাই যে সর্ব্ববাদীসম্মত এমত নহে। প্রাণীবিভাগ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন বৈজ্ঞানিকের বিভিন্ন মত। কেহ হয় ত অপঞ্জরী প্রাণীবর্গকে একটি উপরাজ্যভুক্ত না ধরিয়া উহাদিগকে ভাগ করিয়া কতিপয় উপরাজ্য গঠন করার পক্ষপাতী। প্রকৃত পক্ষে, পঞ্জরী প্রাণীর তুলনায় অপঞ্জরী প্রাণীর সংখ্যা এত অধিক, এবং উহাদের মধ্যে এমন সব পার্থক্য বিদ্যমান যে, সকলগুলাকে একই উপরাজ্যভুক্ত ধরিলে বৈজ্ঞানিক হিসাবে উহাদের প্রতি অবিচার করা হয়। অনেকে শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, বৈজ্ঞানিকগণ এ পর্য্যন্ত যত জাতীয় কৃমির সহিত পরিচিত হইয়াছেন, তাহার সংখ্যা এক লক্ষের বহু উচ্চে। একদল বৈজ্ঞানিক মাংসাশী প্রাণী সমূহকে একনিশ্বাসে কয়েকটা বংশে ভাগ না করিয়া প্রথমে উহা-দিগকে কতিপয় উপশ্রেণীতে (Sub-order) এবং প্রত্যেক উপশ্রেণীকে বিভিন্ন পরিবারে (Family) এবং সর্ব্বশেষে এক একটি পরিবারকে নানা বংশে (Genus) ভাগ করিয়া থাকেন। মাংসাশী প্রাণীবর্গের বংশ পরিচয় বর্ণনা কালে পাদটীকায় এরূপ উপশ্রেণী বিভাগের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গিয়াছে। কিন্তু যতই কেন ভাগাভাগি হউক না, প্রাণী পরিচয় প্রণালীর মূল সূত্র একই এবং তাহাই প্রদর্শন করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আলোচ্য প্রবন্ধে প্রাণীসমূহের বাহ্য লক্ষণ অর্থাৎ অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ না করিয়া যে সকল লক্ষণ বাহ্যতঃ এবং সহজেই চক্ষে পড়ে, তাহার বিষয়ই ধরা হইয়াছে। প্রাণী-বিজ্ঞানটা এতই সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন ও উন্নত হইয়াছে য, কোনও [illegible]কে না দেখিয়া উহার ২।৪ খানা অস্থিমাত্র [illegible] প্রাণীটির দৈহিক আকার, জীবন যাপন [illegible] অর্থাৎ উহার সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য যাহা কিছু আছে তাহার সকল সংবাদই বলিয়া দেওয়া যায়। বৈজ্ঞানিকগণ এইভাবে ভূগর্ভ নিয়ে বিভিন্ন স্থলে প্রাপ্ত জীবকঙ্কালাদি পরীক্ষা করিয়া অধুনালুপ্ত বহু জাতীয় অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য প্রাণীর বিষয় অবগত হইয়াছেন। মানবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এক কালে পৃথিবীটা ঐ সকল প্রাণীর লীলাভূমি ছিল। সে কত যুগান্তরের কথা! কি উপায়ে সে সকল প্রাণীর সম্পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ করা সম্ভবপর হইয়াছে, ভবিষ্যতে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করার আশা রহিল। *

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সরকার।

গ্রন্থ সমালোচনা

বীরবলের হাল খাতা। 'সবুজপত্র' সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় এখন আর কাহারও নিকট অপরিচিত নহেন। সকল মানুষেরই যেমন নানাদিক্ থাকে, তাঁহারও চরিত্রে তেমনই নানা ধর্ম্মের সমাবেশ রহিয়াছে। তিনি যখন ব্যঙ্গ-রসিক রূপে দেখা দেন, তখন নিজেকে 'বীরবল' নামে পরিচিত করেন। সুতরাং 'বীরবলের হালখাতা' জিনিষটা কি, তাহার নাম শুনিলেই বুঝা যায়। এই খাতায় বীরবল সাহিত্য, সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে বিবিধ প্রবন্ধে বীরবলী ঢংয়ে তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার সকল মতের অনুরাগী হওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, প্রমথ বাবুও বোধ হয় তাহা আশা করেন নাই। কিন্তু বীরবল যে প্রথমেই একটা খোঁচা দিয়া কথা আরম্ভ করেন, তাহাতে সকলেই উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে বাধ্য হন। পাঠকগণের উপর বীরবলের এই বিষয়ে একটা অসাধারণ প্রভাব রহিয়াছে। যে

---

* বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে ভাবে প্রাণীবর্গকে ভাগ করা হইয়াছে তাহা নিম্নোল্লিখিত গ্রন্থসমূহ হইতে গৃহীত :—

(1) "Natural History Primer" by Gilbert Wheeler

(2) "Classification of the Animal kingdom by Nicholson

(3) "Mammalia; Their various orders and Habits" by Luis Figuier

কোনও প্রবন্ধের প্রথম ছত্রটী তুলিয়া এই কথা সমর্থিত করা যাইতে পারে। লেখকের পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে।

আমাদের সাহিত্য চর্চ্চার একটা মস্ত দোষ এই যে, ইহাতে চর্চ্চা নাই। অর্থাৎ একজন একটা মত প্রকাশ করিলে, সেটা সেখানেই শেষ হইয়া যায়; অন্যে আর তাহা নিয়া দু চার কথা বলিবার জন্য মোটেই চেষ্টা করে না। সকলেই যার যার বক্তব্য বলিয়া যাইতেছেন; কেহ কেহ বা অন্যেরটা শোনেন এবং নিজের টা বলেন; কিন্তু কদাচিৎ কেহ অন্যের টা শুনিয়া সেই সম্বন্ধেই একটু ভাবিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু 'বীরবল' এই বিষয়ে দিগ্বিজয়ী; তিনি যাহা বলেন, তাহা না শুনিয়া উপায় নাই। তারপর, অবশ্যই সে মত গ্রহণ করা না করা পাঠকের খাস এখতিয়ার। বীরবলের ভাষা অপূর্ব্ব, প্রকাশ ভঙ্গী অনন্য-সাধারণ এবং সাহস দুর্জ্জয়। বীরবলের এক খাতা [illegible]য়াছে। আশাকরি, দ্বিতীয়টী আরম্ভ হইয়াছে।

৺ গোবিন্দ চন্দ্র দাস।

কালের দুর্লঙ্ঘ্য নিয়মে গত ১৪ই আশ্বিন প্রত্যুষে কবিবর গোবিন্দ চন্দ্র দাস ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। জীবনে কবির কখনও সুখ হয় নাই; আজ তাঁহার সকল দুঃখের অবসান হইল। কিন্তু বঙ্গ সাহিত্যের কুঞ্জে আর একটী বীণা নীরব হইল. দেশের এই ক্ষতি পূরণের যোগ্য নহে।

মহাপ্রস্থানে কবি গোবিন্দ দাস।

আজি বঙ্গের শারদ কুঞ্জে
 এ কোন্ অনল উঠিল জ্বলি'
কোরকে কমল রহিল শুকা'যে,
 শেফালি কাননে এল না অলি।
চকোর কণ্ঠ রহিল নীরব
 কেতকীর বনে ওঠেনা তান,
অশ্রু গড়ায়ে ঝরিল শিশির
 শিহরি উঠিল জগৎ-প্রাণ।

প্রকৃতি-রাণীর আদুরে দুলাল,
 বঙ্গমায়ের 'বাঙ্গাল' কবি,
লুকাল সহসা মরণ আড়ালে
 নিখিল চকিতে জীবন রবি।
শিশুর মধুর সহজ ভাষায়
 কে গাহিবে আর মোহন গান,
শৌর্য্য গরিমা তুলিবে জাগায়ে
 মরমে হানিয়া শ্লেষের বাণ!

স্বদেশ যাঁহার 'অস্থিমজ্জা,'
 স্বদেশ যাঁহার প্রাণের 'প্রাণ,'
কে গাহিবে সেথা অতীত কাহিনী
 বাঁচাযে রাখিতে দেশের মান।
মরম বীণায় ঝঙ্কারি কে বা
 তুলিবে গভীর করুণ তান,
কে বুঝাবে আর ব্যাকুল বেদনা
 আকুল আবেগে গাহিয়া গান!

প্রকৃতির এই লীলা-নিকেতনে
 পূজারির বেশে দাঁড়ালে আসি,
হেরিলে গগনে কি প্রভা মাধুরী
 ভূতলে কত না রূপের রাশি!
নারীর নয়নে রূপের কুহেলি,
 'পদ্মা'র বুকে অপার মায়া,
পূত পাদপীঠ 'বিক্রমপুরে',
 হেরিলে দেশের মোহিনী কায়া।

কবির নিয়তি—দারিদ্র্যদহন,
 জীবনে, হে কবি, সয়েছ বেশ,
আজি অভিনব যাত্রার পথে
 সব বেদনার হয়েছে শেষ।
কি দিয়ে আজিকে পূজিব তোমার
 গরিমাদীপ্ত চরণতল—
কাহিনী তোমারি, পূজার মন্ত্র,
 উপাদান, শুধু আঁখির জল।

শ্রীসুকুমার দাস গুপ্ত।

৮ম বর্ষ অগ্রহায়ণ ১৩২৫ ৮ম সংখ্যা

বৌদ্ধ-সহজিয়া সাহিত্য। *

কিছুদিন পূর্ব্বে অনেক শিক্ষিত লোকেরও ধারণা ছিল যে, বাঙ্গালা ভাষার বয়স বড় অধিক নহে। কৃত্তিবাসী রামায়ণই সেকালে অতি প্রাচীন বঙ্গীয় সাহিত্য বলিয়া গৃহীত হইত। মহর্ষি বাল্মীকি যেমন লৌকিক কাব্য-সাহিত্যের পিতা বলিয়া পূজিত হইয়া থাকেন, যবন কবি হোমার যেমন গ্রীকভাষার আদিকবি বলিয়া বিখ্যাত, ইংরেজেরা চসারকে যেমন তাঁহাদের ভাষার প্রথম কবি বলিয়া পরিচিত করেন, তদ্রূপ শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যে অনেকেই ফুলিয়ার কৃত্তিবাস ঠাকুরকে বাঙ্গালার আদি কবি বলিতেন ; বোধ হয়, এখনও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। কৃত্তিবাস ঠাকুরের জন্মকাল ঠিক কত, তাহা আমরা জানি না ; তবে প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা চণ্ডীদাস ঠাকুর কৃত্তিবাস অপেক্ষা এবং মৈথিল-পণ্ডিতকবি বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস অপেক্ষাও প্রাচীন বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ বিশ্বাস করেন। পরবর্ত্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি সমসাময়িক বলিয়া প্রবাদ আছে এবং উভয় কবির সাক্ষাৎকার লইয়া পদাবলীও রচিত হইয়াছে। কিন্তু বিদ্যাপতির ব্যাখ্যাকার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ গুপ্ত মহাশয় নানা প্রমাণপ্রয়োগে ঐ প্রবাদ অমূলক বলিয়াছেন। † যাহা হউক, সম্প্রতি সাহিত্যিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিকগণের অনুসন্ধানের ফলে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, কৃত্তিবাস-পণ্ডিত বঙ্গভাষার আদিকবি নহেন।

বঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব-সাগরের মন্দর স্বরূপ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বহু আয়াসে যে সকল উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার ফলে আমরা এখন জানিতে পারিয়াছি যে, আমাদের মাতৃভাষা প্রাচীনতায় জগতের অনেক বিখ্যাত ভাষা অপেক্ষা ন্যূন নহেন। এ সম্বন্ধে বঙ্গদেশবাসী ও বঙ্গভাষাভাষী কখনও শাস্ত্রি-মহাশয়ের ঋণ পরিশোধে সমর্থ হইবেন না। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে আজ আমরা যে সকল

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

† বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে ৺সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের ব্যয়ে প্রকাশিত গ্রন্থের ভূমিকা।

উপাদান সংগৃহীত দেখিতেছি. "বিশ্বকোষ" নামক বিশাল ও বিখ্যাত বঙ্গ জ্ঞান ভাণ্ডারে আমরা বঙ্গভাষার যে সকল রত্নের সন্ধান পাইয়াছি,—সে সকলের অধিকাংশের জন্য আমাদিগকে চিরকাল শাস্ত্রীমহোদয়ের নিকট অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ থাকিতে হইবে।

শাস্ত্রি-মহাশয় ইতঃপূর্ব্বে রামাই পণ্ডিতের "শূন্যপুরাণ" বাহির করিয়াছেন। তাহাতে বঙ্গদেশের মধ্যযুগের সামাজিক এবং ধার্ম্মিক অবস্থার সহিত তাৎকালিক দেশপ্রচলিত ভাষার অবস্থাও প্রকটিত হইয়াছে। ধর্ম্ম সংক্রান্ত গুহ্যকথার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন প্রয়োজন না থাকিলেও ভাষার এবং সাহিত্যের সহিত দেশের প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাস এবং আচার এমন অচ্ছেদ্যরূপে সম্বদ্ধ, যে তাহাকে ত্যাগ করিয়া ভাষার কথা বলা আদৌ চলে না। শাস্ত্রিমহাশয়ের আবিষ্কৃত এই "শূন্যপুরাণ" প্রায় সহস্র বর্ষের বচনা। এত পুরাতন [illegible] হইলেও, তাহার নমুনা আমরা যাহা পাইয়াছি, তাহাতে উহাকে আমাদের নিত্যব্যবহৃত বাঙ্গালা ভাষার পুস্তক বলিয়া গ্রহণ করিতে কাহারও দ্বিধা জন্মে না। উহার ভাষা অন্যান্য প্রাচীন কবিতার ভাষা হইতে বিশেষ জটিল অথবা দুর্বোধ নহে। "বিশ্বকোষ" হইতে একটু নমুনা দিতেছি,—

> "নহি রেক নহি রূপ নাহি ছিল বন্ন চিন।
> রবি সসী নাহি ছিল নাহি রাতি দিন॥
> নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাস।
> মেরুমন্দার ন ছিল ন ছিল কৈলাস॥
> দেউল দেহারা নহি পুজিবার দেহ।
> মহাপুন্নমাঝ পবভু আর অচ্ছি কেউ॥
> ঋষি যে তপস্বী নহি নহিক বাম্ভন।
> পব্বত পাহাড় নহি নাহিক থাবর জঙ্গম॥" ইত্যাদি।
>
> বিশ্বকোষ, অষ্টাদশ ভাগ, ৩৩পৃষ্ঠা।

পাঠক দেখিতেছেন, ইহাতে সংস্কৃত শব্দগুলির প্রাকৃতরূপ ভিন্ন প্রাচীনত্বের আর কোন জটিলতা নাই। [রেক=রেখা, বন্ন=বর্ণ, চিন্=চিহ্ন, সসী=শশী, থল=স্থল, দেহারা=দেহলী, দেহু=দেউ=দেব (অন্তঃস্থ "ব"), পুন্ন=পূর্ণ পবভু প্রভু, অচ্ছি=অস্তি=আছে, বাম্ভন=ব্রাহ্মণ, পব্বত=পর্ব্বত, থাবর=স্থাবর।] অতি সহজেই যে এরূপ কবিতা বুঝিতে পারা যায়, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। তবে এই কবিতার মর্ম্মার্থ যে খুব গভীর, তাহাও নিশ্চয়। যাঁহারা ঋগ্বেদের বিখ্যাত "নাসদীয় সূক্ত" পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিবেন যে, রামাই পণ্ডিত সেই অতি গম্ভীর সৃষ্টিতত্ত্ব মাতৃভাষার সরল পদাবলীতে ব্যক্ত করিয়াছেন।

যাহা হউক সম্প্রতি শাস্ত্রিমহাশয় আরও কতকগুলি অতি মূল্যবান্ উপাদান বঙ্গ সাহিত্য ভাণ্ডারে উপস্থিত করিয়াছেন। লালগোলার বদান্য পুণ্যাত্মা রাজা বাহাদুরের ব্যয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাবলীর অন্তর্নিবিষ্টরূপে সুপণ্ডিত শাস্ত্রিমহোদয় একখানি অতিবৃহৎ পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ পুস্তকে "চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়ঃ" "সরোজবজ্রের দোহাকোষ" "কাহ্নপাদের দোহাকোষ" এবং "ডাকার্ণব" নামে চারিখানি প্রাচীন পুথি প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুরাগী এবং অনুসন্ধিৎসু পাঠকের নিকট এই পুস্তকখানি অমূল্য। পুস্তকের প্রথমে শাস্ত্রিমহাশয় একটি ভূমিকা লিখিয়া উহাদের পরিচয় দিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সাধারণের অজ্ঞাত অনেক ভাষাতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুথি চারিখানির মধ্যে প্রথম তিন খানির ভাষাকে শাস্ত্রিমহাশয় বাঙ্গালাভাষাই বলিয়াছেন কিন্তু শেষোক্ত "ডাকার্ণব" নামক পুথির সংস্কৃতাংশের মাঝে মাঝে যে সকল গান অথবা পদ আছে, তাহা কোন্ ভাষার, তাহা তিনি ঠিক করিতে পারেন নাই। ঐ পুথি তিনি য়ুরোপে পাঠাইবেন বলিয়াছেন।

শাস্ত্রীমহাশয় নেপাল দেশ হইতে বহু অধ্যবসায়ের ফলে এই পুথিগুলি আনিয়াছিলেন এবং অনেক দিন অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিবার পর তবে প্রকাশ করিয়া-

ছেন। তাঁহার লিখিত ভূমিকা হইতে জানিতে পারা যায় যে, তিনি ১৮৯৭—৯৮ খৃষ্টাব্দে দুইবার এবং ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে শেষবার নেপাল রাজ্যে গিয়াছিলেন, ১৯০৭ খৃষ্টাব্দেই তিনি চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়ঃ" এবং দুইখানি "দোহা-কোষ' পাইয়াছিলেন, কিন্তু প্রকাশ করিলেন ১৩২৩ সালে (১৯১৬ খৃষ্টাব্দে), আমরা আশা করিয়াছিলাম যে তিনি চলিত বাঙ্গালায় ঐ গ্রন্থগুলির ব্যাখ্যা লিখিবেন, কিন্তু আমাদের সে আশা পূর্ণ হয় নাই, তিনি কোন ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন নাই। তবে তিনি গ্রন্থশেষে একটী শব্দকোষে গন্থে ব্যবহৃত শব্দগুলির প্রচলিত অর্থ দিয়াছেন। কিন্তু সেই শব্দকোষ তিনি নিজে সংকলন করেন নাই, সুতরাং উহাতে যে সকল অর্থ লিখিত হইয়াছে, উহার সকলগুলিই তাঁহার অনুমোদিত কি না জানি না। আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় ঐ শব্দকোষে অনেক ত্রুটি আছে বলিয়া বোধ হয়।

এই পুস্তক প্রকাশিত হইলেও এখনও সুপ্রচারিত হয় নাই। যাঁহারা এই নূতন প্রচারিত পুস্তক পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের সহিত বর্ত্তমান লেখকের এ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল, তাঁহাদের মতে এই পুস্তকের ভাষা আদৌ বাঙ্গালা নহে, শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার "খেয়ালের" বশে এই দুর্বোধ "সাপের মন্ত্র'কে বাঙ্গালা বলিয়া চালাইয়াছেন। তাঁহাদের এই প্রকার সমালোচনায় আমাদের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হয় এবং আমরা মনোযোগের সহিত উহার কিয়দংশ পাঠ করি। এখন বুঝিতেছি যে, শাস্ত্রীর খেয়াল নহে, "চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়ে"র পদাবলী এবং দোহাকোষের দোহাগুলি প্রকৃত বাঙ্গালাই বটে, কিন্তু বড় দুর্বোধ বাঙ্গালা। কেন দুর্বোধ তাহা নিবেদন করিতেছি।

এই যে 'নেপালানীত" সাহিত্য, ইহা এক বিচিত্র সাহিত্য। ইহার ভাষা যে কেবল প্রাচীন বলিয়া স্বভাবতঃ জটিল, তাহা নহে,—উপরন্তু রচকেরা ইচ্ছানুসারে ইহাকে সাধারণের দুর্বোধ করিয়াই রচিয়াছেন। যে অদ্ভুত ভাষায় ইহা রচিত, টীকাকারেরা তাহাকে "সন্ধ্যাভাষা" নাম দিয়াছেন। সন্ধ্যাকালে যেমন না আলো না অন্ধকার, ছায়া ছায়া ভাব হয়,—কোন জিনিস দেখা যায়, কোন জিনিস দেখা যায় না, "সন্ধ্যাভাষায়" রচনাও তেমনি,—ছায়া ছায়া ভাবে লেখা,—লেখকগণের মনের ভাব যে, সকলে যেন সহজে তাহা না বুঝে। তাহার কারণ এই যে এই সকল রচনা সাধারণের জন্য নহে, সম্প্রদায়বিশেষের ধর্ম্মসাধনের নিমিত্ত সেই ধর্ম্মসম্প্রদায়ের গুরুস্থানীয় ব্যক্তিগণের দ্বারা ওগুলি লিখিত হইয়াছে। সেই ধর্ম্ম, সেই সাধনা সর্ব্বসাধারণের অবলম্বনীয় অথবা পালনীয় নহে,—তাহা অতি গোপনীয়, তাই এত সাবধানতা। যাঁহারা তান্ত্রিকধর্ম্মের গুহ্যাতিগুহ্য সাধনার সহিত সামান্যভাবেও পরিচিত হইয়াছেন, তাঁহারা অক্লেশে এই সকল রচনার উদ্দেশ্য এবং মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিবেন। শাস্ত্রীমহাশয়ের আনীত পুঁথিকাগুলি "সহজিয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের" সাধন ভজনের কথায় পূর্ণ এবং তাঁহাদের সম্প্রদায়ের গোপনীয় ভাষায়—সন্ধ্যাভাষায় রচিত।

এই সাহিত্য বুঝিতে চেষ্টা করিতে গেলে "সহজিয়া" ধর্ম্মের একটু পরিচয় লওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু এই খানেই বিষম বাধা। গোপনীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের রহস্যকথা সেই সকল সম্প্রদায়ের ভিতর অতি যত্নে থাকত,—বাহিরের লোকের তাহাতে আদৌ অধিকার নাই। আধুনিক সভ্যসমাজে প্রচলিত "ফ্রি মেসন" (Free Mason Societies) সম্প্রদায়ের ন্যায় আমাদের দেশের প্রাচীন বৌদ্ধ মহাযান, মন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজযান, হিন্দু তান্ত্রিক, বৈষ্ণব সহজিয়া, বাউল, কর্ত্তাভজা ও কিশোরী ভজন প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ক্রিয়া কলাপ সাধনাদি বাহিরের লোকের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তন্ত্রশাস্ত্র আজ্ঞা করিয়াছেন যে, সাধনাদির রহস্য "গোপয়েৎ মাতৃজারবৎ"" এবং বৈষ্ণব রাগমার্গ সাধনও সাধারণ্যে প্রকাশ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

যথা :—

"বড়ই নিগূঢ় কথা রাগের ভজন।
ইহা প্রচারিলে হয় নরকে গমন॥"

এই হেতু, সহজিয়াদিগের সাধনভজনের কথা বাহিরের লোকের বুদ্ধির অগম্য। বৈষ্ণব সাধক বলিয়া প্রসিদ্ধ কবিবর চণ্ডীদাসও হেঁয়ালির ভাষায় এই সাধনের কথা তাঁহার কয়েকটি পদে লিখিয়াছেন,—চণ্ডীদাসের অতিভক্ত পাঠকের পক্ষেও সেই সকল পদের মর্ম্ম বুঝিতে পারা অসাধ্য। শাস্ত্রিমহাশয়ের আবিষ্কৃত পুস্তকের ভাষা তাই ইচ্ছাকৃত দুর্ব্বোধ।

নেপালের এই পুঁথিগুলি হইতে "সহজিয়া" মার্গের কিন্তু অতিপ্রাচীনতা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। এতদিন অনেকেরই বিশ্বাস ছিল যে, "সহজিয়া মার্গ" বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বিশেষেরই নিজস্ব, এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভদ্র গোস্বামী হইতেই সহজিয়া মার্গ অথবা পন্থের সৃষ্টি এবং নেড়ানেড়ীগণ বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরই অপচার বিশেষ। কিন্তু এই নবাবিষ্কৃত পুঁথিগুলি হইতে দেখা যাইতেছে যে, এই পন্থের সৃষ্টি বহু পুরাতন, এমন কি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দও হইতে পারে। বঙ্গীয় সহজিয়া ভক্তেরা বলেন যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মুকুটমণি স্বরূপ জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, রূপগোস্বামী, বিল্বমঙ্গল, সনাতন, রায় রামানন্দ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ—এমনকি স্বয়ং মহাপ্রভুও এই সহজ-পন্থের পথিক ছিলেন এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ, সনাতন গোস্বামী, নরোত্তম দাস, এবং শ্রীজীবগোস্বামী প্রভৃতি পণ্ডিত বৈষ্ণব "সহজ মতের" অনেকগুলি নিগূঢ় সাধন ভজনের উপদেশ পরিপূরিত পুস্তক লিখিয়াছেন। সভ্যভব্য বৈষ্ণবেরা অবশ্য এই সকল কথা মিথ্যা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতে চাহেন যে, এরূপ সর্ব্বজনসম্মানিত বিদ্যাজ্ঞানোজ্জ্বলমনা মহানুভব বৈষ্ণব কি অশ্লীল ও ঘৃণিত "সহজিয়া" সম্প্রদায়ের শাস্ত্রকার হইতে পারেন? কদাপি নহে।

আমরা কিন্তু এই নবপ্রাপ্ত প্রাচীন পুঁথিগুলিতে দেখিতে পাইতেছি যে, প্রায় পঞ্চদশ শত বৎসর অথবা তৎপূর্ব্বেও অনেক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সহজ পন্থের পন্থী ছিলেন এবং সেই পন্থের শাস্ত্র ও টীকা সংস্কৃত ভাষায় প্রণয়ন করিয়াছিলেন। "চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়" গ্রন্থের প্রত্যেক পদই পণ্ডিত ও সিদ্ধ আচার্য্যের রচিত এবং সংস্কৃত ভাষার টীকাগুলিও বিশেষ পাণ্ডিত্যপরিপূরিত। আর "সহজ" মত যে ঘৃণিত এবং অশ্লীল, তাহাই বা কে বলিল? আজ নব্য সভ্যতার আলোকে আমরা যাহাকে অশ্লীল ও ঘৃণ্য বলিতেছি, সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাহাই পরম পবিত্র এবং পূজ্য ছিল। শিবশক্তির যুগ্ম প্রতীক গৌরীপট্ট সমন্বিত শিবলিঙ্গের পূজা ভারতে বহু সহস্র বৎসর হইতে প্রচলিত রহিয়াছে,—নব্য সভ্যতার সমুপযুক্ত মনের নিকট তাহা অশ্লীল হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানী অথবা ভক্ত উপাসকের নিকট তাহা নিতান্ত আদরণীয়। যাঁহারা বিবাহ এবং গর্ভাধানে অবশ্য উচ্চার্য্য বৈদিকমন্ত্র গুলির মর্ম্ম বুঝিয়াছেন, তাঁহারা কি উহাদিগকে অশ্লীল বলিতে পারেন? পরমপূজ্য বাজসনেয়ি ব্রাহ্মণ উপনিষদের অগ্নিবিদ্যা প্রকরণে পুরুষ এবং স্ত্রীর অগ্নিরূপে যে বর্ণনা আছে, সে বর্ণনা কি কেহ অশ্লীল বলিতে পারেন? * অশ্বমেধ যজ্ঞে যে সব আচরণ করিতে হয় এবং যে সকল মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, সে গুলি কি কখনও অশ্লীল বলিয়া নিন্দিত অথবা পরিত্যক্ত হইয়াছে? কেবল আমরা বুঝিতে পারি না বলিয়াই,

* পুরুষোবাব গৌতমাগ্নিস্তস্য ব্যাত্তমেব সমিৎপ্রাণো ধূমো বাগর্চিশ্চক্ষুরঙ্গারাঃ শ্রোত্রং বিস্ফুলিঙ্গাস্তস্মিন্নেত স্মিন্নগ্নৌ দেবা অন্নং জুহ্বতি তস্যা আহুত্যৈ রেতঃ সম্ভবতি। ১২। যোষা বা অগ্নির্গৌতম তস্যা উপস্থ এব সমিল্লোমানি ধূমো যোনিরর্চির্যদন্তঃকরোতি তেঽঙ্গারা অভিনন্দা বিস্ফুলিঙ্গাস্তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা রেতো জুহ্বতি তস্যা আহুত্যৈ পুরুষঃ সম্ভবতি স জীবতি যাবজ্জীবত্যথ যদা ম্রিয়তে॥১৩॥

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্। ষষ্ঠের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ।

কোনও বিষয়ের নিন্দা করা উচিত নহে। "সহজ পন্থা" সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না ;—যাঁহারা সে পন্থার পথিক, তাঁহাদিগকে নিন্দা করিবার আমাদের অধিকার নাই। আমরা তাঁহাদের সাধন ভজনার কোনই কথা জানি না, ও বুঝি না ; সুতরাং সে সম্বন্ধে ভালমন্দ কোন মত প্রকাশ করিতে আমরা অক্ষম। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, যাঁহারা সে রসের রসিক এবং সে পথের পথিক, তাঁহারা সকলেই সেই "সহজ" ধর্ম্মের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। আর গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের জন্মের বহুপূর্ব্ব হইতেই এই মত যে গৌড়বঙ্গে প্রচলিত ছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

বেদান্তের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে বেদান্তাদি শাস্ত্রে যেরূপ কথিত হইয়াছে, ব্রহ্মের বিষয় বলিতে গিয়া সর্ব্বশাস্ত্রকে যেরূপ নির্ব্বাক্ হইতে হইয়াছে, জ্ঞানমার্গের মহাপুরুষগণ যেরূপ কোন ভাষাতেই ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারেন নাই, আমরা দেখিতেছি যে, "সহজযানের" রহস্যবিদ্ মহাপুরুষেরাও তাঁহাদের অবলম্বিত এই "সহজ" সম্বন্ধেও প্রায় ঠিক সেই রূপই বলিয়াছেন। আমরা এখানে কয়েকটি বাক্য উদ্ধার করিতেছি ;—

মহাপুরুষ সরোজবজ্র বলিতেছেন,—

ঝাণরহিঅ কি কীঅই ঝাণে ?
জো অবাচ তঁহি কাই বক্খাণে ? (ক)

পৃষ্ঠা ৯১, শাস্ত্রীর পুস্তক।

[ঝাণ—জ্ঞান, রহিঅ—রহিত, কি—কি, কীঅই—ক্রিয়তে—করিতেছে, ঝাণে—জ্ঞানে, জো—যে, অবাচ—অবাচ্য, তঁহি—তাঁহাকে, কাই—কে ই, বক্খাণে—ব্যাখ্যানে ব্যাখ্যা করিবে ?]

যিনি জ্ঞানের অগোচর, জ্ঞানে তাঁহার কি করিবে ? যিনি অবাচ্য,—বাক্যের অতীত, তাঁহাকে কে বাক্যদ্বারা প্রকাশ করিতে পারে ?

"মন্ত ণ তন্ত ণ ধেঅ ণ ধারণ।
সব্ব বি রে বট বিব্ভমকরণ (খ)"

৯২ পৃষ্ঠা, শাস্ত্রীর পুস্তক।

[মন্ত=মন্ত্র, ণ=নহে; তন্ত=তন্ত্র, ণ=নহে, ধেঅ=ধ্যেয়, ণ=নহে, ধারণ=ধারণা, সব্ব—সর্ব্ব, বি=অপি, রে বট=ওহে বটো (বটু শব্দের সম্বোধনে), বিব্ভম করণ=বিভ্রম কারণ।]

তাঁহার সম্বন্ধে মন্ত্র তন্ত্র কিছুই নয়, তিনি ধ্যেয় নহেন, ধ্যান ধারণায় তাঁহাকে পাওয়া যায় না। হে শিষ্য, বা হে অবোধ, এ সকলই বিভ্রমের কারণ।

"জঁহি মনপবন ন সঞ্চরই
রবি সসি নহি পবেশ।
তহি বট চিত্ত বিসাম করু
সরহে কহিঅ উবেশ। (গ)

৯৩ পৃষ্ঠা, শাস্ত্রীর পুস্তক।

[জহি=যথায়, মনপবনমনরূপবায়ু, ন সঞ্চরই=ন সঞ্চরতি=সঞ্চার করে না, রবি সসি=রবিশশী, নহি,=নহে, পবেশ=প্রবেশ, তহি=তথায়, বট=হে বটু, চিত্ত=চিত্ত=মনের সাম্যাবস্থা, বিসাম=বিশ্রাম, করু=করুক, সরহে=সরোরুহ অথবা সরোজ বজ্রপাদ গুরু, কহিঅ=কহে=কহিতেছে, উবেশ=উপদেশ।]

যথায় মনও সঞ্চার করিতে পারে না, যেস্থানে সূর্য্যচন্দ্রেরও প্রবেশ নাই, হে শিষ্য, তোমার চিত্ত তথায় বিশ্রাম করুক,—শ্রীসরোজবজ্রপাদ এই উপদেশ দিতেছেন।

"জহি মণ মরই পবণ হো কৃথঅ জাই।
এহু সে পরমমহাসুহ কহিম্পি ণ জাই॥ (ঘ)"

৯৩ পৃষ্ঠা, শাস্ত্রীর পুস্তক—

[জহি=যথায়, মণ=মন, মরই=মরে, হো=হ (হইতো অথবা হি নিশ্চয়ার্থে) কৃথঅ=ক্ষয়, জাই=যায়, এহু=অত্র অথবা হেথায়, সে=সেই, পরমমহাসুহ=পরমমহাসুখ,

কহিম্পি = কথমপি অথবা কুত্রাপি কখনও বা কোথাও, ণ = না, জাই = যায়।]

যেখানে মন মরিয়া যায়, (অর্থাৎ সংকল্প-বিকল্পাত্মক নিজ স্বাভাবিক অবস্থা পরিত্যাগ করে), ইন্দ্রিয়জ্ঞান ক্ষয় পায় অর্থাৎ লুপ্ত হইয়া যায়, এই অবস্থাতেই সেই পরমমহাসুখ,—সে সুখ কোথায়ও যায় না।

"জবেঁ মণ অত্থমণ জাই তণু তুট্টই বন্ধণ।
তবেঁ সমরস সহজে বজ্জিই ণউ সুদ্দ ণ বম্ভণ ॥ (৬)"

৯৯ পৃষ্ঠা, শাস্ত্রীর পুস্তক।

[জবেঁ = যবে = যখন, মণ = মন, অত্থমণ = অস্তমিত, জাই = যায়, তণু = দেহ, তুট্টই = ত্রুট্যতি, টুট যায় = ছিড়ে যায়, বন্ধণ = বন্ধন, তবেঁ = তবে, তখন, সমরস — একরস, সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা, সহজে — সহজ তত্ত্বে, বজ্জিই — বিশ্রতে — থাকে, ণউ — নহে, সুদ্দ — শূদ্র, ণ — নহে, বম্ভণ — ব্রাহ্মণ।]

যখন মন অস্তমিত হইয়া যায়, দেহের বন্ধন খসিয়া যায়, তখনই একরস সহজ তত্ত্বে অবস্থিতি করে, শূদ্র অথবা ব্রাহ্মণের ভেদজ্ঞান থাকে না।

"এত্থু সে সুরসরি জমুনা এত্থু সে গঙ্গাসাঅরু।
এত্থু পআগ বণারসি এত্থু সে চন্দ দিবাঅরু।

(৮) ৯৯ পৃষ্ঠা, শাস্ত্রীর পুস্তক।

[এত্থু = এথায়, সে = সেই, সুরসরি = সুরসরিৎ, জমুনা = যমুনা, এত্থু = এথায়, সে = সেই, গঙ্গাসাঅরু = গঙ্গাসাগর, পআগ = প্রয়াগ, বণারসি = বারাণসী, চন্দ — চাঁদ, দিবাঅরু = দিবাকর]।

এখানে, এই সহজতত্ত্বেই সকল পুণ্যতীর্থ ও সকল দেবতা লাভ হয়, এখানেই গঙ্গা, যমুনা, গঙ্গাসাগর, প্রয়াগ ও কাশী, এখানেই চন্দ্র সূর্য্য।

সিদ্ধাচার্য্য কৃষ্ণাচার্য্য বলিতেছেন,—

"লোঅহ গব্ব সমুব্বহই হউ পরমত্থে পবিন।
কোটিহ মাহ এক জত হোই নিরংজনলীন ॥১॥"

পৃষ্ঠা ১২৩, শাস্ত্রীর পুস্তক।

[লোঅহ = লোকঃ, গব্ব = গর্ব্ব, সমুব্বহই = সমুদ্বহতি = বহন করে, হউ = হই, পরমত্থে = পরমার্থে = পরমতত্ত্বে, পবিন = প্রবীণ, কোটিহ = কোটির, মাহ = মধ্যে, এক = একজন, জত = যদি, হোই = ভবতি = হয়, নিরংজনলীন = নিরঞ্জনে লীন = পরমতত্ত্বের জ্ঞাতা]

লোকে গর্ব্ব করিয়া বেড়ায়, 'আমি পরমার্থ বুঝিয়াছি', কিন্তু কোটির মধ্যে যদি বা একজন প্রকৃত তত্ত্বের সন্ধান রাখে।

"আগমবেঅপুরাণে পংডিত্ত মান বহংতি।
পক্ক সিরিফল অলিঅ জিম বাহেরিত ভূময়ন্তি ॥২॥"

পৃষ্ঠা ১২৩, শাস্ত্রীর পুস্তক।

[আগমবেঅপুরাণে = আগম বেদপুরাণে, পংডিত্ত = পণ্ডিতাঃ = পণ্ডিতগণ ; মান = গর্ব্ব, বহংন্তি = বহন করে, পক্ক = পাকা, সিরিফল = শ্রীফল = বেল, অলিঅ = অলয়ঃ = ভ্রমরসকল, জিম = যেন, বাহেরিত = বাহিরে, ভূময়ন্তি = ভ্রমন্ত = ভ্রমণ করে।]

পণ্ডিতগণ আগমবেদ পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র অভ্যাস করিয়া মনে মনে গর্ব্ব করেন। কিন্তু তাঁহারা প্রকৃত রসের সন্ধান পান না। যেমন বেল পাকিলে ভ্রমর বা মধুমক্ষিকা গন্ধে আকুল হইয়া তাহার চারিদিকে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু বেলের কঠিন খোসা ভাঙ্গিয়া ফলের স্বাদ লইতে পারে না, পণ্ডিতেরাও তদ্রূপ শাস্ত্রপাঠে তত্ত্বের একটু আভাস পান বটে, কিন্তু প্রকৃত অর্থ বা রস বুঝিতে পারেন না, বাহিরেই থাকেন।

এইরূপ ভাবে যে সকল আচার্য্য "সহজতত্ত্ব" বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারা এই মহাতত্ত্বকে যে অতিশয় পবিত্র ভাবে অনুভব করিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই "সহজ" তত্ত্বকে তাঁহারা যে ব্রহ্মতত্ত্বের সমান বোধ

করিতেন, তাহা শাস্ত্রবাক্যের সহিত তাঁহাদের বাক্যের তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। আমরা যথাস্মৃতি দুই একটি তুলনা করিতেছি,—যথা—

সরোজবজ্র,—

"জো অবাচ তঁহি কাই বকৃথ ণে ?"

(ক) পূর্ব্বোদ্ধৃত।

শাস্ত্রবাক্য,—

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" তৈত্তিরীয় উপনিষৎ, ব্রহ্মানন্দবল্লী, ৪র্থ অনুবাক্। "নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।" কঠোপনিষৎ।

সরোজবজ্র,—

"মন্ত ণ তন্ত ণ ধেঅ ণ ধারণ।" (খ) পূর্ব্বোদ্ধৃত।

শাস্ত্রবাক্য,—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।"

(মুণ্ডকোপনিষৎ ৩।২।৪, কঠোপনিষৎ ২।২৩)

সরোজবজ্র,

"জহি মন পবন ন সঞ্চরই
রবিসসি নহি পবেশ।
তহি বট চিত্ত বিসাম করু
সরহে কহিঅ উবেশ॥" (গ)

পূর্ব্বোদ্ধৃত।

শাস্ত্রবাক্য,—

"ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতো-
হয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥"

(মুণ্ডকোপনিষৎ ২।২।১০, কঠোপনিষৎ ৫।১৫।)

সরোজবজ্র,—

"জহি মণ মরই পবণ হো কৃথঅ জাই।
এহু সে পরম মহাসুহ কহিম্পি ণ জাই॥(ঘ)
জবেঁ মণ অত্থমণ জাই তণু তুট্টই বন্ধণ।
তবেঁ সমরস সহজে বজ্জিই ণউ সুদ্দ ণ বম্ভণ॥ (ঙ) পূর্ব্বোদ্ধৃত।

শাস্ত্রবাক্য,—

"তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি॥ ৭॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্‌দৃষ্টে পরাবরে॥ ৮॥ (মুণ্ডকোপনিষৎ ২।২।)

"নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা॥ ১২॥
যদাসর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিশ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্রব্রহ্ম সমশ্নুতে॥১৪॥
যদাসর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথমর্ত্ত্যোঽমৃতোভবত্যেতাবদনুশাসনম্॥১৫।"

(কঠোপনিষৎ ষষ্ঠবল্লী।)

"এহু সে পরম মহাসুহ"—ইনিই সে পরম মহাসুখ,—এই বাক্যও বৈদিক মহাবাক্যের অবিকৃত প্রতিধ্বনি। তথায় আমরা দেখিতে পাই—

রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধা ঽনন্দী ভবতি।

(তৈত্তিরীয় উপনিষৎ, ২।৭)

আনন্দংব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন। (ঐ ২।৯)

আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। (ঐ ৩।৬)

বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম। (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, ৩।৯।২৮)

প্রেমাপ্তস্য পরম আনন্দ। (ঐ ৪।৩।৩২)

যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পেসুখমস্তি। (ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৭।২৩।)

তস্য প্রিয়মেব শিরঃ। মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ। প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ।

আনন্দ আত্মা। (তৈত্তিরীয় উপনিষৎ। ২।৫।)

তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপ মমৃতং যদ্বিভাতি। (মুণ্ডকোপনিষদ্ ২।২।৭)

এইরূপ আরও অনেক মহাবাক্য বৈদিক সাহিত্য হইতে সংগৃহীত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ফল কি? আমরা এখানে "সহজিয়া পন্থী"র আশ্রয়ভূত "সহজ" তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছি না, এবং সে শক্তিও আমাদের নাই। তবে যাঁহারা "সহজিয়া" এই কথা শুনিয়াই ঘৃণায় নাসা কুঞ্চিত করেন, এবং বৈষ্ণবদিগের মধ্যে যাঁহারা "সহজিয়া"-গণকে ঘৃণা অথবা কৃপার চক্ষুতে দর্শন করিয়া থাকেন, এবং যে সকল গ্রন্থ মহাপ্রভু অথবা প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যদিগকে সহজিয়া পথের পথিক বলিয়া পরিচিত করিয়াছে, ঐ সকল গ্রন্থের লেখকগণকে মিথ্যাবাদী, অথবা যে সকল পুস্তক ঐ সকল বৈষ্ণব মহাপুরুষগণের লিখিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, ঐ সকল পুস্তককে যাঁহারা "জাল" বলিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের বিবেচনার জন্যই আমরা এ সম্বন্ধে যৎসামান্য আলোচনা করিলাম। বৈষ্ণব সহজিয়ারা বলেন,

"আপনিই লিখিয়াছে আপন ভজন॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
তাহার চরিত্র গোসাঞি করিয়াছে বর্ণন॥
সেই অনুসারে বিদ্যাপতির করণ।
চণ্ডীদাস সেই ধর্ম কর্য়াছে যাজন॥
জয়দেব গোসাঞির তত্ত্ব সেই মত হয়।
গোবিন্দের ভজন কৈল ছয় মহাশয়॥
মহাপ্রভুর মনের করণ না যায় বর্ণনে।
নিত্যানন্দ প্রভুর চরিত্র দেখহ নয়ানে॥
বীরভদ্র গোসাঞির কি কহিব গুণে।
বেরাগীকে শিখাইল আপন করণে॥
.. . .
অনন্ত হরি প্রভু সহজতত্ত্ব ধর্ম।
বেরাগীকে শিখাইল প্রকৃতির মর্ম।
(আনন্দ ভৈরব, বিশ্বকোষ-ধৃত)॥

আরও, "প্রভুর অন্তর কথা কেহো নাহি জানে।
স্বরূপ রঘুনাথের হয় প্রাণ ধনে॥
আর কারো গোচর নাহি এই কথা।
এই দুইজনে বার্ত্তা জানয়ে সর্ব্বথা॥
চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায় মহাশয়।
জয়দেব কর্ণামৃত এসব জানয়॥
অপ্রাকৃত বস্তু তেঁহ এই সব জানে।"
(বিশ্বকোষ, একবিংশ ভাগ, ৩৫১ পৃষ্ঠা)।

আরও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটকগীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে,
গায় শুনে পরম আনন্দ॥"
"বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করায় প্রভুর আনন্দ॥"
ঐ, ঐ, ৩৫৫ পৃষ্ঠা।

সুতরাং বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যে "সহজ তত্ত্বের" রসিক ছিলেন, একথা অমূলক বলিবার কোনও কারণ নাই। চণ্ডীদাস ঠাকুর নিজেই আপনাকে "সহজের" সেবক বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। "চৈত্যরূপ প্রাপ্তি" নামে একখানি গদ্যপুস্তিকা চণ্ডীদাস ঠাকুরের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। উহাতেও তাঁহার সেই রামতারা অথবা রামী রজকিনীর উল্লেখ আছে *। আর তাঁহার

* বিশ্বকোষ, অষ্টাদশ ভাগ, ১৮৯ পৃষ্ঠা।

পদাবলীর মধ্যে "সহজ" রসের কথা ত অনেকই আছে। সুতরাং চণ্ডীদাসকে সহজিয়া পন্থের পন্থী বলিতে কাহারও আপত্তি নাই। আর শ্রীমহাপ্রভু যে চণ্ডীদাসের পদাবলী পড়িতে ও শুনিতে অতিশয় আনন্দ অনুভব করিতেন, তাহা কবিরাজ গোস্বামীর চরিতামৃতে সুস্পষ্ট লেখা রহিয়াছে। সুতরাং সহজিয়ারা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ঘৃণার পাত্র হওয়া উচিত নহে।

চণ্ডীদাস ঠাকুর যে চতুর্দশ শতাব্দীতে হিন্দুর হিন্দুয়ানীর সেই কড়াকড়ির দিনে প্রকাশ্য ভাবে গ্রামের দেবীর মন্দিরে রামী রজকীর সঙ্গে প্রেম করিতেন, এ কেমন কথা? ব্রাহ্মণের সহিত রজকীর প্রেম সমাজ কেমন করিয়া সহ্য করিলেন? সমাজ সহ্য করেন নাই, কিন্তু দেবীর আজ্ঞায় অথবা প্রভাবে সমাজকে সবই সহিতে হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। কিন্তু যিনি ব্রাহ্মণের জাতিধর্ম্মের বিলোপ করিয়া,স্মৃতিশাস্ত্রের মস্তকে পদাঘাত করিয়া চণ্ডীদাসের সহিত রামীর সংসর্গকে সমাজের মাথায় তুলিয়া দিলেন, তিনি কেমন দেবী? শূদ্রার সহিত ব্রাহ্মণের সংসর্গকে স্মৃতি এবং পুরাণ একবাক্যে মহাপাপ বলিয়া ঘোষিত করিয়াছেন; অথচ ব্রাহ্মণ যুবক চণ্ডীদাস গাহিলেন,

"তুমি বেদবাদিনী, হরের ঘরণী
তুমি সে নয়নের তারা।
তোমার ভজনে ত্রিসন্ধ্যাযাজনে
তুমি সে গলার হারা॥"

পুনশ্চ, "শুন রজকিনি রামি,
ও দুটি চরণ শীতল জানিয়া শরণ লইনু আমি"॥

একি ব্যাপার? ব্রাহ্মণপুত্র রজকীর চরণ শরণ করিলেন, তাঁহাকে বেদবাদিনী (সরস্বতী) ও হরের ঘরণী (পার্ব্বতী) বলিয়া গ্রহণ করিলেন, এবং রজকীর ভজনেই তাঁহার ত্রিসন্ধ্যার উপাসনা হইল! এ সকল আবার সেই বাশুলী দেবীর আজ্ঞায় হইল! এ দেবী কে? যাঁহারা চণ্ডীদাসের পদাবলী পড়িয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন, চণ্ডীদাস রজকিনীর আশ্রয়ে তান্ত্রিক সাধনা কিছু করেন নাই। হিন্দু দেবীগণের মধ্যে বাশুলীর নামগন্ধও পাওয়া যায় না। তন্ত্রেও বাশুলীর কোন উল্লেখ আছে বলিয়া সন্ধান পাওয়া যায় নাই। অগত্যা আমাদের দেশের অনেক পণ্ডিত "বাশুলীকে" আদ্যাশক্তি কালিকার "বিশালাক্ষী" মূর্ত্তি মনে করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। সত্য কি তাই?

আমাদের মনে হয়, সত্য তাহা নহে। "বিশালাক্ষীর" সহিত বাশুলীর সম্বন্ধ নাই,—তিনি বৌদ্ধ তন্ত্রের দেবী। এ সম্বন্ধে বিশ্বকোষ অভিধানের "সহজিয়া" প্রবন্ধ লেখকের মত আমরা যুক্তিযুক্ত মনে করি। তিনি বলিতেছেন, "কোন প্রামাণিক হিন্দুশাস্ত্রে বাশুলী দেবীর নামোল্লেখ নাই। গৌড়বঙ্গের যে যে স্থানে এক সময়ে বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণের প্রভাব ছিল, সেই সেই স্থানেই প্রায় এক একটী বাশুলী বিদ্যমান। নেপালের বজ্রাচার্য্যেরা বজ্রসত্বের শক্তি বজ্রধাত্বীশ্বরীর যেরূপ গুহ্যমূর্ত্তি চিত্রিত করেন, তাঁহার সহিত নান্নুরের বাশুলী মূর্ত্তির অনেকটা সাদৃশ্য আছে"।* এই কথা বলিয়া তিনি অনুমান করিতেছেন যে, বজ্রধাত্বীশ্বরী প্রথমে বজ্রেশ্বরী এবং তাহাই সাধারণের মুখে অপভ্রংশে "বাজশলী" বা "বাশুলী"তে পরিণত হওয়া বিচিত্র নহে।

বাশুলী ঠাকুরাণীকে বৌদ্ধ তান্ত্রিক-দেবতা মনে করিবার কারণ আছে। নেপালে শাস্ত্রিমহাশয় অতি প্রাচীন সময়ের "চণ্ডরোষণ মহাতন্ত্র" নামে বজ্রযান-সম্প্রদায়ের একখানি গ্রন্থ ও তাহার এক সংস্কৃত টীকা দেখিয়া আসিয়াছেন এবং টীকার কিয়দংশ "বিশ্বকোষ" অভিধানের একবিংশ ভাগের ৩৪৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। ঐ টীকাংশ হইতে "সহজ-মার্গ"সম্বন্ধে অনেক গুহ্যকথার পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের মনে হয় যে, এই বজ্রযান সম্প্রদায় হইতে বৌদ্ধ এবং হিন্দু উভয় সম্প্রদায়েই "সহজতত্ত্ব" গৃহীত হইয়াছিল। উভয় মধ্যে বৌদ্ধ

* বিশ্বকোষ, একবিংশভাগ, ৩৪৮ পৃষ্ঠা।

সম্প্রদায়ই হয় ত আদিম, তবে ঠিক বলা যায় না। যেহেতু এখনও বৈদিক সকল সাহিত্য এবং তন্ত্রের প্রাচীন সমুদয় গ্রন্থ সাধারণে প্রচারিত হয় নাই। বেদের মধ্যেও যে এই "সহজতত্ত্বে"র বীজ নাই, তাহা আমরা বলিতে সমর্থ নহি; বরং ঔপনিষদিক সাহিত্যের স্থানে স্থানে উহার আভাস দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়াই বোধ হয়।

বাশুলী বৌদ্ধতান্ত্রিকগণের গুহ্য সাধনের দেবী বলিয়াই তিনি ব্রাহ্মণের "বামনাই" স্বীকার করেন নাই। বৌদ্ধ বজ্রযান ও সহজযানের অন্যতর প্রসিদ্ধ আচার্য্য শ্রীসরোজবজ্র বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ও বেদাদির বিরুদ্ধে লিখিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের নবপ্রকাশিত পুস্তকে সরোজবজ্রের বাঙ্গালা দোহাকোষের সহিত অদ্বয়বজ্রের যে সংস্কৃত টীকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বর্ণাশ্রম, চতুর্বেদ, ষড়দর্শন, উপাসনা, জটা চীরাদি ধারণ প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মের সর্বজনপ্রামাণ্য বিষয়ের বহু নিন্দা এবং ব্যঙ্গ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সব প্রমাণ হইতে আমাদের মনে হয় যে, চণ্ডীদাসের আরাধ্যা দেবী বাশুলী এবং তাঁহার আদিষ্ট "সহজ" পথ উভয়েই বৌদ্ধ সহজিয়াদিগের জিনিস। বৌদ্ধতান্ত্রিক বজ্রযান ও সহজযানের মুণ্ডিতমস্তক শ্রাবকশ্রাবিকাগণকেই পরিশেষে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভদ্র গোস্বামী "নেড়া নেড়ী" আখ্যা দিয়া বৈষ্ণব করিয়া লইয়াছিলেন। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, "আনন্দ ভৈরব" গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে,—

"বীরভদ্র গোসাঞির কি কহিব গুণে।
বৈরাগীকে শিখাইল আপন করণে॥
যদি এহো বাক্যে কেহো প্রতীত না হয় মনে।
বারশত নাড়াকে তের শত নাড়ী দিল কেনে॥"

(বিশ্বকোষধৃত, একবিংশ ভাগ, ৩৪৮ পৃষ্ঠা)

এবং তাই উত্তর কালে শাক্তসম্প্রদায় বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে অবজ্ঞা করিয়া "নেড়ানেড়ীর দল" বলিতেন।

ভূমিকা অতিশয় দীর্ঘ হইল, কিন্তু উপায় নাই। আমরা যে সকল বাঙ্গালা গানের অর্থ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহা একে অতিশয় প্রাচীন,—তাহাতে উহা গোপনীয় সন্ধ্যাভাষায় লিখিত। এই সকল রচনা প্রকৃতই Mystic রচনা,—এ কালের Mystic ইহার নিকট অতি সুবোধ। ইহাদিগের প্রাচীনতা সম্বন্ধে আমাদের মত এই যে, যে সময়ে আমাদের বঙ্গদেশের সীমা পশ্চিমে মিথিলাকেও অতিক্রম করিয়াছিল, যে সময়ে বাঙ্গালাভাষা পূর্ব্বে ব্রহ্মসীমান্ত হইতে পশ্চিমে প্রয়াগের প্রত্যন্ত পর্য্যন্ত কথিত হইত,—বাঙ্গালার নৃপতিগণ আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশই শাসন করিতেন, সেই প্রাচীন সময়ে—এই গানগুলি রচিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়ের শাখা প্রশাখা তখন কাশ্মীর হইতে বঙ্গোপসাগরের বেলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল,—বৌদ্ধতান্ত্রিক সম্প্রদায়ের শত শত সিদ্ধ মহাপুরুষ এই প্রকার পদ রচনা করিয়া সেই সময়ে সাধক ও ভক্তগণের শিক্ষাবিধান করিয়া গিয়াছেন। এই সব পদই উত্তর যুগের বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যের জন্মদাতা বলিয়া বোধ হয়। এই পদগুলির প্রকৃত অর্থ করিতে পারিলে বঙ্গদেশের অথবা সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের ধর্ম্ম, সমাজ, ভাষা ও সাহিত্যের, অর্থাৎ এক কথায় মধ্যযুগের সভ্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের এক নূতন ক্ষেত্রের দ্বার খুলিয়া যাইবে। তাই আমরা অত্যন্ত আশান্বিত হৃদয়ে ও উৎসাহের সহিত এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি। ভরসা করি, পাঠকগণ কৃপা করিয়া আমাদের ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন এবং আলোচনার ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া নূতন নূতন তত্ত্ব প্রকাশিত করিয়া বঙ্গসাহিত্যের মহদুপকার করিবেন।

নমঃ শ্রীবজ্রযোগিন্যৈ॥

গুণ্ডরীপাদানাং॥ ৪॥ পৃষ্ঠা ৯॥ রাগ অরু

তিঅড্ডা চাপী জোইনি দে অঙ্ক বালী।
কমলকুলিশঘাণ্ট করহুঁ বিআলী॥ ধ্রু॥ ১॥

জোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি ॥ ধ্রু ॥ ২ ॥
খেঁপহু জোইনি লেপ ন জায়।
মণিকুলে বহিয়া ওড়িআণে সমাঅ ॥ ধ্রু ॥৩॥
সাসু ঘরে ঘালি কোঞ্চা তাল।
চন্দে সুজ বেণি পখা ফাল ॥ ধ্রু ॥ ৪ ॥
ভণই গুডরী অহমে কুন্দুরে বীরা।
নরঅ নারী মঝেঁ উভিল চীরা ॥ ৫ ॥

[তিঅড্ডা = তিনটা, চাপী = চাপিয়া (প্রাচীন বাঙ্গলা ভাষায় চাপিঅ, কোচবিহার রঙ্গপুরের ভাষায়ও করি'যা ; ধরি' আন্ = 'করিয়া যাও,' 'ধরিয়া আন' স্থলে প্রচলিত, তবে "চাপী"স্থলে "চিপি" প্রচলিত), জোইনি = যোগিনি (প্রাকৃতে আদ্য "য" "জ" হয় এবং শব্দের মধ্যস্থ অথবা অন্তঃস্থ ক্, গ্, চ্, জ্, ত্, দ্, প্, ব্, ও য্ লোপ পায় ; বাঙ্গলায়ও ডাকিনী স্থলে ডাইনী হয়), দে = দে, দাও ; অঙ্ক = আলিঙ্গন, ক্রোড়; বালী = বালিকা; কমল কুলিশ = সহজ আনন্দের উৎপত্তি মূল (ব্যাখ্যার যোগ্য নহে), ঘাণ্ট = ঘণ্ট, (কোচবিহারে প্রচলিত), করহু = কর, বিআলী = বিকলী = বিকল যাহাতে করে, আনন্দে অধীর যাহাতে করে ॥ ১ ॥

জোইনি = যোগিনি; তঁই = ত্বং; তোমা; বিনু = বিনা; খনহি = ক্ষণও; একটু সময়ও; ন = না; জীবমি = জীবামি, বাঁচি ; তো = তোমার; তোর ; মুহ = মুখ, (প্রাকৃতে খ, থ, ধ, ভ, "হ"য়ে পরিণত হয়); চুম্বী = চুম্বিয়া; চুম্বন করিয়া; কমলরস = পদ্মমধু, পীবমি = পিবাম ; পান করি ॥ ২ ॥

খেঁপহু = ক্ষেপণ কর; জোইনি = যোগিনি; লেপ = লিপ্ত; ন = না; জায় = যায়; মণিকুলে = মণিমূলে; দেহের স্থান বিশেষে (ব্যাখ্যার যোগ্য নহে); বহিআ = বাহিয়া; ব'য়ে; ঊর্দ্ধগতি যাহা হওয়া, যেমন "গাছ ব'য়ে উঠে"—; ওড়িআণে = [illegible]চক্রে; দেহের স্থানবিশেষে; ব্যাখ্যার যোগ্য নহে ; সমাঅ = সঙ্গ পায়, প্রবেশ করে = অন্তর্ভূক্ত হয় ॥ ৩ ॥

সাসু = শ্বাস; ঘঁরে = ঘরে; ঘালি = ঘা'ল ক'রে; আঘাত করিয়া; রুদ্ধ অথবা বদ্ধ করিয়া; কোঞ্চা = কুঞ্চিকা; চাবি; (সহজিয়া যোগের পারিভাষিক শব্দ) তাল = তালাতে; (পারিভাষিক); চন্দে = চন্দ্র; সুজ = সূর্য্য; বেণি = দুই; ওড়িয়া ভাষায় নিত্য ব্যবহৃত হয়; পখা = পক্ষ; ফাল = ফাড়; খণ্ড খণ্ড কর ॥ ৪ ॥

ভণই = ভণতি; গুডরী = গুণ্ডরী, পদকর্ত্তার নাম; অহমে = আমরা আমি ; কোচবিহার রঙ্গপুরের ভাষায়, হিন্দী এবং ওড়িয়া ভাষার ন্যায় "হাম্‌রা" = আমরা, এক বচন উত্তম পুরুষে ব্যবহৃত হয়। হিন্দী "হম্" এবং ওড়িয়া "অম্ভে" অর্থ আমরা—অনেক স্থলেই একবচনে "মৈ" ও "মুঁ" স্থলে ব্যবহৃত হয়, তবে সে সে স্থলে বহুবচনের ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ওড়িয়া ভাষায় আবার "আম্ভেমানে" এবং কোচবিহারে "হাম্‌রাগুলা"—এইরূপ পুনশ্চ বহুবচনে (Double plural form) ব্যবহৃত হয়। কুন্দুরে = পরিভাষিক শব্দ ; বীরা = বীরাঃ—বীর; নর = নর, নারী = নারী ; মঝেঁ = মধ্যে, উভিল = উড্ডীয়মান; চীরা = চিহ্নপতাকা চিন্ ॥ ৫ ॥]

এই পদটীর অর্থ করিবার উপায় নাই। কেবল দ্বিতীয় কলিটির অর্থ বেশ বুঝিতে পারা যায়। "যোগিনি, তোমা বিনা আমি এক ক্ষণও বাঁচি না, তোমার মুখ চুম্বন করিয়া আমি পদ্মমধু পান করি।" —এ ঠিক সেই বৈষ্ণব কবিদের ভাবের কথা। কিন্তু পদটীর অন্যান্য অংশের সরলার্থ প্রকাশ অর্থাৎ প্রচলিত বাঙ্গালায় অনুবাদ করা অসম্ভব। "সহজ" পন্থ সম্বন্ধে "চণ্ডরোষণ তন্ত্রের" টীকা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া এই পদের মর্ম্ম সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকগণের গোচর করিতে চেষ্টা করা ভিন্ন আমাদের পক্ষে আর কিছু করা অসম্ভব। সেই টীকা হইতে জানিতে পারি,—

"চত্বার আনন্দাস্তত্র প্রজ্ঞোপায়াভ্যামন্যোন্যানুরাগলক্ষণং মালিঙ্গনচুম্বনস্তনমর্দ্দননখদানাদিনা যন্ত্রকচবরেন বজ্রপদ্মসংযোগং যাবদানন্দ এতেন কিঞ্চিৎ সুখমুৎপদ্যতে। ততঃ পদ্মান্তর্গতবজ্রচালনেন যাবন্মণিমূলং বোধিচিত্তমায়াতি তাবৎ পরমানন্দ এতেন তদধিকং সুখমুৎপদ্যতে। মণিমূলাদ্ যাবৎ পদ্মাদবান্তর্গতমশেষং ন ভবতি তাবৎ সহজানন্দঃ।" বিশ্বকোষধৃত, একবিংশ ভাগ, ৩৪৬-৩৪৭ পৃষ্ঠা।

ইহার বঙ্গানুবাদ করিতে আমরা অক্ষম, অথচ এই তত্ত্বের একটু আভাস না পাইলে বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধকদিগের এবং উত্তরকালীন বৈষ্ণব সহজিয়া দিগের "সহজ" তত্ত্বের কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। পরম বৈষ্ণব অশীতিপর বৃদ্ধ কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

"সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কাম ক্রীড়া সাম্যে তার কহি কাম নাম॥
নিজেন্দ্রিয় সুখ বাঞ্ছা নহে গোপিকার।
কৃষ্ণসুখ নিতে তার সঙ্গম বিহার॥
ব্রজলোকের কোন ভাব লইয়া সেই ভজে।
ভাব-যোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে।'

বিশ্বকোষধৃত, একবিংশ ভাগ ৪৯ পৃষ্ঠা।

মহাপ্রভুর অন্যতর অন্তরঙ্গ রায় রামানন্দের উক্তি—

"এই কার্য্য কর তুমি শুনহ সাধক।
রসবতী নায়িকা যে আনহ প্রত্যক্ষ॥
মহাপ্রভুর মনবৃত্তি যেরূপ করণ।
সাক্ষাতে থাকিয়া আমি শিখাব সাধন॥"

বিশ্বকোষ, একবিংশ ভাগ, ৩৫২ পৃষ্ঠা।

সহজিয়া বৌদ্ধদিগের মধ্যে সাধক আপনাকে ভগবান্ বজ্রসত্ত্ব এবং সঙ্গিনী যোগিনীকে বজ্রধাত্বীশ্বরী দেবী মনে করিয়া গুহ্য সাধনা করেন, এবং বৈষ্ণব সহজিয়ারা তৎস্থলে কৃষ্ণরাধিকার আরোপ করিয়াছেন; তবে তাঁহাদের গ্রন্থ "নিগূঢ়ার্থ প্রকাশাবলী"তে দেখিতে পাওয়া যায়,—

"সহজ ভজনে মূল সেই আদ্যাশক্তি।
একাকার সমাকরণ কহিল নিশ্চিতি॥" বিশ্বকোষধৃত, একবিংশ ভাগ ৩৪৮ পৃষ্ঠা।

আর নান্নুরের চণ্ডীদাস ঠাকুর বাশুলীদেবীর প্রত্যাদেশ ব্যক্ত করিয়া লিখিয়াছেন,—

"হাসিয়া বাশুলী কয়, শুন চণ্ডী মহাশয়
আমি থাকি রসিকনগরে।
সে গ্রামদেবতা আমি, ইহা জানে রজকিনী
জিজ্ঞাস গে যতনে তাহারে॥
সে দেশের রজকিনী হয় রসের অধিকারী
বাশুলী স্বরূপ তার প্রাণ।
তুমি ত রমণের গুরু সেব রসের কল্পতরু
তার সনে দাস অভিমান॥
চণ্ডীদাস কাছে মাতা কহিলে সাধন কথা,
বাশুলী সত্য প্রাণপ্রিয়া হৈল।
নিশ্চয় সাধন গুরু, সেই রসের কল্পতরু,
তার প্রেমে চণ্ডীদাস মৈল॥'

আর এই বাশুলী কথিত "সহজ" যে বেদের আদিষ্ট জ্ঞানমার্গের সম্পূর্ণ প্রতিকূল তাহা চণ্ডীদাস ঠাকুরের এবং তাঁহার পরবর্ত্তী বৈষ্ণব "নেড়ানেড়ী" গণের আচরণে স্পষ্টই প্রকাশিত হইয়াছে। সহজিয়ারা বলেন, রায় রামানন্দ জগন্নাথের দেবদাসীর, চণ্ডীদাস রামীর, বিদ্যাপতি রাণী লছীমা দেবীর, জয়দেব পদ্মাবতীর, শ্রীরূপ মীরাবাঈর, বিল্বমঙ্গল চিন্তামণির ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্যামাঙ্গিনীর সহিত "সহজ"রস অনুভব করিয়াছিলেন। সভ্য ভব্য বৈষ্ণবেরা এ সকল কথা স্বীকার করেন নাই এবং বিদ্যাপতি ঠাকুর যে এ রসে বিশেষ রসিক ছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ তাঁহার রচিত পদাবলীর মধ্যে পাওয়া যায় নাই। হিন্দু তান্ত্রিকগণের শৈব বিবাহ ও তদনুবর্ত্তী বামাচারের বিবিধ

গুহ্যাতিগুহ্য সাধন, বৌদ্ধ বজ্রযান ও সহজযান পন্থের পথিকগণের অনুষ্ঠিত গোপনীয় ব্যাপার এবং বৈষ্ণব রসিক সহজিয়াদিগের "রাগানুগা" "পিরীতি" অথবা "সহজ" সাধন—সকলেরই মূলে এক বিষয় রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার স্থান ইহা নহে, সুতরাং এই পর্য্যন্ত আভাস দিয়াই আমরা নিবৃত্ত হইতেছি। তবে, একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, ঐ ঐ সম্প্রদায়ের সাধকেরা নিজ নিজ সাধনপন্থাকে অতি পবিত্র বৈদিক ব্রহ্মজ্ঞানের সমান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং সাধারণে তাঁহাদের অত্যুচ্চ আদর্শ ধারণা করিতে পারিবে না বলিয়াই বৌদ্ধ তান্ত্রিক হিন্দুতান্ত্রিক এবং বৈষ্ণব সহজিয়ারা সকলেই নিজ নিজ সাধনা-পদ্ধতি লোক সাধারণের নিকট হইতে চিরকালই অতি গুহ্য ও রহস্যময় রাখিয়াছেন এবং অধিকারী ভিন্ন কাহারও নিকট প্রকাশ করা মহাপাপ বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের উদ্দেশ্য যে প্রকৃতই উচ্চ ছিল,তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। বৈদিক উচ্চ উপদেশও সাধারণের নিকট গুহ্য এবং অপ্রকাশ্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, যথা,

"বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্।
নাপ্রশান্তায় দাতব্যং নাপুত্রায়া শিষ্যায় বা পুনঃ॥২২॥"
যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।
প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥২৩॥ শ্বেতাশ্বতর উপানিষৎ
ষষ্ঠ অধ্যায়॥

এবং "ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥৬৭॥
শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা, অষ্টাদশ অধ্যায়॥

যাহা হউক,এখন আমরা প্রকৃতের অনুসরণ করি।
॥১৪॥ পৃষ্ঠা ২৫॥

ধনসী রাগ
ডোম্বীপাদানাং।
গঙ্গা জউনা মাঝেঁরে বহই নাঈ।
তহিঁ বুড়িলী মাতঙ্গি পোইআলী লে পার করেই॥১॥
বাহ তু ডোম্বী বাহ লো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা।
সদ্গুরু পাঅ পএ জাইব পুণু জিণউরা॥২॥
পাঞ্চ কেড়ুআল পড়ন্তেঁ মাঙ্গে পিটত কাচ্ছী বান্ধী
গঅণ দুখোলেঁ সিঞ্চহুঁ পানী ন পইসই সান্ধি।৩॥
চন্দ সূজ্জ দুই চকা সিঠি সংহার পুলিন্দা।
বাম দাহিণ দুই মাগ ন রেবই বাহ তু ছন্দা॥৪॥
কবড়ী ন লেই বোড়ী ন লেই সুচ্ছড়ে পার করেই।
জো রথে চড়িলা বাহবাণ জাই কুলেঁ কুল বুড়ই॥৫॥

[গঙ্গা = গঙ্গা, জউনা = যমুনা,মাঝেঁ = মাঝে,রে = সম্বোধনে. বহই = বহতি, বইতেছে, নাঈ = নৌকা। তঁহি = তাহাতে, বুড়িলী = বুড়ী, মাতঙ্গি = চণ্ডালী, ডোমনী, পোইআলি লে = পৌইলী = দাসী, নাবিকা, লে = রে, পার করেই = পার করে॥১॥ *

বাহ = বহন কর, বা'ও, তু = তুমি, ডোম্বী = ডোমনী, বাহ লো = বেয়ে যাও, লো—সম্বোধনে, ডোম্বী = ডোমনী, বাটত = পথে, (কোচবিহারে সপ্তমী "তে" স্থলে "ত" প্রযুক্ত হয়, যথা জলে = পাণিত্, ঘরে = ঘরত ইত্যাদি) ভইল = হইল (ভূ ধাতু), উছারা = অধিক বেলা (উচ্ছলিত),পাঅ = পদে, (কোচবিহারে এবং হিন্দীতে পাঁও) পএ = পথে,জাইব = যাইব, পুণু = পুনশ্চ, জিণউরা = জিনপুর (সুখস্থান)॥২॥

পাঞ্চ = পাঁচ,কেড়ুআল = নৌকার দাঁড় (কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে

---

* সন্ধ্যাভাষাতে সহজতত্ত্বের যোগ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। শাস্ত্রিমহাশয়ের প্রদত্ত শব্দকোষে 'বুড়িলী' অর্থে ডুবিলী এবং 'মাতঙ্গী' অর্থে মত্তাঙ্গী অর্থ করা হইয়াছে। পোইলী শব্দের অর্থ শব্দকোষে নাই, শব্দটাও ধরা হয় নাই। মাতঙ্গী অর্থে চণ্ডালী যে কোন সংস্কৃত অভিধানে পাওয়া যায়। "চণ্ডালী", "ডোম্বী" এই সম্প্রদায়ের পরিভাষিক শব্দ, সাধনার অবস্থা বা শ্রেণী বিশেষ। পোইলী শব্দে ওড়িয়া ভাষায় দাসী বুঝায়। মাতঙ্গী শব্দের গুহ্যার্থ সহজ-সুখ-প্রমত্তাঙ্গী বটে;তাঁহারাও তাহাই করিয়াছেন।

অর্থেকথার ব্যবহৃত হইয়াছে), পড়ন্তে = পড়িতেছে, মাঙ্গে = মার্গে, পিটত = ফিটাও, খোল, কাচ্ছীবান্ধী = কাছীবান্ধা (কচ্ছিকা মণিমুন—টীকা) গঅণ = গগন, দুখোলে = দুই খোলে? সিঞ্চহু = সেচন কর, পানি = জল, ন = না, পইসই = প্রবিশতি, প্রবেশ করিতেছে, সান্ধি = সন্ধি, যোড়ার জায়গা ॥৩॥

চন্দ = চন্দ্র, সূজ্জ = সূর্য্য; চকা = চাকা, সিটিসংহার = সৃষ্টিসংহার, পুলিন্দা = পুলিন্দং সন্ধ্যাভাষয়া নপুংসকং, দাহিণ = দক্ষিণ, মাগ = মার্গ, বেরই = দেখা যায়, বাহ তু = তুমি ব'য়ে যাও, ছন্দা = স্বচ্ছন্দে ॥৪॥

কবড়ী = কড়ি, লেই = লয়, বোড়ী = বুড়ি, পাঁচগণ্ডা কড়ি, সুচ্ছড়ে = সচ্ছলে, জো = যে, রথে = রথে, চড়িলা = উপবিষ্ট, চড়িয়াছে, বাহবাণ = ব্রাহ্মণ, জাই = যায়, কুলেঁ = তীরে, কুল = সব, সমস্ত (হিন্দীতে এখনও প্রচলিত), বুড়ই = ডুবিয়া যায় ॥৫॥]

ডোম্বী সিদ্ধাচার্য্য বলিতেছেন।—

"গঙ্গা ও যমুনার মধ্যে নৌকা চলিতেছে, তাহার মধ্যে এক বুড়ী দাসী পার করে ॥১॥

ও ডোম্‌নী ব'য়ে যা, ব'য়ে যা, পথে বড় বিলম্ব হইল, সদ্‌গুরুর পাদপদ্মের প্রসাদে আমি সুখস্থান জিনপুর যাইব ॥২॥

নৌকার কাছী বান্ধা খুলিল, পাঁচ দাঁড় পড়িতেছে, গগনরূপ খোলে জল ছেঁচিয়া ফেল, যেন নৌকার যোড়ের জায়গায় জল না ঢোকে ॥৩॥

চন্দ্র সূর্য্য দুই চাকা সৃষ্টি ও সংহার, নপুংসক (এই স্থল দুর্ব্বোধ।) ডান বাঁ দুই তীর দেখা যায় না, তুই স্বচ্ছন্দে ব'য়ে যা ॥৪॥

(এই নাবিকা পারের মাশুল স্বরূপ) কড়িও লয় না বুড়ীও লয় না, স্বচ্ছন্দে (বিনা মাশুলে) পার করে। যে ব্রাহ্মণ রথে চড়িয়া যায়, সে কুলেই একেবারে ডুবিয়া মরে ॥৫॥" এইটি অবশ্য বাহ্য অথবা বহিরঙ্গের অর্থ, হেঁয়ালী খুলিয়া মর্ম্ম প্রকাশ করা অনুচিত বোধে করা হইল না।

॥১৬॥২৯ পৃষ্ঠা॥

রাগ ভৈরবী।

মহীধর পাদানাম্‌।

তিঁনি এঁ পাটেঁ লাগেলি রে অণহ কসণ ঘণ গাজই।

তা সুনি মার ভয়ঙ্কর রে সঅ মণ্ডল সএল ভাজই ॥১॥

মাতেল চীঅগঅন্দা ধাবই।

নিরন্তর গঅণন্ত তুসেঁ ঘোলই ॥২॥

পাপপুণ্য বেণি তিড়িঅ সিকল মোড়িঅ খম্ভা ঠাণা।

গঅণ টাকলি লাগিরে চিত্তা পইঠ ণিবানা ॥৩॥

মহারস পানে মাতেল রে তিহুঅন সএল উএখী।

পঞ্চবিষয় রে নায়করে বিপখ কো বী ন দেখী ॥৪॥

খররবি কিরণ সন্তাপেরে গঅণগঙ্গা গই পইঠা।

ভণন্তি মহিত্তা মই এথু বুড়ন্তে কিম্পি ন দিঠা ॥৫॥

[তিনি এঁ = তিনি, পাটেঁ = পর্দায়, পাটে, লাগেলি = লাগিল, রে = আছে, অণহ = অনাহত, কসণ = কৈসন, কিরূপ (টীকায় আছে "ভয়ানকং"—কিমিতি বিস্ময়ে) মণ = মন, গাজই = গর্জ্জতি, গর্জ্জন করিতেছে। তা সুনি = তাহা শুনিয়া, মার = কন্দর্প, (বৌদ্ধ সাধকের শত্রু, খৃষ্টানের ও মুসলমানের সয়তানের মত) সঅ = সব, মণ্ডল = সৈন্যগণ, সএল = সকল, ভাজই = ভাগই, ভঙ্গ দেয়, পলায়ন করে ॥১॥

মাতেল = মত্ত, চীঅ = চিত্ত, গঅন্দা = গজেন্দ্র, ধাবই = ধাবতি, দৌড়িতেছে, নিরন্তর = সর্ব্বদা, গঅণন্ত = গগনে, তুঁসে = কুটিয়া, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাগে বিভক্ত করিয়া, ঘোলই = ঘূর্ণয়তি, ঘুলিতেছে বা গুলিতেছে (যাহা হইতে 'ঘোল' শব্দ

হইয়াছে) ॥২॥

বেণি = দুই (ওড়িয়া ভাষায় সুপ্রচলিত), তিড়িঅ = ত্রোটয়িত্বা, তুঁড়ে, ভাঙ্গিয়া, সিকল = শৃঙ্খল, শিকল, মোড়িঅ = মর্দ্দয়িত্বা মাড়িয়া, চূর্ণ করিয়া, খম্ভা = স্তম্ভসকল, ঠাণা = স্থান (হস্তীর বন্ধন স্থানকে "হাতীর থান" কোচবিহার প্রদেশেও বলে), গঅণ = গগন, টাকলি = লক্ষ্য করিয়া ("মরণ টাকিলি বেটা অনাথা দেখিয়া" ভারতচন্দ্র) লাগি = জন্য, ("সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু" চণ্ডীদাস)। চিত্তা = চিত্ত, পইঠ = প্রবিষ্ট, ণিবানা = নির্বাণ ॥৩॥

মাতেল = মত্ত হইল, তিহুঅন = ত্রিভুবন, সএল = সকল, উএখী = উপেক্ষিয়া; নায়করে = নায়কের, সাধকের, বিপখ = বিপক্ষ, কো = কে, বী = অপি (হিন্দীতে "ভী" যথা "তুমভী আও" ব্যবহৃত হয়, ঢাকা সহরে ব্যবসায়িমহলেও "বি" নাকি প্রচলিত আছে) দেখী = দেখিল ॥৪॥

সন্তাপেরে = সন্তাপেতে ("তে" বিভক্তিস্থলে "রে" সপ্তমী বিভক্তি ওড়িয়া ভাষায় সুপ্রচলিত) গঅণ গঙ্গা = গগনগঙ্গা, গই = গেল (হিন্দীতে ব্যবহৃত হয়) পইঠা = প্রবিষ্ট, ভণন্তি = ভণে, বলিতেছে, মহিত্তা = মহীধর পদকর্ত্তা, মই = ময়া আমার দ্বারা অথবা আমি (হিন্দী "মৈঁ") এথু = অত্র, এখানে বুড়ন্তে = মগ্নেসতি—ডুবিলে, কিম্পি = কিমপি, কিছুই, ন দিঠা = ন দৃষ্টঃ—দেখি না ॥৫॥]

"(কায়, বাক্য ও চিত্ত এই) তিন পর্দ্দায় কি একঘন অনাহতধ্বনি গর্জ্জন করিতেছে ! সেই শব্দ শুনিয়া ভয়ঙ্কর মার তার সকল সৈন্য লইয়া পলায়ন করিল ॥১॥

চিত্ত-গজেন্দ্র উন্মত্ত হইয়া দৌড়িল এবং নিরন্তর গগনকে (চতুর্থ আনন্দ, সাম্প্রদায়িক গুহ্যকথা) সুক্ষ্মরূপে খুলিতেছে ॥২॥

সেই গজেন্দ্র পাপপুণ্য দুই শিকল ভাঙ্গিয়া এবং (অবিদ্যারূপ) বন্ধন স্থান ও স্তম্ভ চূর্ণ করিয়া গগন (আনন্দ) লক্ষ্য করিয়া নির্বাণ-(রূপ সরোবরে) প্রবেশ করিল ॥৩॥

(চিত্ত গজেন্দ্র) মহারস পানে মত্ত হইল এবং ত্রিভুবন সকলকে উপেক্ষা করিল। পঞ্চবিষয় নায়কের বিপক্ষ হইলেও কেহই তাহাকে দেখিতে পাইল না ॥৪॥

(চিত্ত গজেন্দ্র মহাসুখরূপ) খররৌদ্রসন্তাপে (তপ্ত হইয়া) গগন-গঙ্গায় (আনন্দ রূপ নির্বাণ নদীজলে) প্রবেশ করিল। মহীধর বলিতেছেন, আমিও এই (নির্বাণ সুখ সরোবরে) ডুবিলাম, আর কিছুই দেখিতেছি না ॥৫॥"

চিত্তকে গজেন্দ্ররূপে সন্ধ্যাভাষায় এই বর্ণনা করা হইয়াছে

॥২২॥ ৩৮ পৃষ্ঠা।

রাগ গুঞ্জরী

সরহ পাদানাম্।

অপণে রচি রচি ভব নির্বাণা।
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপনা ॥১॥
অম্ভে ন জাণঁহু অচিন্ত জোই।
জাম মরণ ভব কইসণ হোই ॥২॥
জইসো জাম মরণ বি তইসো।
জীবন্তে মঅলেঁ ণাহি বিশেসো ॥৩॥
জা এথু জাম মরণে বি সঙ্কা।
সো করউ রস রসানেরে কংখা ॥৪॥
জে সচরাচর তিঅস ভমন্তি।
তে অজরামর কিমপি ন হোন্তি ॥৫॥
জামে কাম কি কামে জাম।
সরহ ভণতি অচিন্ত সো ধাম ॥৬॥

[অপণে = আপনি, নিজে, রচি রচি = রচিয়া রচিয়া, গড়িয়া গড়িয়া, ভব = উৎপত্তি, নির্বাণা = নির্বাণ, মিছেঁ = মিছে, লোঅ = লোক, বন্ধাবএ = বন্ধন করায়, অপনা = আপনাকে ॥১॥ অম্ভে = আমরা, ন = না, জাণঁহু = জানি, অচিন্ত = অচিন্ত্য জোই = যাহা (টীকাকারের মতে "যোগী"), জাম = জন্ম, ভব = উৎপত্তি, কইসণ = কীদৃশ ('কৈসন' বিদ্যাপতি ব্যবহার করিয়াছেন, হিন্দীতে এখনও চলিতেছে) হোই = ভবতি, হয়

(প্র.কৃতে 'তোদী') ॥২॥

জইসো = যাদৃশ (বিস্তাপতিতে বহুল ব্যবহৃত) মআঁলে = মরিলে, ণাহি = নাহি, নাই, বিশেসো = বিশেষ ॥৩॥

জা = যাহার, এথু = অত্র, ইহসংসারে, বি = অপি, সঙ্কা = শঙ্কা, ভয়, সো = সে, করউ = করোতু, করুক, বস বসানেরে = পারদ ও রসায়ন প্রভৃতি ঔষধে (এখানেও "তে" স্থলে "রে" বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে) কংখা – আকাঙ্ক্ষা ॥৪॥

জে = যে (সংস্কৃত রূপ), যাহারা, তিঅস – ত্রিদশ, মরন্তি = ভ্রমন্তি, ভ্রমণ করে, তে = তাহারা (সংস্কৃতরূপ) কিম্পি = কিমপি, হোন্তি = ভবন্তি, হয় ॥৫॥

জামে = জন্মে, কাম = কর্ম্ম, কামে = কর্ম্মে, জাম = জন্ম, সরহ = পদকর্ত্তা, অচিন্ত – অ চিন্ত্য, সো = সই, ধাম = তেজ॥৬॥]

লোকে নিজে নিজে উৎপত্তি এবং ধ্বংস রচনা (কল্পনা) করিয়া মিথ্যা আপনাদিগকে বন্ধন করায় ॥১॥

আমরা যে অচিন্ত্য (পদার্থ, অর্থাৎ) জন্ম, মৃত্যু ও উৎপত্তি কিরূপে হয়, তাহা জানি না। ॥ ২ ॥

জন্ম যেমন, মৃত্যুও তেমন, জীবিত ও মৃতে বিশেষ (ভেদ) নাই ॥ ৩ ॥

যাহার এই সংসারে জন্মমৃত্যুতে ভয় আছে, সেই রসায়নাদি ঔষধের আকাঙ্ক্ষা করুক ॥ ৪ ॥

যাহারা সচরাচর (সর্ব্বদা) স্বর্গলোকে ভ্রমণ করে, তাহারা (ত) কিছুতেই অজরামর হয় না। ॥ ৫ ॥

জন্মেই কর্ম্মের উদ্ভব না কর্ম্মফলেই জন্ম হয় ? সরহ বলেন যে, সেই তত্ত্ব অচিন্তনীয় ॥৬॥

॥ ৪১ ॥ ৬৩ পৃষ্ঠা ॥

বাগ কহ্নু গুংজরী।

ভুসুকুপাদানাম্ ॥

আই এ অণুঅনাএ জগরে ভাঁতি এঁসো পড়িহাই—
রাজসাপ দেখি জো চমকিই যারে কিং তং বোড়ো খাই ॥ ১ ॥

অকট জোইআ রে মা কর হথা লোহ্না।
আইস সঁভাবে জই জগ বুঝষি তুট বাষণা তোরা ॥ ২ ॥

মরুমরীচি গন্ধনইরী দাপতিবিম্বু জইসা।
বাতাবত্তেঁ সো দিট ভইআ অপেঁ পাথর জইসা ॥ ৩॥

বাঁঝি সুআ জিম কেলি করই খেলই বহুবিহ খেড়া।
বালুআ তেঁলে সসর সিংগে আকাশ ফুলিলা ॥৪॥

রাউত ভণই কট ভুসুকু ভণই কট সঅলা অইস সহাব।
জই তো মূঢ়া অচ্ছসি ভান্তী পুচ্ছতু সদ্‌গুরু পাব ॥ ৫ ॥

[আই = ওহে, এ, – এই = অণুঅনাএ = অনুৎপন্নে, জগরে = জগতে ("তে" স্থলে "রে" ৭মী বিভক্তি) ভাঁতি = ভ্রান্তি, এঁসো – ঈদৃশ, পড়িহাই = পড়িআই, প্রতীয়তে, প্রত্যয় হয়, রাজসাপ = শাঁখিনীসাপ (টীকাতে "রজ্জুসর্প" বলা হইয়াছে—তাহা ও হইতে পারে) দেখি = দেখিয়া, জো = যে, চমকিই – চমকাইয়া উঠে, যা রে = হাঁ রে, কিং = কি, তং = তাহাকে, বোড়ো = বোড়াসাপ, খাই = খায় ॥ ১ ॥

অকট – আশ্চর্য্য, জোইআ = যোগীআ, মা = মৎ, কর = কর, হথা = হাত, লোহ্না = লবণযুক্ত, লোণা, আইস = ঈদৃশ, সঁভাবে = স্বভাবে, জই = যদি, (বিস্তাপতি বাহুল ব্যবহার করিয়াছেন), জগ = জগৎ, বুঝষি = বুঝিতেছ, তুট = তুচ্ছ, বাষণা – বাসনা, তোরা = তোর ॥ ২ ॥

মরুমরীচ = মরুভূমির মরীচিকা, গন্ধনইরী = গন্ধর্ব্বনগরী (রৌদ্রে স্থির ও স্বচ্ছ বায়ুতে আকাশে নগরাদির ভ্রম হয়, মরীচিকার এক বিশেষ প্রকার) দাপতিবিম্বু = দর্পণের বিম্ব, জইসা = যদৃশ, (হিন্দী জৈসা—জৈ = যাহার, সা = মত) বাতাবত্তে = বাতাবর্ত্তে, সো = সেই, দিট = দৃঢ়, ভইআ = ভূত, হওয়া, অপে = জলের, জইসা = যাদৃশ ॥ ৩ ॥

বাঁদ্ধি = বাঁধিয়া, সুস্ম = সূত্র, সূতা (টীকায় বদ্ধাসুত), জিম = যেন, কেলি = খেলা, করই = করোতি, করে, খেলই = খেলতি, খেলে, বহুবিহ = বহুবিধ, খেডা = খেলা (ওড়িয়া ভাষায় এরূপ উচ্চারণ অনেক)। বালুআতেলে = বালুকার তৈলে, সসর সিংগে = শশ কর শৃঙ্গে (শশর—ওড়িয়া ভাষায়ও ষষ্ঠী 'র' বিভক্তি ঐরূপ প্রযুক্ত হয়, আমাদের বর্ত্তমান বাঙ্গালায় অকারান্ত শব্দে "অ" স্থানে আগে "এ" করিয়া পরে "র" বিভক্তি যোগ হয়,—যেমন নরের, ফলের, জলের,—কিন্তু ওড়িয়ায় নরর ফলর, জলর,—এইরূপ হয়) আকাশফুলিলা = আকাশকুসুমে ॥ ৪ ॥

রাউতু = অশ্বারোহী, ভুসুকুপাদের উপাধি, তিনি রাজপুত্র অশ্বারোহী ছিলেন। ভণই = বলিতেছেন, কট = কড়া, দৃঢ়, সঅলা = সকলের, অইস = ঈদৃশ, সহাব = স্বভাব, জই = যদি, তো = তোর মূঢা = হে মূর্খ, ভান্তী = ভ্রান্তি, পুচ্ছতু = জিজ্ঞাসা কর, কোচবিহার অঞ্চলে বলে "পুচ্ কর", হিন্দীতেও "পুছ্ করনা" চলিত আছে, সংস্কৃত 'পৃচ্ছতু'), পাব = পাইবে, (ওড়িয়া ভাষায় ব্যবহৃত হয়) ॥ ৫ ॥]

ভুসুকু পাদ বলিতেছেন,—

ওহে, এই (প্রকৃত প্রস্তাবে) অনুৎপন্ন (সুতরাং মিথ্যা) জগতে ভ্রান্তি এইরূপ প্রত্যয় করায়। (কিন্তু) রাজসাপ (বিষহীন অথচ দেখিতে ভয়ানক সর্পবিশেষ—অথবা রজ্জু ভ্রমে সর্প জ্ঞান হওয়া) দেখিয়া যে চমকিয়া উঠে, তাহাকে কি (সত্যই) বোড়া সাপে খায় ? ১॥

হে আশ্চর্য্য যোগী,—হাত লোনা করিও না। যদি (তুমি) এইরূপ স্বভাবে (সত্য সত্যই) জগৎকে বুঝিয়া থাক, (তাহা হইলে) তোমার বাসনা তুচ্ছ ॥২॥

মরুভূমিতে মরীচিকা, গন্ধর্বনগরী এবং দর্পণের বিম্ব সদৃশ (মিথ্যা) বায়ুবেগে দৃঢ় হওয়া জলের পাথর (শিলা) সদৃশ (মিথ্যা) ॥২॥

যেন সূতা বান্ধিয়া (পুতুলে সূতা বান্ধিয়া বাজীকরের মত, প্রকৃতি বা জগৎ) ক্রীড়া করে এবং বালুকা হইতে তৈল, শশকের শৃঙ্গ এবং আকাশ কুসুমে বহুবিধ খেলা খেলায় ॥৩॥

রাউত ভুসুক দৃঢ় (করিয়া) বলিতেছেন, সকলের এইরূপই স্বভাব। হে মূঢ়, যদি ভ্রান্তি আছে, সদ্‌গুরুকে জিজ্ঞাসা কর, (প্রকৃততত্ত্ব) পাইবে।

পুথি বড়ই বাড়িয়া গেল, আমরা অদ্য এই স্থানেই ক্ষান্ত হইব। এই ভাষার নমুনা দেখিয়া আমাদের মনে হয় যে, যে অতীত কালে বাঙ্গালা, হিন্দী এবং ওড়িয়া প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষাগুলি আধুনিক মূর্ত্তি ধারণ করে নাই, যে সময়ে সুবিস্তৃত গৌড়মণ্ডলে একই গৌড়ীয় ভাষা প্রচলিত ছিল, সংস্কৃত আলঙ্কারিক ও বৈয়াকরণগণ স্থানবিশেষে যাহাকে প্রাকৃত, বিভাষা অথবা অপভ্রংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, এই ভাষা সেই সুপ্রাচীন সময়ের রচিত সেই ভাষা। শাস্ত্রিমহাশয় নেপাল হইতে যে অমূল্যরত্ন আহরণ করিয়া আনিয়া বঙ্গভাষাভাষিগণকে প্রদান করিয়াছেন, তাহার প্রকৃত অনুশীলন করিতে পারিলে আমাদের মাতৃভাষার যে কেবল প্রাচীনতা বাহির হইবে তাহা নহে, পরন্তু আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য ভাষার সহিত তাহার প্রকৃত সম্বন্ধ জানিতে পারা যাইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভূমির পুরাতন সভ্যতার সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন মূর্ত্তির সহিতও আমাদের পরিচয় ঘটিবে। আমরা শক্তিহীন নগণ্য ব্যক্তি; যোগ্যতর সাহিত্যসেবকগণকে এই বিরাট ও বিশাল কার্য্যক্ষেত্রে সাগ্রহ ও সানুরোধ আহ্বান করিয়া অদ্য বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

১২৬৭ সনে ঢাকার সাহিত্য।*

১২৬৬-৬৭ সনে ঢাকায় সর্ব্ব প্রথম মুদ্রা-যন্ত্র (১) প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার নাম বাঙ্গলা যন্ত্র। ঢাকাপ্রকাশ কার্য্যালয়ে উহা এখনও বিদ্যমান আছে।

সাহিত্যের পূর্ব্বাবস্থা

তৎপূর্ব্বে হস্তলিখিত পুথি-পত্রই ঢাকার সাহিত্যের নিদর্শন ছিল। ঢাকার সাহিত্যের এই প্রাচীন যুগের অনেক গ্রন্থ-পত্র কীটদষ্ট হইয়া লোপ পাইয়াছে বা অযত্নে হারাইয়া গিয়াছে। এরূপ ভাবে লুপ্ত বা লুপ্তপ্রায় অনেক হাতের লেখা বই, কবিতা, কবির গান, হোলির গান, ভাটীয়াল গান প্রভৃতি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সাহিত্যের বহু উপকরণ এখনও সংগৃহীত হইতে পারে। এরূপ কষ্টসাধ্য কার্য্য বা লুপ্ত-রত্নোদ্ধারের যথোচিত চেষ্টা এখনও না হইলেও ঐ যুগের কোন কোন হস্তলিখিত গ্রন্থ (২) এক্ষণ প্রকাশিত হইতেছে; কোন কোন হস্তলিখিত গ্রন্থ বা উদ্ধারও করা যাইতেছে।

মুদ্রাযন্ত্র-প্রতিষ্ঠার ফলে ঢাকায় মুদ্রিত সাহিত্যের (Printed literature) সৃষ্টি হয়। ঢাকার সাহিত্যের এই আধুনিক কালের প্রথম বার্ষিক বা ১২৬৭ সনের সাহিত্যের আলোচনাই বর্ত্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধের লক্ষ্যস্থল।

* ঢাকা সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত।

(১) ঢাকায় তখনআর কোন মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। অথচ এই সময়ে কলিকাতায় ৯০টী মুদ্রাযন্ত্র ছিল; বলা বাহুল্য, ইহাতে কলিকাতায় সাহিত্যচর্চ্চার বিশেষ আনুকূল্য হইত। "পুলিসের একখানি পত্র পাঠে জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে যে, অধুনা কলিকাতায় ৯০টী মুদ্রাযন্ত্র আছে।" বিবিধার্থ সংগ্রহ ৪৩ পর্ব্ব।

(২) "শারদামঙ্গল," ৺চৈতন্যকৃষ্ণদাসের "দিবাস্বিপ্নার" প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

বলা বাহুল্য, এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এই সকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা, প্রধানতঃ দুইটী কারণে অসম্ভব। প্রথমতঃ, স্থানাভাব, দ্বিতীয়তঃ সংগৃহীত উপকরণের অসম্পূর্ণতা। আমরা এখনও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারি নাই। এরূপ সংগ্রহ কার্য্য কিরূপ শ্রম সাপেক্ষ ও ব্যয়সাধ্য তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। আশা করি, ইহা স্মরণ করিয়া এই অসম্পূর্ণ বিবরণও আপনারা গ্রহণ করিবেন।

১৭৭৮খৃঃঅব্দে হুগলীতে হলহেড সাহেবের ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। এই ব্যাকরণের দৃষ্টান্তে বাঙ্গালা অক্ষর এদেশে প্রথম ব্যবহৃত হয়। ইতঃপূর্ব্বে 'লন্দনে' দুএকখানা গ্রন্থ বাঙ্গলা অক্ষরে 'চাপা' হইয়াছে। বাঙ্গালীর প্রথম মুদ্রাযন্ত্র অগ্রদ্বীপ—কালনায় ১৮২৫ খৃঃঅব্দে স্থাপিত হয়। সুতরাং হলহেড সাহেবের ব্যাকরণ প্রকাশের প্রায় ৮৫ বৎসর পরেও কালনায় মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনের প্রায় ৩৫ বৎসর পরে ঢাকায় মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রবন্ধের প্রারম্ভেই, আর একটী কথাও বলিব। ঢাকায় মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে ঢাকার সাহিত্যিকেরা বা লেখকেরা সাধারণতঃ "তত্ত্ববোধিনী", "সংবাদ-প্রভাকর" প্রভৃতি কলিকাতার পত্রে কবিতা প্রবন্ধাদি লিখিতেন বা কলিকাতায় গ্রন্থাদি ছাপাইতেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে, আমরা সেই সকল লেখক, বা তাঁহাদের লিখিত প্রবন্ধাদিরও কোন উল্লেখ বা আলোচনা করিব না। ঢাকার সাহিত্য বলিতে, আমরা ঢাকায় মুদ্রিত বা প্রকাশিত গ্রন্থ-পত্র ধরিয়া লিখিতেছি। আমাদের আলোচ্য বিষয়টীকে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে—(১) সংবাদ-পত্র ও সাময়িক সাহিত্য, ও (২) গ্রন্থ প্রকাশ, এই দুইটী স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে বিভাগ করিয়া লইতেছি।

(১) সংবাদ-পত্র ও সাময়িক সাহিত্য

ঢাকার প্রথম মাসিক পত্রিকা 'মনোরঞ্জিকা', তৎপরে 'কবিতাকুসুমাবলী' প্রকাশিত হয়। উভয় পত্রিকাই

অত্যল্পকাল-ব্যবধানে, ১২৬৭ সনে, বাঙ্গলা-যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার—'মনোরঞ্জিকার' সম্পাদক ও কবি হরিশ্চন্দ্র মিত্র এ সময় 'মনোরঞ্জিকার' কম্পোজিটার ছিলেন। ইহার প্রায় তিন বৎসর কাল পূর্ব্বে ১৮৫৭। ৮ই জানুয়ারী (বাং ১২৬৪ সনে) ঢাকা নর্ম্মালস্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। নর্ম্মাল স্কুল ঢাক্যর সাহিত্যে একটা প্রেরণা দিয়াছে। এ সময়, প্রথম ছয়মাস কাল মিঃ লনার্ড ও তৎপর মিঃ এস্, সি, এরাটুন (Mr S C Aratoon) নর্ম্মালস্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং বাবু অভয়াচরণ রায় ইহার প্রথম সহকারী (Assistant) ছিলেন। অভয় বাবু "সভা স্থাপনের উপকারিতা" সম্পর্কে এক পুস্তিকা লেখেন, এবং ইহাঁরই উদ্যোগে "মনোরঞ্জিকা সভা" স্থাপিত হয়। 'মনোরঞ্জিকা' এই 'মনোরঞ্জিকা সভার'ই মুখপত্র ছিল।

'মনোরঞ্জিকা' পরিচালনকালে সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র একদিন 'কাপী' দিতে বিলম্ব করিতেছেন—হরিশ্চন্দ্র 'কাপির' প্রত্যাশায় Composing Stick হাতে লইয়া মৌনভাবে অপেক্ষায় আছেন।

তৎপর তিনি একটা কবিতা মনে মনে রচনা করিয়া, তাহাই তৎক্ষণাৎ ছাপার হরপে অক্ষরবদ্ধ (Compo) করিতে লাগিলেন। হরিশ্চন্দ্রকে কবিতা লিখিতে 'কালী কলম' লইয়া আর কসরৎ করিতে হইল না। কৃষ্ণচন্দ্র হরিশ্চন্দ্রের এ 'অকাণ্ড' ধরিয়া ফেলিলেন। তখনই সদ্য রচিত কবিতার প্রুফ (Proof) উঠিল। কৃষ্ণচন্দ্র হরিশ্চন্দ্রের কবিতা 'বাণী বন্দনা' * পড়িয়া এক খানি কবিতাময়ী পত্রিকা প্রকাশে হরিশ্চন্দ্রকে অনুরোধ করিলেন। অনুরোধ রক্ষিত হইল। 'সংবাদ-প্রভাকর'-সম্পাদক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যুর প্রায় ৩ বৎসর কাল পরে, "কবিতা-কুসুমাবলী" প্রকাশিত হইল। তৎপরে, ঢাকার প্রথম সংবাদ পত্র 'ঢাকা প্রকাশ' ও এই ১২৬৭ সনেই কৃষ্ণচন্দ্রের সম্পাদকতায় বাঙ্গলা যন্ত্রেই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এ সময় হরিশ্চন্দ্র "ঢাকা প্রকাশের" সহকারী ছিলেন। 'ঢাকা প্রকাশ' এখনও চলিতেছে। বাঙ্গলা সংবাদপত্র-সাহিত্যে "ঢাকা প্রকাশই" এক্ষণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম সংবাদপত্র। বস্তুতঃ জন্মাবধি অবিচ্ছিন্ন ভাবে বাঙ্গলার আর কোন সংবাদ-পত্র ৫৮ বৎসর কাল পরিচালিত হয় নাই। "সোম-প্রকাশের" অনুকরণেই 'ঢাকা প্রকাশে'র নামকরণ হইয়াছিল। ৺ব্রজসুন্দর মিত্র, ৺দীনবন্ধু মৌলিক, ৺ভগবান্ চন্দ্র বসু, ৺কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বাঙ্গলা-যন্ত্রের স্বত্বাধিকারীবর্গের চেষ্টাতেই 'ঢাকা প্রকাশের' প্রকাশ ঘটে। সোমপ্রকাশ সম্পাদকের এক ভাগিনেয় তখন "ঢাকা-প্রকাশের" হেড কম্পোজিটর ছিলেন, তিনি বেতন পাইতেন মাসিক ৩০৲ টাকা এবং সম্পাদক বেতন পাইতেন মাসিক ২৫৲ টাকা মাত্র।

এই ১২৬৭ সনেই বাঙ্গলা-যন্ত্রে আর একখানি মাসিক পত্রিকা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার নাম "নবব্যবহার-সংহিতা", নামেই আমরা পত্রিকার পরিচয় পাইতেছি। ইতঃপূর্ব্বে বাঙ্গলা ভাষায় ব্যবহার-শাস্ত্রের আর কোন মাসিক পত্র সম্ভবতঃ প্রকাশিত হয় নাই।

নব ব্যবহার সংহিতায় "আইন, সারকুলার অর্ডার ও অন্যান্য বিধি প্রকাশিত হইত"। ইহার মূল্য ছিল বার্ষিক অগ্রিম ৪৲টাকা।

৺রামচন্দ্র ভৌমিক ইহার সম্পাদক ছিলেন। "বাঙ্গলা যন্ত্র" প্রতিষ্ঠার পরে,—রামচন্দ্র বাঙ্গালায় আইনের অনেক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা দীননাথ ঢাকার একজন মোক্তার ছিলেন। রামচন্দ্র সেই স্থানে থাকিয়া প্রথম জীবনে বাঙ্গলা-যন্ত্রের কম্পোজিটারের

*(১) এই কবিতাটীর প্রথম দুইটী পংক্তি এইরূপ —
'নিন্দি নিশানাথ নিভা, কবিতা দেবীর কিবা
লালিত্য লাবণ্য নিরমল।'
সম্পূর্ণ কবিতাটী 'ঢাকা রিভিও ও সম্মিলন' পত্রের গত নবেম্বর ও ডিসেম্বর সংখ্যায় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে।

কর্ম্ম করিতেন, তৎপর তিনি ঢাকা-প্রকাশেরও অন্যতম স্বত্বাধিকারী হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি জিলার জজসাহেবের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইয়া ওকালতিও করিতেন।

১২৬৭ সনে বিক্রমপুরের পল্লীগ্রাম হইতেও মাসিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। বিক্রমপুর কুকুটিয়ার ৺কৈলাসচন্দ্র সরকারের উদ্যোগে দুইখানা মাসিক পত্রের আবির্ভাব ঘটে। এই দুইখানি পত্রিকার নাম "সংস্কার সংশোধিনী" ও জ্ঞানপ্রসাবনী'। জ্ঞানপ্রসবিনী কুমিল্লায় এবং সংস্কার-সংশোধিনী কুকুটিয়ায় প্রকাশিত হইত। উভয় মাসিক পত্রই কুমিল্লায়—'বীরযন্ত্রে' মুদ্রিত হইত। মুদ্রা-যন্ত্রের অভাবে 'জ্ঞান প্রসবিনী' প্রথমতঃ মুদ্রিত হইতে পারিত না, হাতে লিখিয়াই ইহা প্রথম প্রকাশ করা হইত। এইরূপে ৩।৪ বৎসর কাটিবার পর ১২৬৭ সনে মুদ্রিত 'জ্ঞান-প্রসবিনী'র প্রকাশ ঘটে।

'ঢাকা-প্রকাশে'র যখন প্রথম প্রকাশ হয়, তখন ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিবিধার্থ সংগ্রহের' সম্পাদক। ঢাকা-প্রকাশের সমালোচনা-ব্যপদেশে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল। 'ঢাকাপ্রকাশ' তখন সর্ব্বপ্রকারেই 'সোম প্রকাশের' সমকক্ষ ছিল। ফলে, সেই সময়ে 'ঢাকপ্রকাশে'র সমালোচনা করিতে গিয়াও তিনি ঢাকার প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

অন্যান্যকথা

"ঢাকা প্রকাশ"—সোমপ্রকাশের অনুকরণে ঢাকায় উক্তনামে একখানি সংবাদ-পত্র প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। অনেক বিষয়ে ঢাকাবাসীরা কলিকাতার নাগরিকদিগকে লজ্জিত করিয়াছেন; যদি কখনও বঙ্গশ্রী সৌভাগ্যবতী হন, তাহা হইলে ঢাকাবাসিগণই সর্ব্বপ্রথম লক্ষিত হইবেন। আমরা সহৃদয়বর্গকে অনুরোধ করি—তাঁহারা নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম মধ্যে—ঢাকাপ্রকাশ গ্রহণও একটা প্রধান বলিয়া গণ্য করুন।"

ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সমালোচনা

(বিবিধার্থ-সংগ্রহ ৭৫ খণ্ড, শকাব্দ ১৭৮৩। আষাঢ়)।

ঢাকা সেই সময় সাহিত্য-চর্চ্চার একটা প্রধান কেন্দ্র ছিল। তাই মুদ্রাযন্ত্র-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই ঢাকায় তিনখানা মাসিক পত্র ও একখানা সংবাদ-পত্র প্রকাশিত হইতে পারিয়াছিল। আমাদের বিশ্বাস ডাঃ রাজেন্দ্রলাল ঢাকাপ্রকাশের সমালোচনায় প্রসঙ্গতঃ ঢাকার প্রশংসা কীর্ত্তনে সেই কথারই ইঙ্গিত করিয়াছেন। ঢাকায় সংবাদ-পত্র সাহিত্যে কৃষ্ণচন্দ্র ও হরিশ্চন্দ্র পথ-প্রদর্শক। আলোচ্য বৎসরেই ইঁহাদের কর্ম্মজীবন নিঃশেষিত হয় নাই। এই সকল বিষয় বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্যের বহির্ভূত হইলেও প্রসঙ্গক্রমে অতিসংক্ষেপে ইঁহাদের সাহিত্যিক কর্ম্ম-জীবনের পরবর্ত্তী কালের দুই একটী কথা এস্থলে উল্লেখ করিব।

সংবাদপত্র-সাহিত্যের স্থিতি ও বিস্তৃতি

১২৭১ সনে কৃষ্ণচন্দ্র ও হরিশ্চন্দ্র বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। এই বৎসর কৃষ্ণচন্দ্র "ঢাকা-প্রকাশেই" রহিলেন কিন্তু হরিশ্চন্দ্র সাপ্তাহিক 'হিন্দুহিতৈষিণী' পত্র প্রকাশ করেন। সুয়াপুরের ৺বরদাকিঙ্কর রায়, জগন্নাথ চৌধুরী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের চেষ্টায় 'হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী' সভা স্থাপিত হয়। এই সভার কর্ত্তৃত্বাধীনে ও হরিশ্চন্দ্রের সম্পাদকতায় সাপ্তাহিক 'হিন্দুহিতৈষিণী' পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৭৬৮ শকের ২২শে অগ্রহায়ণ ৺ব্রজসুন্দর মিত্রের চেষ্টায়, তাঁহারই কুমারটুলীস্থ বাসভবনে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ('তত্ত্ববোধিনী' ১৭৬৯ শক। ১মভাগ, ৩৪ সংখ্যা, দ্বিতীয় কল্প, ১৪৫পৃঃ)। তখন "ঢাকা-প্রকাশ" ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র এবং 'হিন্দুহিতৈষিণী' হিন্দুসমাজের মুখপত্র হইল। ঢাকাপ্রকাশ প্রত্যেক রবিবার এবং হিন্দুহিতৈষিণী প্রত্যে ক সোমবার প্রকাশিত হইত। উভয় পত্রে বেশ প্রতিযোগিতা চলিত। তৎপর বালিয়াটীর সাহাবাবুদের

চেষ্টায় ও কৃষ্ণচন্দ্রের সম্পাদকতায় সাপ্তাহিক পত্র 'বিজ্ঞাপনী' প্রকাশিত হয়। হরিশ্চন্দ্রও হিন্দুহিতৈষিণী ছাড়িয়া একে একে "ঢাকা-দর্পণ" (সাপ্তাহিক), "পল্লীবিজ্ঞান" (সাপ্তাহিক), "অবকাশরঞ্জিকা" (মাসিক), ১২৭০ সনে "কাব্য প্রকাশ", ১২৭৮ সনে মিত্রপ্রকাশ প্রভৃতি সংবাদ পত্র বা মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। এস্থলে আরও একটী কথা বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। বাঙ্গলা সাহিত্যে শ্রীরামপুরের মিসনারী সাহেবদিগেরও অন্যান্য কয়েকজন ইউরোপীয় লেখকের প্রভাবের বিষয় আপনারা সকলেই অবগত আছেন। এই সময়ে ঢাকার সাহিত্যের ইতিহাসে আমরা একমাত্র মিঃ এরাটুনের নামই উল্লেখ করিতে পারি—(কার্য্যকাল ১৮৫৭ ডিসেম্বর ১৮৭১ খৃঃ অঃ)। মিঃ এরাটুন বাঙ্গলা সাহিত্যে কৃতবিদ্য এবং হরিশ্চন্দ্রের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি স্বয়ং ইঁহার গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিতেন।

কৃষ্ণচন্দ্র ও হরিশ্চন্দ্র সংবাদ-পত্র-সাহিত্যের যে যুগ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ঢাকার সাহিত্যে তাহার প্রভাব দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ঢাকার সংবাদ-পত্র-সাহিত্যের আমূল বিবরণ প্রদান আমাদের অভিপ্রেত নহে; তথাপি আমাদের পূর্ব্বোক্ত মত পাছে বিনা সমর্থনে কেহ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত না হন, এই আশঙ্কায় আমরা দুইখানা সংবাদ পত্রের দুইটী স্থল এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া আমাদের পূর্ব্ব মত সমর্থনের চেষ্টা করিব। ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে বা ঢাকার প্রথম সংবাদ-পত্র ঢাকাপ্রকাশ প্রকাশের প্রায় ১৫বৎসর পরে, ঢাকার "East" পত্রে বাঙ্গলা সংবাদ পত্র "ঢাকা দর্শকের" এই সমালোচনাটী প্রকাশিত হইয়াছিলঃ—

সংবাদ পত্র সাহিত্যের অব্যাহত উন্নতি

"A pice-paper. We welcome the appearance of a pice-paper, "Dacca Darshaka." We wish our co[illegible]porary every success. This is the third attempt at publishing a pice paper from here. The object of the paper is no doubt the good of the masses and we hope it will succeed in doing some good in that direction" (The "East," Aug, 8, 1875.) এই সমালোচনায় দেখা যায়, ১৮৭৫ খৃঃঅব্দের পূর্ব্বেও আরও দুইখানি এক পয়সা মূল্যের সংবাদ-পত্র ঢাকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে বা মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠার[illegible] প্রায় ১৫বৎসরের মধ্যেই ঢাকায় এরূপ একপয়সা মূল্যের তিনখানা পত্র প্রকাশ সামান্য কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে।

১২৭৯ সনে 'মধ্যস্থ'-পত্রে (১) আরও একখানা রাজনৈতিক সংস্কৃত পাক্ষিক পত্রের বিষয় জানিতে পারিতেছি। এই পত্রসম্বন্ধে আমরা ব্যক্তিগত কোন মতামত প্রকাশ না করিয়া, 'মধ্যস্থে'র সমালোচনাই এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"সংস্কৃত-সঞ্জীবনী পত্রিকা (পাক্ষিক)—আমরা এই নবোদিতা পাক্ষিক পত্রিকার তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। বঙ্গদেশে এক্ষণ যত নগরী শ্রীসম্পন্ন আছে, তন্মধ্যে ঢাকা অতি প্রাচীনা ও সর্ব্বপ্রধানা। ঢাকাবাসী আধুনিক কৃতবিদ্য সম্প্রদায় রাজধানীস্থ তদ্রূপ জনগণ অপেক্ষাও কোনো কোনো বিষয়ে অধিক উদ্যমশালী।

নিরবচ্ছিন্ন সংস্কৃত-ভাষাতে উক্ত পত্রিকা প্রকাশিত হওয়াতে, ঢাকার গৌরব আরো বৃদ্ধিকে প্রাপ্ত হইয়াছে। যদিও বঙ্গদেশে বঙ্গভাষাতেই পত্রাদির প্রচার নিতান্ত আবশ্যক; কিন্তু রাজকীয় ও সামাজিক যে যে বিষয় অধুনা লিখিত হইতেছে, সেই প্রকার প্রসঙ্গ এই পত্রিকায়

(১) সুপ্রসিদ্ধ লেখক ও নাট্যকার—৺মনোমোহন বসু ইহার সম্পাদক ছিলেন।

সংস্কৃত ভাষায় পাঠ অতীব চিত্তহর ও সুশ্রাব্য।"

("মধ্যস্থ," শকাব্দা ১৭৯১। ইংরাজী ১৮৭৯। ১লা এপ্রিল)।

অতঃপর সংবাদপত্র ছাড়িয়া (১)* আমরা এক্ষণ 'গ্রন্থ প্রকাশ' প্রসঙ্গ উত্থাপন করিব।

(২) গ্রন্থ-প্রকাশ।

আলোচ্য বৎসরে ঢাকায় কোন্ কোন্ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল, এখনও তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। সুতরাং এ প্রবন্ধে তাহার নির্ঘণ্ট প্রদান এক্ষণ সম্ভবপর নহে। ১২৬৭ সনে ঢাকাপ্রবাসী দুইজন লেখকের যে দুইখানি গ্রন্থ সাহিত্যে স্থায়ী স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, এ প্রবন্ধে সেই দুইখানি গ্রন্থসম্পর্কেই সংক্ষেপে দুই একটী কথা বলিয়া উপসংহার করিব। এই গ্রন্থদ্বয়ের নাম (১) কৃষ্ণচন্দ্রের "সদ্ভাব-শতক" ও (২) দীনবন্ধুর "নীলদর্পণ"। 'ঢাকার কবি' কৃষ্ণচন্দ্র যখন "ঢাকা প্রকাশ" সম্পাদক ছিলেন, সেই সময়েই "সদ্ভাব-শতক" প্রকাশিত হয়। ঢাকা প্রবাস কালে কৃষ্ণচন্দ্র লালমোহন বসাকের নিকট পার্শী-ভাষা অধ্যয়ন করেন। প্রধানতঃ কবি হাফেজের কোন কোন কবিতার মর্ম্মাকর্ষণ করিয়া বা কবির স্বকপোল কল্পনায় ১০০টী খণ্ড কবিতায়, তিনি "সদ্ভাব শতক" গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। "সদ্ভাব শতকের কোন কোন কবিতা কবি হরিশ্চন্দ্র লিখিয়া দিয়াছিলেন"। *(২) সদ্ভাবশতকের অন্যূন ৬০টী কবিতা গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব্বে "কবিতাকুসুমাবলী"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বাঙ্গলা সাহিত্যে ইতঃপূর্ব্বে আর কেহ পার্শী কবিতার রস সংগ্রহ করেন নাই।

১৮৬০ খৃঃ অব্দে বা ১২৬৭ সনেই বিক্রমপুর-গৌরব ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মহাশয় "হিন্দুপেট্রিয়ট" পত্রে নীলকর সাহেবদিগের বিরুদ্ধে একটী প্রবন্ধ লিখেন। ইতঃপূর্ব্বে সম্ভবতঃ আর কেহই নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন নাই। প্রথমাবধি হিন্দু পেট্রিয়ট, তত্ত্ববোধিনী, তৎপর ঢাকাপ্রকাশ এবিষয়ে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেন। দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় এ সময় ঢাকা বিভাগে Inspecting পোষ্ট মাষ্টার ছিলেন। ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলে এ সময় অতিমাত্রায় নীলের চাষ হইত। এতদ্দেশের অনেক স্থানে নীলের কুঠি এখনও বর্ত্তমান রহিয়া অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। দীনবন্ধুবাবুর জন্মভূমি নদীয়া (আধুনিক যশোহর) চৌবেড়িয়াতেও নীলের উপদ্রব ছিল। এই সময় ঢাকাতে মিঃ ওয়াইজ একজন প্রধান নীলকর ছিলেন। তাহার জমিদারীতে আয় ছিল ১৪।১৫ লক্ষ টাকা।

নীল দর্পণ

*(১) প্রসঙ্গক্রমে আমরা, এই সময়ের (১২৬৭ সনের) কলিকাতার সাহিত্য সম্পর্কে দুই একটী কথা বলিতে পারি। আলোচ্য বৎসরে কলিকাতায় "বিজ্ঞান কৌমুদী" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই বৎসরে মধুসূদনের তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, রাজেন্দ্র লাল মিত্রের 'শিবাজী ও শিল্পিক দর্শন, মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের 'জীবরহস্য' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। আধুনিক কালে প্রত্যেক বৎসরই যেরূপ ভূরি ভূরি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে তাহা হইত না।

(২)* "এইক্ষণ কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করিতেছি, আমার পরম মিত্র শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র মিত্র মহাশয় এই গ্রন্থ প্রণয়নে যথোচিত সাহায্য প্রদান করিয়াছেন এবং কোন কোন কবিতা তিনি স্বয়ং রচনা করিয়া দিয়াছেন। তাহার সরস লেখনী সংসৃষ্ট না হইলে আমি এতদ্ গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত করিতে সাহসী হইতে পারিতাম না। * *

ঢাকা বাঙ্গলা যন্ত্র
২লা ফাল্গুন। ১৭৮২ শক } শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

সদ্ভাবশতক (১ম সংস্করণ), বিজ্ঞাপন।

মিঃ কেমারণ, মিঃ পোগোজ, মিঃ গ্রিশ ও নবাব খাজে আবদুলগণি সাহেবের চেষ্টায় ১৮৬২ খৃঃ অব্দে "ঢাকা নিউস্" (Dacca News) নামে একখানা নীলকরগণের (Planters' Journal) ও বাহির হইয়াছিল। এ সময় ঢাকাতে নীলকর সাহেবদিগের প্রবল প্রতাপ ছিল।

এরূপ অবস্থায় ঢাকায় নীলদর্পণ মুদ্রণ ও প্রকাশ এবং সর্ব্বপ্রথম অভিনয় করণ স্পষ্টই নির্ভীকচিত্ততার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

ঢাকা বাঙ্গলা যন্ত্রে নীল দর্পণ মুদ্রিত হয়। নাট্যকলার দিক্ দিয়া বিচার করিলে, নীলদর্পণ নির্দ্দোষ নহে। প্রথমতঃ ১২৬৭ সনের 'কবিতাকুসুমাবলী'তেই ইহার সমালোচনা বহিয়াছে। (১) তৎপর পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ও কএকটী যুক্তি প্রদর্শন করিয়া এই কথারই পূর্ণ সমর্থন করিয়াছেন। কৌতুহলী পাঠকবর্গের তৃপ্ত্যর্থে আমরা এ স্থলে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের যুক্তি কএকটীও নিম্ন টীকায় উদ্ধৃত করিয়া দিলাম (২)।

এরূপ ক্ষেত্রে নীলদর্পণের মুদ্রাকর ও প্রকাশক ভবিষ্যৎ বিপদের সম্ভাবনা জানিয়া শুনিয়াও, নির্ভীক হৃদয়ে নীলদর্পণ মুদ্রণ ও প্রকাশ করেন। বাঙ্গলা নাট্য-সাহিত্যের সহৃদয়তার অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ "নীলদর্পণ" জন সমাজে প্রচারের সুযোগ করিয়া দিয়া তাঁহারা যে অসাধারণ নির্ভীকতা ও সাহিত্য প্রীতি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়।

নীলদর্পণ প্রকাশে বা প্রচারে যাঁহারা লিপ্ত ছিলেন তাঁহারা কোন না কোন প্রকারে লাঞ্ছিত হইয়াছেন *। ঢাকায় নীলদর্পণের সংস্রবে ইহার মুদ্রাকর, প্রকাশক, বা অন্য কোন ব্যক্তি কোন প্রকারে লাঞ্ছিত হইয়াছেন, কিনা এখনও আমরা তাহার সঠিক বিবরণ প্রাপ্ত হই নাই।

---

* "নীলদর্পণ—এই নাটক ঢাকা বাঙ্গলা যন্ত্রে রামচন্দ্র ভৌমিক কর্ত্তৃক প্রকাশিত"। বিবিধার্থ সংগ্রহ, ১ম পর্ব্ব, ২য় কল্প, ১৭৮৩ শকাব্দা পৃঃ ৪৮।

(১) 'কবিতাকুসুমাবলী'ও ঐ সময়ে বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইত। 'কবিতাকুসুমাবলী'র সমালোচনা—"নীল দর্পণ নাটক—এইগ্রন্থে নীলকরদিগের অত্যাচার সুন্দর রূপে বিবৃত হইয়াছে। যদ্যপি ইহাতে বিশেষ কোন চাতুর্য্য লক্ষিত হয় না, কিন্তু গ্রন্থকারের সহৃদয়তা নিবন্ধন এতৎপাঠে পাঠকেরা কথঞ্চিৎ তুষ্টিলাভ করিতে পারেন, স্থানে স্থানে অপ্রাসঙ্গিকতা দোষ না ঘটিলে, নাটকখানি উৎকৃষ্ট হইত। গ্রন্থকর্ত্তা আপনার নাম প্রকাশ করেন নাই, সুতরাং আমরা পাঠকবর্গকে তাঁহার পরিচয় প্রদান করিতে পারিলাম না" 'কবিতাকুসুমাবলী,' ১৪৪ পৃষ্ঠা ১২৬৭। ১ম পর্ব্ব, ১০ম সংখ্যা, ফাল্গুন।

(২) "নীলদর্পণ করুণরসপূর্ণ হইলেও ইহা যে, নাটকাংশে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে, তাহা বলা যাইতে পারে না। কারণ, নাটকের সকল অংশই অভিনেয় হওয়া উচিত, কিন্তু প্রজাদিগের উপর শ্যামচাঁদ ও রামকান্তের প্রহার, গর্ভবতী ক্ষেত্রমণির উদরে মুষ্ট্যাঘাত, উড়নি পাকান দড়িতে গোলকচন্দ্রের মৃতদেহ দোদুল্যমান রাখা, গলা টিপিয়া সবিতাকে হত্যা করা প্রভৃতি কাণ্ড সকল অভিনীত হইতে পারে না। ইংরেজি নাটকে এ সকল সম্পূর্ণরূপে দোষাবহ হয় না বটে, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ওরূপ কাণ্ড সকল, রঙ্গস্থলে দর্শকদিগের উদ্বেজক হয় বলিয়া, নেপথ্যে সম্পাদন করিয়া সংস্কৃত নাটকরীতির অনুসরণ করাই কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন নীলদর্পণে কোন কোন অযোগ্যস্থলে সাধুভাষা সমন্বিত বক্তৃতা আছে, সে গুলি স্বভাবসঙ্গত নহে। তা ছাড়া গ্রন্থকার অকারণেও ২।১টী পাত্রকে রঙ্গস্থলে আনিয়াছেন, দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে দুইজন অধ্যাপককে রঙ্গভূমিতে আনিবার কোন কারণ আমরা দেখিতে পাইলাম না।—'বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব', দ্বিতীয় সংস্করণ—২৫০—২৫২ পৃঃ।

ঢাকাতেই সর্ব্ব প্রথম নীল দর্পণ অভিনীত হয় (২)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নাট্য-সাহিত্যের দিক দিয়া বিচার করিলে, নীলদর্পণ দোষস্পর্শশূন্য নহে। ৺পানীবাবু বা ৺গঙ্গা গোবিন্দ গুপ্ত ও অন্যএকজন নাট্যসাহিত্য সেবী ঢাকায় নীলদর্পণ অভিনয়ের পূর্ব্বে ইহার আবশ্যকানুরূপ পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন করিয়া লইয়াছিলেন। এ ব্যাপারে পানীবাবুই প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। গঙ্গা গোবিন্দবাবুর সংশোধিত সেই "নীলদর্পণ" খানি আমরা এখনও সযত্নে রক্ষা করিতেছি। ইহা সত্য সত্যই ঢাকার নাট্য-সাহিত্যের গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতির অমর নিদর্শন। নীলদর্পণ প্রকাশে সমাজ ও সাহিত্যের যে মহদুপকার সাধিত হইয়াছে, ঢাকা সর্ব্বপ্রকারেই তাহার আনুকূল্য করে নাই কি? দীনবন্ধুবাবুর ও কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিষ্ঠার

উপসংহার

মূলীভূতকারণ "নীলদর্পণ" ও "সদ্ভাবশতক" মুদ্রণ ও প্রকাশ করি নিশ্চিতই ঢাকা সেই গৌরব, সেই সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার ফলভাগী হইয়াছে। তারপর, যখন মনে করি ইহাদের প্রকাশ-কালে ঢাকার সবে মাত্র গ্রন্থপত্র মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখন হৃদয়ে একটা বিপুল বিস্ময়ের তরঙ্গ বহিয়া যায়।

শ্রীগিরিজাকান্ত ঘোষ।

---

* (১) "যে যে ব্যক্তি ইহাতে (নীলদর্পণে) লিপ্ত ছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই কিছু কিছু বিপদ্‌গ্রস্থ হইয়াছিলেন। ইহার প্রচার করিয়া লংসাহেব কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, সীটন কার অপদস্থ হইয়াছিলেন। ইহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত গোপনে তিরস্কৃত ও অপমানিত হইয়াছিলেন" ইত্যাদি। বঙ্কিম বাবুর দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী ৮ পৃঃ।

(২) The Dacca correspondent of the Harkara of the 12th June, 1861, wrote :— "Our native friends entertain themselves with occasional theatrical performances, and the *Nil Darpan* was acted on one of these occasions"

—pp 83 (Lalit Mitter's Edition)

(৩) "Mr Peterson—I believe, you have considerable experience with regard to native customs and manners.

Mr Forbes—I have.

Mr Peterson—Is the drama a particular mode of representing or expressing the state of society among the Bengalees ?

Mr Forbes—It is.

Mr Peterson—Is the drama a favourable mode of depicting the seveval states of native society ?

Mr Forbes—Yes.

Mr Peterson—I believe *Dacca is a famous place for the getting up dramas of* this kind, and the people there take a peculiar interest in it.

Mr Forbes—Yes, they do.

উচ্চ শিক্ষার পদ্ধতি

বর্ত্তমানে ভীষণ যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিয়াও ইংলণ্ড প্রমুখ দেশ শিক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট ও বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যপ্রণালী অনুসন্ধান ও উন্নতির পথ নির্দ্দেশ করিতে একটী বিশেষজ্ঞ-গঠিত কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয়, আমাদের দেশে এই সুযোগেও শিক্ষাপদ্ধতির যথোপযুক্ত আলোচনা হইতেছে না।

সর্ব্বদেশেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা উচ্চ শিক্ষার বিস্তার হইয়া আসিতেছে, বিভিন্ন যুগে উহার আদর্শের কিরূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই বিষয়ের আলোচনা করিব।

আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কালে "তক্ষশীলা", "নালন্দ", 'বিক্রমশীলা,' 'বারাণসী', ওদন্তপুরী, 'নবদ্বীপ' প্রভৃতি স্থানে উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান ছিল। তন্মধ্যে তক্ষশীলা, বারাণসী ও নবদ্বীপে প্রকৃত পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। বিবিধ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ বিদ্যার্থীদিগকে যথোপযুক্তরূপে শিক্ষা প্রদান করিতেন। এবং তাঁহাদের গভীর পাণ্ডিত্য ও যশো-গৌরবে নানা দিগ্দেশ হইতে বহু ছাত্র আকৃষ্ট হইত। কিন্তু নালন্দ বিক্রমশীলা ও ওদন্তপুরীর শিক্ষামন্দিরগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয় বলা যাইতে পারে। সে সকল কেবল জ্ঞান বিস্তারের কেন্দ্র ছিল না, তাঁহাদের এক একটী সমষ্টিগত সামাজিক জীবনও ছিল। এই সকল মন্দির তৎকালীন ভারতবাসীগণের আশা ও শক্তির তীর্থক্ষেত্ররূপে পরিণত হইয়াছিল। এবং ইহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া ভারতবর্ষ এক বৃহৎ জ্ঞান-সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিল। এই সকল বিদ্যালয়ের বিস্তৃত বিবরণ এক স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচিত হওয়া আবশ্যক। আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে লোভনীয় পন্থা পরিত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য জগতের শিক্ষাপ্রণালীর আলোচনা করিব।

ইউরোপের সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করিতে হইলে ভূমধ্য সাগরের দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ভূ-খণ্ডের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। সভ্যতার আদি লীলাভূমি মিশরে কি প্রণালীর শিক্ষাপদ্ধতি ছিল তাহার যথোপযুক্ত বিবরণ জানা যায় নাই। প্রাচীন যুগের অন্যান্য দেশের ন্যায় যুদিয়া ও মিশরে শিক্ষালয়গুলি ধর্ম্মযাজক কর্ত্তৃক পরিচালিত হইত। ইহুদিগণ বিজ্ঞানে বিশেষ উন্নত হইয়াছিলেন, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু নীল-উপত্যকার শিক্ষাগুরুদিগের নিকট পাশ্চাত্য জগৎ বিশেষ ভাবে ঋণী। চতুর্দিকস্থ দেশসমূহের উপর তাহার প্রভাব অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল; এমন কি, গ্রীসের প্রাচীন কালের পণ্ডিতগণ মিশরের জ্ঞান ভাণ্ডার আয়ত্ত করা অবশ্য কর্ত্তব্য মনে করিতেন। এই যুগে শিক্ষার ব্যবস্থা বিভিন্ন দেশে থাকিলেও গ্রীক্‌গণই ইহাকে একটী বিজ্ঞানে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকল শিক্ষণীয় বিষয়কে সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত করিতেন—সঙ্গীত ও ব্যায়াম। সঙ্গীত বলিতে তাঁহারা সকল প্রকার মানসিক, ও ব্যায়াম বলিতে সকল প্রকার শারীরিক শিক্ষা বুঝিতেন। গ্রীসের জাতীয় অভ্যুদয়ের প্রথম যুগে থেমিষ্টক্লিস্‌ এরিষ্টাইডিস্‌ প্রভৃতি নেতৃবর্গ স্বদেশের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহারা যোদ্ধা ছিলেন এবং তখন রাজনীতি সামরিক পণ্ডিত্যের নিম্নে স্থান পাইত। এবং সেই জন্য শিক্ষা-প্রণালীতে সঙ্গীত অপেক্ষা ব্যায়ামের আদর অধিক ছিল। কিন্তু পেরিক্লিস্‌ যখন শান্তির সহিত আভ্যন্তরিক উন্নতি সাধন করিতেছিলেন, তখন রণনীতি অপেক্ষা রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধিক সমাদৃত হইল, যুদ্ধাদির আবশ্যকতাও ক্রমে কমিয়া আসিতে লাগিল। পূর্ব্বে জনসাধারণ স্বভাবতঃই দেশের সেবার জন্য আত্মদান করিতে প্রস্তুত থাকিত, কিন্তু কালক্রমে স্বদেশ সেবার সে আগ্রহ শিথিল হইয়া পড়িল।

দেশের লোকদিগকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য বাগ্মিতার আবশ্যক হইত। এই জন্য জননায়কদিগকে নানা প্রকার বাক্ চাতুর্য্য ও যুক্তি তর্কের অবতারণা করিতে হইত। এই সকল কারণে এই যুগে বিবিধ বিদ্যা, বিশেষতঃ বাগ্মিতার প্রভূত উন্নতি লাভ হইয়াছিল। এই সকল বিদ্যা চর্চ্চার উদ্দেশ্য ছিল, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পারদর্শিতা লাভ করা। ডিমোস্থিনিস্, এসাইনিস্ প্রভৃতি রাজনীতির নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। ক্রমে রাজনৈতিক জীবন অবসন্ন হইয়া পড়িল। সাম্রাজ্য স্বরাজ প্রভৃতি একে একে চলিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু বহির্জীবনের এ সকল ব্যর্থতার মধ্যেও পেরিক্লিসের যুগে ভাবরাজ্যে যে নবজাগরণের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা অব্যাহত ভাবে কার্য্য করিতে থাকিল।

সক্রেটিস্ প্রভৃতি যাহার জন্য নির্য্যাতিত হইয়াছিলেন, এই সময়ে এথেন্সবাসীগণ সেই স্বাধীন চিন্তাকে সাদরে বরণ করিয়া লইল। নিঃসঙ্কোচে ধর্ম্ম ও নীতির সমালোচনা চলিতে লাগিল। রাষ্ট্রীয় প্রাধান্যের দিনে অবাধ চিন্তার স্থান ছিল না। এখন আর কেহ রাজকার্য্যে যোগদানের সুযোগ না পাইলে জীবন ব্যর্থ মনে করিত না। এখন কেহ প্লেটোর ন্যায় দর্শন শিক্ষক, কেহ আইসক্রেটীসের ন্যায় ভাষা ও বক্তৃতা শিক্ষক, কেহ বা এরিষ্টটলের ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, আবার কেহ বা এপিকিউরাসের ন্যায় নূতন নীতিশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক হইলেন। দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনার জন্য যে সকল বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে প্লেটোর বিদ্যালয় সর্ব্বপ্রধান। প্লেটোই সর্ব্বপ্রথম শিক্ষাবিজ্ঞানের সূত্রপাত করেন। তাঁহার বিদ্যালয়ে কার্য্যকরী বিদ্যাদানের ব্যবস্থা ছিল না। তিনি ভাবরাজ্যে বাস করিতেন ও ভাবের রাজ্য গড়িতেন। কিন্তু আইসক্রেটীসের সময়ে শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্ত্তন হয়। তিনি বিশেষ ভাবে সাহিত্য চর্চ্চা করিতেন বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ উচ্চ শিক্ষাও দিতেন, সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গের আলোচনার সঙ্গে সংযোজিত সামাজিক, নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয়ের আলোচনা করিতেন। এইরূপে ক্রমে শিক্ষাপ্রণালীতে বিশ্বজনীন ভাব প্রবেশ লাভ করিতে থাকে। এই ভাব এরিষ্টটলের সময়ে সর্ব্বাধিক পুষ্টিলাভ করে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে নিখিল বিদ্যা-চর্চ্চার আয়োজন হইল। সমগ্র গ্রীস এতদিন কেবল মাত্র গ্রীস্বাসীর অন্তঃকরণে নগরে নগরে, কি[illegible], আইওনিয়া, মিলেটাস্ প্রভৃতি স্থানে নানা হৃদয়ে যে যে চিন্তা জাগাইয়াছে এবং সকলের ভিতর দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি রূপে যে নব সত্য দান করিয়াছে, বিশাল সাম্রাজ্য এখন যে যে নূতন ভাব মানুষের মনে অঙ্কিত করিতেছে, আলেকজান্দারের এর শিক্ষক এরিষ্টটল তাহার লিসিয়াম্ বিদ্যালয়ে এই সমস্ত ভাব শক্তিকে এক স্থানে পুঞ্জীভূত করিয়াছিলেন।

এরিষ্টটল্ তাঁহার গুরুর ন্যায় ভাবরাজ্যে বাস করিতেন না, তিনি বাস্তব লইয়া থাকিতেন। তাঁহার আলোচনার ফলে বিবিধ বিদ্যা সুসম্বদ্ধ হইয়া বিজ্ঞানে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার আলোচ্য বিষয় সমূহকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১ম) মানব সম্বন্ধীয় জ্ঞান — (২য়) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান। প্রথমোক্ত বিষয়ে এমন কোনও বিদ্যা নাই যাহা তাহার দ্বারা আলোচিত হয় নাই। অধিকাংশ বিষয়ে তাঁহার সিদ্ধান্ত অদ্যাপি স্বীকার্য্য। তিনি মানসিক ও নৈতিক বিষয়গুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি তাঁহার চিন্তাশক্তি জড় জগতের সত্য নির্দ্ধারণেও নিয়োগ করিয়াছিলেন। প্রথমে তাঁহার শিক্ষাপ্রণালী একটু ভিন্ন প্রকারের থাকিলেও তিনি পরে ছাত্রদিগকে সর্ব্ব বিদ্যা বিভূষিত করিতে যত্ন করিতেন। কোনও একটা লক্ষ্য সাধনের জন্য শিক্ষাদান তাঁহার রীতিবিরুদ্ধ ছিল।

তৎপরে খ্রীষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে ও তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে শিক্ষা প্রণালীর একটী গুরুতর পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। ডিমোস্থিনীস্ ও এরিষ্টটলের যুগে শিক্ষা সাধারণ জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন

হইয়াছিল। তৎপর সুধীগণ নিভৃতে জ্ঞান চর্চা করিতেন। ইহার ফলে একদিকে যেমন একদেশদর্শিতা দেখিতে পাই, আবার অন্যদিকে চিন্তা সমূহ বিক্ষিপ্ত না হইয়া ঐক্য ও সামঞ্জস্য লাভ করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছিল।

গ্রীস্ এখন আর স্বাধীন নহে। ইহা প্রথমে মাসিদন ও পরে রোমের করতলগত হয়। অবশ্য গ্রীসের গবেষণা ইউরোপীয় দার্শনিক চিন্তার মূল প্রস্রবণ। ইউরোপ বিভিন্ন যুগের মধ্যদিয়া যে সকল বিষয়ে সার্থকতা লাভ করিয়াছে, তাহার মধ্যে ভাবনাজো যুক্তিমূলক বিজ্ঞান এবং কর্মজীবনে স্বায়ত্তশাসন এই দুইটী প্রধান। এই দুইটী ফলই এথেন্সের দান।

শিক্ষা বিষয়ে সর্ব্ব প্রকার স্বাধীনতা এই যুগের বিশেষত্ব। পণ্ডিতগণ স্ব স্ব প্রবৃত্তি অনুসারে শিক্ষা দিতেন; তাহাতে কোনও প্রকার বিধি নিষেধ ছিল না এবং বিদ্যালয়ের পরিচালনা বিষয়ে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করিতেন না। ধনী বিদ্যোৎসাহী পণ্ডিতগণ উঁহাদের ব্যয়ভার বহন করিতেন। ক্রমে বিদ্যালয়গুলি স্থায়ী হওয়াতে, এথেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়া তৎকালীন পাশ্চাত্য জগতের রাজধানী হইয়াছিল।

খ্রীষ্ট পূর্ব্ব একশত ছয় চল্লিশ অব্দে গ্রীস্ রোমক সাম্রাজ্যের একটী প্রদেশে পরিণত হয়। কিন্তু রোম গ্রীস্‌কে অধীনতা পাশে বদ্ধ করিতে যাইয়া আপনি বদ্ধ হইয়া পড়িল। রোম গ্রীসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। গ্রীস জয়ের পূর্ব্বেও রোমের নিজস্ব এক শিক্ষানীতি ছিল, কিন্তু তাহাকে উচ্চ শিক্ষা বলা যাইতে পারে কিনা সন্দেহ। গ্রীসের নিকট হইতে রোম চিন্তা ও দর্শন গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু রোমীয়দের হস্তে ইহার বিলক্ষণ পরিবর্ত্তন ঘটে; কারণ, পারিপার্শ্বিক ভাব ও শক্তি সমূহের পরিবর্ত্তন অনুসরণ করিয়া মানবজীবনের অভিব্যক্তি পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত হয়। উদ্ভিদ্ ও ইতর জন্তু যেমন বেষ্টনের প্রভাবে রূপান্তর লাভ করে, বিবিধ শক্তিপুঞ্জের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া, বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ করে, মানবও সেইরূপ বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে পতিত হইয়া জীবনের বিভিন্ন অভিব্যক্তির পরিচয় প্রদান করে, জীবন ধারণের বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে এবং বিভিন্ন প্রকারে জীবনের স্বাতন্ত্র্য ও পারম্পর্য্য রক্ষা করে।

রোমের চিন্তা জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিভিন্ন অবস্থায় উহার নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে স্বদেশীয়, গ্রীক ও মিশরের চিন্তা প্রণালী প্রাধান্য লাভ করে। ইহার প্রথম অবস্থায় শিক্ষা বিজ্ঞান' পরিস্ফুট হয়নাছিল না। দ্বিতীয় যুগে 'কেটো' ও 'সিসিরিয়ো'র শিক্ষা প্রভাবে রোমের নিজস্ব জীবনের আদর্শ অটুট ছিল, কিন্তু জীবনের দার্শনিক ব্যাখ্যার নিমিত্ত তাহারা গ্রীসের ষ্টোয়েক (Stoic) সম্প্রদায়ের নিকট ঋণী ছিল। এই গ্রীক প্রভাবের ফলে রোমবাসীদের হৃদয়ে চিন্তাশক্তি জাগত হইতে থাকিল। তাহার ফলে ধর্ম্ম এবং নীতির প্রতি সাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল।

কিন্তু রোমের প্রভাব যতই বিস্তৃত হইতে লাগিল, তাহার সাম্রাজ্য যতই নূতন নূতন দেশ করতল গত করিল ততই তাহার সরলতা, অমায়িকতা বিলুপ্ত হইতে লাগিল; রোম নীতি এবং ধর্ম্মের আদর্শ হইতে স্খলিত হইল। নিষ্ঠুরতা, আলস্য ও বিভিন্ন প্রকার নৃশংস আমোদ-প্রিয়তা রোমে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল, যে মহত্ত্ব ও উদারতা রোমকদিগের সর্ব্বপ্রধান অলঙ্কার ছিল, এখন তাহা দূরে পলায়ন করিল পণ্ডিতগণ এই অবস্থার পরিণাম চিন্তা করিয়া এবং সর্ব্বনাশের পরিপূর্ণ আয়োজন দেখিয়া জাতীয় চরিত্র সংশোধনে যত্নবান হইলেন। ষ্টোয়েক সম্প্রদায় সৎ-সাহিত্য প্রচার দ্বারা জীবনের উচ্চ আদর্শ নির্দ্দেশ করিলেন। প্লেটো দর্শন নবভাবে আলোচিত হইতে থাকিল, তাহার ও পিথাগোরাস প্রবর্ত্তিত মতবাদের ফলে ধর্ম্ম ও নীতির প্রতি সশ্রদ্ধ ভাব এবং বিনয়শিক্ষা সমাজে প্রবেশ লাভ করিতে লাগিল।

এই সকল অবস্থার মধ্যে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম রোমে প্রবেশ করিল এবং বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত ইউরোপে নৈতিক জগতের পরিচালন ভার গ্রহণ করিল। কিন্তু এই ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের পরে বহুদিন পর্য্যন্ত রোমের পতনের যুগের শিক্ষাপদ্ধতি ইউরোপের নানা দেশে প্রবর্ত্তিত ছিল। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রায় একই প্রণালীতে শিক্ষা প্রদান করা হইত। এই প্রণালীর বিশেষত্ব, লৌকিক শিক্ষার প্রাধান্য, এরিষ্টটল্, প্লেটো প্রভৃতি গ্রীক্ পণ্ডিত দিগের প্রণীত গ্রন্থাবলী ও তৎসঙ্গে সঙ্গে ভার্জ্জিল, লিভি, সিসিরো, সীজর প্রভৃতির পুস্তক সকল প্রায় সর্ব্বত্র পাঠ্যপুস্তক রূপে ব্যবহৃত হইত। ষষ্ঠ হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত শিক্ষার ইতিহাসের এক স্বতন্ত্র যুগ বলা যাইতে পারে। এই যুগের প্রারম্ভে রোমের ধ্বংস প্রাপ্তি ঘটে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপ্রণালী বিলুপ্ত হয়। রোমের পতনের পর খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম যাজকগণ বিদ্যাদানের ভার গ্রহণ করেন। এক নূতন শ্রেণীর বিদ্যালয় পুরাতনের স্থান অধিকার করে। এই সকলও বিদ্যালয় ধর্ম্মমন্দির সংশ্লিষ্ট থাকিত এবং তাহার বিশেষত্ব ধর্ম্ম শিক্ষার প্রাধান্য। এই নূতন শিক্ষানীতি প্রাচীন বিদ্যা ও চিন্তা প্রণালীর মূলে কুঠারাঘাত করিতে ব্যগ্র হইল। কিন্তু প্রাচীন পন্থা একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিল না। অন্য পাঠ্যপুস্তকের অভাবে এই যুগের বিদ্যালয়েও এরিষ্টটল্ প্রভৃতির প্রণীত গ্রন্থগুলিই অধীত হইতে লাগিল।

ফরাসিদেশে Morevingian রাজ বংশের শাসন কালে এই প্রকারের শিক্ষা ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল; কিন্তু ইংলণ্ডে Theodorus, Bead প্রভৃতির চেষ্টায় প্রকৃত সাহিত্য ও শিক্ষার উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। এই বিদ্যাচর্চ্চার পুনরভ্যুত্থানের প্রভাব ফ্রান্সে অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে লক্ষিত হয়। তখন Charles Great এর শাসন কালে উপযুক্ত ব্যক্তির নেতৃত্বে Monastic ও Cathedral উভয়বিধ বিদ্যালয়ের আমূল সংস্কার হয় এবং তাঁহার Palace School নামক বিদ্যালয় বিবিধ বিদ্যা চর্চ্চার কেন্দ্র স্থলে পরিণত হয়। দশম শতকের অরাজকতা এই উন্নতির অন্তরায় হইলেও ইহাকে সম্পূর্ণ বিনাশ করিতে পারিয়াছিল না। বরং দেখিতে পাই যে, রাজনৈতিক দুর্যোগ কাটিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ফরাসি দেশে জ্ঞানোন্নতি ও বিদ্যালাভের জন্য এক নব উদ্দীপনার আবির্ভাব হয়। এই নব জাগরণের প্রকৃষ্ট ফল প্যারিস্-বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ইউরোপের চিন্তাজগতের ইতিহাসে এক অতি স্মরণীয় ঘটনা এবং এই সময় হইতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রণালীর এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়। অল্পকালের মধ্যেই ইহার অনুকরণে ইউরোপের সর্ব্বত্র বহুসংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু কি কারণে ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এত গুলি বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে হইলে এই যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি কি ভাবে কার্য্য করিতেছিল, তাহা আলোচনা করা আবশ্যক। এই যুগের পণ্ডিতগণ ধর্ম্ম আলোচনা, দর্শন, তর্কশাস্ত্র ও সাহিত্য অধ্যাপনাই তাহাদের আদর্শ বলিয়া জানিতেন। বহির্জগৎ হইতে আপনাদিগকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখিয়া, রাজনৈতিক, সামাজিক সর্ব্বপ্রকার আন্দোলন উপেক্ষা করিয়া, তাঁহাদিগের ধর্ম্মমন্দিরের নিভৃত প্রকোষ্ঠে বসিয়া জ্ঞানানুশীলন করিতেন। তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপ্রণালীতে পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি যে সকল বিজ্ঞান সাক্ষাৎ ভাবে বহির্জগতের সহিত পরিচিত করে, তাহাদের কোন স্থান ছিল না। ছাত্রদিগকে অধিকাংশ সময়ে অর্থহীন কর্ম্মকাণ্ড এবং পূজা পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হইত। এই ব্যবস্থার ফল অতি গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতা প্রবেশ করিল; অন্ধ বিশ্বাস, স্বাধীন ও যুক্তিমূলক চিন্তার স্থান অধিকার করিল। জ্ঞানের উৎস শুষ্ক হইয়া গেল। পণ্ডিতগণ এক একটী ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন কোথায় তাঁহারা ভগীরথের ন্যায় জ্ঞানের মন্দাকিনী ধারা

প্রবাহিত করিয়া আপনারা ধন্য হইবেন এবং জগৎকে ধন্য করিবেন—না, কোথায় তাঁহারা মহাসাগর হইতে দূরে আবদ্ধ হইয়া রহিলেন।

এই যুগের প্রবর্ত্তিত শিক্ষা তৎকালীন ইউরোপীয়দিগের আশা ও আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিতে পারিল না। ইহার প্রতিবাদ স্বরূপ স্থানে স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। নবম শতাব্দীতে ইতালীর অন্তর্গত Salarno তে একটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সেখানে চিকিৎসা শাস্ত্রই প্রধানতঃ শিক্ষা দেওয়া হইত। এই বিদ্যালয় স্থাপন সম্ভবতঃ ইউরোপে স্যারাসিন্ (Saracen) সভ্যতার প্রভাবের ফল। সে সময়ে সঙ্কীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতা সকল বিদ্যালয়ে বিলক্ষণ বিদ্যমান ছিল, কিন্তু Salarno সে প্রভাব অতিক্রম করিয়াছিল। সর্ব্ব জাতীয় ছাত্রের জন্য জ্ঞানমন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত থাকিত, এমন কি, ইহুদিগণ—যাহারা খ্রীষ্টানদিগের হস্তে সর্ব্বত্র লাঞ্ছিত হইত, তাহারাও এখানে শিক্ষা পাইতে পারিত। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে Bologna তে একটী প্রসিদ্ধ শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাতে প্রধান অধ্যাপনার বিষয় ছিল ব্যবহারশাস্ত্র। প্যারিসের প্রধান আলোচনার বিষয় ছিল ধর্ম্মবিজ্ঞান। প্রথম অবস্থায় ইহা তর্কশাস্ত্রের চর্চ্চার জন্যই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। প্যারিস্ ও Bologna বিশ্ববিদ্যালয় একই চেতনা ও প্রেরণার ফলে স্থাপিত হইলেও তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হয়। তাহাদের গঠনপ্রণালীও বিভিন্ন প্রকারের ছিল। Bologna য় প্রবর্ত্তিত শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল জীবনের কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের জন্য যুবকদিগকে প্রস্তুত করা, আর প্যারিসের উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদিগকে সাধারণভাবে মানসিক শিক্ষা দিয়া স্বাধীন চিন্তা শক্তি জাগ্রত করা এখানে ছাত্রদিগকে কর্ম্মপটু করিবার চেষ্টা না করিয়া চিন্তাশীল করার ব্যবস্থা ছিল। এই বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশাস্ত্র বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তর্কবিতর্কের সহিত এবং প্রকৃত তত্ত্ব জিজ্ঞাসার ভাবে আলোচিত হইত। এ বিষয়ে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত সকলেই শিরোধার্য্য করিতেন; এমন কি, 'পোপগণ'ও ইহার সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিতে যত্নবান্ থাকিতেন। যাহাতে ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা ও অধ্যাপনা অন্যত্র না হয়, তৎপক্ষে 'পোপ' যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন, ফলে যে সকল বিদ্যার্থী ধর্ম্মবিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতে চাহিত, তাহাদের প্যারিসে গমন ব্যতীত আর গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু ব্যবহারশাস্ত্রের অধ্যাপনার অনুমতি পোপগণ সহজেই দিতেন বলিয়া ইউরোপ খণ্ডের নানা প্রদেশে এই বিষয় আলোচনার জন্য নূতন নূতন বিশ্ব বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে লাগিল। ফলে ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ফরাসি দেশে যতগুলি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে অধিকাংশই প্যারিসের অনুকরণে না হইয়া Bologna র অনুকরণে গঠিত হইয়াছিল। Bologna র আর একটী বিশেষত্ব ছিল গণতন্ত্রের প্রসার। এখানে ছাত্রগণের বিশেষ আধিপত্য ছিল। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় বলিতে পণ্ডিত সমাজ বুঝাইত। Bologna বিশ্ববিদ্যালয় বলিতে বিদ্যার্থী-সমষ্টি বুঝাইত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে Bologna তে চিকিৎসা শাস্ত্র ও দর্শন পাঠের ব্যবস্থা হয়। প্রথমোক্ত বিভাগে ইহা অল্পদিনের মধ্যেই প্রসিদ্ধি লাভ করে। কিন্তু অনেক দিন পর্য্যন্ত দর্শন বিভাগে অধিক ছাত্র আকৃষ্ট হইত না। অবশেষে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহা ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যাপনা ও উপাধি দানের অধিকার প্রাপ্ত হয়।

প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপয়িতাদিগের মধ্যে Abelard এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার যত্নে এই বিদ্যার বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। তাঁহার প্রিয় শিষ্য Lambard এর রচিত গ্রন্থ মধ্যযুগে সর্ব্বত্র পাঠ্য-পুস্তক রূপে আদৃত হইত।

প্যারিস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত

সর্ববিষয়ে আচার্য্যগণেরই প্রাধান্য ছিল। তাঁহারাই উপাধি প্রদান করিতেন, পাঠ্যবিষয় নির্ব্বাচন করিতেন এবং ছাত্রদিগের মানসিক ও নৈতিক সর্বপ্রকার উন্নতির ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহারা চ্যান্সেলার, Dean প্রোক্টর (Proctor) থাকিতেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগেও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে তাঁহাদের এ স্বাধীনতা খর্ব্ব হয়। কএকটী ক্ষুদ্র ক্ষমতাশালী অভিজাত শ্রেণী তাহাদের স্থান অধিকার করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় এই ভাবে পরিচালিত হইতেছিল। এমন সময়ে এক ভীষণ ঝঞ্ঝাবাত আসিয়া উহাকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল। ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লব, প্রাচীন রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম্ম প্রকরণ মূলতঃ প্রাচীন সভ্যতা ধ্বংস করিতে উদ্যত হইল। সঙ্গে সঙ্গে যে বিশাল মহীরুহ বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত ইউরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা মন্দির বলিয়া আদৃত হইত, তাহাও সমূলে উৎপাটন করিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে ইউরোপে সর্ব্বত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। তাহাদের সংখ্যা এত অধিক যে, এই প্রবন্ধে তাহাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব। তবে সেই সকল বিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপ্রণালীর সাধারণ ভাবে আলোচনা করিব।

মধ্যযুগে বিশ্ববিদ্যালয় গুলি পরস্পর অসম্বদ্ধ ও সাহায্য-নিরপেক্ষ জ্ঞানচর্চ্চার কেন্দ্র ছিল। Abelard তাঁহার ছাত্রদিগকে নিজ অভিরুচি অনুযায়ী শিক্ষা দিতেন। জনসমাজের সহিত তাহার কোনও সংশ্রব থাকিত না। শিক্ষাপ্রণালীও এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইত যে, পারিপার্শ্বিক জগতের নানা বিবর্ত্তনের মধ্যেও তাহা অটুট থাকিত। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা অনেকাংশে রাজানুগ্রহ ও পোপের পৃষ্ঠপোষণের উপর নির্ভর করিত। তথাপি সেগুলিকে কোনও বৃহত্তর সমাজের অঙ্গীভূত বলা যাইতে পারিত না। সেগুলি দেশ ও কালের চিহ্ন বহন করিতে চাহিত না। পাঠ্য নির্ব্বাচন বিষয়েও দেখিতে পাই যে, সর্ব্ব বিষয়েই কেবল মূল তত্ত্ব উপলব্ধি করাইতে চেষ্টা করা হইত। সেই সমস্ত মূল সত্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া দেশ ও কালের উপযোগী করিবার কোনও ব্যবস্থা থাকিত না। কোনও গুরুতর বিষয়ের মীমাংসার আবশ্যক হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথিতনামা অধ্যাপকগণের মতামত সাদরে গৃহীত হইত; কিন্তু তাহার অধিক তাঁহারা অগ্রসর হইতেন না। দ্বাদশ শতাব্দীতে শিক্ষা প্রণালীর আমরা যে গুরুতর ত্রুটী লক্ষ্য করিয়াছি, তাহা ঐ যুগেও অনেকাংশে বিদ্যমান ছিল; কিন্তু এ ভাব দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারিল না। বহির্জ্জগৎ সম্বন্ধে এমন উদাসীনতা হ্রাস পাইতে লাগিল। সমস্ত মানবসমাজ হইতে দূরে থাকিয়া এক কাল্পনিক চিন্তা-জগতে বাস করা সম্ভবপর হইল না। এক নূতন চিন্তার স্রোত সমস্ত ইউরোপখণ্ডকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিল। ১৪৫৩ খৃং অব্দে Constantinople এর পতন হয়; তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিজয়ী Ottoman দের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য গ্রীসের পণ্ডিতগণ তাহাদের গ্রন্থাদি লইয়া সমস্ত ইউরোপে ছড়াইয়া পড়েন। যে জ্ঞান বিস্তারের পথে রোম এতদিন কণ্টকস্বরূপ ছিল, এখন তাহা সমস্ত দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। এই আন্দোলনকে Renaissance অথবা জ্ঞানের পুনরুত্থান নামে অভিহিত করা হয়। ইরেসমাস ও কলেটর ইউরোপকে নবভাবে শিক্ষিত ও দীক্ষিত করিলেন। ইউরোপ এথেন্সের নিকট হইতে যে বর প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা নানা বিপর্য্যয়ের মধ্যে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু এই নব জাগরণের স্রোত সমস্ত পঙ্কিলতা মুছিয়া ফেলিয়া ইউরোপের জীবন ও চিন্তাকে সরস ও সজীব করিয়া তুলিল। জ্ঞানের নবালোকে ইউরোপ সঙ্কীর্ণতার সকল গণ্ডি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া আত্মোপলব্ধির জন্য ব্যাকুল ভাবে ছুটিয়া চলিল। এই জ্ঞানের পুনরুত্থানের প্রভাব সর্ব্ব ক্ষেত্রেই সুস্পষ্টরূপে

দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মূল মন্ত্র মানবের আশা ও আকাঙ্ক্ষার অনুধাবন ও তাহার তৃপ্তি সাধনের উপায় উদ্ভাবন। ইহার ফলে, যে বহির্জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান অবিদ্যা বলিয়া উপেক্ষিত হইত, তাহার সম্যক্ পরিপুষ্টি ও সর্ব্ব বিদ্যালয়ে তাহার যথোপযুক্ত সমাদর দেখিতে পাই। Renaissance এর প্রাক্কালে Rabelais শিক্ষার আদর্শ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া বলিলেন, "প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হইতে হইবে। জলের মাছ, আকাশের পাখী, বনের বৃক্ষলতা, ভূগর্ভে নিহিত বিবিধ ধাতু, যাহা যেখানে থাকুক তাহার পরিচয় লইতে হইবে।" মূলতঃ ইহাকেই Renaissance যুগের শিক্ষা পদ্ধতির চুম্বক বলা যাইতে পারে।

Renaissance এর একটী ফল জাতীয় জীবনের উদ্বোধন। জাতিসমূহ স্ব স্ব রাজ্যের সীমা ও জাতীয় বিশেষত্ব নির্দ্দেশ করিয়া লইয়া জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও উচ্চতম আদর্শ পূরণের নিমিত্ত ছুটিয়া চলিল। জাতি সমূহের সামাজিক, নৈতিক, ও রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক অবস্থার স্বাতন্ত্র্য হেতু তাহাদের অভাব পূরণের ব্যবস্থার বিভিন্নতা লক্ষিত হইতে লাগিল। এই সকল কারণে শিক্ষা প্রণালীরও আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিল।

বিশ্ব-পণ্ডিতগণ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের শিক্ষামন্দির স্বকীয় বিশেষত্ব বজায় রাখিতে যত্নবান্ হইবে সত্য, কিন্তু ইহা রাষ্ট্র ও সমাজের অতীত নহে। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে বিশ্ব বিদ্যালয় উপেক্ষা করিতে পারে না, বরং নূতন ভাবের সৃষ্টি করিয়া সে সকলের উচ্চ আদর্শের সন্ধান দেখাইয়া দিবে। ইহাই বর্ত্তমান যুগের শিক্ষাপদ্ধতির বিশেষত্ব।

জ্ঞানের নবযুগের অভ্যুদয়ে আমরা দেখিতে পাই যে, মানবের চিন্তা ও কর্ম্ম ধারা বিবিধ পথে চালিত হইতেছে। ইহার পরে আসিল Reformation বা ধর্ম্ম সংস্কারের যুগ। ইহার প্রভাব সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করিব। এই দুই ভাবশক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষণীয় বিষয় বিস্তৃত হইতে থাকিল। মধ্যযুগের শিক্ষাপ্রণালীর বিশেষত্ব, ছিল বিবিধ বিদ্যার অনুশীলন দ্বারা সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ হইবার চেষ্টা। শিক্ষণীয় বিষয় শ্রেণীবদ্ধ ও বিবিধ ভাগে বিভক্ত হইলেও বিভিন্ন বিদ্যা পরস্পর নির্ভর-সাপেক্ষ, তাহা সে যুগের পণ্ডিতগণ বিশেষ ভাবে অনুধাবন করিতেন। এই জ্ঞানের অখণ্ডত্বের ধারণা মধ্যযুগের শিক্ষা বিজ্ঞানের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয়। কাহাকেও পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইতে হইলে বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া আবশ্যক হইত। এমন কি Milton তাহার Tractate in Education গ্রন্থে মত প্রকাশ করিয়াছেন যে. দুর্গনির্ম্মাণ প্রভৃতি বিষয় যাহা বর্ত্তমানে কেবল সামরিক বিশেষজ্ঞদিগের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাও সাধারণ বিদ্যার্থীর জ্ঞাতব্য বিষয়। মানব জাতির জ্ঞানবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এইভাব ক্রমে শিথিল হইয়া আসিতেছে। এখনকার বিদ্যার্থী সর্ব্ববিদ্যা আয়ত্ত করা অসম্ভব জানিয়া সে পন্থা পরিত্যাগ করিতেছেন। তাহার পরিবর্ত্তে আমরা দেখিতে পাই, যে, এক একটী বিদ্যাকে বহু ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার এক একটীর অনুশীলনের জন্য পণ্ডিতগণ সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিতেছেন।

প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টান্ত অনুসরণে যে সকল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে Oxford অন্যতম। Oxfoad এবং Cambridge বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের চিন্তারাজ্যের নায়কতা করিয়াছে; কিন্তু সেগুলি মধ্যযুগের আদর্শ লইয়া গঠিত হইয়াছিল। এই দুইটী প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষত্ব এই যে, তথায় মানবজীবনের সাধারণ আশা ও আকাঙ্ক্ষাও চরিত্র-গঠনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষা প্রদান করা হয়। সে শিক্ষা কোন উদ্দেশ্যমূলক নহে। ইহার আদর্শ বিদ্যার্থীর মনে জ্ঞানের পিপাসা বৰ্দ্ধিত করা, যাহার ফলে তাহারা উত্তর কালে নীতি ও ন্যায় পরতার সহিত জীবনের বিবিধ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারে।

অতএব দেখিতে পাই, মধ্য যুগের শিক্ষার আদর্শ Oxford ও Cambridge এ এখনও প্রচলিত আছে। এই আদর্শ অতি উচ্চ সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা বর্ত্তমান কালের অভাব পূরণের পক্ষে যথেষ্ট নহে। এখন সর্ব্ব ক্ষেত্রেই কঠিন প্রতিযোগিতা চলিতেছে। তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইলে সাধারণ ভাবে নানা বিদ্যা আয়ত্ত করার চেষ্টা অপেক্ষা কোনও একটী বিষয়ে ব্যুৎপন্ন হওয়া আবশ্যক। নতুবা বর্ত্তমান যুগের কঠিন সংগ্রামে জয়লাভের সম্ভাবনা নাই।

বর্ত্তমান যুগ বিশেষজ্ঞের যুগ। এবং আধুনিক প্রণালীতে গঠিত সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে এই মূল তত্ত্ব কার্য্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা আছে। আমেরিকা ও জর্ম্মাণির বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এবিষয়ে অগ্রগণ্য। ইংলণ্ডেও বর্ত্তমান যুগে যে সকল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেগুলিতে এবিষয়ে দৃষ্টি রাখা হইয়াছে।

বর্ত্তমান কালের চিন্তা ও শিক্ষা পদ্ধতিতে দুইটী বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। প্রত্যেক বিদ্যা সকল সীমা লঙ্ঘন করিয়া অনন্ত বিস্তৃতির দিকে ধাবিত হইতেছে। আবার প্রত্যেক বিদ্যার অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয় লইয়া নূতন নূতন বিদ্যার সৃষ্টি হইতেছে। একে চায় জ্ঞানকে সসীম হইতে অসীমের দিকে ধাবিত করিতে, অপরের উদ্দেশ্য শিক্ষণীয় বিষয়কে বহুভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার প্রত্যেকটীকে স্বতন্ত্র ভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করা। ইহার ফলে আমরা সর্ব্বক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের উদ্ভব দেখিতে পাই। এইরূপ শ্রমবিভাগ নীতির ফলে ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যাগুলি ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া অতি সত্বরেই উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে এবং ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানের সম্পূর্ণতা বিধানে যথেষ্ট সহায়তা হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা সর্ব্ব বিষয়ে মঙ্গলের কারণ হইবে না, এরূপ আশঙ্কা [illegible] এরূপ অনৈক্য বশতঃ সমগ্র জ্ঞেয় জগতের নিয়ম শৃঙ্খলা আবিষ্কারের পক্ষে অসুবিধা হয়। কিন্তু এ অসুবিধা সত্ত্বেও এ মূল নীতি বর্ত্তমান কালে সমধিক আদৃত হইতেছে। আধুনিক যুগের উচ্চ শিক্ষা পদ্ধতি বুঝিতে হইলে Germany এবং America তে প্রবর্ত্তিত শিক্ষানীতি আলোচনা করা আবশ্যক। এসকল বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অধ্যাপনার বিষয় এত অধিক যে, তাহার তালিকা সংগ্রহ করা সহজ নহে। প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য কোনও ক্ষেত্রেই অনাদৃত হইতেছে না। প্রাচীন দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি শিক্ষা দানে যথেষ্ট সময় ও মনোযোগ দেওয়া হইতেছে। কিন্তু অধিকাংশ বিদ্যালয়ের বিশেষত্ব বিজ্ঞান শিক্ষার আয়োজন পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বর্ত্তমান যুগের একটী লক্ষণ জাতীয় ভাবের উত্থান। সেই জন্য একদিকে যেমন বিশ্ব-বিদ্যালয় সমূহে প্রাচীন যুগে প্রবর্ত্তিত বিদ্যাগুলির যথোপযুক্ত চর্চ্চা হয়, অন্যদিকে তেমনি জাতীয় জীবনে যাহা কিছু আবশ্যক, সে সকল পূরণের নির্দ্ধারণ ভারও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর অর্পিত হইয়াছে। সেই জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয়ে এমন অনেক বিষয় দেখিতে পাই, যাহা পূর্ব্বে কখনও উচ্চ শিক্ষার বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইত না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় সকল বিশ্ব বিদ্যালয়ে শিল্প, বাণিজ্য এবং কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং এই সকল বিভাগেই অধিক সংখ্যক ছাত্র আকৃষ্ট হয়। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫০; তদ্ব্যতীত একএকটী স্বতন্ত্র বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য উচ্চাঙ্গের শিল্প শিক্ষালয় বর্ত্তমান আছে। এই গুলিও কোনও অংশে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে হীন নহে।

আধুনিক যুগের অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় মধ্যযুগে স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু কালক্রমে প্রয়োজন বোধের সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে নব্য ভাব অবলম্বিত হইয়াছে। জর্ম্মানির বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মধ্যে প্রেগ সর্ব্ব প্রথমে স্থাপিত হয়। ১৪২৬ খৃঃ অব্দে Louvain এর বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমে জর্ম্মাণিতে অন্যান্য বিশ্ব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। তন্মধ্যে হাইডেল্‌,

লিভজিগ, টুবেইনগিন প্রভৃতিই প্রধান। যে সময় ইতালি এবং ইউরোপের দাক্ষিণাংশে অন্যান্য দেশে জ্ঞানের নব জাগরণের প্রভাব বিস্তৃত হইতেছিল, তাহার অল্পকাল পরেই জর্ম্মাণিতে লুথার ধর্ম্মসংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হন। তাহার ফলে ইউরোপের উত্তরাংশে চিন্তা এবং শিক্ষার পদ্ধতি নূতন ভাব ধারণ করে। অতএব আধুনিক যুগের প্রারম্ভে যেমন অনুসন্ধিৎসা, সত্য নির্দ্ধারণের নিমিত্ত ব্যাকুলতা দেখিতে পাই, তাহা এই উভয়বিধ শক্তির ক্রিয়ার ফলে ইউরোপে সর্ব্বত্র প্রকটিত হইয়াছিল। লুথার পাইয়াণ স্থানে স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতেছিলেন। তন্মধ্যে কনিস্‌বর্গ ও জেনা সমধিক প্রসিদ্ধ। এই দুইটী ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্থাপিত হইয়া ক্রমশঃ অধিকতর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে থাকে। এই সময়ে এক দিকে যেমন এই সকল বিদ্যালয়ের সাহায্যে লুথারের মতবাদ প্রচারিত ও দার্শনিক ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছিল, আবার অপর দিকে উইটেনবার্গ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় রোম্যান ক্যাথলিক ধর্ম্ম মতের প্রাধান্য প্রমাণ করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিত। ইহার ফলে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাব অতি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু জাতীয় জীবনের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এই ভাব ক্রমশঃ লুপ্ত হইতে থাকে। ইউরোপের অন্যান্য অংশে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ন্যায় জর্ম্মানি প্রাচীন ধর্ম্মমত ও ধর্ম্ম বিজ্ঞানের আলোচনা পরিত্যাগ করিল না বটে, কিন্তু জাতীয় জীবনের বিবিধ অভাব পূরণ করিবার জন্যই বিশেষ ভাবে ব্যগ্র হইল। নেপোলিয়নের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে জর্ম্মানিতে চিন্তাশীলতা ও তাহার ফলে অতীন্দ্রিয়তা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বিশ্ব বিদ্যালয়ের পণ্ডিতগণও যেন ভাবরাজ্যে বাস করিতেন। জর্ম্মানি তাহাতে গৌরব অনুভব করিত ;কিন্তু নেপোলিয়ন যখন প্রুসিয়াকে শূন্যের চিন্তা জগৎ হইতে টানিয়া লইয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া পদদলিত করিলেন, তখন জর্ম্মানির সে সুষুপ্তির ঘোর ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার পর হইতে জীবন এবং সমাজে এক নূতন গতির স্রোত প্রবাহিত হইল। বার্লিন, বন প্রভৃতি কেন্দ্রে নূতন নূতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইতে লাগিল এবং এই সকল শিক্ষালয়ে আধুনিক যুগের শিক্ষা পদ্ধতি অতি স্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জর্ম্মানির বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের বিশেষত্ব তাহাদের বিজ্ঞান ও লৌকিক বিদ্যা দানের ব্যবস্থা। পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন, চিকিৎসা শাস্ত্র প্রাণি-বিজ্ঞান, উদ্ভিদ্ বিদ্যা, ভূবিদ্যা, খনিজ বিদ্যা, নৌনির্ম্মাণ বিদ্যা, পূর্ত্ত, কৃষি, শিল্প, কলাবিদ্যা, স্থাপত্য, বিভূষণ শিল্প, জাতি বিজ্ঞান (Anthropology), রাষ্ট্র বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিষয়েই শিক্ষা দান করা হইতেছে। মনোবিজ্ঞান এখন দুই ভাবে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে—একটী দার্শনিক, অপরটী বৈজ্ঞানিক। একে অপরের সাহায্যে পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে। ইতিহাস এখন আর ঘটনাবলীর সমষ্টি নহে। উহা প্রাণি-বিজ্ঞান, জাতিবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের নিকট হইতে বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করিয়া পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে এবং মানব জীবনের আশার পথ নির্দ্দেশ করিয়া আপনার অস্তিত্বের সার্থকতার প্রমাণ করিতেছে।

ধনবিজ্ঞান পাঠ করিতে হইলে এখন আর কয়েকটী অভ্যস্ত সূত্র আলোচনা করিয়া ছাত্রগণ ক্ষান্ত হয় না। Adam Smith এর গ্রন্থ এখন আর যথেষ্ট নহে। শুল্ক নির্দ্ধারণ, স্থাবর সম্পত্তির মূল্য নির্ণয়, ধনাগম প্রভৃতি যে সকল বিষয় সর্ব্বদা রাষ্ট্রের নেতাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে, ছাত্রগণ পঠদ্দশায় সেই সকল প্রশ্ন সমাধানের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। জাতি-বিজ্ঞান বা Anthropology এখন প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া আলোচিত হইতেছে। একটীর নাম Physical Anthropology বা Somatology; ইহার উদ্দেশ্য মানব জাতির বিভিন্ন যুগের আকৃতিগত পরিবর্ত্তন আলোচনা

করিয়া তাহার চিন্তা ও কর্ম্ম প্রণালীর অভিব্যক্তির পন্থা নির্দ্দেশ করা। অপর বিভাগের নাম Psyco-social Anthropology; ইহার উদ্দেশ্য-জাতি সমূহের চিন্তা প্রণালী ও সামাজিক ব্যবস্থার আলোচনা করিয়া তাহাদের জীবনের মৌলিকতা ও পারম্পর্য্যের ধারা নির্দ্ধারণ করা। সেই জন্য Harvard এর বিদ্যার্থীগণ একদিকে যেমন বর্ত্তমান জগতের চিন্তা প্রণালী বিশ্লেষণ করিতে ও বিভিন্ন জাতির সামাজিক জীবনের ধারা নির্ণয় করিতে ব্যস্ত হইয়াছে, তেমনি অপর দিকে সুদূর অতীত কালে যে সকল জাতি সভ্যতার আলোক বিস্তার করিয়াছিল, তাহাদের চিন্তার উৎস অন্বেষণ করিতেছে। টোড়া, নাগা প্রভৃতি বর্ত্তমান ভারতের অনুন্নত জাতি সমূহের চিন্তা প্রণালী বিশ্লেষণ করিতেছে। আবার অপর দিকে Saracen, Assyria, ইরাণী, চৈনিক প্রভৃতির জাতীয় জীবনের আদর্শ ও কর্ম্ম প্রণালী আলোচনা করিতেছে। এই ভাবে দেখিতে পাই নব্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিভিন্ন বিদ্যার পরিপুষ্টি সাধনের জন্য যেরূপ বিপুল আয়োজন করিতেছে, তাহাতে আশা হয় যে, অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র মানব জাতির চিরন্তন আশা ও আকাঙ্ক্ষার ধারা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ব্যাখ্যা করিয়া ভবিষ্যতের মানবজাতির ইতিহাস লিখিবার পথ সুগম করিয়া দিতেছে। এই সকল বিষয়ে জর্ম্মানির Berlin, Gottingen, Haul, Bonn, Liepsig, প্রভৃতি এবং ইয়াঙ্কি স্থানে Harvard, Columbia, Chicago, প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহার মধ্যে কোন কোনও ভাব প্রকাশ পাইতেছে। বিজ্ঞান, ব্যবহারশাস্ত্র অধ্যাপনার ভার বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করিয়াছেন। সম্প্রতি কৃষি ও বাণিজ্য-নীতি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইতেছে। কিন্তু আধুনিক যুগের বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলি অত্যাবশ্যকীয় লক্ষণ কলিকাতাতে দেখিতে পাই না। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক একটী বিশিষ্ট সমষ্টিগত জীবন থাকা আবশ্যক। সমস্ত ছাত্রগণ একটী নৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকিবে। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যক্ষেত্র এত বিস্তীর্ণ যে, বর্ত্তমানে ইহা সম্ভবপর নহে। বর্ত্তমান কমিশনের অনুসন্ধানের ফলে আশা করি এমন একটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবে, যাহাতে এই আদর্শ বজায় থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান সময়ের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের আবশ্যকীয় বিবিধ বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় অনেকাংশে এই আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তথায় প্রাচীন এবং নবীনের মিলন হইবে, আশা করি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন যে সকল বিষয় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান নির্দ্দেশ অন্যতম। কিছুদিন হইতে একটী প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়কে নগরের কোলাহল হইতে উপকণ্ঠে কোনও নিভৃত স্থানে স্থানান্তরিত করিলে উহাতে জ্ঞানচর্চ্চার ও ছাত্রদিগের বিনয় শিক্ষার পক্ষে সুবিধা হইবে। কিন্তু ইহা কার্য্যে পরিণত করিলে একটী গুরুতর ভ্রম সংঘটিত হইবে। মানবের কর্ম্ম এবং পরীক্ষা ক্ষেত্র হইতে দূরে লইয়া গেলে জ্ঞানানুশীলনের এক দিকে সুবিধা হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহার ফলে মানবের চেতনা ও বেদনার অনুভূতি লাভের পক্ষে ব্যাঘাত ঘটিবে। এবং বর্ত্তমান শিক্ষানীতি যে পথে চলিতেছে, তাহার বিপরীত পথ অবলম্বন করা হইবে।

মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ ছিল, এক একটী পণ্ডিত মণ্ডলী সৃষ্টি করা—যে পণ্ডিতসমাজ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নয়, পরন্তু জ্ঞানের অহেতুক আনন্দে ডুবিয়া থাকিতে চাহিতেন। বর্ত্তমান যুগের বিশ্ববিদ্যালয় চায় বিশেষজ্ঞলব্ধ জ্ঞান কোন সমাজ বা বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া তাহা সমস্ত জাতির মধ্যে বিতরণ করিয়া তাহাকে উচ্চতর সোপানে আরূঢ় করিতে। বিশ্ববিদ্যালয় এখন জ্ঞান রাজ্যের কেন্দ্র হইয়া জাতীয় জীবনে নব নব আশা, উদ্দীপনা জাগাইয়া দিবার

ভার গ্রহণ করিয়াছে। এখন উহা সমাজ ও রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে গৌরব বোধ করে না—এখন উহা জাতীয় জীবনের এক অতি আবশ্যকীয় অঙ্গ, বিবিধ চিন্তার প্রস্রবণ। এক সময়ে প্রাচীন প্রচলিত বিদ্যার সংরক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত; কিন্তু এখন তাহা যথেষ্ট নহে। তাহাকে আধুনিক যুগের পণ্ডিতদিগের আবিষ্কার ও মৌলিক গবেষণার ফলদ্বারা পরিবর্দ্ধিত করিতে হইবে। পূর্ব্বে ধারণা ছিল, জ্ঞান স্থিতিশীল কিন্তু এযুগের পণ্ডিতগণ জানেন ইহা গতিশীল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে লব্ধ জ্ঞান আয়ত্ত দ্বারা ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া সকল সীমার অতীত অনন্তের বিচিত্র পথে ধাবিত হইতে হইবে।

মধ্যযুগের পণ্ডিতগণ আপনাদিগের শক্তিকে সঙ্কুচিত রাখিতে চাহিতেন, সর্ব্ববিষয়ে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ চিন্তা জগতের নায়কগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতে গৌরব বোধ করিতেন। কিন্তু এই স্থানে আমরা শিক্ষানীতির মূল আদর্শের গুরুতর পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করি। সকল শিক্ষারা চরম উদ্দেশ্য আত্মোপলব্ধি। মানুষের শক্তি যতই ক্ষুদ্র হউক, সে তাহার নিজের স্বাধীন চিন্তা শক্তির চালন দ্বারা আপনার স্থান করিয়া লয়। এই আত্মোপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা ছন্দে, গানে, দর্শনে, শিল্প প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে বিকাশ লাভ করে। মানুষের মধ্যে এক বিচিত্র সৃজনী শক্তি ক্রিয়া করিতেছে। তাহার ফলে সে নিজস্ব একটী জগৎ সৃষ্টি করিয়া জীবন পথে ধাবিত হইতেছে।

বর্ত্তমান কালের শিক্ষা প্রণালী আলোচনা করিয়া স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, শিক্ষা যেন একটু অধিক মাত্রায় বহির্ম্মুখীন হইয়া পড়িতেছে। এই অবস্থা বিভিন্ন অবস্থার অভিব্যক্তির ফল, এবং সমস্ত মানব জাতির ইতিহাস একটী বিরাট ভ্রম নহে। তথাপি শিক্ষা প্রণালী ক্রমে একদেশদর্শী না হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। মানব জীবনের চরম লক্ষ্য যেন কখনও দৃষ্টির বহির্ভূত না হয়। মানব আধ্যাত্মিক জীব। আত্মিক জীবনের উৎকর্ষ সাধনই তাহার চরম লক্ষ্য। যে শিক্ষা সেই গন্তব্য স্থলের পন্থা নির্দ্দেশ না করে, তাহাকে অসম্পূর্ণ এমন কি ব্যর্থ বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমান যুগের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহেও ধর্ম্মালোচনার ও ধর্ম্ম নীতির অনুসরণের ব্যবস্থা আছে সত্য। কিন্তু তাহা ধর্ম্মের ছায়া মাত্র। তাহার অনন্ত বোধ নাই। মুক্তির ব্যাকুলতা নাই। মানুষ আধ্যাত্মিক জীব বটে, কিন্তু তাহাকে জড় জগতে বাস করিতে হয়; অতএব জড়ের সহিত সম্বন্ধ তাহার অতি ঘনিষ্ঠ। অতএব মধ্যযুগ যেমন জড়কে উপেক্ষা করিয়া একদিকে ভ্রমে পতিত হইয়াছিল, বর্ত্তমান যুগ তাহাকে প্রাধান্ত দিয়া অন্যপ্রকার ভ্রম করিতেছে। উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষাও সীমা লঙ্ঘন না করে, সে বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক। এ বিষয়ে জার্ম্মাণী ও ইয়াঙ্কিস্থান একটু অধিক মাত্রায় অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে। এই দুই দেশের ছাত্রগণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রকাশের সুযোগ পায় না। তাহারা যেন এক বিরাট কর্ম্মশালাতে কার্য্য করিতেছে। প্রত্যেকের নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্র আছে। প্রত্যেকে স্ব স্ব কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া জাতীয় জীবনের পুষ্টিবিধান করিতেছে। এই ব্যবস্থাতে ব্যক্তিত্বের বিকাশের কোনও সুযোগ নাই। এখন ইউরোপের কোনও কোনও জাতি বৈষয়িক ক্ষেত্রে পুষ্টি লাভ করিয়াছে। সগর্ব্বে সর্ব্বত্র নিজ মহিমা প্রচার করিতেছে। তাহারও কারণ এক দিন জার্ম্মানী প্রভৃতি জাতি চিন্তা ও দর্শনে অতীন্দ্রিয়তা বা Idealism এর আদর্শ উপলব্ধি করিয়াছিল। সেই শক্তি জাতীয় জীবনে নিহিত আছে বলিয়াই সে জড়কে নিজের প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত প্রয়োগ করিয়াছে—তাহার দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছে। কিন্তু সতর্ক থাকিতে হইবে, ইহা যেন কখনও প্রভুত্ব প্রাপ্ত হয় না। এই ভাবে শিক্ষা প্রণালী নিয়ন্ত্রিত হইলে মানবজাতি উচ্চ চিন্তা দ্বারা চালিত হইয়া সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের সহিত পরিচিত হইতে পারিবে এবং শিক্ষা বিজ্ঞানের অস্তিত্ব সার্থক হইবে।

শ্রীললিতকুমার নিয়োগী।

চণ্ডাল।

(১)

শৌর্য্যেরি শরজালে দিশি ভরিলে
ধরা তুমি বাহুবলে ভাঙ্গি গড়িলে।
ছুটালে আগুন তুমি মুঠি আঘাতে
টঙ্কারে শঙ্করে নিতি জাগাতে।
মত্ততায় ক্ষমাহীন ভোর সুখেতে
ধ্যানে না ধরিলে ভগবান্ বুকেতে।
ভোগে ভুলে গেলে ত্যাগ সাধন হে,
অবনত লহ অভিবাদন হে।

(২)

রিপু শোণিতের খর-তব তৃষাতে
তুলিলে দুধেতে আঁখি জল মিশাতে।
শ্রেয়েরে প্রেয়ের আগে বরণি'
স্বর্গ ভুলিয়াছিলে পেয়ে ধরণী।
পীড়িত করিলে দীনে হীন বচনে
ব্যাপৃত নিজেরি কারাগার রচনে।
ভুক্তে ভুলিলে হরি সাধন হে,
অবনত লহ অভিবাদন হে।

(৩)

হরি করুণায় যবে আঁখি ফুটালে
বীরের ও শির দ্বিজপদে লুটালে।
চেয়ে নিলে অপমান মানে দলিয়া
গঙ্গা মাটী যে হলো শিলা গলিয়া।
দীনতায় সব শাপ খণ্ডালে হে,
চণ্ড আছিলে হলে চণ্ডাল যে।
সম্পদ দিয়ে নিলে সাধন হে,
অবনত লহ অভিবাদন হে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

টাকার প্রাণ

এ সংসারে অনেক জিনিসেরই প্রাণের কথা শুনা যায় ; মন্ত্রের প্রাণ, দেশের প্রাণ, সাহিত্যের প্রাণ, কবিতার প্রাণ ইত্যাদি ; কিন্তু টাকার প্রাণের কথা কেহ শীঘ্র বলিয়াছেন, এমন মনে পড়ে না। অথচ এমন যে সর্ব্বশক্তিমৎ একটা বস্তু তাহার সঙ্গে প্রাণনামক পদার্থের কোনই সম্বন্ধ নাই—এ কথাটা একটু বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া বলা চলে না। সম্বন্ধ দুইপ্রকারে হইতে পারে,—ভাবে এবং অভাবে। প্রাণ যদি টাকাতে অস্তিত্ববান্ হয়—অর্থাৎ টাকার যদি প্রাণ থাকে, তবে সেটাও একটা সম্বন্ধ ; আর, টাকাতে প্রাণের থাকা উচিত ছিল, অথচ সে নাই—এমনও যদি হয়, তবে, সে অভাবটাও একটা সম্বন্ধ। এ দুইয়ের একটা সম্বন্ধও প্রাণের সঙ্গে টাকার নাই,—ইহা কিছুতেই বলা চলে না।

টাকা যাদের আছে, তাদের যে অনেক সময়েই প্রাণ থাকে না, একথা অনেকবার শুনা গিয়াছে। ধনীর দেহে অবশ্যই প্রাণ আছে।—সকল ধনীই যদি একরাত্রে এক যোগে প্রাণহীন হইয়া যাইত, তাহা হইলে সমাজে একটা মন্দ উলটপালট হইত না। কিন্তু সেটা হয় না। ধনীরাও বাঁচিতে পারে। তবে যে তাদের প্রাণ নাই, সেটা দৈহিক প্রাণ নহে—মনেতে প্রাণোচিত গুণ, অর্থাৎ দয়া মায়া ইত্যাদি। অবশ্যই এগুলিও যে তাদের নাই—একথা আমরা মানিয়া লইতেছি না। কিন্তু এই কথাটা অনেক সময় শুনিতে পাওয়া যায়। আর এইটা যদি সত্য হয়—অর্থাৎ ধনীর সঙ্গে প্রাণের সম্বন্ধ বাঞ্ছনীয় হইলেও যদি তাহার অভাব থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে, টাকার সঙ্গেও প্রাণের এমন একটা সম্বন্ধ আছে যে, দুইটা একত্র অবস্থান করিতে পারে না।

এই গেল এক পর্য্যায়। কিন্তু ইহা ছাড়া, টাকার

সঙ্গে প্রাণের আরও একটা সম্বন্ধ আছে ;—সেটা অভাবে নয়, ভাবে। টাকা যে চলিতে পারে, তাহার যে পা আছে, তাহা যে কোন শিক্ষিত বাজীকর দেখাইয়া দিতে পারে। সত্য সত্য লোকের চোখের সাম্‌নে হাঁটিয়া যাওয়ার মত পা এক পদার্থ ; আর, লোক চক্ষুর অন্তরালে—সূক্ষ্ম,অদৃশ্য পথে যাতায়াত করিবার মত পা আর এক পদার্থ। কিন্তু আমাদের মানিয়া লইতে হইবে, যে, এ উভয় প্রকারের পায়ের সঙ্গেই টাকার সম্বন্ধ আছে। সংখ্যায় একটাই হউক আর দশটাই হউক, টাকার পা আছে, সুতরাং ইহা সপাদ ; আর, সপাদ অর্থাৎ চলচ্ছক্তিমৎ বস্তু বিশেষকেই আমরা প্রাণী বলি ; সুতরাং টাকা প্রাণী—অর্থাৎ ইহার প্রাণ আছে।

একটা অতি সোজা কথাকেই রসিকতা ও ন্যায়ের ঘোর প্যাঁচ দিয়া বলা হইল। টাকার পা আছে, প্রাণ আছে ইত্যাদির সোজা অর্থ এই যে, এক হাতের টাকা অন্য হাতে যায়—এক জনের টাকা অন্য জনে পায়—টাকা খরচ করা হয় ; এবং তাহার ফলে সমাজের কতকগুলি লাভ লোকসান হয়। টাকার ব্যয়ের ফলে সমাজে যে সুখ দুঃখ উপস্থিত হয়—তাহাই উহার প্রাণের লক্ষণ। টাকার জোরে ইংরেজ ও মার্কিণ জর্ম্মেণীকে যুদ্ধে হারাইয়া দিল। ইহাতে পৃথিবীতে অনেক সুখ দুঃখের আমদানী হইবে, অনেক পরাধীন স্বাধীনতা লাভ করিবে, অনেক লাঞ্ছিত সম্মানিত হইবে, অনেক দুঃখীর দুঃখের অবসান হইবে, অনেক অশ্রুতপূর্ব্ব জাতির নাম স্মরণীয় ও বরণীয় হইয়া উঠিবে ; আবার, অনেক উন্নত শিরঃ ধূলায় লুটাইবে, অনেক রাজার রাজত্ব যাইবে, অনেক গর্ব্বিতের দর্প চূর্ণ হইবে, অনেক সুখীর সুখস্বপ্ন দুঃখের নির্দ্দয় স্পর্শে ভাঙ্গিয়া যাইবে।—এইখানে, আমরা জানিতে পারি, টাকার প্রাণ আছে, তাহার কার্য্যকরী শক্তি আছে। আবার, টাকার জোরে লর্ড নর্থক্লিফ (Northcliffe) পাঁচ সাতটা সংবাদ পত্র কিনিয়া লইলেন ; সে গুলিতে তাঁহার এবং তাঁহার পক্ষের গুণ গান হইতে লাগিল।—ইহাতেও একটা জয় পরাজয় আছে, একটা সুখ দুঃখের লীলা আছে ; সুতরাং এখানেও প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হয়। পুনশ্চ, টাকার জোরে একজন রক্‌ফেলার (Rockfeller) ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য হইলেন, আর পাঁচ জন সমব্যবসায়ীকে পিষিয়া মারিলেন ; ইহাতেও সমাজদেহে সুখদুঃখের আবির্ভাব ঘটিল, এবং ইহাতেও আমরা প্রাণের পরিচয় পাইলাম। তেমনই, টাকা আছে বলিয়াই কেহ হাসপাতাল, সরাইখানা প্রভৃতি স্থাপন করিতেছে ; তাহাতেও লোকের সুখ দুঃখ আছে—এবং তাহাতেও টাকার শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। টাকার অভাবে একজন দুঃখ পাইতেছে, আর সেই জিনিসটাই আর এক জনের পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আছে বলিয়া সে তাহার দুঃখ মোচন করিল—এ উভয়বিধ ব্যাপারেই টাকার প্রাণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

সুতরাং একথা আর অপ্রতিপন্ন রহিল না যে সমাজে টাকার গতায়াত আছে এবং এই গতায়াতের ফলে লোকের সুখ দুঃখের উৎপত্তি হয়। আমি যদি অন্যের অর্থ শোষিয়া লই—কিংবা আমার উপার্জ্জিত অর্থ অন্যকে দান করি, তাহা হইলে, এই উভয়বিধ ব্যাপারেই একটা চলা ফেরার, একটা গতির পরিচয় থাকিবে ; এবং উভয় ব্যাপারেই একটা অনুভূতি কাহারও না কাহারও মনে জাগিবে। এই যে একটা গতি ইহারই নাম দিয়াছি প্রাণ।

কিন্তু টাকার প্রাণের একটা বিশিষ্টতা আছে। ইহা এক এক জনের বেলায় এক এক রকমে আত্মপ্রকাশ করে। সকলেই কম বেশী টাকা খরচ করে ; কিন্তু খরচের নিমিত্তটা সকলের বেলায় এক নয়। কেহ ভোগে, কেহ ত্যাগে, কেহ পরের উপকারে, কেহ পরের অপকারে, কেহ সৎকার্য্যে, কেহ অসৎ উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে। শুধু তাই নয়, অনেক সময় দেখা যায়, এক এক সমাজে টাকা খরচ করিবার এক একটা বিশিষ্ট ধরণ থাকে। কোন সমাজ বা শ্রেণীর লোক

হয় ত শুধু খাওয়া পরার জন্যই টাকা খরচ করে, কোথাও বা ইহার উপরে ভোগবিলাসের জন্য—গান বাজনা—নাটক নভেলের জন্যও অর্থব্যয হয়, আর, কোথাও বা সৎ সাহিত্য, সৎ শিল্প প্রভৃতির জন্যও অর্থব্যয় ঘটিয়া থাকে। এথেন্সে যদি সৎসাহিত্যের ও সৎশিল্পের জন্য কেহ অর্থ ব্যয় না করিত, তাহা হইলে জগতের কতই না হানি হইত? কোথায় থাকিত ইউরিপিডিস্, সোফোক্লীস্, কে জানে? আর রোমে যদি ভোগ বিলাসের জন্য—গ্ল্যাডিয়েটরদের (Gladiator) নৃশংস খেলার জন্য—টাকা খরচ করা না হইত, তাহা হইলে ইতালীর ইতিহাস নিশ্চয়ই অন্য রকম হইত,—জগতের তাহাতে লাভই হউক আর লোকসানই হউক। সুতরাং টাকা যে শুধু খরচ করা হয়, তা নয়, এক এক সময়ে এক এক দেশে এক একটা বিশিষ্ট ধরণে খরচ করা হয়। এবং এক এক রকমের খরচের এক একটা বিশিষ্ট ফল দেখা যায়।

যে কাজটা পাঁচ রকমে করা যায়, সেটার সম্বন্ধেই প্রশ্ন উঠে, কোন্ রকমে করা উচিত। এই যে ঔচিত্যের সমস্যা, সেটা অর্থব্যয়ের বেলাও বেশ স্পষ্ট ;—সেখানেও অনেক সময় জিজ্ঞাসা করা হয়, টাকা থাকিলে ব্যক্তি এবং সমাজের পক্ষে সেটা কি ভাবে ব্যয় করা উচিত।

প্রশ্ন উঠিলেই তাহার উত্তর হয় না, এবং উচিত অনুচিতের বিচারে সকলের এক মত হওয়া প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। কাজেই ধনী তাহার ধন কি ভাবে ব্যয় করিবে, এ বিষয়ে উপদেশ দেওয়া তত সহজ নহে। একটা কথা আমাদের সর্ব্বাগ্রে মনে রাখা উচিত, স্বত্ব অর্থে যে কতকটা প্রয়োগে স্বাধীনতা বুঝায়, তাহা ভুলিলে চলিবে না। কোনও একটা জিনিসকে কাহারও নিজস্ব বলার সোজা অর্থ এই যে, অন্যের স্পষ্ট কোন অনিষ্ট না করিয়া সে উহা যে ভাবে ইচ্ছা প্রয়োগ ও ব্যবহার করিতে পারে। সুতরাং ধন যদি ধনীর হয়, তাহা হইলে তাহার ব্যবহারে ধনীকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে সমাজ বাধ্য। যাহার পাঠা সে ইচ্ছা করিলে ঘাড়ের দিকেও কাটিতে পারে, ইচ্ছা করিলে ল্যাজের দিকেও কাটিতে পারে। ধনীও তেমনই তাহার টাকা যে ভাবে ইচ্ছা ব্যয় করিতে পারে, কোনও একটা বিশিষ্ট প্রকারে ব্যয় করিবার জন্য তাহাকে বাধ্য করার ক্ষমতা সমাজের হাতে দেওয়া যাইতে পারে না।

অন্যে যে কাজ যে ভাবে করে সেটা অন্য ভাবে করিলে ভাল হইত,—এরূপ আমাদের মনে হইতে পারে ; এরূপ আমরা ইচ্ছা করিতে পারি। কিন্তু তাহা না করিলেই তাহার ফাঁসির ব্যবস্থা করিতে পারি না। ইংরেজ জাতি যদি ব্যবসায়ী না হইয়া কেবলই সাহিত্যিক হইত—ব্যবসায়ের জন্য অর্থ উপার্জ্জন ও অর্থ ব্যয় না করিয়া কেবলই বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য কিংবা দুঃস্থ সাহিত্যিকদের ভরণ পোষণের জন্য তাহাদের অজস্র অর্থ ব্যয় করিত, তাহা হইলে হয়ত আমাদের কাহারও কাহারও লাগিত ভাল। কিন্তু তাহা করা হয় না বলিয়া আমরা দুঃখিত হইতে পারিলেও নিন্দা করিতে পারি কি না সন্দেহ, এবং ইংরেজ যে নিতান্তই পাপ কর্ম্ম করিতেছে, এ কথা কিছুতেই বলিতে পারি না। কিংবা, এদেশের সরকারের প্রিয় কোন ব্যক্তি যদি তাঁহার বিপুল অর্থ ব্রাহ্মণ ভোজনে ব্যয় না করিয়া উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদের আপ্যায়নে ব্যয়িত করেন, তবে সেটাও ব্যক্তিবিশেষের বা শ্রেণী বিশেষের যতই ক্ষোভের কারণ হউক না কেন, পাপ কর্ম্ম ইহাকে কিছুতেই বলিতে পারি না। আর, এসব স্থলে কথনই আমরা এরূপ প্রার্থনাও করিতে পারি না যে, আইন করিয়া এ সব ভদ্রলোকদের টাকাটা ব্রাহ্মণ ভোজনে ব্যয়িত করান হউক। তেমনই, আমার ধন যদি আমি সেবাশ্রমে দান না করিয়া ভারত ভ্রমণে ব্যয় করি, তাহা হইলে, সেবাশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষ আমার প্রতি একটু রুষ্ট হইতে পারেন সত্য,

কিন্তু নিশ্চয়ই সরকারের কাছে আবেদন করিয়া আমার অর্থ তাঁহারা ছিনাইয়া লইতে পারেন না। ধনীর নিজের ধনে যদি তাহার কোন স্বামিত্ব থাকে, তাহা হইলে সে ধন ব্যয় করিবার বেলায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতাও তাহাকে না দিয়া সমাজ পারে না। বস্তুবিশেষে ব্যক্তির স্বত্ব সব সমাজই মানিয়া লয়; প্ল্যাটোর গণতন্ত্র জগতে বাস্তব সত্যে এখনও পরিণত হয় নাই; সুতরাং অর্থের অধিকারীমাত্রেরই একটা ব্যয়স্বাধীনতা আছে।

তবে, একথাও স্বীকার্য্য যে, যাহার যে জিনিসটা আছে তাহাকে যদি সে জিনিসটা আমাদের পছন্দ মত প্রয়োগ করিতে না দেখি, তবে আমরা তাহার নিন্দা করি। যদি দেখি স্যার রামচাঁদ ধুন্ধুরিয়া তাঁহার কোটি কোটি টাকার এক কপর্দ্দকও সাহিত্য সেবার জন্য দান করেন নাই—অথচ জুয়া খেলায় কিংবা ঘোড় দৌড়ে প্রতি বৎসর তাঁহার হাজার হাজার টাকা উড়িয়া যাইতেছে, তাহা হইলে আমরা সাহিত্যিকেরা নিশ্চয়ই তাঁহার নিন্দা করিব। কিংবা যদি দেখি শেঠ চুন্ন্‌র্ভচাঁদ পরেশনাথের মন্দিরে সোণার চূড়া দিবার জন্য বিশ লক্ষ টাকা দিয়া ফেলিয়াছেন, অথচ বঙ্গীয় হিতসাধনী সভার চাঁদার খাতায় সই করিলেন না, তাহা হইলেও শ্রেণীবিশেষের কাছে তাঁহার নিন্দা অনিবার্য্য। কিংবা রাণী স্বর্ণসুন্দরী মহাভারত শুনিবার জন্য দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণদের বাবতে যদি দুই লক্ষ টাকা খরচ করিয়াও ইগার্টন হাঁসপাতালে এক পয়সাও না দেন, তাহা হইলে তাঁহারও নিন্দা হইবে—সর্ব্বত্র না হইলেও কোন কোন জায়গায় নিশ্চয়ই হইবে। এইরূপ সর্ব্বত্র, সর্ব্বজনসম্মত না হইলেও প্রাদেশিক নিন্দা যে হয়, এটাও একটা সত্য কথা।

এইখানে আমরা দুইটী সত্যের সাক্ষাৎ পাইতেছি। প্রথম, সমাজ আইন করিয়া যদিও কর ধার্য্য করিতে পারে এবং সেই হিসাবে ব্যক্তির আয়ের কতক অংশ নিজে গ্রহণ করিতে পারে, তথাপি সে আইন করিয়া ব্যক্তিকে কখনও বলিতে পারে না যে, 'তোমার বাকী টাকা তুমি এই ভাবে ব্যয় করিবে'। রাষ্ট্র রক্ষার জন্য—সমগ্র রাষ্ট্রের হিতের জন্য কতকটা ব্যয় করিতে ব্যক্তিকে বাধ্য করা চলে এবং আবশ্যকও; কিন্তু তার বেশী ফরমাইস দিবার অধিকার সমাজের নাই। আপন অর্থের ব্যয়ে ব্যক্তির সুতরাং প্রচুর স্বাধীনতা আমরা মানিয়া থাকি;—শুধু তাই নয়—ন্যায্য এবং অপরিত্যাজ্য মনে করিয়া থাকি। পক্ষান্তরে আবার, ব্যক্তিবিশেষকে যদি আমাদের অপছন্দ মত ব্যয় করিতে দেখি, তবে, তাহার নিন্দা করিতেও ছাড়ি না। এই দুইটাই সত্য কথা; কিন্তু দুইটীর একত্র অবস্থান সঙ্গত কি?

এমন যদি হয় যে, রাম ও শ্যাম সহোদর ভাই, অথচ তাহাদের মধ্যে ঘোর শত্রুতা; তাহা হইলে তাহাদের একত্র অবস্থান সম্ভব কি? বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই উপদেশ দিবে যে, হয় তাহাদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অস্বীকার করা উচিত, নয় শত্রুতা ত্যাগ করা উচিত। আমাদের উল্লিখিত সত্য দুইটী সম্বন্ধেও তাই। আমাদের যদি ইহাই অভীপ্সিত হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই আমাদের পসন্দমত তাহার অর্থ ব্যয় করিবে, তাহা হইলে তাহাকে সেইরূপে বাধ্য করার ক্ষমতা আমাদের থাকা উচিত—সেরূপ আইন করিবার অধিকার সমাজকে দেওয়া উচিত। এটা এমন অদ্ভুত কিছু নয় এবং মোটেই অকল্পনীয় নয়। বর্ত্তমান যুদ্ধের ব্যপদেশে অনেক দেশেই আইন করিয়া বলিয়া দেওয়া হইতেছে, কে কতটুকু এবং কি কি খাইবে, কতটুকু তৈল পুড়িয়া বাতি জ্বালিবে, কয়খানা কাপড় পরিতে পাইবে ইত্যাদি। রোমেও এক সময় এইরূপ নিয়ম করিয়া ভোগ বিলাস সংযত করা হইয়াছিল। আর, সব সভ্য সহরেই মিউনিসিপ্যালিটী অনেক সময় বলিয়া দেয় 'এর বেশী জল খরচ' করিতে পাইবে না।

আর এরূপ আইন করিবার অধিকার যদি আমরা সমাজকে দিতে নারাজ হই, তাহা হইলে যার পাঠা সে তাকে ল্যাজে কাটিলে তাহাকে দোষ দিতে পারি না—

যায় টাকা তাহাকে স্বাধীন ভাবে তাহা ব্যয় করিতে দেখিলে রুষ্ট হইতে পারি না। আমরা বন্ধুভাবে যাচিত বা অযাচিত হইয়া উপদেশ দিতে পারি, প্রার্থী হইয়া আবেদন করিতে পারি,—কিন্তু আমাদের উপদেশ অনুসৃত না হইলেই কিংবা আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর না হইলেই তাহাকে নারকী মনে করিতে পারি না। অবশ্যই তাহার বিরুদ্ধে পাঁচটা নিন্দার কথা রটনা করিতে চাহিলে কেহ হয় ত আমাদের মুখ চাপিয়া ধরিবে না; কিন্তু সেটা করা আমাদের সঙ্গত নয়, এই মাত্র।

রাজা আইন করিয়া আমাকে বলিয়া দিউন, আমার টাকা আমি কি ভাবে ব্যয় করিব, এটা নিশ্চয়ই আমি চাই না। রাজা ইচ্ছা করিলে হয় ত আমি তাঁহাকে ঠেকাইতে পারিব না. কিন্তু আমার ইচ্ছা নয় যে, তিনি আসিয়া আমার টাকাটা ব্যয়ের একটা বিলিবন্দোবস্ত করিয়া দেন। এই স্বাধীনতাটুকু প্রত্যেকেই প্রিয় মনে করে। তবে যে আমি আর একজনকে অপব্যয়ী, কৃপণ, প্রভৃতি বলিয়া নিন্দা করি, তাহার অর্থ এই যে, আমার ইচ্ছা তাহার টাকাটাও সে আমার পছন্দমত খরচ করে। আমার টাকা সম্বন্ধে আমি অন্যের পরামর্শ মত ব্যয় করিতে নারাজ, কিন্তু পরের টাকার বেলায় ইচ্ছা হয়, সে আমার বুদ্ধিতে পরিচালিত হউক। অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এ অত্যন্ত জুলুম দাবী।

যাঁহারা লোকশিক্ষকের পদে আসীন, তাঁহারা সর্ব্বত্রই সব বিষয়েই উপদেশ দিয়া থাকেন। অর্থ ব্যয় সম্বন্ধেও উপদেশ দেওয়া যে হয় না কিংবা উচিত নয়—তাহা বলিতেছি না। কিন্তু একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, উপদেশ নিরপেক্ষ এবং নিঃস্বার্থ হওয়া চাই। সর্ব্বত্যাগী যীশুই শিষ্যকে উপদেশ করিতে পারেন, 'সব ছাড়িয়া আমাকে অনুসরণ কর।' কিন্তু যিনি প্রবীণ সঞ্চয়ী—কৃপণতার কাছাকাছি সঞ্চয়ী—তিনি যে পরকে দান করিতে উপদেশ করিবেন, এটা কিছু দৃষ্টিকটু এবং শ্রুতিকটু। 'পরোপদেশে পাণ্ডিত্যং সর্ব্বেষাং সুকরং নৃণাং'—কিন্তু সুকর জিনিস মাত্রেরই মূল্য কিছু কম।

কেহ যদি আমাদের অভিপ্রেত নক্সামত তাহার বাড়ীটী তৈয়ার না করে তাহা হইলে কি তাহাকে আমরা বেকুব বলিতে পারি? কেহ যদি আমাদের পরামর্শ মত চা বাগানে টাকা না খাটাইয়া পাটের কারবার করে তাহা হইলে তাহাকে কি আমরা মূর্খ বলিতে পারি? তেমনই কেহ যদি পান্থশালা নির্ম্মাণ না করিয়া জাপানে বেড়াইতে যায় তবে তাহাকে কৃপণ বলিতে পারি না; কিংবা কেহ যদি আমার ছেলের পড়ার খরচ না দিয়া নিজের ছেলেকে ক্যাম্ব্রিজে পাঠায়, তবে তাহাকেও নৃশংস বলিতে পারি না। এই কথাটা ভুলিয়া গেলে ধনীর প্রতি অবিচার করা হয়।

তেমনই কোন দেশের কিংবা কোন শ্রেণীর লোক যদি ঘোড় দৌড়ে কিংবা ফুটবল খেলায় টাকা উড়ায় অথচ একজন চিত্রকরের চিত্র কিনিয়া তাহাকে সঙ্গতিপন্ন করিয়া না দেয়, তাহা হইলে, সে সকল লোকের রুচি সম্বন্ধে আমরা যত কথাই বলি না কেন, তাহাদিগকে ন্যায়ের আদালতে অপরাধী সাব্যস্ত করিতে পারি না। কোন দেশের ধনীরা যদি বাগান করিয়া টাকা খরচ করে, অথচ ভাল ভাল কবিদের গ্রন্থ গুদামে পঁচিয়া যায়, কিংবা কোন শ্রেণীর পাঠকপাঠিকা যদি কেবল নাটক উপন্যাস পড়ে, দার্শনিক গ্রন্থ একখানাও না কিনে,—তাহা হইলে, এরূপ সকল স্থলেই ইহাদের রুচির নিকট আমাদিগের মাথা নোয়াইতেই হইবে। আমরা রুচি পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিতে পারি, কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাহা না হয়, সে পর্য্যন্ত আমাদিগকে এই কঠোর সত্য মানিয়া লইতেই হইবে যে, সকলেরই যার যার রুচিমত অর্থ ব্যয় করিবার অধিকার আছে।

সুতরাং কোন দেশের কিংবা কোন শ্রেণীর সাহিত্যিক যদি খাইতে না পান, কোন চিত্রকরের চিত্র যদি না বিকায়, কোন অতি বড় পণ্ডিতের যদি অন্ন না জুটে—

তাহা হইলেও সমাজকে গালি দিবার অধিকার আমাদের নাই ;—সমাজের রুচির নিকট আমাদিগকে হার মানিতেই হইবে।

বিনা প্রয়োজনে কেহ অর্থব্যয় করিতে চায় না; এবং প্রয়োজন জিনিসটা রুচির উপর নির্ভর করে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এদেশে কোন ব্রাহ্মণ যদি পাচক হইতে চাহিত, তাহা হইলে তাহার চাকরী জুটিত কিনা সন্দেহ ; কেন না, তখনকার রুচি অনুসারে এই জিনিসটার প্রয়োজন লোকে বড় অনুভব করে নাই ; আর, এখন যদি কোন মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিত শুধু পাণ্ডিত্যের জোরে বাঁচিয়া থাকিতে চান, তাহা হইলে তাঁহাকে কি যে মুস্কিলে পড়িতে হইবে, তাহা জানিতে হইলে বেশী অনুসন্ধানের প্রয়োজন করে না। ঢাকার মসলিন এক সময়ে নবাব দরবারে, বাগদাদের খলিফদের মজলিসে মাথার মাণিক ছিল ; আর, এখনকার অর্থশালীরা তাহার খোঁজও করেন না, কেন না, এখনকার বিলাসে তাহার প্রয়োজনাভাব। আবার, তখনকার বিলাসীরা নিজের হাতে মোটর চালাইতে সম্মত হইতেন কিনা সন্দেহ, অথচ এখনকার দিনে পাল্কী প্রায় লোপ পাইবার মত। এইরূপে এক এক সময়ের রুচি অনুসারে এক একটা জিনিসের প্রয়োজন অনুভূত হয় এবং লোকে অকুণ্ঠিত চিত্তে তাহার পাছে অর্থব্যয় করে।

আবার কতকগুলি জিনিস আছে যাহার জন্য লোকে চিরকালই বেশী অর্থব্যয় করিতে ইচ্ছুক। বাজারে মিঠাই যত বিক্রয় হয়, কাব্যপুস্তক নিশ্চয়ই তত নয় ; চাউলের দোকানে যত ভিড় হয়, ঘড়ির দোকানে নিশ্চয়ই তত নয় ; নর্ত্তকীরা যত পয়সা পায়, মহামহোপাধ্যায়েরা নিশ্চয়ই তত নয়,—ব্যারিষ্টারেরাও তত পান কিনা সন্দেহ। এই সকল জায়গায়ই প্রয়োজনই অর্থচয়ের নিয়ামক। প্রয়োজন বোধ করে না বলিয়াই বানর মুক্তার হার স্পর্শও করে না, এবং প্রয়োজন বোধ করে বলিয়াই মুক্তার হার ফেলিয়াও সে ময়দার পুঁটুলী লইয়া পলায়ন করে ; নরও তেমনই তাহার ভোগের জন্য, তাহার তৃপ্তির জন্য প্রয়োজন বোধ করে বলিয়াই থিয়েটার বা সার্কাসের টিকিট কিনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে, এবং প্রয়োজন বোধ করে না বলিয়াই শঙ্করভাষ্য কিনিতে চায় না।

সুতরাং আমাদের বলা চলে না যে, অমুক খুব বড় জ্ঞানী, সকলেরই তাঁহাকে মাসে মাসে কিছু দেওয়া উচিত ; কিংবা অমুক খুব বড় কবি, সকলেরই তাঁহাকে সাহায্য করা উচিত। লোকে যদি এই জ্ঞানের কিংবা এই কবিত্বের প্রয়োজন বোধ করে, তাহা হইলে আপনা হইতেই ইহার জন্য অর্থ-ব্যয় করিবে, কাহারও উপদেশের অপেক্ষা করিবে না। বড় ব্যারিষ্টারকে যে হাজার টাকা করিয়া দিনে দেওয়া হয় কিংবা বড় ডাক্তারকে বত্রিশ ঘণ্টা স্তব স্তুতি করিয়া এবং বত্রিশটী টাকা নগদ দিয়া দশ মিনিটের জন্য বাড়ীতে আনা হয়, সে জন্য ত লোকে কাহারও উপদেশের অপেক্ষা করে না। গরজ এমনই জিনিষ, যে, তাহার লাজও নাই। দরকার হইলে আমরা সবই করি, দরকার না হইলে আমরা কিছুই করিতে চাই না।

কোন দেশ যদি এমন হয় যে, সে দেশের লোকের চিত্তবিনোদনের জন্য মুর্গীর লড়াই-ই যথেষ্ট, কাব্যের আর আবশ্যক করে না, তবে সে দেশে কবিরা নিশ্চয়ই অনাহারে মারা যাইবেন। কিংবা এমন যদি কোন দেশ থাকে যেখানে ধারাপাতই যথেষ্ট বিদ্যা, তবে সেখানে লর্ড কেল্‌ভিনের জন্মগ্রহণ করা বৃথা। কোন দেশ যদি এমন থাকে যেখানে মল্লবিদ্যা ভিন্ন আর কোন বিদ্যার দরকার করে না, সে দেশে দশটা ভাষার অভিধান মুখস্থ বলিতে পারিলেও আমাকে কেহ ভাত দিবে না। সুতরাং আমি অনেকগুলি বই পড়িয়াছি কিংবা কতকগুলি বই লিখিয়াছি বলিয়াই যে আমার দেশ-বাসীদের নিকট দাবী করিয়া বসিব, 'আমাকে টাকা দেও' —সেটা সঙ্গত নয়।

সুতরাং আমরা যে অনেক সময় দুঃখ করি যে, আমাদের দেশে সাহিত্যিকদের বিশেষতঃ কবিদের অন্নসংস্থান হয় না, এই কথাটা একটু ভাল করিয়া বুঝা উচিত। শুধু কবিদেরই

যে ভাত হয় না, তা নয়, অনেক লোকেরই হয় না। কত পণ্ডিত ব্যক্তি অনাহারের শূন্যতায় পাণ্ডিত্যের চাপে নিষ্পেষিত হইয়া যাইতেছেন, কে জানে? কত সচ্চরিত্র ব্যক্তি, কত ধার্ম্মিক ব্যক্তি নীরবে কষ্ট সহ্য করিতেছেন—কেন না, ধর্ম্মের আমাদের সম্প্রতি প্রয়োজন নাই, এবং নাচ দেখিয়া যেমন পয়সা দিতে পারি, চরিত্র দেখিয়া তেমন দিতে রাজী নই! বাজীকর দরজীকে বলিয়াছিল, 'দেখ, আমি রোজ রোজ কত পয়সা পাই, আর তুমি সারাদিন সূতা চালাইয়া কতই বা পাও!'—কিন্তু দেশে যখন দুর্ভিক্ষ আসিয়াছিল, তখনও লোকে দরজীর দোকানে একেবারে না গিয়া পারে নাই, কিন্তু বাজী দেখিবার আর তখন প্রয়োজন হয় নাই। এইরূপে শিক্ষার, রীতির, আয়ের পরিবর্ত্তন হইলে দেশে কত লোকেরই, কত শ্রেণীরই যে অন্নাভাব ঘটে, তাহার স্থিরতা নাই। তীর্থের পাণ্ডাদেরও এখন ইংরেজী পড়িতে হইতেছে, কেন না, যাত্রীর মাথায় পা তুলিয়া দিলেই এখন আর সে উহা গ্রহণ করিতে রাজী নয় এবং গ্রহণ করিলেও অর্থদানের বেলায় তাহার মুষ্টি বদ্ধ।

এ দেশে যদি শিল্পীদের, সাহিত্যিকদের, কবিদের অন্নসংস্থান না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, হয় এই সকল ব্যক্তির দেয় সামগ্রী সমাজে এত প্রচুর যে বিনা মূল্যেই পাওয়া যায়, নতুবা বুঝিতে হইবে, ইহাদের সামগ্রীর কোন প্রয়োজনই আমাদের নাই। কবিতা যে কিছু অনাবশ্যক রকমে বেশী উৎপন্ন হইতেছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু ভাল কবিতা খুব বেশী হইতেছে না, ইহাও সত্য। তথাপি যে কবিদের শুধু কাব্য হইতেই ভাত হয় না— অন্য একটা কিছু যোগ্যতাও থাকা চাই,—তাহার কারণ লোকে কাব্যের জন্য পয়সা ফেলিতে একটু ইতস্ততঃ করে। ইহা কবিদের পক্ষে একটু কঠোর বটে, কিন্তু দেশের লোকের পক্ষ হইতেও ইহা বলা যাইতে পারে যে, তাহারা যে জীবনে কাব্যের কোন প্রয়োজন বোধ করে না। তাহাদের সে রুচি উৎপাদনের জন্য কে চেষ্টা করিয়াছে? সে শিক্ষা কই? সে প্রবৃত্তি কই? সে অবকাশ কই? যে প্রকারের জীবন আমরা যাপন করি, কিংবা বাধ্য হইয়া যাপন করিতে হয়, তাহাতে কাব্যের ত কোন স্থান নাই! অতি গরীব গৃহস্থও ছেলে মেয়েদের জন্য পুতুল কিনে—পুতুল নির্ম্মাণের শিল্প এ দেশে চলে; এবং একটু অবস্থা হইলে লোকে স্যাকড়ার শিল্পেরও আদর করে। কিন্তু তাহার গৃহসজ্জার জন্য চিত্রের প্রয়োজন হয় না, তাহার আমোদের জন্য কাব্যের প্রয়োজন হয় না, এবং তাহার এমন সময় বা প্রবৃত্তি বা শক্তি নাই যে দার্শনিক গবেষণা করিবে। সুতরাং এই সকল কাজের জন্য—এই সকল জিনিসের জন্য অর্থব্যয় তাহার নিকট অপব্যয়। ইউরোপে পুরাতন চিনা মাটীর বাসন কিনিয়া ঘর সাজাইয়া রাখা একটা রোগবিশেষ; এদেশেও সঙ্গীত কিছু বুঝুন আর নাই বুঝুন, সেতার এস্রাজ দুই একটা ঘরে রাখা বড়লোকদের একটা নেশা। এমন যদি হইত যে, আলমারিতে দুই একখানা কাব্যগ্রন্থ রাখাও বিলাসের একটা অঙ্গ, তাহা হইলেও মহিলারা অন্ততঃ কবিদের ভরণ পোষণ কতক অংশে করিতেন। এখনও লোকে লক্ষ্মীর পাঁচালীর বা সুবচনীর পাঁচালী শুনিয়া পয়সা দেয়, কিছুদিন পূর্ব্বেও ভাটেরা এদেশে যথেষ্ট পয়সা পাইয়াছে। কিন্তু কবিরা—চিরদরিদ্র। শুধু কবি কেন, দার্শনিক, চিত্রী, প্রভৃতি অনেকেরই এই দশা। এজন্য সমাজকে কেবল দোষ দেওয়া অন্যায়। মনে রাখিতে হইবে, কবি যদি কাব্য হইতে জীবিকা অর্জ্জন করিতে চান, তাহা হইলে অন্য পাঁচ জন ব্যবসায়ীর মত তাঁহাকেও নিজের জিনিসের দর যাচাই সহ্য করিতে হইবে। কেহ যদি বলে, কফি জিনিসটা খুব ভাল, তাহা হইলে অমনই আমরা কফি কিনিয়া খাইতে আরম্ভ করি না। এদেশে চায়ের ব্যবহার এখন অতি প্রচুর, কিন্তু কিম্বদন্তী আছে, এই চা-ই এক সময়ে বিনা মূল্যেও লোকে গ্রহণ করিতে চাহিত না; এখন ইহার জন্য লোকে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করে, কেন না এখন লোকে জানে, ইহা হইতে তাহার একটা তৃপ্তি হইতে পারে। চায়ের প্রতি একটা রুচি এখন উৎপন্ন হইয়াছে। কবিও তেমনই কাব্য হইতে যদি অর্থ চান, তাহা হইলে

লোকের প্রত্যয় জন্মাইতে হইবে যে, ইহা হইতে তাহার একটা লাভ হইতে পারে। লোকে যে জিনিস চায় না, এমন জিনিস বাজারে উপস্থিত করিয়া যদি আশা করি যে প্রচুর অর্থ পাইব, আর সেই অর্থ না পাইয়া যদি সমাজকে গালিগালাজ করি, তাহা হইলে কেহই আমাকে বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী বলিবে না। কাব্য সম্বন্ধেই, শুধু তাই নয়, দর্শন বিজ্ঞান সম্বন্ধে, এমন কি ধর্ম্ম সম্বন্ধেও এই নিয়ম। এমন কি কোথায়ও হয় নাই যে, যে ধর্ম্ম শুনিবার জন্য এক সময়ে লোকে প্রচুর অর্থব্যয় করে, সময়ান্তরে তাহাই বিনা মূল্যেও শুনিতে চায় না?

সুতরাং শুধু কবিদের জন্য দুঃখ করার কোন সার্থকতা নাই। কবি যদি তাঁহার কাব্য দান করিয়াই সন্তুষ্ট না হন, শুধু যশে যদি তাঁহার তৃপ্তি না হয়, যদি তিনি কাব্যের বিনিময়ে অর্থ চান, তবে আমি বিবেচনা করিতে বাধ্য। প্রশংসা করিলেই পয়সা দিতে হইবে, এমন কোন যুক্তি নাই। তাজমহল দেখিয়া প্রশংসা করি, কিন্তু সে জন্য কাহাকেও পয়সা দিতে রাজী কিনা সন্দেহ। বসন্তের বাতাসে আনন্দ পাই, কিন্তু পয়সা দিয়া কিনিতে হইলে তাহা কিনিতাম কিনা সন্দেহ। কবির প্রশংসা করিতে পারি; জ্ঞানীর জ্ঞানে বিস্ময় প্রকাশ করিতে পারি; কিন্তু তার অর্থ ই এই নয়, তাঁহাকে রোজই দুইটা টাকা দর্শনী দিয়া দেখিয়া আসিতে হইবে। জিনিস বিক্রয়ার্থ বাজারে উপস্থিত করিলেই বাজারের নিয়ম মানিতে হইবে।—দরকার না হইলে কেহ তাহা কিনিবে না;—তা সে কাব্যই হউক, আর দুর্গামোণ্ডাই হউক।

ব্যবসায় ক্ষেত্রে ব্যর্থকাম হইয়া দেশের লোককে গালি দেওয়া ব্যবসায়ী হিসাবে অক্ষমতার লক্ষণ। কবিই হই আর, দার্শনিকই হই, বিক্রয়ার্থ আমার জিনিস বাজারে উপস্থিত করিলেই লোকে লুফিয়া নিবে, এমন কোন কথা নাই। হইতে পারে আমার জিনিস খুব ভাল, মূর্খতার দরুণ লোকে আমার মর্ম্ম বুঝে না; কিন্তু লোককে ইহার মর্ম্ম বুঝাইতে চেষ্টা না করিয়া তাহাকে নিন্দা করায় কি লাভ? নূতন জিনিস বাজারে উপস্থিত হইলেই লোকে কিছু কাল অপেক্ষা করিয়া ইহার গুণাগুণ পরীক্ষা করে; প্রয়োজন বোধ না করিলে কখনই সে ইহা কিনিবে না। এই সব ক্ষেত্রে চতুর ব্যবসায়ী নানা উপায়ে লোকের রুচি নিজের অনুকূল করিয়া লইতে চেষ্টা করে। কবি বা দার্শনিক যদি তাহা না করেন কিংবা করিয়াও কৃতকার্য্য না হন, তবে সে দোষটা ষোল আনাই সমাজের ঘাড়ে চাপাইলে চলিবে কেন? আমরা অন্যকে, সমাজকে, বিশ্বকে এক রকম দেখিতে ইচ্ছা করিতে পারি, কিন্তু সেই সেই বস্তু যদি সে রকম না হয়, তবে ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া লাভ কি?

টাকা অন্যত্র যে নিয়মে, যে রূপে চলে, শিল্প, সাহিত্য, ও কাব্যের বেলায়ও তেমনই তাহার গতি। অর্থশাস্ত্রের এই কঠোর সত্য অস্বীকার করার উপায় নাই।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

রীতিকা—কবিতাগ্রন্থ। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা, ১৯০ নং অপার চিৎপুর রোড, বাগবাজার, মাধুরী কার্য্যালয় হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, মূল্য ১৲ ও ৷৷০ ছাপাকাগজ মন্দ নয়।

যে সকল গুণ থাকিলে কবিতা সুখপাঠ্য হয়, সে সকল ইহাতে বড় দেখিতে পাইলাম না। শিক্ষিত বাঙ্গালাদেশের জল বায়ুর এমন একটা গুণ আছে যে কারণে রাম শ্যাম যদু সকলেই একটু কবিযশঃ লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন।

সুকবি হইতে হইলে যেমন কবি-প্রতিভার দরকার তেমনি কবি-প্রতিভা যাহাতে সম্যকরূপে বিকাশ লাভ করিতে পারে, সেজন্য সাধনাও করিতে হয়। কিন্তু যাহাদের এই দুয়েরই অভাব, তাঁহাদের পক্ষে কবিতা লেখা বিড়ম্বনা মাত্র।

অগ্রহায়ণ ১৩২৮

আলোচ্য গ্রন্থের সকল কবিতার বিশ্লেষণ করিবার মত স্থান আমাদের নাই, তবে কয়েকটি কবিতার বিশ্লেষণ করিলেই পাঠকগণ অতিসহজে রীতিকার অসাধারণ কবি-প্রতিভার পরিচয় পাইবেন।

প্রায় সকল কবিতাতেই ছন্দের দোষ আছে। এক পৃষ্ঠাতেই লাইন ৫, ১৩, ১৬, তে ছন্দ পতন দোষ যাঁহার ছন্দজ্ঞান নাই তাঁহাকেও কবিতা লিখিতে হইবে, ইহাতে কম বিড়ম্বনার কথা নহে।

তিনি "কল্পনা" কবিতার কি কহিতেছেন শুনুন—

স্বপনে স্বরগ-ধামে নিশীথ ভ্রমণে,
হেরিনু বিচিত্র শোভা সিতছায়া পথে
নাচিছে চকোর-বধূ, সহসা, শ্রবণে
পশিল বীণার ধ্বনি, পরতে পরতে।
হনু উন্মাদিনী ; যথা রাধা-বিনোদিনী
ছুটিত পুলিনে, শুনি শ্যামের বাঁশরী ;
অম্বরে ছুটিনু তথা, হাসি নির্ঝরিণী
দেখা'ল অপূর্ব্ব-দৃশ্য আ'মরি, আ'মরি.

লেখকের বিকট কল্পনা শক্তি দে'খয়া আমরাও বলি আ'মরি. আ'মরি"। কবি-নিজেই বলিতেছেন তিনি উন্মাদিনী? হইয়া অম্বরে ছুটিলেন, তবে উন্মাদিনীর গোলাপটি কি অপরাধে যে 'পপাত ধরণীতলে' তাহা ভাবিবার বিষয় বটে।

"বাঁশরী" কবিতার বিশেষত্ব "কে, নি, সা রি"। ৮ম লাইনের "প্রসারিব" সঙ্গে মিল দেওয়ার জন্যই বোধ হয় "কে নি,সা,রি"র আবির্ভাব। যাহারা শব্দের মিলের ভয়ে কবিতা লিখিতে সাহস পাইতেছেন না, তাহারা এখন হইতে এই কবির সাহায্য লউন।

"অলি"র সম্বন্ধে লেখক কহিতেছেন, "ফুলে ফুলে বেড়াও ছুটে পাগল কুটিল-আঁখি, নিবিড়-কালো কুব্জ-দেহে পুরাগ-রেণু মাখি"—অলির যে কুব্জদেহ, এ তথ্য আমরা জীবনে আর কখনও শুনি নাই।

চরণ কবিতায় 'বঁধুআছে'মধু আছে, শুধু অর্থ নাই এই যা দুঃখ।

'বর্ষা রাণী কবিতায়—

"মুছিয়ে দিয়ে ধূ'লা, বালি, ঝড়ের তুলি বুলিয়ে, নিদাঘ-ক্ষতে স্নেহের প্রলেপ দিয়েছ বুক জুলিয়ে"র অর্থ করিতে আমাদের কিন্তু মাথা ঘুলিয়ে যাওয়ার গতিক। শেষে লেখক বলিতেছেন —— "মহীয়সী মূর্ত্তি তব,

কি এক বেশ অভিনব,
হাত বাড়া'য়ে যাত্রা শেষ ধরবো গলা তোমারি"।

আমাদের বিনীত অনুরোধ লেখক মহাশয় দয়া করিয়া একাজ করিবেন না। কি জানি গলাধরার দরুণ যদি বর্ষারাণী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে কবিতা জন্মিলেও কৃষকদের ফসল ফলিবে না।

ষড়রসের পর যদি কেহ বিকটরসের পরিচয় পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা একবার "বাগ্‌দেবী" কবিতাটি পড়ুন। কবি একান্ত ভক্তি সহকারে বলিতেছেন—

"হে জননী ধন্য আমি তোমার কৃপায়।
আজ ভাষা-ভুজঙ্গিনী,
শুনি' তব বেণু-ধ্বনি,
নাচি'তেছে ফণাতুলি' প্রতি লহমায়॥"

তারপর দেখুন——"তোমার বীণার তান
তুলিয়াছে কি তুফান,
ক্ষুদ্র এই হৃদিমাঝে, স্মৃতি-সুষমায়।

'স্মৃতিসুষমায়' এখানে কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বুঝিলাম না।

২৭ পৃষ্ঠার 'কুমকুম' "কড়ি ও কোমলের" 'বকবকুম' এর —ছোট ভাই নাকি? লেখকের—"জলধি মথিয়া, মেদিনী দলিয়া লঙ্ঘি' তুঙ্গ শৈলশির" আমাদিগকে ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "অভিষেক সঙ্গীতে"র 'মথিয়া জলধি, দলিয়ামেদিনী, লঙ্ঘি' শৈলরাজি পদটির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

বহুদিন পূর্ব্বে 'ধূমকেতু' কাগজে একজন লেখক দুঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"শিয়াল শকুন চাবায় এখন
বঙ্গভাষার হাড়মাড়।"

বেওয়ারিশ বঙ্গভাষার দুর্দ্দশা দেখিয়া মনে হয় কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়।

শ্রী—

৮ম বর্ষ পৌষ ১৩২৫ ৯ম সংখ্যা

বিশ্ববিধি ও মানব সমাজ

১। বর্ত্তমান যুগের লক্ষণ সম্বন্ধে কোন মনস্বী গ্রন্থকার সংক্ষেপে একটি কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা এই—"The movement of progressive societies has hitherto been a movement from status to contract এস্থলে Status শব্দটি অধীনতার নামান্তর রূপে ধরা যাইতে পারে। প্রাচীনযুগে সমাজের উপর সমাজপতির ক্ষমতা সর্ব্বতোমুখী ও অব্যাহত ছিল। কোনও পরিবারের কর্ত্তা অধীনস্থ জনগণের পিতাপুত্রের নির্ব্বাসন, এমন কি, শিরশ্ছেদ পর্য্যন্ত করিতে পারিতেন। সমাজ ক্রমশঃ সেই অধীনতার অবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ক্রমশঃ স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। এখন যেন সমাজের প্রত্যেকেই স্বাধীন ও স্বস্ব প্রধান, এখন আর ব্যক্তিত্ব সমষ্টিতে বিসর্জ্জিত নয়, ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হইতেছে সুতরাং পরস্পর স্বাধীন সম্মতিতে ও সজ্ঞানে পরস্পরের প্রতি আচার ব্যবহার সম্বন্ধে যে নিযমাবলী নির্দ্ধারণ করেন, তদতিরিক্ত অন্য কোনও নিয়মে কেহ কাহাকে বাধ্য বা আবদ্ধ করিতে পারেন না। এখন এই নিয়মেরই প্রচলন হইয়াছে এবং বর্ত্তমান কালে যে সমাজ যতদূর উন্নত, তাহাতে এই নিয়ম ততই প্রসারতা লাভ করিয়াছে এবং অনুন্নত সমাজ জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ স্বাধীনতার দিকে সাগ্রহে দ্রুত গতিতে প্রধাবিত হইতেছে।

২। এইরূপ স্বাধীনতার যুগে বিধি বা নিয়মানুবর্ত্তিতার উল্লেখে অনেকেই বিস্মিত হইতে পারেন। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। বিধি বা নিয়মের অনুবর্ত্তিতা ব্যতীত জগতের অস্তিত্বই সম্ভবপর হইত না। এই জন্যই জ্ঞানিগণ নিরঙ্কুশ স্বাধীনতাকে স্বাধীনতা নামে অভিহিত না করিয়া উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতার আখ্যা দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না।

৩। তথাপি একথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, কেবল স্বাধীন বুদ্ধিও শক্তিশালী মানব সমাজে নহে,

সমস্ত জীব জগৎ ও জড়জগতের সর্ব্বত্রই সময় সময় উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল রুদ্রলীলার অভিনয় করিয়া থাকে ; তখন মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্বের সুনিয়মের পরিবর্ত্তে ঘোর অরাজকতার আবির্ভাব হয় এবং বিশ্বসংহারিণী মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া প্রকৃতি যেন রাক্ষসী বেশে এই সুন্দর শোভাময় জগতের যাবতীয় শোভা সম্পদ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিবে, মনে এরূপ আতঙ্কেরই সঞ্চার হয়।

৪। জড় জগতের ভীষণ জলপ্লাবন, আগ্নেয় গিরির হৃৎকম্পকারী অগ্ন্যুৎপাত এবং ভূমিকম্পের ভয়াবহ আলোড়নে একদিকে যেমন এই দানবী লীলার বিকট মূর্ত্তির পরিচয় পাই, মানবজগতেও যুদ্ধ প্রভৃতি জনক্ষয়কারী মহামারীতে আমরা সেই ভীষণ মূর্ত্তিই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। জ্ঞান-গরিমা-মণ্ডিত মানব সমাজ এই লোকক্ষয়কারী বিবাদ হইতে নিবৃত্ত না হইতে পারেন, এমন বোধ হয় না ; কিন্তু যেমন জড় জগতের প্রাগুক্ত উচ্ছৃঙ্খলতাপূর্ণ উদ্দাম ধ্বংসলীলার মূল কারণ সাধারণতঃ দুর্জ্ঞেয়, মানব সমাজের এই যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতির প্রবৃত্তির মূলেও যে কারণ নিহিত রহিয়াছে, তাহাও সেইরূপ দুর্জ্ঞেয় বলিয়াই নির্দ্দেশ করিতে হইবে। মানবজ্ঞান এই দুর্জ্ঞেয় কারণানুসন্ধানে বিরত হয় নাই। কোন কোন মনীষীর মতে প্রকৃতি বা জগৎ যে সুনিয়মে প্রতিষ্ঠিত, সেই সুনিয়মের সহিত ইহার কোনও অসামঞ্জস্য বা বিরোধ নাই। কালের আবর্ত্তনে যখন যে যে বস্তু স্বকীয় কর্ম্ম সম্পাদনে অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে, তখনই সেই সেই বস্তুকে অভিনব কার্য্যক্ষম আকার প্রদানের জন্য এই ধ্বংসলীলার আবির্ভাব, এই ধ্বংসলীলা প্রকৃতির সৃষ্টিলীলারই মূলে নিহিত।

৫। এইরূপ সামঞ্জস্যবাদের দিক্ দিয়া না দেখিলেও, এই উচ্ছৃঙ্খল ধ্বংসলীলা বিশ্বব্যাপী সুনিয়মের একটি দৃষ্টতঃ ব্যভিচার মাত্র, একথা বলা যাইতে পারে। এই উচ্ছৃঙ্খলতা যেন বিশ্বের সুনিয়মের সামান্য ব্যভিচার, কোন অজ্ঞের প্রয়োজন সাধন জন্য ইহার আবির্ভাব, আবার মুহূর্ত্তকাল পরেই ইহার তিরোভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। যদি এই উদ্দাম ধ্বংসকারিণী লীলা প্রকৃতির নিত্য স্বভাব হইত, তবে ইহা চিরকাল বর্ত্তমান থাকিত ; কিন্তু ইহা তো চিরকাল বর্ত্তমান থাকে না। এইরূপ উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা জড়জগতে বা জীবজগতে যখনই দৃষ্টিগোচর হয়, তখনই আমরা নিশ্চিত বুঝি ও দৃঢ় বিশ্বাস করি যে, ইহা ক্ষণকাল পরেই অন্তর্হিত হইবে, এবং প্রকৃতির সুষ্ঠু নিয়ম বা বিধি পুনরায় এই জগৎসংসারে প্রবর্ত্তিত হইবে ও শোভাময় বিশ্বরাজ্যের অনন্ত অপূর্ব্ব শোভা কখনও চিরকালের জন্য ধ্বংস বা অপনীত হইবে না। প্রকৃতিও সর্ব্বদাই এইরূপই দেখা যাইতেছে। সুতরাং আমরা ইহা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতে পারি যে, জড়জগতে ও জীবজগতে যতপ্রকার উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতার লীলাই অভিনীত হউক না কেন, তৎসমস্ত জগতের সুনিয়মের পথে দৃশ্যতঃ ক্ষণিক বাধা প্রদান করিলেও মূলবিধির সহিত উহার যে এক নিগূঢ় সামঞ্জস্য আছে, তাহা সর্ব্বত্র সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত না হইলেও, যে সুন্দর নিয়মে বিশ্ব বিধৃত ও প্রতিষ্ঠিত, এরূপ রুদ্রলীলাসমূহ সেই সুনিয়মের সামান্য ব্যভিচার মাত্র,—অলক্ষ্যে সর্ব্বদাই সেই সুনিয়ম অব্যাহত থাকিয়া বিশ্বস্থিতির মূল ধারা রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

৬। আমরা এই বিশাল বিশ্বে বিধির অবিরাম প্রতিষ্ঠা সপ্রমাণ করিবার জন্য যে সকল কথার আলোচনা করিলাম, জগতের দৈনন্দিন অতিশয় সাধারণ ঘটনা হইতেই তাহার সমর্থন করা যাইতে পারে। প্রতিদিন দিবাভাগে নিয়মিত সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তে,—রজনীতে চন্দ্রোদয় ও চন্দ্রাস্তে, জোয়ার ভাটার গতিতে, জীবজগতের জন্ম, পরিবর্দ্ধন ও পরিণতিতে সমস্ত জগৎ যে সুন্দর নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। একটু অনুসন্ধান করিয়া যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যাউক না কেন, এইরূপ শত সহস্র দৃষ্টান্ত আমাদের নয়নপথের পথিক হইবে এবং জগৎ যে সুন্দর

বিধির বা নিয়মের অনুবর্ত্তিতা ব্যতীত ক্ষণকালও চলিতে পারে না, তাহা স্বীকার করিতে আর কোনরূপ সঙ্কোচ বা সন্দেহের কারণ থাকিবে না।

৭। এইরূপে সমস্ত জগৎ বিধি বা নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকায় জগতের বিভিন্ন বস্তু পাছে নিয়মের অন্ধ দাস হইয়া নিজ নিজ উন্নতি, বিকাশ, পরিণতি ও সার্থকতা লাভ করিতে না পারে, তজ্জন্য আবার এই নিয়ম বন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেককেই যেন কতকটা স্বাধীনতা বা স্বাধীন শক্তির অধিকারী করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাই তাহারা মূল বিধির অধীন হইয়াও নিজ নিজ পথে উন্নতি, পরিণতি লাভ করিয়া সমগ্র জগতের শোভাসম্পদ বৃদ্ধির সহায়তা করিতেছে। এবং মূল বিধানের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের উন্নতি ও পরিপুষ্টির সাহায্যকল্পে যে সব স্বাধীন শক্তি অথবা অবান্তর নিয়মাবলী কার্য্য করিয়া থাকে, সেই সব নিয়মাবলী মূল বিধিরই অঙ্গীভূত। এইরূপে আমরা সাধারণ দৃষ্টিতে জগৎ প্রতিষ্ঠার মূলে নিহিত মূলবিধির সহিত যে সব নিয়মাবলীর সংশ্রবশূন্যতা ও বিরোধ দেখিয়া থাকি, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে তত্ত্বানুসন্ধান করিলে, মূল বিধির সহিত তৎসমূহের অঙ্গাঙ্গী যোগ ও সামঞ্জস্য দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারা যায় না এবং আমরা যতই স্বাধীনতাপ্রিয় হই না কেন, স্বাধীনতামাত্রেই যে বিধি বা নিয়মের গণ্ডীতে সুদৃঢ়রূপে আবদ্ধ ও সঙ্কুচিত, তাহা আমাদের জ্ঞাননেত্রের নিকট তখন সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। যাহা হউক, আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে বিশ্বের মূলবিধি ও তাহার দৃশ্যতঃ বিরুদ্ধ নিয়মাবলীর সামঞ্জস্য সপ্রমাণ করিতে প্রয়াসী না হইয়া বিশ্বের মূল বিধি কি, এবং মানব সম্বন্ধে তাহার প্রভাব কিরূপ, তৎসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

৮। সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে মানবের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। প্রাগৈতিহাসিক যুগের গ্রন্থে দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ প্রভৃতির বিবরণ বহুল পরিমাণে বর্ণিত আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তৎসমস্ত আমাদের সাধারণ চক্ষুর প্রত্যক্ষের বহির্ভূত। আমরা যাহা সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, তাহা জড়জগৎ ও জীবজগৎ, এই দুই ভাগে বিভক্ত। জড়জগৎ অপেক্ষা জীবজগৎ শ্রেষ্ঠ, মানব জীবজগতের সম্রাট। কিন্তু মানব জীবজগতের সম্রাট হইলেও এবং তাহার স্বাধীনতা ও চিন্তাশক্তি অসামান্য হইলেও সে বিশ্ব সাম্রাজ্যের নগণ্য প্রজা ব্যতীত আর কিছু নহে। তাহার ক্ষমতা অপরিসীম এবং সে স্বাধীনতার অনন্ত প্রতিমূর্ত্তি হইলেও, বিশ্ব সাম্রাজ্যের নিকট তাহার ক্ষমতা তুচ্ছাতিতুচ্ছ,—বিশ্ববিধির নিকট তাহার গর্ব্বোন্নত মস্তক অবনত, বিশ্ববিধির পদে সে চিরপ্রণত। প্রকৃতির এই উদ্দাম দুর্দ্দমনীয় চিরচঞ্চল শিশুকে আর কেহই ভীত সন্ত্রস্ত করিতে পারে নাই,—সকলের নিকট হইতেই সে আপনার প্রাপ্য কর আদায় করিয়া লইয়াছে, সকলকেই শাসন করিতে অগ্রসর হইয়া কৃতকার্য্য হইয়াছে, কিন্তু কেবল বিশ্ববিধির নিকট সে পরাভূত হইয়াছে।

৯। তবে একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, সেই পরাভবেও সে প্রকারান্তরে জয়ী হইবার জন্য চেষ্টা করিতে ত্রুটি করে নাই—তাহার পরাভব প্রকারান্তরে তাহার জয় ঘোষণা করিতেছে এবং সে বিশ্ববিধির দাস হইয়া বিশ্ববিধিকেও যেন প্রকারান্তরে নিয়ন্ত্রিত করিয়া 'মানব" এই গৌরবজনক আখ্যায় অভিহিত হওয়ার উপযুক্ত হইয়াছে।

১০। আমরা এইক্ষণে বিশ্ববিধি কি, এবং মানব কিরূপে তাহার অধীন হইয়াও প্রকারান্তরে তাহাকে পরাভূত করিবার স্পর্দ্ধা অর্জ্জন করিয়াছে, তাহা দেখিতে যত্ন করিব।

১১। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিধি বা নিয়ম জগৎ প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ জগৎস্থিতির মূলে নিহিত। সেই বিধির সহিত পরিচিত থাকা মানবমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। অচেতন জড় পদার্থ এবং ইতর জন্তুর পক্ষে বিধি না জানিলে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। অচেতন জড় পদার্থ নিয়তি-

নির্দ্দিষ্ট পথে আপনা আপনি চলিয়া থাকে, অজ্ঞ ইতর জন্তুগণও অন্ধ শক্তি বা অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক শক্তির (Instinct) প্রভাবে নিয়মের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে। কিন্তু যাহাদের জ্ঞান আছে, যাহারা জ্ঞানের অভিমান করিয়া থাকে, তাহাদের পক্ষে বিধি বা নিয়ম অনবগত থাকা কিছুতেই সঙ্গত হইতে পারে না। আইনের একটি প্রচলিত নিয়ম Ignorance of law is no excuse. অতএব জ্ঞানাভিমানী মানবের নিজ দেশের বিধি জানা সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য। ইয়ুরোপের একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত শিশুপাঠ্য কোনও গ্রন্থের প্রারম্ভে দেশের বিধি বা নিয়মের প্রতি যাহাতে শিশুগণের মতি আকৃষ্ট হয়, তজ্জন্য যে কয়টি কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তিনি লিখিয়াছেন ;—"Any man who should attempt to live in a country without reference to the laws of that country, would very soon find himself in trouble, and if he be fined, imprisoned or even hanged, sensible people would probably consider that he had earned his fate by his folly." &c. &c.

কোনও ক্ষুদ্র municipality র অধীনে বাস করিয়াও তাহার বিধি বিধান না জানিলে, সামান্য কারণে, একটু ত্রুটীতে কত লাঞ্ছনাই না ভোগ করিতে হয়, কতরূপেই না বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়। ইহাতে সহজেই বুঝা যায় যে, কোন দেশের বিধি না জানিয়া তথায় বসবাস করিতে গেলে আরও কতদূর বিপদে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা। আমরা যে প্রদেশে বসবাস করি, সে প্রদেশের বিধির সহিত পরিচয় না থাকিলেই যদি পদে পদে এত অসুবিধা ও অনর্থ ঘটিবার আশঙ্কা থাকে, তবে এ বিশাল বিশ্বরাজ্যের প্রজা হইয়া বিশ্বের বিধির সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলে যে কতদূর অধিকতর বিপদ ও দুর্দ্দশা ঘটিতে পারে, তাহার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। পক্ষান্তরে, বিশ্বরাজ্যের প্রজার পক্ষে বিশ্বের বিধি অবগত থাকিলে, এ বিশ্বে বসবাস করা বহু পরিমাণে সুগম হইয়া উঠিবে। জ্ঞানাভিমানী মানবের পক্ষে সর্ব্বপ্রকারেই বিশ্ববিধির সহিত পরিচিত থাকা একান্ত প্রয়োজন।

১২। এই বিশ্ব যেমন অনন্ত ও অপরিসীম, ইহার বিধিও তেমনি অনন্ত ও অসংখ্য। এই অনন্ত অসীম বিশ্বের অসংখ্য বিধি জানিতে চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি?

১৩। স্থূল দৃষ্টিতে এরূপ প্রচেষ্টা ফলবতী হওয়ার সম্ভাবনা নাই, এইরূপ প্রতীয়মান হইলেও, আমাদের নিরাশ হইবার কারণ নাই। যে অনন্ত শক্তিমান্ এই বিশাল বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন, তিনি জগতে অনন্ত ও বিচিত্ররূপে প্রকাশিত হইয়াও নিজে যেমন একমাত্র অনন্ত ও অদ্বিতীয় মহাপুরুষ, তেমনি এই অসীম বিশ্ব-রাজ্যের অসংখ্য ও বিচিত্র বিধিসমূহকেও যেন একটিমাত্র সুস্পষ্ট মহান্ ও একতাপূর্ণ বিধির শৃঙ্খলায় সংবদ্ধ রাখিয়াছেন। অসংখ্য মণিরত্ন বিভূষিত হার যেমন একটি সূত্রে গ্রথিত থাকে, সেইরূপ এই জগতের অসংখ্য বৈচিত্র্যময় বিধিসমূহও একটি সুন্দর নিয়ম-সূত্রে বিধৃত রহিয়াছে। যেমন একটি অতি সূক্ষ্ম বীজ হইতে অসংখ্য ফল পুষ্প পত্র শাখাদি সমন্বিত বিশাল মহীরুহের উৎপত্তি —তেমনই সমুদয় বিধিগুলি সেই মূল বিধির বিকাশ ও অভিব্যক্তি মাত্র। যেমন বীজের প্রকৃতি রীতি বুঝিতে পারিলে বৃক্ষেরও প্রকৃতি রীতি সম্যক্ না হইলেও অনেকটা অধিগত হয়, তেমনি সেই মূলবিধির সহিত পরিচিত হইতে পারিলেই আমরা বিশ্বের অনন্ত অসংখ্য নিয়মাবলীর প্রকৃতি রীতি নীতির ধারণা করিতে বহু পরিমাণে সমর্থ হইব। এবং মানবাত্মা সেই জগৎ সবিতারই আংশিক স্ফুরণ স্বরূপে সেই জ্ঞানানুসন্ধানে কেবল যে তৎপর তাহা নহে, সেই জ্ঞান লাভের অধিকারী

বটে †। অতএব আমরা একতার সেই মূলবিধির অনুসন্ধান করিতে যত্নবান্ হইব।

১৪। এইরূপ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে প্রথমেই সসঙ্কোচে একটী কথা বলিতে হইতেছে যে, যদিও মানবের চিন্তা ও জ্ঞান ক্রমশঃ উন্নতিশীল, যদিও মানব পুরুষপরম্পরাগত জ্ঞানভাণ্ডারের উত্তরাধিকারীরূপে পূর্ব্ববর্ত্তীগণাপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানসমৃদ্ধ, তথাপি এই গুরুতর বিষয়টির তত্ত্বানুসন্ধান বহু প্রাচীন কাল হইতেই আরব্ধ হইয়াছে, এবং আমাদের প্রাচীন পূর্ব্বগামী মনীষিগণ এই জটিল বিষয়ে যে তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, তদপেক্ষা সমীচীন ও উৎকৃষ্টতর কোনও তত্ত্বের উদ্ভাবন পরবর্ত্তীগণের অসাধ্য।

১৫। আমরা এইমাত্র মানবের জ্ঞানের ক্রমোন্নতির উল্লেখ করিয়াছি। মনীষী ও কবিগণ সমস্বরে বিশ্বের ক্রমোন্নতি বা ক্রমবিবর্ত্ততত্ত্বের সমর্থন করেন। কবি Tennyson আপনার স্বাভাবিক কোমল প্রাঞ্জল কবিত্বময় সরল ভাষায় বিশ্বের এই ক্রমোন্নতিতত্ত্ব সমর্থন করিতে গিয়া গাহিয়াছেন,—

"For throughout nature one increasing purpose runs.
And the minds of men are widened with the processes of the suns".

এই ক্রমোন্নতি তত্ত্ব সমর্থন করিতে যাইয়া অনেক মহাত্মা নানাপ্রকার উদ্ভট কল্পনারও সাহায্য গ্রহণ না করিয়াছেন, এমন নহে। তাঁহাদের কেহ কেহ এরূপ মতও পোষণ করেন যে, হিন্দুর পৌরাণিক দশমহাবিদ্যায় ও দশাবতারের কল্পনায়ও কলিকালের অবসানে সত্যযুগের আবির্ভাব সূচক গাথার ইঙ্গিতে ক্রমোন্নতি তত্ত্বই ঘোষণা করিতেছে। জড়জগতে ও জীব-জগতে ক্রমোন্নতির ধারা দেখাইয়া প্রমাণ প্রয়োগ দিতে চেষ্টার কোন ত্রুটি হয় নাই। এইরূপে সমগ্র বিশ্বের বিরাট বিশাল অঙ্গ যে কালের আবর্ত্তনে ক্রমে পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে, ইহাই মনীষিগণের ধ্রুব সিদ্ধান্ত।

১৬। মনীষিগণ এই ক্রমোন্নতি তত্ত্ব সমর্থনের জন্য যে সমস্ত সুন্দর সুন্দর যুক্তি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, এস্থলে তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। সাধারণতঃ তৎসম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ না থাকিলেও এই বিশাল বিশ্বদেহের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সর্ব্বদাই যে ক্রমোন্নতির লক্ষণ প্রকটিত হইতেছে, তাহা সাধারণের নেত্রপথের গোচরীভূত নহে। বীজ বৃক্ষে পরিণত হয়, বৃক্ষ হইতে ফুল, ফল জন্মে, ফল হইতে পুনরায় বীজেরই আবির্ভাব, মধ্যের অবস্থাগুলি ক্রমোন্নতির পরিচায়ক হইলেও, চরমে পূর্ব্বাবস্থারই পুনঃ প্রাপ্তি দেখিতে পাওয়া যায়। একটি অসহায় নিরবলম্ব শিশুর, সবল অঙ্গসৌষ্ঠব-সম্পন্ন জ্ঞানবান্ যুবকে, যুবকের পুনরায় সুপরিপক্ক জ্ঞা ও অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন বৃদ্ধে পরিণতি, এমন কি বৃদ্ধের দেহাবসানেও তদীয় জ্ঞানের ফল তাহার বংশ ও শিষ্যানুশিষ্য ক্রমে মানব সমাজের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া যখন

† "The essential unity of the Divine mind causes a necessary unity in the process by which things exist and grow, no less than a unity in the type of their manifold general species. Into both manifestations of Divine mind, we are by the essential unity of our Divinely emanated human souls, compelled to inquire. Our human reason, as proceeding from the Divine reason, is constantly employed in working out a unity or consistency of plan, to speak more popularly, in the process of our own little lives; and we are thus naturally determined to seek for such a unity, consistency & necessary dependence, in all the operations of the world, which exists only, as has been well said, in reason, by reason and for reason." Blackie.

অশেষ কল্যাণ সাধন করে, দেখা যায়, তখন এই সব অবস্থাগুলি ক্রমোন্নতির ফল বলিতে কেহই কুণ্ঠাবোধ না করিতে পারেন,—কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কালক্রমে সেই যুবক যদি বিকৃতমস্তিষ্ক লোলচর্ম্ম বৃদ্ধে পরিণত হয়, তখন তাহা ক্রমোন্নতির ফল স্বীকার করিতে কেহই অগ্রসর হইবেন না। এইরূপ বিসদৃশ ঘটনার জন্য নানাবিধ কারণ পরস্পরের উপর দোষারোপ করা অতি সহজ; কিন্তু পদে পদে এরূপে ক্রমোন্নতি তত্ত্বের সমর্থনের জন্য কারণ প্রদর্শন না করিয়াও এই দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বটী সাধারণের বোধগম্যরূপে অবস্থান্তর প্রাপ্তি নামেই পরিচিত করিয়া দিতে পারি। জ্ঞানিগণ বলেন, ক্রমোন্নতি বিশ্ববিধি; আমরা এই ক্রমোন্নতি তত্ত্বটির একটু আলোচনা করিতে যাইয়া এ বিশ্বের কয়েকটি ঘটনায় ইহার যেরূপ অভিব্যক্তি দেখিতে পাইলাম, তাহাতে আরোহ-পদ্ধতি (inductive method) অনুসরণে নিঃসঙ্কোচে নির্দ্ধারণ করিতে পারি, অবস্থান্তর প্রাপ্তিই বিশ্ববিধি অর্থাৎ অনাদি অনন্তকাল যাবৎ এই বিশ্বের বিশাল দেহ, এমন কি ইহার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পর্য্যন্ত সাধারণ লোকলোচনের গোচরেই প্রতিমুহূর্ত্তে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতেছে অথবা রূপান্তর পরিগ্রহ করিতেছে। অধিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই। একবার মানব জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখুন, কিরূপ বিচিত্র কৌশলে সামান্য পরমাণু হইতে মাতৃগর্ভে ভ্রূণের শরীর গঠন, সেই অসহায় ভ্রূণের জন্মগ্রহণ, অনন্তর অন্যের সাহায্য ব্যতীত প্রথমতঃ তাহার সামান্য কার্য্য সম্পাদনে অক্ষমতা ও ক্রমে ক্রমে কার্য্যক্ষম সুন্দর সুদৃঢ় বপুঃ লাভ করিয়া মনোহর যুবকে পরিবর্ত্তন, পুনরায় সেই যুবকের শিথিলাঙ্গ বৃদ্ধের পদবীতে আরোহণ ও পরিশেষে এই পরিদৃশ্যমান সংসার-রঙ্গালয় হইতে তাহার অপসৃত হওন,—সমস্তই এই অবস্থান্তর প্রাপ্তি বা রূপান্তর প্রাপ্তি তত্ত্ব সুস্পষ্টভাবে লোকের নিকট প্রকটিত করিতেছে।

১৭। বিশ্বের এই অবস্থান্তর বা রূপান্তর প্রাপ্তি তত্ত্বটি আমরা আরও একটু পরিস্ফুট করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব। বিশাল বিশ্বের প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রতি মুহূর্ত্তে একরূপ হইতে রূপান্তর গ্রহণ করিতেছে, এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতেছে, আজ যে জিনিষ যে অবস্থায় আছে, যে অধিকারের অন্তর্ভূত আছে, কাল সে জিনিষ সে অবস্থায় থাকিবে না, সে অধিকারে থাকিবে না, অন্য অধিকারে যাইয়া পড়িবে। মূলকথা এই, বিশ্বের সমস্ত দ্রব্যসম্ভার প্রতিমুহূর্ত্তে এক অধিকার হইতে অন্য অধিকারে—বীজ চারাগাছের শ্রেণীতে, চারা গাছ বৃক্ষের শ্রেণীতে, শিশু যুবকে যুবক বৃদ্ধে পরিণত হইয়া পূর্ব্বে যে যে বস্তু যে যে অধিকারে ছিল, সেই সেই বস্তু সেই সেই অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়া অন্য অধিকারে —এক ভাবরাজ্যের সীমা হইতে অন্য ভাবরাজ্যের সীমায় অর্থাৎ আরও পরিষ্কাররূপে বলিতে গেলে, এক হস্ত হইতে হস্তান্তরে যাইয়া পড়িতেছে। এই অবস্থান্তর বা হস্তান্তর তত্ত্বটিও বিশ্বের মূলবিধি।

১৮। এই অবস্থান্তর বা হস্তান্তর কথাটি অতি ক্ষুদ্র হইলেও জ্ঞানবিজ্ঞানবিদ্ মানবসমাজে ইহার প্রভাব কিরূপ গুরুতর, তাহা বুঝা বড় সহজ নহে। জগতের জড় অচেতন অগণিত দ্রব্যসম্ভার অবিরত রূপান্তরিত বা হস্তান্তরিত হইলেও তাহাদের বিদ্রোহ ভাবের পরিচয় আমরা সচরাচর প্রত্যাশা করি না। অনন্ত চেতনময়ের সত্ত্বা যেমন তাহাদের মধ্যে অস্ফুটভাবে বিরাজিত, তাহারা রূপান্তর বা হস্তান্তরে কোনরূপ বিদ্রোহের পরিচয় দিলেও তাহা সেইরূপ যবনিকার অন্তরালে অস্ফুটভাবেই থাকে—অনন্ত জাগ্রত ভাব ধারণ করিয়া তাহা প্রকাশ পায় না। কিন্তু সচেতন মানব-জগৎ এই রূপান্তর সহজে বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ, অবস্থান্তর বা হস্তান্তর ব্যাপার সর্ব্বদা মানবের চক্ষে অনুকূল বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। আত্মরক্ষা এবং আত্মবিকাশের অনুকূল ভাবিয়া মানব

যে যে সম্পত্তি সংগ্রহে দিবানিশি প্রাণপণ যত্ন করিয়া থাকে, বিশ্বের এই চিরন্তন বিধি রূপান্তর তত্ত্বের অধীন বলিয়া সেই সেই সম্পত্তি সর্ব্বদাই রূপান্তর পরিগ্রহ করিতেছে এবং এক হস্ত হইতে অন্যহস্তে সরিয়া যাইতেছে। তাই মানব আপন সম্পত্তি ধন জন যখনই বিশ্বের চিরন্তন বিধির অধীনে হারাইতে বসে, তখনই সে আর নীরব থাকিতে পারে না, এবং কেবল নানারূপ কাতরোক্তিতেই তাহার বিদ্রোহের ভাব প্রকাশিত হয় না, পরন্তু সে নানা আয়োজনের সৃষ্টি করিয়া তাহার প্রভাব বিফল করিতে প্রয়াসী হয়।

১৯। মানবের এই প্রয়াস, এই উদ্যম পুনঃ পুনঃ বিফলীকৃত হইয়াছে। ভ্রমান্ধ মানব সংসারে প্রবেশ করিয়া প্রথম প্রথম আশার মোহিনী কল্পনায় কতই সুখের চিত্র না অঙ্কিত করিয়া থাকে, ও হৃদয়ের অন্তস্তলে কত মনোমুগ্ধকর ভাবই না পোষণ করে, কিন্তু ক্রমে যখন বিশ্বের চিরন্তন বিধিদ্বারা পদে পদে বিড়ম্বিত হইতে থাকে, তখন বুঝিতে পারে, যে, কঠোর বিশ্ববিধি পর্য্যুদস্ত হইবার নহে, বস্তুতঃ সে নিজেই বিশ্বরাজ্যের নগণ্য প্রজা মাত্র. প্রতি পদক্ষেপেই তাহার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তাই মানব অতৃপ্ত বাসনার মোহে মুগ্ধ হইয়া এতকাল যাবৎ যে সব করুণ আর্ত্তনাদ করিয়াছে, যুগে যুগে তাহার ভাব ধারা ধরিয়া কবিগণ নানা ভাবে কাব্যে, অদ্বিতীয় শিল্পীগণ শিল্পে তাহা প্রতিফলিত করিয়া মানব হৃদয়ে স্থায়ী আসন অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের "যেতে নাহি দিব" কবিতায় সেদিনও যে বিলাপগীতি বঙ্গভাষায় ঝঙ্কৃত হইয়াছে, তাহার মূলে বিশ্বের এই চিরন্তন কঠোর বিধিই বর্ত্তমান।

২০। প্রাচীনকাল হইতে এপর্য্যন্ত যে সকল মনীষী ও ধর্ম্মবেত্তা এই ধরাধামে আবির্ভূত হইয়া মানব সমাজ অলঙ্কৃত করিয়াছেন এবং মানবসমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা এই কঠোর তত্ত্বটি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং এই একটি মাত্র তত্ত্ব নানাবিধ বিচিত্রভাবে ও ভঙ্গীতে জনসমাজে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। জনসমাজের গঠন ও স্থিতির জন্য তাঁহারা যে যে নিয়মাবলী নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বিশ্ববিধির এই কঠোর তত্ত্বটীও নানারূপ আচরণের মধ্যে পড়িয়া নানাভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

২১। যেমন একটীমাত্র আলো লাল, পীত, হরিৎ, লোহিত প্রভৃতি বিভিন্ন রঙ্গের কাচের আবরণে নানাবিধ রঙ্গের আলো বলিয়া প্রতিভাত হয়, তেমনই এই একটি মাত্র মূলতত্ত্ব বিভিন্ন ধর্ম্মবেত্তার নিকট হইতে বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা লাভ করিয়াছে। ইহাতে তাঁহারা যে মানবসমাজের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন না, তাহা নহে; অথবা তাঁহারা যে কপটতাপ্রিয় ও বঞ্চক ছিলেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে এরূপ অসঙ্গত অভিযোগ করিবারও কোন কারণ নাই। স্নেহময়ী জননী যেমন যে সন্তানের নিকট যে বস্তু প্রিয়, যাহার যাহা উপযোগী, তাহাকে তাহা দিয়া পোষণ করেন, বিজ্ঞ চিকিৎসক যেমন বিভিন্ন রোগীর জন্য বিভিন্ন পথ্যের ব্যবস্থা প্রদান করেন, হিতকর অথচ তিক্ত বটিকা সুমিষ্ট দ্রব্যের সূক্ষ্ম আবরণে আচ্ছাদিত করতঃ ব্যবহারের সুবিধা করিয়া রোগী নিরাময় করিয়া তোলেন, তেমনি মানব সমাজের অকৃত্রিম বন্ধু সেই মহাপুরুষগণ এই কঠোর তত্ত্বটাকে নানাবিধ ভাবে প্রকাশ করিয়া বিভিন্ন রুচিশীল মানবসমাজের উপযোগী করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

২২। এইরূপে এই রূপান্তর তত্ত্বটীর কঠোরতা দূরীভূত করিবার যত্ন সত্ত্বেও দুই এক স্থানে তাহা স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াও পড়িয়াছে। ভারতের সেই অদ্বিতীয় গ্রন্থে—যাহা একাধারে মহাকাব্য হইয়াও ইতিহাস, এবং ইতিহাস হইয়াও ধর্ম্মগ্রন্থ বা পঞ্চমবেদ, সেই মহাভারতে যখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বকরূপী ধর্ম্মের প্রশ্নের উত্তরে বিশ্বের বার্ত্তা যে ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন, "মাসর্ত্তু দর্ব্বীপরিবর্ত্তনেন সূর্য্যাগ্নিনা রাত্রিদিবেন্ধনেন। অস্মিন্

মহামোহময়ে কটাহে ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা।”— তাহাতে নানাবিধ ভাবে ও ছন্দে আন্দোলিত ও ধর্ম্মকোলাহল মুখরিত আমাদের জীবন যাত্রার মধ্যেই যেন আমরা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠি। বস্তুতঃ মহামনা যুধিষ্ঠির যে তত্ত্বটী বলিয়াছেন, তাহাই বিশ্বের চিরন্তন বিধি। গভীর ভাবে চিন্তা করিলে “কাল যে ভূত সমূহকে পরিপাক করিয়া পরিণতি ঘটাইতেছে”, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহের কারণ থাকে না, ইহাই সাধক কাঙ্গাল হরিনাথের ভাষায় কর্ম্ম-কারের হাপুড়ে পুড়িয়া পুড়িয়া ক্রমশঃ বিশুদ্ধতর হওয়ার সহিত উপমিত হইতে পারে এবং রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলিতে “দিনে দিনে তুমি নিতেছ আমায় সে মহা দানেরই যোগ্য করে”, এই ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। এইরূপে ক্রমোন্নতি তত্ত্বট মহামনা যুধিষ্ঠিরের মহাবাণীতে স্পষ্টরূপে প্রকটিত হইলেও মানব সমাজ তাহার সেই সুন্দর ভাবটীর ধারণা করিতে আদৌ প্রস্তুত হয় নাই। স্বয়ং বিশ্বের রূপান্তর বা রূপান্তর তত্ত্বের কঠোরতাই যেন ঐ মহাবাণীতে অকপটে প্রকটিত হইয়াছে, এই ভাবটীকে ধরিয়া মানব বিভীষিকাগ্রস্ত জীবের ন্যায় আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়াছে।

২৩। আমরা এইবার মহাপুরুষ ও আচার্য্যগণের উপদেশ ও আচরণের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহাতেজা ধনঞ্জয়কে আপনার প্রিয়তম সখা ও শিষ্যকে বিশ্বের চিরন্তন বিধি সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, দেখুন—

“মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত॥

এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে সুখ ও দুঃখের কারণ অস্থায়ী ও পরিবর্ত্তনশীল, অতএব তিতিক্ষা অবলম্বন কর।

পুনরায়—

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।

মানব, সুখ ও দুঃখের কারণ সতত চঞ্চল অবস্থার পরিবর্ত্তন ধ্রুব জানিয়া তুমি তাহাতে বিচলিত হইও না। এজগতে সুখ সুবিধার জন্য তুমি ব্যস্ত ও লালায়িত, দুঃখ দূরে রাখিতে সুখের উপকরণ সংগ্রহ করিতে ও তাহা চিরকাল আয়ত্ত রাখিতে ব্যতিব্যস্ত, কিন্তু জানিও তাহা চিরকাল কাহারও বশে থাকিবে না, তাহা অবিরত রূপান্তরিত, হস্তান্তরিত হয়,—অতএব তুমি তিতিক্ষা অবলম্বন কর, তাঁহারাই স্থিতধী মুনি, যাঁহারা এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে সুখদুঃখের কারণ পরম্পরার পরিবর্ত্তনে অণুমাত্রও বিচলিত হন না তুমি সামান্য সম্পদ ও সুখদুঃখের কারণ পরিবর্ত্তনে এত বিচলিত কেন? তোমার সম্পত্তির বিনাশ, আত্মীয় স্বজনের দেহান্তর বা নিধন, এ সব তো তুচ্ছ, তোমার নিজ দেহেরই যে অবস্থান্তর ঘটিবে, এমন কি বিনাশ পর্য্যন্ত হইবে, একটু ধীর চিত্তে ভাবিয়া দেখিলে, তাহাতেও তোমার ক্ষোভ করিবার কোনই কারণ নাই, যে হেতু—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥

শিশু যেমন যুবক হয়, যুবক যেমন বৃদ্ধ হয়, দেহের এইরূপ অবস্থান্তর যখন নিত্য প্রত্যক্ষ, তাহাতে যদি অনুশোচনার কিছু না থাকে, দেহের নাশও তেমনি রূপান্তর মাত্র, তাহাতেও দুঃখিত হওয়ার কোনই কারণ নাই।

এই ভাবটী নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে আরও পরিস্ফুট—
“অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥

তোমার বর্ত্তমান দেহ (অবস্থা) পূর্ব্বে ছিল না, পরেও থাকিবে না, অতএব তজ্জন্য শোক কর কোনও প্রয়োজন নাই। এই সমস্ত বাক্যের মধ্যে বিশ্ববিধির যে মূলসূত্র পাইয়াছি, তাহা অন্তর্নিহিত।

২৪। লোকোত্তরচরিত মহাপুরুষগণ শুধু এই উপদেশ দিয়াই বিরত হন নাই, তাঁহারা অলৌকিক শক্তি-

বলে নিজ নিজ জীবনে এই উপদেশ প্রতিপালন করিয়া পরবর্ত্তিগণের নিকট উজ্জল আদর্শও স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। সংসারের ঘটনাচক্রে ঘাত প্রতিঘাতে শোক, ক্ষোভ বা দুঃখের কারণ উপস্থিত হইলে বিচলিত হন নাই, সুখের উল্লাসেও কর্ত্তব্যপথ হইতে ভ্রষ্ট হন নাই—পরন্তু নির্ব্বিকার চিত্তে প্রসন্নবদনে সকল অবস্থা বা অবস্থান্তরই বরণ করিয়া লইয়া তাঁহারা ধন্য ও মানবজাতিকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত মানবের ধর্ম্মপুরাণ ও ইতিহাসের অঙ্কে অঙ্কে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। অযোধ্যাপতি দশরথের প্রাজ্ঞ অমাত্য সুমন্ত্রের একটি কথায় আমরা এই ভাবটি পরিস্ফুটরূপে সহজেই বুঝিতে পারি। পিতৃনিদেশ বশবর্ত্তী হইয়া রামচন্দ্র বনবাসে প্রস্থান করিলে, রামচন্দ্রের তৎকালীন অবস্থা বর্ণনায় তিনি বলেন,

"আহূতস্যাভিষেকায় বিসৃষ্টস্য বনায় চ।
ন ময়া দর্শিত স্তস্য স্বল্পোঽপ্যাকারবিভ্রমঃ॥"

রামকে যুবরাজ পদে অভিষেকের জন্য আমন্ত্রণ করিবার সময় তাঁহার মুখমণ্ডলে যে ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল, বনবাসে গমনের আদেশ প্রদানেও সে মুখমণ্ডলে ভাবের কোনই ব্যত্যয় হয় নাই,—কোন অবস্থায়ই সেই মুখমণ্ডলে কিঞ্চিন্মাত্র বিকারের আবির্ভাব হয় নাই, ইহাই লোকোত্তরচরিত মহাত্মাগণের জীবনের মেরুদণ্ড এবং ইহার মূলে সেই কঠোর বিশ্ববিধিরই শিক্ষা।

২৫। জ্ঞানের অবতার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের 'মোহমুদগরে" আমরা সংসারের অনিত্যতা সর্ববস্তুর অস্থায়িত্ব প্রতিপাদক যে বর্ণনা পাই, তাহাও গীতার পূর্ব্বোক্ত উক্তিসমূহের প্রতিধ্বনিমাত্র। তিনি বিশ্ববিধির ভাবেই অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। অনন্তর বোধিসত্বের উপদেশাবলীর প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিপতিত হয়। যে রাজকুমার স্বয়ং অশেষ ভোগসুখে লালিত পালিত, পরিবেষ্টিত হইয়াও জীবদেহের ভীষণ পরিণাম দর্শনে পিতার সুবিশাল রাজ্য ও সুবিপুল ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ ধূলিমুষ্টির ন্যায় চরণে দলন করিয়া দুশ্চর তপস্যায় মনঃ প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন, সিদ্ধির প্রকৃষ্ট পথ প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া "সিদ্ধার্থ" নামে ভুবন বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছেন এবং আজ সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বর্ষ যাবৎ জগন্মণ্ডলের অসংখ্য নরনারীর শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ণ পূজা পুষ্পাঞ্জলি পাইয়া আসিতেছেন, তিনিও নিজ প্রচারিত ধর্ম্মমতে বিশ্ববিধির এই মূল তত্ত্বই নানাভাবে প্রকটিত করিয়া-ছিন।

২৬। আমাদের সুমধুর চরিত গৌরাঙ্গসুন্দর কেমন জলন্ত দৃষ্টান্ত দিয়া উপদেশ দিয়াছেন, 'মানব তুমি যদি প্রকৃত সুখী হইতে চাও, তবে সন্ন্যাসী হও, প্রকৃত সন্ন্যাসী হইতে চাহিলে কল্যকার জন্য কিছুই সঞ্চয় করিও না।" সেই কুসুমকোমল ঠাকুর কেমন কুলিশকঠোর প্রাণে কয় খণ্ড মাত্র হরিতকী সঞ্চয়ের অপরাধে এক প্রিয়তম শিষ্যকে অনুচর দল হইতে প্রত্যাখ্যান করিলেন, ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। তাঁহার অবিরল অশ্রুধারায়, হৃদয়-বিদারী ক্রন্দনে কর্ণপাত পর্য্যন্ত করিলেন না। যেহেতু অচিরস্থায়ী সামান্য সম্পত্তি সঞ্চয় ও তাহাতে মমত্ব জন্মিলেই দুঃখের উৎপত্তি সুনিশ্চিত। যিনি বিশ্বপ্রেমিক বিশ্বের সর্ব্বভূতের হিতে বিনিরত—যিনি সর্ব্বভূতে আত্মরূপ দৃষ্টি করেন বা আত্মবিসর্জ্জন করেন, তিনি যে সঞ্চয় মাত্রকেই ঘৃণার চক্ষে দেখিবেন, তাহাতে সন্দেহ আছে কি? বাঙ্গলায় একটি চলিত গান আছে "যে করে আশার আশ, করি তার সর্ব্বনাশ।" ইহা এই ভাবেই প্রণোদিত। রবীন্দ্র নাথও গাহিয়াছেন,

"শক্তি যারে দাও বহিতে, অসীম প্রেমের ভার,
একেবারে সকল পর্দ্দা ঘুচায়ে দাও তার।
না রাখ তার ঘরের আড়াল, না রাখ তার ধন,
পথে এনে নিঃশেষে তায় কর অকিঞ্চন।
এমন করে মুখোমুখি সামনে তোমার থাকা,
কেবলমাত্র তোমাতে প্রাণ পূর্ণ করে রাখা,
এ দয়া যে পেয়েছে, তার লোভের সীমা নাই,
সকল লোভ সে সরিয়ে ফেলে তোমায় দিতে ঠাঁই॥"

২৮। সেদিনও পরমহংসদেব জগতের অদ্বিতীয় ও অপূর্ব্ব ধর্ম্মগ্রন্থ গীতার উপদেশের বিষয় জিজ্ঞাসিত হইলে যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা অনেকেই জানেন। তিনি বলেন, "গীতা পদটী বারম্বার উচ্চারণ করিলেই

গীতার মহদুপদেশ বুঝিতে পারা যায়। পুনঃ পুনঃ গীতা শব্দ উচ্চারিত হইল "তাগী" এই শব্দটীই উচ্চারিত হয়। পরমহংসদেবের উপদেশের অর্থ এই যে গীতা "ত্যাগী" হইতে উপদেশ দিতেছে। গীতার ত্যাগী অর্থে কর্ম্মত্যাগী নহে, পরন্তু কর্ম্মফলত্যাগী সন্ন্যাসী হওয়া। সুতরাং পরমহংসদেব প্রকারান্তরে বিশ্বের কঠোর বিধির কঠোরতা কিরূপে মন্দীভূত হইতে পারে তাহারই উপদেশ দিতেছেন।

২৮। সর্ব্ববিধ ধর্ম্মশাস্ত্রেই দানের প্রশংসা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। একবার তাহার নিগূঢ় কারণ বুঝিতে যত্ন করিলেই বিশ্বের সেই কঠোর বিধিটী আসিয়া পড়িবে। মানব, যে সম্পত্তির জন্য তোমার এত যত্ন, সে সম্পত্তি তোমার হস্তে চিরকাল থাকিবে না, সে সম্পত্তির মায়া তোমাকে একদিন না একদিন পরিত্যাগ করিতেই হইবে, ইহাই যখন বিশ্বের কঠোর বিধি, তখন তোমার জ্ঞান থাকতে থাকিতে পরোপকারে যাহা কিছু করিতেছ, যাহা দান করিয়া যাইতেছ, তাহাতে সেই বিশ্ববিধিকে তুমি প্রকারে পরাভূত করিতেছ, তাহা তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেই মূল সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে, তুমি নিজে শক্ত সমর্থ জ্ঞানবান্ থাকিতে থাকিতে নিজ অভিরুচি মত তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া ধন্য হও।

২৯। বিশ্বের এই হস্তান্তর বা ত্যাগের বিধিটী যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। সূর্য্য আপনার অমিত কিরণজাল বিতরণ করিয়া জগতের প্রাণিগণকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে, স্বকীয় কিরণে চন্দ্রের অন্ধকার বিদূরিত করিয়া জগৎ আলোকিত করিতেছে, শস্যের সৃষ্টি পুষ্টির সহায়তা করিতেছে, সলিল আত্মদানে জগৎ পরিতৃপ্ত করিতেছে, অনিল প্রাণিগণের প্রাণ ধারণের জন্য অবিরত সঞ্চরণ করিতেছে, কে নয়? বিশ্ব ভরিয়া চাহিয়া দেখ, কুসুম আপন সুগন্ধ বিলাইয়া, পাখী আপনার কলকণ্ঠের ঝঙ্কারে দিগ্ দিগন্ত সুমধুর নাদে মুগ্ধ করিয়া, বৃক্ষ ছায়া পত্র পুষ্প ফল দান করিয়া, ওষধি আপন জীবনত্যাগে শস্য বিতরণ করিয়া জগতের তৃপ্তি বিধান করিতেছে, কিন্তু কাহারও তো কোনরূপ আর্ত্তনাদ নাই। কেবল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব মানবই নিজ স্বাধীন শক্তিতে বলীয়ান্ হইয়া আমিত্বের গরিমায় সুখের উপকরণের কল্পনায় সম্পত্তি ধন জন প্রভৃতি অর্জ্জন ও সংগ্রহে দেহ মন ক্ষয় করিয়া স্বকীয় সমাজ মধ্যে অপ্রতিহত যথেচ্ছাচার চালাইতে, অসাধ্য সাধন করিতে যাইয়া মানবসমাজের অঙ্গে নানারূপ ক্লেদ ও বিস্ফোট উৎপাদন করিতেছে। তজ্জন্যই এই সব ধর্ম্মবেত্তা আচার্য্যের আবির্ভাব, তাই বিশ্বের চিরন্তন বিধি ঘোষণার এত প্রয়োজন। মানব প্রভূত ধনজন প্রভুত্ব লাভ করিয়াও যখন দেখে তাহার নিরবধি নিরঙ্কুশ আশার পরিতৃপ্তি নাই, যখন বুঝে যে, প্রভূত সম্পত্তি ধন জন করায়ত্ত হইলেও তাহাদের উপর তাহার সার্ব্বভৌম ও সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতা পরিচালনে সে অনধিকারী, তাহার নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহার নিজকৃত সম্পত্তি ধনজন তাহার বশে থাকে না—প্রত্যুত বিকারগ্রস্ত হয়; তখনই মানব, বিশ্বের বিধি কি, বিশ্বের মূলে কোন্ অজ্ঞাত শক্তি তাহার এই স্বাধীন শক্তিতে বাধা প্রদান করিয়া পদে পদে তাহা প্রতিহত করিতেছে, জানিতে ব্যগ্র ও আকুল হয়।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থান মধর্ম্মস্য তদাত্মানংসৃজাম্যহং।

এই ব্যাকুলতা হইতেই বিশ্ববিধি জগতের সর্ব্বত্র নানা ভাষায় নানা ভাবে নানা ছন্দে প্রচারিত হইয়া মানব সমাজে প্রচণ্ড বর্ব্বর শক্তিকে পদে পদে খণ্ডিত করিয়া মানব সমাজের মহান্ উপকার সাধন করিতেছে।

৩০। বিশ্বে যখন এই কঠোর বিধি অবধারিত, তবে কি মানুষ সম্পত্তি ধনজন অর্জ্জন করিবে না? বিদ্যা উপার্জ্জন করিবে না, তপস্যা করিবে না? এক কথায় মানুষ কি সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিবে? এই প্রশ্নের সদুত্তর গীতাই দিয়াছেন—

"কর্ম্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

নিষ্কাম হইয়া ফলাফলে অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। এই অনাসক্তি বা ফলত্যাগ কথাটির মর্ম্ম উদ্ঘাটন করা প্রয়োজন। যদি কর্ম্মের ফলেরই কোন আকাঙ্ক্ষা না থাকে, তবে কর্ম্ম করিতে উদ্যম, উৎসাহ, পরিশ্রম কে স্বীকার করিবে বল? তাই নিজের অর্থাৎ ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ 'আমিত্ব' যে কামনা তাহাই স্বার্থপূর্ণ বিধায় সকাম এবং বিশ্বের হিতের নিমিত্ত যে কামনা, (যাহাতে তোমার নিজের স্বার্থও অন্তর্নিবিষ্ট আছে) তাহাই নিষ্কাম। মানব, তুমি বিশ্বহিতে প্রণোদিত হইয়া কর্ত্তব্যবোধে এই ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান কর যেন তোমার জীবনের ছোট বড় প্রতি কার্য্য সমগ্র বিশ্বের মঙ্গলের জন্য অনুষ্ঠিত হয়। তাহাতে ক্ষুদ্র আমিত্বের বা স্বার্থের গন্ধ থাকিবে না, সুতরাং সে সকল কর্ম্মের ফলাফলে তুমি আবদ্ধ অর্থাৎ সুখী বা অসুখী হইবে না—হওয়ার বিন্দুমাত্র কারণই থাকিবে না।

৩১। নীতিবিদের উপদেশ, "অধর্ম্ম পথে কিছু উপার্জ্জন করিও না।" ইহারও মূলে, সেই একই তত্ত্ব। যখন তোমার কোন জিনিসেই চিরস্থায়ী অধিকার নাই, তখন অধর্ম্মে সম্পত্তি অর্জ্জনের প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ তোমাকে যখন সম্পত্তি হস্তান্তর বা দান করিতে হইবে, তখন তোমার দানের জিনিষটী বিশুদ্ধ হওয়া চাই। তুমি অন্যায়রূপে যাহা উপার্জ্জন কর, তাহা মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতার বিশ্বরাজ্যের পক্ষে সুন্দর দান হইতে পারে না। সাত্ত্বিক দানের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

"দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতং॥

ইহার সঙ্গে একথা বলিলেও অসঙ্গত হয় না যে, যে উপার্জ্জন অধর্ম্মাশ্রিত, তাহার দান সাত্ত্বিক দান নহে। যাহা ন্যায় পথে অর্জ্জিত হয়, তাহার দানই সাত্ত্বিক দান এবং সেই দানেই পৃথিবী ও সমাজ ধন্য ও বরেণ্য। সকল দেশের ঋষি মনীষিগণ জগতে ও সমাজে নিজ নিজ অপূর্ব্ব সাধন বলে যে সকল মহান্ ভাব দান করিয়া গিয়াছেন, সেরূপ দানের তুল্য সাত্ত্বিক দান কোথায়?

৩২। জগৎ এই সাত্ত্বিক দানই চায়। সমস্ত বিশ্ব-বিধির মূল হস্তান্তর বা রূপান্তর বিধি এই সাত্ত্বিক দানের মহিমাই ঘোষণা করিতেছে। যখন তোমার সর্ব্বস্বই ত্যাগ করিতে হইবে, তখন পর পীড়নে প্রয়োজন কি? তাই "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" এই নীতির উদ্ভব। নীতি-বিদ্গণ যেন স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন, "মানব, তুমি যে 'আমি' 'আমি' করিয়া এত উদ্বেগী ও আকুল হইয়া সম্পত্তি ধনজন অর্জ্জন ও সঞ্চয়ের জন্য ছুটাছুটি করিতেছ, তোমার উদ্যম প্রশংসনীয়, কিন্তু কেবল 'আমি' 'আমি' এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে যদি তুমি নিজেকে আবদ্ধ ও মাতো-য়ারা রাখ, তবে তুমি অচিরকাল মধ্যেই তোমার বিষম ভ্রম বুঝিতে পারিয়া নিতান্ত বিপদে পতিত হইবে, তখন তোমার এ উদ্যম ও উৎসাহ তো থাকিবেই না, পরন্তু ভীষণ বিপদ-সাগরে নিপতিত হইবে। তাই বিশ্ববিধি তোমাকে আমিত্বের প্রসার করিতে উপদেশ দিতেছে। তুমি তোমার সেই সঙ্কীর্ণ 'আমিত্ব'কে একটু একটু করিয়া বর্দ্ধিতায়তন করিয়া লও।

৩৩। যে জিনিষ নিজে ভালবাস, তাহা আপনার ভালবাসার পাত্রকে দিয়া সুখী হও। কেন না, সে তোমার অতিশয় প্রিয়, নতুবা তুমি তোমার কষ্টোপা-র্জ্জিত জিনিষ কি অমনি ত্যাগ করিতে পার? এইরূপে তোমার যে কিছু সম্পত্তি আছে, তৎসমস্তই হস্তান্তর করিতে হইবে। বিশ্বের এই কঠোর বিধিটী যদি বুঝিতে-পার, তবে একথাও ভাবিতে পার, যে জগৎ পিতার তুমি সন্তান, অপর সকলেও সেইরূপ তাঁহারই সন্তান অর্থাৎ সকলেই তোমার আপনার প্রিয়জন, ভাই, বন্ধু, তবে আর তাহাদের জন্য সম্পত্তি রাখিয়া যাইতে এবং সঞ্চয় করিতে তোমার কোনই ভয় বিষাদ কি ক্ষোভের কোনও কারণই থাকিবে না—থাকিতে পারে না। তখন তোমার সমস্ত কার্য্য আনন্দময়, সমস্ত যত্ন পরিশ্রম উদ্যম

ও উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে, তোমার সম্পত্তি তোমার ধনজন তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, কি ঐ সমস্ত তোমাকে ছাড়িয়া যাইবে, এই বৃথা ভয়ে মুহূর্ত্তের জন্যও অবসন্ন হইতে হইবে না। এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম করিতে যে উপদেশ দিতেছেন, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ কামনা শূন্য হইয়া, উৎসাহ উদ্যম বিহীন হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করা নহে, পরন্তু বিশ্বহিতকে আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থের কামনা-স্থলে সংস্থাপিত করিয়া সমধিক যত্ন ও উৎসাহের কর্ম্মানুষ্ঠান করা। এইরূপ ভাবে যিনি কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, সমস্ত ক্ষণস্থায়ী অসার ও আবিল সঙ্কীর্ণ স্বার্থপূর্ণ কামনা তাহাতে বিলীন হয়, সুতরাং তিনিই গীতার ভাষায় পরমা শান্তি লাভের অধিকারী হন।

আপূর্য্যমাণ মচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি
ন কামকামী॥

৩৪। পরিশেষে, আমরা যিনি বিশ্বের নিয়ন্তা, যিনি বিশ্ববিধির অবস্থান্তর বা রূপান্তর তত্ত্বের অতীত হইয়াও অনন্তরূপে এই তত্ত্বের সহিত ওতপ্রোতভাবে সংমিলিত এবং যাঁহার বিষয় এই নিবন্ধের সামান্য পরিসরে আলোচনা অনন্তর জ্ঞানে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হই নাই,—যাঁহার অচিন্তনীয় ইচ্ছায় সমগ্র জগৎ সৃষ্টি স্থিতি ও লয় হইতেছে এবং বিশ্বের সমস্ত ব্যাপার পরিচালিত হইতেছে, তাঁহার বিষয় চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারি না। তিনি সমস্ত স্থাবর জঙ্গমের কেবল সৃষ্টি স্থিতি ও প্রত্যবহারের কারণ নহেন, তিনিই ইহাদের উপাদান এবং যে অশরীরি বাক্য মন ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইয়াও এই সবরূপ ধারণে পুনরায় ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হইয়াছেন, যিনি সকল যন্ত্রের যন্ত্রী, আর্য্য ঋষিগণ তাঁহাকেই সর্ব্বভূতের আশ্রয় জানিয়া ও সর্ব্বভূতে তাঁহার সত্তা অনুভব করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিবার সময় নিষ্কাম হইয়া অথবা তাঁহারই শ্রীচরণে সর্ব্ব কর্ম্মফল সমর্পণ করিয়া অর্থাৎ বিশ্ববিধির সম্পত্তি হস্তান্তর তত্ত্বের কঠোরতা দূরীভূত করিবার ব্যপদেশেই যেন তাঁহারই প্রকটিত মূর্ত্তি আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত সমগ্র জগৎকে কর্ম্মফল অর্পণ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে আমাদের উল্লিখিত কঠোর বিশ্ববিধিটীই সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিতেছে। অতএব দেখুন, মানবগণের মধ্যে যাঁহারা অসীম মনীষাসম্পন্ন, অসাধারণ সাধন বলে যাঁহাদের মধ্যে ভাগবতী শক্তি প্রকট হইয়াছে, তাঁহারা বিশ্ববিধির এই কঠোরতা বুঝিতে পারিয়া মানব সমাজে কেমন ভাবে তাহার প্রভাব ক্ষুণ্ন করিয়া তাহাকে আনন্দ রসে সিঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন।

৩৫। আরও এক গ্রাম ঊর্দ্ধে উঠিয়া যখন আমরা আমাদের সম্পত্তি ধনজনের বিষয় ছাড়িয়া, নিজ নিজ দেহান্তরের বিষয় চিন্তা করি, তখনই বুঝিতে পারি মহাপ্রকৃতি যেন বলিতেছে, মানব কেবল তোমার সম্পত্তি ধনজন নহে, তুমি স্বয়ংই সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনের অধীন, সর্ব্বদা রূপান্তরিত হইতেছ, এক হস্ত হইতে হস্তান্তরে,—এক ভাবরাজ্য হইতে অন্য ভাবরাজ্যে প্রতি মুহূর্ত্তে প্রবেশ লাভ করিতেছে, সুতরাং অতীত ও বর্ত্তমানের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে উত্তম হইতে তোমার উত্তমতর হওয়ার প্রয়োজন। যে বিশ্বের তুমি একাংশ (একাঙ্গ) তাহা প্রতিমুহূর্ত্তে অতীত কালাগত অশেষ সম্পত্তিতে সমৃদ্ধ হইয়া রূপান্তরিত হইতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে তোমারও উন্নতির প্রয়োজন ; নতুবা সেই অভিনব রাজ্যে তোমার নানাবিধ বিড়ম্বনা ও লাঞ্ছনা অপরিহার্য্য হইয়া উঠিবে ; বিশেষতঃ সে রাজ্যের সহিত তোমার অঙ্গাঙ্গী যোগ ও সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। এই তত্ত্বটীই বিশ্বের সেই কঠোর বিধি হইতে নিষ্কাশিত জ্ঞানমার্গানুসারিগণের সাধনার চরম সীমা ও প্রাণারাধ্য 'সোহং তত্ত্ব' এবং ভক্তিমার্গানুসারিগণের সাধনার চরম তত্ত্ব ও প্রাণের প্রাণ মধুর ভাবে প্রকটিত ;—তুমি আর জগৎ এক, সুতরাং তোমার ক্ষুদ্র আমিত্বের গণ্ডী তুচ্ছাতিতুচ্ছ ও হেয়, বিশ্বের হস্তান্তর বিধিতে তুমি নির্ভয় ; তোমার প্রিয় যখন জগৎব্যাপী, তুমিও জগৎব্যাপী অথবা তোমারই জগদ্ব্যাপী প্রিয়তমের অনন্তকাল স্থায়ী অবিরাম অতুলনীয়

মহানন্দপ্রদ রাসোৎসবে তাঁহারাই মধুর আহ্বানে তুমি চলিয়াছ, তোমার সামান্য সম্পত্তি ধন জন তো তুচ্ছাতিতুচ্ছ, তোমার আত্মবিসর্জ্জনে, রসচতুর রসময়ের অপূর্ব্ব প্রেমরসের মহাসাগরে আত্মহারা হইয়া সম্পূর্ণ নিমজ্জনে আর ভয় কি? বরং তাহাতেই পূর্ণ সুখ, পূর্ণ পরিতৃপ্তি।

শ্রীনিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী

সিন্ধু-বন্দনা।

(চট্টগ্রাম সাহিত্য পরিষদে পঠিত)

হে সাগর, হে মোর সাগর,
সলিল-বিপুল-কায়, সীমাহারা কল্লোল মুখর—
হে জলধি, পরাণের নিত্য সত্য আনন্দ স্পন্দন,
মোর লাগি আনিয়াছ তোমারি সে প্রেম-নিমন্ত্রণ।
কতদিন হায় প্রিয়, অতীতের কোন্ সে ঊষায়
শৈশব ঔৎসুক্য ভরে কি অজ্ঞাত মোহ তাড়নায়।
ছুটে এসেছিনু কাছে, হে বিপুল অনন্ত প্রসারি!
সে দিন দেখিয়াছিনু আমার এ সারা বক্ষ ভরি'
উদ্বেলিত তরঙ্গিত ফেনপুঞ্জ শুভ্র হাস্যময়,
তোমারি সলিল শোভা সমুজ্জ্বল সৌন্দর্য্য অক্ষয়।
মনে হয় সেই দিন আমার এ সমগ্র-হিয়ায়
তোমার সৌন্দর্য্য-তৃষা সুবিপুল প্রেম-মহিমায়,
একান্ত মধুর ভাবে, হে সুন্দর, জেগেছিল ধীরে
দাঁড়ায়ে এ মুক্তি মঞ্চে, তোমারি এ অন্তহারা তীরে।
তোমারি শীকর-স্পৃষ্ট পবনের মৃদু আন্দোলন,
মোর তরে রচেছিল সেদিন কি মধুর-স্বপন!
আমার অন্তর-বধূ আপনারে ফেলি হারাইয়া
তোমার মাঝারে প্রিয় সেইদিন গেছিল মিশিয়া।
তারপর, তারপর, হায় প্রিয়, হায় প্রিয়তম,
স্বপন না হতে শেষ কর্ত্তব্য আদেশে নির্ম্মম
বিপুল উদ্বেলময় তব স্নেহ বন্ধন টুটিয়া।
অনিচ্ছায় যেতে হল আবার ও সংসারে ছুটিয়া।
তারপরে দিনে দিনে মাসে মাসে কত বর্ষ হায়!
হয়ে গেছে সমাহিত অতীতের [illegible] গুহায়,—
নাহি আর সে শৈশব ক্রীড়ামত্ত চিন্তা[illegible]হীন,
যেদিন ধরণী ছিল আনন্দের আভায় রঙ্গীণ,
সৌন্দর্য্য উল্লাস মত্ত বিশ্বময় প্রেম প্রস্রবণ,
আমার কৈশোর বক্ষে বহেছিল যে মহা প্লাবন,
আজি তাহা বড় শীর্ণ, হায় বন্ধু, সবি শুষ্কপ্রায়
প্রেমহীন রুক্ষদৃষ্টি নিরবধি লভি এ ধরায়,
কত চিন্তা, কত ভাব কি উদার আশা বহি মনে
উপনীত হয়েছিনু মানুষের বিচিত্র ভুবনে।
ধীরে ধীরে দাঁড়াইয়া মানবের মায়া মধ্যস্থলে
বিস্মৃতি আনিনু ডাকি আপনাতে প্রতি পলে পলে,—
ভুলেছিনু কেবা আমি এ বিশাল সংসারের মাঝে
মোরে নিয়োজিতে হবে কিবা সেহি সুদুষ্কর কাজে!
হে অপার নিত্যরূপ, ওগো সিন্ধু প্রশান্ত আকার,
সে কথা ভাবিতে গিয়ে জাগে প্রাণে মহা হাহাকার;
হৃদয়-মন্থন-করা মোর সর্ব্ব প্রেমরাশি দিয়ে
অপূর্ব্ব নৈবেদ্য এক এ ধরারে দিয়ে সাজাইয়ে,
সকল আনন্দে যবে বিশ্বপানে দেখিনু চাহিয়া
দেখিনু সবাই তারে ঘৃণাভরে যায় বিদলিয়া।
যেথায় প্রাণের অর্ঘ্য, পরাণের প্রীতির সম্ভার
বিদ্রূপে মলিন হয় লভে শুধু দৃষ্টি অবজ্ঞার।
সত্য যেথা চিরদিন লভে শুধু ঘৃণা অপমান,
হে সিন্ধু, ভুলাও মোরে ক্ষণতরে তাহারি সন্ধান।
নিরাশায়, হতাশায় জীর্ণ—ম্লান অন্তর আমার
আবার এসেছে ছুটে হে অপার মহাপারাবার
তোমারি মুক্তির মাঝে;—সুবিপুল প্রণয়ের টানে
তুমি মোরে টেনে লহ তোমার মর্ম্মের মাঝখানে।
তোমার রহস্য সাথে, হে সাগর, হে মোর সাগর।
পরিচিত কর মোরে, অন্তরের রতন-আকর।

নিখিল ঐশ্বর্য্য, আর দেবতার অসীম প্রকাশ,
দেবত্বের শ্রেষ্ঠ দীক্ষা, স্বরগের সুষমা বিকাশ,
তোমাতেই পরিপূর্ণ হয়ে আছে চির নিশিদিন,
হে আদি সুহৃৎ, মোরে আরবার করহ বিলীন—
অনন্ত মহিমাময় তোমার ও সঙ্গীতে শোভায়,
সব চিন্তা ক্লেশ মম একেবারে যেন মুছে যায়।
হে আমার আদি প্রিয়, হে আমার অনাদি বান্ধব!
দুর্ব্বহ হৃদয় ভার ক্ষণতরে করিতে লাঘব,
এসেছি ছুটিয়া সিন্ধু, তোমারই সৌন্দর্য্য-সকাশে,
আমারে টানিয়া লহ তোমার ও স্নেহ-প্রেম পাশে।
হে অপার, হে উদার, প্রাণময় উচ্ছ্বাস বিপুল,
আমাতে বোধন কর তোমার ও আনন্দে অতুল!
হে মোর আত্মার বঁধু, হে আমার প্রণয় বন্ধন!
তোমার অক্ষয় শক্তি মোর মাঝে লভুক স্পন্দন।
আজিকার তরে প্রিয়, এই পুণ্য মাহেন্দ্র লগনে
তোমার আমার এই চিরন্তন প্রেম সম্মিলনে
সার্থক করিয়া তোল!—
রুদ্ধ মোর অন্তর-আগার,—
তোমার তরঙ্গাঘাতে, হে অসীম জলধি অপার।
শতধা চূর্ণিত করি অবরুদ্ধ প্রাণের প্রাচীর
অসীম করিয়া তোল মুকুতির আনন্দে অধীর।
ওগো প্রিয়, ওগো বন্ধু, হে বিপুল বিরাট বিকাশ,
তাহাতে রচিতে যেন পারি তব অসীম নিবাস।
আমাতে জাগুক মুক্তি জগতের, বিশ্ব-মানবের;
আমাতে অক্ষয় হোক পূর্ণ-ধারা প্রেম প্রবাহের!
হে অপার, হে অব্যক্ত, হে মহান্ রহস্য আধার!
বিশ্ব শিশু জন্মলভি তোমারই বক্ষে সমুদার—
পলে পলে তিলে তিলে লভেছে এ যৌবন মাধুরী,
তোমারি হৃদয় ধারা তারি বক্ষে গোপনে সঞ্চারি
মাতৃগর্ব্বে পরিপূর্ণ করে দেছ তার সারা প্রাণ!
আমি যে তাহারি শিশু, তারি রূপ, তারি স্পর্শ, গান,
তাহারি সৌরভ রস মোর মাঝে বাঁধিয়াছে বাসা,
তাহারি হৃদয়স্পন্দে মোর প্রাণে জেগে ওঠে আশা,
তুমি সর্ব্বমূল তার; তুমি সিন্ধু ঐশ্বর্য্য আধার
অনাদি প্রকৃতি রূপ, মহনীয় মহিমা-আকার,
হে মহা ধারণাতীত, তব সৌম্য আশীর্ব্বাদ বয়ে
যখনি ফিরিয়া যাব সংসারের মুখর নিলয়ে
আমার নয়ন মুখে, হে সুন্দর, প্রশান্তি তোমার,
নীরবে ফুটিয়া উঠি করে নেবে তোমারে প্রচার।
তার পরে হে সুহৃৎ, তব স্নিগ্ধ আশিস্ সঙ্কেতে
অভিনব প্রেমধারা বিলাইয়া ভুবন মরুতে
অপূর্ব্ব নন্দনশোভা ফুটাইয়া তারি বক্ষোপরি'
মহিমায় গরিমায় বিরচিব তারে স্বর্গ করি।
হবে না এ হে বিরাট, কল্পনার অলীক স্বপন—
মনুষ্যত্বে দেবত্বের হবে নিত্য পুণ্য সম্মিলন,
তোমারি সে সমুদাত্ত প্রাণময় প্রেমমন্ত্র স্বরে
এটুকু সাহস করি বলিবারে গর্ব্ব দেহ মোরে!
হে অপার, হে উদার, মোরে তব মন্ত্র শিক্ষাদান
অযোগ্যে হবে না ন্যস্ত, রেখো বন্ধু, রেখো এই জ্ঞান;
অমনি তোমার মত সুবিপুল প্রসন্ন উদার
প্রেম পরিপূর্ণ প্রাণ, হে জলধি, জনক আমার,
তাঁহারি অসীম প্রেম—পরিপূর্ণ হৃদয়ের পারে
মুক্তির অমৃতশ্বাসী সমীরণ সঞ্চালন ভারে,
শোকে দুঃখে জর্জ্জরিত অগণ্য মানব ম্রিয়মাণ
লভিতেছে আজও কিবা সমুজ্জ্বল প্রেমের সন্ধান।
আমি যে সন্তান তাঁরি,— অগণিত তাঁরি গুণচয়
আমাতে কি, প্রিয়তম, একেবারে লভেনি আশ্রয়?
হে সিন্ধু, বিপুল সিন্ধু! আমাদেরি এ ধরণী মাঝে
বিপুল হৃদয় নিয়ে আরো ক'টী মানুষ বিরাজে,—
তারা মোরে বাসে ভালো, তাহাদের সারা প্রাণ দিয়ে
তাদের প্রাণের রসে তারা মোরে রেখেছে জীয়ায়ে,
আমার উদারপ্রাণ ভ্রাতা, আর ভগিনীর দল,
আমার পরাণময় বন্ধু, আর আশা সমুজ্জ্বল,
জননী অমৃতময়ী স্নেহ মূর্ত্তি মাণিক আমার,

আমারে শুনায়ে নিতি দেবতার স্তব মহিমার
আমার এ প্রাণখানি তুলিয়াছে পরিপূর্ণ করি,
হে অপার, পারাবার, আজি সব সংশয় সংবরি,
অন্তহীন আদিহীন হে অপার জলধি মহান্,
আমারে বলিয়া দেহ সঞ্জীবনী মন্ত্রের সন্ধান !
সৃষ্টির আদিম বন্ধু, নিত্যসাক্ষী বিশ্ব রচনার !
জোয়ান সম্পদে পূর্ণ শান্তিধামে এই বসুধার
আজিকে উঠিছে জ্বলি কি বিপুল অশান্তি অনল,
বিদ্বেষ-গরল-বহ্নি গর্জ্জিতেছে প্রতি পলে পল !
উত্তপ্ত নিশ্বাসে তার জগতের পুণ্য প্রেম ধারা
আজি শুষ্ক একেবারে হের প্রিয় বারি বিন্দুহারা,
জাতিতে জাতিতে দ্বন্দ্ব, মানুষে মানুষে কোলাহল
প্রভুত্বের মিথ্যা স্বার্থ শুধু ব্যর্থ অভিনয় ছল ;
অভিমান অহঙ্কার দৃপ্ততেজে উন্নত শিরসে
সত্যেরে বিদ্রূপ করে আপনার ঔদ্ধত্য প্রকাশে,
ধরারে রঞ্জিত করে সন্ত তপ্ত শোণিত ধারায়,
দানবের বিভীষিকা ধরা মাঝে তাণ্ডবে খেলায় !
ওগো প্রিয়, হে বারিধি, পৈশাচিক ওই অত্যাচার
প্রশমিত করে দাও সুবিপুল প্রবাহে তোমার !
এ অনল ক্রীড়ারঙ্গ করে দাও আজি অবসান
প্রবল প্লাবন বহি, হে নীলাম্বু, হে মহাপরাণ !
তুমি সত্য হয়ে ওঠ দৃপ্ত তেজে হয়ে বিভাসিত
উদাত্ত মন্তরে তব এধরারে করি পবিত্রিত
আবার জাগাও বিশ্বে তোমারি সে গীতি মহিমায়,
অনাদি অতীত হতে অন্তরের ভাব প্রেরণায়
তোমারি সৌন্দর্য্যপ্রিয় মুগ্ধ ভক্ত মানবের দল
তোমাতে প্রত্যক্ষ করি দেবতার ছবি নিরমল,
তব তরে রচিল যে সব নব বন্দনা সঙ্গীত,
আজো যাহা দেশে দেশে নানা ছন্দে হয় বিঘোষিত !
হে জলধি, হে অপার, হে অকুল মহা পারাবার,
শ্যাম শৈল কান্তিময়ী স্নেহপ্রাণ স্বদেশ আমার,
বিহগ-কাকলী স্বনে, পবনের মৃদু সঞ্চালনে
তোমারি বন্দনা গীতে পরিপূর্ণ করেছে স্বমনে।
এমনি এমনি নিত্য অনাদি সে অতীত হইতে
বিশ্বের হৃদয় হতে কেন্দ্রীভূত ধ্বনিত সঙ্গীতে
ভাষা দিয়া, সুর দিয়া এ দেশেরি কবি মহাপ্রাণ
তোমারি বন্দনা তরে রচে গেছে সমুদাত্ত গান !
হে সিন্ধু, সে গীতরাশি মোর কণ্ঠে আজি পুনর্ব্বার
রণিয়া ধ্বনিয়া উঠি নমি পড়ে চরণে তোমার।
সে গীত হউক শেষ, আজি পুনঃ ক্ষণেকের তরে,
তোমারে কহিব বন্ধু নিত্য কিবা ঘটিছে সংসারে ;—
এ ধরণী শান্তিময়ী, কবি তারে করেছে বর্ণনা
ভাষার বিচিত্র ছন্দে প্রাণে বহি আশ্বাস প্রেরণা,
ওগো বন্ধু, ভ্রান্ত সম এতদিন খুঁজিয়াছি হায়
শান্তিরে ধরণী ভরি ; অবশেষ মহা নিরাশায়
ফিরিয়া এসেছি আমি, হে অপার মহাপারাবার,
তোমারি শান্তির তীরে,সৌম্যোদার আনন্দে তোমার।
হের কিবা অত্যাচার জাগিয়াছে মোদের সংসারে
সত্যেরে করিতে ধ্বংস, বিনাশিতে প্রেম মহিমারে।
হের এ দুর্ভাগা দেশে সমাজের প্রতি স্তরে স্তরে
কলুষ উঠেছে জাগি কি মোহিনী ডাকিনী মন্তরে।
এ কলুষ দূর করি এ দেশেরে করিতে নির্ম্মল
তোমার ঐশ্বর্য্য প্রভু, দেহ মোরে করিতে সম্বল।
দয়া কর হে সাগর, হে অসীম অনাদি নন্দন,
এখনো সময় আছে এ দেশেরে করিতে রক্ষণ।
ইহারা তো নাহি বুঝে কি করিতে কি করে ইহারা,
কি এক ভ্রান্তির বশে সকলেই জ্ঞান বুদ্ধি হারা
এদেরে বাঁচাতে হবে ইহাদেরে দিতে হবে প্রাণ,
এদেরে শিখাতে হবে সত্যের ও ন্যায়ের সম্মান
এ অভাগ্য জাতি মাঝে কল্যাণেরে হবে প্রতিষ্ঠিতে
এদেরে জাগাতে হবে সঞ্জীবন মন্ত্রের সঙ্গীতে।
কে করিবে হে সাগর, সে দৈবত মন্ত্র উদ্বোধন,
তুমি নাহি দিলে মন্ত্র, তুমি নাহি জাগালে স্পন্দন।
তোমারি সেবক আমি হে বিপুল সমুদ্র উদার !

মানব সভার মাঝে তব শিক্ষা করিতে প্রচার,
দেহ প্রাণ, দেহ শক্তি, দেহ মোরে অটল নির্ভর,
তোমারি বরেণ্য শিক্ষা এনে দেহ প্রাণের ভিতর।
তোমারি ক্ষীরোদ কক্ষে নিদ্রালস বিষ্ণু ভগবান,,
তাঁহারে জাগাও প্রভু, এ ধরারে কর পরিত্রাণ!
এই মহা জগতের দেবতা সে পালন ঈশ্বর,
অবতীর্ণ হয়ে পুনঃ মোদের এ অবনী ভিতর
মানবেরে দিক্ শক্তি, মানুষেরে দিয়ে যাক্ প্রাণ,
রচিয়া নবীন গীতা দিক্ নব কর্ম্মের সন্ধান।
নমো নমঃ সে অসীমে অনাদি সে দেবতা সুন্দর
শিবত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সে শ্রেষ্ঠ মনোহর।
হৃদয় মুকুতা দিয়ে শয্যা তাঁর দিয়াছ রচিয়া—
তুমি সিন্ধু সুবিমল নিতি তাঁর চরণ বন্দিয়া!
নমো নমঃ সংখ্যাতীত, নমো নমঃ চরণে তোমার,
হে বিশাল, সুবিশাল, পারাবার মহাপারাবার!
তুমি নিত্য বহি আন দেবতার আশীর্ব্বাদ রাশি
তুমি বহি আন তব, সমুচ্ছ্বল ফেনশুভ্র হাসি!
তোমার ঔদার্য্য মাঝে জগতের হীন স্বার্থচয়
লহরী তরঙ্গ ভঙ্গে হে সুন্দর হউক বিলয়!

*   *   *

মোদের ধরার বুকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুভ্র প্রাণগুলি
ছলনা নাহিক বুকে, আনন্দের অর্দ্ধস্ফুট কলি,—
মানুষের ভবিষ্যৎ আশা আর ভরসা সুন্দর,
সার্থক করুক এরা, শিশু এরা মোদের নির্ভর!
হে সাগর, হে সুন্দর, ইহাদেরে কর আশীর্ব্বাদ,
ইহাদের তরে আজি বহি আন স্বর্গের সংবাদ!
এ জগৎ হোক পূর্ণ ইহাদের গুণ পরিমলে,
শান্তির সাম্রাজ্য এরা প্রতিষ্ঠিত করুক ভূতলে।
তোমারি সেবক আমি, আমি তব মন্ত্র উপাসক
যখনি দেখি গো প্রভু আমি শুধু নহিক একক,
এ মহা ভুবন মাঝে মন্ত্র তব করিতে প্রচার,
সার্থক হইব প্রিয় পূর্ণ হবে সাধনা আমার।
আমার মাঝারে, ওগো সিন্ধু, তব মন্ত্র উদ্বোধন
ব্যর্থ নাহি হবে বন্ধু, আমি তব বিজয়ী নন্দন।
শিষ্য আমি প্রিয়তম, পদে তব করি নমস্কার।
নমো নমো নমঃ ওম্, লক্ষ কোটী চরণে তোমার।

শ্রীহরিকৃপা চৌধুরী।

কৈকেয়ীর কলঙ্ক।

প্রথম প্রস্তাব।

(কেকয় দেশ।)

কেয়ূরাঙ্গদকঙ্কণৈর্ম্মণিগতৈর্বিদ্যোতমানং সদা
রামং পার্বণচন্দ্রকোটিসদৃশচ্ছত্রেণ বৈ রাজিতম্।
হেমস্তম্ভসহস্রষোড়শযুতে মধ্যে মহামণ্ডপে
ভরতাদিভিঃ পরিবৃতং রামং ভজে শ্যামলম্॥

উপনিষৎ।

ভারতীয় লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যের আদিকাব্য রামায়ণেই সপত্নীবিদ্বেষ-বিষ-জর্জ্জরা কৈকেয়ী রাণীর কলঙ্ক কথিত হইয়াছে। রামায়ণের কাল হইতেই, আমাদের সমাজে, বিষদুষ্টা বিমাতার দৃষ্টান্তস্বরূপ ভরত-মাতা কৈকেয়ীর নাম উচ্চারিত হইয়া আসিতেছে। আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণাপথের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট্, দেবরাজ ইন্দ্রের সমর-সচিব, শব্দভেদী শরনিঃক্ষেপপটু মহারাজ দশরথের প্রিয়তমা পত্নী এবং ভ্রাতৃপ্রেমের অতুলনীয় উদাহরণ, নিঃস্বার্থ-ভ্রাতৃ-হিতৈষণার অবতার, উদার-হৃদয় ভরতের জননী কৈকেয়ী দেবী ঘৃণিত, হীন, দাসীর মন্ত্রণায় পরিচালিত হইয়া লোকাভিরাম রামচন্দ্রের নির্ব্বাসন প্রার্থনা করতঃ, প্রিয়তম-পুত্র-বিরহে স্বামীর প্রাণবিয়োগ নিশ্চিত অবগত থাকিয়াও, সুদৃঢ় নির্ব্বন্ধ সহকারে সীতা সহিত রামচন্দ্রকে বনে পাঠাইয়া নিজ

নামে যে দুরপনেয় কলঙ্ক রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার কথা এদেশে ঘরে ঘরে এতই প্রচলিত যে, তাহার কাহিনী নূতন করিয়া তুলিবার কোন প্রয়োজন নাই। কৈকেয়ীর চরিত্রে সে কলঙ্ক লেপ এতই গাঢ়নিবদ্ধ যে মহাকবি ভবভূতি এবং মধুরভাষী মুরারি কবি, নিজ নিজ রচিত নাটক "বীরচরিত" এবং "অনর্ঘ রাঘব" সে চরিত্র যথাসত্য অঙ্কিত করিয়া সাধারণকে দেখাইতে সাহস করেন নাই, তাঁহারা উভয়েই সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের রীত্যনুসারে সেই চরিত্র কবিজনোচিত উপায়ে আবরিত রাখিয়া দিয়াছেন। উভয়েই রাম-বনবাস ব্যাপার যে রাবণমন্ত্রী মাল্যবান্ ও বানর রাজমন্ত্রী জাম্বুবানের ষড়যন্ত্রপ্রসূত বলিয়া নিজ নিজ দৃশ্যকাব্যে দেখাইয়াছেন, তাহা সংস্কৃতজ্ঞ পাঠক অবগত আছেন।

কিন্তু, আর্য্যনীতিনিপুণ গিরিব্রজরাজ অশ্বপতির দুহিতা এবং সম্রাট দশরথের দয়িতা ভার্য্যা হইয়াও কেন কৈকেয়ী দেবীর হৃদয়ে এরূপ অনার্য্যজনোচিত হীন বিচার উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। অথবা বঙ্গকবিকুলরবি গৌড়ীয় কাব্যমধুচক্রের কর্ত্তা মধুকররাজ মধুবর্ষী শ্রীমধুসূদন তাঁহার "বীরাঙ্গনা" কাব্যে যে লিখিয়াছেন,

"কিন্তু পূর্ব্বকথা এবে স্মর, নরমণি,
সেবিনু চরণ যবে তরুণ যৌবনে.
কি সত্য করিলা, প্রভু, ধর্ম্মে সাক্ষী করি,
মোর কাছে? কাম-মদে মাতি যদি তুমি
বৃথা আশা দিয়া মোরে ছলিলা, তা' কহ,—
নীরবে এ দুঃখ আমি সহিব তা' হ'লে।"

তাঁহার এরূপ বাক্যের মধ্যে কোনও সত্য আছে কি না, তাহাও দেখিব। রাজা দশরথ পূর্ব্বে কখনও কৈকেয়ীর নিকটে, তাঁহার গর্ভজ পুত্রকে রাজ্য প্রদান করিবেন,—এরূপ সত্য করিয়াছিলেন কি? বাল্মীকি রচিত রামায়ণ হইতে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, এই রাম-বন-বাস-ব্যাপারে কৈকেয়ীর অপরাধ অতি অল্প, এবং দশরথ তাঁহার অপেক্ষা বহুগুণে অধিকতর অপরাধী। অথচ, অদৃষ্টের এরূপই পরিহাস, দশরথ ভারতবর্ষে সত্যসন্ধ ধার্ম্মিক রাজা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, আর কৈকেয়ী কর্কশা, কলহপরায়ণা ও বিদ্বেষবিষজর্জ্জরা বিমাতার আদর্শস্থানীয়া হইয়া আপামর সাধারণের নিকট ধিক্কৃতা হইয়া আসিতেছেন। আমাদের আশা আছে যে মহর্ষি বাল্মীকি স্বপ্রণীত রামায়ণে এরূপ উপাদান রাখিয়া দিয়াছেন যাহার ফলে একটু চেষ্টা করিলেই এই অতি প্রাচীন আর্য্য মহিলার চরিত্র হইতে কলঙ্ক কালিমা অনেক পরিমাণে অপনীত হইতে পারে। বর্ত্তমান যুগে, সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব অথবা নবাব সিরাজ উদ্ দৌলার চরিত্রের কলঙ্ক ক্ষালন করিবার রীতিমত প্রয়াস দৃষ্টিগোচর হইতেছে; আমাদের পক্ষে সুতরাং ভরতের মত নররত্নের প্রসবিনী এরূপ এক আর্য্যজননীর চরিত্রের কলঙ্ক ক্ষালন চেষ্টা করা অন্যায় অথবা অনাবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

এরূপ চেষ্টা করার পূর্ব্বে কৈকেয়ী দেবীর পিতার রাজ্য কেকয় দেশের সম্বন্ধে আমরা কিছু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিতেছি এবং প্রসঙ্গক্রমে ভারতবর্ষ এবং আর্য্যাবর্ত্ত সম্বন্ধেও দুই এক কথা বলিতে হইবে। আশা করি, এই আলোচনা পাঠক মহাশয়গণের অপ্রীতি উৎপাদন করিবে না।

বর্ত্তমান কালে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিরও নিশ্চিত বিশ্বাস যে, আধুনিক "ইণ্ডিয়া"ই আমাদের প্রাচীন "ভারতবর্ষ" এবং "আর্য্যাবর্ত্ত" দেশ অর্থে—উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল, পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ এবং পশ্চিমে আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তান—ইত্যাকার সীমানিবদ্ধ দেশকে বুঝাইয়া থাকে। আমাদের কিন্তু বিশ্বাস যে, "ভারতবর্ষ" প্রাচীনকালে বহুদূর বিস্তৃত এক মহাদেশকে বুঝাইত এবং তৎকালে "আর্য্যাবর্ত্ত"ও তদ্রূপ এক বহু বিস্তৃত দেশ ছিল। কলিকাতায় "ভারতবর্ষ" মাসিক পত্র বাহির হইতে আরম্ভ করিলে, আমরা "ভারতবর্ষ" শীর্ষক

দুইটি (পৌরাণিক ভূগোল শাস্ত্রাবলম্বনে লিখিত) প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলাম। তন্মধ্যে প্রথমটি "ভারতবর্ষ" পত্রের প্রথমবর্ষের আশ্বিন-সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল এবং দ্বিতীয়টির ভাগ্যে কি হইয়াছে, তাহা আমরা অবগত নহি। এরূপ কৈফিয়তের তাৎপর্য্য এই যে, বর্তমান প্রস্তাবে উক্ত "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত প্রবন্ধের লিখিত বিষয় স্থানে স্থানে কিছু কিছু থাকিবে।

প্রাচীন কালের "ভারতবর্ষ", "আর্য্যাবর্ত্ত", এবং হিমালয় অনেক বড় ছিল। পুরাণে লিখিত আছে, যুগধর্ম্মে আমাদের দেহের পরিমাণ এবং আয়ু ক্রমশঃ হ্রস্ব হইতে হ্রস্বতর হইয়াছে। এই উক্তি সত্য হউক বা না হউক, আমাদের "হিমালয়" বর্ষপর্বত, "আর্য্যাবর্ত্ত" এবং "ভারতবর্ষ" যে অধুনা নিতান্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই। আমরা পৌরাণিক ভূগোল হইতে এতৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি এবং ভৌগোলিক শাস্ত্র ও গবেষণা নিপুণ বিদ্বজ্জন সমীপে নিবেদন করিতেছি, তাঁহারা স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান ও বিবেচনান্তে কর্ত্তব্য বিষয়ের মীমাংসা ও সিদ্ধান্ত করুন। কেবল মাত্র কনিংহাম প্রমুখ বিদেশী বিদ্বানের উপর একান্ত নির্ভর করিলে কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই।

প্রাচীন-কালে "হিমালয়" পর্ব্বতশ্রেণী যে অতি দূর বিস্তৃত ছিল, তাহার প্রমাণ কালিদাস তাঁহার "কুমার-সম্ভব" কাব্যের প্রথম শ্লোকে দিয়াছেন। হিমালয় বর্ণনার প্রারম্ভেই তিনি বলিতেছেন,

> "আছেন উত্তর দিকে দেব আত্মাময়
> অচল কুলের রাজা নাম হিমালয়।
> পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই দুই পারাবার
> মগ্ন করি রাখিয়াছে দুই প্রান্ত তাঁর।
> শৈলেন্দ্রের সুবিশাল শরীর আয়ত
> শোভিতেছে পৃথিবীর মানদণ্ড মত ॥১॥" *।

(কুমারসম্ভব, প্রথম সর্গ, লেখক কৃত অনুবাদ, পাণ্ডুলিপি হইতে উদ্ধৃত)।

কালিদাসের মতে হিমালয় পর্ব্বতরাজের পূর্ব্ব ও পশ্চিম দুই প্রান্ত যথাক্রমে পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্রে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে, এবং তাঁহার দেহ পৃথিবীর এদিক হইতে ওদিক ঠিক একটা মাপ কাঠির মত পড়িয়া আছে।

এই উক্তি কবির কল্পনা নহে। কালিদাস সে কালের ভূগোলশাস্ত্রে কিরূপ পণ্ডিত ছিলেন, তাহা তাঁহার রঘুবংশ কাব্যের (চতুর্থ সর্গ, রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনা এবং ত্রয়োদশ সর্গ রামসীতার লঙ্কা হইতে স্বদেশ গমন বর্ণনা) ও "মেঘদূত" কাব্যের (পূর্ব্বমেঘের) বর্ণনা পড়িলেই উত্তমরূপে বুঝিতে পারা যায়। কালিদাসের উক্তির সহিত পৌরাণিক উক্তির যে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে, তাহা আমরা দেখিতেছি।

বায়ু, মৎস্য, বিষ্ণু এবং শ্রীমদ্ভাগবত এই চারিখানি সর্ব্বজন প্রামাণ্য মহাপুরাণ এবং বিখ্যাত মার্কণ্ডেয় পুরাণে ভৌগোলিক বিষয়গুলি বেশ বিস্তৃত ভাবেই পাওয়া যায়। "ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ" নামে যে মুদ্রিত পুরাণা-স্তরের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহা বায়ু পুরাণেরই প্রক্রিয়া পাদ ও অনুষঙ্গপাদ মাত্র, সুতরাং আমরা পৃথকভাবে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের উল্লেখ করিব না। এইসকল পুরাণের মতে জম্বুদ্বীপ (প্রধানতঃ এসিয়া) নয়টি "বর্ষে" বিভক্ত। হিন্দু এবং জৈনপুরাণ-বিখ্যাত ঋষভদেবের পুত্রগণের নামানুসারে ভারতাদি বর্ষের নাম-করণ হইয়াছে। জম্বুদ্বীপের চারিদিকই লবণ সমুদ্রদ্বারা বেষ্টিত। এই জম্বুদ্বীপে ছয়টি বর্ষপর্ব্বত আছে, বর্ষ-পর্ব্বতগুলির পূর্ব্ব এবং পশ্চিম উভয় দিকই পূর্ব্ব ও পশ্চিম সাগরে নিমগ্ন। হিমবান্ (হিমালয়) পর্ব্বতই সর্ব্ব দক্ষিণ

---

* অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্ব্বাপরৌ বারিনিধী বগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ ॥১॥
কুমার সম্ভব কাব্য, ১ম সর্গ।

দিকে অবস্থিত এবং হিমালয়ের দক্ষিণ দিকেই ভারতবর্ষ অবস্থিত। ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত এবং পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে সমুদ্র। ধনুকে গুণ যোজনা করিলে যেরূপ দেখায়, ভারতবর্ষের আকার প্রায় তদ্রূপ। এক্ষেত্রে ধনুরাকারে সমুদ্র পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম এই তিন দিকে এবং হিমালয়-পর্ব্বত শ্রেণী গুণাকারে উত্তরে অবস্থিতি করিতেছেন। এই ভারতবর্ষ আবার নয় ভাগে বিভক্ত, তাহার মধ্যে আটটি খণ্ড ভারতীয় দ্বীপ অথবা উপদ্বীপ, এবং নবমখণ্ড আমাদের এই ভারত খণ্ড। ইন্দ্রদ্বীপ, কসেরু, তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান্, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গন্ধর্ব্ব ও বারুণ এই আটটী প্রধান দ্বীপ। দ্বীপগুলি ব্যতীত, এই ভারতখণ্ড বা ভারতদ্বীপ উত্তর দক্ষিণে গঙ্গার প্রভব স্থান হইতে কুমারিকাপর্য্যন্ত সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ এবং তির্য্যগভাবে উত্তর দিকে নয় সহস্র যোজন আয়ত। এই দ্বীপের স্থানে স্থানে ম্লেচ্ছগণ বাস করে এবং পূর্ব্বভাগে কিরাতগণ, ও পশ্চিম ভাগে যবনগণের নিবাস, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ ইহাতে স্ব স্ব বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক বাস করেন। *

পাদটীকার একটি শ্লোক মার্কণ্ডেয় পুরাণের এবং অবশিষ্ট শ্লোকগুলি বায়ুপুরাণ হইতে উদ্ধৃত হইল। মৎস্যপুরাণ, (১১৩ ও ১১৪ তম অধ্যায়), বিষ্ণুপুরাণ, (২য় অংশ, ২য় হইতে ৩য় অধ্যায়), শ্রীমদ্ভাগবত, (৫ম স্কন্দ, ১৯শ অধ্যায়) মার্কণ্ডেয় পুরাণ (৫৩ হইতে ৫৮ অধ্যায়), মহাভারত ভীষ্মপর্ব্ব, (জম্বুখণ্ড বিনির্ম্মাণ পর্ব্বাধ্যায়) এবং হরিবংশ প্রভৃতি প্রামাণ্য পুস্তকে ভারতবর্ষ এবং তত্রত্য পর্ব্বত নদ নদী ও দেশ জনপদাদির বর্ণনা আছে। রামায়ণেও প্রসঙ্গতঃ ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বৃত্তান্ত আসিয়া পড়িয়াছে। স্থানাভাব বশতঃ সমুদয় গ্রন্থ হইতে প্রমাণ অধ্যাহৃত হইল না। অনুসন্ধিৎসু পাঠকমহাশয় ইচ্ছা করিলেই মূল পুস্তকগুলি দেখিতে পারিবেন। ভারতবর্ষের অন্তর্গত আটটি দ্বীপের মধ্যে "তাম্রবর্ণ" একটি;—মৎস্য পুরাণের মতে উহার নাম "তাম্রপর্ণী" এবং বিষ্ণুপুরাণের মতে 'তামপর্ণ"। ভারতখণ্ডের দক্ষিণে তাম্রপর্ণী নদী আছে, তাহার নিকটে যে দ্বীপ আছে, তাহার আধুনিক নাম "সিলোন।" প্রাচীনকালে তাহারই নাম

* "জম্বুদ্বীপং পৃথুঃ শ্রীমান সর্ব্বতঃ পরিবারিতঃ।
নবভিশ্চারতঃ সর্ব্বৈভু বনৈভু তভাবনৈঃ।
লাবণেন সমুদ্রেণ সর্ব্বতঃ পরিবারিতঃ ॥ ১২ ॥
জম্বুদ্বীপস্য বিস্তারাৎ সমেন তু সমন্ততঃ।
প্রাগায়তাঃ সুপর্ব্বাণঃ ষড়েতে বর্ষ পর্ব্বতাঃ।
অবগাঢ়া উভয়তঃ সমুদ্রৌ পূর্ব্বপশ্চিমৌ ॥ ১৩ ॥"
৪৩ অধ্যায়, বায়ুপুরাণ।
"ভারতস্য তু বক্ষ্যামি নিসর্গং তং নিবোধত ॥ ৭২ ॥
পূর্ণতীর্থে হিমবতো দক্ষিণস্যাচলস্য হি।
পূর্ব্বপশ্চায়তস্যাস্য দক্ষিণেন দ্বিজোত্তম ॥ ৭৩ ॥"
"উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমবদ্দক্ষিণঞ্চ যৎ ॥ ৭৫ ॥
বর্ষং যস্তারতং নাম যত্রেয়ং ভারতীপ্রজা ॥ ৭৬ ॥"
৪৫ অধ্যায়, বায়ুপুরাণ।
"দক্ষিণাপরতো হ্যস্য পূর্ব্বেণ চ মহোদধিঃ।
হিমবানুত্তরেণাস্য কার্ম্মুকস্য যথাগুণঃ ॥ ৫৯ ॥"
৫৭ অধ্যায়, মার্কণ্ডেয় পুরাণ।
"ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নবভেদাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৭৮ ॥
ইন্দ্রদ্বীপঃ, কসেরুশ্চ তাম্রবর্ণঃ গভস্তিমান্।
নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গন্ধর্ব্বস্ত্বথ বারুণঃ ॥৭৯ ॥
অয়ন্তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ।
যোজনানাং সহস্রন্তু দ্বীপোঽয়ং দক্ষিণোত্তরম্ ॥ ৮০ ॥
আয়তে হ্যাকুমারিক্যাদাগঙ্গাপ্রভবাচ্চ বৈ।
তির্য্যগুত্তর বিস্তীর্ণঃ সহস্রাণি নবৈব তু ॥ ৮১ ॥
দ্বীপো হ্যুপনিবিষ্টোঽয়ং ম্লেচ্ছৈরন্তেষু নিত্যশঃ।
পূর্ব্বে কিরাতা হ্যস্যান্তে পশ্চিমে যবনাঃস্মৃতাঃ ॥ ৮২ ॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা মধ্যে শূদ্রাশ্চ ভাগশঃ।
ইজ্যাযুদ্ধবাণিজ্যাভির্বর্ত্তয়ন্তো ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৮৩ ॥
৪৫ অধ্যায়, বায়ুপুরাণ।

"সিংহল" ছিল। "তাম্রবর্ণ" অথবা "তাম্রপর্ণী" সম্ভবতঃ উহারই নামান্তর। গ্রীক্ ভৌগোলিক টলেমী উহার নাম "Taprobane" বলিয়াছেন। সম্প্রতি অনেকেরই বিশ্বাস আছে যে রাবণের রাজধানী লঙ্কাই উত্তরকালে "সিংহল" এবং "সিলোন" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। বৌদ্ধ মতের গ্রন্থ পালি ভাষায় রচিত "মহাবংশ" নামক পুস্তকেরও এইরূপ মত। "মহাবংশে" উক্ত হইয়াছে যে, পূর্ব্বে এই দ্বীপের নাম "লঙ্কা" ছিল, পরে নির্ব্বাসিত বঙ্গরাজপুত্র বিজয় সিংহের দ্বারা এই দ্বীপ (খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫৪৩ অব্দ) বিজিত ও অধিকৃত হওয়ায় তাঁহার উপাধি "সিংহ" হইতে "সিংহল" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। অথচ শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ ও মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তৎকালে "লঙ্কা" এবং "সিংহল" নামে দুইটি পৃথক্ পৃথক্ দ্বীপ ছিল *। "লঙ্কার" অবস্থা সম্বন্ধে আমরা রামায়ণের বঙ্গানুবাদক ৺ রাজকৃষ্ণ রায় এবং "বিশ্বকোষ" অভিধানের "উপনিবেশ" প্রবন্ধের লেখকের সহিত এক মত। তাঁহারা বায়ু পুরাণের ৪৮ অধ্যায় (এসিয়াটীক সোসাইটি, তথা বঙ্গবাসী সংস্করণ; বঙ্গবাসীর তথাকথিত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের ৫২ অধ্যায়, বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুজ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অনুষঙ্গপাদের ৫৩ অধ্যায়) হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে,রামায়ণ-কথিত লঙ্কানগরী যবদ্বীপের নিকট মলয় দ্বীপে (বর্ত্তমান ইংরেজী মানচিত্রের মলয় উপদ্বীপ অথবা মলক্কাদ্বীপ) বিদ্যমান ছিল †। আমরাও এইরূপ মনে করি। মনে করার যথেষ্ট হেতু আছে, কিন্তু বর্ত্তমান প্রস্তাবে সে আলোচনা প্রাসঙ্গিক না হওয়ায় এতাবতাই ক্ষান্ত হইতেছি।

ভারতবর্ষের উত্তরে যে হিমালয় পর্ব্বত বর্ত্তমান, পুরাণের মতে তাহার পূর্ব্ব পশ্চিম দুইপ্রান্ত পূর্ব্ব ও পশ্চিম দুই সমুদ্রে নিমগ্ন। মহাকবি কালিদাসও তাহাই বলিতেছেন। এরূপ অবস্থায় ভারতবর্ষের আয়তন পূর্ব্বে প্রশান্ত মহাসাগর পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর অথবা আটলান্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতেছে। এই বর্ণনা হইতে পশ্চিমে এসিয়া মাইনর (অথবা মিসর, বার্ব্বেরী পর্য্যন্তও হইতে পারে) হইতে পূর্ব্বে চীন দেশ পর্য্যন্ত যাবতীয় ভূভাগ ভারতবর্ষের অন্তর্গত ছিল বলিতে হইবে। চীন, পূর্ব্ব উপদ্বীপ, ব্রহ্মদেশ, ইণ্ডিয়া, আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান, পারস্য, মেসোপোটেমিয়া, আরব ও তুরস্ক, (এবং সম্ভবতঃ মিসর ও তৎপশ্চিম ভাগের উত্তর আফ্রিকা)

---

* ভারতবর্ষের 'কূর্ম্মনিবেশ' বর্ণনায়—
"লঙ্কা কালাজিনাশ্চৈব শৈলিকানিকটা তথা ॥২০॥
[illegible]াঃ কৌরবা যে চ ঋষিকাস্তাপসা শ্রমাঃ।
[illegible]াঃ সিংহলাশ্চৈব তথা কাঞ্চীনিবাসিনঃ ॥২৭॥"

মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ৫৮ অধ্যায় (বঙ্গবাসী সংস্করণ)
"সিংহলান্ বর্ব্বরান্ ম্লেচ্ছান্ যে চ লঙ্কানিবাসিনঃ। ২৩।
মহাভারত বনপর্ব্ব, ৫১ অধ্যায় (বোম্বাই, গোপাল নারায়ণ)

"জম্বুদ্বীপস্য চ... উপদ্বীপানষ্টৌ তদ্ যথা—স্বর্ণপ্রস্থশ্চন্দ্রশুক্র আবর্ত্তনো রমণকোমন্দরহরিণঃ পাঞ্চজন্যঃ সিংহলো লঙ্কেতি ॥৩০॥
শ্রীমদ্ভাগবত, ৫ম স্কন্ধ' ঊনবিংশ অধ্যায় (নির্ণয় সাগর সংস্করণ)

† "তথৈব মলয়দ্বীপ মেব মেব সুসংবৃতম্।
মণিরত্নাকরং স্ফীত মাকরং কনকস্য চ ॥২১॥
* * * *
তত্র শ্রীমাংস্তু মলয়ঃ পর্ব্বতো রজতাকরঃ।
মহামলয় ইত্যেবং বিখ্যাতো বরপর্ব্বতঃ ॥২৩॥
* * * *
তস্য কূটতটে রম্যে হেমপ্রাকার তোরণা।
নির্য্যূহবলভীচিত্রা হর্ম্ম্যপ্রাসাদমালিনী ॥২৮॥
শতযোজনবিস্তীর্ণা ত্রিংশদ্ যোজন মায়তা।
নিত্য প্রমুদিতা স্ফীতা লঙ্কা নাম মহাপুরী ॥২৯॥"
বায়ুপুরাণ, ৫২ অধ্যায়।

এই সমুদায় দেশই তাহা হইলে এককালে ভারতবর্ষের অন্তর্গত ছিল। আমরা এরূপ কথাই বলিতে চাহি। ইহাতে যদি পাশ্চাত্য শ্বেতাঙ্গ গুরুসম্প্রদায় অথবা তাঁহাদের ভক্ত এদেশী শিষ্যসঙ্ঘ আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে আমরা নিরুপায়।

তবে উপায়ের মধ্যে আমরা গ্রীক্ ঐতিহাসিক এরিয়ানের নামের [illegible] পারি। [illegible] ভারতবর্ষের উত্তরসীমায় [illegible] পর্ব্বত [illegible] সম্বন্ধে বলিতেছেন, "উত্তর [illegible] Taurus [illegible] সমুদ্র তীরবর্ত্তী পাম্ফিলিয়া ([illegible]phylia [illegible] (Lycia) ও শিলিশিয়া (Cilicia) না[illegible] দেশ দিয়া সমস্ত আসিয়া খণ্ডকে ভাগ করিয়া পশ্চিম দেশ বিস্তীর্ণ হইয়াছে। এই পর্ব্বত নানাস্থানে নানা নামে অভিহিত হইয়াছে। একস্থানে ইহাকে পরোপমিসস্ (Paropamisus), অপর কোনস্থানে ইমোডস্, আবার কোনস্থানে ইমায়ুস (Imaus) বলে। মাকিদনেরা ইহাকে কৌকেশশ (Kaukasus) বলিয়া থাকে।" Arrian, Indika, II (আমাদের নিকট মূল পুস্তক নাই, "বিশ্বকোষ" অভিধান, "আর্য্যাবর্ত্ত" প্রবন্ধ, দ্বিতীয়খণ্ড, ১৮১ পৃষ্ঠা হইতে গৃহীত হইল)।

হিপারকাশ (Hipparchus) নামক গ্রীক পণ্ডিতের জগৎ সম্বন্ধে যতদূর জ্ঞান ছিল, (খৃঃ পূঃ ১৫০) তাহার মানচিত্রে দেখা যায় যে, তরাশগিরি শ্রেণী কাস্পীয় সাগরের দক্ষিণ হইতে ভারতখণ্ডের উত্তর সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল *। বিখ্যাত পারসী বীর দিগ্‌বিজয়ী জারক্শাশ (Xerxes) গ্রীস দেশ জয় করিতে গিয়া বিফল মনোরথ হন এবং তাঁহাকে দশসহস্র সৈন্য লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। রোলিন (Charles Rollin) † তৎকৃত প্রাচীন ইতিহাসের প্রথমখণ্ডে উক্ত প্রসিদ্ধ প্রত্যাবর্ত্তনের যে একটি মানচিত্র দিয়াছেন, তাহাতে এ'খান কথিত পামফিলিয়া, লাইশিয়া ও শিলিশিয়া দেখান হইয়াছে। ঐ সকল দেশ লইয়াই বর্ত্তমান এসিয়ামাইনর রাজ্য, এখনও তরাশ পর্ব্বত তথায় পূর্ব্ব নামেই প্রথিত হইতেছে। মুসোঁ রোলিনের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রাচীন সময়ের গ্রীক জাতির জ্ঞাত জগতের এক মানচিত্র প্রদত্ত হইয়াছে, উহাতে এসিয়ামাইনরে তরশাশ (Tarsus), ইণ্ডিয়ার পশ্চিমোত্তরে ইমাউস্ (Imaus) এবং ইণ্ডিয়ার উত্তরে এমোদি (Emodi) পর্ব্বত দেখান হইয়াছে। "ইমাউস্" ও "এমোদি" যথাক্রমে "হিমবান্" ও "হিমালয়" শব্দেরই অপভ্রংশ বোধ হইতেছে। আধুনিক এসিয়া মহাদেশের যে কোন একখানি মানচিত্র লইলেই দেখা যাইবে যে, পৌরাণিক সময়ের হিমবান্ অথবা হিমালয়-শ্রেণী পূর্ব্বে চীনদেশ হইতে পশ্চিমে এসিয়ামাইনর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। চীনদেশে পি লিঙ্ (Pe-ling), তিব্বতে কিউন লিউএন (Kwen Luen), ভারতে হিমালয়, কাশ্মীরের উত্তরে কারাকোরম, (Karakorum), আফগানিস্থানে হিন্দুকুশ ও সিয়া কোহ্ (Siah-koh), পারস্যে এলবর্জ (Elburj), আর্ম্মেনিয়াতে ককেশাশ (Caucasus), এবং এসিয়ামাইনরে তরাস (Tarus) ইত্যাকার নানা নামে ঐ এক প্রাচীন হিমালয়ই যে, নানাদেশে কথিত হইতেছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং এরিয়ানের কথিত ভারতের উত্তর সীমার সহিত পৌরাণিক বর্ণনার যে মিল একেবারেই নাই, তাহা কখনই বলিতে পারা যায় না। তাহা হইলে, আমরা নিঃশঙ্কচিত্তে প্রচার করিতে পারি যে, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সুদিনে "ভারতবর্ষ" বলিতে সে কালের প্রায় সমুদায় সভ্য ভূভাগকেই বুঝাইত। পশ্চিমে এসিয়ামাইনর ও সিরিয়া দেশে যবনগণ, তৎপরে [illegible], তাহার পর শক, পহ্লব, বাহ্লীক, পারসিক, কৈকেয়,

* Nelson's Enclyclopaedia Vol 25 (Atlas) p 353.

† Ancient History by M—C Rollin (Translated) In 3 Vols, (17-9) (Printed by J. M'Gowan (London)

নদী (?) উত্তীর্ণ হইলেন। পরে তিনি সেই অতি বিস্তৃতা তরঙ্গসমাকুলা পশ্চিমবাহিনী হ্লাদিনী নাম্নী নদী উত্তীর্ণ হইয়া শতদ্রু নাম্নী নদীর পরপারে গমন করিলেন। তৎপরে সত্যসন্ধ ভরত, ঐলধান নামক গ্রামের নিকটবর্ত্তিনী নদী উত্তীর্ণ হইয়া অপর পর্ব্বত প্রদেশে যাইয়া, যে নদী স্বমধ্য পতিত বস্তু সকলকে ক্রমে প্রস্তর করিয়া ফেলে, সেই নদী পার হইয়া পবিত্রভাবে, যথায় শল্যকর্ষণের ঔষধ আছে, সেই আগ্নেয় প্রদেশ ও তন্মধ্যস্থিত শিলাবহা নদী দেখিয়া * চৈত্ররথ বনে ⁑ যাইবার জন্য বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত সকল অতিক্রম করিতে লাগিলেন *,* । পরে তিনি গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থানে যাইয়া বীরমৎস্য প্রদেশের উত্তর ভাগ দিয়া গমন করত ভারুণ্ড নামক বনে প্রবেশ করিলেন। পরে তিনি বেগবতী মনোহরা কুলিঙ্গা নাম্নী পার্ব্বতীয়া নদী পার হইলেন এবং যমুনা নদীর নিকটে যাইয়া তাহা উত্তীর্ণ হইয়া সৈন্যগণকে আশ্বাসিত করিলেন এবং তথায় স্নান ও জলপান পূর্ব্বক গাত্রমর্দ্দন দ্বারা ক্লান্ত অশ্বদিগের শ্রম দূর করিয়া জল লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। সেই ভদ্রস্বভাব রাজপুত্র ভরত উৎকৃষ্ট যানদ্বারা বায়ুর আকাশ অতিক্রমের ন্যায়, নিরন্তর মনুষ্যগমনাগমন চিহ্নশূন্য সেই মহারণ্য পশ্চাৎ করিলেন। পরে তিনি অংশুধান নামক গ্রামে যাইয়া তথায় মহানদী গঙ্গা উত্তীর্ণ হওয়া কঠিন বিবেচনা করিয়া শীঘ্র সুবিখ্যাত প্রাগ্বট নামক নগরে গেলেন এবং সৈন্যগণের সহিত তথায় গঙ্গাপার হইয়া কুটিকোষ্টিকা নাম্নী নদীর নিকটে যাইয়া তাহা উত্তরণ পূর্ব্বক ধর্ম্মবর্দ্ধন নামক

+ "স প্রাঙ্ মুখো রাজগৃহাদভিনির্যায় বীর্য্যবান্।
ততঃ সুদামাং দ্যুতিমান সন্তীর্য্যাবেক্ষ্য তাং নদীম্ ॥১॥
হ্লাদিনীং দূরপারাঞ্চ প্রত্যক্ স্রোতস্তরঙ্গিনীম্।
শতদ্রুমতরচ্ছ্রীমান্ নদীমিক্ষ্বাকুনন্দনঃ ॥২॥
ঐলধানে নদীং তীর্ত্বা প্রাপ্য চাপর পর্ব্বতান্।
শিলামাকুর্ব্বতীং তীর্ত্বা আগ্নেয়ং শল্যকর্ষণম্ ॥৩॥
সত্যসন্ধঃ শুচির্ভূত্বা প্রেক্ষমাণঃ শিলাবহম্।
অত্যাগাৎ স মহাশৈলান্ বনং চৈত্ররথং প্রতি ॥৪॥
সরস্বতীঞ্চ গঙ্গাঞ্চ যুগ্মেন প্রতিপদ্য চ।
উত্তরান্ বীরমৎস্যানাং ভারুণ্ডং প্রাবিশদ্বনম ॥ ৫ ॥
বেগিনীঞ্চ কুলিঙ্গাখ্যাং হ্লাদিনীং পর্ব্বতাবৃতাম্।
যমুনাং প্রাপ্য সন্তীর্ণো বলমাশ্বাসয়ত্তদা ॥ ৬ ॥
শীতীকৃত্বাতু গাত্রাণি ক্লান্তানাশ্বাস্য বাজিনঃ।
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ প্রায়াদাদায় চোদকম্ ॥ ৭ ॥
রাজপুত্রোমহারণ্যমনভীক্ষ্ণোপসেবিতম্।
ভদ্রোভদ্রেণ যানেন মারুতঃ খমিবাত্যয়াৎ ॥ ৮ ॥
ভাগীরথীং দুষ্প্রতারাং সোহংশুধানে মহানদীম্।
উপায়াদ্রাঘবস্তূর্ণং প্রাগ্ বটে বিশ্রুতেপুরে ॥ ৯ ॥
স গঙ্গাং প্রাগ্ বটে তীর্ত্বা সমায়াৎ কুটিকোষ্টিকাম্।
সবলস্তাং স তীর্ত্বাথ সমগাদ ধর্ম্মবর্দ্ধনম্ ॥ ১০ ॥
তোরণং দক্ষিণার্দ্ধেন জম্বুপ্রস্থং সমাগমৎ।
[illegible]বী রম্যং গ্রামং দশরথাত্মজঃ ॥ ১১ ॥
[illegible]ম্যো বনেবাসং কৃত্বাসৌ প্রাঙ্ মুখো যযৌ।
[illegible]ময়ুজিহ্বালায়াঃ প্রিয়কা যত্র পাদপাঃ ॥ ১২ ॥

(ক) "ইক্ষুমতী" পৌরাণিক "চক্ষু" "বংক্ষু" এবং বৈদিক "বক্ষু" ও আধুনিক Oxus নদীরই নামান্তর বলিয়া বোধ হয়।

* শিলাবহা নদী অথবা শিলাবহ নদ। জলস্রোতের অথবা তুষার স্রোতের (Glacier) বেগে ছোট বড় শিলাখণ্ড (Boulders) ভাসাইয়া লইয়া যায়। হিমালয় পর্ব্বতের উপরিস্থ অথবা নিম্নস্থ সন্নিহিত নদ নদীতেই ইহা হওয়া সম্ভব। যে নদীতে কোন বস্তু পড়িলেই উহা প্রস্তরে পরিণত হইয়া যায়, ঐ নদীও হিমালয় পর্ব্বতে আছে।

⁑ চৈত্ররথ বন ভবতের অচ্ছোদ নদীর সন্নিহিত।
(বায়ুপুরাণ, ৪৭ অধ্যায়, ৫।৬ শ্লোক)।

, ভরতকে অযোধ্যা আসিবার পথে বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। কেকয় যদি অমৃতসরের নিকটে হইত, তাহাহইলে তথাহইতে অযোধ্যা আসিতে এরূপ বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত অতিক্রম করিতে হইত না। এ সকল পর্ব্বত গান্ধার অথবা কাশ্মীর দেশের পর্ব্বত।

গ্রামাভিমুখে চলিলেন। পরে সেই দশরথ-নন্দন ভরত তোরণ নামক গ্রামের দক্ষিণ ভাগ দিয়া জম্বুপ্রস্থ গ্রামে যাইয়া বরুথ নামক গ্রামের অভিমুখে গেলেন। তিনি তথ্যকার রমণীয় বনমধ্যে রজনী-যাপন করিয়া প্রভাতে পূর্ব্বমুখ হইয়া, যথায় প্রিয়ক নামে বিখ্যাত বহুতর বৃক্ষ আছে, উজ্জিহানা নগরীর সেই উদ্যানামুভিখে গমন করিলেন। পরে তিনি সেই প্রিয়ক নামক বৃক্ষসকলের নিকটস্থ হইয়া রথে শীঘ্রগামী অশ্বসকল যোজনা পূর্ব্বক সৈন্যগণকে মন্দগমনে অনুমতি করিয়া দ্রুতপদে যাইতে লাগিলেন। পরে তিনি সর্ব্বতীর্থ নামক গ্রামে রাত্রি বাস করিয়া প্রভাতে পর্ব্বতজাত ঘোটকসকলের দ্বারা সেই গ্রামের নিকটবর্ত্তিনী উত্তরবাহিনী নদী পার হইয়া অন্যান্য অনেক নদী উত্তীর্ণ হইলেন। তৎপরে সেই নরব্যাঘ্র ভরত হস্তিপৃষ্ঠক নামক গ্রামে কুটিকানদী উত্তরণ পূর্ব্বক লৌহিত্য নামক গ্রামে যাইয়া কপীবতী নাম্নী নদী অতিক্রম করিলেন। পরে তিনি একশাল নামক গ্রামের নিকটবর্ত্তিনী স্থাণুমতী নাম্নী নদী উত্তীর্ণ হইয়া বিনত নামক গ্রামে যাইয়া তৎসমীপবর্ত্তিনী গোমতী নাম্নী নদী পার হইয়া কলিঙ্গনগরে উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহার বাহন সকল পরিশ্রান্ত হইলেও তিনি তৎসমীপবর্ত্তী সালবন-মধ্যদিয়া দ্রুতগমন করিতে লাগিলেম। তিনি রজনীতে শালবন অতিক্রম করিয়া অরুণোদয় কালে মহীপতি মনুর সন্নিবেশিতা অযোধ্যা নগরী দেখিতে পাইলেন। সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ ভরত এইরূপে পথিমধ্যে সপ্তরাত্রি কাটাইয়া অষ্টম দিবসে অযোধ্যার সন্নিহিত হইয়া সারথিকে বলিতে লাগিলেন।"

(বঙ্গবাসীর অনুবাদ।)

এই দুইটি যাত্রা বিবরণীতে পর্ব্বত, নদী ও প্রদেশাদির নাম পৌর্ব্বাপর্ব্ব নিয়মিত ক্রমে লিখিত না হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে, তথাপি এই উভয় যাত্রা মিলাইয়া পাঠ করিলে প্রতীতি হয় যে, ভরত অতি দ্রুত-গামী অশ্বাদি যানে আসিলেও কেকয় দেশ হইতে অযোধ্যা আসিতে তাঁহার সপ্তদিবারাত্রি পথেই অতিবাহিত হইয়াছিল এবং অষ্টম দিবসে তিনি অযোধ্যায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। "বিশ্বকোষে" আর্য্যাবর্ত্তের যে মানচিত্র প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, অযোধ্যা হইতে কেকয় রাজধানী গিরিব্রজ অথবা রাজগৃহ নগরের দূরত্ব ইংরাজী ৫০০ পাঁচশত মাইলেরও কম। দ্রুতগামী উষ্ট্রও প্রতিদিন ১০০ একশত মাইল দুর্গম পথ চলিতে পারে †; এরূপ অবস্থায় ভরত যেরূপ দ্রুতগামী যানে আসিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ৫০০ পাঁচশত মাইল পথ দুইদিনেই অতিক্রম করিতে পারিতেন। আর, পথে যে সকল পার্ব্বত্য প্রদেশ, নগর এবং নদনদীর উল্লেখ আছে, তাহা বিবেচনা করিলে সহজেই প্রতীতি জন্মে যে, হিমালয়ের উত্তর পশ্চিম প্রান্ত অতিক্রম করিয়া তবে যাত্রী অযোধ্যা হইতে

স তাংস্তু প্রিয়কান্ প্রাপ্য শীঘ্রানাস্থায় বাজিনঃ।
অনুজ্ঞাপ্যাথ ভরতো বাহিনীং ত্বরিতো যযৌ॥ ১৩॥
বাসংকৃত্বা সর্ব্বতীর্থে তীর্ত্বা চোত্তরগাং নদীম্।
অন্যা নদীশ্চ বিবিধৈঃ পার্ব্বতীয়েস্তুরঙ্গমৈঃ॥১৪॥
হস্তিপৃষ্ঠক মাসাদ্য কুটিকামপ্যবর্ত্তত।
ততার চ নরব্যাঘ্রো লৌহিত্যে চ কপীবতীম্॥ ১৫॥
একশালে স্থাণুমতীং বিনতে গোমতীং নদীম্।
কলিঙ্গনগরে চাপি প্রাপ্য শালবনং তদা॥ ১৬॥
ভরতঃ ক্ষিপ্রমাগচ্ছৎ স পরিশ্রান্তবাহনঃ।
বনঞ্চ সমতীত্যাশু শর্ব্বর্য্যামরুণোদয়ে॥ ১৭॥
অযোধ্যাং মনুনা রাজ্ঞা নির্ম্মিতাং স দদর্শ হ।
তাং পুরীং পুরুষব্যাঘ্রঃ সপ্তরাত্রোষিতঃ পথি॥ ১৮॥
অযোধ্যা মগ্রতো দৃষ্ট্বা সারথিমিদ মব্রবীৎ॥ ১৯॥

অযোধ্যাকাণ্ড, ৭১ সর্গ। (বঙ্গবাসী।)

† ইলহৈরি জাতীয় উষ্ট্র অষ্টাহের মধ্যে [illegible] ক্রোশ আফ্রিকার মরুপথ ভ্রমণ করিয়া [illegible]

বিশ্বকোষ, দ্বিতীয় খণ্ড, ৪৬০ পৃষ্ঠা।

কেকয় রাজ্যে যাতায়াত করিতে পারিতেন। "বাহ্লীক প্রদেশ বর্ত্তমান কাশ্মীরের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত এবং "উজ্জিহান." কাশ্মীরেরই অংশবিশেষ বলিয়া কনিংহাম প্রমুখ য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন এবং ভরত "উজ্জিহানা" অতিক্রম করিয়াছিলেন বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

ভরত ও তাঁহার সঙ্গিগণ যে অতি দ্রুতগামী অশ্বাদি যানে কেকয় হইতে অযোধ্যা আসিয়াছিলেন, তাহা আমাদের অনুমান মাত্র নহে. রামায়ণেও ইহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে, যথা—

"তিনি (ভরত) যাইতে লাগিলে. ভৃত্যবর্গ উষ্ট্র, অশ্ব, গো ও গর্দ্দভ যোজিত সুবৃত্তচক্র শতাধিক রথ লইয়া তাঁহার অনুগামী হইল।" রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৭০ তম সর্গ। (বঙ্গবাসীর অনুবাদ।)*

দ্রুতগামী গর্দ্দভও পারস্য দেশের নিজস্ব বলিয়া বোধ হয়। রামায়ণের উদ্ধৃতাংশ হইতে এবং অন্যান্য স্থান হইতে কেকয় দেশের অবস্থান নির্ণযের নিমিত্ত কি কি" উপাদান পাওয়া যাইতে পারে, এক্ষণে তাহাই দেখা যাউক। অযোধ্যা এবং কেকয়রাজের রাজধানী গিরিব্রজ নগরের মধ্যে নিম্নলিখিত ভৌগোলিক বস্তু বিদ্যমান আছে. যথা,—

১। পর্ব্বত—সুদামা পর্ব্বত, বিষ্ণুপদ পর্ব্বত.অপর পর্ব্বত।

২। নদী—মালিনী, গঙ্গা, শরদণ্ডা, ইক্ষুমতী, বিপাশা, শাল্মলী, সুদামা, পশ্চিমগামিনী হ্লাদিনী, শতদ্রু, যে নদীর মধ্যে যাহা পড়ে তাহাই প্রস্তরে পরিণত হয় সেই নদী, শিলাবহ নদ, সরস্বতী ও গঙ্গার সঙ্গমস্থান, বেগবতী, কুলিঙ্গা পর্ব্বতাবৃতা হ্লাদিনী, যমুনা, ভাগীরথী, উত্তরগামিনী একটি নদী, অন্য অনেক নদী, কুটিকা, কপীবতী, স্থাণুমতী, গোমতী।

৩। বন—চৈত্ররথ, ভারুণ্ড, মহারণ্য, উজ্জিহানার প্রিয়ক উদ্যান, শালবন।

৪। প্রদেশ, জনপদ. নগর. ইত্যাদি—অপর তাল, প্রলম্ব, হস্তিনাপুর, পাঞ্চাল, কুরুজাঙ্গল, কুলিঙ্গা, অভিকাল, তেজোভিভবন, বাহ্লীক, ঐলধান. বীরমৎস্য, অংশুধান, প্রাগ্‌বট, কুটিকোষ্টিক. ধর্ম্মবর্দ্ধন, তোরণ, জম্বুপ্রস্থ, বরূথ, উজ্জিহানা, সর্ব্বতীর্থ, হস্তিপৃষ্ঠক, লৌহিত্য, একশাল, বিনত, কলিঙ্গনগর।

এই সকল পর্ব্বত, নদ নদী, বন, প্রদেশ ও নগর ইত্যাদি সম্বন্ধে রামায়ণে বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের ৪৩ সর্গে, সুগ্রীবকর্ত্তৃক সীতান্বেষণ নিমিত্ত চারিদিকে বানর সৈন্য প্রেরণ সময়ে, উত্তর দিকে হিমালয় সন্নিহিত প্রদেশ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, "হিমালয়রূপ শিরোভূষণ-শোভিত উত্তর দিক্...তথায় ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, শূরসেন, প্রস্থল, ভরত, কুরু, মদ্র, কাম্বোজ, যবন ও শক প্রভৃতির পত্তন এবং বরদ প্রভৃতি অনুসন্ধান করিয়া হিমালয় পর্ব্বতও অনুসন্ধান করিবে।" কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, † ৪৩ সর্গ, (বঙ্গবাসীর অনুবাদ)।

মহাভারত সভাপর্ব্ব, দিগ্বিজয় পর্ব্বাধ্যায়, নকুল কর্ত্তৃক পশ্চিম দেশ জয় করার প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে,—

"(নকুল) সমস্ত পঞ্চনদ, অমর পর্ব্বত, উত্তর জ্যোতিষ, দিব্যকটপুর ও দ্বারপালকে বলপূর্ব্বক বশীভূত করিলেন।

*"রথান্ মণ্ডলচক্রাংশ্চ যোজয়িত্বা পরঃশতান্।
[illegible] গোঽশ্ব খরৈর্ভৃত্যা ভরতংযান্তমন্বয়ুঃ॥২৯॥"
৭০ সর্গ, অযোধ্যাকাণ্ড। (বঙ্গবাসী)

†"দিশং হ্যুদীচীং বিক্রান্তহিমশৈলাবতংসিকাম্।৪।
... ...
তত্র ম্লেচ্ছান্ পুলিন্দাংশ্চ শূরসেনাং স্তথৈব চ।
প্রস্থলান্ ভরতাংশ্চৈব কুরুংশ্চ সহ মদ্রকৈঃ॥১১॥
কাম্বোজ যবনাংশ্চৈব শকানাং পত্তনানি চ।
অন্বীক্ষ্য বরদাংশ্চৈব হিমবন্তং বিচিন্বথ॥১২॥"
৪৩ সর্গ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড। (বঙ্গবাসী)

অনন্তর রামঠ, হারহূণ এবং প্রতীচ্য ভূপালদিগকে আপনার বশে আনিলেন। তৎপরে তথায় অবস্থান করিয়াই বাসুদেবের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন, বাসুদেব ও যাদবগণ তাঁহার শাসন গ্রহণ করিলেন। অবশেষে সকলে উপস্থিত হইয়া মদ্রদিগের নগর অধিকার করিয়া মাতুল শল্যকে প্রীতিপূর্ব্বক বশীভূত করিলেন।

* * * * *

পরিশেষে সাগরগর্ভস্থ (?—উপকূলস্থ) পরম দারুণ ম্লেচ্ছ, পহ্লব, বর্ব্বর, কিরাত, যবন ও শাকদিগকে বশীভূত ও তাহাদিগের নিকট হইতে উৎকৃষ্ট দ্রব্যজাত সংগ্রহ করিয়া অবশিষ্ট অন্যান্য পার্থিবদিগকে বশ করিলেন।" ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ, ৩১ অধ্যায়।*

বায়ুপুরাণে, ভারতবর্ষের উত্তর (-পশ্চিম) দিকে অবস্থিত দেশ-সমূহের বর্ণনায় আছে,—

"বাহ্লীক, বাটধান, আভীর, কালতোয়ক, অপরীত, শূদ্র, পহ্লব, চর্ম্মখণ্ডিক, গান্ধার, যবন, সিন্ধুসৌবীর, মদ্রক, শক, দ্রুহ্য, পুলিন্দ, পারদ, হারহূণ, রমট, কন্ধকটক, কেকয়, দশমালিক, ক্ষত্রিয়োপনিবেশ, বৈশ্য-শূদ্র কুল, কাম্বোজ, দরদ, বর্ব্বর, প্রিয়লৌকিক ইত্যাদি"।

বায়ুপুরাণ, ৪৫ অধ্যায়, বঙ্গবাসীর অনুবাদ। †

মৎস্যপুরাণেও অবিকল ঐরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল "রমট" স্থলে "রামঠ", "কন্ধকটক" স্থলে "কণ্টকার", দশমালিক স্থলে "দশনাম";—কেকয় ঠিক আছে। ‡

মার্কণ্ডেয় পুরাণেও ঐরূপ। কেবল "রমট" স্থলে "মাঠর" "কন্ধকটক" স্থলে "বহুভদ্র," এবং "দশমালিক" স্থলে "দশমালিক";—কেকয় ঠিক আছে। ¶

এতদ্ভিন্ন মহাভারত, ভীষ্মপর্ব্ব, জম্বুখণ্ড বিনির্ম্মাণ পর্ব্বাধ্যায়ে এবং কর্ণপর্ব্বে ভারতখণ্ডের উত্তর পশ্চিম দিকের দেশের বর্ণনা আছে এবং কর্ণপর্ব্বে মদ্রদেশের সবিশেষ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আর অধিকতর প্রমাণ অধ্যাহারের প্রয়োজনাভাব।

উদ্ধৃত বাক্যাবলী হইতে দেখা যাইতেছে যে, মহাভারতে সমস্ত পঞ্চনদ প্রদেশের পর শাকল এবং মদ্রের উল্লেখ আছে এবং পুরাণে সর্ব্বত্রই গান্ধার এবং মদ্র দেশের পর কেকয়ের উল্লেখ আছে। যদিও উপযুক্তরূপ শোধনের অভাবে পুরাণে পাঠান্তর অতিশয় অধিক,

---

* "কৃৎস্নং পঞ্চনদং চৈব তথৈবামরপর্ব্বতম্।
উত্তরজ্যোতিষং চৈব তথাদিব্যকটং পুরম্॥১১॥
দ্বারপালং চ তরসা বশে চক্রে মহাদ্যুতিঃ।
রামঠান্ হারহূণাংশ্চ প্রতীচ্যাশ্চৈব যে নৃপাঃ॥১২॥
তান্ সর্ব্বান্ স বশে চক্রে শাসনাদেব পাণ্ডবঃ।
তত্রস্থঃ প্রেষয়ামাস বাসুদেবায় ভারত॥১৩॥
স চাস্য গতভীরাজন্ প্রতিজগ্রাহ শাসনম্।
ততঃ শাকলমভ্যেত্য মদ্রাণাং পুটভেদনম্॥১৪॥
মাতুলং প্রীতিপূর্ব্বেণ শল্যং চক্রে বশে বলী।
... ...
ততঃ সাগরকুক্ষিস্থান্ ম্লেচ্ছান্ পরমদারুণান্॥৬॥
পহ্লবান্ বর্ব্বরাংশ্চৈব কিরাতান্ যবনান্ শকান্।
ততো রত্নান্যুপাদায় বশে কৃত্বাচ পার্থিবান্॥
ন্যবর্ত্তত"—ইত্যাদি।
সভাপর্ব্ব, ৩২ অধ্যায়, বোম্বাই গোপাল নারায়ণ সংস্করণ।

† "বাহ্লীকা বাটধানাশ্চ আভীরাঃ কালতোয়কাঃ।
অপরীতাশ্চ শূদ্রাশ্চ পহ্লবাশ্চর্ম্মখণ্ডিকাঃ॥১১৫॥
গান্ধারা যবনাশ্চৈব সিন্ধুসৌবীর মদ্রকাঃ।
শাকা দ্রুহ্যাঃ পুলিন্দাশ্চ পারদা হারহূণকাঃ॥১১৬॥
রমটা কন্ধকটকাঃ কেকয়া দশমালিকা।
ক্ষত্রিয়োপনিবেশাশ্চ বৈশ্যশূদ্র কুলানিচ॥১১৭॥
কাম্বোজাদরদাশ্চৈব বর্ব্বরা প্রিয়লৌকিকাঃ॥ ইত্যাদি।

‡ রামঠাঃ কণ্টকারাশ্চ কৈকেয়া দশনামকাঃ॥৪২॥
মৎস্যপুরাণ ১১৪ অধ্যায়, বঙ্গবাসী।

¶ মাঠরা বহুভদ্রাশ্চ কৈকেয়া দশমালিকা॥৩৭॥
মার্কণ্ডেয় পুরাণ। ৫৭ অধ্যায়। বঙ্গবাসী।

তাহা হইলেও, কেকয় দেশ যে গান্ধার এবং মদ্র দেশের পশ্চিমে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। গান্ধার বর্ত্তমান আফ্‌গানিস্থানের পূর্ব্বাংশ, মদ্র পশ্চিমাংশ এবং কেকয় পূর্ব্ব-পারস্য বলিয়া আমাদের বোধ হয়। রামায়ণে কেকয় দেশের উৎকৃষ্ট উৎপন্নদ্রব্যের নাম যেরূপ লিখিত হইয়াছে, তাহাতেও উহা পারস্য বলিযাই অনুমিত হয়। ভরত মাতামহালয হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন কালে কেকয় রাজ, তাঁহাকে নিম্নলিখিত রূপ উপহার দিয়াছিলেন—

"পরে কেকয়রাজ, ভরতকে সমাদর সহকারে অনেক উত্তম হস্তী, বহুতর বিচিত্র কম্বল, অনেক মৃগচর্ম্ম, ষোড়শ শত অশ্ব, দ্বিসহস্র নিষ্ক এবং অন্তঃপুবে অতি যত্নে বর্দ্ধিত বৃহৎকায়-সমন্বিত ও বলবীর্য্যে ব্যাঘ্র সদৃশ দংষ্ট্রাযুক্ত বহু কুক্কুর প্রদান করিলেন।...তাঁহাকে ইন্দ্রশিরা দেশজাত ঐরাবতবংশীয় প্রিয়দর্শন অনেক হস্তী, এবং সুসজ্জিত দ্রুতগামী বহুতর খর দিলেন।

"অযোধ্যাকাণ্ড, ৭০সর্গ বঙ্গবাসীর অনুবাদ।*

হস্তী এখন পারস্য দেশে পাওযা যায না; হয়ত পূর্ব্বকালে পাওয়া যাইত, অথবা অন্যান্য দেশ হইতে আনীত হইত। উত্তম অশ্ব, গর্দ্দভ, কুক্কুর এবং বিচিত্র লোমজাত কম্বল (গালিচা) এখনও পারস্যদেশে প্রচুব পাওয়া যায়।"কেকয়জ"শব্দে উত্তম অশ্বই বুঝাইযা থাকে।

প্রবন্ধ বোধ করি অতি বিস্তৃত হইযা পড়িল, সুতরাং এই স্থানেই আপাততঃ নিরস্ত হইতে হইতেছে। পুরাণের মতে শক, যবন, হূণ, হারহূণ (শ্বেতহূণ) চীন, ইত্যাদি ক্ষত্রিয়বর্গ। রামায়ণ, মহাভারত ও পাণিনি ব্যাকরণে শক-যবনাদির নাম পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা অনার্য্য এবং অর্ব্বাচীন কালে তাঁহাদের সহিত ভারতের পরিচয় হইয়াছে, আর্য্যগণ "ভারত বর্ষের" বহির্দেশ হইতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের এ সম্বন্ধে চিন্তা করিবার অনেক বিষয় রহিয়াছে।

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

* "তস্মৈ হস্ত্যুত্তমাংশ্চিত্রান্ কম্বলানজিনানিচ।
সৎকৃত্য কেকয়ো রাজা ভবতায় দদৌ ধনম্ ॥১৯॥
অন্তঃপুরেঽতিসংবৃদ্ধান ব্যাঘ্রবীর্য্যবলোপমান্।
দংষ্ট্রায়ুধান্ মহাকায়ান্ শুনশ্চোপায়নং দদৌ ॥২০॥
রুক্মনিষ্কসহস্রে দ্বে ষোড়শাশ্বশতানিচ।
সৎকৃত্য কেকয়ীপুত্রং কেকযোধনমাদিশৎ ॥২১॥
... ...
ঐরাবতানৈন্দ্রশিরান্ নাগান্ বৈ প্রিয়দর্শনান্। †
খরান্ শীঘ্রান্ সুসংযুক্তান্ মাতুলোঽস্মৈ ধধনং দদৌ
॥২৩। ৭০ সর্গ, অযোধ্যাকাণ্ড।

† হস্তী-শাস্ত্রে ঐরাবত, বামন, কুমুদ, অঞ্জন প্রভৃতি দিগ্‌হস্তিগণের বংশজাত ভদ্র, মন্দ্র প্রভৃতি শ্রেণীর এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতীয় হস্তীর বর্ণনা আছে। তন্মধ্যে ঐরাবত বংশীয় হস্তীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

অতীতের স্বপ্ন।

(একটি ইংরেজী কবিতার ভাবানুবাদ)

কত না গভীর নিশায় যখন
সুপ্তির ক্রোড়ে সুপ্ত-মগন আঁখি,
অতীতের শত রঙ্গীন স্বপন
সুখের আলোকে বুকখানি দেয় ঢাকি।
মধুবদিনের কথা—
মধুময় মধুরতা,
সেই হাসিখেলা--মনভাঙ্গাগড়া--হাসিকান্নার দোল;
প্রিয়ের সে প্রিয়মুখ,
ফেনিলোচ্ছল সুখ,—
স্মৃতি হয়ে মোব হৃদয়েব পুরে তুলিতেছে কল্লোল।
এমনি গভীর নিশায় যখন
সুপ্তিব ক্রোড়ে সুপ্ত-মগন আঁখি,
অতীতেব শত রঙ্গীন স্বপন
সুখের আলোকে বুকখানি দেয় ঢাকি।
বন্ধু যাহাবা ছিল এ ধবায়
জ্যোৎস্নাব মত আমার গগনে ফুটি,
শীত-আহত পত্রের মত হায়
একে একে তাবা ভূমিতে পড়িল লুটি।
বহিতে নিয়তি-লেখা—
আজি আমি শুধু একা—
উৎসবগত কক্ষের মত জাগি ম্রিয়মাণ-সাজে;—
নাই সে আলোক-মালা,
আমোদ-বিজলী ঢালা,—
সব গেছে চলি কক্ষ একাকী রহিল আঁধার-মাঝে।
এমনি গভীব নিশায় যখন
সুপ্তির ক্রোড়ে সুপ্ত-মগম আঁখি,
অতীতের শত রঙ্গীন স্বপন
সুখের আলোকে বুকখানি দেয় ঢাকি।

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

ভোগের ভয়

আমরা প্রায়ই নিজেদের চিন্তায় এতই বেশী ব্যাপৃত থাকি যে, পরের কথা ভাবিবার অবসর বড় হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যেন ভীত না হন; এখানে পরার্থে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিবার কোন পরামর্শ হইবে না। পরে যাহা করে, যাহা ভাবে, যাহা বিশ্বাস করে,—তাহার একটু অনুসন্ধান লইলে এবং এই অনুসন্ধান হইতে একটু আনন্দ উপভোগ করিতে পারিলে, টাকা পাওয়া যায় কিনা জানি না, তবে স্বদেশদ্রোহিতাও হয় বলিয়া জানা নাই। শরীরে বল থাকিলে যেমন একটু চলা ফেরা না করিলে চলে না, মনের ভিতরেও তেমনই যদি শক্তি থাকে, তবে ইতস্ততঃ একটু আধটু অনুধাবন না করিয়া থাকা অসম্ভব। সুতরাং যে ব্যক্তির সাম্‌নে দিয়া বিশ্বের শোভাযাত্রা চলিয়া গেলেও সে তাহা দেখিতে পায় না—তাহার মনের ক্ষমতা কত বড়, বুঝা কঠিন নয়; যাহার সম্মুখে লীলাচঞ্চল মানবশিশু নানা ভঙ্গিতে নাচিয়া বেড়ায়—যাহার সম্মুখে বিশ্বমানব নানা ধরণে আপনার বিশাল ইতিহাস গড়িয়া তুলিতেছে, অথচ যাহার এ সমস্ত কিছুই উপভোগ করিবার ক্ষমতা নাই বলিতে হইবে, ভগবান্ তাহাকে ভোগের শক্তিতে বড়ই খাটো করিয়াছেন।

কিন্তু আমাদের এবং আমাদের সমষ্টি আমাদের জাতির সম্বন্ধে এই কথাটাই একটু দুঃসাহসে ভর করিয়া বলিতে হইবে, যে, ভগবান্ আমাদিগকে ভোগের শক্তিতে বড় খাটো করিয়াছেন। আমাদের নাড়ী অতি ক্ষীণ; বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিনটার যে কোনটাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক না কেন, আমাদের এই চিরন্তন ক্ষীণতাকে সে অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারে না। আমরা নিবু নিবু হইয়া বাঁচি, আর নিবু নিবু হইয়াই ফস্ করিয়া অনন্তে মিলাইয়া যাই। এটা নিশ্চয়ই খুব শক্তিমত্তার লক্ষণ নয়। কিন্তু এমন মানুষও আছে, যার দুর্দান্ত দৈত্যশিশুর মত সংসারে আসে, সর্ব্বদমনের মত সিংহশিশুর দাঁত গণিয়া লওয়াকে ক্রীড়া মনে করে, অসুরের মত ভোগ করে, এবং কৌরব-বাহিনীতে ঘটোৎকচের পতনের মত পৃথিবীর এক কোণ লইয়া খসিয়া পড়ে।

কারণটা কি, সে বিচার এখানে করা হইতেছে না। কিন্তু কথাটা সত্য, যে, আমরা অত্যন্ত দুর্ব্বল—দেহে এবং মনে উভয়তঃই দুর্ব্বল। আমাদের যে টাকা নাই, আমরা যে ভাল করিয়া খাইতে পাই না, ভাল করিয়া শীত গ্রীষ্ম হইতে দেহ রক্ষা করিতে পারি না, ছেলের অসুখ হইলে যে ভাল করিয়া চিকিৎসা করাইতে পারি না—এই সকলই সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। কারণ, খাইতে পরিতে পায় না, এমন লোক যেমন এ দেশে যথেষ্ট আছে, খাইয়া পরিয়া ফুরাইতে পারে না, এমন লোকেরও এদেশে অপ্রাচুর্য্য নহে। অনেকে যেমন ঔষধ ও পথ্যের অভাবে মরিয়া যায়, অনেকে আবার তেমনই বৃহদর্শন ডাক্তার আনিয়া মহাশক্তি ঔষধ খায় বলিয়াই মরিয়া যায়। এই অসামঞ্জস্যের ভিতরে যে একটা অর্থনীতির সূত্র রহিয়াছে, তাহার আলোচনা ও বিচার ইউরোপে হইতেছে, আমাদের দেশে আরও কিছুদিন সবুর চলিবে। এ সকলের কথা এখানে তুলিতে চাই না। কিন্তু আমাদের নানা প্রকার বাহ্য বস্তুর অভাবের বিজ্ঞাপন দেওয়ার ভিতরে যে একটা নাকি কান্নার সুর লুকান থাকে, সেটাই বিশেষ ভাবে পরিত্যাজ্য। সেই জন্যই, আমাদের টাকা নাই, কড়ি নাই, ছাতি নাই, জুতা নাই, ইত্যাদি চীৎকার করিয়া সকলকে জানান তত রুচিজনক নহে। ধার করা জিনিসে, ফাঁকি দিয়া দৈন্য গোপন করা যেমন অভদ্রামি, নিজের অভাব নিয়া পরকে জ্বালাতন করাও তেমনই বেহায়ামি। সুতরাং যে সব অভাব নিয়া অনেককার অনেকের দ্বারস্থ হইয়াছি—অনেক রকমে অনেককে

যাহা জানাইয়াছি—সে সকল পুরাতন কাসুন্দি ঘাঁটিয়া কোন লাভ নাই।

কিন্তু একটা কথা। ঘরে ভাঁড়ারে চাউল আছে কিনা, যে গৃহস্থ সে খবরই রাখে না, সে চিন্তাশীল হইতে পারে, দার্শনিক হইতে পারে, জীবন্মুক্ত হইতে পারে, তটস্থ হইতে পারে, কিন্তু গৃহস্থ নয়। এই জন্যই, যে সকল অভাবের কথা সংবাদপত্রের স্তম্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া গোষ্ঠী-সংলাপে পর্য্যন্ত আলোচিত হয়, সে সকলের পুনরুত্থাপন যেমন অপ্রয়োজনীয়,—যে অভাবটার দিকে প্রায়শঃই আমাদের দৃষ্টি পড়ে না সেটার কথা মাঝে মাঝে মনে করা তেমনই প্রয়োজনীয়।

আমরা যে দেহে এবং মনে অত্যন্ত দুর্ব্বল, আমাদের যে ভোগের শক্তি কম, এ কথাটা অনেক সময়ই আমরা বিশ্বাস করিতে চাই না। দেহের দৌর্ব্বল্যের প্রমাণ প্রায় সর্ব্বত্রই মিলে,—রেলে, ষ্টিমারে, যাত্রাগানে—যে কোন ভিড়ের জায়গায় আমরা দেহের ভঙ্গুরতা বুঝিয়া লই। যে কোন কাবুলির সম্মুখে দাঁড়াইলেই আমাদের মনে হয়, দেহ নামক জড় পদার্থটী সভ্যতার পক্ষে তত আবশ্যক নয়, কারণ, ওটাকে খুব বেশী বাড়িতে না দিয়াও আমরা সভ্য রহিয়াছি। সুতরাং দেহের দিক্‌টা, অর্থাৎ স্থূল ও জড় পদার্থের অভাবের দিক্‌টা আমরা মোটের উপর মানিয়া লই। কিন্তু মন অণু; সে সূক্ষ্ম; সেটার বড়াই না করিতে পারিলে কোনরূপ অহঙ্কার করাই আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। সুতরাং মনে আমরা খাটো—এ কথা সহজে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নই। আমরা যাহা বুঝিতে পারি না, তাকে বলি অর্থহীন, যাহা আমাদের অনধিগম্য, তাহাকে আমরা পরিত্যাজ্য বলি; যাহা ভোগ করিবার শক্তি আমাদের নাই, তাকে বলি পাপ,—এইরূপে সংসারের আঙুর ক্ষেতে আমরা শৃগাল-নীতি অবলম্বন করিয়া সাহঙ্কার বৈরাগী হইয়া বাঁচিয়া আছি। শক্তির দেমাক একটুও কমাইতে রাজী নই; কিন্তু যাহা আয়াসলভ্য তাহার বেলায়ই সাজিয়া বসি বৈরাগী।

এই সকলই দুর্ব্বলতার লক্ষণ। আমরা যে সাতশত বৎসর মুসলমানদের অধীন থাকিয়াও মুসলমান সভ্যতার কোন খোঁজ লই নাই, মুসলমানেরা জোর করিয়া যাহা গ্রহণ করাইয়াছেন, তাহা ছাড়া আর কিছুই যে তাঁহাদের নিকট হইতে আদায় করিয়া লই নাই—ইহাতে আত্মরক্ষা হইয়াছে বটে, কিন্তু আত্মবিস্তার হয় নাই। পলাইয়া যে বাঁচিল, সে বাঁচিল বটে, কিন্তু বড় হইল না,—শক্তির কোন পরিচয় দিল না। সাত শত বৎসর এদেশে রাজত্ব করিয়াও মুসলমানেরা যে এক বকর্-ঈদের দাঙ্গা ভিন্ন আর বিশেষ কিছু স্থায়ীভাবে দান করিতে পারেন নাই, ইহা মুসলমানদের পক্ষে যেমন অগৌরবের কথা, হিন্দুদের পক্ষেও তেমনই। কারণ, ভারতে আসিয়া মুসলমান সভ্যতা যেমন বন্ধ্যা হইয়া পড়িয়াছিল, ইউরোপে তেমন হয় নাই। ঝিনুকের ভিতর বাহির হইতে কিছু প্রবেশ করিলে, ঝিনুক উহাকে মুক্তা করিয়া রাখিয়া দেয়। ইউরোপ মুসলমান সভ্যতার নিকট হইতে যাহা আদায় করিয়া লইয়াছে, ভারতবর্ষ যে তাহা পারে নাই,—ইহাতে ভারতবর্ষের,—হিন্দু সভ্যতার একটা দুর্ব্বল দিক প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দু সভ্যতা অনেক ঝড়ের ভিতরেও আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, সন্দেহ নাই,—এবং ইহা শক্তির লক্ষণ, অনেক অনাহুত আগন্তুককেও সে আপন করিয়া লইয়াছে—এবং ইহাও শক্তির লক্ষণ। কিন্তু পরকে পর এবং আপনকে আপন রাখিয়া পরের সঙ্গে যে আদান প্রদান করিতে পারা যায়, তাহার দৃষ্টান্ত হিন্দু সভ্যতা খুব বেশী দেখাইতে পারে নাই। নিজের ঘর সামলাইয়াও যে পরের বাড়ী যাতায়াত করা যায়—একেবারে একান্নবর্ত্তী কিম্বা একেবারে প্রকাশ্য শত্রু না হইয়াও যে প্রতিবেশীভাবে মিলিয়া থাকা চলে—ইহা ত না মানিয়া পারি না। দুর্ব্বলের পক্ষে তাহা কঠিন হইতে পারে, সে হয় আশ্রিত, অনুগত, পদানত হইয়া পড়িবে; নতুবা বড়কে 'ঈতি' মনে করিয়া দূরে পলাইয়া আত্মরক্ষা

করিবে। এই দুইটার একটাও প্রকৃত আত্মরক্ষা নহে। প্রকৃত আত্মরক্ষা পলাইয়া যাওয়া নহে ;—উহা একেবারে মিশিয়া যাওয়াও নহে। স্পর্শমাত্রেই শামুক তাহার অদ্বিতীয় দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া তটস্থ হইয়া যায়—তাহাতে তার আত্মরক্ষা হয়, সন্দেহ নাই ; গায়ে বাতাস লাগিলেই লজ্জাবতী লতা চোখ মুখ চাপিয়া এলাইয়া পড়ে—ইহাতে তাহারও আত্মরক্ষা হয় বটে। কিন্তু সিংহ শার্দ্দূলের আত্মরক্ষার নীতি এরূপ নহে।

যে সুস্থ এবং সবল, সে বাহিরের আলো বাতাস হইতে অনেক জিনিস নিজস্ব করিয়া লয়— অনেক জিনিসেরই সম্মুখীন হইয়া তাহার পরিচয় জানিবার সাহস রাখে। হাওয়ার সঙ্গে মিশিয়া যাওয়ার গতিক তাহার নয় ; হাওয়ার ভয়ে দরজা জানালা আটকাইয়া দেওয়ার কোন দরকারও সে বোধ করে না। এই দুইটার মাঝামাঝি পন্থাই সবলের পন্থা। হিন্দু সভ্যতা যে এই তৃতীয় পন্থা অবলম্বন করিতে পারে নাই, এটা তাহার দুর্ব্বলতার পরিচায়ক।

হিন্দু সভ্যতা দুইটী বিশাল সভ্যতার সম্মুখীন হইবার সুযোগ পাইয়াছে,—একটী মুসলমান সভ্যতা, আর একটী ইউরোপের বর্ত্তমান সভ্যতা। প্রথম সংস্পর্শে যে কারণেই হউক, সে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছে। হূণ শকদিগের নিজস্ব কোন সভ্যতা ছিল না, গুটী কয়েক পুরাণ রচনা করিয়া—গুটি কয়েক স্তব ও প্রশস্তিতে সেই সকল জাতির রাজাদিগকে ভুলাইয়া—সূর্য্য ও চন্দ্র বংশের সঙ্গে তাহাদের একটা সম্বন্ধ কল্পনার বলে আবিষ্কার করিয়া—সেই সকল বর্ব্বর জাতিকে হিন্দু সভ্যতা আপন করিয়া লইতে পারিয়াছিল। কিন্তু মুসলমানদের বেলায় সে প্রণালী কার্য্যকরী হয় নাই,—সাত শত বর্ষ একত্র থাকিয়াও মুসলমানকে হিন্দু আপন করিয়া তুলিতে পারে নাই। এখানে সে শম্বুক-নীতি অবলম্বন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে। সরিয়া সরিয়া পলাইয়া পলাইয়া—সে আপন বাঁচাইয়াছে। মুসলমান সভ্যতা তাহাকে পরাজিত করিতে পারে নাই সত্য ; কিন্তু সেটার কারণ মুসলমান সভ্যতার দৌর্ব্বল্য, না, হিন্দু সভ্যতার পলায়ন-নীতি, সব তারিখের হিসাব নিয়া ব্যস্ত ঐতিহাসিকেরা তাহা বলিতে ভুলিয়া যান।

হিন্দু সভ্যতার দ্বিতীয় সংঘর্ষ হইতেছে বর্ত্তমানে ইউরোপের সভ্যতার সঙ্গে। এখানে সরিয়া থাকা অসম্ভব, ইউরোপের সর্ব্বগ্রাসী সর্ব্বস্পর্শী, সর্ব্বগ সভ্যতার সম্মুখীন না হইয়া আমাদের উপায় নাই ; ইহার সোজা কারণ, এমন কোন স্থান নাই যেখানে গিয়া লুকাইয়া থাকিব- যেখানে গেলে ইহার সঙ্গে দেখা আর হইবে না। সুতরাং ইহার চোখে চোখে আমাদিগকে চাইতে হইতেছে ; এবং যেখানেই স্পষ্ট চোখোচোখি হয়, সেখানেই যেন আমরা লজ্জাবতী লতার মত এলাইয়া পড়িতেছি। দেড় শত বৎসর একত্রে বাস করিয়াও ইহাকে আমরা ভাল করিয়া চিনিতে চেষ্টা করিলাম না। ইহার বিরুদ্ধে অনেক কথাই অনেক সময় বলি ; ইহা যে অসনাতন, আর আমাদেরটী যে সনাতন, ইহা যে ঐহিক, আর আমরা যে পারত্রিক, ইহা যে ভোগে ব্যসনে অভিভূত, আর, আমরা যে ত্যাগের ও মুক্তির পথের পথিক—ইত্যাদি অনেক কথাই বলি। কিন্তু আমার ভয় হয়, ইহা যেন অনেকটা মেয়ে মানুষের 'না' বলার মত। উপন্যাস যাঁরা লিখেন এবং পড়েন তাঁরা অবশ্যই জানেন, যে, মেয়েমানুষেরা অনেক সময় সম্মতি জানাইবার জন্যই নিষেধার্থক অব্যয় প্রয়োগ করিয়া থাকেন। আমার ভয় হয়, যে পরিমাণে আমরা ইউরোপকে নিন্দা করি, ঠিক সেই পরিমাণে—কিংবা তারও বেশী পরিমাণে, আমরা ইহার দাস হইয়া পড়িতেছি। আমরা ইহাকে মনে মনে সম্মান করি, ইহাকে ভয় পাই ; এবং এই জন্যই বোধ হয়, ব্যাসের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রজননীর ন্যায় ইহার প্রতি আমরা চোখ মেলিয়া চাইতে সাহস পাই না। ইহার মূর্ত্তি বিকট কি মধুর, সে কথা আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে,

সাহস পাই না। আমরা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি।

প্রভাতে চায়ের পেয়ালা হইতে আরম্ভ করিয়া সান্ধ্য-সম্মিলন পর্য্যন্ত. কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসই যে আমরা ইউরোপের নিকট গ্রহণ করিয়াছি—ভাত খাওয়ায় নুন টুকু হইতে আরম্ভ করিয়া গা ঢাকিবার বস্ত্র টুকু পর্য্যন্ত রোজ রোজকার কত জিনিসই যে ইউরোপ আমাদিগকে যোগায়, তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু এ সকল তেমন কিছু নয়; সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সহজেই চলিয়া যায়। আমাদের বিশেষ পরাভব হইয়াছে, ইহার চেয়ে গভীরতর দেশে—সাহিত্যে ও শিল্পে। ইহা ভাল কি মন্দ—উচিত কি অনুচিত, সে প্রশ্ন এখানে তুলিতে চাই না। কিন্তু ইহা ঘটিতেছে এবং ঘটিতেছে যে তাঁহার কারণ, আমরা চোখ মেলিয়া ইউরোপের দিকে চাইতে পারিলাম না। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র আমাদের কোল জুড়িয়া লইতেন না, যদি আমরা একবার চোখ মেলিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতারূপ ব্যাসদেবের দিকে চাহিতাম। অন্ধ অনুকরণ আমরা করিতাম না, অপ্রত্যাশিত পরাভব আমাদের ঘটিত না, যদি আমরা ইহার স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করিতাম। তাহা যে করি না, সেটাই আমাদের দৌর্ব্বল্যের লক্ষণ। হংস যেরূপ জল হইতে দুধটুকু ছাঁকিয়া লয়, আমরা যে সেরূপ ইউরোপীয় সভ্যতার সারটুক তুলিয়া লইতে পারি নাই, ইহাই আমাদের দুর্ব্বলতার পরিচায়ক। আমাদের অনেকে স্থান ত্যাগ করিয়া দুর্জ্জনকে পরিহার করার ন্যায় সরিয়া দাঁড়াইয়া ইহার প্রভাব এড়াইতে চাহেন; আবার কেহ একেবারে মিশিয়া গিয়া প্রতি-যোগিতার পরিশ্রম হইতে রক্ষা পান। এই দুইয়ের মাঝামাঝি যে পন্থা—যে পন্থায় বিচারের তৌল-দণ্ডে তুলিয়া ইহার-মূল্য নিরূপণ করা হইবে—সে পন্থা আমরা গ্রহণ করি নাই; পরকে মানিয়া এবং নিজস্ব রক্ষা করিয়া পরের সঙ্গে কারবার আমরা করিতে পারি নাই। ইহা আমাদের শক্তিহীনতার লক্ষণ।

সুবিধা অসুবিধা আমাদের কি আছে কিংবা ছিল, তাহা এখানে জানিতে চাই না। চীন জাপানকে, এমন কি মিশর, মেসোপটোমিয়াকেও ইউরোপ যাহা করিতে পারে নাই, আমাদিগকে তাহাই করিয়া ফেলিতেছে। রাষ্ট্রীয় অধীনতার কথা বলিতেছি না,—তাহার চেয়ে বড় জিনিস সভ্যতার অধীনতার কথা বলিতেছি। সুতরাং যে কারণেই হউক—যে হেতু-পরম্পরাতেই হউক, আমা-দের মজ্জার ভিতর একটা প্রকাণ্ড দৌর্ব্বল্য আসিয়া পড়িয়াছে।

এবং এই জন্যই আমরা আপন নিয়া বড় ব্যস্ত হইয়া থাকি। আমাদের কি কি ছিল, আমরা কত বড় ছিলাম, সেই সব চিন্তায়ই আমরা ব্যস্ত। চারিদিকে যেন দেখিতেছি, পূর্ব্বেকার অনেক আপন জিনিস পরস্ব, পরাভিভূত হইয়া পড়িতেছে। তাই, 'আমার আমার' করিয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছি। পাছে আত্মরক্ষা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়, পাছে নিজস্ব ঠিক রাখিতে না পারি—এই ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া শামুকের মত ক্রমেই নিজের ভিতর নিজেকে গুটাইয়া লইতেছি, আর মনে করিতেছি, বাহিরের সত্তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ না রাখিলেও চলিবে। আমরা যেন ভাবি, পৃথিবীর উত্তর পশ্চিম অংশ জুড়িয়া যে এক বিশাল মানবসঙ্ঘ বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহাদের দিকে চোখ না ফিরাইলেই আমরা বাঁচিয়া গেলাম। আমরা যেন ভাবি, শ্বেত জাতিসমূহ আপনা হইতেই একদিন সরিয়া যাইবে, সুতরাং আমাদের বিশ্বাস, আমাদের চিন্তা, আমাদের শিল্প, ও আমাদের সাহিত্যের উপর ইহাদের কোন প্রভাব আসিতে না দিলেই যথেষ্ট। কিন্তু তাহা হইবে না। ভগবান্ বৃথাই এত বড় সব জাতিগুলিকে পাঠান নাই।

অতঃপর এই সত্যটাকে মানিয়া লওয়াই বুদ্ধিমানের কর্ম্ম যে, প্রতীচীর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ থাকিবে। রাষ্ট্রের সম্বন্ধের কথা বলিতেছি না,—সে সম্বন্ধে কি

হইবে না হইবে, শাসন-তরীর কর্ণধার দেশী হইবে না বিদেশী হইবে—জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব হইবে না ভারতবাসী হইবে—সে সব কিছুই জানি না, এখানে তাহা জানিতে চাহিও না। কিন্তু এই সব ব্যবস্থা যে রূপই হউক না কেন, প্রতীচীর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ আর কখনও একেবারে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। গ্রীকেরা গ্রীসের বাহিরের লোকদিগকে অনেককাল বর্ব্বর বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছিল,কিন্তু পরে যখন এই বর্ব্বরেরাই বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছিল, তখন গ্রীস বুঝিয়াছিল, বর্ব্বর ছাড়িবার পাত্র নহে। ভারতের আর্য্যেরাও ম্লেচ্ছ বলিয়া অনেক জাতিকে দূর হইতে অভিবাদন করিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন ; এবং এখনও হয়ত অনেকে আশায় আছেন যে, 'ম্লেচ্ছনিবহ' নিধন করিবার জন্য স্বয়ং বিষ্ণু কল্কি বেশে অবতরণ করিবেন। ইহুদীরাও এমনই ভাবে 'মেসায়ার' আগমন প্রত্যাশা করিতেছে ; করিতে করিতে ক্রমেই তাহারা দুর্ব্বল হইতেছে, ক্রমেই তাহাদের উদ্ধারের আশা ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। ইহুদীদের 'মেসায়া'ও আসিলেন না ; কল্কির আসার সম্ভাবনাও কমিয়া আসিতেছে। সুতরাং ইউরোপ যে একটা মিথ্যাকথা নয়, আমেরিকা যে মৃত মহীরাবণের দেশ নয়, ইউরোপের অনুকরণে সমৃদ্ধ জাপান যে একটা দিবাস্বপ্ন নয়,—এই কথাটাই এখন আমাদিগকে মানিয়া লইতে হইবে। রোমের বিশাল সাম্রাজ্য যখন বর্ব্বরদের আক্রমণে ক্রমে হৃতবল হইয়া হঠাৎ একদিন লোপ পাইল, তখনও লোকে বিশ্বাস করিত, এ জিনিস মরিবার নহে—এ সাম্রাজ্য আবার ফিরিবে। কিন্তু ইতিহাসের কঠোর ঘটনাবলী ক্রমে এই মোহ দূর করিয়া দিয়াছিল। চীনের লোকেরা বোধ হয় কিছুদিন পূর্ব্বেও বিশ্বাস করিত, তাহাদের যে দেশ, সেটা স্বর্গের দেশ—সাধারণ মানুষের পক্ষে অধৃষ্য, অনধিগম্য। সেখানেও সেই মোহ ভাঙ্গিবার জন্য ইউরোপের সঙ্গে গোটা দুই লড়াইয়ের বেশী দরকার হয় নাই। সুতরাং ভারতের এই মোহ ভাঙ্গিবার সময় এখন আসিয়াছে।

ইউরোপ একটা অমূলক চিন্তামাত্র নহে ; ইহা অলীক নহে। ভালর জন্যেই হউক, আর মন্দের জন্যই হউক ; সমস্ত পৃথিবী আজ অবনত মস্তকে ইউরোপের এবং ইউরোপেরই আত্মজ আমেরিকার শাসন মানিয়া লইয়াছে। এই দিনে আর ইউরোপকে উপেক্ষা করা চলে না।

এখন বুঝিয়া লইতে হইবে, কেন ইউরোপ এমনতর বড় হইল ? কিসে তাহার শক্তি ? কিসে আমরা ছোট হইয়া গেলাম ? ইউরোপের ক্ষাত্র বলের এবং বৈশ্যোচিত ঐশ্বর্য্যের কথা অনেকেই বলেন ; কিন্তু একটা অত বড় সভ্যতা এমন দুইটা ফাঁকা জিনিসের উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া আছে, এমন ত মনে হয় না। সে সভ্যতার ভিতর এই বিরাট, বিপুল শক্তির কেন্দ্র নিশ্চয়ই অন্যত্র।

ইউরোপের সভ্যতাকে আমরা অনেক সময়ই বৈষয়িক মনে করিয়া থাকি। আমাদের বিশ্বাস, এ সংসারের ভোগবিলাস, ঐহিক সুখ দুঃখ, এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা—এ সকলের বড় কোন জিনিসের প্রতি ইউরোপীয় সভ্যতা দৃষ্টি দেয় নাই। আর, আমরা ইহাও বিশ্বাস করি যে, ঠিক এইখানেই আমরা ইউরোপ হইতে শ্রেষ্ঠ ; আমাদের দৃষ্টি উর্দ্ধমুখী ; আমরা পারত্রিক বিষয় নিয়া ব্যস্ত ; এক পোয়ার জায়গায় এক ছটাক চাউল হইলেও আমাদের চলে, কাপড় প্রায় না হইলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু ভাবুকতা,আধ্যাত্মিকতা—এই জিনিসটাই ঠিক আমরা চাই। কথাটা অসত্য নয়, কিন্তু অসত্যের সঙ্গে মিশ্রিত।

আমাদের যে অনেক জিনিসই কম হইলেও চলে, তাহা ঠিক। কিন্তু তাহার কারণ আমাদের মোক্ষ চিন্তা, বা, আলস্য এবং অক্ষমতা, তাহা ভাবিবার বিষয়। আমরা মুমুক্ষু বলিয়াই বুভুক্ষু, বা বুভুক্ষু বলিয়াই মুমুক্ষু—এইটা খুব ভাল করিয়া দেখা দরকার। কিন্তু ইউরোপ

যে সত্য সত্যই কোন ধর্ম্ম চিন্তা করে না, তাদের দেশে মুমুক্ষু নাই বা হয় না, এই কথাটা মিথ্যা। রোম সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান ইউরোপের আবির্ভাব পর্য্যন্ত—সহস্রাধিক বৎসর ধরিয়া সে মহাদেশে এক শ্রেণীর লোক ত্যাগে, বৈরাগ্যে, কঠোর তপশ্চর্য্যায় ভারতবাসীকেও হার মানাইয়া দিয়াছে। ইহাদের বিবরণ দিতে গিয়া বর্ত্তমান ঐতিহাসিকেরা (যথা, লেকী, প্রভৃতি) যে একটু চাপা হাসি হাসিয়া লন, তাহা আমাদের অবিদিত নয়; কিন্তু যখন ভাবি, কি অটল ছিল ইহাদের বিশ্বাস, কি কঠোর ছিল ইহাদের ত্যাগ, এবং কি নির্ম্মম ভাবে এই সংসারের সামান্য সুখ হইতেও ইহারা দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়াছিল, তখন ইহাদের প্রতি শ্রদ্ধা আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। হয় ত, তাহারা ভুল বুঝিয়াছিল; কিন্তু যাহা তাহারা ভাল মনে করিয়াছে, কি প্রাণপণে তাহার জন্য সাধনা করিয়াছে। আফ্রিকার দুস্তর মরুভূমিতে, বিজন মাঠে, লোকালয়ের সংস্রব শূন্য হইয়া মধ্যযুগে ইউরোপের সন্ন্যাসীরা কম তপস্যা করে নাই। সুতরাং ইউরোপে অন্তর্দৃষ্টি বা ঊর্দ্ধ দৃষ্টি নাই, কিংবা কোন কালেই ছিল না, একথা বলিতে পারি না। এখন অবশ্যই ইউরোপ এপ্রকার দুশ্চর তপস্যাকেই আর জীবনের লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে রাজী নয়।

এখন ইউরোপের সভ্যতাকে ভোগের পন্থা বলিলে আর ইউরোপ চটিবে না ভোগ অর্থ ব্যসন নয়, ইহা শুধু বিলাস নয়। ভোগের মধ্যে সার কথা এই যে, ইহাতে এই পৃথিবীকে সত্য বলিয়া মনে করা হয়, এই জীবনে সুখভোগকে পাপ মনে করা হয় না; এখানে বাঁচিয়া থাকার অর্থ বন্ধন নয়, পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতির ফল নয়। ভোগ অর্থ এই পৃথিবী ভগবান্ সৃষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করা এবং সেইজন্য এই পৃথিবীর সম্পদ্—এখানকার সুখকে বর্জ্জনীয় মনে না করা। হইতে পারে, যাহারা কেবল সুখকেই মাত্র বরণীয় মনে করে, তাহারা ভুল করে; কিন্তু ঐহিক সুখ বরণীয় না হইলেই বর্জ্জনীয় হইবে, এমন কোন কথা নাই। জীবনে তাহার একটা স্থান আছে, যদিও তাহা শীর্ষ স্থান নহে। সুতরাং এই জীবনটাকে অল্প মাহিনার কেরাণীর আফিসের কাজের মত তাড়াতাড়ি কোনমতে শেষ করিয়া লইতে হইবে, এমন কোন যুক্তি নাই। এখানেও সম্পদ আছে, সৌন্দর্য্য আছে, আনন্দ আছে। কোন শয়তান আসিয়া এই জগৎটা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া যায় নাই, কোন গরীব মোহে পড়িয়া ভুলে আসিয়া আমরা এখানে পড়ি নাই, এটা একটা অতি বড় সত্য জিনিস,—ইহা স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, মতিভ্রমও নয়। এই যে বিশ্বাস, এবং এই বিশ্বাসে ভর করিয়া পৃথিবীতে যে বাঁচিয়া থাকা—শুধু তাই নয়, সকল সুখদুঃখের সহিত এই জীবনকে যে বরণ করিয়া লওয়া, তাহারই নাম ভোগ, এবং এইটাই ইউরোপের বর্ত্তমান সভ্যতার মজ্জা। ভোগ এই পৃথিবী নিয়া ব্যস্ত নয়; এই জীবন ছাড়া আর কিছু মানিতে গররাজী নয়; এই জীবনটাকে সে সত্য বলিয়া মনে করে, বরণীয় বলিয়া গ্রহণ করে,—এই মাত্র। এই জীবন সত্য হইলেই, ইহার ওপারে আর সব অসত্য হইয়া যাইবে, এমন কোন কথা নাই। সুতরাং এ জীবনকে বরণ করিয়া লইলেই আর সব চরণে দলিতে হইবে, এমন কোন যুক্তি নাই। এই পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য্য, সকল সুখকে স্পর্শনীয় ও বরণীয় মনে করে বলিয়াই ইউরোপকে আমরা বলি ভোগী। এবং ইহাতে ইউরোপ একটুও অসন্তুষ্ট হইবে না। সে বলিবে, সত্যকে সত্য, সুন্দরকে সুন্দর, সুখকে সুখ, না বলায় এমন কি একটা বাহাদুরি আছে?

সুতরাং একথাটা সত্য যে, ইউরোপ ভোগপন্থী। কিন্তু আমরা যে কোন কালেই তাহা ছিলাম না, এরূপ মনে করা ভুল। এখন পৃথিবীটা আমাদের কাছে মায়াময় হইয়া গিয়াছে, কেন না, ইহাতে আমাদের আপনার জিনিস খুব কমই রহিয়াছে। কিন্তু চিরকালই এমন

ছিল না। যারা উজ্জয়িনী ও পাটলিপুত্রের মত নগরী নির্ম্মাণ করিতে পারিয়াছিল, যাদের কবির কল্পনায় অলকার মত নগরী সৃষ্ট হইয়াছে, যারা কৌমুদী মহোৎসব ও বসন্তোৎসব করিতে জানিত, যারা গ্রীক রমণীদের ব্যাকাস (Bacchus) পূজার মত মদন চতুর্দ্দশীর উৎসব করিতে পারিত, যারা সোমলতার প্রত্যেক অঙ্গস্পর্শে আনন্দে শিহরিয়া উঠিত এবং যাদের সাম গানে এত আনন্দ রহিয়াছে, তাদের দেশে ভোগ ছিল না, কে বলিতে পারে? বাৎসায়ন হইতে আরম্ভ করিয়া কালিদাস পর্য্যন্ত সকলেই নানা রকমে যাদের ঐশ্বর্য্যের, ভোগের বর্ণনা করিয়াছেন, তারা যে সকলই শঙ্করাচার্য্যের 'মোহমুদ্গর' ছাড়া আর কিছুই জানিত না, একথা বলা দুঃসাহস মাত্র।

সুতরাং ভোগ এদেশেও ছিল। কিন্তু এই ভোগ যখন বিলাসে, ব্যসনে পরিণত হইয়াছিল, তখনই বোধ হয় সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, এবং তখন হইতেই বোধ হয় ভোগের প্রতি একটা বিদ্বেষ অথবা ভয় আমাদের জন্মিয়াছে। এখনও হয় ত মনে মনে ভোগের প্রতি আমাদের টান রহিয়াছে, কারণ, এমন কাহাকেও দেখি না, যে কিছুই চায় না; ত্যাগের কথা যারা বলিতে ব্যগ্র, তারাও ত সেটাকে জীবিকা করিয়া লইয়াছে। তথাপি আমরা প্রকাশ্যে ভোগকে ভয় করি, এবং ভোগের নামে ইউরোপের সভ্যতার দিকেও নির্ভীক ভাবে চাইতে পারি না। ভিতরে ভিতরে আমরা পরাজিত হইয়া আসিতেছি, ক্রমেই সারহীন হইয়া পড়িতেছি, ক্রমেই শক্তি কমিয়া আসিতেছে; তথাপি প্রকাশ্যে ইহাকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি। ক্রমেই আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছি, তথাপি ইউরোপ যে একটা সত্য জিনিস—নাই বলিলেই যে ইহা অস্তিত্বহীন হইবে না—ইহা আমরা স্বীকার করিতে চাই না।

এ সকলেরই কারণ আমরা অর্দ্ধেক সত্য নিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে চাই। ইউরোপ কি বার্ত্তা নিয়া আসিয়াছে, তাহা না বুঝিয়াই ভোগী বলিয়া ইহার প্রতি আমরা বিরক্তি দেখাইতে চাই; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরাও ভোগেরই দাস,—তবে, অক্ষমতার দরুণ আমাদের ভোগের আয়োজন কম। বিশ্বসংসার লুটিয়া সামগ্রী আনিতে পারি না, তাই আমাদের ভোগের পরিমাণ কম। ইউরোপ সমস্ত পৃথিবীতে, জলে, স্থলে, আকাশে বিজয়ীর মত চলিয়া ফিরে, বিজয়ীর ন্যায্য মাশুল আদায় করিয়া লয়, তাই তার আয়োজনের অন্ত নাই। একটা সূচও তৈয়ার করিতে পারি না, সুতরাং আমরা স্বল্পে সন্তুষ্ট। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা বহ্বাশী নহি, এমন নহে।

সুতরাং ত্যাগের কথা কিছু বাড়াইয়া বলায় লাভ নাই। সব দিক দিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ইহা অর্দ্ধেক সত্য ভিন্ন আর কিছু নহে। হ'তে পারে, আমরা পারত্রিক বিষয়ের কথা যত জানি, বুঝি, এবং ভাবি, ইউরোপ তার এক আনাও জানে না। কিন্তু পরলোক সত্য হইলেই ইহলোক মিথ্যা হইয়া যায় না। এই কথাটাই বিশেষ করিয়া ইউরোপের নিকট আমাদিগকে শিখিতে হইবে। আমরাই শুধু বড়, আমাদেরই শুধু একটা সনাতন সভ্যতা আছে, ইউরোপ কিছুই নয়—ইহার কিছুই নাই,—মনে করিয়া আপন নিয়া মত্ত থাকা মত্ততা মাত্র। ইউরোপ যে একটা সম্পদ, ঐশ্বর্য্য ও সত্য নিয়া জগৎ জুড়িয়া দম্ভ করিয়া বেড়াইতেছে, তার দিকে অন্ধ হওয়া দুর্ব্বলতা মাত্র। ভোগে ভীত হওয়া কিছু নয়, ভোগকে সংযত করিতে না পারা দুর্ব্বলতা। এবং এই দুর্ব্বলতা আমাদের আসিয়াছে বলিয়াই ভোগের বিরুদ্ধে কত কথা কই।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঈডেন উদ্যানে আদমের মত বিশ্বসংসারে মানুষকে ছাড়িয়া দিয়া ভগবান্ কখনও বলিয়া দেন নাই, 'ইহার কিছুই স্পর্শ করিও না, ইহার সমস্তই তোমার পক্ষে নিষিদ্ধ'। অসংযম পাপ বলিয়া ভোগও পাপ

নয়। সুতরাং শ্রুতির বচন উদ্ধৃত করিয়া আমরা যে দেশের লোককে বলিয়া যাইব,'সংসার বাস সব পরিত্যাগ কর'—সেটা হওয়া উচিত নহে। বরং আমাদের বলা উচিত, 'মানুষ, তুমি দেবশিশু ; ভীত হওয়া তোমার উচিত নয়'; 'খড়্গোনাক্রম্য ভুঞ্জীত বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।' যে বীর, যে সবল, যাহার বাহুতে ও হৃদয়ে অদম্য তেজঃ রহিয়াছে, তাহার নিকট এই পৃথিবী একটা অনাবশ্যক কারাগৃহ নহে ; ইহার বাতাস, ইহার নদ নদী, ইহার আকাশ, ইহার আলো ও আঁধার, ইহার ওষধি পর্য্যন্ত তাহার নিকট মধুময় ; এমন কি, 'মধুমৎ পার্থিবং রজঃ'। শক্তিহীন হইয়াছি বলিয়াই আমরা ভোগকে ভয় পাই ; শক্তিহীন হইয়াছি বলিয়াই আমরা ভুলিয়া যাই যে, 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'। দুর্ব্বলকে কোণঠেসা করিয়া সবল যে এই পৃথিবী ভোগ করিয়া লয়, সে দৃষ্টান্ত আজ ইউরোপ আমাদিগকে দেখাইতেছে।

পত্নীত্ব ও মাতৃত্ব।

এখনও সকল সভ্যদেশেই নারী কম বেশী পুরুষের অধীন। এখনও ইব্‌সেন্‌ না বলিয়া দিলে ইউরোপ হয় ত বুঝিত না যে, নারীরও একটা পৃথক সত্তা আছে—সেও নৈতিক হিসাবে একটা ব্যক্তি—একটা moral person ;—তাহারও একটা আত্মা আছে এবং সে আত্মারও ধর্ম্মাধর্ম্ম আছে এবং সে আত্মাও কর্ম্মানুসারে ফল ভোগ করিয়া থাকে। এই কথাটা এখন ইউরোপের নারী ইব্‌সেনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ধীরে সুস্থে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। আবার কখনও বা সে অধীর ও উন্মত্ত হইয়া 'সাফ্রেজিষ্ট'মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভৈরবী তাণ্ডবে তাহার অধিকার দাবী করিয়া, এ জ্ঞান যে তাহার হইয়াছে—একথা লোকে প্রচার করিতে চায়। তথাপি হাজার 'সাফ্রেজিষ্ট'দের তাণ্ডবের উপর দিয়াও—হাজার দরজা জানালা ভাঙ্গার ভিতর দিয়াও—এই সত্যটা ভাসিয়া উঠে যে, নারী এখনও পুরুষের অধীন। সাইকেলে বা ঘোড়ায় চড়িয়া পুরুষের পাশাপাশি কিম্বা অগ্রে যাইবার স্পর্দ্ধাও সে রাখে ; রাস্তায় পাহারা দিবার কিংবা ক্ষেতে লাঙ্গল চালাইবার নূতন অধিকার বর্ত্তমান যুদ্ধ ইউরোপে তাহাকে দিয়াছে ; সাঙ্কেতিক লিখনে, বৈদ্যুতিক সংবাদ চালনে, আফিসের হিসাব রাখায়—সে পুরুষের সমকক্ষ ত বটেই, বরং তাহার চেয়ে বেশী পটু। তথাপি স্বীকার করিতে হইবে, নারী এখনও পুরুষের অধীন—এখনও সে পুরুষের আদরের সামগ্রী, সোহাগের পুতুল—এবং সেই জন্যই দ্বিগুণভাবে পুরুষের উপর নির্ভরশীল।

ভোট দিবার জন্য, শাসনযন্ত্র চালাইবার জন্য, সম্পত্তির অধিকারিণী হইবার জন্য—নানা দাবীতে, নানা আবদারে নারী শুধু এই কথাই প্রমাণ করিয়া দেয় যে, এখনও সে পুরুষের সম্পূর্ণ সমকক্ষ হইতে পারে নাই। নারীর পক্ষে উকীল জন ষ্টুয়ার্ট মিল হইতে আরম্ভ করিয়া ইব্‌সেন, বার্ণার্ড শ' পর্য্যন্ত সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া আসিতেছেন যে, নারী সকল অবস্থাতেই পুরুষের চেয়ে খাটো। ভারতের কোন এক সুদূর অতীত দিবসে, শান্ত স্নিগ্ধ পবিত্র আশ্রমপদে স্নিগ্ধচ্ছায় তরুমূলে সমাসীন দীর্ঘ শ্মশ্রু, পলিতকেশ, উপবাস-কঠোর ঋষি ব্যবস্থা দিতেছেন—'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি.'—

'পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
পুত্রো রক্ষতি বার্দ্ধক্যে, ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি ॥

—একথা আমরা অতি সহজেই কল্পনা করিতে পারি। আমরা যা দেখি, যা অনুভব করি, যা ভাবি,—তার সঙ্গে এ ব্যবস্থা মিশিয়া রহিয়াছে। কিন্তু ইউরোপের কবি যে বলিবেন,

'A woman, a dog and a walnut tree
The more you *beat* them, the better they be'.

এ কথাটা কল্পনা করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ। তথাপি ইহাও ঘটিয়া গিয়াছে। এবং ঘটিয়া গিয়াছে

বলিয়াই বোধ হয় আজ ইবসেন্ প্রমুখ নারীধর্ম্মের প্রেরিত পুরুষদের আবির্ভাব। কিন্তু রাবণের মত রাজাও স্বর্গের সিঁড়ি তৈয়ার করিতে পারেন নাই, মোসেসের মত প্রেরিত পুরুষও এক জীবনে সমস্ত য়ীহুদী-দিগকে স্বর্গের অধিবাসী করিয়া দিতে পারেন নাই। তেমনই ইব্‌সেন্ প্রমুখ ব্যক্তির আবির্ভাব সত্বেও ইউরোপের নারী সমাজ এখনও সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য—সর্ব্ব বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে পুরুষের সহিত সাম্য অর্জ্জন করিতে পারে নাই।

হেগেসিয়স্ (Hegesias) বলিয়া একজন দার্শনিকের নাম শোনা যায়—যিনি ছিলেন মৃত্যুর উপাসক। 'মুদ্রারাক্ষসে'যে চাণক্যের চর যমপট দেখাইয়া বাড়া বাড়ী ঘুরিত এবং সংবাদ-সংগ্রহ করিত,এই দার্শনিক সেই প্রকার মৃত্যুর উপাসক ছিলেন না। ইনি সত্যিকার জীবন্ত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করাই মানুষের শ্রেয়ো ধর্ম্ম মনে করিতেন। ইনি সাংখ্যের মত বলিতেন, জীবন দুঃখময়, দুঃখ হইতে মুক্তিই সুখ; সুতরাং মৃত্যুকে আলিঙ্গন করাই সকল সুখের নিদান। ইনি যখন রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেন, তখন নাকি শত শত যুবক যুবতী তাহাতে প্রবুদ্ধ হইয়া অগ্নিতে কিংবা জলেতে দেহ বিসর্জ্জন দিয়া মুক্তির ও শান্তির সন্ধানে ছুটিয়া যাইত। কিন্তু সকলে যে তাহা করে নাই,তাহার সহজ প্রমাণ এই যে,আমরা আজ এখানে তাঁহাকে স্মরণ করিতে পারিলাম। তেমনই, ইব্‌সেন্ প্রভৃতির সহস্র প্ররোচনা সত্বেও সকলেই ইব্‌সেনের নোরার (Nora)র মত স্বামী পুত্র ত্যাগ করিয়া ঘরের বাহির হইয়া ব্যক্তিত্ব বিকাশের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয় নাই। বিবাহ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ অবস্থায়ই যে নারী পুরুষের চেয়ে হীন, হাজার রকমে এ কথা বলা হইলেও এই সকল অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন দুনিয়াতে এখনও দেখা দেয় নাই। সুতরাং নারী এখনও পুরুষের অধীন; শুধু এসিয়াতে নয়, ইউরোপেও।

এই যে স্বায়ত্ত বস্তুটীকে লইয়া আমরা ঘরকন্না করি, তাহার প্রভাব আমাদের জীবনে কতটুকু? মানুষের দীর্ঘ ইতিহাসে নারী যে কত রকমে মীমাংসকদের অপূর্ব্বনামক কর্ম্ম-শক্তির ন্যায় অদৃষ্ট ভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিয়াছে, তাহা বলা কঠিন। সন্তান হারাইয়া অন্ধমুনি রাজা দশরথকে বলিয়াছিলেন, 'তোমার সঙ্গে ত আমার স্ত্রীনিমিত্ত কিংবা ক্ষেত্রনিমিত্ত কোন কলহ নাই, তবে তুমি আমাকে অপুত্রক করিলে কেন?' স্ত্রী যে কলহের কারণ, তাহা কত রকমেই না মানুষের ইতিহাস স্মরণ করাইয়া দেয়। শুধু আদালতের মোকদ্দমায় নয়, তার চেয়ে অনেক বড় জায়গায় অনেক ধীমান্ শক্তিমান্ পুরুষ নারীর চরণতলে আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন। একজন দুর্দ্ধর্ষ পুরুষ যদি এক জোরা পটলচেরা চোখের বিজলীতে মোহিত হইয়া না যাইতেন, তাহা হইলে গ্রীক্ কবি হোমর কি লইয়া কাব্য রচনা করিতেন, জানি না। রুক্মিণী হরণ, সুভদ্রা হরণ আর পাণ্ডবদের দ্রৌপদী লাভ —এ সকলের ভিতরই স্ত্রীনিমিত্ত বৈর দেখিতে পাই। ভারতের ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা জুড়িয়া দেখিতে পাই—মরুর কুসুম কুসুম-সদৃশ নুরজাহানের লীলা।

স্ত্রীনিমিত্ত বৈর যেমন সত্য জিনিস, তেমনই অন্য রকমেও নারী পুরুষের উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকে। ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট দুষ্মন্ত যদি একটী বনবাসিনীর 'অব্যাজমনোহরং বপুঃ' দেখিয়া মজিয়া না যাইতেন, তাহা হইলে কালিদাসের এত সুন্দর সৃষ্টি কোথায় থাকিত, কে জানে? গ্রীক্ রমণী আস্পেসিয়ার (Aspasia) গৃহে Periclesএর মত মহৎ ব্যক্তিদের যে বৈঠক বসিত, তাহাতে এথেন্সের রাষ্ট্রনীতি কতদূর পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহা কোথাও লেখা না থাকিলেও একেবারে কল্পনার অতীত নহে। পারস্য কবি বাদশাহের মুখ দিয়া বলাইতেছেন 'আমার প্রাণপ্রিয় প্রণয়িনীকে যে আনিয়া দিবে,প্রেয়সীর চর্ম্মের কৃষ্ণবর্ণ তিল চিহ্নটীর জন্য আমি সমগ্র সমরখন্দ্ ও বোখারা রাজ্য তাহাকে বখসিস্ দিব'। কিন্তু

পেট্রার প্রেমের ফাঁদে বন্দী Antonyও প্রেমের বদলে একটা দেশ হারিয়া গেলেন।

সুতরাং কলহের বিষয় হইয়া, প্রেমের বস্তু হিসাবে—নানা মূর্ত্তিতে নিঃশব্দে ও অদৃশ্যে রমণী মানুষের ইতিহাসের যে এক অজ্ঞাত অংশ অধিকার করিয়া বসিয়া আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু মানুষের জীবনের দুইটা দিক্ আছে—একটা তাহার কর্ম্মের দিক, আর একটা তাহার চিন্তার। পুরুষের কর্ম্মের উপর নারীর প্রভাব যে রহিয়াছে, নারী-নিমিত্ত কলহগুলিই তাহার সোজা প্রমাণ। কিন্তু চিন্তার রাজ্যে যে বিশাল জ্ঞান ভাণ্ডার মানুষ সৃষ্টি করিয়াছে, সেখানে রমণীর দান কতটুকু—সেখানে তাহার প্রভাব কতটুকু? দর্শনের সুদীর্ঘ ইতিহাসে রমণীর নাম আমরা কয়টা পাই? গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন, হয় ত বা তাঁহারা দুই একজন ব্রহ্মবাদীর চিন্তার বিকাশে সাহায্যও করিয়া থাকিবেন। হয় ত বা তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তায়—আলোচনায়, ঋষিদের মনে দুই একটা উচ্চ ভাবও পরিস্ফুট হইয়া থাকিবে। কিন্তু ইহা হইতে তাঁহারা নিজেরা ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারিণী ছিলেন,—ও বিদ্যা তাঁহারা আয়ত্ত করিয়াছিলেন,—এ কথা যেমন স্পষ্ট বুঝা যায়, কোন নূতন সত্য তাঁহারা পৃথিবীকে দান করিয়াছিলেন—এ কথা তত বুঝা যায় না। দুই এক জায়গায় রমণীরা বিদ্যার উপদেশ দিতেছেন বটে, কিন্তু তাহা যে গুরুর নিকট প্রাপ্ত বিদ্যার উপদেশ নয়—তাহা যে স্বয়ংলব্ধ জ্ঞানের উপদেশ,—এ কথা তেমন জোর করিয়া বলা যায় না। বাইবেলেও রাণী Shebar কথা শুনিতে পাই, যিনি অত্যন্ত বিদুষী ছিলেন। এইরূপ বিদুষী রমণীর নাম ইতিহাসে আরও রহিয়াছে। কিন্তু উপদেষ্টা—সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে পুরুষকে যেমন দেখি, নারীর সাক্ষাৎ সে ভাবে পাই না। গার্গী হয় ত বেদান্ত বুঝিতেন, কিন্তু সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন বেদব্যাস—ভাষ্য করিয়াছেন শঙ্করাচার্য্য। সুতরাং ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয় যে, দর্শনের ইতিহাসে রমণী দার্শনিকের নাম নাই।

গণিত বিদ্যায় রমণীর নাম আছে—যথা লীলাবতী। আর জ্যোতিষে আছে খনার নাম। কিন্তু তার পরে যে এই সকল শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন রকমের উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে রমণীর দান অতি নগণ্য। তেমনই অন্যান্য জ্ঞানের ভাণ্ডারেও রমণীর প্রভাব কম।

সুতরাং জ্ঞানের রাজ্যে প্রকাশ্যে রমণীর দান অতি নগণ্য; পুরুষ সেখানে যাহা সৃষ্টি করিয়াছে, তার তুলনায় রমণী কিছুই দেয় নাই, বলিলেও নিতান্ত অন্যায় হইবে না। সাহিত্য ক্ষেত্রে আজকাল লেখিকার সংখ্যা খুব কম না হইলেও এবং উপন্যাস লেখায় দুই একজন রমণী অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া থাকিলেও—একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সেখানেও রমণী পুরুষের চেয়ে খাটো। এত বড় পৃথিবীটাকে মানুষ কত রকমে সাজাইয়াছে—কত নগর, উপনগর, কত বর্ত্ম, কত হর্ম্ম্য সে সৃষ্টি করিয়াছে; কত জ্ঞান সে আহরণ করিয়াছে, কত সৌন্দর্য্যের লীলা তাহার মানসপটে অঙ্কিত হইয়াছে, কত শিল্প ও সাহিত্য তাহার হৃদয়ের ভাবপ্রবাহ প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছে; এ সকলের ভিতর রমণীর কুসুমপেলব করস্পর্শের চিহ্ন অতি কম। মানুষ যে দুর্দ্ধর্ষ দৈত্যের মত বিশ্বশক্তির সঙ্গে লড়াই করিতেছে, কত রকমে যে তাহার জয় পরাজয় ঘটিতেছে,—সে সবের ভিতর নারীর সাহচর্য্য অতি সামান্য। সেখানে নারী তেমন ভাবে পুরুষের সাহায্য করিতে পারে নাই।

তথাপি নারী পুরুষের চিন্তার অনেকটা দিক জুড়িয়া রহিয়াছে। নারী পুরুষের বিপুল কর্ম্মক্ষেত্রে তাহাকে তেমন সাহায্য না করিলেও, পুরুষ নারীর জন্য অনেক ভাবে এবং করে। বৈজ্ঞানিক, কিংবা দার্শনিক কিংবা সৌন্দর্য্যের উপাসক ইহার যে ব্যাখ্যাই করুন না কেন, কথাটা সত্য। নারী কর্ত্তৃক সাহিত্য সৃষ্টি খুব বেশী না

হইলেও, সাহিত্যের বোধহয় সাড়ে পোনর আনাই নারীর নিমিত্ত। প্রেম নামক যে বস্তুটা এত রকমে সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহার নিমিত্ত নারী। সৌন্দর্য্য সৃষ্টির কায়িক পরিশ্রমে নারী তেমন সহায়তা না করিলেও নারীর নিমিত্ত সৃষ্টি অনেক হইয়াছে। নেবুকাড্‌নেজার (Nebuchhadnazer) যে শূন্যে উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, ভারতে যে তাজমহল নির্ম্মিত হইয়াছিল, নারীই তাহার মূলে। দার্শনিক-দের চিত্ত সাধারণতঃ অত্যন্ত কঠোর বলিয়াই বিখ্যাত। কিন্তু তাহা হইলেও জন ষ্টুয়ার্ট মিলের মত দার্শনিক যে 'স্বাধীনতা' ('Liberty') সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন, 'নারীর দাসত্ব' ('Subjection of women') তাহার সঙ্গে জড়িত এবং নারীই ছিলেন তাহাতে বীর্য্যবতী মদিরা।

খ্রীষ্টান ধর্ম্ম জগতে প্রচারিত হইবার পরে ইউরোপে এবং আফ্রিকার পর্ব্বতগুহায় এবং মরুস্থলীতে যে সকল সন্ন্যাসী কঠোর ধর্ম্ম সাধন করিতেন, তাঁহারা অবশ্যই নারীর প্রভাব স্বীকার করেন নাই। কিন্তু তাঁহারা যে লোকালয় ত্যাগ করিয়াছিলেন তাহার কারণ, কামিনী ও কাঞ্চনের ভীতি। শঙ্কর যে ঘোষণা করিলেন, নারীই নরকের একমাত্র দ্বার,* তাহার মূলেও নারী-ভীতি বর্ত্তমান। ইঁহারা নারীর প্রভাব মানিতে রাজী হন নাই বটে, নারীর চকিত-চাহনির মোহে কিছু করিতে চান নাই বটে, কিন্তু তথাপি নারীর যে একটা প্রবল প্রতাপ রহিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। এবং যে প্রভাবকে যে তাঁহারা ভয় পাইতেন,—তাহার প্রমাণ তাঁহাদের সমাজ ছাড়িয়া পলায়ন। হয় ত তাঁহাদের মনে ঘৃণাও ছিল, কিন্তু ভয়ও কি একেবারেই ছিল না? একজন খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীর কথা শোনা যায়, যিনি নারীর ভয়ে এতই ভীত ছিলেন যে, নিজের জননীর দিকেও চাহিতে সাহস পান নাই। একাধিক দিবস আর্ত্তনাদ করিয়া জননী গহ্বর সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিলেন, তথাপি পুত্র একবার বাহির হইয়া দর্শন দিয়া মায়ের প্রাণরক্ষা করিলেন না! ইহা শুধু নারী জাতির প্রতি অবজ্ঞা মাত্র নহে; ইহার মূলে একটা বিষম ভয় রহিয়াছে।

সুতরাং কামিনী ও কাঞ্চন নামক যে দুইটী পদার্থের বিরুদ্ধে শাস্ত্রকারেরা এবং সন্ন্যাসধর্ম্মীরা এত কথা বলিয়াছেন সেই দুইটীরই প্রভাব অসামান্য। ইহারা মানুষকে স্বর্গে নিয়া যায়, না, শুধু নরকের চাবিই ইহাদের কাছে রহিয়াছে, তাহা ঠিক জানি না। এই পৃথিবীর লীলা শেষ হইলে কোথায় ইহারা আমা-দিগকে নিয়া যাইবে তাহা না জানিলেও একথা নিঃস-ঙ্কোচে বলা যায়, যে, এখানকার খেলায় নারী পুরুষের অতি বড় প্রবল সাথী।

নারীর হাতে গড়া জিনিস জগতে অতি কম। কিন্তু একথা ত দেবতাদের সম্বন্ধেও বলা চলে; দেবতারাও নাকি হাতে ধরিয়া কিছু সৃষ্টি করেন না; দেবতারা মানুষের মনের উপর একটী বৈদ্যুতিক ঢেউ চালাইয়া দেন, আর, মানুষের সকল শক্তি তাঁহাদের ইচ্ছাকে পরিণত করিবার জন্য নিয়োজিত হয়। নারীর প্রভাবও তেমনই শুধু একটা বৈদ্যুতিক ঢেউ, শুধু একটা মদিরা —একটা নেশা—একটা উত্তেজনা। কিন্তু এমনই ইহার তেজ, যে, ইহার শক্তিতেই জগৎ চলিতেছে। মধ্যযুগে ইউরোপেই যে শুধু ভ্রাম্যমাণ বীরেরা (Knight-errant) নারীর মোহে ভ্রান্ত হইতেন, তাহা নহে; আদি ও অন্ত্যযুগে সব সময়েই সর্ব্বত্রই নারী পুরুষের জীবনে অধিষ্ঠাত্রী। সংসারের ভয়ে যারা অস্থির, পলায়ন যাহাদের বীরত্ব, তাহাদের বেলা যাহাই হইক না কেন, যারা গৃহস্থ সংসারী, নারীত্বের প্রভাব তাহাদের অবিচ্ছিন্ন নহে।

কিন্তু এই নারীত্বের দুইটী দিক আছে। আমরা কাব্য লিখিবার সময় তাহার একটী মাত্র দিক দেখি;

* "দ্বারং কিমেকং নরকস্য? নারী"।

কবির চোখে নারী শুধু সুন্দর; কবি যে তাহাকে মহিমাময়, গরিমাময়, দীপ্তিময়, প্রেমময় রূপে দেখেন, তাহার অর্থ তিনি তাহাকে শুধু উপভোগ্য মনে করেন; সৌন্দর্য্য ভোগের জিনিষ, ইহা একটী বিলাস; প্রেমে তৃপ্তির আশা আছে; দীপ্তিতে আনন্দ আছে। সুতরাং কবি যে নারীর উপাসনা করেন তাহাতে কেবল এই টুকুই জানান হয় যে, নারী পত্নী হইবার যোগ্য।

কাননে কুসুমকলি যখন ফুটিয়া উঠে, তখন পরিমল লোভে শুধু অলিই যে পাগল হয়, তা নয়; মানুষও সে সৌন্দর্য্যে মাতোয়ারা হয়। কিন্তু মানুষের সেই সৌন্দর্য্য ভোগে একটা কথা চাপা পড়িয়া যায়, মানুষ ভুলিয়া যায় যে, কুসুমের বিকাশ শুধু পরিমল দানের জন্য নয়; শুধু অলির মন মাতাইবার জন্য নয়; সে বিকাশ মাতৃত্বের সোপান মাত্র। কুসুম যে জননী হইতে চলিল, সেই মহান্ সত্যটী ঘোষণা করিবার জন্যই পরিমলের আবির্ভাব হয় এবং অলির মন মাতিয়া উঠে। মানুষের বেলায়ও নারীর যে সৌন্দর্য্য, যে বিকাশ এত রকমে পুরুষের মনে প্রভাব বিস্তার করে, তার চরম পরিণতি মাতৃত্বে।

তার অর্থই এই নয় যে, পত্নীত্বের কোন মূল্য নাই। পশু পক্ষীর সমাজে পত্নীত্বের বন্ধন যদিও খুব দৃঢ় এবং স্থায়ী নয়, তথাপি সর্ব্বত্রই—সমস্ত জীব জগৎ জুড়িয়াই এই জিনিসটী রহিয়াছে। সুতরাং ইহাকে মূল্যহীন মনে করা চলে না। এত বড় জগৎটা যে সকল শক্তির ক্রিয়ায় ধৃত রহিয়াছে, প্রেম তাহার মধ্যে নগণ্য নহে। যত সব বাসনা মানুষের চিত্তকে অধিকার করিতে পারে, যত সব প্রবল উত্তেজনার অধীন হইয়া মানুষ কাজ করিতে থাকে, তার মধ্যে প্রেম একটী প্রধান। সুতরাং এই প্রেমের উপর অধিষ্ঠিত যে পত্নীত্ব, সেটাকে একেবারে মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করা বৃথা। নারীত্বের পূর্ণ বিকাশে পত্নীত্ব একটী প্রকাণ্ড স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ইহাকে বাদ দিলে নারীত্বের পূর্ণতা হয় কি না জানি না। কিন্তু তথাপি স্বীকার করিতে হইবে, যে, পত্নীত্বই নারীত্ব নয়; নারী বলিলে ইহার চেয়ে বেশী বুঝায় এবং বুঝান উচিত। ফুলকে যদি শুধু ফুল হিসাবেই দেখি, তবুও তাহাকে দেখা হয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু সম্পূর্ণরূপে দেখা হয় না। ফুল যে ফুল এবং তার পরে ফলপ্রসূ—এই ভাবে দেখাই হইল প্রকৃতরূপে ফুল দেখা। নারীত্বের বেলায়ও তেমনই। নারীত্ব মানে পত্নীত্ব এবং মাতৃত্ব দুই-ই।

অবশ্যই বর্ত্তমান কাব্য-সাহিত্যের প্রায় ষোল আনা জুড়িয়াই নারী পত্নী হিসাবে—পুরুষের সঙ্গিনী হিসাবে—তাহার প্রেমের বস্তু হিসাবে, অর্থাৎ তাহার সোহাগের 'পুতুল' হিসাবে দেখা দেন। তাহার কারণ, যে আবেগ পুরুষের মনে নারীকে সঙ্গিনীরূপে পাইবার ইচ্ছা জাগাইয়া দেয়, তাহার প্রতাপ এতই বেশী যে, তাহাকে দমন করা কঠিন। কিন্তু সোহাগের সামগ্রী হিসাবে নারী জগতে যতই দ্বন্দ্ব কলহের সৃষ্টি করুন না কেন, যতই কাব্য নাটকের উপাদান হউন না কেন, সে হিসাবে তিনি পুরুষের চেয়ে খাটো হইবেনই। লঙ্কাকাণ্ডের কারণ সীতাদেবীই হউন কিংবা ট্রয়ের যুদ্ধের নিমিত্ত হেলেনই হউন, বিজয়ী পুরুষ তাঁহাকে আপন সামগ্রী বলিয়া গ্রহণ করিবেই। সেখানে পুরুষ স্বামিত্বের দাবী করিবেই। হইতে পারে, 'None but the brave deserve the fair'—বীর ভিন্ন কেহ রমণীর রমণীয়তার অধিকারী হইতে পারে না; কিন্তু যে বীর তাহার কাছে রমণী কখনও নিজের অবলাত্ব গোপন করিতে পারিবেন না। সেখানে তিনি ভোগের বস্তু, বিলাসের সামগ্রী, সোহাগের পুতুল,—সুতরাং পুরুষের চেয়ে ঢের ছোট।

ইউরোপ যে নারীত্বের সম্মানের বড়াই করে, সেটা পত্নীত্বের সোহাগ। সম্মান তাহাতে কতটুকু আছে, জানি না; সোহাগ অবশ্যই খুবই আছে। এবং এই সোহাগের মোহে ফাঁকি দিয়া যে নারীত্বের খর্ব্বতাকে চাপা দিয়া রাখা হয় বলিয়া ইব্‌সেন্ অভিযোগ করিয়াছেন, সেটাও পত্নীত্বের খর্ব্বতা।

অবশ্যই কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, পত্নী হিসাবেই বা নারী কেন পুরুষের চেয়ে ছোট বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহা হইলে কি উত্তর দিব জানি না। কিন্তু নারী যদি কোন জায়গায় পুরুষের চেয়ে ক্ষুদ্র হইয়া থাকেন, তবে, সেটা পত্নী হিসাবেই। নারীত্বের শ্রেষ্ঠত্ব পত্নীত্বে নয়, মাতৃত্বে। পুরুষ যেখানে পৃথিবী দখল করিয়া বসিয়া আছে, সেখানে নারী বিশেষ সহায়তা করিতে পারেন নাই। যে উদ্দাম লীলায় পুরুষ ভূতলে রাজত্ব করে, সেখানে নারী শুধু অনুযায়ী সঙ্গিনী মাত্র। কিন্তু তথাপি নারী হেয় নহে। সে যে জননী; তাহারই ক্রোড়ে যে বিশ্ববিজয়ী শিশু লালিত হয়। সাগর-মেখলা ধরিত্রী যাহার শাসন মানিয়া লইয়াছে, সেই মানবশিশু যে তাহারই কোলের নিধি!

এই কথাটা ভুলিয়া গিয়াই—মাতৃত্বকে অবহেলা করিয়া পত্নীত্বের বড়াই করিতে গিয়াই ইউরোপ আজ যত গোলে পড়িয়াছে।

সৌন্দর্য্য বোধ।

সৌন্দর্য্যের কথা শুনিয়াই যদি কেহ কথের আশ্রমে শকুন্তলা কিংবা নৈষধরাজের অন্তঃপুরে দময়ন্তীর কথা মনে করিয়া বসেন, তাহা হইলে তিনি একটা নিরেট ভুল করিবেন না, সত্য; কিন্তু তথাপি সত্যের ষোল আনা তাঁহার চোখে পড়িল না। শকুন্তলা-দময়ন্তীর সৌন্দর্য্য—যে সৌন্দর্য্য নিয়া সংস্কৃত কবিরা মন মাতাইয়া রাখিয়াছেন, যে সৌন্দর্য্য বিদ্যার দেহে ভারতচন্দ্র দেখিয়াছেন, তাহাও সৌন্দর্য্য সন্দেহ নাই; কিন্তু যে সৌন্দর্য্য বৈষ্ণব কবিদের ভগবৎপ্রেমের মূলে রহিয়াছে, তাহাও সৌন্দর্য্য; এবং যে সৌন্দর্য্য জীবজগতের বাহিরে বৃক্ষলতায়, ফলে ফুলে, সাগরে ভূধরে, আকাশে বাতাসে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ দেখিয়াছিলেন, তাহাও সৌন্দর্য্য। সুতরাং সুন্দরকে যে শুধু মানুষের দেহেই থাকিতে হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই।

যাহা সুন্দর তাহার ভিতরে কোন গড়মিল নাই। সুন্দরের প্রত্যেক অংশ প্রত্যেকের সঙ্গে ভাইবোনের মত কোলাকুলি করিয়া থাকে। তাহার অবয়বগুলির ভিতর এমন একটা সামঞ্জস্য—এমন একটা পরিমাণ থাকে, যাহার জন্য তাহাকে সুন্দর বলা হয়। সুন্দরকে কেন সুন্দর বলি, তাই নিয়া দার্শনিকদের মধ্যে বিচার হইয়াছে। এবং দার্শনিকেরা যেখানেই বিচার করিয়াছেন সেখানেই প্রায় একমত হইতে পারেন নাই। এক্ষেত্রেও তেমনই মতভেদ যথেষ্ট রহিয়াছে। এই সকল মতভেদের অর্থ এই নয় যে, সত্য এক নয়; ইহার আসল তাৎপর্য্য এই,—সত্য জিনিসটা এত বিরাট যে, নানা দিক্ হইতে ইহাকে দেখা চলে, এবং ভাষায় তাহাকে সম্যক্‌রূপে প্রকাশ করা চিরকালই কঠিন। স্বয়ং ভগবান্‌ই বলিতেছেন, 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং'—যে আমাকে যে ভাবে পাইতে চায়, আমি তার কাছে সে ভাবেই উপস্থিত হই। সত্যকেও তেমনই বহু ভাবে দেখা যায়। 'একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি।' দার্শনিকদের মতভেদ হইতে সুতরাং এই টুকুই বুঝা যায় যে, যদিও সত্য এক, তবুও ইহা এক এক জনের কাছে এক এক ভাবে প্রতিভাত হয়।

সৌন্দর্য্যতত্ত্ব নিয়া যে মতভেদ, তাহার মূলেও ঐ একই কথা। সুন্দরও নানা ভাবে নানা জনের কাছে প্রতিভাত হয়। নিশ্চয়ই সুন্দরের মধ্যে এমন একটা জিনিষ আছে, যে জন্য ইহাকে সুন্দর বলি। কিন্তু সেই জিনিসটী যে কি, তাই নিয়া সকলে একমত হইতে পারি না। তথাপি যাহা সুন্দর তাহা যে সমঞ্জস,—একথা সকলেই বলিবেন। দেহের সৌন্দর্য্যই হউক, আর মনের সৌন্দর্য্যই হউক, জীবজগতের সৌন্দর্য্যই হউক আর নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যই হউক—সুন্দরের ভিতর একটা আবয়বিক সামঞ্জস্য থাকিবেই।

কিন্তু সৌন্দর্য্যের তত্ত্ব যাহাই হউক না কেন, সৌন্দর্য্য বুঝিবার—তথা উপভোগ করিবার একটা ক্ষমতা যে ভগবান্ মানুষকে দিয়াছেন, সেইটার কথাই এখানে বলিতে চাই। ভোগের শক্তিটী না থাকিলে, জিনিসটী থাকা না থাকা সমান। সমস্ত বিশ্ব সংসার সৌন্দর্য্যে পরিপূরিত রাখিয়াও যদি ভগবান্ মানুষকে তাহা ভোগ করিবার ক্ষমতা না দিতেন, তাহা হইলে মানুষের প্রতি অবিচার করা হইত কি না জানি না, কিন্তু মানুষের পক্ষে সে সৌন্দর্য্য না থাকারই সমান হইত।

সৌন্দর্য্য ভোগ করিবার ক্ষমতা মানুষের রহিয়াছে বলিয়াই, মানুষ এত রকমে বিশ্বের আনন্দে মাতিয়া রহিয়াছে। শুধু তাই নয়, সুন্দরকে মানুষ এত রকমে দেখিতে চায়, যে, সমস্ত বিশ্ব জুড়িয়া যে সৌন্দর্য্য রহিয়াছে, তাহার উপরেও মানুষ নিজের চেষ্টায় কত সুন্দর জিনিষ জগতে আনয়ন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। মানুষ তাহার ঘর, বাড়ী, গ্রাম, নগর, শিল্প, সাহিত্য, কাব্য ও সঙ্গীতের ভিতর যে একটা বিরাট চেষ্টার পরিচয় দিতেছে, তাহা যে শুধুই অভাব নিবারণের চেষ্টা, এমন নয়; ইহার ভিতর সৌন্দর্য্য সৃষ্টির

আকাঙ্ক্ষাও প্রবল। সুস্থ, সবল শিশু যে অকারণ চীৎকারে তাহার আনন্দরাশি জগতে ঢালিয়া দেয়, সেটা কোন অভাব নিবারণের জন্য নহে, কবি যে সঙ্গীতের ফোয়ারায় বিশ্ব আমোদিত করিয়া তুলে, তাহা শুধু যশের জন্য নহে, গৃহী যে গৃহনির্ম্মাণে পারিপাট্য দেখায় তাহা শুধু শীতাতপ নিবারণের জন্য নহে, দরজী যে পোষাকের মাপ ঠিক রাখিতে চায়, তাহা শুধু দেহ ঢাকিবার জন্য নহে। এ সকলেরই ভিতর মানুষ সুন্দরকে দেখিতে চায়; বিশ্বের সৌন্দর্য্যের সঙ্গে নিজের সৃষ্ট সৌন্দর্য্য যোগ করিয়া দিয়া ভোগের মাত্রা বাড়াইয়া লইতে চায়।

কিন্তু এই যে সৌন্দর্য্য ভোগের লালসা, এই যে সৌন্দর্য্যসৃষ্টির চেষ্টা—ইহা সকলের সমান নহে, সকল ব্যক্তিরও সমান নহে, সকল জাতিরও সমান নয়। এই খানে ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, সৌন্দর্য্য অর্থ শুধু দৈহিক সৌন্দর্য্য নহে। সৌন্দর্য্যের ভিতর যে একটা সামঞ্জস্য, যে একটা পারিপাট্য থাকে—তাহা যে বুঝে, সে সব জিনিসেই উহা দেখিতে চায়। আকাশের বা সমুদ্রের সৌন্দর্য্য যেমন মানুষ সৃষ্টি করে না, দেহের সৌন্দর্য্যও তেমনই মানুষের সৃষ্টিচেষ্টার বাহিরে। কিন্তু সৌন্দর্য্য দেখিবার বুঝিবার এবং ভোগ করিবার শক্তি যাহার হইয়াছে, সে শুধু দেহে নয়, সকল সব জিনিসেই সব কাজেতেই তাহা দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িবে। শুধু তাহার ঘর বাড়ীতে নয়, শুধু তাহার পোষাকে পরিচ্ছদে নয়, যে ব্যক্তির সৌন্দর্য্য বোধ আছে, সে তাহার কাজে, কথা বার্ত্তায়, চিন্তায় ও চরিত্রে—সর্ব্বত্রই সৌন্দর্য্যের পরিচয় দিবে। বিশ্ব সৃষ্টির সৌন্দর্য্য যে বুঝে, নিজের সৃষ্টিতেও সৌন্দর্য্য সে দেখাইবেই, আর, যাহার নিজের সৃষ্টিতে সৌন্দর্য্যের পরিচয় নাই, বিশ্বের সৌন্দর্য্য তাহার অনধিগম্য। জগতের সৌন্দর্য্য উপভোগ করা এবং নিজের সৃষ্টিতে সৌন্দর্য্যের পরিচয় দেওয়া—ইহারই নাম প্রকৃত সৌন্দর্য্য বোধ।

কিন্তু সৌন্দর্য্য বুঝিবার শক্তি সকলের সমান নহে, কোন শক্তিই ভগবান্ সকলকে সমান করিয়া দেন নাই, এ শক্তিটাও বাটিবার বেলায় ভুল ঘটে তাহাতে করেন নাই। এ কথাটি ব্যক্তির পক্ষে যেমন সত্য, জাতির পক্ষেও তেমনই। সকল ব্যক্তির সৌন্দর্য্যের জ্ঞান যে সমান নয় তাহা যেমন তাহার কাজ, চিন্তা ও চরিত্রের দিকে চাহিলেই বুঝা যায়, জাতির বেলায়ও তেমনই তাহার শিল্প ও সাহিত্যের দিকে চাহিলেই বুঝা যায়, তাহার সৌন্দর্য্য বোধ কেমন। জাপানীরা যেমন সুন্দর সুন্দর বাগান জর খেলনা তৈয়ার করিতে পারে, তেমন বোধ হয় আর কেহ পারে নাই, গ্রীকেরা যেমন সুন্দর নাটক লিখিয়াছে, তেমন বোধ হয় আর কেহ পারে নাই, ফরাসীরা যেমন সুন্দর করিয়া কথা বলিতে পারে এবং লিখিতে পারে, তেমন বোধ হয় সকলে পারে না, মুসলমানদের ভিতর যেমন চলাফেরার আদব কায়দা আছে, তেমন বোধ হয় সকলের ভিতর নাই। সুতরাং জাতিবিশেষের সৌন্দর্য্যবোধ এক একটা বিশিষ্ট প্রণালীতে প্রকাশিত হইয়াছে। তথাপি সৌন্দর্য্য বোধে সাধারণতঃ প্রাচীন গ্রীকদিগকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়, কারণ, তাহাদের শিল্প ও সাহিত্য, এমন কি দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার ভিতরও এমন একটা সামঞ্জস্য ও পারিপাট্য দৃষ্ট হয়, যাহা অন্য কোন জাতি তেমন ভাবে দেখাইতে পারে নাই। গ্রীসের যাহারা এত প্রশংসা করেন, তাহারা সকলেই বলেন গ্রীকের যাহা কিছু করিয়াছে তাহার সকলটার ভিতরই এমন একটা পরিমাণ-জ্ঞান দেখা যায়, যাহা অন্য কুত্রাপি দেখা যায় না। গ্রীকদের এক এক খানা নাটক যেন এক একটা সাজানো বাগান। ঠিক যেখানে যত টুকু দরকার তার বেশী বাক্যব্যয় নাই, যাহা না বলিলে নয়, তার বেশী কিছু বলা হয় না, যে ঘটনা না ঘটিলে চরিত্র বিকাশের অসঙ্গতি হয়, তার বেশী কিছু ঘটে না, যে কয়টা চরিত্র না আসিলে নয়, তার বেশী কেহ দেখা দেয় না। সমস্তের ভিতর এমন একটা সংযম; অথচ এমন একটা সৌষ্ঠব,

থাকে যে প্রথম সাক্ষাৎকারেই মনে হয়, একটা অতি সুন্দর জিনিসের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছি। গ্রীকদের সাহিত্যেরই ভিতর যে কেবল এই সৌন্দর্য্য বোধ দেখা যায়, তাহা নয়; গ্রীকেরা যাহা কিছু করিয়াছে, সে সকলের ভিতরই অনেকে এইরূপ একটা সৌষ্ঠব দেখিয়া থাকেন।

আনন্দকে যাঁরা হেয় মনে না করেন, তাঁহাদের কাছে সৌন্দর্য্যবোধ নামক পদার্থটার হানোপায় চিন্তা করা অনাবশ্যক। বরং যাহাদের সৌন্দর্য্য বোধ পুষ্টি লাভ করে নাই, তাহাদের শিক্ষার পূর্ণতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার হেতু আছে। শিক্ষার অর্থ শুধু এই নয় যে, কতকগুলি সত্য কথা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে হইবে। শিষ্টতা বলিলে শুধু বুদ্ধির বিকাশই বুঝিতে হইবে, এমন কোন যুক্তি নাই। সভ্যতার মানে শুধু বিজ্ঞান নহে। সভ্যতার ভিতর যদি সৌন্দর্য্যের সাক্ষাৎ না পাই, তবে তাহার শক্তি স্বীকার করিলেও পূর্ণতা স্বীকার করিব না।

মানুষ শুধু জ্ঞানপিপাসু জীব নহে, মানুষের আত্মা শুধু বিজ্ঞানময় কোষে বাস করে না; আনন্দ আকাঙ্ক্ষা করিবার একটা স্বাভাবিক অধিকার মানুষের আছে। সুতরাং শিক্ষা ও সভ্যতার অর্থ যদি মানবত্বের পূর্ণ বিকাশের চেষ্টা হয়, তাহা হইলে তাহার ভিতর সৌন্দর্য্য-বোধেরও একটা স্থায়ী আসন রহিয়াছে। মানুষকে শুধু জ্ঞানী করিবার চেষ্টা—আনন্দময় কোষ হইতে মানবাত্মাকে বহিষ্করণের চেষ্টা একদেশদর্শিতা মাত্র। মানুষের ভিতর যে সব আশা আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে এবং সেই সবের ফলে মানুষের যে কর্ম্ম চেষ্টা, তাহার সহিত জ্ঞানলিপ্সাকে যোগ করিলে তবে ত পূর্ণ মানবত্বের সাক্ষাৎ মিলে। মানুষের বাসনা ও তাহার কর্ম্ম—এ সকলের ভিতরই তাহার সৌন্দর্য্য বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং সৌন্দর্য্যকে—আনন্দকে মানব জীবন হইতে নিষ্কাশন করিলে মানবত্বের অঙ্গহানি ঘটিবে। মানুষ যদি আনন্দ চায়, যদি সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে ও সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে চায়, তবে সেটাকে পাপ মনে করিতে পারি না। বরং সৌন্দর্য্য বোধের অভাব বা অপরিণতি দেখিলে তাহার মনুষ্যত্বকে অপূর্ণ মনে করিব।

অনেকে আছেন, যাঁরা জীবনটাকে কঠোর ও রুক্ষ করিয়া রাখাকে ধর্ম্ম মনে করেন; যাদের নিকট মানব-জীবন পাঠশালায় ছাত্র-জীবনের মত শুধুই একটা গুরুমহাশয়ের ভীতিতে পরিপূর্ণ; যাঁরা শুধুই 'এটা-নয়, ওটা নয়' বলিয়া বিশ্বের সমস্ত আনন্দ হইতে নিজেকে প্রহরী-পরিবেষ্টিত কয়েদীর মত সরাইয়া রাখিতে চান। কিন্তু মানুষের ভিতর এত সব অনুভূতি, এত সব বাসনা, এত সব আকাঙ্ক্ষা, এত সব কর্ম্ম চেষ্টা দিয়া যে সকল হইতে আপন আত্মাকে সরাইয়া নিতে অনুজ্ঞা করিয়া ভগবান শুধুই একটা নিষ্ঠুর খেলা খেলিতে বসেন নাই। সুতরাং মানুষকে যে আমরণ পঞ্চাগ্নির মধ্যস্থিত তপস্বীর মত কঠোর তপস্যাই করিতে হইবে, এমন কোন সনাতন বিধান নাই। বিশ্বময় এত সব সৌন্দর্য্য ছড়াইয়া দিয়া ভগবান্ কখনও বলিয়া দেন নাই, 'এ সব তোমার ভোগ্য নহে'।

সৌন্দর্য্য হইতে আনন্দ লাভ মানুষের পক্ষে এত স্বাভাবিক যে, যাহার তাহা হয় না, তাহাকে আপন স্বভাবের বিরোধী বলা চলে। এই যে সভ্যতা নামক একটা বিশাল জিনিস—যার ভিতর মানুষের কত সীমা-হীন আকাঙ্ক্ষা, কত অন্তহীন চেষ্টা, কত অপরিমেয় অনুভূতি প্রকাশের জন্য ব্যাকুল হইয়াছে,—যার ফলে মানুষ গহ্বর ছাড়িয়া অট্টালিকায় বাস লইয়াছে, নগ্নতা পরিহার করিয়া বস্ত্রে শোভিত হইয়াছে, আম-মাংস ত্যাগ করিয়া পাক-প্রণালী গ্রহণ করিয়াছে—যার ফলে মানুষ পশুত্বকে অতিক্রম করিয়া মানবত্বে আরোহণ করিয়াছে, পশুর আরাব ত্যাগ করিয়া সঙ্গীতের অধিকারী হইয়াছে, আহার বিহারের উপরেও কাব্যোপলব্ধির স্থান করিয়া দিতে পারিয়াছে—যার ফলে মানুষ দেশকালের বর্ত্তমানতা

অতিক্রম করিয়া অতীত ও অনাগতের প্রতি দৃষ্টি দিতে সক্ষম হইয়াছে—যার ফলে মানুষ আকাশে পাতালে একটা বিরাট ভাবের অভিব্যক্তি দেখিতে শিখিয়াছে—এই যে সভ্যতা, ইহার ভিতরে যে কত বড় একটা সৌন্দর্য্য-লিপ্সা রহিয়াছে, তাহার পরিমাণ করা চলে না। সুতরাং সুন্দরকে মানুষের জীবন হইতে সরাইয়া দিতে হইলে তাহাকে এ জীবন হইতে চলিয়া যাইবার জন্য ছাড়-পত্র দিতে হয়।

জন্ম লইয়াছে যে জীব, কত কাল সে বাঁচিবে তাহা কেহ না জানিলেও মোটের উপর তাহার যে বাঁচিবার অধিকার আছে, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু মানুষ যদি শুধু বাঁচিয়া থাকিয়াই সন্তুষ্ট হয়, যদি তাহার বিকাশের চেষ্টা, স্ফূর্ত্তির চেষ্টা, ফুলের মত ফুটিয়া উঠিবার চেষ্টা না থাকে, তাহা হইলে তাহার মনুষ্যত্ব রহিল কোথায়? অঙ্কুরোদ্গমের পরই যদি বৃক্ষ বলিয়া বসে, 'আমি আর বড় হইব না, আমার পত্র পুষ্প হইতে দিব না, চারিদিকের হাওয়ার স্পন্দনে আমি আনন্দের পুলক অনুভব করিব না,'—তাহা হইলে বৃক্ষত্বের দাবী তাহার পক্ষে অন্যায় হইবে। মানুষও যদি তেমনই কোন রকমে বাঁচিবার মত উপায় করিতে পারিলেই মনে করে যথেষ্ট হইয়াছে, যদি সুন্দর মতে সে বাঁচিতে না চায়, যদি বৃক্ষের মত পত্র পুষ্পে শোভিত হইতে সে না চায়—যদি সৌন্দর্য্য দ্বারা আপনাকে বেষ্টিত ও মণ্ডিত করিয়া না লয়, তাহা হইলে তাহার মনুষ্যত্বের দাবী কেন মঞ্জুর করা হইবে? শুধুই বাঁচিবে অথচ ভাল ভাবে বাঁচিবে না, শুধুই খাইবে অথচ ভাল খাইবে না, শুধু পরিবে অথচ ভাল পরিবে না, শুধুই দেখিবে, শুনিবে, অনুভব করিবে, অথচ ভাল ভাবে, সুন্দর ভাবে কিছুই করিবে না—এ কেমন মনুষ্যত্ব, এ কেমন আধ্যাত্মিকতা? মানুষ যদি সুন্দর করিয়াই গৃহ নির্ম্মাণ না করিল, তবে পর্ব্বত গহ্বর ছাড়িল কেন? যদি সুন্দর করিয়াই নগর সৃষ্টি না করিল, তবে অরণ্য হইতে বাহির হইল কেন, এত সব বৃক্ষের প্রাণ নাশ করিল কেন? যদি সুন্দর কিছু নির্ম্মাণ না করিল, তবে সে নির্ম্মাণের ফল দাঁড়াইল কি? মানুষ যাহা কিছু করিবে, যাহা কিছু বলিবে, যাহা কিছু দেখিবে, যাহা কিছু ভাবিবে, সে সমস্তেরই ভিতর যদি একটা সৌষ্ঠব, একটা সৌন্দর্য্য, একটা আনন্দের ঢেউ না রহিল, তবে তাহার বিকাশ হইল কোথায়?

কুঁড়ি হইতেই ফুল যদি বলিয়া বসিত, 'আর কেন, এখন আত্মমের চিন্তা করি', তাহা হইলে জগতের কতই না ক্ষতি হইত! কত আমোদ, কত আনন্দ হইতেই যে পৃথিবী বঞ্চিত হইত, তাহা কে জানে? মানুষের জীবনটাও যদি তেমনই ফুটিবার অবকাশ না পায়, যদি তাহার বহুমুখী চিন্তা, গতি ও চেষ্টা আনন্দের সুবাসে আমোদিত হইয়া না উঠে, যদি তাহার সমস্ত জীবনটার দিকে চাহিলে সুন্দর বলিয়া প্রতীতি না জন্মে, তবে, সেটা কি কম ক্ষতি? এত সব ভোগের জিনিস, এত সব সৌন্দর্য্যে ভরা বিশ্বেতে আসিল যে জীবটী, শক্তির অভাবে কিম্বা বুদ্ধির দোষে সে ফুটিয়া উঠিতে পারিল না, ইহা কি সামান্য লোকসান? ফুলের বাগান করিয়া যদি ফুলকে ফুটিতে না দেওয়া হয়, তাহা হইলে সেটা যেমন মূর্খতা, জীবন লাভ করিয়াও সে জীবনকে বিকশিত হইতে না দেওয়াও তেমনই ভ্রম।

যাঁহারা মনে করেন, মানব জীবনটা শুধুই একটা শিক্ষা, একটা বিরাট কর্ত্তব্য, তাঁহাদের ধর্ম্মবুদ্ধি অবশ্যই খুব প্রবল। কিন্তু যাহা করিতে হইবে তাহা যে শুধু করিতেই হইবে, ভাল ভাবে, সুন্দর ভাবে, সৌষ্ঠবের সহিত করা যাইবে না—এমন কোন নিয়ম নাই। যাহা কর্ত্তব্য তাহা যে শুধুই কর্ত্তব্য—তাহার ভিতর যে সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে না, তাহার ভিতর যে আনন্দের স্থান নাই, এমন কোন যুক্তি নাই। জীবনটা শুধুই কর্ত্তব্য, সুতরাং কোন মতে সেটা শেষ করিয়া ফেলিলেই যথেষ্ট হইল, এরূপ মনে করা ভুল। ইহা অনিচ্ছার কর্ত্তব্য নহে, ইহা একটা নিরানন্দের চুক্তি রক্ষা মাত্র নহে। ইহা একটা বিরাট আনন্দের ব্যাপার। ইহার ভিতর সৌন্দর্য্য থাকিলে ইহার পুষ্টি বই হানি হয় না। সুতরাং জীবনটাকে যাঁরা জটা চীর-ময়, কঠোরতাময়, রুক্ষ, নির্ম্মম করিয়া রাখিতে চান, তাঁরা জ্ঞানী হইতে পারেন, কিন্তু সত্যের একটী দিক্ মাত্র দেখিয়া থাকেন। ফুলটীর যদি ফুটিবার অধিকার থাকিয়া থাকে, তবে মানব জীবনেও তেমনই সৌন্দর্য্যের অবকাশ আছে। মানব জীবন যদি সত্য হয়, তবে তাহা শুধু সত্যই নয়,—'সত্যং শিবং সুন্দরং';—ইহার ভিতরে মঙ্গল রহিয়াছে, ইহার ভিতরে সৌন্দর্য্য রহিয়াছে। মরুকে আমরা বাসস্থান বলিয়া গ্রহণ করি নাই; জীবনটাকেই তবে মরু করিয়া রাখিব কেন?

...রীর সমস্ত ... আদর্শস্থানীয়। পঞ্চনদ দেশের আচার ... বলিয়া কোনও শাস্ত্র নির্দেশ করেন নাই; এবং সিন্ধুনদ ও তাহার পঞ্চশাখার দ্বারা বিধৌত ঐ পঞ্চনদ প্রদেশের পশ্চিমে অথবা পশ্চিমোত্তরে যে সকল জনপদ বিদ্যমান আছে, মহাভারতের সময়ে, তাহার কদাচারই বিদ্যমান ছিল। মহাভারতে উক্ত পঞ্চনদী বিধৌত পঞ্চনদ প্রদেশের বহির্দেশে অবস্থিত জনপদ সমূহ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে,—

"যাহারা হিমালয়, গঙ্গা, সরস্বতী, যমুনা ও কুরুক্ষেত্রের বহির্ভাগে, এবং যাহারা সিন্ধুনদী ও তাহার ষষ্ঠশাখা হইতে দূরপ্রদেশে অবস্থিত, সেই সমস্ত ধর্মবর্জিত ও অশুচি বাহীকগণকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। গোবর্দ্ধন বট ও সুভদ্র নামে চত্বর বাল্যাবধি আমার স্মৃতিপথে জাগরূক রহিয়াছে। আমি নিতান্ত গূঢ় কার্য্যানুরোধবশতঃ বাহীকগণের সহিত বাস করিয়াছিলাম। তন্নিবন্ধন তাহাদের ব্যবহার বিদিত আছি। শাকল নামে নগর, আপগা নামে নদী ও জর্ত্তিকাভিধেয় বাহীকগণের ব্যবহার যাহার পর নাই নিন্দনীয়। তথায় আচারভ্রষ্ট ব্যক্তিরা গৌড়ীসুরা পান ও লশুনের সহিত ভৃষ্ট যব, অপূপ ও গোমাংস ভোজন করিয়া থাকে। কামিনীগণ মত্ত, বিবস্ত্র, ও মাল্যচন্দন বিভূষিত হইয়া নগরের গৃহ প্রাচীর সমীপে নৃত্য এবং গর্দ্দভ ও উষ্ট্রের ন্যায় চীৎকার করিয়া অশ্লীল সঙ্গীত করিয়া থাকে—ইত্যাদি।" মহাভারত, কর্ণপর্ব্ব, ৪৫ অধ্যায়। (৺কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।) *

সিন্ধু ও তাহার শাখা নদীগুলির পশ্চিমদিকে যে সকল দেশ ও জনপদ অবস্থিত, তাহাদের সাধারণ নাম "বাহীক"। আর্য্যগণের আদিম বাসস্থান ঐ সকল দেশে হইলে, উহাদের আচার এতাদৃশ ঘৃণিত হইত না। উল্লিখিত নিন্দা প্রধানতঃ মদ্র দেশ সম্বন্ধে, কর্ণ ও শল্যের কলহ ব্যপদেশে, কথিত হইয়াছে। মদ্র ও কেকয় এই দুই জনপদ পরস্পরের নিকটস্থ; উহাদের আচার

---

* সরস্বতী দৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে ॥ ১৭ ॥
তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে ॥ ১৮ ॥
কুরুক্ষেত্রং চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ ॥ ১৯ ॥
এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ ॥ ২০ ॥
মনুসংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়।

* বহিষ্কৃতা হিমবতা গঙ্গয়া চ বহিষ্কৃতাঃ।
সরস্বত্যা যমুনয়া কুরুক্ষেত্রেণ চাপি যে ॥৬॥
পঞ্চানাং সিন্ধুষষ্ঠানাং নদীনাং যে হন্তরাশ্রিতাঃ।
তান্ ধর্ম্মবাহ্যানশুচীন্ বাহীকানপি বর্জয়েৎ ॥৭॥
গোবর্দ্ধনো নাম বটঃ সুভদ্রং নাম চত্বরম্।
এতদ্রাজকুলদ্বারি মাকুমারাৎ স্মরাম্যহম্ ॥৮॥
কার্য্যেণাত্যর্থগূঢ়েন বাহীকেষূষিতং ময়া।
তত এষাং সমাচারঃ সংবাসাদ্বিদিতো মম ॥৯॥
শাকলং নাম নগরমাপগা নামনিম্নগা।
জর্ত্তিকানাম বাহীকাস্তেষাং বৃত্তং সুনিন্দিতম্ ॥১০॥
ধানাগৌড্যাসবং পীত্বা গোমাংসং লশুনৈঃ সহ।
অপূপমাংসবাট্যানামাশিনঃ শীলবর্জ্জিতাঃ ॥১১॥
গায়ন্ত্যথ চ নৃত্যন্তি স্ত্রিয়ো মত্তা বিবসনাঃ।
নগরাগারবপ্রেষু বহির্মাল্যানুলেপনাঃ ॥১২॥
মত্তাবগীতৈর্বিবিধৈঃ খরোষ্ট্রনিনদোপমৈঃ।
অনাবৃতা মৈথুনেতাঃ কামচারাশ্চ সর্ব্বশঃ ॥১৩॥
ইত্যাদি। কর্ণপর্ব্ব, ৪৪ অধ্যায়, বোম্বাই, গোপাল নারায়ণ সংস্করণ।

(৮ শ্লোক) গোবর্দ্ধনঃ গবাং ছেদন স্থানং; সুভদ্রং চত্বরং সুরাভাণ্ডাশ্রয়ভূতং এতদ্দ্বয়ং রাজগৃহদ্বারস্যোপলক্ষণম্।

(১৩ শ্লোক) অনাবৃতাঃ স্বপরপুরুষ... কামাচারাঃ যথেষ্টচারিণ্যঃ ॥ ইতি শ্রীনীলকণ্ঠ কৃতা টীকা।

ব্যবহারও সমপ্রকারের হইবার সম্ভাবনা। কেকয় দেশও মদ্রের ন্যায় "বাহীক" ভূভাগের অন্তর্গত।

মদ্রদেশের কদাচারের কথা কর্ণপর্ব্বে বিস্তর কথিত হইয়াছে; কেবল দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লিখিত বাক্যাংশ আমরা তুলিয়াছি। যাঁহাদের ইচ্ছা হয়, তাঁহারা কর্ণপর্ব্বের ৪১ অধ্যায় হইতে ৪৬ অধ্যায় (৺ কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ) পাঠ করিতে পারেন। বোম্বাই সংস্করণের মহাভারতে ৪০ অধ্যায় হইতে এই প্রসঙ্গের সূচনা হইয়াছে।

বিবাহ সম্বন্ধেও মদ্রাদি দেশের আচার উত্তম নহে। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ এই অষ্টবিধ বিবাহের মধ্যে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে রাক্ষস এবং গান্ধর্ব্ব উৎকৃষ্ট বলিয়া মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে এবং কন্যাপণ দ্বারা গৃহীত অথবা ক্রীতকন্যার সহিত যে বিবাহ,—অর্থাৎ আসুর বিবাহ, তাহা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে একান্ত অকর্ত্তব্য ও কেবল মাত্র বৈশ্য শূদ্রের জন্যই বিহিত হইয়াছে। * তথাপি, মহাভারতে দেখা যায়, মদ্ররাজ শল্য নিজ ভগিনী মাদ্রী দেবীর সহিত কুরু-রাজ-কুমার পাণ্ডুর বিবাহসম্বন্ধ উপলক্ষে ভীষ্মকে বলিতেছেন,—

"আপনাদের কুলগত হইলে ভগিনীর অনেক সৌভাগ্য মানিতে হইবে, কিন্তু মহাশয়, আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা যে এক বিষম নিয়ম স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, আপনি তাহা সবিশেষ জ্ঞাত আছেন; তাহাই হউক অথবা মন্দই হউক, আমি তাহা লঙ্ঘন করিতে পারিব না; আপনাকেও সেই নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে, কারণ উহা আমাদিগের কুলধর্ম্ম।" আদিপর্ব্ব, ১১৩ অধ্যায়। (৺ কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ) †

এই "কুলধর্ম্ম" আর কিছুই নহে, কন্যার মূল্য লইয়া বিবাহ প্রদান। সর্ব্বজ্ঞকল্প রাজনীতিনিপুণ ভীষ্মদেব ধর্ম্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াও কার্য্য উদ্ধারের জন্য সেই পাহাড়ী ভগিনী বিক্রেতাকে বলিলেন,—

"মদ্ররাজ, তুমি চিন্তিত হইও না, স্বয়ং প্রজাপতি শুল্কগ্রহণ পূর্ব্বক কন্যাদানের নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তোমার কুলধর্ম্ম নির্দ্দোষ ও সাধুসম্মত, অবশ্যই প্রতিপালিত হইবে'।

"এই বলিয়া ভীষ্ম শল্যকে রথ, গজ, তুরগ, বসন, ভূষণ, ও মণি মুক্তা, প্রবাল প্রভৃতি দ্রব্যজাত শুল্কস্বরূপ প্রদান করিলেন। শল্য তৎসমুদায় গ্রহণ পূর্ব্বক পরম প্রীত হইয়া অলংকৃতা স্বীয় ভগিনী মাদ্রীকে লইয়া ভীষ্মের হস্তে সমর্পণ করিলেন।" ঐ ১১৩ অধ্যায়। (সিংহ মহাশয়ের অনুবাদ)।

কেকয় রাজ অশ্বপতি যখন দশরথকে স্বীয়-তনয়া

* ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥২১॥
চতুরো ব্রাহ্মণস্যাদ্যান্ প্রশস্তান্ কবয়ো বিদুঃ।
রাক্ষসং ক্ষত্রিয়স্যৈকমাসুরং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ॥২৪॥
পৃথক্ পৃথগ্ বা মিশ্রৌ বা বিবাহৌ পূর্ব্বচোদিতৌ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব ধর্ম্ম্যৌ ক্ষত্রস্য তৌ স্মৃতৌ॥২৬॥
জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্ত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ।
কন্যাপ্রদানম্ স্বাচ্ছন্দ্যা দাসুরো ধর্ম্ম উচ্যতে॥৩১॥
মনুসংহিতা। তৃতীয় অধ্যায়।

† "নহি মে হন্যোঽবরস্তত্র শ্রেয়ানিতি মতির্মম॥৮॥
পূর্ব্বৈঃ প্রবর্ত্তিতং কিঞ্চিৎ কুলেঽস্মিন্ নৃপসত্তমৈঃ।
সাধু বা যদিবাঽসাধু তন্নাতিক্রান্তুমুৎসহে॥৯॥
ব্যক্তং তদ্ভবতশ্চাপি বিদিতং নাত্র সংশয়ঃ।
নচ যুক্তং তথা বক্তুং ভবান্ দেহীতি সত্তম॥১০॥
কুলধর্ম্মঃ স নো বীর প্রমাণং পরমং চ তৎ।
তেন ত্বাং ন ব্রবীম্যেতদসন্দিগ্ধং বচোঽরিহন্॥১১॥
তং ভীষ্মঃ প্রত্যুবাচেদং মদ্ররাজং জনাধিপঃ।
ধর্ম্ম এষ পরো রাজন্ স্বয়মুক্তঃ স্বয়ম্ভুবা॥১২॥
নাত্র কশ্চন দোষোঽস্তি পূর্ব্বৈর্বিধিরয়ং কৃতঃ।
বিদিতেয়ং চ তে শল্য মর্য্যাদা সাধুসম্মতা॥১৩॥
ইত্যাদি। আদিপর্ব্ব, ১১৩ অধ্যায়, বোম্বাই সংস্করণ।

সংপ্রদান করিয়াছিলেন,* তথাপি তিনি মদ্ররাজ শল্যের মত রথ, গজ, তুরগ, বসন ভূষণ, মণিমুক্তা প্রবালাদি বস্ত্র এবং অলঙ্কার ও মুদ্রাতে পরিণত ও অপরিগণিত সহস্র সহস্র মুদ্রার স্বর্ণ কন্যাশুল্ক স্বরূপ গ্রহণ করেন নাই,† তথাপি তিনি যে একেবারেই কন্যাকে ব্রাহ্ম বিধিমত বরকে বস্ত্রাচ্ছাদনাদি দ্বারা অর্চনা করিয়া বিনাশুল্কে প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা নহে‡। রাজনীতি নিপুণ কৌশলী কেকয়রাজ জানিতেন, বর দশরথ স্ত্রৈণ এবং তিনি কোশল-রাজ কুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাই তিনি নিজ ভবিষ্যৎ দৌহিত্রের নিমিত্ত অযোধ্যারাজ্যের উত্তরাধিকার স্বরূপ সুদুর্লভ শুল্কগ্রহণে নিজ দুহিতাকে 'দোজবরে' পাত্রের করে সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবের যথাস্থানে আমরা এই শুল্কগ্রহণ সম্বন্ধে প্রমাণ উপস্থিত করিব। প্রাচীন কালের রাজগণ প্রায়ই বহুবিবাহ করিতেন, তাই অনেক সময় রাজ্যের উত্তরাধিকার লইয়া বিবাদ হইত এবং জ্যেষ্ঠাধিকারের নিয়ম সর্ব্বদাই অব্যাহত থাকিত না। যখনই কোন বহুবিবাহকারী নরপতি প্রবৃত্তিবশে পরিচালিত হইয়া আর একটি বিবাহ করিতে উৎসুক হইতেন তখন প্রায়ই তাঁহাকে "জ্যেষ্ঠাধিকার" রূপ নিয়মকে পদদলিত করিয়া নূতন প্রণয়িনীর মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতে হইত। ভীষ্মের পিতা শান্তনুকেও এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া দাসরাজ দুহিতা সত্যবতীকে বিবাহ করিতে হইয়াছিল। ঋষির আশ্রমে, আজন্ম অরণ্যে প্রতিপালিতা হইয়াও শকুন্তলা প্রেমমুগ্ধ দুষ্মন্তকে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করাইয়া তবে তাঁহার নিকট গান্ধর্ব্ব বিবাহ বিধানানুসারে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন §। শকুন্তলা রাজাকে বলিলেন,

"আপনার ঔরসে আমার গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, সে আপনি বিদ্যমানে যুবরাজ ও অবিদ্যমানে অধিরাজ হইবে। যদ্যপি আপনি এই বিষয়ে প্রতিশ্রুত হন, তবে আমি আপনার হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে পারি।" মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৭৩ অধ্যায়। (৺সিংহ মহাশয়ের অনুবাদ।)

বলা বাহুল্য দুষ্মন্ত শকুন্তলার বাক্যে তৎক্ষণাৎ "তথাস্তু" বলিয়াছিলেন। দশরথও কৈকেয়ী দেবীর অসামান্য রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তুল্যরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন।

কৈকেয়ী দেবীর পিতা সাধারণ ক্ষাত্রনীতিতে সুনিপুণ ছিলেন। ইহার অধিক তাঁহার চরিত্রের সম্বন্ধে কিছু জানিবার উপায় নাই। পরন্তু তাঁহার জননীর চরিত্রের একদেশ আমরা রামায়ণেই উত্তমরূপে দেখিতে পাই। কেকয়রাজ অশ্বপতির পত্নী যে অতি গর্ব্বিত ও আত্মসর্ব্বস্ব ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। অযোধ্যা সাম্রাজ্যের মন্ত্রীগণের একতম মন্ত্রী, প্রবীণ ও সুবিজ্ঞ সূতপ্রবর সুমন্ত্র রাণী কৈকেয়ীর মাতৃচরিত্রের আবরণ উদ্ঘাটন করিয়াছেন। সুমন্ত্র যখন দেখিলেন যে, কৈকেয়ী কিছুতেই তাঁহার দারুণ অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হইলেন না, স্বামী এবং সপত্নীজনের সমবেত শোকাশ্রু

* ইত্যুক্তা স মহাতেজাঃ শাতকুম্ভকৃতম্।
রত্নানি চ বিচিত্রাণি শল্যায়াদাৎ সহস্রশঃ। ১৪।
গজানশ্বান্ রথাংশ্চৈব বাসাংস্যাভরণানি চ।
মণিমুক্তা প্রবালংশ্চ গাঙ্গেয়োব্যসৃজচ্ছুভম্ ॥ ১৫।
আদিপর্ব্ব, ১১৩ অধ্যায়। বোম্বাই।

† ব্রাহ্মবিবাহ। আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতিশীলবতে স্বয়ম্।
আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মোধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৭॥
মনুসংহিতা, ৩য় অধ্যায়।

‡ গান্ধর্ব্ব বিবাহ। ইচ্ছয়ান্যোন্যসংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ।
গান্ধর্ব্বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ ॥ ৩২ ॥
মনুসংহিতা, ৩য় অধ্যায়।

§ সত্যং মে প্রতিজানীহি যথা বক্ষ্যাম্যহং রহঃ।
ময়ি জায়েত যঃ পুত্রঃ স ভবেত্ত্বদনন্তরঃ ॥ ১৬ ॥
যুবরাজো মহারাজ সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে।
যদ্যেতদেবং দুষ্মন্ত অস্তু মে সঙ্গমস্ত্বয়া ॥ ১৭ ॥
আদিপর্ব্ব, ৭৩ অধ্যায়। বোম্বাই।

প্রবাহেও যখন তাঁহার কঠিন প্রাণ কিঞ্চিন্মাত্রও তরল হইল না, পুত্রের বিরহ আশঙ্কায় স্বামীকে মূর্চ্ছিত এবং মরণাপন্ন দেখিয়াও যখন তাঁহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র দয়ার সঞ্চার হইল না, সূতপ্রবর সুমন্ত্রের কাতর ক্রন্দনেও যখন কোন ফল হইল না, তখন * সুমন্ত্র সারথি, রাজা দশরথের মন জানিয়া সহসা অশুভ সন্তাপসমন্বিত, ক্রোধাভিভূত ও ক্রোধে রক্তলোচন হইয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে বারংবার হস্তে হস্ত নিষ্পেষণ পূর্ব্বক মস্তক ঘূর্ণিত ও দন্ত কটমট করত বাক্যরূপ সুশাণিত বাণে কৈকেয়ীর হৃদয় কম্পিত করিতে লাগিলেন। যেরূপ বাণের দ্বারা মর্ম্মভেদ করে সেইরূপ তিনি বাক্যরূপ অনুপম বজ্রদ্বারা কৈকেয়ীর সমস্ত মর্ম্মভেদ করত তাঁহাকে বলিলেন,—'দেবি, তুমি যখন নিজের স্বামী, চরাচরাত্মক সমুদয় জগৎ প্রতিপালক, রাজা দশরথকে পরিত্যাগ করিলে, তখন ইহলোকে তোমার আর অকার্য্য কিছুই নাই; তোমাকে আমি পতিনাশিনী ও কুলনাশিনী বিবেচনা করি।......কোন্ ব্যক্তি কুঠার দ্বারা আম্রবৃক্ষ কাটিয়া তথায় নিম্ববৃক্ষ রোপণ পূর্ব্বক তাহার পরিচর্য্যা করেন? যে নিম্ববৃক্ষে জল সেচন করে, নিম্ববৃক্ষ কদাচ তাহাকে মধুর ফল দেয় না। আমি বিবেচনা করি, আভিজাত্য তোমার মাতারও যেরূপ, তোমারও সেইরূপ; কেন না, ইহা সকল লোকেই বলিয়া থাকে যে, নিম হইতে কখনই মধু ঝরে না। আমরা তোমার মাতার এক ঘোরতর পাপাভিসন্ধির

* ততো নির্ধূয় সহসা শিরো বিশদা চাসকৃৎ।
পাণিং পাণৌ বিনিষ্পিষ্য দন্তান্ কটকটায্য চ ॥১॥
লোচনে কোপসংরক্তে বর্ণং পূর্ব্বোচিতং জহৎ।
কোপাভিভূতঃ সহসা সন্তাপ মশুভংগতঃ ॥২॥
মনঃ সমীক্ষমাণশ্চ সূতো দশরথস্য সঃ।
কম্পয়ন্নিব কৈকেয্যা হৃদয়ং বাক্‌শরৈঃ শিতৈঃ ॥৩॥
বাক্যবজ্রৈরনুপমৈ র্নির্ভিন্দন্নিব চাশুগৈঃ।
কৈকেয্যাঃ সর্বমর্মাণি সুমন্ত্রঃ প্রত্যভাষত ॥৪॥
যস্যাস্তব পতিস্ত্যক্তো রাজা দশরথঃ স্বয়ম্।
ভর্ত্তা সর্ব্বস্য জগতঃ স্থাবরস্য চরস্য চ ॥৫॥
ন হ্যকার্য্যতমং কিঞ্চিত্তব দেবীহ বিদ্যতে।
পতিঘ্নীং ত্বামহং মন্যে কুলঘ্নীমপি চান্ততঃ ॥৬॥

* * *

আম্রংছিত্ত্বা কুঠারেণ নিম্বং পরিচরেৎ তু যঃ।
যশ্চৈনং পয়সা সিঞ্চেন্নৈবাস্য মধুরো ভবেৎ ॥১৬॥
আভিজাত্যং হি তে মন্যে যথা মাতুস্তথৈব তে।
নহি নিম্বাৎ স্রবেৎ ক্ষৌদ্রং লোকে নিগদিতং বচঃ ॥১৭॥
তব মাতুরসদ্‌গ্রাহং বিদ্মঃ পূর্ব্বং যথাশ্রুতম্।
পিতুস্তে বরদঃ কশ্চিদ্দদৌ বরমনুত্তমম্ ॥১৮॥
সর্ব্বভূতরুতং তস্মাৎ সঞ্জজ্ঞে বসুধাধিপঃ।
তেন তির্যগ্‌গতানাঞ্চ ভূতানাং বিদিতং বচঃ ॥১৯॥
ততো জৃম্ভস্য শয়নে বিরুতাদ্ভূরিবর্চসঃ।
পিতুস্তে বিদিতো ভাবঃ স তত্র বহুধাহসৎ ॥২০॥
তত্র তে জননী ক্রুদ্ধা মৃত্যু পাশমভীপ্সতী।
হাসং তে নৃপতে সৌম্য জিজ্ঞাস্যামিতি চাব্রবীৎ ॥২১
নৃপশ্চোবাচ তাং দেবীং হাসং শংসামি তে যদি।
ততো মে মরণং সদ্যো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥২২॥
মাতা তে পিতরং দেবী পুনঃ কেকয়ম ব্রবীৎ।
শংস মে জীব বা মা বা ন মাং ত্বং প্রহসিষ্যসি ॥২৩॥
প্রিয়য়া চ তথোক্তঃ স কেকয়ঃ পৃথিবীপতিঃ।
তস্যৈ তং বর দানার্থং কথয়ামাস তত্ত্বতঃ ॥ ২৪ ॥
ততঃ স বরদঃ সাধু রাজানং প্রত্যভাষত।
ম্রিয়তাং ধ্বংসতাং বেয়ং মা শংসীস্ত্বং মহীপতে ॥২৫॥
স তচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য প্রসন্নমনসো নৃপঃ।
মাতরং তে নিরস্যাশু বিজহার কুবেরবৎ ॥২৬॥
তথা ত্বমপি রাজানং দুর্জনাচরিতে পথি।
অসদ্‌গ্রাহমিমং মোহাৎ কুরুষে পাপদর্শিনী ॥ ২৭ ॥
সত্যশ্চাত্র প্রবাদোঽয়ং লৌকিকঃ প্রতিভাতি মে।
পিতৄন্ সমনুজায়ন্তে নরা মাতরমঙ্গনাঃ ॥ ২৮ ॥
রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৩৫ সর্গ, বঙ্গবাসী সংস্করণ)।

নিয়ে জানি, যেরূপ শুনিয়াছি, বলিতেছি। কোন বরদ ব্রাহ্মণ তোমার পিতা কেকয়াধিপতিকে একটি উৎকৃষ্ট বর দিয়াছিলেন; তাহার প্রভাবে তিনি সকল জন্তুরই বাক্যবোধে সমর্থ হন; এমন কি, তির্য্যগ্‌যোনিগত ভূতবর্গেরও কথা জানিতে সক্ষম হন। কিছুদিন পরে তোমার পিতা শয্যায় শয়ন করিয়া স্বর্ণের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট জৃম্ভ নামক পক্ষীর বাক্য শুনিয়া তাহার ভাব বোধকরত বারংবার হাসিতে লাগিলেন। তখন তোমার জননীও সেই শয্যায় শুইয়া ছিলেন। তিনি তাঁহার সেই অকারণ হাস্য দর্শনে ক্রোধসমন্বিতা ও মৃত্যুমুখে পতিতা হইতে অভিলাষিণী হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—'শুভদর্শন নরনাথ, আমি তোমার হাসির কারণ জানিতে ইচ্ছা করি।' তখন কেকয়রাজও সেই দেবীকে বলিলেন,—'আমি যদি তোমাকে ইহার কারণ বলি, তবে এখনই আমার মৃত্যু হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।' পরে তোমার জননী, তোমার পিতাকে—'আমাকে আর ঠাট্টা করিতে হইবে না; তুমি বাঁচ আর মর সেই কথাটি বল', এই কথা বলিলেন। প্রেয়সী ভার্য্যা সেইরূপ বলিলে কেকয় রাজ সেই বর প্রদাতা ব্রাহ্মণের নিকট উক্ত বিষয় বর্ণনা করিলেন। পরে সেই বরদাতা সাধু পুরুষ তাঁহাকে,—'মহারাজ, তোমার স্ত্রী মরুক অথবা দেশান্তরেই গমন করুক, তুমি কদাচ তাহার কথামত কাজ করিও না--এরূপ প্রত্যুক্তি করিলেন। সেই প্রসন্নমানস ঋষির কথা শুনিয়া কেকয়াধিপতি তোমার জননীকে নিগ্রহ করিয়া কুবেরের ন্যায় বিহার করিতে লাগিলেন। পাপদর্শিনি, সেইরূপ তুমিও মোহপ্রযুক্ত দুষ্টজনাচরিত পথ অবলম্বন করিয়া এই দশরথ রাজাকে অসৎকার্য্যে নিযুক্ত করিতেছ। 'ইহলোকে পুরুষেরা পিতার ও রমণীরা জননীর স্বভাবানুসারে জন্মিয়া থাকে এই যে, একটি প্রবাদ আছে, তাহা এতদিনে আমার নিকট সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে।" রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড ৩৫ সর্গ (বঙ্গবাসীর অনুবাদ)।

স্বামীর প্রাণ যায়, যাউক, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু স্বামীর সেই প্রাণান্তকর রহস্যটি জানিতেই হইবে,—কৈকেয়ী দেবীর জননীর এইরূপ পণ ছিল। এরূপ নারীর আপনার সামান্য একটু কৌতূহল নিবৃত্তির নিকট স্বামীর প্রাণও তুচ্ছ পদার্থ! এরূপ নারী সংসারে আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থ ব্যতীত আর কিছুই ভালবাসিতে পারেন না; পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্বামী, পুত্র,—স্বজন, সখী,—সকলই তাঁহার নিজ সুখের উপায় মাত্র। আপনার অপেক্ষা প্রিয়তর ইঁহাদের আর কেহই নাই, তাই ইঁহারা নিতান্ত লঘুচিত্ত, ভাবপ্রবণ, এবং ক্ষণে ক্ষণে ভাবের তরঙ্গে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে থাকেন। মনঃসংযম, সদসদ্ বিবেক, গাম্ভীর্য্য, কর্ত্তব্যজ্ঞান, প্রভৃতি ইঁহাদের ত্রিসীমায়ও আসিতে পারে না। কৈকেয়ী রাণী এরূপ এক মহিলার গর্ভে জন্মিয়া উত্তরাধিকার সূত্রে মাতার চরিত্রের মন্দ গুণগুলি সকলই পাইয়াছিলেন। জন্মভূমির কদাচার, পিতার কূটনীতি পরিচালিত চরিত্র, জননীর এবংপ্রকার প্রকৃতি—সূতিকাগৃহেই কৈকেয়ীর চরিত্রের বীজ ও ভূমি প্রস্তুত করিয়াছিল। তাহার উপর আশৈশব নীচবুদ্ধি মন্থরা দাসীর সাহচর্য্যরূপ সলিলসেকে সেই চরিত্রাঙ্কুর সতেজ বিষবল্লীর আকারে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল। তদুপরি নবযৌবনে পরিণত হইয়াই রূপোন্মত্ত কামান্ধ প্রৌঢ় পতির অত্যধিক আদর যত্নে তরুণী কৈকেয়ী একেবারে সকলের মাথায় চড়িয়া বসিয়াছিলেন। মহাকবি বাল্মীকির লেখনী একটি শ্লোকার্দ্ধেই অতি সুন্দররূপে তাঁহার চরিত্র-চিত্রিত করিয়াছেন, যথা—

'আত্মকামা সদা চণ্ডী ক্রোধনা প্রাজ্ঞমানিনী।'

১০। অযোধ্যাকাণ্ড, ৭০ সর্গ।

বাঙ্গালা অনুবাদে ইহার মর্ম্ম প্রকাশ করা অসাধ্য না হইলেও দুঃসাধ্য বটে, এবং সম্পূর্ণ একপৃষ্ঠা লিখিয়াও উত্তমরূপে সেই মর্ম্ম প্রকাশ করা যাইবে কিনা সন্দেহ।

যাহা হউক, নানারূপ কারণ সমবায়ে কৈকেয়ী

আত্মসুখ সর্ব্বস্বা, অভিমানিনী, ক্রোধপরায়ণা এবং নিজের বুদ্ধিবলের উপর অত্যধিক আস্থাবতী হইলেও 'নীচ' অথবা ক্ষুদ্র ছিলেন না। তাঁহার হৃদয় পূর্ণ ভাবে স্বতঃই কঠিন ছিল না,—কোমলতা এবং উদারতা সর্ব্বদাই তাঁহার চরিত্রের অন্তঃস্থলে ঢল ঢল করিত। রামচন্দ্র সপত্নী পুত্র হইলেও কৈকেয়ী তাঁহার প্রতি মাতৃবৎ স্নেহশালিনী ছিলেন। রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যাভিষেকের প্রথম সংবাদ মন্থরার মুখে শুনিয়াই তিনি 'আহ্লাদে আটখানা' হইয়া নিজকণ্ঠ হইতে মহার্ঘ হার উন্মোচন করিয়া দাসীকে প্রথমসংবাদ প্রদানের পুরস্কার দিয়াছিলেন। সে দানে কুটনীতি অথবা কপটতার লেশ মাত্রও ছিল না। তখনও তাঁহার হৃদয়ের স্বাভাবিক স্নেহ সুধাসমুদ্র রামের রাজ্যপ্রাপ্তি সংবাদের সুখে উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু, মন্থরা তাঁহাকে সূতিকাগৃহ হইতে চিনিত, সে কৈকেয়ী চরিত্রের একটি অতি কোমল মর্ম্মস্থান জানিত, সে তাই বুঝিয়া সুচতুর সুকৌশলী শস্ত্র চিকিৎসকের ন্যায় অতিশয় নিপুণ চাতুরীর সহিত তাঁহার সেই মর্ম্মস্থান ভেদ করিল। সেই ভিন্ন স্থান দিয়া তাহা খরবেগে তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত স্নেহসুধা প্রবাহিত হইয়া গেল,—নিমেষমাত্রে স্নেহময়ী মা রক্তপিপাসু রাক্ষসীতে পরিণত হইল। আমরা ক্রমশঃ যথাস্থানে এই অত্যাশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের পরিচয় প্রাপ্ত হইব।

কৈকেয়ী রামবনবাস ব্যাপারে যত দোষই করিয়া থাকুন,—কপটতা করেন নাই। কিন্তু তাঁহার তথাকথিত সত্যসন্ধ ও ধার্ম্মিক স্বামী এই ব্যাপারে যথেষ্ট কূটনীতি এবং কাপট্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে দশরথের ন্যায় কামান্ধ বৃদ্ধের কখনও চরিত্রের দৃঢ়তা অথবা উদারতা থাকিতে পারে না। তিনি মনে বুঝিয়াছেন এক,—প্রকাশ্যে আচরণ করিয়াছেন অন্যরূপ; তাই ন্যায়নিষ্ঠ মহাকবি তাঁহার মহাপাপের সমুচিত মহাদণ্ড,—প্রাণদণ্ড—বিধান করিয়াছেন। অতঃপর আমরা এই রাম বনবাস ব্যাপারে দশরথের চরিত্র আলোচনা করিতেছি।

প্রথমেই আমরা স্বীকার করিতেছি যে, "বীরাঙ্গনা কাব্যের" কবি শ্রীমধুসূদন "দশরথের প্রতি কেকয়ী" শীর্ষকপত্রে যে সঙ্কেত করিয়াছেন, তাহার কোনই মূল নাই। রাজা দশরথ যে কোনও সময়ে কৈকেয়ীর নিকট তাঁহার গর্ভজপুত্রকে রাজ্যপ্রদানের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সমগ্র রামায়ণে কোথাও তাহার আভাস মাত্রও পাওয়া যায় না। সুতরাং উক্ত পত্রের আক্ষেপ ও অভিযোগ সম্পূর্ণ কবিকল্পনা প্রসূত বলিতে হইবে এবং এই অভিযোগে রাজা দশরথকে সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষ বলিতেই হইবে।

তথাচ, আমরা নিঃসন্দেহে বলিব যে, দশরথের হৃদয়ের অন্তস্থলে একটি মহাবিষধর বৃশ্চিক লুকাইয়াছিল। কৌশল্যার ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্না মহিষী পাইয়াও যখন তিনি রূপজ মোহে আকুল হইয়া 'বাহীক' প্রদেশের সুন্দরী রাজকুমারীকে লাভ করিবার লালসায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, সংসারের নীতিতে সুনিপুণ কেকয়রাজ অশ্বপতি সুযোগ পাইয়া তাঁহাকে দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়াছিলেন যে তাঁহার দৌহিত্রই তাঁহার (দশরথের) অবর্ত্তমানে অযোধ্যা সাম্রাজ্যের অধিপতি হইবেন। বিবাহের পর এই প্রতিজ্ঞার কথা সম্ভবতঃ, রাজা কখনও জিহ্বাগ্রেও আনেন নাই। অযোধ্যার অবরোধে এই প্রতিজ্ঞার কথা সুপ্রচারিত ছিল না বলিয়াই মনে হয়, এমন কি, স্বয়ং কৈকেয়ীও উহা জানিতেন কি না সন্দেহ। অযোধ্যার রঘুবংশীয় নৃপতিদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠাধিকার কুলাচাররূপে অক্ষুণ্ণ সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, সুতরাং দশরথ ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পরে নিশ্চয়ই অনুতপ্ত হইয়াছিলেন এবং সেই হেতু আর কাহারও নিকট উহা প্রকাশ করেন নাই।

আর কেহ না জানিলেও কিন্তু স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র উহা জানিতেন। আমাদের মনে হয়, তাঁহার পিতাই অতি গোপনে তাঁহাকে এই কথা বলিয়াছিলেন। আমরা

তাহারা মুখে দশরথের এবম্প্রকার প্রতিজ্ঞার কথা শুনিতে পাইয়াছি। রাম বনবাসের পরে ভরত মাতামহাশ্রম হইতে অযোধ্যায় আগমন করিয়া যখন সকল ব্যাপার আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলেন, তখন ক্ষোভে, লজ্জায় এবং অপমানে তাঁহার অন্তরাত্মা বিকল হইয়া উঠিল। রাম চন্দ্রই ধর্ম্মতঃ রাজ্যের অধিকারী, প্রকৃত পরম ধর্ম্মাত্মা ভরত তাই রামকে অযোধ্যায় ফিরাইয়া আনিবার জন্য প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বাল্য সনেক চিত্রকূটে গিয়া রাজ্য গ্রহণ করিবার জন্য রামকে কত অনুরোধ, কত সাধনা, কত কাঁদাকাটি করিলেন, এমন কি শেষে স্বীয় জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়া প্রায়োপবেশন করিলেন, তিনি বলিলেন,—'দাদা,—যদি অযোধ্যায় ফিরিয়া গিয়া তোমার রাজ্য তুমি না লও, আমি তোমার সাক্ষাতে অনশনে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছি, দেখ।'

ভরতের অতুলনীয় চরিত্র বস্তুতঃই একখানি উৎকৃষ্ট কাব্যের বিষয় হইতে পারে, এরূপ অনুপম আত্মবিসর্জ্জন, নিঃস্বার্থ সেবা এবং সুপবিত্র ভ্রাতৃপ্রেমের উদাহরণ জগতে দুর্ল্লভ। তবে সে বিষয় আমাদের আলোচ্য নহে; সুতরাং তাহা লইয়া কালক্ষেপ করা অনুচিত। যাহা হউক, রাম যখন কিছুতেই ভরতকে বুঝাইয়া বিদায় করিতে পারিলেন না, অবশেষে সেই রহস্যটির উল্লেখ করিলেন। তিনি বলিলেন,—

"ভাই, পূর্ব্বকালে আমাদিগের পিতা যখন তোমার জননীকে বিবাহ করেন, তখন মাতামহের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, আপনার এই কন্যার গর্ভে যে সন্তান হইবে, তাহাকেই আমি রাজ্য দান করিব।" তৃতীয় শ্লোক, ১০৭ সর্গ, অযোধ্যা কাণ্ড। (বঙ্গবাসীর অনুবাদ। *

নিম্নের মূল সংস্কৃত শ্লোকটি দেখিলেই পাঠক মহাশয় বুঝিতে পারিবেন যে রাজা দশরথ কেকয়রাজের নিকট সত্য সত্যই রাজ্য শুল্ক প্রদানের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহার ব্যবহারেও এই রাজ্যশুল্ক প্রদান করিবার কথা সত্য বলিয়া দৃঢ় প্রতীতি জন্মে। যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে, আমরা এই কপট ব্যবহারের আলোচনা করিতেছি।

রাজা দশরথের প্রথমা পত্নী কৌশল্যা দেবী কৃতাভিষেকা মহিষী হইলেও প্রধানা ছিলেন না, কিন্তু কৈকেয়ী দেবী 'ভোগিনী পত্নী' † হইলেও রাজার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তরা ছিলেন ‡। ধর্ম্মপত্নী যশস্বিনী কৌশল্যা অলোকসাধারণ গুণগ্রাম ভূষিতা এবং কায়মনোবাক্যে স্বামিসেবাপরায়ণা হইলেও স্বামী তাঁহার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। রাজা দশরথের নিজের মুখের উক্তি হইতে এবং কৌশল্যারও বিলাপ বাণী হইতে এই বিষয় আমরা জানিতে পারি §। তথায় কৌশল্যাপুত্র রাম নিজ অসাধারণ গুণে পিতার প্রিয়তম হইয়াছিলেন। কৈকেয়ী অপেক্ষাও রাজা রামকে ভালবাসিতেন।

---

*পুরাভ্রাতঃ পিতা নঃ স মাতরং তে সমুদ্বহন্।
মাতামহে সমাশ্রৌষী রাজ্যশুল্ক মনুত্তমম্ ॥ ৩ ॥
অযোধ্যাকাণ্ড, ১০৭ সর্গ। (বঙ্গবাসী)

† কৃতাভিষেকা মহিষী ভোগিন্যোঽন্যা নৃপাস্ত্রয়ঃ।
অমরকোষ।

‡ স বৃদ্ধ স্তরুণীং ভার্য্যাং প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সীম্ ২৩
অযোধ্যাকাণ্ড, দশম সর্গ।

অবলিপ্তে ন জানাসি ত্বত্তঃ প্রিয়তরো মম।
মনুজো মনুজব্যাঘ্রাদ্রামাদন্যো ন বিদ্যতে ॥ ৫ ॥
অযোধ্যাকাণ্ড, একাদশ সর্গ।

§ কিং মাং বক্ষ্যতি কৌশল্যা রাঘবে বনমাস্থিতে।
কিঞ্চৈনাং প্রতিবক্ষ্যামি কৃত্বা বিপ্রিয়মীদৃশম ॥ ৬৭ ॥
যদা যদা চ কৌশল্যা দাসীবচ্চ সখীব চ।
ভার্য্যাবদ্ ভগিনীবচ্চ মাতৃবচ্চোপতিষ্ঠতে ॥ ৬৮ ॥
সতত‌ং প্রিয়কামা মে প্রিয়পুত্রা প্রিয়ংবদা।
ন ময়া সৎকৃতা দেবী সৎকারাহা কৃতে তব ॥ ৬৯ ॥
অযোধ্যাকাণ্ড, দ্বাদশ সর্গ।

এইখানেই তাঁহার মানসিক অশান্তির সুমহৎ কারণের উদ্ভব হইল। কৈকেয়ী প্রিয়তমা পত্নী, তাঁহার গর্ভজ পুত্রকে রাজ্যদান করিবেন বলিয়া তিনি প্রতিশ্রুত, অথচ রামকে রাজ্য প্রদান করিবার জন্য তিনি নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়া উঠিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্র কেবল ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ নহে, নিজ গুণেও ভারতসাম্রাজ্য রক্ষা করিবার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী; সুতরাং তাঁহাকে এইবার কৈকেয়ীকে বঞ্চনা করিয়া রামকে রাজ্য দিবার চেষ্টা করিতে হইল,—তাঁহাকে এইবার কূটরাজনীতির আশ্রয় লইতে হইল। এইবার তাঁহাকে নিজ হৃদয়ে বৃশ্চিক পুষিতে হইল।

কৈকেয়ীর প্রতি দশরথের বাক্য। "রঘুনন্দন রাম বনে গেলে, কৌশল্যা আমাকে কি বলিবেন এবং ঈদৃশ অপ্রিয় কার্য্য করিয়া আমিই তাঁহাকে কি বলিব? সেই প্রিয়বাদিনী, পুত্রপ্রণয়িনী কৌশল্যা দেবী সর্ব্বদাই আমার প্রিয় কামনা করিয়া থাকেন, তিনি সময়ানুসারে মাতা, ভগিনী, ভার্য্যা সখী ও দাসীর ন্যায় আমার সেবা করেন; সুতরাং তাঁহাকে সংকার করা আমার কর্ত্তব্য; কিন্তু আমি তোমার জন্য তাঁহাকে কখনও সংকার করি নাই।" (বঙ্গবাসীর অনুবাদ)।

কৌশল্যার বাক্য রামের প্রতি,—

অত্যন্তং নিগৃহীতাস্মি ভর্ত্তুর্নিত্যমসম্মতা।

পরিবারেণ কৈকেয্যাঃ সমা বাপ্যথবাবরা॥ ৪২॥

অযোধ্যাকাণ্ড ২০ সর্গ।

"আমি চিরকালই স্বামীর অপ্রিয়, তিনি আমাকে অত্যন্ত নিগ্রহ করিয়াছেন,—তিনি আমাকে কৈকেয়ীর দাসীর সমান—কি তদপেক্ষাও নিকৃষ্ট করিয়াছেন। (বঙ্গবাসীর অনুবাদ)।

রাজপুত্রগণের বিবাহের পরে মহোৎসবের ঘটায় অনেকদিন অতিবাহিত হইল। এখন রাজা দশরথের মনে রামকে রাজা করিবার ইচ্ছা জাগিয়া উঠিল; কিন্তু সে ইচ্ছা সফল করিবার সম্বন্ধে প্রবল বাধা ভরত এবং তাঁহার মাতুল যুধাজিৎ। তাই, রাজা সর্ব্বাগ্রে সেই বাধা অপসারণ করিবার জন্য ভরতকে বলিলেন, "পুত্র, এই তোমার মাতুল, কেকয় রাজপুত্র বীর্য্যবান্ যুধাজিৎ তোমাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন।"* ভরত পিতার এই কথা শুনিয়া শত্রুঘ্নকে সঙ্গে লইয়া মাতুলের সহিত মাতামহাশ্রমে গমন করিলেন। ভরতশত্রুঘ্ন মাতুলালয়ে গেলে রাম লক্ষ্মণ উভয়ে পিতৃসেবা করিতে লাগিলেন, রাম পিতার অনুমতি ও অনুমোদনক্রমে অযোধ্যার পুরবাসিগণের নানা প্রকার হিতানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। এইরূপে রাম ক্রমশঃ ব্রাহ্মণ হইতে বণিক শ্রেণী পর্য্যন্ত সকলেরই নিতান্ত প্রিয় হইয়া উঠিলেন। *

ভরতকে অতি দূরদেশস্থ মাতামহাশ্রমে পাঠাইয়া রাজা নির্ব্বিঘ্ন হইলেন। তখন তিনি রামের যৌব রাজ্যাভিষেক সুসম্পন্ন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। অযোধ্যার রাজতন্ত্র যথেচ্ছাচারমূলক ছিল না।—রাজা সমুদায় গুরুতর রাজকার্য্যেই মন্ত্রিগণের, পৌরজানপদবর্গের এবং সামন্ত নৃপতি সমূহের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। রামকে যৌবরাজ্যে নিয়োগ করিতে হইলেও তদ্রূপ মন্ত্রিবর্গ, জনসমুদায় এবং সামন্তচক্রের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে; তাই, তিনি সর্ব্বাগ্রে সামন্ত ভূপতি সমূহকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। কেবল ভরতের মাতামহ কেকয় রাজকে এবং পুত্রগণের শ্বশুর মিথিলাধিপ জনককে নিমন্ত্রণ করিলেন না;—

* ভরত প্রতি দশরথের বাক্য:—

অয়ং কৈকয়রাজস্য পুত্রো বসতি পুত্রক॥ ১৭॥

ত্বাং নেতুমাগতো বীরোযুধাজিন্ মাতুলস্তব।

বলিলেন, 'তাঁহারা এই প্রিয়বার্ত্তা পরে শুনিবেন, এত তাড়াতাড়ি কি? † কেকয়-রাজকে নিমন্ত্রণ না করার কারণ দশরথ প্রকাশ্যে যাহাই বলুন,—আসল কথা এই যে, রাজ্যাভিষেকের বার্ত্তা তাঁহার নিকট গোপন করাই তাঁহার মনের গূঢ় অভিপ্রায় ছিল।

প্রকাশ্য সভায় রাজা তাঁহার মনোভিলাষ যথোপযুক্ত [illegible]তা ও বাগ্মিতার সহিত ব্যক্ত করিলে উপস্থিত সকলেই সমস্বরে তাঁহার প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। রামচন্দ্র সর্ব্বগুণান্বিত এবং জ্যেষ্ঠা ও মহিষীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠপুত্র, সুতরাং ন্যায় ও ধর্ম্মানুসারে তাঁহার রাজ্যাভিষেক প্রস্তাবে কাহারও অসম্মতির কোন কারণ ছিল না। রাজা কৈকেয়ীর বিবাহ সময়ে কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা কেকয়রাজ ভিন্ন আর কেহই জানিতেন না। সেই কেকয়রাজকে এই বার্ত্তা জানান হয় নাই, সুতরাং কে আর তাঁহার এই সম্পূর্ণ ন্যায়ানুগত প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিবে? রাজা সমবেত সামন্ত-রাজচক্র, মন্ত্রিমণ্ডল এবং পৌরজানপদবর্গের অনুমোদন প্রাপ্ত হইয়া সানন্দে জ্যেষ্ঠ ও প্রিয়তম পুত্র রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যের ঘোষণা করিলেন। তাঁহার আদেশে নগরী সুসজ্জিত হইতে লাগিল, অভিষেকের আবশ্যক উপকরণ সকল সংগৃহীত হইতে লাগিল। রাজা রামকে ডাকিয়া বলিলেন,—

"রাম, তুমি আমার জ্যেষ্ঠা সদৃশী পত্নীতে জন্মলাভ করিয়াছ, আমারও সদৃশ হইয়াছ, এবং আমার সকলপুত্র অপেক্ষা সমধিক গুণসম্পন্ন হইয়া আমার প্রীতি-ভাজন হইয়াছ; বিশেষতঃ স্বীয়গুণে প্রজাগণকেও অনুরক্ত করিয়াছ; অতএব তুমি পুণ্যযোগে যৌবরাজ্য গ্রহণ কর, ইত্যাদি।"

(তৃতীয় সর্গ, অযোধ্যাকাণ্ড, বঙ্গবাসীর অনুবাদ *)

পুনরায় তিনি রামকে আপনার গৃহে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন,—

"আমি নানাপ্রকার দুর্লক্ষণ দৃষ্টি করিতেছি; এইরূপ দুর্লক্ষণ সমূহ প্রাদুর্ভূত হইলে, মহীপতি প্রায়ই ঘোরতর বিপদে পতিত হইয়া কাল-কবলিত হইয়া থাকেন, এ নিমিত্ত আমার জীবনের প্রতি সংশয় হইয়াছে। বিশেষতঃ প্রাণীদিগের মনোবৃত্তি সর্ব্বদা একরূপ থাকে না; অতএব রাঘব, যে কোন প্রকারেই হউক আমার চিত্ত বিমুগ্ধ হইতে না হইতেই তুমি শীঘ্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হও।...সেই পুণ্যযোগে তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিব,—কল্যই তুমি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হও, কেননা আমার মন এ বিষয়ে অতীব ত্বরান্বিত করিতেছে।...অদ্য তোমার বন্ধুবর্গ অপ্রমত্ত-চিত্তে সর্ব্বতোভাবে তোমাকে রক্ষা করুন, যেহেতু এইরূপ কার্য্যেই নানাবিধ বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে; এই

তাহার পর—শ্রুত্বা দশরথস্তেভদ্ভরতঃ কৈকয়ীসুতঃ ॥১৮॥
গমনায়াভিচক্রাম শত্রুঘ্নসহিতস্তদা।

... ...

গতে চ ভরতে রামো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ ॥ ২০ ॥
পিতরং দেবসঙ্কাশং পূজয়ামাসতুস্তদা।
পিতুরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য পৌরকার্য্যাণি সর্ব্বশঃ ॥ ২১ ॥
[illegible]কার রামঃ সর্ব্বাণি প্রিয়াণি চ হিতানি চ।

... ...

এবং দশরথঃ প্রীতো ব্রাহ্মণা নৈগমাস্তথা ॥ ২৩ ॥
[illegible] শীলবৃত্তেন সর্ব্বে বিষয়বাসিনঃ।
তেষামতিযশাঃ লোকে রামঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥ ২৪ ॥
আদিকাণ্ড, ৭৭ সর্গ। (বঙ্গবাসী)

† নানা নগরবাস্তব্যান্ পৃথগ্ জানপদানপি।
সমানিনায় মেদিন্যাঃ প্রধানান্ পৃথিবীপতিঃ ॥ ৪৬ ॥

... ...

নতু কেকয়রাজানং জনকং বা নরাধিপঃ।
ত্বরয়া চানয়ামাস পশ্চাত্তৌ শ্রোষ্যতঃ প্রিয়ম্ ॥ ৪৮ ॥
অযোধ্যাকাণ্ড, ১ম সর্গ। (বঙ্গবাসী)

জন্য যদিও তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধর্ম্মাত্মা ভরত সাধুদিগের মতের অনুবর্ত্তী হইয়াছে, এবং যদিও সে জিতেন্দ্রিয় জ্যেষ্ঠের আজ্ঞাবহ ও দয়াবান্, তথাপি আমার মতে তাহার অবর্ত্তমানেই তোমার যৌবরাজ্যের অভিষেক হওয়া উচিত। কেননা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, মনুষ্যদিগের চিত্ত সর্ব্বদা সমভাবে থাকে না,—ধর্ম্মাত্মা সাধুদিগেরও চিত্ত রাগ ও দ্বেষে আক্রান্ত হইয়া থাকে। ইত্যাদি"

(চতুর্থসর্গ, অযোধ্যাকাণ্ড, বঙ্গবাসী অনুবাদ।*)

"জ্যেষ্ঠায়ামসি মে পত্ন্যাং সদৃশ্যাং সদৃশঃ সুতঃ ॥ ৩৯ ॥
উৎপন্ন স্ত্বং গুণৈর্জ্যেষ্ঠো মম রামাত্মজঃ প্রিয়ঃ।
ত্বয়া যতঃ প্রজাশ্চেমাঃ স্বগুণৈরনুরঞ্জিতাঃ ॥ ৪০ ॥
তস্মাত্ত্বং পুষ্যযোগেন যৌবরাজ্যমবাপ্নুহি।
কামতস্ত্বং প্রকৃত্যৈব নির্ণীতো গুণবানিতি ॥ ৪১ ॥

তৃতীয় সর্গ, অযোধ্যাকাণ্ড। (বঙ্গবাসী)

"প্রায়েণৈব নিমিত্তানামীদৃশানাং সমুদ্ভবে।
রাজা হি মৃত্যুমাপ্নোতি ঘোরঞ্চাপদমৃচ্ছতি ॥ ১৯ ॥
তদ্‌যাবদেব মে চেতো ন বিমুহ্যতি রাঘব।
তাবদেবাভিষিঞ্চস্ব চলা হি প্রাণিনাং মতিঃ ॥ ২০ ॥

... ...

অত্র পুষ্যেঽভিষিঞ্চস্ব মনস্ত্বরয়তীব মাম্।
শ্বো২হমভিষেক্ষ্যামি যৌবরাজ্যে পরন্তপ ॥ ২২ ॥

... ...

সুহৃদশ্চাপ্রমত্তাস্ত্বাং রক্ষন্ত্বদ্য সমন্ততঃ।
ভবন্তি বহুবিঘ্নানি কার্য্যাণ্যেবংবিধানি হি ॥ ২৪ ॥
বিপ্রোষিতশ্চ ভরতো যাবদেব পুরাদিতঃ।
তাবদেবাভিষেকস্তে প্রাপ্তকালো মতো মম ॥ ২৫ ॥
কামং খলু সতাং বৃত্তে ভ্রাতা তে ভরতঃ স্থিতঃ।
জ্যেষ্ঠানুবর্ত্তী ধর্ম্মাত্মা সানুক্রোশো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥২৬॥
কিন্তু চিত্তং মনুষ্যাণামনিত্যমিতি মে মতম্।
সতাঞ্চ ধর্ম্মনিত্যানাং কৃতশোভি চ রাঘব ॥ ২৭ ॥

৪র্থ সর্গ, অযোধ্যাকাণ্ড। (বঙ্গবাসী)।

দশরথের হৃদয়ের অন্তস্থলে বঞ্চনা ও অনুশোচনার বৃশ্চিক অতি নির্দ্দয় ভাবে দংশন করিতেছে। তিনি ভরতের ভয়ে অস্থির হইয়া চারিদিকে ষড়যন্ত্রের বিভীষিকাময়ী ছায়া দেখিতেছেন। কি উপায়ে ত্বরায় রামের অভিষেক বিনা বিঘ্নে সম্পন্ন করিবেন, তাহারই জন্য অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি ভাবিতেছেন, কোনও উপায়ে একবার রামের অভিষেক হইয়া গেলেই সব বিপদ নিবৃত্ত হইয়া যাইবে, তিনি নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিবেন।

রামাভিষেক মহোৎসবের ঘোষণা নগরের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলেও এখনও রাণী কৈকেয়ী সে সংবাদ কিছুই জানেন না। দশরথ আত্মকৃত বঞ্চনার ভয়ে এত ভীত যে, এই সংবাদ তিনি তাঁহার প্রিয়তমাকেও দিতে সাহস করেন নাই।

এদিকে নগরে মহোৎসবের ঘটা পড়িয়া গিয়াছে। নগরের রথ্যাসমূহ পরিমার্জ্জিত ও জলসিঞ্চিত হইতেছে, অন্ধকার বিনাশের নিমিত্ত পথিপার্শ্বে দীপবৃক্ষ রোপিত হইতেছে, সর্ব্বশ্রেণীর প্রাসাদ, হর্ম্ম্য, দেবালয়, পণ্যদ্রব্য-শোভিত বিপণি ও সমৃদ্ধ গৃহস্থজনের গৃহ সুসজ্জিত হইতেছে, স্থানে স্থানে বিবিধ বর্ণের ধ্বজা উড়িতেছে, নটনটী নাচিতেছে, গায়কে গাহিতেছে, জনমণ্ডলী আনন্দে বিহ্বল হইয়াছে। রামের মাতা কৌশল্যা পুত্রের মঙ্গলের জন্য হোম, গায়ত্রীপাঠ, বিষ্ণুপূজা, দান প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্যে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এদিকে কৈকেয়ীর প্রাসাদের কেহই ইহার বিন্দুবিসর্গও অবগত নহে। কৈকেয়ীর দাসী মন্থরা যদৃচ্ছাক্রমে প্রাসাদ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল; সে অযোধ্যার এইরূপ সুসজ্জিত অবস্থা এবং কৌশল্যার প্রাসাদদ্বারে দানগ্রহণেচ্ছু জনসঙ্ঘ দেখিয়া হর্ষোৎফুল্লনয়না তত্র ক্ষৌমবাসপরিহিতা রামের ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "রামের মাতা অতীব হৃষ্টা হইয়া লোকদিগকে ধন প্রদান করিতেছেন কেন? রাজা প্রীত হইয়া তাঁহাকে কোন বিশেষ কাজ করাইবেন নাকি? আর লোকেরই বা

এত আনন্দ কেন ?" রামের ধাত্রী মন্থরার কথা শুনিয়া আহ্লাদে বিদীর্ণপ্রায় হইয়া বলিল, "তুমি কি শুন নাই ? রাজা যে রামকে রাজ্য দিতেছেন।"

ধাত্রীর কথা শুনিবাই মন্থরা তেলেবেগুণে জ্বলিয়া গেল। সে ক্রোধে দাউ দাউ জ্বলিতে জ্বলিতে কৈকেয়ীর শয়নাগারে গিয়া বলিল, "মূঢ়ে, তুমি এখনও শুইয়া আছ ? তোমার যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পার নাই ? তুমি পতিপ্রেমের বড় বড়াই করিয়া থাক,—তোমার সেই সৌভাগ্য নদীর স্রোতের মত কোথায় ভাসিয়া গেল যে !" সরলা রাণী মন্থরার এত রোষের কারণ বুঝিতে না পারিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, মন্থরা একেবারে বর্ষার নদীস্রোতের মত বাক্য স্রোত ছাড়িয়া দিল। সে কতরূপ ভণিতা করিয়া, কত ভয় দেখাইয়া, দশরথের কতপ্রকার নিন্দা করিয়া বলিল, "তোমার স্বামী ভরতকে দূরে রাখিয়া কণ্টক দূর করিয়াছেন, কল্যই রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন।" কৈকেয়ী মন্থরার কথায় রুষ্ট অথবা ভীত হওয়া দূরে থাকুক, রামের রাজ্য প্রাপ্তির সংবাদে বিস্মিতা এবং আনন্দোৎফুল্লা হইয়া শারদীয়া চন্দ্রলেখার ন্যায় প্রসন্ন রমণীয় মূর্ত্তিতে শয্যা হইতে উঠিয়া পরমানন্দে মন্থরাকে দিব্য আভরণ পুরস্কার দিয়া বলিলেন, "মন্থরে, তুমি আমাকে প্রিয় সংবাদ দিলে, আমি তোমার আরও উপকার করিতে ইচ্ছা করি ; বল, তোমায় আর কি পুরস্কার দিব ? আমি রাম ও ভরতে কিছুমাত্র পার্থক্য দেখি না। তুমি আমাকে যে সংবাদ দিয়াছ, তাহার অপেক্ষা প্রিয় আমার আর কিছুই নাই ; বল বল, আমি তোমাকে কি পুরস্কার দিব ?"

কৈকেয়ীর এই সুধানিষ্যন্দিনী, স্নেহবিগলিতা মাতৃমূর্ত্তি দেখিয়া কে বলিবে, যে এই মুখ হইতেই পরিশেষে সেই রাজ্যধ্বংসী মহাভয়াবহ বিষ বর্ষণ হইয়াছিল ! আমাদের স্থানাভাব বশতঃ কবিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকির শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিতে পরিলাম না। যাহা হউক, কৈকেয়ীর বাক্যে বিষপূর্ণ হৃদয়া মন্থরা আরও অধিকতর ক্রুদ্ধ হইল। সে এইবার চতুরতা খেলিল। সে জানিত, কৈকেয়ীর মর্ম্মস্থান কোথায়,—সে বুঝিত, কৈকেয়ী আত্মকামা, কৈকেয়ী প্রাজ্ঞমানিনী এবং সৌভাগ্যমদবিহ্বলা,—সে জানিত কৈকেয়ীর হৃদয়ে অপত্যস্নেহ কত গভীর। তাই সে একে একে কৈকেয়ীকে বুঝাইয়া দিল যে, রাজা দশরথ এতদিন তাঁহাকে অবোধ বালিকা জানিয়া কল্পনা করিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে কেবল মুখে ভালবাসা দেখান, তাঁহার প্রকৃত ভালবাসা কৌশল্যার উপর ; তাই ত ভরতকে দূর করিয়া রামকে রাজ্য দিলেন ; রাম রাজা হইয়া সর্ব্বাগ্রেই ভরতকে মারিয়া ফেলিবে, আর ভরতের মাতাকে ও পত্নীকে রামের মাতা এবং পত্নীর দাসত্ব করিতে হইবে,—কৈকেয়ী এতদিন প্রকৃত শত্রু রাজাকে মিত্র ভাবিয়া আসিতেছেন,—ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রথমতঃ কৈকেয়ী দুই একবার তর্ক করিয়া মন্থরাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অবশেষে তাঁহার কোমল প্রাণ মন্থরার উদ্গীরিত গরলে ভস্ম হইয়া গেল। তিনি প্রকৃতই মনে করিলেন, রাম রাজা হইলে ভরতকে হয় মারিয়া ফেলিবেন, নচেৎ নির্ব্বাসিত করিবেন।

এইরূপে কৈকেয়ীর প্রহত আত্মাভিমান নিগৃহীত সর্পের ন্যায় জাগিয়া উঠিল, তাঁহার হৃদয়ের মাতৃস্নেহ পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় উন্নত হইয়া উঠিল, তিনি বিবেচনাশক্তি হারাইয়া একেবারে মন্থরার নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। মন্থরা পরামর্শ দিল, তিনি যে রাজার নিকট দুইটি বর পাইবেন,—তাহার একটিতে ভরতের রাজ্যাভিষেক এবং দ্বিতীয়টিতে রামের চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য নির্ব্বাসন প্রার্থনা করিয়া লউন। ভরত চৌদ্দবৎসর রাজত্ব করিতে পাইলে, রাজ্যের সমুদয় সৈন্য এবং ধনরাশি তাঁহার হস্তগত এবং নিখিল মন্ত্রিমণ্ডল, প্রজাবর্গ ও সামন্ত সম্প্রদায় তাঁহার বশীভূত হইবে ; তাহা হইলে নির্দ্দিষ্ট কাল পরে রাম অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেও

ভরতের কোন ক্ষতি হইবে না।—এইরূপ বুঝাইয়া দিয়া বলিল,—"তুমি শোকপরায়ণা হইয়া রোদনকরতঃ ভূতলে লুণ্ঠিত হও; আমি জানি যে, নরপতি দশরথ তোমার জন্য অগ্নিতেও প্রবেশ করিতে পারেন, তিনি কখনই তোমার বাক্য লঙ্ঘন করিতে পারিবেন না। রাজা তোমাকে বিবিধ রত্ন, মণি, মুক্তা ও সুবর্ণ দিতে চাহিবেন, কিন্তু তাহা তুমি লইও না। তুমি তাঁহাকে শপথ করাইয়া তাঁহার নিকট রামের বনবাস ও তোমার পুত্রের রাজ্যলাভরূপ দুই বর চাহিয়া লইও,—দেখিও সাবধান।"

এই প্রকার হলাহল বিষে রাণী কৈকেয়ীর হৃদয়ের সুধাসমুদ্র শুকাইয়া গেল, তিনি নির্ব্বোধ বালিকার মত মন্থরার বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া অনর্থের পথে ধাবিতা হইলেন। তাঁহার চরিত্রের সুপ্ত কালসর্প জাগ্রত হইয়া উঠিল,—তিনি পতিপ্রেম, উদারতা, দয়া, সৌজন্য সমস্ত ভুলিয়া গিয়া রক্তপিপাসু রাক্ষসীর মত কঠোর হইয়া উঠিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ আপনার অঙ্গ হইতে অলঙ্কার উন্মোচন করতঃ ক্রোধাগারে গিয়া ভূশয্যায় শয়ন করিলেন এবং মন্থরার মুখের দিকে চাহিয়া পতির মৃত্যুদণ্ডের আজ্ঞাস্বরূপ বলিতে লাগিলেন,—

"কুব্জে, আমার আর সুবর্ণ, রত্ন, কি উত্তমোত্তম খাদ্য দ্রব্য, কিছুতেই প্রয়োজন নাই, যদি রাম রাজ্যলাভ করে, তবে আমার মৃত্যু হইবে, সন্দেহ নাই; সুতরাং হয় রাম বনে গমন করিবে এবং ভরত পৃথিবী লাভ করিবে, তুমি আসিয়া ইহা আমাকে জানাইবে, না হয় মহারাজের নিকট আমার মৃত্যু-সংবাদ প্রদান করিবে।" *

কুব্জাকে এইরূপ বাক্য বলিয়া কৈকেয়ী দেবী স্বর্গভ্রষ্টা দেবীর ন্যায় মলিনবেশে ধূলিশয্যায় পড়িয়া রহিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল চন্দ্র নক্ষত্র বিরহিত তমোময়ী ভয়ঙ্করী বিভাবরীর মত বোধ হইতে লাগিল।

এদিকে মন্দবুদ্ধি মন্থরা রাজার সর্ব্বনাশের জন্য জাল পাতিয়া প্রস্থান করিবামাত্রই হতভাগ্য দশরথ ধীরে ধীরে আসিয়া সেই ফাঁসে পা দিলেন। তিনি রজনী প্রভাতে রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের নিমিত্ত যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয়ের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করিয়া প্রদোষ সময়ে প্রাণ হইতেও প্রিয়তরা প্রেয়সী পত্নীর প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। কৈকেয়ী দেবীর প্রাসাদ অথবা বিলাস ভবন অযোধ্যার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিল। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান ভারত সম্রাট স্বীয় প্রেয়সীর স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া জগতে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। "তাজমহল" আজ নিজ অতুলনীয় সৌন্দর্য্যে ভুবন বিখ্যাত হইলেও তাহা প্রেমের অন্তিম চিহ্ন মাত্র, আর সেই আর্য্য সভ্যতার সুবর্ণযুগে, সূর্য্যবংশাবতংশ ইক্ষ্বাকু-মান্ধাতা-সগর-দিলীপ ভগীরথ-রঘু প্রমুখ ধর্ম্মে কর্ম্মে আদর্শ নরপতিগণের উত্তরাধিকারী সম্রাট দশরথ তাঁহার অনিন্দ্যসুন্দরী ও সার্দ্ধসপ্তশত পত্নীর শিরোমণি স্বরূপা প্রিয়তমা কৈকেয়ী দেবীর জন্য যে বিলাস-প্রাসাদ সাজাইয়াছিলেন, তাহা যে শিল্পসৌন্দর্য্যে কবি কল্পনারও অতীত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? দিক্‌পালাদি দেবগণ যেমন অতিশয় অনুরাগের সহিত দেবরাজ বাসবের উপাসনা করিয়া থাকেন, ভারতবর্ষের পূর্ব্ব, পশ্চিম,

---

* ইহ বা মাং মৃতাং কুব্জে নৃপায়াবেদয়িষ্যসি।
বনন্তু রাঘবে প্রাপ্তে ভরতঃ প্রাপ্স্যতে ক্ষিতিম্ ॥৫৮॥
সুবর্ণেন ন মে হ্যর্থো ন রত্নৈর্ন চ ভোজনৈঃ।
এষ মে জীবিতস্যান্তো রামো যদ্যভিষিচ্যতে ॥৫৯॥
অযোধ্যাকাণ্ড, নবম সর্গ। (বঙ্গবাসী)।

উত্তর ও দক্ষিণ দেশীয় আর্য্য ও ম্লেচ্ছ সমস্ত নরপতি,— এমন কি আরণ্য ও পার্ব্বত্যপ্রদেশস্থ সামন্তগণও সকলে মহাবল পরাক্রান্ত সম্রাট দশরথের সেবা করিতেন। *

প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বাগ্রে তিনি প্রেয়সীর শয়ন মন্দিরে গেলেন, কিন্তু, আজি সে গৃহ, সে শয্যা শূন্য দেখিলেন! যে প্রিয়তমা সর্ব্বদা সুবেশে সজ্জিত হইয়া সহাস্যবদনে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেন, আজি তিনি কোথায়? এই সামান্য ব্যাপারেই রাজার হৃদয়ে এক আঘাত লাগিল। তিনি আগ্রহের সহিত প্রতিহারীকে 'রাণী কোথায়?' জিজ্ঞাসা করিলে, প্রতিহারী করযোড়ে নিবেদন করিল যে, দেবী অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইয়া ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়াছেন। প্রতিহারীর এই কথায় রাজার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল! তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখন তিনি বিষন্ন বদনে সেই ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার প্রিয়তমা তরুণী ভার্য্যা যেন স্বর্গভ্রষ্টা দেবতার ন্যায়, দিবচ্যুতা অপ্সরার ন্যায়, অপহৃতা কিন্নরীর ন্যায়, ছিন্নমূলা বল্লরীর ন্যায়, জালাবদ্ধা মৃগীর ন্যায়, বাণবিদ্ধা করেণুর ন্যায় মাটিতে পড়িয়া লুটাইতেছেন! এইদৃশ্যে কামান্ধ বৃদ্ধ নরপতির মস্তক ও হৃদয় যুগপৎ বিমথিত ও বিক্ষোভিত হইয়া উঠিল! তিনি নিতান্ত শোকাকুল চিত্তে [illegible] পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার দেহে হস্তপরামর্শ করিতে করিতে নানা অনুবাদের সহিত তাঁহার দারুণ ক্রোধের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। এই অনুনয় বিনয় হইতে বুঝিতে পারা যায়, যে বৃদ্ধরাজা অত্যধিক পরিমাণে কামাবিষ্ট হওয়ায় সদসদ্‌ বিবেক এবং কার্য্যাকার্য্য জ্ঞান হারাইয়া ছিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, 'আমি এবং আমার অনুগত সকলেই তোমার বশবর্ত্তী, কেহই তোমার মতের বহির্ভূত নহে; তোমার অভীষ্ট সাধন করিতে যদি আমার জীবন যায়, তাহাতেও আমি সম্মত আছি;—অতএব তুমি রোদন করিও না, এবং অনাহারে শরীর শোষণ করিও না। তোমার অভিপ্রায় কি তাহা ব্যক্ত কর, কে তোমার অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছে?—বল, আমি কাহার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিব,—অথবা কাহারই বা সুমহান্ অপ্রিয় করিব? বল, কোন্‌ বধ্যব্যক্তিকে প্রাণদান করিতে হইবে, অথবা কোন্‌ নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণ দণ্ড করিতে হইবে? কোন্‌ ধনবান্‌ ব্যক্তিকে নির্ধন করিতে হইবে, অথবা কোন্‌ অকিঞ্চনকে ধনাঢ্য করিতে হইবে?...যতদূর পর্য্যন্ত সূর্য্যের প্রকাশ, পৃথিবীতে ততদূর পর্য্যন্ত আমার অধিকার আছে; দ্রাবিড়, সিন্ধু-সৌবীর, সৌরাষ্ট্র, দক্ষিণাপথ, বঙ্গ, অঙ্গ, মগধ, মৎস্য, কাশী ও কোশল এইসব সমৃদ্ধ রাজ্য আমার অধীন; ঐ সকল জনপদে বহুতর ধন, ধান্য, ছাগ, মেষ প্রভৃতি দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে; তুমি ঐ সকলের মধ্যে যাহা চাও, বল, আমি তোমাকে তাহাই দিব।"— ইত্যাদি *।

* দশরথের সামন্তগণের মধ্যে,—

প্রাচ্যোদীচ্যা প্রতীচ্যাশ্চ দক্ষিণাত্যাশ্চ ভূমিপাঃ।
ম্লেচ্ছাশ্চার্য্যাশ্চ যে চান্যে বনশৈলান্তবাসিনঃ ॥২৫॥
উপাসাঞ্চক্রিরে সর্ব্বে তং দেবা ইব বাসবম্‌।
তেষাংমধ্যে স রাজর্ষির্মরুতামিব বাসবঃ ॥২৬॥

তৃতীয় সর্গ, অযোধ্যাকাণ্ড। (বঙ্গবাসী)

* কস্য বাপি প্রিয়ং কার্য্যং কেন বা বিপ্রিয়ং কৃতম্‌
কঃ প্রিয়ং লভতামদ্য কোবা সুমহদপ্রিয়ম্ ॥ ৩১ ॥
মা রৌৎসীর্ম্মাচ কার্ষী স্বং দেবি সম্পরিশোষণম্‌।
অবধ্যো বধ্যতাং কো বা বধ্যঃ কো বা বিমুচ্যতাম্ ॥৩২॥
দরিদ্রঃ কো ভবেদাঢ্যো দ্রব্যবান্‌ বাপ্যকিঞ্চনঃ।
অহঞ্চ হি মদীয়াশ্চ সর্ব্বে তব বশানুগাঃ ॥ ৩৩ ॥
ন তে কঞ্চিদভিপ্রায়ং ব্যাহন্তু মহমুৎসহে।
আত্মনো জীবিতে নাপি ব্রুহি যন্‌ মনসি স্থিতম্‌ ॥ ৩৪ ॥

....

অত্যুদ্রিক্ত কামবেগে হতবুদ্ধি বৃদ্ধ এইরূপ অনুনয় বিনয় করিলে, কৈকেয়ী প্রথমে তাঁহাকে রীতিমত শপথ গ্রহণ করাইয়া, ইন্দ্র প্রভৃতি তেত্রিশ দেবতা, দিবারাত্রি, আকাশাদি পঞ্চভূতকে সাক্ষী রাখিয়া সেই সুবিখ্যাত বরদ্বয় প্রার্থনা করিলেন। সেই যুগ্ম বরের বিষয় সকলেরই সুবিদিত, সুতরাং তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। তিনি বলিলেন, "সেই যে দুইবর প্রদান করিতে আপনি ধর্ম্মানুসারে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, এক্ষণে যদি তাহা প্রদান না করেন, তবে আমি আপনার দ্বারা অপমানিতা হইয়া এখনই প্রাণ পরিত্যাগ করিব।"

রাজা দশরথ ভ্রমেও ভাবেন নাই যে, এইরূপে তাঁহার সর্ব্বনাশ হইবে। সর্ব্বদা প্রিয়ভাষিণী প্রেমময়ী প্রেয়সী যে সহসা এরূপ কালসর্পীর ন্যায় মহাভয়ঙ্কর গরল উদ্গীরণ করিবেন, কাম-মোহিত বৃদ্ধ তাহা কখনও স্বপ্নেও মনে স্থান দেন নাই। সহসা এইরূপে তাঁহার মস্তকে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল, তিনি জ্ঞানশূন্য হইলেন। অতঃপর সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া কখনও ক্রোধবশে তর্জ্জন গর্জ্জন, কখনও অনুনয় বিনয়, বা কখনও করযোড়ে কাতর ক্রন্দন, কত করিলেন,--কিন্তু সমস্ত নিষ্ফল হইল। স্নেহ, প্রেম, পরিচয়, কুল,শীল, ন্যায়, ধর্ম্ম, যশঃ—ইত্যাদির নামে কত বুঝাইলেন, সব বৃথা হইল। কূটবুদ্ধি কুব্জা কৈকেয়ীর অন্তরের অন্তঃস্থলে যে ঈর্ষ্যা ও দুরাকাঙ্ক্ষার অনল জ্বালিয়া দিয়াছে, তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের স্নেহ প্রস্রবণই একেবারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। নারীর কুসুম-কোমল অন্তঃকরণ প্রখর রবিকরদগ্ধ মরুভূমির আকার ধারণ করিয়াছে। মহিলা শিলাতে পরিণত হইয়াছে। "রাজা এতদিন তাঁহাকে নির্ব্বোধ বালিকা ভাবিয়া অলীক চাটুবাক্যে প্রতারিত করিয়া আসিতেছেন, তাঁহার প্রকৃত প্রেম কৌশল্যার উপরই আছে", এতদিন যে বুঝিতে পারেন নাই; নিজে বড় বুদ্ধিমতী বলিয়া ভাবিতেন, অদ্য তাঁহার সে প্রজ্ঞার অভিমান চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তিনি আপনাকে সার্দ্ধ সপ্তশতাধিক সপত্নীর শিরোমণি ও পতির একমাত্র প্রেমাস্পদ বলিয়া সৌভাগ্যের যে বড় গর্ব্ব করিতেন, আজ সে গর্ব্ব ধুলিসাৎ হইয়াছে। অনুতাপ ও ঈর্ষার দাবানল আজ হূহু শব্দে তাঁহার চিত্তকাননকে ভস্মীভূত করিতেছে। "রাম রাজ্য লাভ করিলেই আত্মরক্ষার্থ ভরতকে হয় নিহত নতুবা নির্ব্বাসিত করিবেন"—মন্দকারিণী মন্থরার এই বাক্য তীক্ষ্ণ তীরের ন্যায় তাঁহার হৃদয় ভেদ করিয়াছে। যে রামকে তিনি পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন, আজ সেই রাম তাঁহার পুত্রহন্তা শস্ত্রপাণি আততায়ীর রূপে তাঁহার অন্তঃস্থলে দারুণ বিভীষিকার সঞ্চার করিতেছে। অনুতাপে, ঈর্ষ্যায় ও প্রাণাধিক পুত্রের প্রাণরক্ষার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছে। এরূপ অবস্থায় দশরথের অশ্রু পরিপ্লুত কাতর ক্রন্দন প্রকৃতই অরণ্যে রোদনবৎ নিষ্ফল হইবে, তাহাতে বিস্ময় কি? নিজ প্রিয় শাবককে নিহত অথবা অপহৃত করিতে আততায়ী আসিয়াছে বুঝিতে পারিলে, মহারণ্যমধ্যে ব্যাঘ্রী যেরূপ বিকট সংহার মূর্ত্তি ধারণ করে, অদ্য কৈকেয়ীরও সেই দশা হইয়াছে। তাঁহার সেই দারুণ রোষানলে হতভাগ্য দশরথ অচিরে শুষ্কতৃণের মত ভস্ম হইয়া গেলেন।

কৈকেয়ীর সুদারুণ অধ্যবসায়ের ফলে রামচন্দ্রের নির্ব্বাসন হইয়া গেল এবং পুত্রগতপ্রাণ বৃদ্ধ নরপতি "হা রাম, হা লক্ষ্মণ, হা সীতে" বলিতে বলিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। রামায়ণের এই স্থানে পাষাণভেদিনী করুণ রস-স্রোতস্বিনী অবিরাম গতিতে বহিয়া গিয়াছে। মন্থরা, দশরথ এবং কৈকেয়ীর কথোপকথন, লক্ষ্মণ ও

যাবদাবর্ত্ততে চক্রং তাবতী মে বসুন্ধরা ॥ ৩৬ ॥
দ্রাবিড়াঃ সিন্ধুসৌবীরাঃ সৌরাষ্ট্রাঃ দক্ষিণাপথাঃ।
বঙ্গাঙ্গমগধা মৎস্যাঃ সমৃদ্ধাঃ কাশি কোশলাঃ ॥ ৩৭ ॥
তত্রজাতং বহুদ্রব্যং ধন ধান্যম জাবিকম্।
ততো বৃণীষ কৈকেয়ি যদ্ যত্বং মনসেচ্ছসি ॥ ৩৮ ॥
দশম সর্গ,, অযোধ্যাকাণ্ড। (বঙ্গবাসী)

সুমিত্রার নিঃস্বার্থ আত্ম-বিনিয়োগ, কৌশল্যার বিলাপ, সকলই উচ্চশ্রেণীর নাট্যকাব্যের উপযুক্ত। আদি কবি ভগবান্ বাল্মীকির লেখনী এখানে প্রকৃতই এরূপ করুণ রসের প্রবাহ বহাইয়াছেন যাহাতে বজ্রেরও হৃদয় দ্রব হয় এবং পাষাণও হাহাকারে কাঁদিয়া উঠে। যাঁহারা রসপিপাসু, এবং কাব্যামোদী, তাঁহারা ইহার উপভোগে চরিতার্থ হইবেন, সন্দেহ নাই।

সংক্ষেপে আমরা কৈকেয়ী চরিত্র বিবৃত করিলাম। তিনি নির্দ্দোষ, এরূপ কথা আমরা বলি না। তবে তাঁহার চরিত্র আদ্যোপান্ত পর্য্যালোচনা করিলে, তাঁহার পিতা, মাতা, দেশ, কাল, সখী, ও স্বামীর বিষয় বুঝিয়া দেখিলে, তাঁহার দোষের মাত্রা অনেক লঘু হইয়া পড়ে। আমাদের বিশ্বাস যে, দশরথের মত শিথিলচরিত্র ও কামাতুর স্বামীর হস্তে না পড়িলে, তাঁহার চরিত্রে কলঙ্কের ছায়া স্পর্শ করিতে পারিত না। দশরথ সার্দ্ধ ত্রিশতাধিক স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়া অযোধ্যার অন্তঃপুরে বিষবৃক্ষের যে উদ্যানের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, নিজেই কেবল তাহার ফলভোগে অপমৃত্যু লাভ করেন নাই, তাঁহার পুত্র, পত্নী, পরিজন, প্রজা, মন্ত্রী ও পুরোহিত, অধিক সাম্রাজ্যের সকলেই, তাঁহার সেই অপরাধের ফলভোগে অসুখী হইয়াছিলেন। কৈকেয়ীপুত্র মহাত্মা ভরত নীলকণ্ঠের মত অঞ্জলি পুরিয়া সেই বিষ পান করিয়া তবে সাম্রাজ্যে শান্তি স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। যে মহাপ্রাণা মহিলা ভরতের মত নররত্নের জননী, তাঁহার হৃদয় যে রত্নাকর সদৃশ, তাহাতে সংশয় নাই। তবে দশরথের ভাগ্যদোষে, সে রত্নাকর হইতে বিষেরই উদ্ভব হইল। তাঁহার কলঙ্কের কারণ, তাঁহার স্বামী; এ সম্বন্ধে মহর্ষি মনুর বাণী স্মরণ করিয়া আমরা অদ্য বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

"যাদৃগ্‌গুণেন ভর্ত্রা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি।
তাদৃগ্‌গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা ॥ ২২ ॥
মনু সংহিতা, নবম অধ্যায়।

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

পঞ্চ প্রদীপ।

বিরহী।

ছটফট সব কাল, হীন বেশ, প্রাণমন জঞ্জাল, সব শেষ;
টলমল বিশ্বাস, ঘুম কম, ধড়ফড় নিশ্বাস, নির্ম্মম;
প্রাণহীন, দূর-দূর, সব পর, নির্জ্জন চক্ষুর ঝরঝর;
খুব সাধ ভুলবার, চুলবুল, দিনরাত 'দূর ছাই', নাই ভুল।

বিরহিণী।

জানালার পাশে বসা, দুই চোখ ছল্-ছল্;
বুকের বসন খসা, দুর্ব্বল চঞ্চল!
পথে আঁখি ফেলে রাখা, লাজহীন উন্মন;
ম'রে গিয়ে বেঁচে থাকা, সেই মুখ চিন্তন!!

হিন্দু পরিবার।

'শ্বউরের' চুপ্-চাপ্, 'শাউরীর' দুব্-দাপ্,
দিন রাত বউদের কান্না;
তারপর ভাই ভাই, দূর-দেশ ঠাঁই ঠাঁই,
ভিন-ভিন সংক্ষেপ রান্না!
পুত্রের প'ড়্‌বার, কন্যার ভ'র্‌বার
টঙ্কার সন্ধান, কষ্ট;
গিন্নীর ফিস্-ফিস্, কর্ত্তার কিস্-মিস্,
ডাক্তার, দেওঘর, নষ্ট!!

বালিকা মা।

একটা যেন শোক, কোকিল-কালো চুল,
কান্না-ভরা চোখ, আধেক-ফোটা ফুল;
রুগ্ন ছেলের দুখ, বুকে দুখের ভার,
দুঃখ-মাখা মুখ, জীবন আঁধিয়ার;
গণ্ড ব'সে-পড়া, শীর্ণ শরীর খানি,
কষ্টে নড়া-চড়া, কণ্ঠে বিষাদ বাণী;—
নভেল-পড়া পতি, একটা খোড়ো কাক,
যক্ষ্মা-পরিণতি, মরণ-হাঁক ডাক!

যুবতী।

অলক্তরঞ্জিত যুগলচরণ, নীলশাড়ী প্রোজ্জ্বল শরীর শোভন,
পদে পদে কম্পিত চঞ্চল বুক, চন্দ্রমা লাঞ্ছিত সুন্দর মুখ;
নর্ত্তিত নিতম্ব চুম্বিত চুল, মধুকর গুঞ্জিত চম্পক ফুল;
বর্ষার মাতোয়ারা জাহ্নবীজল, শরতের ফুটফুটে জ্যোৎস্না তরল।

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

সেকালের ঢাকা।

১৮২১ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত একখানি ভুগোলবিষয়ক পুস্তকে ঢাকা জেলার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল—সে আজ ৯০ বৎসরের কথা। এই সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া—সেকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত ঢাকার এত পরিবর্দ্ধন—এত ভাঙা গড়া চলিতেছে যে, একালের ঢাকার পার্শ্বে সে কালের ঢাকার চিত্র নিতান্ত মলিন বলিয়াই প্রতিভাত হইবে। তবে সংসারে যাহা কিছু প্রাচীন, যাহা কিছু সেকালের, ঐতিহাসিকের চক্ষে তাহাই মূল্যবান্, শিক্ষিত সমাজও তাহাই জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।—সেই সাহসেই আমরা এই স্থলে সেই বিবরণটী প্রকাশ করিলাম—

১। "ঢাকানগর, ঢাকা জালালপুর (বর্ত্তমান ফরিদপুর) ময়মনসিং, শ্রীহট্ট, বাখরগঞ্জ, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম এই সাত জেলা ঢাকা কোর্টের অন্তঃপাতী। ইহার মধ্যে ঢাকা নগরের চারিদিকের গ্রামের সহিত নিজ ঢাকা জেলা। এই ঢাকা অঞ্চল বরেন্দ্র ভুমির মধ্যে গণ্য যায়।

২। "নিজ ঢাকা জেলা"—বঙ্গদেশের পূর্ব্ব অঞ্চল। তাহার উত্তর সীমা ময়মনসিংএর সীমা লাগাও, দক্ষিণ সীমা বাখরগঞ্জের সীমা লাগাও, পূর্ব্ব সীমা ব্রহ্মপুত্র নামে প্রধান নদ, যে নদেতে ত্রিপুরা আর ঢাকা ভিন্ন হইয়া আছে, পশ্চিম সীমা ঢাকা জালালপুরের সীমা লাগাও।

৩। "তটবর্ত্মে কলিকাতা হইতে ঢাকা ৮০ ক্রোশ অন্তরে, কিন্তু নৌকা পথে যাইতে হইলে নদীর বক্রতা প্রযুক্ত ২০০ ক্রোশের ন্যূন নহে। ইংরাজী ১৬০৮ শকে নবাবী আমলে ঐ ঢাকা নগর বঙ্গদেশের প্রধান রাজধানী হইয়া ১০০ শত বৎসর পর্য্যন্ত সমভাবে ছিল, এই জন্যে ঐ ঢাকাতে আর তাহারই চারিদিকের গ্রামেতে বিবেচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ন্যূনাধিক বার লক্ষ লোক; কিন্তু হিন্দু অল্প ও মুসলমান অধিক। ঢাকার রাজধানীর পূর্ব্বে রাজমহলে ও তাহার পরে মুর্শিদাবাদে বাঙ্গালার প্রধান রাজধানী ছিল। এই জেলাতে ঢাকা ছাড়া আরও দুইটী প্রধান নগর আছে। তাহার নাম নারায়ণগঞ্জ ও স্বর্ণগ্রাম। নারায়ণগঞ্জে পনর হাজার লোক আছে, তথাকার লবণ, শস্য ও তামাকু এই সকল সামগ্রী লইয়া অনেক বাণিজ্য কর্ম্ম চলে। স্বর্ণগ্রামে খাষা (Khosa) বস্ত্র জন্মে।

৪। "এই জেলাতে ব্রহ্মপুত্র, বুড়ীগঙ্গা, দলসরাই, লক্ষী এই সকল প্রধান ২ নদী আছে।"

এই বিবরণ হইতে ইতিহাসপ্রিয় পাঠকবর্গ যে সেকালের ঢাকা জেলার ভৌগোলিক পরিচয়ের সহিত সেই ৯০ বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালা ভাষারও একটি স্বরূপ প্রতিকৃতি জানিতে পারিলেন—একথা বলাই বাহুল্য।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

নব-অনুরাগ।

তুমি এসেছ যদিগো জীবনে আমার
নব আভরণে সাজি',
তবে আদরে আমারে তোমার চরণে
লওগো টানিয়া আজি;
তোমার মধুর মন্ত্রে কর' এ
অন্তর পরিপূর,
ঘুচে যাক্ যত বিষাদ-কালিমা,
অভাব হউক দূর।

আমি তোমার ধেয়ানে রহিব মগন,
তোমারে করিব সার,
হাসি-কান্নার সলিলে ধোয়া'ব
প্রাণের সকল ভার,
তোমার চরণ করিয়া বরণ
তোমারে স'পিব প্রাণ,
তোমারে লইয়া ভুলিব জগতে
দুঃখ, সরম, মান!

তুমি আমার পানেতে হাসিয়া চাহিবে
উজলি' অমিয় আঁখি,
আমি ভুলিব আপন, বিশ্ব-ভুবন
নয়নে নয়ন রাখি;
তুমি দেখাবে আমারে কত না চিত্র,
শুনাবে কত না তান,
আমি মদির-মধুর আবেশে মজিয়া
গাহিব তোমারি গান।

তুমি এসেছ যদিগো জীবনে আমার
নব আভরণে সাজি'
তবে আদরে আমারে তোমার চরণে
লওগো টানিয়া আজি;
চাহে প্রাণ মোর তব প্রেম-ডোর,
যাচে তব মধুবাণী,
পূরাও কামনা, দেবতা আমার,
অয়ি মোর হৃদি-রাণি!

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

ডিয়োন্যুসস্ *

স্মৃতি বলিয়াছেন, মদ্য অপেয়, অদেয়, অগ্রাহ্য। ব্রহ্মহত্যা যেমন একটা বড় পাপ, সুরাপানও তেমনই। এখনও নানারূপ সভা ও সংসদ, শাস্ত্র ও নীতি এবং রাসায়নিক বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত, বৈদ্যক শাস্ত্রের নির্দ্দেশ সংগ্রহ করিয়া উপদেশ করিতেছেন, সুরা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। ইহাতে দেহের অনিষ্ট হয়, মনের অনিষ্ট হয় এবং অনাবশ্যক অর্থব্যয় বাড়ে। তথাপি পৃথিবীর বারো আনা লোকই এখনও এই জিনিসটী ত্যাগ করিতে সম্মত হয় নাই। ইউরোপের ধর্ম্মযাজকেরা সে দেশের ঠাণ্ডা হাওয়ার দোহাই দেন; আর অনেকে আবার নিষেধ বিধির প্রামাণ্যতা অস্বীকার করিয়া অভ্যাসবশে ঐ জিনিসটীর প্রতি আকৃষ্ট হন। অসুরদের সঙ্গে লড়াই করিবার সময় দেবী চণ্ডী স্বয়ং বলিতেছেন, "তিষ্ঠ তিষ্ঠ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহং'—হে মূঢ়, কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, কিছু মধু পান করিয়া লই।" লড়াইয়ের সময় স্নায়ুগুলিকে উত্তেজিত করিবার জন্য যে মধু পান আবশ্যক হয়, অধুনা সমাপ্ত যুদ্ধে জর্ম্মেণী অন্ততঃ সে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে। এই মধু যে চাক-ভাঙ্গা মধু নয়, তান্ত্রিকেরা বোধ হয় তাহা স্বীকার করিবেন। তন্ত্রে আছে,

"পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পুনঃ পততি ভূতলে।
উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে"।

ইহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে, জানি। এখানে কুলকুণ্ডলিনীর উত্থান-পতনের কথা বলা হইতেছে। কিন্তু তথাপি তান্ত্রিক পূজায় সুরা অদেয়, অগ্রাহ্য নয়। স্পষ্ট বিধান রহিয়াছে;—সুরা শোধনের মন্ত্র আছে; এখনও ইহা দত্ত হয় এবং গৃহীতও হয়। যে কর্ত্তা

* ঢাকা সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষের বংশ পূর্ব্ববঙ্গে বিদ্যমান আছে, সে সব বংশে 'মন্ত মদের মপের মগ্রাহ্যং' বিধি অনুসৃত হয় না।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করিতেছেন—'ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ' —ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করিয়া উত্থান কর; 'যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ'—নির্ভয়ে লড়াই কর। সেই সময়ে তাঁহার হাতে পান-পাত্র ছিল, এমন কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু তিনি নিজে যখন যাদবদের সঙ্গে শিশুপালের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন, তখন মাঘ-কবির মতে রৈবতক পর্ব্বতে তাঁহার বন বিহার, জল বিহার এবং রাত্রিবাস হইয়াছিল। তখন তিনি নিজে কি করিয়াছিলেন, তাহা কোথায়ও স্পষ্ট বলা না থাকিলেও যাদবেরা স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া যে মধুপান করিয়াছিল, তাহার দীর্ঘ বর্ণনা আছে।

'আচার্য্যকং রতিষু বিলসন্মন্মথ শ্রীবিলাসা,
হ্রীপ্রত্যূহপ্রশমকুশলাঃ শীধবশ্চক্রুরাসাম।—

অর্থাৎ লজ্জা প্রশমনে কুশল মন্ত যাদবনারীগণের রতিবিষয়ে আচার্য্যের আসন গ্রহণ করিয়াছিল। পুনশ্চ,—

'দত্তমিষ্টতময়া মধু পত্যুর্বাঢ়মাপ পিবতো রসবত্তাম্' —প্রিয়তমা কর্তৃক প্রদত্ত মধু পান-কারী পতির নিকট অত্যন্ত সুরস হইয়াছিল। মাঘ-কবি যদি নিতান্তই একটা অপ্রামাণ্য কথা বলিয়া থাকিতেন, যদি কৃষ্ণের জীবনচরিতে এই প্রসঙ্গ কাব্যরসিকেরা অসঙ্গত মনে করিতেন, তাহা হইলে যে 'মাঘে সন্তি ত্রয়োগুণাঃ' সেই মাঘ কবে লোপ পাইয়া যাইতেন, তাহার ঠিকানা নাই।

যদুবংশে যে মদ্যের ব্যবহার খুবই চলিত, তাহার আর একটা প্রমাণ, কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলদেব রেবতীকে যেমন ভালবাসিতেন, 'হালা'ও তেমনই ভাল বাসিতেন। এমন কি কালিদাস মনে করেন যে, বলদেব যে হালা পরিত্যাগ করিয়া সরস্বতী নদীর জলপান করিয়াছিলেন, সরস্বতীর পবিত্রতার পক্ষে ইহার চেয়ে বড় প্রমাণ আর দরকার করে না। * কারণ, সুরাত্যাগ করা বলদেবের পক্ষে একটু কঠিন।

আর যদুবংশ যে মদ্যের প্রভাবেই ধ্বংস পাইয়াছিল, তাহা ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী কবি নবীনচন্দ্র সেনও স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কৃষ্ণভক্ত ছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

শুধুই কি তাই? বৈদিক ঋষিরাও মদ্যকে অপেয় মনে করিতেন বলিয়া বোধ হয় না। মদ্য নানা জিনিস হইতেই হয় বলিয়া শুনি। যাহার মাদকতা গুণ আছে, তাহাই যদি মদ্য হয়, তবে সোমলতা হইতে যে তরল পদার্থ ক্ষরিত হইত, সেটাকে মদ্য না বলিবার কোন হেতু নাই। সোমকে লক্ষ্য করিয়া ঋষি বলিতেছেন, 'স্বাদিষ্ঠয়া মদিষ্ঠয়া পবস্ব সোম ধারয়া'—হে সোম, তুমি অতিশয় স্বাদু এবং অতিশয় মাদক ধারায় ক্ষরিত হও। সুতরাং সোমলতা হইতে যাহা তৈয়ার হইত, তাহাকে অরিষ্টই বলি, আর যাই বলি, তাহার মাদকতা স্বীকৃত হইয়াছে। এই জিনিসটীকে ঋষিরা কেমন শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, সামবেদের 'পাবমানং পর্ব্ব' তাহারই প্রমাণে ভরা।

শুধু শতাব্দ গণনা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই যে এসব ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা নয়; ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে একজন জার্ম্মেণ অধ্যাপক (Treitschke) বলিতেছেন, 'সজীব, উদার সভ্যতার পক্ষে মদ্য নিশ্চয়ই একটা অত্যাবশ্যক অঙ্গ'। দেশের হাওয়ার সঙ্গে সেদেশের লোকের চরিত্রের কেমন নিকট সম্বন্ধ, সেই কথা বলিতে গিয়া ট্রাইট্‌চ্‌কে ইংলণ্ডের দিকে দৃক্‌পাত করিয়াছেন। তাঁহার নিজের কথার ইংরেজী অনুবাদ এইঃ—

'The misty,foggy climate has had a by no means favourable effect upon the inhabitants of England; in London there are times when

* হিত্বা হালামভিমতরসাং রেবতীলোচনাঙ্কাং। বন্ধুপ্রীত্যা সমরবিমুখো লাঙ্গলী যাঃ সিষেবে।৪৯। পূর্ব্বমেঘ।

in a thick fog the spleen lies in the air. Besides, the country lacks wine and *wine is undeniably an important factor in a cheerful, liberal culture.* * অর্থাৎ ইংলণ্ডের অধিবাসীদের উপর সে দেশের কুজ্ঝটিকাময় হাওয়ার প্রভাব বড় ভাল হয় নাই। লণ্ডনে ঘন কুয়াশায় এমন অনেক সময় হয় যে, হাওয়ার ভিতরই এমন একটা কিছু থাকে যাহাতে আপনা হইতেই মন খারাপ হইয়া যায়। অধিকন্তু সে দেশে মদ নাই; একটা সজাব, উদার সভ্যতার পক্ষে মদ খুবই দরকার।

অপিচ, "The climate, the lack of wine and of beauty of scenery have indisputably had an unfavourable effect upon English culture. While the English can exhibit a truly great literature, they have never achieved anything outstanding in music or in the fine arts. * অর্থাৎ ইংলণ্ডের হাওয়া, সে দেশের মদ্যের অভাব এবং সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের অভাব—সে দেশের অধিবাসীদের উপর এ সকলের ফল যে ভাল হয় নাই, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে। ইংরেজেরা যদিও একটা অতি মহৎ সাহিত্যের অধিকারী, তথাপি সঙ্গীতে এবং ললিতকলায় তাহারা স্থায়ী তেমন কিছু করিতে পারে নাই'।

কথাটা হয়ত একেবারে মিথ্যা নয়। তবে, তাহার কারণ দেশে মদ্যোৎপত্তির অভাব, না আর কিছু, বলা কঠিন। কারণ, ইংলণ্ডে মদ্য উৎপন্ন না হইলেও সে দেশের লোকে মদ্য পান করেন না, এমন নয়। আর, আজ যদি ট্রাইট্‌চ্‌কে বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে, কি বলিতেন, ভাবিবার বিষয়।

অবশ্যই মদ্যের মধ্যে নানা জাতি আছে। অধ্যাপক ট্রাইট্‌চ্‌কেও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সেটা মাদকতার বেশ কম মাত্র। ট্রাইট্‌চ্‌কের মতে যাহা কম মাদক (wine) তাহাই গ্রহীতব্য, অত্যধিক মাদক যে মদ (Brandy), তাহা গ্রহীতব্য নহে। ইহা মাত্রা নির্দ্দেশ মাত্র, মদ্য নিষেধ নহে।

সুতরাং মদ্যের উপাসনা এখনও পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। তাহার অর্থ এই নয় যে, অতঃপর সকলকেই অবিলম্বে এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে। বেদের পরে ব্রাহ্মণ, উপনিষদ,পুরাণ,স্মৃতি হইয়া গিয়াছে; সুতরাং সোমলতার উপাসনা প্রচার করিবার সময়ও বোধ হয় চলিয়া গিয়াছে। তবে একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময়ে, আর্য্যজাতির বিভিন্ন শাখায় শুধুই যে সুরার প্রচলন ছিল তাহা নহে, ইহার প্রচুর স্তুতি ও প্রশংসাও হইয়া গিয়াছে। সমগ্র আর্য্য সভ্যতার সহিত, সমস্ত আর্য্য জাতির ইতিহাসের সহিত, ইহার একটা নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে। ইহা যদি শুধুই একটা পানীয় বলিয়া বিবেচিত হইত, যদি ইহা কখনও পূজনীয় বলিয়াও দৃষ্ট না হইত, তাহা হইলে সভ্যতার সঙ্গে ইহার সম্বন্ধের কথা বলার কোনই মানে থাকিত না। কারণ, মানুষ মাত্রেই পান-ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করে; সুতরাং খাদ্যের সঙ্গে তাহার সভ্যতা সম্পৃক্ত, একথা বলায় কোন বিশেষত্ব নাই। কিন্তু সোমলতা কিংবা দ্রাক্ষালতা কিংবা অন্যবিধ পদার্থ হইতে যে উত্তেজক পানীয় নিঃসারিত হইতে পারে, তাহাকে অনেক সময় অর্চ্চনীয় পর্য্যন্ত মনে করা হইয়াছে; এবং ইহার ফলে ধর্ম্মে ও সাহিত্যে পর্য্যন্ত ইহার একটা আসন-লাভ ঘটিয়া গিয়াছে। এমন কি, যে সংস্কৃত সাহিত্যকে আমরা হয়ত অন্য সাহিত্য হইতে একটু বেশী মাত্রায় আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ মনে করি, সেখানেও ইহার ভূয়োভূয়ঃ স্তুতিবাদ দেখা যায়। পুরাণে এবং স্মৃতিতে যাহাই হউক,—বেদে এবং কাব্যসাহিত্যে

---

* Treitschke, Lectures on Politics, Tr. by A. L. Gowens.

ইহা নিন্দিত হয় নাই। ইহা বল, বীর্য্য, ধন, আয়ুঃ সমস্তই দান করিতে পারে—ইহাই যেন বেদের বিশ্বাস। ইহা দেবতাদের পেয়, এবং দেবতার প্রসাদ হিসাবে মানুষেরও অপেয় নহে। ইহা পান করিবার জন্য দেবতারা ভূমিতে অবতীর্ণ হইতেন। তাড়কাসুর বধ করিবার জন্য বিশ্বামিত্র যখন রামলক্ষ্মণকে নিয়া যান, সেই অবস্থায় রামলক্ষ্মণের বর্ণনা করিতে যাইয়া ভর্তৃহরি বলিতেছেন, তাঁহাদিগকে তখন সোমরস পান করিবার জন্য (সোমরসং পিপাসু) মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ দুইটী দেবকুমারের মত দেখাইতেছিল। সুতরাং সুরা এখন যেমন প্রায়ই সহরের অভদ্রোচিত স্থানে গিয়া বাসা লইয়াছে, চিরকালই এমন ছিল না। বিশেষতঃ এদেশে যেমন ইহার পদচ্যুতি ঘটিয়াছে, অন্য দেশে এখনও সেরূপ ঘটে নাই।

এ দেশে অবশ্যই সুরার পূজা অতীতের কথা। গত রাত্রের দুঃস্বপ্নের মত অতীতের এই উপাসনার কথা স্মরণ করার উদ্দেশ্য অতীতকে ফিরাইয়া আনার চেষ্টা নয়। কিন্তু অতীতকে যাঁরা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মনে করেন, তাঁদের এই খানে বিবেচনা করিবার বিষয় আছে। সত্য যুগ পিছনে পড়িয়াছে, কিংবা সাম্‌নে আছে, ঠিক জানি না। সত্যযুগ অর্থে যদি এমন একটা সময় বুঝায় যখন কেহই এমন কিছু করিত না, যাহা এখন করিলে আমরা লজ্জিত হইব, তাহা হইলে সে যুগ আসিবার দেরী আছে। আর সত্যযুগ অর্থ যদি সেই সময় হয়, যখন মানুষ পাপের আতঙ্কে নিগৃহীত হয় না, তাহা হইলে সে যুগ চলিয়া গিয়াছে। এখন আমাদের পাপপুণ্যের বিচার-শক্তিটা কিছু বেশী মাত্রায় তীক্ষ্ণ হইয়াছে। সেটা লাভ কি লোকসান, ঠিক বলিতে পারি না। এখন আমাদের যত বিষয়ে জুগুপ্সা জন্মিয়াছে, এখন আমরা যত সব বিষয়কে পাপ মনে করি, তার প্রায় সবগুলিই আদি যুগের মানুষ সাধারণ আহার-বিহারের মত নির্ব্বিকার চিত্তে করিয়া গিয়াছে। যে জ্ঞান বৃক্ষের ফল খাওয়ার দরুণ বাইবেলের মতে আদমের উদ্যান হইতে বিচ্যুতি ঘটিয়াছিল, তাহা কোন বৃক্ষে ফলুক আর না-ই ফলুক, মানুষের মনে সম্যক্ পরিণত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার ফলে এখন আমরা পাপ পুণ্যের বিচার যত সূক্ষ্ম ভাবে করি, তেমন আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা—গ্রীক কবি হোমরের নরনারীরা অন্ততঃ, করেন নাই। এখন যেমন আমরা কখন পাপ করিয়া ফেলি, এই ভয়ে সর্ব্বদাই আড়ষ্ট, কলশ ভরিয়া সোমরস ক্ষরণ করিবার সময় ঋক্‌বেদের ঋষিদের মন সেরূপ হয় নাই। পাপ সম্বন্ধে একেবারে ভীতির অভাব, একেবারে বিতর্কের অভাব যদি সত্য যুগের লক্ষণ হয়, তবে সে যুগ চলিয়া গিয়াছে। লাভ হইয়াছে বলিয়া নীট্‌চে (Nietsche) অন্ততঃ বিশ্বাস করেন না; যদিও অনেকেরই মতে আমরা ধর্ম্মবুদ্ধিতে উন্নত হইতেছি, সুতরাং মোটের উপর উন্নতই হইতেছি।

সত্যযুগ অতীত হইয়া গিয়া থাকিলেও, অতীত ঠিক যেমনটী ছিল তেমনই ভাবে ফিরাইয়া আনিবার আকাঙ্ক্ষা বোধ হয় আমরা সত্য সত্যই করি না। মানুষের কর্ম্মচেষ্টার গতি অনাগতের দিকে। সুতরাং সুরাপূজা জিনিসটী যদি অতীত হইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার দিকে দৃক্‌পাতের সার্থকতা শুধু ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসার চরিতার্থতা মাত্র। আরও একটা লাভ এখানে রহিয়াছে। সুরার পূজা উপলক্ষ্য করিয়া আর্য্য জাতির যে একটা সাহিত্য উৎপন্ন হইয়াছে, যে একটী সৌন্দর্য্য তাঁদের উপাসনার ফলে সৃষ্ট হইয়াছে, সেই জিনিসটী অবহেলার যোগ্য নহে। সৌন্দর্য্য-মাত্রেরই ভিতর সামান্যতঃ এমন একটী সনাতন পদার্থ থাকে, যাহা চিরকালই উপভোগ্য।

আর্য্য জাতির এক প্রবীণ শাখা গ্রীকদের কল্পনায় সুরার একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ছিলেন, তাঁহার নাম ডিয়োন্যুসস্ (Dionysus)। গ্রীক পুরাণ মতে ইনি মানুষীর গর্ভেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, যদিও ইঁহার

জনক ছিলেন দেবরাজ জিউস্ (Zeus)। কিন্তু ইঁহার জন্ম সম্বন্ধে দুইটী বৃত্তান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। একটী কাহিনীর মতে, মানবীর গর্ভে জন্ম ইঁহার দ্বিতীয় জন্ম। প্রথমতঃ ইঁহার জন্ম হয় পার্সিফোনির (Persephone) গর্ভে। গ্রীক দেবরাজ জিউস্ আমাদের দেবরাজ ইন্দ্রেরই মত একটু বেশী পরিমাণে নারীর সম্মান করিতেন,—একটু অতিরিক্ত মাত্রায় Chivalrous ছিলেন। ফলে, দেবীকুলে এবং মানবীকুলে তাঁহার প্রণয়িনীর অন্ত ছিল না। ইন্দ্রের শচীর মত জিউসেরও প্রধানা মহিষী ছিলেন হীরা (Hera), এবং সাধারণ সাধ্বী স্ত্রীলোকের মত ইনিও স্বামীর ইতস্ততঃ যাতায়াতটা একটু কঠোর দৃষ্টিতে দেখিতেন। কাজেই জিউস্‌কে তাঁহার অসংখ্য প্রণয় ব্যাপার গোপনেই রাখিতে হইত। কিন্তু 'গুপত পীরিতি বিষম বড়;' তিনি প্রায় সর্ব্বত্রই হীরার কাছে ধরা পড়িয়া যাইতেন, এবং পরে একটা কুকাণ্ড ঘটিয়া যাইত।

পার্সিফোনির সঙ্গে তিনি ভুজঙ্গের বেশে প্রণয় চালাইতেছিলেন। কিন্তু ক্রমে ডিয়োন্যুসস্ জন্ম নিলেন—অতি সুন্দর চেহারা, সোনালি রংয়ের চুল। জন্মিয়াই তিনি পিতার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিলেন। পিতা গোপনে তাহাকে লালন করিতে লাগিলেন—পাছে বিমাতা হীরা সপত্নীপুত্রের বিনাশ সাধন করেন। একদিন জিউস্ শিবের কুঁচুনী পাড়া গমনের মত কোথায় প্রণয় করিতে যাইবেন; ছেলেটীকে একটী সুদৃঢ় কক্ষে আবদ্ধ করিয়া খেলিবার জন্য তাঁহার রাজমুকুট ও রাজদণ্ড তাহার হাতে দিয়া গেলেন। এদিকে হীরা সেই সুযোগে টাইটান্ (Titan) দিগকে পাঠাইয়া দিলেন; ইহারা খেলেনার লোভ দেখাইয়া ছেলেটীকে ভুলাইয়া আনিয়া হত্যা করিল এবং তাহার মাংসে উদরের তৃপ্তি সাধন করিল; অস্থিগুলি এপোলোর (Apollo) কাছে পাঠাইয়া দেওয়া হইল—এপোলোও জিউসের পুত্র। কিন্তু এপোলো বৈমাত্রেয় ভ্রাতার মৃত্যুতে বরং দুঃখিত হইলেন, এবং যথারীতি তাহার হাড় কয়খানিকে সমাহিত করিয়া রাখিলেন। এদিকে টাইটান্‌রা যখন ডিয়োন্যুসসের মাংসে ভোজ তৈয়ার করিতেছিল, হীরা তখন তাহাদের নিকট হইতে ডিয়োন্যুসসের হৃৎপিণ্ডটী কাড়িয়া লইয়াছিলেন; এবং জিউস্ ফিরিয়া আসিলে সংতৃপ্ত প্রতিহিংসার চিহ্ন স্বরূপ তখনও স্পন্দনশীল সেই হৃৎপিণ্ডটী নিয়া জিউসের নিকট উপস্থিত করিলেন। নিরুপায় জিউস সেই হৃৎপিণ্ডটী গ্রহণ করিলেন।

জিউসের আর এক জন মানবী প্রণয়িনী ছিলেন থিবিস-রাজ (Thebes) ক্যাডমসের (Cadmus) কন্যা সেমিলি (Semele)। জিউস্ মৃত হৃৎপিণ্ডটী মদ্যের সঙ্গে পান করিবার জন্য সেমিলিকে দিলেন। তাহা হইতে সেমিলির গর্ভ হইল, এবং ডিয়োন্যুসস্ দ্বিতীয় বার জন্ম গ্রহণ করিলেন। এই হইল প্রথম বৃত্তান্ত।

দ্বিতীয় বৃত্তান্ত অনুসারে ডিয়োন্যুসস্ একবারই জন্ম গ্রহণ করেন; এবং তাঁহার এক মাত্র জননী সেমিলি। সেমিলির সঙ্গে যে জিউসের গোপনে দেখা সাক্ষাৎ হয়, হীরা তাহা টের পান। এবং দেবরাজের সঙ্গে প্রেম করা মানবীর পক্ষে যে কত বড় ধৃষ্টতা তাহা শিক্ষা দিবার জন্য, হীরা সেমিলিকে নানা কথার ছাঁদে ভুলাইয়া বুঝাইলেন যে, সেমিলির একবার দেবরাজকে দেবরাজরূপে—যে রূপে হীরা তাঁহাকে দেখেন সেই রূপে, দেখিতে চাওয়া উচিত। দেবরাজ সেমিলীর সে প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন; কিন্তু দেবরাজের বজ্রের তেজ, তাঁহার বিদ্যুতের চকিত স্ফুরণ, মানবী সেমিলি সহ্য করিতে পারিলেন না; তাঁহার অকাল মৃত্যু হইল, এবং অকালে ডিয়োন্যুসস্ প্রসূত হইলেন। জিউস্ ছেলেটীকে তৎক্ষণাৎ তাঁহার জঙ্ঘাদেশে লুকাইয়া রাখিলেন। পরে যথা সময়ে পরিপূর্ণদেহ ডিয়োন্যুসস জন্ম গ্রহণ করিলেন এবং দেবরাজের নির্দ্দেশ অনুসারে অপ্সরাগণ

(Nymphs of Nysa) কর্ত্তৃক লালিত হইলেন।

এইভাবে যে দেবতাটী জন্মগ্রহণ করিলেন, গ্রীক কল্পনায় ইনি সর্ব্বকনিষ্ঠ দেবতা। সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র বলিয়া দেবরাজও ইঁহাকে অত্যন্ত বাৎসল্যের চক্ষে দেখেন। আমাদের অনঙ্গ ঠাকুরের মত ইনিও মানব মানবীর উপর নানা প্রকার উপদ্রব করিয়া থাকেন; কিন্তু দেবতা এবং মানুষ সকলেই সে সব নিঃশব্দে সহ্য করেন। স্বর্গে এবং মর্ত্ত্যে ইঁহার অখণ্ড প্রতাপ। একাধিক রূপে, একাধিক নামে ইনি পূজিত হইয়াছেন। গ্রীকদের কল্পনায়, তাহাদের ধর্ম্মে, তাহাদের জীবনে ইঁহার যে কত বড় স্থান, তাহা বলিয়া বুঝান কঠিন। এই কথা বলিতে গিয়াই পেটার,* লিখিয়াছেন—

"ডিয়োন্যুসসের পূজা গ্রীকদের কাছে কত বড় ছিল—এই ধর্ম্মের ভিতর যাহাদের জীবন নিহিত ছিল, তাহাদের কাছে ইহা কত বিস্তৃত ছিল, এই একটী পরিস্ফুট অথচ জটিল প্রতীকের ভিতর তাহারা কত কি দেখিত,—ইহা যদি কেহ বুঝিতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে চিন্তা করিতে হইবে, দ্রাক্ষালতা এবং পানপাত্রের মূর্ত্তিকে আশ্রয় করিয়া যে সমস্ত ভাব এবং অভিব্যক্তি সাহিত্যে উৎপন্ন হইয়াছে, সে সমস্তকেই যদি বিদ্যমান কাব্যের দেহ হইতে অপসারিত করা হয়, তাহা হইলে তাহাতে কি ক্ষতি হইবে? কত মধুর চিন্তালহরী, কত বর্ণবৈচিত্র্য, কত বস্তুবৈচিত্র্য তাহা হইলে বাদ পড়িয়া যাইবে! খ্রীষ্টান ধর্ম্মের শ্রদ্ধা-ভীতিময় ব্যাপার বিশেষের সহিত সম্পর্ক, গ্যালাহাডের (Galahad) পানপাত্রের সহিত সম্পর্ক বাদ দিলেও দ্রাক্ষালতার ফলের ছবিটী কত রকমে এই কাব্যসাহিত্য পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে!" তথাপি, এই কল্পিত ক্ষতি হইতেও চিন্তা করা যাইবে না, গ্রীকদের হৃদয়ে ডিয়োন্যুসসের প্রভাব কত বিস্তৃত ছিল!

বলাই বাহুল্য এমন যে একটী দেবতা, তাহার পূজার বিধির অন্ত নাই। ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণীবিশেষের চিন্তা ও জীবনধারার বৈশিষ্ট্য অনুসারে ইনি এক এক সময়ে একএক রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, এক এক ভাবে পূজিত হইয়াছেন।

বৃক্ষলতার যে জীবন আছে, এই বিশ্বাসটী প্রাচীন জগতের প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়। তপঃক্লিষ্ট ঋষির অনতিরঞ্জিত ভাষায়

'অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ ;—

বৃক্ষলতার ভিতরেও সংজ্ঞা আছে, ইহাদেরও বেদনা বোধ আছে। এই কথাটীকেই কবিত্বময়, ভাবময়, মধুরতাময় করিয়া কবি কালিদাসের তুলিকা ফুটাইয়া তুলিয়াছে। শকুন্তলা লতিকা বনজ্যোৎস্নাকে অপত্যের মত ভাল বাসিতেন, সেটা তেমন বেশী কিছু নয়। কিন্তু শকুন্তলা যখন পতিগৃহে যাত্রা করেন, তখন যে সব বস্ত্র ভূষণে তাঁহাকে সাজানো হইয়াছিল, সে গুলিকে আশ্রম বাসিনীরা বৃক্ষলতার দান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনিন্দ্য সুন্দরী শকুন্তলাকে যাহাতে আরও সুন্দর দেখায়, সেই জন্য বৃক্ষসকল সে দিন কতই না ফুল দিয়াছিল! শকুন্তলার চরণপদ্ম যাহাতে রঞ্জিত হয়, সেজন্য বৃক্ষ সে দিন কতই না লাক্ষারস দান করিয়াছিল।

বৃক্ষলতার সজীবতায় এই যে অতি প্রাচীন বিশ্বাস, ডিয়োন্যুসস্ পূজায় প্রথমে তার বেশী কিছু দেখা দেয় নাই। বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষলতা, এবং বৃক্ষলতায় যে পত্রপুষ্পের উদ্গম হয়, আমরা হয়ত তাহাতে একটা রাসায়নিক ক্রিয়া বা বিক্রিয়া মাত্র দেখি। কিন্তু ইহারই ভিতর প্রাচীনদের কবিচক্ষুঃ একটা জীবনের, একটা প্রাণের সঞ্চার দেখিত! ইহারই গ্রীক নাম ডিয়োন্যুসস্!

বৃক্ষলতার নিকট হইতে মানুষ শুধু শকুন্তলাকে সাজাইবার জন্য পুষ্প, স্তবক ও লাক্ষারসই কেবল গ্রহণ করে না; মানুষের কান্তি, পুষ্টি, তৃপ্তি—তাহার সমগ্র জীবন, কত উপাদানের জন্যই না বৃক্ষলতার নিকট ঋণী! সুতরাং নিশ্চল, নির্ব্বাক্ উদ্ভিজ্জ জগতের ভিতর যে একটা প্রাণ, সেটা ত একটা কম বিরাট ব্যাপার নয়! ইহারই নাম ডিয়োন্যুসস্।

* Walter Pater, *Greek studies.*

যে ব্যক্তি দ্রাক্ষার চাষ করে, দরজার সামনে দিনে দিনে পরিবর্দ্ধমান দ্রাক্ষালতাটী তাহার কতই না উৎকণ্ঠার, কতই না যত্নের জিনিস! দিনে দিনে ইহার বৃদ্ধি হয়, দিনে দিনে ইহার পুষ্টি হয়, আর কল্পনার চক্ষে চাষী ইহার শেষ পরিণতির কতই না মধুময় একটী চিত্র দেখিতে পায়! যে দেবতা ইহার ভিতর বিচরণ করেন, যে দেবতা ইহাকে রসে পরিপূর্ণ করেন, যে দেবতা ইহাহইতে উপলব্ধ তৃপ্তির প্রাণ,—তিনিই ডিয়োন্যুসস্।

ডিয়োন্যুসস্ দ্রাক্ষার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; কিন্তু শুধু দ্রাক্ষা কেন? সমস্ত উদ্ভিজ্জ জগৎইত মানুষের কান্তি পুষ্টির সহায়ক; সুতরাং ডিয়োন্যুসস্ সমগ্র উদ্ভিজ্জ জগতেরই অধিষ্ঠাতা। তথাপি বিশেষভাবে দ্রাক্ষাই তাঁহার আসন। দ্রাক্ষার ভিতর যত আনন্দ আছে, যত উৎসাহ আছে, যত তৃপ্তি আছে, আর কোন্ লতায় তাহা আছে, আর কোন্ বৃক্ষ তাহা দিতে পারে?

উদ্ভিদ্ হইতে শস্য হয়, উদ্ভিদ্ হইতে তৈল হয়, উদ্ভিদ্ হইতে সুরা হয়। উদ্ভিদের দেবতা ডিয়োন্যুসস্ সুতরাং এ সকলেরই দেবতা। শুধু তাই নয়; উদ্ভিদ্ যে প্রকৃতির শোভা ও সম্পদ, সেই প্রকৃতি হইতে মানুষ মধু পায়, দুগ্ধ পায়, জল পায়; এ সকলও সুতরাং ডিয়োন্যুসসেরই দান।

বৃক্ষ লতাকে আশ্রয় করিয়া আরও কত দেব দেবী রহিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই ডিয়োন্যুসসের সঙ্গী, তাঁহার অনুচর। বৃক্ষবিশেষ হইতে বাঁশীর জন্ম হয়; বাঁশীর সঙ্গীতে যে আনন্দ আছে, তাহা তাঁহার অনুচরের দান, সুতরাং তাঁহারই।

বিদ্যুতের অগ্নিস্পর্শে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়—অগ্নির ভিতর তাঁহার জন্ম। সুতরাং মরুতে যে শ্যামলতা, কঠোর হইতে যে কোমলের উৎপত্তি, ডিয়োন্যুসস্ তাহারও দেবতা। পত্রে, পুষ্পে, ফলে যে আনন্দ, যে ভোগ রহিয়াছে, তাহার জন্মের জন্য জননী নিসর্গ রাণীকে কতই না গর্ভ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ডিয়োন্যুসস্ জননীও সেরূপ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিলেন। সেমিলির গর্ভে ডিয়োন্যুসসের উৎপত্তি; সেমিলিই প্রকৃতি; সুতরাং প্রকৃতির ভিতর যত আনন্দ, ডিয়োন্যুসস্ তাহাই।

জিউস্ ইঁহার পিতা। জিউস্‌কে? অনন্ত, উন্মুক্ত আকাশ—বেদের দ্যৌঃ। পিতা, অকালে প্রসূত, সাত মাসের শিশু ডিয়োন্যুসস্‌কে রক্ষার নিমিত্ত অপ্সরাদের হাতে দেন। এই অপ্সরাদের কেহ থাকেন শিশিরে, কেহ থাকেন নির্ঝরিণীতে! শিশিরে, নির্ঝরে যে স্ফূর্ত্তি, যে বিকাশ, যে মধুর নবীনতা রহিয়াছে, সেই সব দিয়া যে দেবতার দেহপুষ্টি হইয়াছে, তিনিই হইলেন ডিয়োন্যুসস্।

এইরূপে প্রাচীন গ্রীকদের কল্পনা নানা ভাবে এই দেবতাকে দেখিয়াছে, নানা ভাবে ইঁহার পূজা করিয়াছে। শুধু কল্পনায়—শুধু কাব্যেই যে তাঁহাকে নানা মূর্ত্তিতে দেখি, তাহা নয়। গ্রীকদের সময়ে এবং গ্রীকদের পরেও চিত্রে তিনি নানা ভঙ্গিতে চিত্রিত হইয়াছেন, প্রস্তর তাঁহাকে মূর্ত্তি দিতে গিয়া নানা আকার ধারণ করিয়াছে।

এই যে বহুরূপী দেবতাটী, কিরূপে ইঁহার পূজা গ্রীসে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল? গ্রীক কল্পনায় তাহারও একটা জবাব আছে, এবং সেইটাকে আশ্রয় করিয়া ইউরিপিডিস্ (Euripides)-এর লেখনী একখানি প্রসিদ্ধ নাটক সৃষ্টি করিয়াছে।

আমাদের দেশেও 'পাঁচালী' সাহিত্য ও 'মঙ্গল' সাহিত্য অনেক সময় বলিয়া দেয়, কিরূপে দেবতাবিশেষের পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। 'অন্নদামঙ্গলে' ভারতচন্দ্র বলিয়া দিতেছেন, কিরূপে অন্নদার পূজা কিংবা অন্নদারূপে ভগবতীর পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। 'চণ্ডী'তে কবিকঙ্কণ বলিতেছেন, চণ্ডীর পূজা কিরূপে প্রচারিত হয়। 'পাঁচালী'তে বলা থাকে, কেমন করিয়া লোকে

শনি বা সত্য নারায়ণের পূজা শিখিয়াছিল। কিন্তু কবিকঙ্কণ বা রায় গুণাকরের সহিত ইহার বেশী সাদৃশ্য ইউরিপিডিসের নাই। ইউরিপিডিস্ শুধুই পূজা প্রচারের কথা বলিতে চান নাই। তার ভিতর যে একটা নাটকত্ব রহিয়াছে, সেইটাই তাঁহার বস্তু; তার ভিতর দেবতার নিকট মানুষের একটা যে বিরাট পরাজয়ের কাহিনী রহিয়াছে, যে একটী মহতী শক্তির লীলা তাহাতে রহিয়াছে, এবং সেই শক্তির মহত্বের ভিতর যে একটা বিরাট সৌন্দর্য্য রহিয়াছে,—সেইটাই নাটকের আকারে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং নাটক ও পাঁচালীর সাধারণ বৈষম্য বাদ দিলেও তাঁহার সৃষ্টি এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস। ইহার ভিতর শুধুই যে পূজা প্রচারের কথা, শুধুই যে মানুষের পরাজয়ের কাহিনী রহিয়াছে, তাহাও নয়; সেই সঙ্গে যে একটা অপার সৌন্দর্য্য উৎপন্ন হইয়াছে, যেখানে সেখানে তাহার সাক্ষাৎ মিলে না।

ডিয়োন্যুস্ যে সেমিলির পুত্র, ইউরিপিডিস্ এই টুকুই মানিয়া লইয়াছেন। থিবিস্ প্রদেশে তাঁহার জন্ম, কিন্তু সেখানে কেহ তাঁহাকে চিনে না, কেহ তাঁহার পূজা করিতে জানে না। সকল দেবতারাই পৃথিবীর কোন না কোন জায়গায় পূজা পাইয়া থাকেন; কিন্তু স্বয়ং দেবরাজের পুত্র ডিয়োন্যুসসের উপাসক মানব জাতির ভিতর থাকিবে না, ইহা অসম্ভব কথা। তাই তিনি স্বয়ং পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছেন এবং যেখানে যাইতেছেন, সেই খানেই অবনত মস্তকে মানব তাঁহার উপাসনা গ্রহণ করিতেছে। তিনি লিডিয়ার (Lydia) স্বর্ণবহুল ভূমি, ফ্রিজিয়া (Prygia), রবিতাপে পরিতপ্ত পারস্যের মরুভূমি, ব্যাক্ট্রীয়া (Bactria), মিডিয়া (Media) আনন্দময় আরব দেশ, সমগ্র এসিয়া ঘুরিয়া আসিয়াছেন, এবং সর্ব্বত্রই তাঁহার পূজা গৃহীত হইয়াছে, সর্ব্বত্রই দ্রাক্ষার চাষ আরম্ভ হইয়াছে। অতঃপর তাঁহার জন্মভূমি থিবিস দেশে আগমন। তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে এসিয়া হইতে একদল মেয়েলোক। থিবিসে তাঁহার পূজাবিধি প্রচারিত হইলেই সমগ্র গ্রীস দেশ তাঁহাকে দেবতা বলিয়া জানিবে।

এই খানে ভারত বর্ষের কোন উল্লেখ নাই, তাইতে টীকাকারেরা কেহ কেহ মনে করেন, ইউরিপিডিসের ভৌগোলিক জ্ঞানে গলদ ছিল। অর্থাৎ ডিয়োন্যুসস্ ভারতবর্ষও জয় করিয়াছিলেন।

ডিয়োন্যুসস্ যখন থিবিসে আসিয়াছেন, তখন সেখানের রাজা পেন্থিউস্ (Pentheus)। পেন্থিউস্ ডিয়োন্যুসসের মাতামহ ক্যাডমাসেরই আর এক কন্যার পুত্র, অর্থাৎ ডিয়োন্যুসসের মেসতুতো ভাই। ডিয়োন্যুসসের মাসীরা তাঁহার জন্মের কথাই ভুলিয়া গেছে, পূজা ত দূরের কথা। সেই অভিমানে তিনি থিবিস্ দেশের সমস্ত নারীদিগকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহারা গৃহ ছাড়িয়া পাহাড়ে আশ্রয় লইয়াছে—সেখানে বৃক্ষলতার স্নিগ্ধ ছায়ায় ডিয়োন্যুসসের পূজা আরম্ভ হইয়াছে। আর তাঁহার সঙ্গের স্ত্রীলোকেরা পেন্থিউসের প্রাসাদের চারিদিকে বাদ্য করিয়া সমস্ত সহর তুলিয়া ধরিয়াছে।

স্বয়ং ক্যাডমাস্ তখনও জীবিত—বার্দ্ধক্য হেতু রাজ্যশাসনের গুরুভার দৌহিত্রের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন; কিন্তু ডিয়োন্যুসস্ তাঁহার দৌহিত্র হইলেও যে দেবাংশে জাত, সুতরাং পূজনীয়, তাহা তিনি জানিতে পারিয়াছেন; এবং বৃদ্ধ বয়সেও এই নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। তাঁহার আর এক সঙ্গী বৃদ্ধ টাইরেসিয়াস (Tairesias)। দুই বৃদ্ধ মৃগ চর্ম্ম পরিধান করিয়া, লতাবিশেষের মুকুট মস্তকে ধারণ করিয়া, বৃক্ষবিশেষের শাখাগ্র হাতে করিয়া, হাত ধরাধরি করিয়া পাহাড়ের দিকে যাইতেছেন, সেখানে ডিয়োন্যুসসের পূজা হইবে।

এমন সময় পেন্থিউস্ আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার প্রজাদের ভিতর, বিশেষতঃ রমণীদের ভিতর হঠাৎ এই

দুর্নীতির আবির্ভাব হইয়াছে—সেই চিন্তায় তিনি উৎকণ্ঠিত। তাঁহার মা, মাসী সকলেই এই ব্যাপারে যোগ দিয়াছেন। লিডিয়া হইতে যে কে একজন আসিয়াছে,—যে আপনাকে দেবতা বলিয়া পরিচয় দেয়—যাহার লম্বা লম্বা চুল, মদের মত গায়ের রং,—প্রেমে আঁখি ঢুলু ঢুলু—সেই ব্যক্তিই এই সব অনিষ্টের মূল। ইহাকে ধরিবার জন্য চারিদিকে লোক প্রেরিত হইয়াছে ; এবং যে সব মেয়েলোক ইহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া আপাততঃ কারাগারে রাখা হইতেছে, বিচার পরে হইবে। কিন্তু এ কি ? বৃদ্ধ মাতামহ স্বয়ং ক্যাড্‌মাস যে ঐ পূজার বেশ ধারণ করিয়াছেন ? বৃদ্ধ টাইরেসিয়স্‌ও যে ! বার্দ্ধক্য ইঁহাদিগকে রক্ষা করিল, নইলে এতক্ষণ ইঁহারা কারাগারে যাইতেন !

বৃদ্ধ টাইরেসিয়স্‌ তখন বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন যে, পেন্‌থিউস্‌ বড় অধর্ম্ম করিতেছেন। দেবতার বিরুদ্ধে এরূপ অশ্রদ্ধা প্রকাশ উচিত নয়। কে বলে, ডিয়োনিসস্‌ দেবতা নন ? আসলে ত দুই জন মাত্র দেবতা ; এক, ডিমিটির (Demeter) বা ধরিত্রী—যিনি মানুষকে ধারণ করিয়া আছেন এবং তাহাকে পোষণ করেন ; আর, ইনি ডিয়োন্যুসস্‌—যিনি মানুষের জন্য আদ্র পানীয় আবিষ্কার করিয়াছেন ; এই পানীয় মানবের দেহে সঞ্চারিত হইলে তাহার দুঃখের অবসান হয়, সে নিদ্রার ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করে এবং সকল কষ্ট ভুলিয়া যায়। দুঃখের আর এমন ঔষধ কি আছে ?

কিন্তু পেন্‌থিউস্‌ তাহা মানিতে রাজী নন। সুরার ঢেউ যখন রমণীর দেহে বহিতে থাকে, তখন যাহা হইতে পারে তাহাকে সৎ মনে করা কঠিন। সুতরাং চারিদিকে উন্মত্ত নারীদিগকে ধরিয়া আনিবার জন্য লোক প্রেরিত হইল। বৃদ্ধেরা রাজাকে দেবতার বিরুদ্ধে লড়াই করিতে মানা করিয়া প্রস্থান করিলেন।

এমন সময় চর আসিয়া খবর দিল, যে সকল রমণীকে কারাগারে আবদ্ধ করা হইয়াছিল, তাহারা ডিয়োন্যুসসেরই আর এক নাম 'ব্রোমিও, ব্রোমিও' বলিয়া ডাক দেওয়া মাত্রই আপনা হইতেই কারাগৃহের অর্গল খসিয়া পড়িয়াছে ! এবং তাহারা সকলেই পলায়ন করিয়াছে ! 'যে ব্যক্তি এই সব আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটাইতেছে, এই তাহাকে ধরিয়া আনিয়াছি'—এই বলিয়া দূত স্বয়ং ডিয়োন্যুসস্‌কে উপস্থিত করিল।

পেন্‌থিউস্‌ তখন ডিয়োন্যুসস্‌কে অনেক কটূক্তি করিলেন ? অমন নাদুস্‌ নুদুস্‌ চেহারা ! কখনও শারীরিক ব্যায়াম করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না ; লম্বা লম্বা চুল ! কন্দর্পের ছায়া যেন সমস্ত দেহে জড়াইয়া রহিয়াছে ! পেন্‌থিউস্‌ কহিলেন, 'হে বিদেশী, কেমন তোমার তথাকথিত দেব ! কেমন তাহার পূজা পদ্ধতি ? সূর্য্যালোকে কেন তাহার পূজা হয় না ! চুল কেন লম্বা রাখিয়াছ ? বুঝিয়াছি, অন্ধকারের, ছায়ায় তুমি সুন্দরীদের রূপ ভোগ করিয়া লও !'

গুপ্তবেশী ডিয়োন্যুসস্‌ উত্তর করিলেন 'আমি ডিয়োন্যুসসের পূজক। লিডিয়া আমার জন্মভূমি। ডিয়োন্যুসস্‌ স্বয়ং আমাদিগকে এই পূজা শিখাইয়াছেন। তিনি জিউসের পুত্র। অন্ধকারে তাঁহার পূজা হয়, কেননা অন্ধকার যে পবিত্র ! লম্বা চুল রাখি, কারণ, উহা দেবতার নামে মানত : অদীক্ষিতের কাছে তাঁহার পূজাবিধি প্রকাশ করা যায় না' !

পেন্‌থিউস্‌ উত্তর করিলেন, 'জিউস্‌ কি আবার নূতন দেবতার জন্ম দিতে আরম্ভ করিলেন ?

হুকুম হইল, ডিয়োন্যুসস্‌কে কারাগারে রুদ্ধ করিতে হইবে।

এসিয়া হইতে আগত রমণীরা ডিয়োন্যুসসের আদেশে মশাল হাতে করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। ভীষণ বাদ্য হইতে লাগিল। পেন্‌থিউসের রাজপ্রাসাদ কাঁপিয়া উঠিল, জলিয়া উঠিল, ভূমিসাৎ হইল ! ডিয়োন্যুসস্‌ কারামুক্ত হইলেন !

উন্মত্তপ্রায় পেন্‌থিউস্‌ ছুটিতে ছুটিতে আবার তাঁহার

সাক্ষাৎ পাইলেন! এমন সময় কিথাইরন্ পাহাড় হইতে লোক ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, সেখানে পূজা হইতেছে। সহরের সমস্ত রমণীরা সেখানে আছেন। পেন্‌থিউসের জননী স্বয়ং সেখানে রহিয়াছেন। সে কি বিস্ময়ের ব্যাপার! বিচিত্র মৃগচর্ম্ম ইহাদের পরিধান। সর্প তাহাদের কটিবন্ধ—সেই সর্প আবার মুখ বাড়াইয়া তাহাদের গণ্ডদেশ লেহন করিতেছে! যে সকল নবপ্রসূতী শিশু সন্তান ফেলিয়া গিয়াছে, এবং দুধে যাহাদের বুক ভরিয়া উঠিতেছে, তাহারা বন্য হরিণ-শিশু কিংবা ব্যাঘ্রশিশুকে কোলে লইয়া তাহাকেই দুধ দিতেছে। মাথায় তাহাদের লতার মুকুট, হাতে বৃক্ষবিশেষের শাখা। যখন তাহাদের পিপাসা হয়, তখন আঙুল দিয়া মাটী খুঁড়িলেই দ্রাক্ষার স্রোত বহিতে থাকে, বৃক্ষের শাখা হইতে মধুর ধারা ক্ষরিত হয়। সে দৃশ্য দেখিলে আপনা হইতেই এই নূতন দেবতার প্রতি ভক্তি উদিত হয়। যাহারা ইহাদিগকে ধরিয়া আনিতে গিয়াছিল, তাহারা ইহাদের শক্তি দেখিয়া পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছে। ইহাদের গাছের ডাল ছাড়া কোন অস্ত্র নাই; কিন্তু হাতে ছিঁড়িয়া বড় বড় ষাঁড় পর্য্যন্ত চক্ষের নিমিষে মারিয়া ফেলিতেছে। এমন যে শক্তিদাতা দেব, তাহার পূজা গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ দুঃখহারী দ্রাক্ষালতা ইহাঁরই দান বলিয়া শোনা যায়। দ্রাক্ষারস না হইলে প্রেম হয় না, ইহা না হইলে কোন তৃপ্তিই মানুষের হয় না। সুতরাং ডিয়োন্যুসস্ অপূজ্য নহেন, অন্য কোন দেবতা হইতে তিনি হীন নহেন।

কিন্তু পেন্‌থিউস্ ভীত হইলেন না, তাঁহার মতি ফিরিল না। তিনি সৈন্যগণকে সজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন, স্বয়ং রমণীদের বিরুদ্ধে অভিযান করিবেন। ছদ্মবেশী ডিয়োন্যুসস্ আবার তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পেন্‌থিউস্‌এর দেবতা-বিদ্বেষ অটল। সুতরাং অতঃপর—তাঁহার বিনাশ না হইলে দেবতার পূজা প্রচারিত হয় না। ডিয়োন্যুসস্ তাঁহাকে বুঝাইলেন, সৈন্য সমভিব্যাহারে নারীর বিরুদ্ধে অভিযান লজ্জার কথা; তিনি স্বয়ং একবার গিয়া দেখিয়া আসুন ব্যাপার খানা কি, তারপর কর্ত্তব্য বিধান করিবেন। কিন্তু তাঁহার গুপ্ত বেশে যাওয়া উচিত, নইলে বিপদ্ ঘটিতে পারে। ক্রমে পেন্‌থিউস্ রমণীর বেশে যাইতেই রাজী হইলেন।

পাহাড়ে ভীষণ ব্যাপার সংঘটিত হইল। গুপ্তবেশে পেনথিউস্ বৃক্ষের শাখায় বসিয়া ব্যাপার কি দেখিতেছেন। এদিকে ডিয়োন্যুসসের প্রভাবে উন্মত্তপ্রায় রমণীরা তাঁহাকে পশু মনে করিয়া শাখা হইতে টানিয়া নামাইয়া ফেলিল! সহস্র নারী-হস্তের বিকট আকর্ষণে তাঁহার দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইল! তাঁহার জননী স্বয়ং তাঁহার মস্তকটা ছিঁড়িয়া লইলেন। দেবতার রোষে বিপাকে পেন্‌থিউসের জীবনলীলা সমাপ্ত হইল।

ইউরিপিডিসের নাটকখানি এই খানেই শেষ হইল না বটে, কিন্তু ডিয়োন্যুসস্ পূজার পথ পরিষ্কৃত হইল। তাঁহার একমাত্র বিরোধী অন্তর্হিত হইল।

এইখানে ডিয়োন্যুসসের পূজা প্রবর্ত্তনের এবং সেই পূজার বিধির একটা বৃত্তান্ত পাইলাম। বলা বাহুল্য, ইহার প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিই যে ঐতিহাসিক সত্য, এমন নহে। ডিয়োন্যুসসের পূজা কোথা হইতে গ্রীসে গিয়াছিল, তাহা প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুসন্ধানের একটা বিষয়। ইউরোপেও প্রত্নতাত্ত্বিক আছেন; তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়াছেন, এই পূজা লিডিয়া, না ফ্রিজিয়া না থ্রেস্ হইতে গ্রীসে গিয়াছিল। কিন্তু সে প্রশ্নের উত্তর যাহাই হউক না কেন, এই পূজা গ্রীকেরা করিত; এবং এই পূজা ছিল,—'the widest and best worship known to the best spirits in the best days of the best community of Hellas.'—গ্রীস দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্প্রদায়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দিনের সকলের চেয়ে উত্তম ব্যক্তিদের মধ্যে সকলের চেয়ে বেশী প্রচলিত এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূজা।

তার পর? তার পর অনেক দিন গিয়াছে। অনেক

বাত্যা বহিয়াছে, অনেক নদী সমুদ্রে মিশিয়াছে। আনন্দ যখন সংযমের রশ্মি ছিঁড়িয়া যায়, তখন যাহা হয়, গ্রীকদের ডিয়োন্যুসস্ পূজায়ও তাহাই হইয়াছিল। পেন্থিউসের আশঙ্কা একেবারে ভিত্তিহীন ছিল না। তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ফল হয় নাই। যিনি ছিলেন আনন্দের দেবতা, জীবনের অধিষ্ঠাতা, ফূর্ত্তির দাতা, কতক গুলি বীভৎস নৃত্য, বীভৎস সঙ্গীত, বীভৎস ক্রিয়াকাণ্ড তাঁহাকে দানবে পরিণত করিয়া দিল। ভারতে তান্ত্রিক পূজার বিকৃতি হইয়াছিল, ডিয়োন্যুসসের ইতিহাসেও সেই ইতিহাসের পুনরুক্তি রহিয়াছে।

সেই গ্রীস আর নাই, সে দিনও নাই। পশ্চিমে বিশ্বজয়ী রোমের নবীন জীবন আরম্ভ হইল। তাহার বিপুল অস্ত্রের আঘাতে গ্রীসের রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যাহত হইয়া গেল। তার পর, জুড়িয়ার একটী ক্ষুদ্র নগরে একটী দরিদ্র পরিবারের গৃহ আলোকিত করিয়া একটী শিশু জন্ম গ্রহণ করিল! বিশ্ববাসীর জন্য সে এক নূতন বার্ত্তা আনিয়াছিল। আপনার হাতে গড়া, আপনার কল্পনার সৃষ্টি দেবতার চরণে মস্তক লুটাইতে মানুষ আর চাহিল না! শুধু শিল্প ও কাব্যে তাঁহাদের অক্ষয় চরণ-চিহ্ন রাখিয়া দেবতারা একে একে নিরুদ্দেশ হইয়াছেন! যেখানে গাছের ছায়ায়, ঝরণার কল নিনাদে, পাহাড়ের গাম্ভীর্য্যে, হাওয়ার আনন্দে, আকাশের নীলিমায়, সমুদ্রের বিশালতায়, দেবতাদের লীলা হইত,—সেখানে কোন্ সুদূর, অতীত নিশার সুখস্বপ্নের মোহ-মদিরাময় স্মৃতিটুকু মাত্র জড়াইয়া রহিয়াছে! ইউরোপে এখন এক বিরাট দৈত্য রাজত্ব করিতেছে, তাহার নাম বিজ্ঞান।

ডিয়োন্যুসস্ সুতরাং আর নাই! তাঁহার স্মৃতি রহিয়াছে; আর রহিয়াছে যাহাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার দেবত্ব বিকশিত হইয়াছিল, সেই দ্রাক্ষা। এখনও স্পেনে, ফ্রান্সে, ইটালিতে—দ্রাক্ষার চাষ হয়; এখনও দ্রাক্ষা লতাইয়া লতাইয়া গৃহের প্রাঙ্গণে, পাহাড়ের গায়ে বাড়িয়া উঠে; এখনও দ্রাক্ষার ফল হয়; এখনও সে ফলে রস সঞ্চিত হয়; এবং এখনও সে রসে আনন্দ ও হাসি আছে। ডিয়োন্যুসস্ নাই বটে, কিন্তু এখনও কবি অকবি অনেকেই কীট্‌স্ (Keats) এর ভাষায় বলিয়া থাকেন—

O! for a beaker full of the warm south!

এখনও দক্ষিণদেশে, ইংলণ্ডের দক্ষিণে স্পেনে, ফ্রান্সে ও ইটালিতে যে তীক্ষ্ণবীর্য্য জিনিসটী উৎপন্ন হয়, তাহার এক পেয়ালার জন্য দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে।

তবে দেবতাটীকে তাড়াইয়া আমাদের লাভ হইল কি? দেবতার অপমৃতির সঙ্গে সঙ্গে যদি ব্যাপারটীও শেষ হইয়া যাইত, তাহা হইলেই এক কথা হইত। কিন্তু যে ব্যাপারটী জীবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল না, তাহার দেবতাকে সরাইয়া তাহাকে প্রাণহীন ও শ্রীহীন করা হইয়াছে ভিন্ন আর কি লাভ আমাদের হইয়াছে? যীশু স্বয়ং সুরা পান করিতেন, সুতরাং ইউরোপ উহা ত্যাগ করিবার কোন হেতু পায় না। এবং খ্রীষ্টান ধর্ম্মের ব্যাপার বিশেষে উহার পবিত্রতাও হয় ত এখনও রক্ষিত হইয়াছে;—স্বাস্থ্য পানের নিয়মে ইউরোপ ইহাকে এখনও ভদ্র করিয়া রাখিয়াছে; কিন্তু সে প্রাচীন সৌন্দর্য্যটুকু কি এখনও আছে?

খণ্ডকাব্য মেঘদূত।

"খণ্ডকাব্যং ভবেৎ কাব্যস্যৈকদেশানুসারি চ।"

খণ্ডকাব্যের এই লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াই সাহিত্যদর্পণ প্রণেতা বিশ্বনাথ কবিরাজ উহার উদাহরণ দিতেছেন "যথা মেঘ দূতাদি।" উদাহরণে 'আদি' শব্দের প্রয়োগ থাকায় টীকাকার বলিতেছেন—কেবল যে মেঘদূত প্রভৃতিই খণ্ডকাব্য তাহা নহে "আদিপদেন ঋতুসংহার-প্রভৃতীনামপি গ্রহণম্।" অতএব দেখা যাইতেছে যে, মেঘদূত ছাড়া কালিদাসের ঋতুসংহার প্রভৃতি আরও দুই একটী কাব্যকে খণ্ডকাব্য আখ্যা প্রদান করা যায়।

মেঘদূতের অনুকরণে অপর কেহ কেহ 'কোকিল দূত,' 'পিকদূত,' 'পদাঙ্কদূত,' 'বাতদূত' 'হংসদূত' ও 'উদ্ধবসন্দেশ' প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামধেয় বিভিন্ন খণ্ডকাব্য রচনা করিয়াছেন। এতন্মধ্যে দুই একখানা কাব্য যে প্রশংসার যোগ্য না হইয়াছে, তাহা নহে; তবে কালিদাসের মেঘদূতের নিকট অন্যান্য 'সকল দূতই' হীনপ্রভ প্রতীয়মান হয়। অনেকের ধারণা, কোনও একখানা আদর্শের অনুকরণ হইলে সেই অনুকৃত জিনিষখানা আদর্শকেও ডিঙ্গাইয়া যায়। প্রমাণস্বরূপ তাঁহারা ভারবি ও মাঘের কাব্যের উল্লেখ করেন। ভারবি কবির কিরাতার্জ্জুনীয়ের অনুকরণে 'শিশুপালবধ' রচনা করিয়া মাঘ কবি নাকি ভারবিকেও অতিক্রম করিয়াছেন। এই কথা কতদূর সত্য তাহা আমরা এই স্থলে প্রমাণ প্রয়োগ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে ইচ্ছা করি না; কেননা উহা আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় নহে। মাঘের ভক্তগণ মাঘ কবিকে শুধু—

"ভারবের্ভা রবের্ভাতি যাবন্মাঘস্য নোদয়ঃ।
উদিতে নৈষধে কাব্যে ক মাঘঃ ক চ ভারবিঃ॥"

এইরূপ প্রশংসা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহারা "মাঘে সন্তি ত্রয়ো গুণাঃ" এই শ্লোক রচনা করিয়া, কালিদাস, ভারবি, ও শ্রীহর্ষ এই তিন কবির গুণরাশি একমাত্র মাঘ কবিতে বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া প্রকাশ করেন। কিন্তু যাঁহারা গুণগ্রাহী, যাঁহাদের বিচার ক্ষমতা সুতীক্ষ্ণ, তাঁহারা পরক্ষণেই বলিয়া উঠিলেন যে—

"ভারভী ভারবের্ভাতি যাবন্মাঘস্য নোদয়ঃ।
উদিতে তু পুনর্মাঘে ভারবের্ভা রবে রিব॥"

প্রস্তাবিত খণ্ড কাব্যগুলি সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা। যদিও সকলেই মেঘদূতের অনুকরণ করিয়াই অপরাপর খণ্ডকাব্য রচনা করিয়াছেন, তথাপি উহাদের মধ্যে কোন খানাই আদর্শকে অতিক্রম করিতে পারে নাই, এমন কি সমকক্ষও হইতে পারে নাই। খণ্ড কাব্যের আলোচনায় 'পদাঙ্কদূত' ও 'পিকদূত' প্রভৃতি হইতে দুই চারিটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া 'মেঘদূতের' শ্লোকের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখাইলেই বোধ হয় কোন্ খণ্ডকাব্যখানা উৎকৃষ্ট আর কোন্ খানা অপকৃষ্ট, তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে।

পদাঙ্কদূতে—

শ্রীকৃষ্ণের বিরহে শ্রীমতী রাধা অধীরা হইয়া যমুনা পুলিনে গমন করেন। সেই স্থানে কৃষ্ণের দেখা না পাইয়া কাননের পথে তাঁহার পদচিহ্ন দর্শন করতঃ উহাকেই দূতরূপে পাঠাইতে অভিলাষ করিয়া বলিতেছেন—

"চেতঃপ্রস্থাপিত মণুতয়া দৌত্যকর্ম্মোপযুক্তং
তত্রৈবাস্তে মুরহরপদস্পর্শ মাসাদ্য মুগ্ধম্।
আকাঙ্ক্ষেয়ং তনুগুরুতয়া নৈব গন্তুং সমর্থা
কোহন্যো গচ্ছেদ্ বদ মধুপুরীং গোপিকানাং হিতায়?"

হে পদাঙ্ক! দৌত্য কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত আমার মনটী আমাকে ছাড়িয়া পূর্ব্বেই আমার প্রিয় পতির নিকট গমন করিয়াছে, কিন্তু কৃষ্ণপদস্পর্শ ছাড়িয়া সে যে আর ফিরিয়া আসিতেছে না। এখন আমি কি করি কাহাকেই বা আবার দূত করিয়া পাঠাই। আমার মনের মাঝে যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া আছে, সেই আকাঙ্ক্ষাকে দূতী করিয়া পাঠাইতে পারি বটে

কিন্তু আকাঙ্ক্ষা যে স্থূল শরীর নিয়া চলিতে পারিবে না; তবে এই গোপিকার হিতের জন্ম অপর আর কে মধুপুরে যাইবে!

শ্লোকের ভাব ও তাৎপর্য্য যে হৃদয়গ্রাহী, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই; কিন্তু ভাষার হিসাবে ও সাহিত্যের তুলাদণ্ডে ওজন করিলে মেঘদূতের সহজ সরল ভাষার নিকট ইহা কিছুতেই সমভারাক্রান্ত হইতে পারে না। প্রথমতঃ প্রথম চরণের প্রথম ভাগে যতিভঙ্গ দোষ লক্ষিত হয়, যাহা মেঘদূতের সমগ্র পুস্তকে কোন শ্লোকেই দৃষ্টিগোচর হয় না। দ্বিতীয়তঃ প্রথম চরণে "অণুতয়া" ও তৃতীয় চরণে "গুরুতয়া" এই দুইটী একই ধরণের "তা" প্রত্যয়ান্ত পদ প্রয়োগে রচনা ভঙ্গীর সৌন্দর্য্য নষ্ট হইতেছে। পদাঙ্কদূতের কতিপয় স্থান সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বে সমলঙ্কৃত; এই অংশে ইহা মেঘদূত অপেক্ষা একটু বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে। পদাঙ্কদূতের

"প্রায়ঃ সত্যং মতমিদ মহো কারণং কার্য্যমেব।"
৭ম শ্লোক।

"ব্যাপ্যজ্ঞানাদ্ অকুলভুবাং ব্যাপকস্যাপিসিদ্ধৌ।"২১॥

"নাপ্রত্যক্ষং প্রমিতিকরণং বাক্যমেতন্ন মানম্। ৪৩॥"

ইত্যাদি শ্লোকে তর্কশাস্ত্রের গূঢ় চিন্তা লুকায়িত রহিয়াছে। মেঘদূতেও যে কোথাও দার্শনিক কথা একেবারেই নাই, তাহা নহে; বরং যাহা আছে, তাহা এমন ভাবেই ব্যবহৃত হইয়াছে যে, ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে উহাকে ধরিতে পারা যায় না।

"ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ ক মেঘঃ
সন্দেশার্থাঃ ক পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপণীয়াঃ।
ইত্যৌৎসুক্যা দপরিগণয়ন্ গুহ্যকস্তং যযাচে
কামার্ত্তা হি প্রকৃতিকৃপণা শ্চেতনাচেতনেষু॥"

এই শ্লোকে প্রথম দৃষ্টিতে আমরা শুধু প্রথম ও দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে দুইটী "ক" শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া বিষমালঙ্কারের ব্যবহার দেখি, অথচ শেষ চরণটীতে অতুলনীয় "অর্থান্তর ন্যাসের" সমাবেশ দেখিয়া খুব বাহবা দেই। কিন্তু এই বাহবার উপরেও ইহাতে প্রশংসার বিষয় ঢের আছে। ইহার ভিতর মেঘের জন্ম সম্বন্ধে গূঢ় দার্শনিক ব্যাখ্যা রহিয়াছে।

পিকদূতের প্রতিপাদ্য বিষয় ঠিক পদাঙ্কদূতেরই ধ্বনি প্রকাশ করিতেছে। প্রভেদ এই যে, পিকদূতের "দূত" হইয়াছে একটা কোকিল, পদাঙ্ক নহে।

"কান্তা শীর্ণা মলিনবদনা ক্ষীণচার্ব্বঙ্গযষ্টি
দীপ্তপ্রেমা সুরভিমলয়প্রাণসঙ্গা নিশান্তে।
শাখাসীনং মধুরলপিতং কোকিলং বীক্ষ্য কশ্চিদ্
ভাবাবেশা জড়িতরসনা বক্তুকামাবতস্থে॥"

কৃষ্ণ বিরহে শ্রীরাধার যে বর্ণনা করা হইয়াছে, এই বর্ণনার সঙ্গে মেঘদূতের যক্ষপত্নীর বিরহাবস্থা তুলিত হউক:—

"তাং জানীথাঃ পরিমিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ং
দূরীভূতে ময়ি সহচরে চক্রবাকী মিবৈকাম্।
গাঢ়োৎকণ্ঠাং গুরুষু দিবসেষ্বেষু গচ্ছৎসু বালাং
জাতাং মন্যে শিশিরমথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাম্॥"

এই কবিতার একদিকে যেমন বিরহের চূড়ান্ত অবস্থা সূচিত হইতেছে, অপর দিকে তেমনি কাব্যকলার সরসতায় মনোহরণ করিতেছে। বিরহবর্ণনা প্রসঙ্গেও মহাকবি উহাতে একটু রস ঢালিয়া দিতে বিস্মৃত হন নাই।

মেঘদূত কাব্যের প্রারম্ভে কবি 'কশ্চিৎ" (১) শব্দের ব্যবহার কেন করিলেন, রঘুবংশের আদিতেইবা "বাক্" (২) শব্দের প্রয়োগ করিবার কারণ কি, অথচ কুমার সম্ভব কাব্যের প্রথম শব্দটী "অস্তি" (৩) দিয়া আরম্ভ

(১) কশ্চিৎকান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ। ইত্যাদি।

(২) বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে ইত্যাদি।

(৩) অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।

করিলেন কেন, সেই বিবরণ এবং আরও অন্যান্য দুই একটী বিষয় জানিতে হইলে কালিদাসের জীবনী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা ভিন্ন আমাদের আর অন্য উপায় নাই।

অন্যান্য দেশের ভূরিশ্রুত প্রাচীন মনীষিগণের ন্যায় মহাকবি কালিদাসের জীবনবৃত্তান্তও কালের গর্ভে লুক্কায়িত রহিয়াছে। এই সম্বন্ধে প্রামাণিক কোনও ঐতিহাসিক বিবরণ এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তবে কাব্যের ভিতর অনুসন্ধান করিয়া কবির জীবনী ও চরিত্রের আভাস যতটুকু পাওয়া যায়, তাহা নিয়াই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। দেখা যাউক, এই-সকল বিষয়ের সঙ্গে প্রচলিত কিংবদন্তীর কোনও সম্পর্ক আছে কিনা? শ্রীহর্ষ প্রণীত নৈষধ চরিত গ্রন্থের প্রত্যেক সর্গের শেষেই কবির মাতা ও পিতার নাম বিদ্যমান রহিয়াছে *। কালিদাসের কোনও গ্রন্থে মাতা পিতার এমন কি বাসস্থানের নাম পর্য্যন্ত নাই। তথাপি তাঁহার বর্ণনা-প্রসঙ্গে আমরা যে সমস্ত স্থানের ও অন্যান্য দুই একটী বিশেষত্বের পরিচয় পাইয়াছি, তাহা সম্বল করিয়াই পাঠকবর্গের সমীপে উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করিতেছি।

যক্ষের পথ নির্দ্দেশ উপলক্ষে কবি কাব্যমধ্যে গিরি, নদী, বন, উপবন গ্রাম, নগর,জনপদ, দেবালয়, রাজধানী, হিমালয়, কৈলাস, অলকা ও যক্ষের আলয় প্রভৃতির, ও পরিশেষে যক্ষপত্নীর বিরহাবস্থা সহজ ও সরলভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। প্রিয়াবিরহে অধীর হইয়া যক্ষ দীর্ঘ আট মাস কাল অতি কষ্টে কালযাপন করিয়াছেন, শরীরে সেই পূর্ব্ব কান্তি নাই, 'কৃশ ও মলিন' হইয়া 'কনকবলয়ভ্রংশ-রিক্ত প্রকোষ্ঠ' হইয়া পড়িয়াছেন। তাই আজ আষাঢ় মাসের প্রথম দিনে গগনে মেঘোদয় নিরীক্ষণ করিয়া অচেতন মেঘকেই প্রিয়ার নিকট দূতরূপে পাঠাইতে 'যাচ্ঞা' করিতেছেন। যক্ষ বিরহদুঃখে বিগতচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন, এই নিমিত্তই তখন তাহার চেতন ও অচেতনে প্রভেদ জ্ঞান ছিল না, কেননা,

'কামার্ত্তাহি প্রকৃতিকৃপণা শ্চেতনাচেতনেষু।'

বিরহীর এই অবস্থা আলোচনা করিয়া টীকাকার মল্লি-নাথ বলিতেছেন যে "সীতাং প্রতি রামস্য হনুমৎসন্দেশং মনসি নিধায় মেঘসন্দেশং কবিঃ কৃতবান্ ইত্যাহুঃ।" অর্থাৎ রামচন্দ্র যেমন সীতাকে উদ্দেশ করিয়া কতগুলি ব্যথার কথা হনুমানের মারফৎ পাঠাইয়াছিলেন, তাহা মনে করিয়াই কবি পত্নীর প্রতি বিরহী যক্ষের সংবাদ প্রেরণ ছলে মেঘকে দূত করিয়া মেঘদূত রচনা করিয়াছেন। এই ধারণার স্বপক্ষে তাঁহারা মেঘদূতের অপর একটী শ্লোক উদ্ধৃত করেন।—

"ইত্যাখ্যাতে পবনতনয়ং মৈথিলীবোন্মুখী সা।"

উত্তরমেঘে ৩৭ শ্লোক।

কিন্তু আমাদের ধারণা অন্য রকম। আমরা দেখিতে পাই যে, মেঘদূতের মূল বিষয়টার সঙ্গে কবির জীবনের একটা স্পষ্ট চিত্র যেন কথায় কথায় অঙ্কিত রহিয়াছে। নিজের জীবনের ঘটনা নিয়া যে অনেক কবিই অনেক সময় অনেক কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ বিশ্বসাহিত্যে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। ইদানীন্তন বাঙ্গালাভাষার লিখক মহলেও সেই প্রচেষ্টা বিরল নহে। কাজেই মনে হয় যে, কবিকে বোধ হয় এক সময় কোনও অনিবার্য্য কারণে প্রিয়তমা পত্নীর দীর্ঘবিরহ সহ্য করিতে হইয়াছিল, সেই বিরহের সময়েই তিনি সম্ভবতঃ এই কাব্যখানা রচনা করিয়া থাকিবেন।

কালিদাস যে কোন্ দেশের এবং কোন্ সময়ের লোক, তাহা অদ্য পর্য্যন্ত কেহও অবিসংবাদিত রূপে প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই। কেহ বলিতেছেন, তিনি কাশ্মীর দেশের অধিবাসী, কেহ বলিতেছেন তিনি মিথিলা দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, আবার কেহ বা

---

* শ্রীহর্ষং কবিরাজ রাজিমুকুটালঙ্কার হীরঃসুতং
শ্রীহীরঃ সুষুবে জিতেন্দ্রিয়চয়ং মামল্লদেবী চ যম্।

প্রতিপন্ন করিতেছেন, কালিদাসের বাসস্থান উজ্জয়িনীতে। তিনি উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্যের অন্যতম সভাসদ্ ছিলেন। তিনি বিক্রমাদিত্যের সভাসদ ছিলেন, এই কথা স্বীকার করিলেও তিনি কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা স্থির করা কঠিন। কারণ, উজ্জয়িনীতে বিক্রমাদিত্য নামে বহু রাজাই রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। বিক্রমাদিত্য একজনের নাম নহে, উহা একটা সম্মান-সূচক উপাধিবিশেষ। যে বিক্রমাদিত্য শকদিগকে (or Scythians or Huns) যুদ্ধে পরাজিত করিয়া শকাব্দ প্রচলন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার রাজত্ব কাল খৃষ্ট জন্মের ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে অথচ কালিদাসের সমসাময়িক অপরাপর পণ্ডিতগণের প্রাদুর্ভাব কাল খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে। বিক্রমাদিত্যের সভায়।

"ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহ-শঙ্কু-বেতালভট্ট-ঘটকর্পর-
কালিদাসাঃ
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ
বররুচির্নব বিক্রমস্য ॥"

এই নয়টী রত্নের উল্লেখ আছে, উহাদের মধ্যে অনেকেই * খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষে এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কালিদাস পঞ্চম শতাব্দীতে যেই বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করিতেন, সেই বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ ছিলেন। তারপর মেঘদূতের চতুর্দ্দশ শ্লোকে "দিঙ্নাগ" ও "নিচুল" শব্দের † উল্লেখ থাকায় একটী 'অর্থান্তর ধ্বনিত' হইতেছে। দিঙ্নাগের সঙ্গে কালিদাসের প্রতিযোগিতা ছিল। এই দিঙনাগ অনুমান খৃষ্টীয় ৫৪১ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি জনৈক বৌদ্ধ শিক্ষকের শিষ্য ছিলেন। কবি "নিচুল" কালিদাসের সহাধ্যায়ী ছিলেন। কাব্যে এই দুইটী নামের অবতারণা দেখিয়া ইহা দৃঢ়ই প্রমাণিত হয় যে, কালিদাস খৃষ্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক।

অপরন্তু, কবি নদনদী নগরী বর্ণনা প্রসঙ্গে উজ্জয়িনী নগরীর বর্ণনা এত বিস্তৃত ভাবে করিয়াছেন যে, তাঁহাকে উজ্জয়িনীবাসী বা অন্ততঃ উজ্জয়িনীপ্রবাসী বলিয়া মনে করা ভুল হইবে না। আমাদের মনে হয়, তিনি উজ্জয়িনী-প্রবাসী ছিলেন, তাঁহার বাসস্থান হয়ত কাশ্মীর বা তৎসন্নিহিত অপর কোনও স্থানে ছিল। রামগিরি হইতে অলকাপুরী পর্য্যন্ত বর্ণনা করিতে তিনি যে সমস্ত পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, উহাদের মধ্যে কাশ্মীর ও তৎসন্নিহিত পর্ব্বতের বর্ণনা এবং গঙ্গার বর্ণনা দ্বারা তাঁহাকে উত্তর প্রদেশের লোক বলিয়াই মনে হয়। বিশেষতঃ রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে কালিদাস যে সমস্ত বর্ণনা আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে উত্তরদেশীয় বলিয়া ধারণা করা অমূলক নহে।

রাজতরঙ্গিনী-প্রণেতা কহ্লণ মল্ল উজ্জয়িনীর হর্ষ বিক্রমাদিত্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই হর্ষ বিক্রমাদিত্য কাশ্মীরের সিংহাসনে মাতৃগুপ্তকে আরোহণ করান। Dr. Bhau Daji বলেন, মাতৃগুপ্ত ও কালিদাস একই ব্যক্তি। রাজা বিক্রমাদিত্য, হর্ষ বিক্রমাদিত্য, ভোজ বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি বহু বিক্রমাদিত্যের সদ্ভাব হেতু কালিদাস যে কোন্ বিক্রমাদিত্যের সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাহা কিছু নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

কথিত আছে যে, কালিদাস বাল্যকালে বোকা ও অবোধ ছিলেন। একদা কোনও রাজকন্যার পাণিপ্রার্থী হইয়া কতিপয় পণ্ডিত সেই রাজকুমারীর সহিত শাস্ত্র বিচারে পরাস্ত হন, এবং প্রতিশোধ নিবার বাসনায়

---

* কেহ কেহ বলেন যে ঐ নয় ব্যক্তি এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন না।

† অদ্রেঃ শৃঙ্গং হরতি পবনঃ কিংস্বিদিত্যুন্মুখীভিঃ
দৃষ্টোৎসাহশ্চকিতচকিতং মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ।
স্থানাদস্মাৎ সরস'নিচুলাৎ' উৎপতোদঙ্মুখঃ খং
'দিঙ্নাগানাং' পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্ ॥

বোকা কালিদাসের সহিত কৌশলে রাজকুমারীকে পরাস্ত করিলে পর রাজা তাহার সহিত রাজকন্যার বিবাহ দেন। রজনীতে রাজকন্যার নিকট স্বামীর বিদ্যা বুদ্ধি প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং পত্নীর পদাঘাতে আহত হইয়া অভিমানী স্বামী গৃহত্যাগ করিয়া যান। এবং দীর্ঘকাল সরস্বতীর আরাধনা করিয়া সরস্বতীর প্রসাদে সংস্কৃত ভাষায় অগাধ বিদ্যা লাভ করতঃ একদিন নিশীথে আসিয়া রাজকুমারীর দ্বারে উপস্থিত হইলেন। পত্নীকে নিজের পাণ্ডিত্য অবগতি করাইবার নিমিত্ত তিনি বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় প্রশ্ন করিলেন "কান্তে! দ্বার মুদ্‌ঘাটয়।" রাজকুমারী স্বামীকে কণ্ঠস্বরে চিনিতে পারিলেন,অথচ স্বামীর মুখে শুদ্ধভাষা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন। পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনিও পতিকে প্রথমত কোনও উত্তর না দিয়া সংস্কৃত ভাষায় জিজ্ঞাসিলেন "অস্তি কশ্চিদ্ বাগ্ বিশেষঃ?"

প্রকৃত জ্ঞানলাভের পর কালিদাসের কাণে এই প্রথম প্রিয়ার 'প্রথমবাণী' প্রবেশ করিল। প্রিয়ার সেই প্রথমবাণী যে প্রিয়জনের কাছে কত মধুর ও কত মিষ্ট তাহা প্রিয়ব্যক্তি মাত্রেই অনুভব করিয়া থাকিবেন। কালিদাস সেই 'প্রথমবাণীর' তিনটী শব্দ অবলম্বন করিয়া তিনখানা অমূল্য গ্রন্থ রচনা করিলেন। 'অস্তি' শব্দ দ্বারা আরম্ভ করিয়া গড়িলেন কুমারসম্ভব। 'কশ্চিৎ' শব্দ দ্বারা আরম্ভ করিয়া মেঘদূত ও 'বাক্' শব্দ মুখে রাখিয়া রঘুবংশ। অবশ্যই ইহা কিম্বদন্তী মাত্র, এবং কিম্বদন্তীর যাহা মূল্য তাহার বেশী ইহাতে কিছু নাই। যে কারণেই হউক, মেঘদূতের আদিতে 'কশ্চিৎ' শব্দ রহিয়াছে। এখন প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাক্।

কাব্যজগতে মেঘদূতের স্থান এতই উচ্চে যে, এই শ্রেষ্ঠকাব্যের টীকা রচনা করিয়া নিজকে উচ্চ করিতে বহু বহু মনীষী চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন; এমন কি স্বয়ং মল্লিনাথও সকল কাব্যের টীকা প্রণয়ন করিয়া বৃদ্ধবয়সে সকলকে জানাইয়াছেন যে, "মেঘে মাঘে গতং বয়ঃ।" অর্থাৎ মেঘ ও মাঘ কাব্যের টীকা লিখিতে লিখিতেই আমার বয়স গত হইয়া গিয়াছে। এপর্য্যন্ত মেঘদূতের যতগুলি টীকা বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে ১। মল্লিনাথের সঞ্জীবনী। ২। কল্যাণমল্ল প্রণীত মালতী। ৩। ভরত-মল্লিক রচিত সুবোধা। ৪। হরগোবিন্দ বাচস্পতির সঙ্গতা। ৫। রামনাথ তর্কালঙ্কার সঙ্কলিত মুক্তাবলী ও ৬। মকরন্দ ভট্টাচার্য্য লিখিত সৌদামনী, এই ছয়খানিই উৎকৃষ্ট। তদ্ভিন্ন মেঘপ্রভা, বল্লভা, মেঘলতা, সুমতিবিজয়, মেঘরাজ, লক্ষ্মীনিবাস, সারোদ্ধারিণী, দক্ষিণবার্ত্তা, সরস্বতী তীর্থ প্রভৃতি আরও অনেক রকমের টীকা অনেক পণ্ডিত প্রণয়ন করিয়াছেন।

কি কারণে কালিদাসের ক্ষুদ্র এই কাব্যখানার প্রতি দেশ বিদেশের সকল লোকেরই এত অনুরাগ,তাহা বুঝিতে গেলে, আমাদিগকে প্রথমেই বলিতে হইবে যে, মেঘ-দূতের রচনার মাধুর্য্য, বর্ণনার চাতুর্য্য, ভাবের গাম্ভীর্য্য, অলঙ্কারের সৌন্দর্য্য ও উপমাদির তাৎপর্য্য এই সমুদয় গুণই সকলের চিত্ত মোহিত করে। বিশেষতঃ বর্ষার প্রারম্ভে মেঘের সেই গুড়ু গুড়ু ধ্বনি শ্রবণ করিলে কবির চিত্ত স্বভাবতঃই 'অন্যথাবৃত্তি' হইয়া উঠে।

মেঘদূতের বিশেষত্ব শুধু এই স্থানেই পর্য্যবসিত নহে, উহার বিশেষত্ব কবিতার সেই সপ্তদশাক্ষরী মন্দাক্রান্তা ছন্দের ভিতর দিয়াও অল্পাধিক পরিমাণে অনুভূত হইতে পারে। এই ছন্দের এমনই একটা চমৎকারিণী শক্তি আছে, যাহাতে কবিতাখানা একবার কি দুইবার পাঠ করিলেই উহা মনের মাঝে মধুর ঝঙ্কার করিতে থাকে। অন্যান্য কবিদের খণ্ডকাব্যগুলিও যদিচ সেই মন্দাক্রান্তা ছন্দেই গ্রথিত, তবু স্বাভাবিকতা ও সরলার্থতায় কোনো খানাই ইহার নিকট দাঁড়াইতে পারে না। সহজ ও সরল বর্ণনার গুণেই মেঘদূতের কবিতা আপনা আপনি কণ্ঠস্থ হইয়া যায়; কোনও বেগ পাইতে হয় না। কবিতার ব্যাখ্যা কালেও কুত্রাপি দুরন্বয় বা দুরান্বয়ের পাহাড়ে পড়িয়া পশ্চাৎপদ হইতে হয় না।

কাব্যের ভিতরে বিদিশা, অবন্তী, উজ্জয়িনী (বিশালা) ব্রহ্মাবর্ত্ত ও কুরুক্ষেত্র, প্রভৃতি স্থান; রেবা, শিপ্রা, বেত্রবতী, সুরস্বতী (দৃশদ্বতী) ও চর্ম্মণ্বতী প্রভৃতি নদী; রামগিরি, আম্রকূট, দেবগিরি, ও নীচগিরি, প্রভৃতি পর্ব্বতের প্রসঙ্গ এমনই ভাবে কবি আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন, যদ্দ্বারা আমরা ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, তিনি সেই সকল দেশ স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। অথবা তিনি ভারতবর্ষের তাৎকালিক ভূগোল বৃত্তান্ত বিশেষ রূপেই অবগত ছিলেন। কবি যে প্রকৃত পক্ষেই একজন পর্য্যটক ছিলেন, তাহার প্রমাণ রঘুবংশের চতুর্থ সর্গের বিস্তৃত দিগ্বিজয় বর্ণনা। স্বয়ং সেই সমস্ত দৃশ্য প্রত্যক্ষ না করিলে পর্ব্বত ও সমুদ্রের বর্ণনা কখনও তেমন স্বভাবসুন্দর হইত না। কল্পনার তুলিতে স্বাভাবিক চিত্র অঙ্কিত করা মানুষের পক্ষে কষ্টসাধ্য।

তারপর বর্ষাকালের উপযোগী কেতকী, কন্দলী, কুটজক (ঝিন্টি), নীপ (= কদম্ব), যূথিকা, শিরীষ, উদুম্বর (ডুমুর), শিলীন্ধ্র (বেঙের ছাতা), কেকা (ময়ূরের ডাক) বলাকা, ইন্দ্রধনু প্রভৃতির বর্ণনা এমন সুন্দর ভাবে বিন্যস্ত রহিয়াছে যে, পুস্তক খানা শীতকালে পড়িতে আরম্ভ করিলেও বর্ষাকালের সেই সমস্ত চিত্র সম্মুখে ভাসিতে থাকে, মনে হয় যেন বস্তুতই বুঝি "বল্মীকের স্তূপ হইতে ঐ ওখানে একটা ইন্দ্রধনু সমুত্থিত হইয়াছে।"

সংস্কৃত্য সাহিত্যজগতে "উপমা কালিদাসস্য" * এই একটা প্রবচন প্রচলিত আছে। কালিদাস যে উপমায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন, সেই বিশেষত্বটুকু দেখাইবার জন্য আমরা তাহার রঘুবংশ হইতে

সঞ্চারিণী দীপশিখেব রাত্রৌ
যংযং ব্যতীয়ায় পতিম্বরা সা।
নরেন্দ্রমার্গাট্টইব প্রপেদে
বিবর্ণভাবং স স ভূমিপালঃ।"

অথবা শকুন্তলা হইতে

"গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুক মিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য॥"

এই সমুদয় অনন্যসদৃশ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারি। মেঘদূত কাব্যে কবি উপমালঙ্কারের সমস্থানীয় অর্থান্তর-ন্যাস ও দৃষ্টান্তালঙ্কার প্রভৃতি এমনই সুনিপুণ হস্তে এবং এমনই উপযুক্ত স্থানে ব্যবহৃত করিয়াছেন, যাহাতে "উপমা কালিদাসস্য" এই রচনটী প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহার অন্যান্য কাব্যে যাইবার প্রয়োজন করে না। তাঁহার সেই।

(১) "আশাবন্ধঃ কুসুমসদৃশং প্রায়শোহ্যঙ্গনানাং
সদ্যঃপাতি প্রণয়িহৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি।
(২) রিক্তং সর্ব্বো ভবতি হি লঘু পূর্ণতা গৌরবায়।
(৩) যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা।
(৪) আপন্নার্ত্তিপ্রশমনফলাঃ সম্পদো হ্যুত্তমানাম্।
(৫) নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমি ক্রমেণ।

এই সমস্ত কবিতা একদিকে যেমন অলঙ্কারের সৌন্দর্য্য বাড়াইতেছে, অপর দিকেও তেমনি সামাজিক জনকে সুন্দর শিক্ষা প্রদান করিতেছে। এতদ্ভিন্ন

(৬) স্ত্রীণামাদ্যং প্রণয়বচনং বিভ্রমোহি প্রিয়েষু।
(৭) সূর্য্যাপায়ে ন খলু কমলং পুষ্যতি স্বা মভিখ্যাম্
(৮) সাস্রেঽহ্নীব স্থলকমলিনীং ন প্রবুদ্ধাং ন সুপ্তাম্।

এই সমুদয় কবিতাতেও মনোহারিণী কবিত্বশক্তি প্রকটিত হইয়াছে। মেঘের সঙ্গে অলকাপুরীর সাদৃশ্য বর্ণনাটী আরও মনোরম।

'বিদ্যুত্বন্তং ললিতবনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ
সঙ্গীতায় প্রহতমুরজাঃ স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষম্।

* উপমা কালিদাসস্য ভারবে রর্থগৌরবম্।
নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়োগুণাঃ॥

(১) "Cf. আশাবন্ধঃ সাহয়তি
(২) " Empty vessels sound much.
(৫) " চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে" সুখানিচ দুঃখানিচ।

অন্তস্তোয়ং মণিময়ভুব স্তুঙ্গ মভ্রংলিহাগ্রাঃ
প্রাসাদাস্ত্বাং তুলয়িতু মলং যত্র তৈস্তৈর্বিশেষৈঃ॥

হে মেঘ! তোমার মাঝে যেমন বিদ্যুৎ বিকাশ পায় অলকাপুরীর মাঝেও তেমনি 'ললিত বনিতা' শোভা পাইতেছে; তোমার গায়ে ইন্দ্রধনু বিরাজ করে, অলকাপুরীও বিবিধ চিত্রসমন্বিত; তোমার গম্ভীর গর্জন আর অলকাপুরীতে সঙ্গীতার্থে বাদিত মুরজধ্বনি; তোমার অভ্যন্তরে স্বচ্ছসলিল আর সেখানে জলের মত নির্ম্মল মণিকুট্টিম; তুমি খুব উন্নতদেশে অবস্থাপিত, সেই অলকাপুরীর প্রাসাদগুলিও আকাশস্পর্শী। অতএব সেই সমস্ত বিশেষ বস্তুধর্ম্মদ্বারা অলকাপুরী তোমার সহিত স্পর্দ্ধা করিতে সমর্থ।

মেঘদূতে যক্ষপত্নীর রূপ বর্ণনা চিত্তে এক অপূর্ব্ব ভাবের সমাবেশ করে। দময়ন্তীর রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রীহর্ষ লম্বা একসর্গে ১০৮টী শ্লোক রচনা করিয়াও তৃপ্ত হন নাই, কাদম্বরীর রূপবর্ণনায় বাণভট্ট সুদীর্ঘ পদ বিন্যাসে বিস্তৃত এক প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন; কিন্তু যক্ষপত্নীর বর্ণনায় মহাকবি কালিদাস তেমন কিছু আড়ম্বর করেন নাই, শুধু একটী মাত্র কবিতায় তিনি সকল সৌন্দর্য্যের স্বভাবচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন।

তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যেক্ষামা চকিতহরিণী প্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।
শ্রোণীভারা দলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ্ যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ॥

আর, "মন্দং মন্দং সুদতি পবন শ্চানুকূলো যথাত্বাং
বামশ্চায়ং নদতি মধুর শ্চাতকস্তে সগর্ব্বঃ।"

এই শ্লোকের দ্বারা কবির জ্যোতিষশাস্ত্র সংক্রান্ত শকুন বিজ্ঞান প্রকটিত হইতেছে। কোনও স্থানে যাত্রা করিবার কালে পথে যদি অনুকূল বায়ু প্রবাহিত হয়, অথচ বামে যদি মধুর কণ্ঠ কোনও পাখীর গান শুনা যায়, তবে সেই যাত্রা সফল।

"বামে মধুরবাক্ পক্ষী বৃক্ষঃ পল্লবিতোঽগ্রতঃ।
অনুকূলো বহন্ বায়ুঃ প্রয়াণে শুভসূচকঃ॥

পত্নীর সঙ্গে যে মেঘের অবশ্যই দর্শন হইবে, সে বিষয়ে যক্ষের মনে কোন সন্দেহই ছিল না। যক্ষ হয়ত ভাবিতে পারিত যে, এই দীর্ঘকাল বিরহ ব্যথা সহ্য করিয়া তাঁহার পত্নী জীবিত আছে কি না কে বলিয়া দিবে! কিন্তু যক্ষের সে কল্পনা আদৌ মনে উদয় হয় নাই। যক্ষ যেমন নিজেও বিরহ ব্যথায় অতি কষ্টে প্রাণ ধারণ করিতেছিল, অথচ জীর্ণ, শীর্ণ 'কনকবলয়ভ্রংশরিক্ত প্রকোষ্ঠ' হইয়া গিয়াছিল, তেমনি সে নিজের পত্নীর ছবিখানাও কল্পনার চক্ষে ঠিক তাহারই মত ভাবিতেছিল। যক্ষ মেঘকে বলিতেছে, 'মেঘ তুমি আমার স্ত্রীকে কি করিয়া চিনিবে? তাহার দুই একটা চিহ্ন বলি শুন।' এই কথা বলিয়া যক্ষ পত্নীর যে বিরহাবস্থা বর্ণনা করিয়াছে, তাহাতে পত্নীর প্রতি পতির ও পতির প্রতি পত্নীর যে কিরূপ সাত্ত্বিক প্রেম জন্মিয়াছিল তাহা অতি সুন্দর প্রকাশিত হইয়াছে। নায়ক নায়িকার নিজ নিজ চরিত্রও এই স্থানে আসিয়াই অলঙ্কার শাস্ত্রধৃত লক্ষণের সঙ্গে মিলিয়া যায়। নায়ক যক্ষ ধীরোদাত্ত গুণসম্পন্ন এবং নায়িকা যক্ষপত্নী 'স্বকীয়া' 'মধ্যা'। পত্নীর চরিত্রে যক্ষ কোন কালেও মন্দ সন্দেহ করেন নাই। ইহা তাহার—

"তাঞ্চাবশ্যং দিবসগণনাতৎপরা মেকপত্নীম্।"
"তামুন্নিদ্রা মবনিশয়নাং সৌধবাতায়নস্থঃ॥"

এই সমুদয় শ্লোকের অংশই স্পষ্ট প্রতিপন্ন করে। অলকা পুরীর তাৎকালিক বর্ণনায় কবি যদিও সেই স্থানের অধিকাংশ লোককেই আদি রসের রসিক রূপে চিত্রিত করিয়াছেন, যদিও "গত্যুৎকম্পাদলকপতিতৈর্যত্র মন্দারপুষ্পৈঃ" ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা নগরীর অভিসারিকাদের 'উদ্দাম যৌবন' বিবৃত করিতেছেন তথাপি যক্ষ তাহার পত্নীকে 'একপত্নী' ভিন্ন কখনও আর কিছু মনে করেন নাই। পরন্ত বিরহের যে সমস্ত

অবস্থা তাহার স্ত্রীর কার্য্যে, বাক্যে ও আচরণে বর্ণিত হইয়াছে, উহাতে তাহাকে একপত্নী ভিন্ন অন্য কোনরূপ জ্ঞান করা অস্বাভাবিক। পত্নী পতির বিরহে এতই আকুল হইয়া পড়িয়াছিল, যে, অন্য কাহারও সঙ্গে বড় একটা আলাপ করিবার ইচ্ছাও তাহার ছিল না। কাজেই ইনি 'পরিমিতকথা' হইয়া পড়িয়াছিলেন। সর্ব্বদা উষ্ণনিশ্বাসের সংস্পর্শে তাহার ফুলের পাপড়ীর মত কোমল ও রক্তিম অধরোষ্ঠ যুগল পুড়িয়া যেন থাক্ হইয়াছে। *

(মেঘদূতে পাঠান্তর ও প্রক্ষিপ্ত শ্লোক)

ইতঃপূর্ব্বে মেঘদূতের যে সমস্ত টীকা ও টীকাকারগণের নাম করিয়াছি, উহাদের মধ্যে অনেকস্থলেই বিভিন্ন শ্লোকের বিভিন্ন পাঠ ধৃত আছে। বিস্তৃতি ভয়ে এই প্রবন্ধে সে সমুদয় পাঠান্তর উদ্ধৃত করিতে ক্ষান্ত রহিলাম। তবে কর্ত্তব্যবোধে দুইটী স্থলের উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। পূর্ব্বমেঘের দ্বিতীয় শ্লোকে 'আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে' ও 'আষাঢ়স্য প্রশমদিবসে' এই দুই রকম পাঠ দৃষ্ট হয়। এতদুভয়ের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত পাঠই সমীচীন। তৎপ্রতি কারণ এই যে, উত্তর মেঘের ৪৯ শ্লোকে † উল্লিখিত হইয়াছে 'শার্ঙ্গপাণি অনন্ত শয্যা হইতে উত্থান করিলে' অর্থাৎ উত্থান একাদশী তিথিতে (কার্ত্তিক মাসের দশম দিনে) যক্ষের শাপ বিমোচন হইবে। সেই দিন আসিতে এখনও চারিটী মাস বাকী। অতএব 'আষাঢ়স্য প্রশম দিবসে' পাঠ অঙ্গীকার করিলে কার্ত্তিক মাসের দশদিন আসিতে বাকী থাকে মাত্র তিন মাস দশদিন, কাজেই চারিমাস পূর্ণ হইতে ২০ দিন বাকী পড়ে। আর 'প্রথম দিবসে' পাঠ ধরিলে উত্থানৈ-কাদশীর (অর্থাৎ ১০ই কার্ত্তিকের) বাকী থাকে চারি মাস দশদিন, অতএব এই স্থলে চারিমাস হইয়া দশদিন বেশী হইয়া পড়ে। প্রশম দিবসে বা 'প্রথম দিবসে' কোন পাঠ অবলম্বন করিলেও যখন ঠিক ঠাক চারিমাস বাকী থাকে না, এই অবস্থায় অল্পবৈষম্য যাহাতে হয়, তেমন পাঠটী অবলম্বন করাই সমীচীন। সুতরাং শেষোক্ত পাঠই মল্লিনাথ প্রভৃতি টীকাকারগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বল্লভ প্রভৃতি টীকাকারগণ কিন্তু 'প্রশম দিবসেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আরও একটা কারণ আমাদের অনুমান হয় এই, যক্ষ মেঘকে বলিয়া দিতেছেন, 'ওহে মেঘ তুমি তোমার ভ্রাতৃবধূকে গিয়া বলিবে বিরহের ৮টী মাস কাটিয়া গিয়াছে, কষ্টে সৃষ্টে আর চারিটী মাস কোনমতে চক্ষু বুজিয়া কাটাইয়া দাও'। এই বাক্য দ্বারা পতি যে পত্নীকে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করিতেছেন তাহাতে সংশয় হইতে পারে না। যক্ষ বলিতেছেন তাহার পত্নী যেন বাকী চারিটী মাস চোক্ বুজিয়া (লোচনে মীলয়িত্বা) কাটাইয়া দেয়। কিন্তু বিরহের দিন যে চোকের নিমেষে কাটে না, এই ধারণা কি বিরহী যক্ষের অনুভূতিতে আসে নাই? অবশ্যই আসিয়াছে। তবু তিনি ইহা দ্বারা নিজের মনকেই যেন প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করিতেছেন, বুঝা যায়। অধিকন্তু, যাহারা কোনও একটা শুভ 'দিবসের গণনায় তৎপর' থাকে তাহারা চারি মাস দশ দিন বাকী থাকিতেই মুখে প্রকাশ করে 'এইত মাস তিন চারি বাকী।' এই ক্ষেত্রেও বিরহী যক্ষ চারিমাস দশদিনকে শুধু চারি মাসই প্রকাশ করিতেছে, অথচ ইহাই স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে তিন মাস কুড়ি দিনকে চারিমাস প্রকাশ করা বিরহীর পক্ষে কখনও শোভমান হয় না। বরং মাস তিনেক বাকী এইরূপ বলিয়া অধীর আগ্রহ প্রকাশ করাই স্বাভাবিক হয়। কাজেই 'প্রশম দিবসে' পাঠ একপক্ষে যেমন অসমীচীন পক্ষান্তরে তেমনি অস্বাভাবিক।

দ্বিতীয়তঃ—আষাঢ় মাসের শেষ মুহূর্ত্ত নিরূপণ করিয়া নব জলধরের আবির্ভাব হইবে, এমন কল্পনা করাও অসঙ্গত। তবে প্রথম দিনে মেঘ দর্শনের একটা হেতু

* নিশ্বাসানা মশিশিরতয়া ভিন্নবর্ণাধরোষ্ঠম্।
† শাপান্তো মে ভুজগশয়না দুত্থিতে শার্ঙ্গপাণৌ,
শেষান্ মাসান্ গময় চতুরো লোচনে মীলয়িত্বা

হইতে পারে এই, প্রিয়ার পক্ষে শ্রাবণ মাসটী অতীব কষ্টদায়ক হইবে মনে করিয়া যক্ষ পূর্ব্ব হইতেই তাহার নিকট একটী দূত পাঠাইতে মনস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাই বহুদিনের প্রতীক্ষার পর আষাঢ়ের প্রথম দিবসে একখণ্ড মেঘ শৈলসানুতে লম্বমান দেখিয়া তাহাকেই দূত প্রেরণ করিতে বাসনা করেন।

পূর্ব্বমেঘের তৃতীয় শ্লোকে "কৌতুকাধানহেতোঃ" এই পাঠের স্থলে "কেতকাধান হেতোঃ" পাঠই বহুবাদি সম্মত। মেঘের বিশেষণ প্রদানে বর্ষাকালের প্রাকৃতিক বর্ণনাই কবির লেখনী হইতে নিঃসৃত হইবে। মেঘ কেতকপুষ্পের গর্ভাধানের কারণ, অথচ কেতকপুষ্পের গন্ধ বিরহীদের নিকট দুঃসহ, ইহা লোকপ্রসিদ্ধি। অতএব রামগিরিতে অবস্থান করিয়া যক্ষ যে সময় সময় কেতক পুষ্পের তীব্র ঘ্রাণ অনুভব করিত, মেঘ দর্শনে আজ তাহাকে সেই বিশেষণটি দ্বারাই বিশেষিত করিতেছেন। 'কৌতুকাধানহেতোঃ' পাঠ ধরিয়া মেঘকে 'অভিলাষ উৎপাদনের কারণ' এই অর্থে অর্থিত করা এই স্থলে সুপ্রযুক্ত হয় না। মেঘপ্রভা-টীকাকার এই স্থলে "শিরো বেষ্টনেন নাসিকাস্পর্শনাৎ" বলিয়া 'কেতকাধানহেতোঃ' পাঠ বিনা কারণে উড়াইয়া দিয়াছেন।

পাঠবৈলক্ষণ্যের ন্যায় মেঘদূতে শ্লোকসংখ্যারও বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়। আমরা প্রচলিত পুস্তকে বর্ত্তমান সময় পূর্ব্বমেঘে ৬৪ ও উত্তরমেঘে ৫৪,সমুদয়ে ১১৮টী শ্লোক মূলশ্লোকরূপে গৃহীত দেখিতে পাই। উহার মধ্যেও আবার কেহ কেহ দুই চারিটী শ্লোক বর্জ্জন করিয়া ১১২ বা ১১৬ টীকে গ্রহণ করেন। কেহ কেহ ১২১, ১১৫, ১২৭টী পর্য্যন্ত শ্লোকসমেত মেঘদূতের সংস্করণ করিয়াছেন। এই রূপ সংখ্যা বৈলক্ষণ্যের কারণ এই বোধ হয়, কোন কোন ব্যক্তি ক্ষমতা প্রদর্শন বাসনায় দুই একটী অতিরিক্ত শ্লোক রচনা করিয়া গ্রন্থমধ্যে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন। এই প্রক্রিয়া একদেশে বা একসময়ে সম্পন্ন হয় নাই। এই নিমিত্তই সকল পুস্তকে সমস্ত প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের সন্নিবেশ দেখিতে পাওয়া যায় না। কালিদাসের রচনার এরূপ একটা অসাধারণ বৈচিত্র্য আছে যে, নিপুণ পাঠকেরা কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে মেঘদূত পাঠ করিলেই কোন্ কোন্ শ্লোক প্রক্ষিপ্ত তাহা নির্ণয় করিতে পারিবেন। আমাদের মনে হয় ১১০টী শ্লোক ভিন্ন অবশিষ্ট ১৭টী শ্লোক কালিদাসের লেখনী হইতে বিনির্গত নহে। ঐ সপ্তদশ শ্লোকের সমুদয়ই যথা সম্ভব দুরান্বয়, কষ্টকল্পনা, পুনরুক্ততা, ন্যূনপদতা, অধিকপদতা, অস্ফুটার্থতা, ব্যর্থবিশেষণতা প্রভৃতি দোষে দুষ্ট। কালিদাস কাব্যখানাকে বিয়োগান্ত রূপেই রচনা করিয়াছেন; কিন্তু পরবর্ত্তী কোনও মহাত্মা বোধ হয় মেঘ ও মেঘপত্নীর চিরবিচ্ছেদ সহ্য করিতে না পারিয়া উত্তরমেঘের সর্ব্বশেষে দুই তিনটী শ্লোক রচনা করিয়া কাব্যখানাকে সংযোগান্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

প্রথম রাতি।

ভুলিনি সই ভুলিনি সেই ভালবাসার প্রথম সুদিন,
ভুলিনি সেই বদন খানি চপলতার চিহ্নবিহীন,
লতিয়ে পড়া অঙ্গখানি,
ঝুলিত সেই কমল পাণি,
ওগো আমার হৃদয়রাণী মুদে পড়া নয়ন নলিন,
ভুলিনি সই ভুলিনি সেই ভালবাসার প্রথম সেদিন।

প্রথম অলির গুঞ্জন সেই ফোট-'ফোট' কলির ফাঁকে,
চতুর্থীরি চাঁদের পাশে যেদিন প্রথম চকোর ডাকে।
তোমার অশোক বকুল বাগে,
মলয় যেদিন প্রথম জাগে,
হোমানলের ধূমে যে দিন ইন্দ্রধনু প্রথম আঁকে,
ভুলিনি সেই প্রথম প্রণয় ভুলিনিক আজো তা'কে।

ভুলিনি সই লজ্জাভরা ভালবাসার প্রথম রাতি,
তোমার আঁখি থাকত মুদে মেলে আঁখি ঘরের বাতি।
প্রথম চুমায় সেদিন দোঁহার,
খুলে গেল স্বর্গ দুয়ার,
কপোলে যে উঠলো ফুটে পারিজাতের কনক ভাতি,
ভুলিনি সই লজ্জাভরা ভালবাসার প্রথম রাতি।

বাক্য যাহা কহেছিলে উত্তরে তা মোর কথাতে,
প্রশ্ন তুমি করই নিক, কওনি কথা স্ব ইচ্ছাতে।
তরুর গায়ে যেমন লতা,
জড়াইল কণ্ঠে কথা,
হিয়ার বাণী উঠলো ভাসি ছল ছল আঁখির পাতে,
ভুলিনি সেই মধুমিলন প্রথম প্রেমের মধুর রাতে।

ভুলিনিক যেদিন প্রথম হ'লে আমার হৃদয় রাণী;
সিংহাসনে সঙ্কুচিতা লজ্জা-রাঙা বদন খানি,
কিরীট হেলায় পড়ছে খসে'
চাইতে সরম সভায় বসে,
ছত্র চামর ধরতে লাজে 'বাড়াইলে' নিজেই পাণি.
ভুলিনিক যে দিন প্রথম হলে আমার হৃদয় রাণী।

শ্রীকালিদাস রায়।

সভ্যতার ভূমি।

কথাটা আজ উঠিয়াছে, বাঙ্গালার সভ্যতার ভূমি গ্রাম না নগর। প্রশ্নটা যখন উঠিয়াছে, তখন ইহা একেবারে বিচারের অযোগ্য নহে। সভ্যতা যে একটা ভূমিকে আশ্রয় করিয়া জন্মগ্রহণ করে এবং সেই ভূমির আব্‌ হাওয়ায় বর্দ্ধিত হয় এবং সেই অনুসারেই তাহার বৈশিষ্ট্যটুকু প্রকাশ পায়,—একথা আর আজ কেহ অস্বীকার করিবে না। এমন একটা সময় হয় ত কখনও ছিল, যখন মানুষ কোনও একটা বিশিষ্ট ভূমিতে নিজেকে বদ্ধমূল মনে করিত না, যখন স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন তাহার পক্ষে মোটেই কষ্টের কারণ হইত না। মানুষের সেই যাযাবর অবস্থায় ভূমির সঙ্গে তাহার সম্পর্ক অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল; সে সময়ে সে যে শুধু ইচ্ছা হইলেই স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে পারিত, তাহা নয়; বরং ইহাই ছিল তাহার প্রকৃতি। সে সময় আপনা হইতেই উৎপন্ন বৃক্ষের ফল ছাড়া আর বিশেষ কিছু সে ভূমির নিকট হইতে গ্রহণ করিত না; এবং আপনা হইতেই উৎপন্ন ঘাস ছাড়া তাহার পালিত পশুর জন্য আর কিছুর প্রয়োজন হইত না। এরূপ একটা অবস্থা যে মানুষের ছিল, তাহার সোজা প্রমাণ, এখনও অনেক মানুষ এই অবস্থায়ই আছে; এবং যাঁহারা এখন দেশের পর দেশ জয় করিয়া বড় হইতেছেন মনে করেন, তাঁহাদেরই পূর্ব্ব পুরুষেরা যে দেশ দেশ ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তাহার ইঙ্গিত পৃথিবীর প্রাচীন সাহিত্যে রহিয়াছে। কিন্তু এই অবস্থা যতদিন মানুষের ছিল, ততদিন সভ্যতার অধিকারী সে হয় নাই।

সভ্যতার আরম্ভ তখনই হইল, যখন মানুষ ভূমিবিশেষকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিল; এবং সেই ভূমির রক্ষণ, বর্দ্ধন ও উন্নয়নের জন্য প্রাণপাত করিতে লাগিল। যখনই মানুষ ভূমি কর্ষণ করিয়া গাছ রোপিতে শিখিল, তখন সেই গাছের ফলের আশায় তাহাকে বাধ্য হইয়া বসিয়া থাকিতে হইত; এবং এই ভাবেই যাযাবর অবস্থা ত্যাগ করিয়া সে জনপদের সৃষ্টি করিতে লাগিল। এই খানেই সভ্যতার ভিত্তি পত্তন হইল।

কিন্তু যেদিন মানুষ পশু তাড়াইবার লাঠি ছাড়িয়া লাঙ্গল ধরিতেও শিখিল, সেই দিনই সে একেবারে স্যর আইজাক্‌ নিউটন্‌ হইয়া গেল না; তাহার পরও তাহাকে দীর্ঘ অধ্যবসায় করিতে হইয়াছে। জঙ্গল কাটিয়া জনপদ, জনপদের পরে নগর প্রভৃতিও তাহাকে সৃষ্টি করিতে হইয়াছে।—তবে ত, সভ্যতানামক জিনিসটী

তাহার ভাগ্যে জুটিয়াছে।

মানুষের বাসস্থান সাধারণতঃ দুইটী প্রধান ভাগে বিভক্ত। যেখানে মানুষের বাস বাটীর সঙ্গে কর্ষণোপযোগী ভূমিও বিদ্যমান থাকে এবং যেখানে মানুষের গৃহসমূহ পরস্পর হইতে অল্পাধিক দূরে এবং যেখানে মানুষের শিল্প অপেক্ষা প্রকৃতির শিল্পেরই প্রাধান্য প্রকটিত—মোটামুটি, সেই স্থানকেই আমরা গ্রাম বলি; এবং তদ্বিপরীত পুঞ্জীকৃত বসতিসমূহকেই নগর বলা হয়। অবশ্যই আইনের চক্ষে সহরের অন্যরূপ লক্ষণও রহিয়াছে;—যথা, একটা বিশিষ্ট প্রকারের স্বায়ত্ব শাসন। কিন্তু লক্ষণ নির্দ্দেশ যতই কঠিন হউক না কেন, চোখে দেখিয়া সহর হইতে গ্রামকে পৃথক্ করা, বোধ হয়,তত শক্ত নয়। সুতরাং এই বিষয়ে সোক্রেটিসের অনুকরণে একটা সূক্ষ্ম নৈয়ায়িক বিচার না করিলেও চলে। আসল প্রশ্নটা হইতেছে, সভ্যতা গ্রামকে আশ্রয় করিয়া জন্মে,না, সহরকে আশ্রয় করিয়া।

এ সম্বন্ধেও কোন সাধারণ নিয়ম উপস্থিত করা সম্ভব কি না, সন্দেহ। পৃথিবীর ইতিহাসে সভ্যতা যে বেশীর ভাগই নাগরিক, একথা বোধ হয় না মানিয়া উপায় নাই। সকলের আগেই আমাদের মনে পড়ে ইজিপ্ট ও গ্রীসের কথা; মনে পড়ে, ব্যাবিলনের কথা, রোমের কথা। এসকল স্থানে ভদ্র, সভ্য লোকদের কেহই গ্রামে থাকিতেন না, একথা বলা বোধ হয়, তত সহজ নয়। কিন্তু তথাপি একটা কথা স্পষ্ট জানা যায়; এ সব দেশের দেশনায়কেরা বা রাষ্ট্রপতি দেশের যেখানে বাস করিতেন, সেখানে সহজেই লোকের ঘন বসতি জমিয়া যাইত এবং নগরের সকল উপাদানই সেখানে সুলভ হইয়া যাইত। ইজিপ্টের থিবিস্ একটী নগর; রাজধানী সুতরাং সভ্যতারও ধানী; ইজিপ্টের সভ্যতার একটা প্রধান জিনিস তাহার স্থাপত্য—তাহার পিরামিড; সেগুলি যদিও সহরের বাহিরে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তথাপি তাহাদের আত্মা ছিল সহরে;—যাঁহাদের সমাধির জন্য পিরামিড্ গুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাঁহারা ছিলেন নগরবাসী। তেমনই গ্রীস্ বলিতে যাহা বুঝায় তাহার বারো আনাই এথেন্স। রোমও একটী নগর ভিন্ন আর কিছুই নহে—এবং রোমের সভ্যতা—রোমের সাম্রাজ্য সম্পূর্ণই একটী নগরের সম্পত্তি। ব্যাবিলন প্রধানতঃ নগর, তার পর সাম্রাজ্য। সুতরাং পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতা যে বহুল পরিমাণে নাগরিক, একথা আমরা বলিতে বাধ্য। কিন্তু ইহার অর্থই এই নয় যে, গ্রাম-জাতীয় মানববসতি তখন ছিল না। তখনও লোকে ভূমিতে উৎপন্ন শস্য খাইয়াই বাঁচিত; সুতরাং ভূমির চাষ তখনও হইত; এবং চাষীরা কৃষ্ট ভূমির নিকটেই বাস করিত; সুতরাং গ্রাম তখনও ছিল। কিন্তু গ্রামে শুধু খাদ্যই উৎপন্ন হইত এবং খাদ্য উৎপাদনের জন্য চাষীরা—প্রায়ই বিক্রীত, স্বাধীনতাহীন দাসেরা—বাস করিত। সভ্যতা বলিতে যে শিল্প, সাহিত্য, কলা বুঝায় তাহা ফসলের মত ক্ষেতে ফলিত না; তাহার জন্ম-স্থান ছিল নগর।

তার পর ইউরোপের মধ্যযুগ। সে সময়েও সহরেরই প্রাধান্য। প্রাচীন সহর তখন অনেক পরিমাণে পরিত্যক্ত হইয়াছিল, কিন্তু জমাদারদের গৃহকে কেন্দ্র করিয়া তখন নূতন সহর সৃষ্ট হইতে লাগিল। জমীদারের বাড়ী, তৎসংলগ্ন তাঁহার কেল্লা, তাহার কাছেই ধর্ম্ম-যাজকের বাড়ী—এ সকল অতি কাছাকাছি; প্রায়ই পাহাড়ের একটা সুদৃঢ় স্থানে; তার পর নীচে চাষী কুলিদের বস্তি; এবং তার পর চাষের ভূমি। এই প্রকার বসতি স্থাপনের ভিতর গ্রাম অপেক্ষা নগরের লক্ষণ অধিক। ক্রমে মধ্য যুগের শেষ দিয়া সমাজে শিল্প ও কারু কর্ম্মের প্রাধান্য সূচিত হইতে লাগিল; বহু মজুরের একত্র সমাবেশ হইতে লাগিল—এবং ক্রমে বর্ত্তমান নগর সমূহের আরম্ভ হইতে লাগিল। সুতরাং যতটুক সভ্যতা মধ্যযুগে ইউরোপে ছিল, তাহা নগরকে আশ্রয় করিয়াই ছিল।

এখন যে ইউরোপের সভ্যতা একান্তই নাগরিক, তাহার আর কোন প্রমাণ দেওয়া দরকার করে না। এখন ইউরোপের সর্ব্বস্বই নগরে। তাহার শিল্প, তাহার সৌন্দর্য্য, তাহার সাহিত্য, তাহার শিক্ষা—সকলেরই ভিতর সহরের ধূঁয়ার গন্ধ রহিয়াছে। এমন কি, এমনও দুই একটা সভ্য দেশ রহিয়াছে, যাহার খাদ্য উৎপাদনের নিমিত্তও গ্রাম দরকার করে না,—যথা স্বয়ং ইংলণ্ড। সেখানকার লোকের খাওয়ার জিনিস বেশীর ভাগই আসে বিদেশ হইতে। কাজেই সেখানে 'পরিত্যক্ত গ্রামের' ('Deserted village') সংখ্যা অল্প নহে।

সুতরাং হিন্দুকোশের পশ্চিমে যে কয়টী সভ্যতা আজ পর্য্যন্ত জন্মিয়াছে, তাহারা সকলই ন্যূনাধিক নাগরিক। সহরের তথাকথিত বিলাস না হইলে, ইহাদের উৎপত্তি হইত না; কেন না, সহর ছাড়া একটীও উৎপন্ন হয় নাই।

কিন্তু ভারতে কি হইয়াছে? অনেকে মনে করেন, হিন্দু সভ্যতার যাহা কিছু বৈশিষ্ট্য তাহা তাহার উৎপত্তি-স্থানের সহিত সম্পৃক্ত। হিন্দু সভ্যতা মোটের উপর ব্রাহ্মণদিগেরই সৃষ্টি। যদিও উপনিষদে ক্ষত্রিয় প্রাধান্যের চিহ্ন অস্পষ্ট নহে—যদিও একাধিক স্থলেই বলা হইতেছে 'অতএব ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রম ধস্তা দুপাসতে', যদিও উপনিষদের প্রবক্তাদের মধ্যে অনেকেই ক্ষত্রিয়, যদিও রাজর্ষি জনক এবং বিশ্বামিত্র প্রভৃতি নগণ্য লোক ছিলেন না, তথাপি হিন্দু সভ্যতা নামক বিরাট জিনিসটী প্রধানতঃ ব্রাহ্মণদিগেরই দান। ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়ে কলহের কথা উপনিষদের বাহিরে পুরাণাদিতেও দেখা যায়, তথাপি ভর্তৃহরির ভাষায়, সাধারণ বিশ্বাস ছিল, 'ক্ষাত্রং দ্বিজত্বং চ পরস্পরার্থং'। এবং এই পরস্পর সাহায্যের মধ্যে ব্রাহ্মণদিগের অধিকারই ছিল বেশী। রাজা অবশ্যই ক্ষত্রিয় ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মন্ত্রীরা হইতেন প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ; এবং মন্ত্রীবিদ্রোহের ফলে যে রাজা নষ্ট হইত, সে দৃষ্টান্ত দুই এক জায়গায় মিলে। পুরাণে বেণ রাজার কথা শুনি, যিনি ব্রাহ্মণদের অসন্তোষ ভাজন হইয়া জীবন এবং রাজ্য উভয়ই হারাইয়াছিলেন; আর, ব্রাহ্মণ চাণক্যের কূট-নীতি যে এক রাজবংশের স্থলে এ আর এক বংশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, সে কথা বোধ হয় একজন রাজাই বলিয়াছেন। বিশেষতঃ পুরাণ, সংহিতা প্রভৃতির প্রবক্তা সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণ, এবং শ্রোতা একাধিক স্থলে ক্ষত্রিয় রাজা। সুতরাং হিন্দু সভ্যতার গঠনে ব্রাহ্মণের দান কম নহে। আর, এই ব্রাহ্মণদের মধ্যে 'বিদূষক'ও যেমন জন্মিত, ঋষিরও তেমনই অসদ্ভাব ছিল না। কিন্তু ঋষিরা থাকিতেন প্রায়ই জনপদে, কিংবা অরণ্যে। হিন্দু সভ্যতা সুতরাং নাগরিক নহে। অভিজ্ঞান-শকুন্তলে ঋষি-কুমার সহরে প্রবেশ করিয়াই অশুচি-সংস্পর্শ অনুভব করিতেছেন। স্নাত ব্যক্তি অভ্যক্ত ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলে যেমন অশুচিভাবাপন্ন হয়, দুষ্মন্তের রাজধানী সহরের পাকা রাস্তায় পা দিয়াই ঋষিতনয়ের সেইরূপ মনে হইতেছিল;—ইহা হইতে সকল সময়ে সকলের না হউক, সময়বিশেষে ব্রাহ্মণবিশেষের যে নগরের প্রতি অবজ্ঞা ছিল, তাহা অনুমান করা যায়। সুতরাং হিন্দু সভ্যতা পল্লীজাতা এবং পল্লবাসিনী,—এইরূপ অনেকে মনে করিয়া থাকেন।

বেদের ঋষিরা কেমন জায়গায় থাকিতেন, অনুমান করা খুব কঠিন নয়। বড় বড় সহরের, কোঠা বাড়ীর, পাকা রাস্তার অস্তিত্ব তখন ছিল, এরূপ মনে করা কঠিন। সুতরাং বৈদিক সাহিত্য যে আরণ্যক—অরণ্যজাত,—একেবারে জাওয়ালের গড়ে না হউক, জনপদে সম্ভূত, এটা কতকটা সাহস করিয়া বলা চলে। তারপরেও তপস্যার জন্য, বৈদিক অনুষ্ঠানের জন্য যে গ্রামেরই দরকার সহরের চেয়ে বেশী ছিল, তাহাও কতকটা জোর করিয়া বলা চলে। এখন অবশ্যই অনেক তীর্থস্থানই পুরাদস্তুর সহরে পরিণত হইয়াছে—যথা বারাণসী, শ্রীক্ষেত্র, ইত্যাদি। কিন্তু তপোবনের যে বর্ণনা প্রাচীন সাহিত্যে পাই, যে সব বর্ণনা প্রাচীন তীর্থের পাওয়া যায়,

তাহা হইতে মনে হইবে, সেগুলি সহর হইয়াই জন্মে নাই। নৈমিষারণ্যে যে ঋষিদের কতটা সাধারণ সভা হইয়াছিল, তাহার কোন তালিকা নাই বটে, কিন্তু সেখানে অনেক সত্র হইয়াছে, অনেক সভাও হইয়াছে—এবং একাধিক অমূল্য গ্রন্থের জন্মস্থান বোধ হয় ঐখানে। কিন্তু নৈমিষারণ্য ত অরণ্য—এখনও প্রায় তাই, অন্ততঃ কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের তুলনায়। কোনও একটা জাতির সভ্যতা সেই জাতির ভদ্র, শিষ্ট, সভ্য লোকদেরে বাদ দিয়া জন্মে না; বিশিষ্ট লোকেরা যেখানে বাস করেন, সভ্যতার জন্মভূমিও সেইটিই। সুতরাং প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা যে গ্রাম্য, একথা মনে করিবার হেতু আছে।

তার পর, প্রাচীন বাংলা দেশেই কি দেখি? প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের যত টুকু জানা গিয়াছে এবং যত টুকু কল্পিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, গ্রাম মাত্রেই পরিত্যক্ত গ্রাম—'Deserted village'—ছিল না। গ্রামে ন্যায়ের, স্মৃতির, সাহিত্যের চর্চ্চা হইত। ভট্টপল্লী পল্লী, নবদ্বীপও সহর নয় এবং বিক্রমপুর এখনও গ্রামের সমষ্টি। এই সব জায়গায়ই 'তেঁতুল পাতার চচ্চড়ি হইত, আর সঙ্গে সঙ্গে হইত জাগদীশী, গাদাধরী। এই সব জায়গায়ই পুকুরের পাড়ে, বকুলের ছায়ায়, অপরাহ্নের স্নিগ্ধতায় বিচার করা হইত শব্দের শক্তি কতটুকু—বিশেষ বলিয়া কোন পদার্থ আছে কিনা এবং অন্বয়-ব্যতিরেক হইতে ব্যাপ্তির জ্ঞান কিরূপে জন্মে। এই সব জায়গায়ই একদিন এক প্রকাণ্ড নৈয়ায়িকের ঘরে জন্মিলেন সাম্যবাদী, প্রেমধর্ম্মের প্রবক্তা শ্রীচৈতন্য। এই সব জায়গায়ই চিন্তিত হইত বিবাহ কাহাকে বলে—সপ্তপদী গমন তাহাতে দরকার কিনা। এই সব জায়গায়ই সিদ্ধান্ত করা হইত 'পিণ্ডদঃ ঋক্‌থভাগী স্যাৎ; —আর, এই সব জায়গায়ই প্রশ্ন উঠিত, দায়ের ভাগ কিরূপে হইবে? বাংলার প্রাচীন সভ্যতাও সুতরাং পল্লীর সম্পত্তি। একটা বিশ্রাম, একটা ব্যস্ততার অভাব, একটা ধীর গতি বাংলার প্রাচীন সভ্যতার ভিতর দেখা যায়। এ সকলই পল্লীর দান—পল্লীর হাওয়ায় বৰ্দ্ধিত। সংস্কৃত আরণ্যক সাহিত্যের লক্ষণ ইহা হইতে দূর হইয়া যায় নাই।

বাংলা ভাষায় যে কয়টী প্রাচীন জিনিস পাওয়া গিয়াছে, তাহাও কি পল্লীজাত নহে? গোরক্ষ বিজয়ের কাহিনী এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেক যোগতন্ত্রের কথা পল্লীতেই আলোচিত হইত। 'মনসা'-মঙ্গল ও মনসার পূজা পল্লীরই জিনিস। কবিগানের, ভাটিয়াল গানের, যাত্রা গানের গায়কেরা পল্লীরই লোক ছিলেন। কেবল তাই নয়। সাহিত্য ছাড়া বাংলার অতি প্রাচীন শিল্প বস্ত্রবয়ন পাড়া গাঁয়ের যুগী জোলারাই করিত।

সুতরাং ভারতের, এবং বাংলার প্রাচীন সভ্যতা পল্লীতেই উৎপন্ন হইয়াছিল, ইহাই অনেকের মত; এবং অনেকে মনে করেন, এই খানেই উহার বৈশিষ্ট্য। হিন্দু সভ্যতা যে আধ্যাত্মিক, ইহা যে বিলাসলেশ শূন্য, ইহা যে ধীরগতি, স্নিগ্ধ, এবং ব্যস্ততা-শূন্য, ইহার ভিতর যে একটা বিরাট বিশ্রাম রহিয়াছে—এই সকলেরই হেতু ইহার জন্মস্থান পল্লী। সহরে অনেক রকম সুখ সুবিধা আছে; পাকা বাড়ী আছে, পাকা রাস্তা আছে, গাড়ী ঘোড়া অছে, রঙ্গমঞ্চ আছে;—কিন্তু অসুবিধাও আছে প্রচুর। সহরে ধুঁয়া আছে, ধূলা আছে, ছুটাছুটি আছে, ব্যস্ততা আছে,—বিশ্রামের অভাব, ছায়ার অভাব, শ্যামলতার অভাব, বিশাল মুক্ত বায়ুমণ্ডলের অভাব আছে। সুতরাং সহরে যে সভ্যতা জন্মে—যে সাহিত্য ও শিল্পের উদ্ভব হয়, তাহার ভিতর একটা বিলাসের ছায়ার সঙ্গে একটা স্পষ্ট ত্বরা-গতির লক্ষণ দৃষ্ট হয়; সর্ব্বদাই একটা 'সময় নাই, সময় নাই,' ভাব দেখা যায়। কিন্তু পল্লীতে জাত সভ্যতার একটা বিশেষ এই যে, ইহা কোন বিষয়েই তাড়াতাড়ি করিতে চায় না; তাড়াতাড়ি করিয়া ফেলিতে হইবে, তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিতে হইবে এবং তাড়াতাড়ি শুনিয়া লইতে হইবে—এরূপ একটা ব্যস্ততার ভাব সেখানে নাই। ফুরাইল বুঝি, গেল বুঝি, এই মনে করিয়া কোন বিষয়েই একটা প্রচণ্ড ব্যগ্রতা ইহার ভিতর নাই। গল্প বলিতে বসিলে তাড়াতাড়ি শেষ করিবার কোন প্রয়োজন বোধ হয় না, কেননা শ্রোতার অবসর আছে। শিল্পসৃষ্টি করিতে বসিলে তাড়াতাড়ি শেষ করিবার কোন আকাজ্ক্ষা নাই, কেন না, বাজার পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা নাই।

পল্লীর জীবনে যেমন একটা নবীনতা ও সরসতা আছে, তেমনই একটা বিশালতা ও উদারতাও রহিয়াছে; পল্লীজাত সভ্যতায়ও এই সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। এবং ঠিক এই গুলিই হিন্দু সভ্যতার বিশিষ্ট গুণ; সুতরাং হিন্দু সভ্যতা যে পাশ্চাত্য সভ্যতা হইতে পৃথক্ তাহার একটা কারণ এই যে, ইহা পল্লীতে জন্মিয়াছিল।

এবং এই সিদ্ধান্তটী ধরিয়া লইয়াই অনেকে আজ কাল উপদেশ দিতেছেন যে, আমাদিগকে আবার জানপদ আশ্রয় করিতে হইবে। কিন্তু ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, এখানে দুইটী বিচার্য্য বিষয় আছে;—প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, হিন্দু সভ্যতা কি বাস্তবিকই সহরের সংস্রবে আসে নাই? দ্বিতীয়তঃ দেখিতে হইবে, যদিই বা, এমন হয় যে, প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা একান্তই পল্লীবাসিনী ছিল, তথাপি বলা যে আমরা যে সভ্যতার অধিকারী এবং ভবিষ্যতে আমরা যাহা গড়িয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছি, তাহাকে একেবারে নগর সংস্পর্শ ছাড়া করিয়া রাখা সম্ভব হইবে কিনা। বলা বাহুল্য, এই দুইটী প্রশ্নের মধ্যে এমন কোন নিকট সম্বন্ধ নাই যে, অতীতে যাহা হইয়াছে ভবিষ্যতেও ঠিক তাহাই হইবে এবং হওয়া উচিত। অতীতে যদিই বা হিন্দু সভ্যতা একমাত্র পল্লীতেই সম্ভব হইয়াছিল, তথাপি তাহার অর্থই এ নয় যে, ভবিষ্যতেও এপ্রকার সম্ভব হইবে। কারণ, অবস্থার ত পরিবর্ত্তন হইতেছে এবং আরও হইবে। তথাপি, অতীতের আলোচনাটা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নহে। কারণ, অতীত হইতে বর্ত্তমানের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এবং ভবিষ্যতের ধারাও কতকটা অনুমান করা চলে। কিন্তু অতীতে কি বাস্তবিকই এ দেশে সহর ছিল না? বাস্তবিকই কি সে সব সহরে কিছু সৃষ্ট হয় নাই? বাস্তবিকই কি আমাদের প্রাচীন সভ্যতাটা সহরের বাহিরেই জন্মিয়াছিল?

সহর যে প্রচুরই ছিল এবং অনেক সহর যে বিলাসের স্পর্দ্ধায় প্যারিসকেও হার মানাইয়া দিতে পারিত, তাহা আর নিক্তির ওজনে প্রমাণ দিয়া কাহাকেও বিশ্বাস করাইতে হইবে না। হয় ত বেদের সময়ে কোন সহরই এদেশে ছিল না; এবং তার পর কোন্ দিন হইতে নগর নির্ম্মাণ আরব্ধ হইল, কোন্ দিগ্বিজয়ী মহাপুরুষ প্রথম সহরের ভিত্তি-প্রস্তরটী স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাও অবশ্যই আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু তথাপি সহর যে হিন্দুরা যথেষ্ট নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করা চলে না। এবং সেই সকল সহরে যে লোক থাকিত—এমন কি, ভদ্র, বিশিষ্ট লোকেরাও থাকিত, তাহাও সন্দেহের অতীত। রাজা স্বয়ং ছিলেন সহরবাসী; এবং কোন দেশেই কখনও রাজা সমাজত্যাগী তপস্বীর মত একক থাকেন না। রাজাকে ঘিরিয়া সমাজের বিশিষ্ট লোকেরাই থাকেন;—কবি থাকেন, দার্শনিক থাকেন, ধন্বন্তরির মত বৈদ্য থাকেন, অমরসিংহের মত শব্দবিদ্ থাকেন। রাজা কখনও সমাজে নগণ্য লোক নহেন; তাঁহার প্রভাব প্রচুর। দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতির পরিপোষণে রাজার প্রভাব একেবারেই থাকে না, একথা বলা কঠিন। কারণ, রাজার সভা বিরোধী হইলে, এ সকল আশ্রয় বিহীন হইয়া পড়ে। ভারত বর্ষেও এই সত্যের ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

আর একটা কথা। শুধু ধর্ম্মাচারই সভ্যতা নয়; এবং শুধু সাহিত্যই সভ্যতা নয়; আর, শুধু সংহিতাই সাহিত্য নয়। প্রাচীন ভারতে উপনিষদ্, পুরাণ এবং হয় ত সংহিতাদিও অরণ্যের জিনিস ছিল; যদিও সংহিতায় গার্হস্থ্য ধর্ম্মের কথা, বিচারালয়ের কথা, এত পুঙ্খানুপুঙ্খ রহিয়াছে যে, তাহার ভিতর নগরের অভিজ্ঞতার চিহ্ন একেবারে অনুপস্থিত নহে। কিন্তু তাহা হইলেও আমরা একথা বলিতে পারি না যে, প্রাচীন হিন্দুদের ষোল আনা সাহিত্যই পল্লীর সৃষ্টি। উজ্জয়িনী, পাটলিপুত্র প্রভৃতি যদি না থাকিত, তাহা হইলে কাব্য হইত কি? বনে প্রস্থিত কোন ঋষি কি বেশ্যার রূপ বর্ণনা করিতে পারিতেন? পৌরাঙ্গনাদের লোলাপাঙ্গের বিদ্যুতের চকিত স্ফুরণে, অভিসারিকাদের দ্রুতপদের চিহ্নে চিহ্নিত রাজবর্ত্মের অন্ধকারে, বিলাসিনীদের প্রসাধন-সাধন অগুরু-চন্দনের ধূমে—যে কাব্যসাহিত্য লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহা কি পল্লীর দান?

প্রকৃত পক্ষে সংস্কৃত সাহিত্যের দুইটী শাখা আছে;—একটী আরণ্যক—অরণ্যে অথবা বিরল-বসতি পল্লীতে

উৎপন্ন; দ্বিতীয়টীকে আর কোন ভাল নাম আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত নাগরিক বলিতে পারি। কাব্যসাহিত্য প্রধানতঃ এই দ্বিতীয় শাখার অন্তর্গত।

তার পর সাহিত্যই ত সভ্যতার একমাত্র অঙ্গ নয়। আর যে সব জিনিস সভ্যতার অন্তর্গত—যে সব আইন কানুন, রাষ্ট্র ও সমাজ সম্বন্ধে যে সব ধারণা, যে সব শিল্প—সভ্যতায় অন্তর্নিবিষ্ট, সে সকল কি সহর ছাড়া হইতে পারিত? স্থাপত্যশিল্প সভ্যতার একটা নিদর্শন; কিন্তু সহর নির্ম্মাণ করিতে না হইলে কোথায় এ শিল্পের বিকাশ হইত? সুতরাং সহর-নির্ম্মাণ ব্যাপারটাও কি সভ্যতার অঙ্গ নহে? এমন কি জাতি কোথাও ছিল, যাহারা সভ্য ছিল, অথচ সহর নির্ম্মাণ করে নাই? ভূমিকে চিরন্তন ভাবে আলিঙ্গন না করিলে মানুষের সভ্যতা আরম্ভ হইতে পারে না; তেমনই আলিঙ্গিত ভূমিকে—নিজের দেশকে, সাজাইতে আরম্ভ না করা পর্য্যন্ত মানুষের সভ্যতার বিকাশ হয় না। এবং দেশ সাজাইবার পক্ষে সহর একটী প্রধান অবলম্বন। সুতরাং হিন্দু সভ্যতা বলিতে যদি কেবল মাত্র আরণ্যক সাহিত্য না বুঝি, তাহা হইলে উহার উপর নগরের প্রভাব কম ছিল না। হিন্দুদেরও ব্যবসা বাণিজ্য ছিল—তাহারাও অন্যান্য কারণের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধার জন্য সহর নির্ম্মাণ করিত। বাঙ্গালী কবি মুকুন্দরামের ব্যাধ কালকেতুও জঙ্গল কাটিয়া এক সহর বসাইয়াছিল। এখনও এদেশের জমীদারেরা হাট বসান; এবং দশ পোনর বৎসর পরে একটা রেলের লাইন ঐ দিক দিয়া গেলেই, ঐ হাট সহরে পরিণত নয়। এই ব্যাপার আগেও ঘটিয়াছে। হিন্দুর প্রতিষ্ঠিত সহর ত এখনও এ দেশের মানচিত্র হইতে একেবারে মুছিয়া যায় নাই। হিন্দু সভ্যতার ভিতরও ভোগ ছিল, বিলাস ছিল; হিন্দুদের ভিতরও বড়লোক ছিল; হিন্দুদের ভিতরও কুটীর ছাড়াও বাসগৃহ ছিল। সুতরাং সহরের গন্ধ যে হিন্দু সভ্যতার ভিতর নাই,—একথা বলা চলে না।

কিন্তু তথাপি ইহাও অসত্য নহে, যে, কুটীরবাসিনীর দীনবেশ হিন্দুসভ্যতার গায়ে অতি স্পষ্ট। হিন্দুর চিন্তা, গ্রামবাসীর চিন্তা; হিন্দুর বিশ্বাস, দরিদ্রের বিশ্বাস। ধনী, ভোগী, বিলাসীর অভাব এদেশে কোন দিনই হয় ত হয় নাই; তথাপি দারিদ্র্য, দারিদ্র্য বলিয়াই কখনও নিপীড়িতও হয় নাই। দুর্ব্বলের উপর প্রবলের, দরিদ্রের উপর ধনীর বাহাদুরি দেখাইবার প্রবৃত্তিটা মানুষের স্বাভাবিক; সুতরাং এ দেশে কোন দরিদ্রই কখনও লাঞ্ছনা ভোগ করে নাই, একথা বলা দুঃসাহস মাত্র। দেবী সিংহ, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এদেশেরই লোক ছিলেন; নীল-কুঠিয়ালদের দেওয়ানজীরাও এদেশেরই লোক ছিলেন। কিন্তু তথাপি দারিদ্র্যকে হিন্দু কখনও অবহেলা করিতে পারে নাই; পল্লীর প্রতি নগর কখনও অবজ্ঞা দেখাইতে পারে নাই। কারণ, পল্লীতে থাকিতেন সংহিতাকার ঋষিরা; আর, দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন রাজার চেয়েও মান্য। সিংহাসন যিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই দিতে পারিতেন, সেই চাণক্যের আসন ছিল কুশাসন। যাঁরা ছিলেন সমাজের চিন্তা, বিশ্বাস ও ধারণার নায়ক, তাঁরা বেশীর ভাগই দরিদ্র ছিলেন, এবং থাকিতেন গ্রামে। সহরে বাণিজ্যের সম্ভার ছিল, সহর বিলাসের আবাসভূমি ছিল; কিন্তু আসল চিন্তালহরীর উৎপত্তি হইত পল্লীতে; সহরে বিচারালয় থাকিত, কিন্তু সংহিতার উৎপত্তি হইত গ্রামের ঋষিদের মস্তিষ্কে। সহরে রঙ্গমঞ্চ ছিল, নাটক ছিল, কবি ছিলেন; কিন্তু গ্রামে থাকিতেন নিষ্ঠাবান্ তপস্বী। সহরে বাৎসায়নের কামসূত্রের অধ্যাপনা হয় ত হইত, কিন্তু বেদান্তের অধ্যাপনা হইত মঠে; ন্যায়ের চর্চ্চা হইত গ্রামে। সুতরাং প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা যে মোটের উপর গ্রামেরই জিনিস, একথা জোর করিয়াই বলা চলে।

কিন্তু এখন? এখন কি হইয়াছে এবং কি হইবে? এখন যে সহর অত্যন্ত প্রধান হইয়া উঠিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অবশ্যই, তাই বলিয়া গ্রামের সঙ্গে সভ্য লোকদের কোন সংস্রব নাই, এরূপ নহে। এখনও জমীদারদের জমীদারী গ্রামে; এখনও সহরের লোকদের আহার্য্য আসে গ্রাম হইতে;—গ্রামে ফসল হয়, তরকারী হয়, দুধ হয়, এবং মাছ মাংসের চাষও সহরে হয় না। কিন্তু গ্রাম যদি শুধু ঐটুকুই হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে লোকের দেহ রক্ষার জন্য যথেষ্ট করিল বটে, কিন্তু সভ্যতার জন্য বিশেষ কিছু করিল না। সাহিত্য, শিল্প

প্রভৃতি গ্রামে হয় না; মাটীর নীচে যাহা জন্মে তাহা গ্রামে উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু তার পরে উহার উপর মানুষের যাহা কারিকরী হয়, তাহার স্থান সহর। গ্রামে উপাদান সৃষ্টি হয়, কিন্তু শিল্প জন্মে সহরে; কল কারখানা থাকে সহরে। পাট জন্মে গ্রামে, কিন্তু পাটের জিনিস হয় সহরে। বর্ত্তমান সভ্যতার বিশিষ্ট ধরণ টুকুই ঐখানে। বাণিজ্যপরায়ণ, শিল্পগত প্রাণ (industrial) যে বর্ত্তমান সভ্যতা, উহা সহরের ধূলা ও ধূয়া ছাড়িয়া থাকিতে পারে না।

শুধু তাই নয়; শুধু জড় বস্তুর উৎপাদনে ও পরিবর্ত্তনেই যে এইরূপ হইয়াছে, তাহা নয়। মানুষের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক চিন্তার কেন্দ্রও সহরে আসিয়া পড়িয়াছে। সহরে না আসিলে শিক্ষা হয় না, সাহিত্য বিজ্ঞানের চর্চ্চা হয় না, সুতরাং আদর্শ গঠনে—প্রকৃত মানব জীবন গঠনে সহরের সাহায্য প্রয়োজন। জাগদীশী পড়িতে হইলেও এখন সহরে আসিতে হয়; এবং জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য সহরে না আসিলে অনেকেরই অনাহার ব্যবস্থা হইবে।

এই ত এখন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার জন্য যে প্রতীচীর শিল্পময় সভ্যতাই মোটের উপর দায়ী, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহাতে কি লাভ হইয়াছে, না, লোকসান হইয়াছে? সংসারে যাহা কিছু হয় তাহার সবটারই লাভ লোকসানের খতিয়ান করা কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যবসায়বুদ্ধির পরিচায়ক। আর, সব জিনিসেরই আয়ান-প্রয়াণ আমার লাভ লোকসানের জন্যই হইবে, এমন বিধিই বা কোথায় আছে? তথাপি, আমাদের সভ্যতার এই কেন্দ্র পরিবর্ত্তনে আমাদেরও যে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সে পরিবর্ত্তনের ফল কি দাঁড়াইবে, এখনও বলা কঠিন। অন্যান্য নানা কারণের মধ্যে রাষ্ট্রীয় সংহতি গঠনের জন্য সহরের প্রয়োজন রহিয়াছে। সহরের লোককে যত সহজে একত্র করা যায়, সহরের লোক যত সহজে একত্র মিলিয়া কাজ করিতে পারে, গ্রামের লোকের পক্ষে তত সহজে তাহা হয় না। সুতরাং এই সব বিষয়ে সহরের লোকের প্রাধান্য থাকিবেই; এবং ঠিক এই জন্যই যাহারা প্রাধান্য লাভে যত্নবান্ তাহারাও সহরে আসিবেই। আবার, অনেককেই জীবিকার জন্যও সহরে আশ্রয় লইতে হয়। উকীল ব্যারিষ্টারেরা গ্রামে থাকিয়া কি করিতেন? বড় দোকানদারেরা গ্রামে থাকিয়া কি করিত? আমাদের জীবনে টাকা একটা প্রধান জিনিস; এবং এই টাকার সন্ধানে আমাদিগকে ছুটিয়া সহরে আসিতেই হয়। সুতরাং টাকার চক্রফেরার বর্ত্তমান বন্দোবস্ত যতদিন থাকিবে, ততদিন অনেক বিষয়েই সহরের প্রাধান্য অনিবার্য্য।

তথাপি, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায়ও কতক কতক বিষয়ে সহরের প্রাধান্য না থাকিলেও কোন ক্ষতি হইত না। শিক্ষার কেন্দ্রগুলি সহর হইতে সরাইয়া নিলে সহরের কোন কোন দোকানদারের লোকসান হইত বটে, কিন্তু দেশের বোধ হয় কোন হানি হইত না। তবে, রাজশক্তি থাকেন সহরে এবং তিনি বোধ হয় শিক্ষাকে সর্ব্বদা চোখের সাম্‌নে রাখিতে চান। কিন্তু সহরের লোকের দৃষ্টিশক্তি সাধারণতঃ একটু কম—সহরের শিক্ষার মধ্যেও একটু অদূরদর্শিতা আসিয়া পড়ে; ইহার উপর জড় বস্তুর প্রভাব একটু বেশী হইয়া পড়ে; মানুষের অব্যবহিত প্রয়োজন—তাহার খাওয়া পরা, ভোগ বিলাস ছাড়াও যে কোন সত্তা আছে, যাহার প্রতি মানুষের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন, এই কথাটা সহরের শিক্ষায় বিস্মৃত হওয়া কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সহর মানুষের শিল্পে পূর্ণ; কিন্তু মানুষের চেয়েও বড় যে প্রকৃতি রহিয়াছে, প্রকৃতি হইতে দূরে থাকিলে মানুষ তাহা মনে করিতে চায় না। একটা উদার সভ্যতা সৃষ্টির পক্ষে এই ভুলটী মারাত্মক। হয় ত, আমাদের অনেকেরে পক্ষেই সহর ছাড়িয়া থাকা অসম্ভব। কিন্তু তথাপি স্বীকার করিতেই হইবে, যে, আমাদের সভ্যতাকে যদি আমরা একটা পাকা রকমের দোকানদারী মাত্র করিয়া রাখিতে না চাই, তাহা হইলে বাহিরের নিসর্গ রাণীকে ভুলিয়া গেলে চলিবে না।

৮ম বর্ষ ফাল্গুন ১৩২৫ ১১শ সংখ্যা

মূর্খের কথা। *

সাহিত্য পরিষদ্ পণ্ডিতগণের সমাজ ; ইহার সভ্য, পৃষ্ঠপোষক, সহানুভূতিকারী সকলেই পণ্ডিত ও পণ্ডিতোচিত রুচিসম্পন্ন। এরূপ সভায় মূর্খের কথার আলোচনা নিতান্তই অশোভন মনে হইতে পারে। কেন না যদিও পণ্ডিতগণের মধ্যে ঐকমত্য অপেক্ষা মতভেদই অধিক দেখা যায়, এবং পণ্ডিতগণই বলিয়াছেন, "Doctors differ" "নাসৌ মুনি র্যস্য মতং ন ভিন্নম্" "পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা সমস্যা পুরিয়া", "বিয়াকালে পণ্ডিতে পণ্ডিতে বাদ লাগে", ইত্যাদি, তথাপি মূর্খ যে সকলেরই ঘৃণার যোগ্য সে বিষয়ে মতভেদ কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। একজন পণ্ডিত বলিয়াছেন, "পণ্ডিতে চ গুণাঃ সর্ব্বে মূর্খে দোষা হি কেবলম্" অর্থাৎ কি না যত রকমের গুণ আছে সবই পণ্ডিতদিগের একচেটিয়া, আর যত রকমের দোষ আছে সবই মূর্খের। আর একজন পণ্ডিত বলিয়াছেন—

তে মৃত্যুলোকে ভুবি ভারভূতা
মনুষ্যরূপেণ মৃগাশ্চরন্তি।

অর্থাৎ মূর্খেরা মনুষ্যরূপধারী পশু এবং এই পৃথিবীর ভার। আর একজন পণ্ডিত বলিয়াছেন—

সাহিত্যসঙ্গীত কলাবিহীনঃ
সাক্ষাৎ পশুঃ পুচ্ছবিষাণহীনঃ।

(যার সাহিত্যজ্ঞান নাই, সঙ্গীতজ্ঞান নাই, কলাবিদ্যার সহিত পরিচয় নাই এমন যে মূর্খ, সে একটা লা[illegible] শৃঙ্গহীন পশু।) আবার আর এক পণ্ডিত মেজাজ আরও একটু চড়াইয়া বলিয়াছেন—

মূর্খো হি জল্পতাং পুংসাং শ্রুত্বা বাচঃ শুভাশুভাঃ।
অশুভং বাক্যমাদত্তে পুরীষমিব শূকরঃ॥

(মূর্খ লোকমুখে ভাল-মন্দ দুই রকমেরই কথা শুনিয়া মন্দটুকুই গ্রহণ করে, যেমন শূকর—আর বাকিটুকু বলিবার প্রয়োজন নাই।)

আর একজন বলিতেছেন,

বরং পর্ব্বতদুর্গেষু ভ্রান্তং বনচরৈঃ সহ।
ন মূর্খজনসম্পর্কঃ সুরেন্দ্রভবনেষ্বপি॥

(বরং পর্ব্বতের দুর্গম স্থানে বনচর (পশুর) সহিত [illegible] করিব, তবু মূর্খের সংসর্গে ইন্দ্রের রঙ্গমহলেও বাস করিতে রাজি নহি।)

আর এক মহাপুরুষ যেন মূর্খের দশা ভাবিতে ভাবিতে কতকটা চটিয়া ও কতকটা হতাশ হইয়া লিখিয়াছেন—

শক্যো বারয়িতুং জলেন হুতভুক্ ছত্রেণ সূর্য্যাতপো
নাগেন্দ্রো নিশিতাঙ্কুশেন সমদো দণ্ডেন গোগর্দভৌ

* ঢাকা সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

ব্যাধি র্ভেষজসংগ্রহৈশ্চ বিবিধৈ র্মন্ত্রপ্রয়োগৈ র্বিষং
সর্ব্বস্যৌষধমস্তি শাস্ত্রবিহিতং মূর্খস্য নাস্ত্যৌষধম্ ॥

(আগুন জল দিয়া বারণ করা যায়, সূর্য্যাতপ ছত্র দিয়া বারণ করা যায়, মদমত্ত হাতীকে তীক্ষ্ণ অঙ্কুশ দিয়া দমন করা সম্ভব, গরু গাধা লগুড় প্রহারে বারণ করা চলে, ব্যাধি দমন করিবার উপায় নানারূপ ঔষধসংগ্রহ, বিষ-প্রশমনের উপায় মন্ত্র প্রয়োগ; এইরূপ সকলেরই একটা না একটা শাস্ত্রবিহিত ঔষধ আছে, কেবল ঔষধ নাই মূর্খের।)

সেকালের পণ্ডিতগণ শেষোক্ত শ্লোকের "মূর্খস্য নাস্ত্যৌষধম্" এই অংশটুকু স্থলে পাণ্ডিতী রসিকতা করিয়া পড়িতেন, 'মূর্খস্য লাঠ্যৌষধম্' অর্থাৎ মূর্খের ঔষধ লাঠি। পাঠশালার গুরুমহাশয়ের মুখে ঐ রসিকতাটুকু শুনিলে সেকালে সকল ছাত্রই হাসিতে চেষ্টা করিত সন্দেহ নাই, কিন্তু অনেকের বুক যে দুরু দুরু করিয়া কাঁপিত না, তাহাও জোর করিয়া বলা যায় না। কেন না মূর্খের প্রতি পণ্ডিত গুরুর রাগ কেবল রসিকতায় শেষ হইত না, অনেক সময়েই অতি প্রচণ্ড আকার ধারণ করিত। আধুনিক কালে নাকি "গুরু ট্রেইনিং" এর গুণে মূর্খ ছাত্রের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে—তাহার প্রতি ট্রেইনিং প্রাপ্ত গুরুর সহানুভূতি জন্মিতেছে,যদিও অবশ্য অতি বড় পণ্ডিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন ট্রেইনিংএর ফলে গুরু নিজেও ছাত্রের ন্যায় সহানুভূতির যোগ্য হইতেছেন। এসব অতি বড় পাণ্ডিত্যের কথা—ছাড়িয়া দেওয়া যা'ক।

আবার দেখুন আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র—যাঁহার মৌলিক প্রতিভার প্রথম পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের সৃষ্টিতে—তিনিও কি না নিতান্ত অকৃতজ্ঞের ন্যায় শেষকালে লাঠির প্রেমে গদ্‌গদ হইয়া "দেবী চৌধুরাণী"তে সেই পুরাণ কাঁচা পাণ্ডিতী রসিকতাটার আবৃত্তি করিয়া লিখিলেন—

"তুমি লাঠি! আর লাঠি নও, বংশখণ্ড মাত্র!......
তোমার সে মহিমা আর নাই শুনিতে পাই সেকালে তুমি নাকি উত্তম ঔষধ ছিলে—মানসিক ব্যাধির উত্তম চিকিৎসকদিগের মুখে শুনিতে পাই "মূর্খস্য লাঠ্যৌষধম্।" এখন মূর্খের ঔষধ "বাপু", "বাছা"—তাতেও রোগ ভাল হয় না।

মূর্খের প্রতি পণ্ডিতের চিরন্তন ঘৃণার অধিক প্রমাণ দেওয়া অনাবশ্যক। তেলে জলে মিলন সম্ভব, কিন্তু মূর্খের প্রতি পণ্ডিতের সানুগ্রহ দৃষ্টি কোনও কালেই সম্ভব বলিয়া আপাততঃ মনে হয় না। চার্লস্ ল্যাম্ব মনুষ্য সমাজে অধমর্ণ ও উত্তমর্ণ ("the men who borrow and the men who lend") এই দুইটি মাত্র শ্রেণী দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার মতে যে মহাপুরুষেরা কেবল পরের কাছে ঋণ করেন, তাহারাই প্রথম ও উন্নততর শ্রেণী, আর যে হীনচেতা ব্যক্তিগণ কেবল পরকে ঋণ দেয়, তাহারা দ্বিতীয় ও নিম্নতর শ্রেণী। ল্যাম্ব সুরসিক পুরুষ ছিলেন, তিনি এই কল্পিত শ্রেণী-বিভাগ লক্ষ্য করিয়া অনেক রসের কথা কহিয়াছেন। রসরচনায় আমার সামর্থ্য নাই, আর সাহিত্য পরিষদের উৎপত্তি রসসাহিত্যের আলোচনার জন্যও নহে, "বিজ্ঞান সম্মত প্রণালী"তে সাহিত্যের মুণ্ডপাত করিবার জন্য। আমিও আমার জ্ঞানবুদ্ধিমতে সেই সাহিত্যিকগণের একমাত্র অবলম্বনীয় বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী অবলম্বন করিয়াই আমার আলোচ্য বিষয় উপস্থাপিত করিতে চেষ্টা করিব। "বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী"তে বিচার করিলে দেখা যায়, মনুষ্যসমাজে দুইটি প্রধান ও ইতরেতর ব্যাবর্ত্তক ভাগ বা শ্রেণী আছে বটে, কিন্তু তাহা রসিক ল্যাম্বের উত্তমর্ণ, অধমর্ণও নহেই, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ Greek ও Barbarian, Jew ও Gentile, হিন্দু ও ম্লেচ্ছ, মোস্লেম ও কাফের, বা সাদা ও রংদারও (white and coloured) নহে; তাহা পণ্ডিত ও মূর্খ। এ দুইটি ভাগ এমন ব্যাপক অথচ এমন স্পষ্ট যে, ইহা বুঝিতে কোনও কষ্ট হয় না। ব্যাকরণের উত্তম পুরুষেরা সর্ব্বদাই পণ্ডিত; মধ্যম পুরুষেরা স্থলে স্থলে পণ্ডিত, উমেদার

ও মোসাহেবগণের নিকট আবার তাহারাই একমাত্র পণ্ডিত। গুণগ্রাহী সমালোচক না হইলে প্রথম পুরুষেরা প্রায় সর্ব্বত্রই মূর্খ। এই যে শ্রেণীবিভাগ ইহা মানব সমাজে চিরকাল বর্ত্তমান ছিল এবং চিরকাল থাকিবে। ইহাদের মধ্যে যে বিরোধ তাহাও চিরন্তন। বিশ্বসৃষ্টির মূলে যে এক শ্রেণীর দার্শনিকগণ অনাদি দ্বৈতভাব লক্ষ্য করিয়াছেন, হইতে পারে, ঐ বিরোধ তাহারই একটা অভিব্যক্তিমাত্র। তবে কথা এই যে, এই বিরোধটা কিছু একপক্ষনিবদ্ধ। অর্থাৎ পণ্ডিতে মূর্খকে দেখিতে পারেন না, তাহাকে অস্পৃশ্য অনাচরণীয় করিয়া রাখিতে চান। মূর্খ পণ্ডিতকে ঘৃণা করিবে এরূপ সাহস মূর্খের নাই। আমি যাহাকে মূর্খ ভাবি সে যদি আমাকে ঘৃণা করে, তাহা হইলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, সে আপনাকে মূর্খ মনে করিয়া করে না, আমার চেয়ে নিজকে পণ্ডিত মনে করিয়াই আমাকে ঘৃণা করিয়া থাকে। 'মৃণালিনী'র সেই বধির বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে মনে পড়ে ত—যিনি বলিয়াছিলেন, "ব্রাহ্মণীর ঐ বড় দোষ, কাণে কম শোনে"?

তবে সকল রীতিরই ব্যভিচার আছে, এবং সেই ব্যভিচার ভরসা করিয়াই পণ্ডিতসমাজে মূর্খের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে সাহসী হইয়াছি। পণ্ডিত মাত্রেই মূর্খকে ঘৃণা করেন বটে, কিন্তু এমন দুই একজন পণ্ডিতও কদাচিৎ দেখা যায়, যাঁহারা মূর্খতাকে সর্ব্ব দোষের আকর মনে করেন না, এমন কি, অবস্থাবিশেষে তাহা গুণ বলিয়াও বিবেচনা করেন। আমার কথাটার বোধ হয় একটা দৃষ্টান্ত আবশ্যক, কেন না অনেকেই হয় ত আমার কথা শুনিয়া অবাক্ হইতেছেন এবং ভাবিতেছেন, পণ্ডিতে মূর্খের প্রশংসা করে, ইহাও কি সম্ভব?

ওয়াল্টার বেজহটের (Walter Bagehot) নাম পণ্ডিত সমাজে অবিদিত নহে। তিনি বহুকাল Economist পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। তিনি নানা শাস্ত্রে কৃতবিদ্য ছিলেন, অর্থনীতি, সমাজ-নীতি, সাহিত্যপ্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি যে সমস্ত মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মর্য্যাদা বিশেষজ্ঞগণের নিকট অত্যন্ত অধিক। এ হেন পণ্ডিত ব্যক্তি একস্থলে * প্রসঙ্গক্রমে মূর্খ ও মূর্খতা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার কথার মর্ম্মানুবাদ এইরূপঃ—

"একটা স্বাধীন জাতির মধ্যে বহুসংখ্যক লোক স্বাধীনতাবোধসম্পন্ন এবং তাহাদের স্বাধীনতা স্থায়ী ও ক্রমোন্নতিশীল হইতে হইলে, তাহাদের মধ্যে যে মানসিক ধর্ম্মটির সত্তা আমি নিতান্ত অপরিহার্য্য মনে করি, তাহা শুনিলে হয়ত অনেকেই হাসিবেন, তাহা আর কিছু নহে—গণ্ডমূর্খতা। এ বিষয়ে প্রমাণ প্রয়োগের সূচনায়ই আধুনিক কালের কোনও জাতির অন্তঃকরণে ব্যথা দেওয়া আমার অভিপ্রেত নহে বলিয়া দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে রোমানদিগের চরিত্রের কথাই উল্লেখ করিব। একটিমাত্র জাতি ব্যতীত (সেটি কোন্ জাতি তাহা বোধ হয় স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক নহে) জগতের ইতিহাসে রোমানরাই রাজনীতিতে সমধিক উন্নত। এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, কিয়ৎপরিমাণ মূর্খতাই ঐ জাতির চরিত্রের সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্টলক্ষ্য ধর্ম্ম নহে কি না। চিন্তাক্ষেত্রে তাহাদের কৃতিত্বের ইতিহাস কিরূপ?—একবারে বর্ণপাতহীন নয় কি? তাহাদের সাহিত্য পরানুকরণমাত্র। কোনওরূপ abstract (বস্তুসম্বন্ধরহিত?) বিজ্ঞানে তাহারা কোনও তথ্য আবিষ্কার করে নাই, কিংবা উচ্চশ্রেণীর কল্পনাপ্রসূত কোনও নির্দ্দোষ বা সুসম্পাদিত কীর্ত্তি রাখিয়া যায় নাই। গ্রীকগণ সুসংস্কৃত মানবী প্রতিভার চরম উন্নতিসীমায় উপনীত হইয়াছিলেন; মানবসমাজ উত্তরাধিকারসূত্রে তাহাদের নিকট হইতে আত্মগৌরব মহিমার আদর্শভূত শিল্পসম্পদ প্রাপ্ত হইয়াছে। রোমানগণ উহার গুণে মুগ্ধ হইয়া কেবল অনুকরণই করিয়াছে। গ্রীকগণ

* *Letters on the French Coup de Etat* by Walter Bagehot.

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে নানা তথ্য আবিষ্কার ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, রোমানগণ মুগ্ধ হইয়া তাহা দেখিয়াছে এবং কাজে চিরদিন উহার অবজ্ঞাই করিয়াছে। গ্রীকগণ একপ্রকার সংখ্যালিখনরীতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, উহা আধুনিক কালে প্রচলিত রীতি হইতে কিঞ্চিৎ নিকৃষ্ট হইলেও, সেকালে উহাই উৎকৃষ্টতম ছিল; রোমানগণের রীতি এখনও তাহাদের নামেই পরিচিত, উহা যে কতদূর কদর্য্য তাহা সকলেই জানে। গ্রীকগণ বিজ্ঞানসম্মত প্রথায় অতি উৎকৃষ্ট দিন-পঞ্জী তৈয়ার করিয়াছিলেন, রোমানগণের মধ্যে রাষ্ট্রের প্রধান পুরোহিত (Pontifex Maximus) অমাবস্যার পর যে দিন প্রথম চন্দ্র দর্শন করিতেন সেই দিন হইতে নূতন মাস আরম্ভ হইত। সমগ্র ল্যাটিন সাহিত্যে একটি অসমাহিত, চিরন্তন সমস্যা এই—আমরা কেন স্বাধীন, তাহারা কেন দাস ? আমরা কেন প্রিটর (Praetor), তাহারা কেন বার্বার (Berber) ? কেন জগতে নির্ব্বোধ জাতিরই জয় এবং প্রতিভাশালী জাতির পরাজয় হয় ? বলা বাহুল্য যে, সারগর্ভ জড়বুদ্ধিতায় (আধুনিক কালের উন্নততম) ইংরেজ জাতিও জগতে তুলনারহিত। যেরূপ রসিকতায় ওয়েষ্টমিনষ্টার হলে পাঁচ সপ্তাহ পর্য্যন্ত হাসির লহর খেলে, তদপেক্ষা অনেক অধিক ও অনেক উচ্চশ্রেণীর রসিকতা আয়র্লণ্ডের অলিতে গলিতে শুনা যায়।"

পণ্ডিত সভ্য দেখিবেন, ওয়াল্টার বেজহট রসিকতার ছায়ামাত্র স্পর্শ না করিয়া ঐতিহাসিক প্রমাণ বলেই দেখাইলেন, মূর্খতা কেবলই দোষ নহে, মূর্খ দেখিলেই তাহাকে 'নাস্ত্যৌষধম্' বলিয়া পরিহাস বা 'শাঠ্যৌষধং' বলিয়া ভয়প্রদর্শন করাই একমাত্র ব্যবস্থা নহে। বেজহটের মতে কোনও জাতি স্বাধীনতায় যথার্থরূপে উন্নত হইতে হইলে, তাহাদের বুদ্ধি একটু কম হওয়াই আবশ্যক। ভারতবর্ষ যে চিরকাল পরপদানত এ দেশে অতিবুদ্ধি লোকের আধিক্যই তাহার কারণ কিনা তাহা গবেষণার যোগ্য।

আমাদের দেশের একজন পণ্ডিত "মূর্খের গুণ" উপলক্ষ্য করিয়া রসিকতা করিয়াছেন, তাহার রকমটা এই—

মূর্খত্বং সুলভং ভজস্ব কুমতে মূর্খস্য চাষ্টৌ গুণা
নিশ্চিন্তো বহুভোজকোঽতিমুখরো রাত্রিন্দিবং স্বপ্নভাক্
কার্য্যাকার্য্যবিচারণান্ধবধিরো মানাপমানে সমঃ
প্রায়েণামযবর্জ্জিতো দৃঢ়বপু মূর্খঃ সুখং জীবতি ॥

(মূর্খত্ব বড় সুলভ ; হে কুমতি লোক, ঐটাই ভজনা কর। মূর্খতার কি গুণ নাই ? আছে বই কি, মূর্খের আট আটটা গুণ। মূর্খ লোক নিশ্চিন্ত, মূর্খলোক বহুভোজনকারী, মূর্খ খুব কথা বলে, মূর্খ রাত্রি দিন সমান ঘুমায়, কার্য্যাকার্য্য বিচারে সে হয় অন্ধ, নয়ত বধির, তার মান অপমান সমান, তার রোগ কম, মূর্খ লোক খুব জোয়ান হয়, আর তাই কি ?—মূর্খ ই ত সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে।)

বলা বাহুল্য এটা হইল পণ্ডিতী রসিকতা ; আর কথার মত কথা একটা শুনুন। বেজহট বলিতেছেন—

"বস্তুতঃ আমরা যে ধর্ম্মটিকে ঘৃণাভরে মূর্খতা এই নাম দেই, উহা সাধারণ সমাজে প্রতিভাসম্পাদক না হইলেও, লোকের মতের মধ্যে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য এবং তাহাদের আচরণে একনিষ্ঠতা সম্পাদন করিবার জন্য উহা স্বয়ং প্রকৃতি দেবীরই কল্পিত একটা উপায়। ঐ ধর্ম্মটি থাকিলে এক বিষয়ে মনঃসংযোগ ঘনীভূত হয়। যে সকল লোক কোনও একটা বিষয় আয়ত্ত করিতে একটু অধিক সময় নেয়, তাহারা কেবল নিতান্ত আবশ্যক বিষয়েই জ্ঞান অর্জ্জন করে। লোককে সমধিক কর্ত্তব্যপরায়ণ করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় কি ?—তাহাদের যে ঐ কর্ত্তব্য ছাড়া আর কিছু করিবার থাকিতে পারে তৎসম্বন্ধে জানিতে না দেওয়া। মতের প্রতি লোকের আসক্তি দৃঢ় করিবার উপায়ও আর কিছুই নহে, ঐ মতের বিরুদ্ধে যেযে যুক্তি আছে, তৎসমুদয়

বুঝিবার অক্ষমতা জন্মান। এই সকল অমূল্য তথ্য যে আমিই প্রথমে আবিষ্কার করিয়াছি তাহা নহে, যাহাদেরই এবিষয়ে কিঞ্চিৎ চর্চ্চা করিতে হয় তাঁহারাই ইহা জানে। তুমি যে কৌসুলিটিকে বেশ চালাক চতুর ভাবিয়া হয়ত তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়াছ, তার সম্বন্ধে তোমার বুড়া তুখোর এটর্ণিটির মত কি তাহা নির্ণয় করিয়াছ কি? তার কথা এই—'চালাক চতুর? হাঁ, তা বটে, তবে কিনা কাজের পক্ষে অতি চালাক। ইহার অর্দ্ধেক সেয়ানা হইলে ভাল হইত; এর উপর নির্ভর করা যায় না, উঁহু, এক মুহূর্ত্তের জন্যও এ ছোকরার উপর ভার দেওয়া নিরাপদ নয়।' আমি উক্ত এটর্ণি মহাশয়েরই যুক্তির একটু সম্প্রসারণ করিয়া বলি যে, ব্যক্তির ন্যায় জাতিও কর্ম্মক্ষেত্রে পটুতা লাভের পক্ষে অতি চালাক হইতে পারে, এবং সমুচিত নির্ব্বুদ্ধিতার অভাবে চিরকাল পরাধীন হইয়া থাকিতে পারে।......"

বেজহট আরও বলেন—

"আমি যাহাকে সমুচিত মূর্খতা বলি উহা মানুষকে অনেক প্রকার চরিত্রগত ত্রুটি হইতে মুক্ত রাখে। যিনি প্রচুর পরিমাণে ঐ গুণের অধিকারী, তিনি স্বীয় পুরাতন ধারণাগুলিতে বাঁধা থাকেন, নূতন কোনও কথার একতিল পরিমাণ হৃদয়ঙ্গম করিতে তাহার সাত সপ্তাহের প্রয়োজন হয়। নিত্য নূতন মতে তাহাকে উৎপথপ্রবর্ত্তিত করিতে পারে না, কেননা নিত্য নূতন মত তাহার যত বিরক্তিজনক এরূপ আর কিছুই নহে। তিনি তাঁহার চিরাভ্যস্ত কার্য্যক্ষেত্রে চিরানুসৃত অভ্যাসের গণ্ডীতে, চিরবিদিত সিদ্ধান্তসমূহের বেষ্টনে, চিরপোষিত বিশ্বাসসমূহের চতুঃসীমায় বাঁধা থাকেন। তিনি কখনও চপলতা বা অধৈর্য্য প্রকাশে প্রলুব্ধ হন না, কেন না তিনি রসিকতার ধার ধারেন না আর তাহার ত্বক্ কিঞ্চিৎ পুরু বলিয়া বিরক্তির হেতু উপস্থিত হইলেও সেটা সহজে গায়ে তোলেন না।......"

আর অধিক উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। আশঙ্কা করিতেছি মৌলিক গবেষণাপ্রিয় সমালোচকের ইতিমধ্যেই ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছে। যে মূর্খের কথা লইয়া পণ্ডিত সমাজে উপস্থিত হয়, তাহারও বুদ্ধি একটু মন্থর এবং চামড়া একটু পুরু, তাহা সহজেই বুঝা যায়, সুতরাং এ অধম লেখকের উপর রোষ প্রকাশ বৃথা হইবে ভাবিয়া আশা করি সমালোচক মহাশয় কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিবেন। এ প্রবন্ধে যদি কেহ মৌলিক গবেষণা আশা করিয়া থাকেন, তবে তাহা তাঁহারই ভ্রম বলিতে হইবে। 'গবেষণা' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ না কি গরু খোঁজা। যদি তাহা হয় তবে খোঁজার প্রয়াস দেখিতে পান আর নাই পান অনেক গরুর বিবরণ পাইবেন। কিন্তু একটু ধৈর্য্য ধরিতে হইবে। আগে একটু মঙ্গলাচরণ আবশ্যক, কেননা গরু পশু হইলেও দেবতা, ব্রাহ্মণের সঙ্গে এক পর্য্যায়ভুক্ত। সেই জন্য তাহাদের বিবরণ ধর্ম্মশাস্ত্রসঙ্গত রীতিতে আরম্ভ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে তাহাই করা যাক্।

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্" ইত্যাদি।

অস্তি ঢাকা জেলায় ধামরাই নামে একটি গ্রাম, তত্র সাড়েসাত শত তন্তুবায়ের বসতি বলিয়া বহুকালপ্রচলিত একটি প্রবাদ আছে। গত লোক গণনার সময় তন্তুবায় পরিবারের সংখ্যা কত দাঁড়াইয়াছিল তাহা আমার জানা নাই, চারি বা পাঁচ শতের কম নাও হইতে পারে। সে যাহা হউক, প্রবাদোক্ত ঐ সাড়ে সাত শত ঘর তন্তুবায়ের মাহাত্ম্যে ধামরাই গ্রাম এতদঞ্চলে মূর্খের গ্রাম বলিয়া বহুকাল যাবৎ অনতিকাঙ্ক্ষণীয় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রত্নতত্ত্বরসিক সমালোচক হয়ত ইতিমধ্যেই আমার উপর আবার খড়গহস্ত হইয়াছেন, কেননা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই "প্রতিভা" পত্রিকায় একজন সুযোগ্য লেখক ধামরাই গ্রামের প্রত্নতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছিলেন, আবার পত্রিকান্তরে রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, দুই হাজার বৎসরেরও অধিক কাল পূর্ব্বে ধামরাই গ্রাম বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধ

বিদ্যার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। এমন একটা স্থান মূর্খের গ্রাম কি প্রকারে হইতে পারে? বিশেষ, এখানে একটা প্রাচীন প্রস্তরস্তম্ভও পাওয়া গিয়াছে। তার পর অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও এই গ্রামে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাস করিতেন, এখন দুই এক জনের অধিক পণ্ডিত না থাকিলেও শ্রাদ্ধাদিতে সাত ঘর পণ্ডিতের উত্তরাধিকারিগণ বিদায় পাইয়া থাকেন। তা ছাড়া অন্ততঃ ভাইকাউন্ট হার্ডিঞ্জের ঠাকুরদাদার আমল হইতে যে এখানে একটি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় ছিল তাহারও প্রমাণ সরকারি দপ্তর হইতে পাওয়া সম্ভব। আর একালের statistics লইলে হয়ত এই একটা গ্রামে এত গ্রাজুয়েট, আণ্ডার গ্রাজুয়েট ইত্যাদি পাওয়া যাইবে যাহা এ জেলার অন্য কোনও গ্রামে নাই। এত ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, statistical প্রমাণের আমার কথা সাহিত্যপরিষদের সভ্যগণের কাছে বিকাইবে কেন? কিন্তু আমি কি করিব? প্রত্নতত্ত্ব ইতিহাস, বা statistics যাহাই বলুক, প্রবাদ বলে, ধামরাই একটা নিরেট মূর্খের গ্রাম। যাহারা ইতিহাস, বা প্রত্নতত্ত্ব বা statistics এর ধার ধারে না, তারা শুনিয়াছে এবং বিশ্বাস করে যে, ধামরাই গ্রামের তন্তুবায়গণ এককালে অতি নির্ব্বোধ ছিল, এবং তাহাদের সংসর্গ দোষে এই গ্রামের ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থাদি কয়েকটি প্রাচীন ভদ্রবংশেরও নির্ব্বুদ্ধিতা খ্যাতি বা অখ্যাতি আছে বা ছিল। লোকে বলে অদ্যাপি ধামরাই গ্রামের কোনও লোককে "বাড়ী কোথায়?" জিজ্ঞাসা করিবার পর, "চিন্‌লাম" বা "চিন্‌তে পেরেছি" বলিলে, তিনি ব্রাহ্মণ হউন বা বৈদ্য হউন বা, তন্তুবায় হউন বা নমঃশূদ্র হউন, হিন্দু হউন বা মুসলমান হউন, সব সময়েই ভয়ানক ভাবে চটিয়া যান, এবং কখনও কখনও অভিধানবহির্ভূত ভাষায় প্রত্যুত্তরও দেন। এই প্রবাদের রকম এবং মূল, এবং সঙ্গে সঙ্গে, ধামরাইবাসীদের কিঞ্চিৎ বিবরণ অদ্য আপনাদিগকে উপহার দিব।

ধামরাই গ্রামটি একটি জনবহুল গ্রাম। ইহার লোকসংখ্যা দ্বাদশ সহস্রের কম নহে। কিন্তু বোধ হয় ইহাতে অন্য যে-কোনও জাতির তুলনায় অদ্যাপি তন্তুবায়গণের সংখ্যাই অধিক। তন্তুবায়গণ এখন নানা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে, কোন্ জাতিই বা ইদানীং একনিষ্ঠ ভাবে স্বজাতীয় ব্যবসায় ধরিয়া আছে? বিশেষ তাঁতের কাজ ইদানীং তেমন লাভজনক নহে। দেশী কাপড়ের ব্যবসায়ের যাহা কিছু লাভ, তাহার অধিকাংশই মধ্যবর্ত্তী লোকের প্রাপ্য। ইঁহারা তন্তুবায়কে দাদন দেয়, সূতা দেয়, ও যথাসম্ভব কম পারিশ্রমিকে তাহার বুনা কাপড়গুলি গ্রহণ করে। এই মধ্যবর্ত্তী লোকগুলিও জাতিতে তাঁতী বটে, কিন্তু ইহাদের সংখ্যা খুব কম। কেননা প্রচুর মূলধন ব্যতীত এ ব্যবসায় চলে না। যাহারা কাপড় বুনায় তাহাদের অধিকাংশ লোকের অবস্থাই খারাপ। মধ্যবর্ত্তীর হাতে পড়া ছাড়া তাহাদের অন্য গতি নাই।

তন্তুবায়ের ব্যবসায়ের একটা প্রধান অসুবিধা এই যে, ইহাতে বড় অধিক মনোযোগ দরকার। একটু অসতর্ক হইলেই হয়ত তাঁত ছিঁড়িয়া মাকু ছুটিয়া পায়ে বা হাতে লাগিতে পারে। তাহাতে ক্লেশ ত আছেই, ক্ষতিও খুব অধিক। তদ্ভিন্ন এই কাজটি প্রচুর আলোক ব্যতীত করা সম্ভব নহে বলিয়া তন্তুবায়কে দিনের অধিক ভাগই গৃহের মধ্যে বসিয়া থাকিতে হয়। সেইজন্য সংসারের অন্যান্য ব্যাপারে তাহার অভিজ্ঞতা অতি সঙ্কীর্ণ থাকিয়া যায়। সে কেবল সূতার আকার প্রকার "মাকু", "চরকা" "টানা" ইহাই জানে এবং ইহারই ভাল মন্দ বিচারে সমর্থ। এমন কি কাপড় সম্বন্ধেও বাজারে চলিত ফ্যাসনের খবর সে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কিছু রাখে না। সে খবর সে তাহার মহাজন বা পূর্ব্বোক্ত মধ্যবর্ত্তীর মুখে কিঞ্চিৎ শুনে। সব কথা তাহাকে সত্য ভাবে শুনান মহাজনের স্বার্থের অনুকূল নয় বলিয়া সে যাহা জানে তাহার মূল্য বড় অধিক নহে।

যে কোনও ব্যবসায়ে অতিরিক্ত মনোযোগ দিলেই ; লোকের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সঙ্কীর্ণসীমাবদ্ধ হয়। এইজন্য গল্পমাত্রেই তাঁতী বা ব্রাহ্মণ মূর্খের ভূমিকা প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণকেও সর্ব্বদা হয় টোলের অধ্যাপনা, না হয় শাস্ত্রের বিধি ব্যবস্থার আলোচনা, না হয় শাস্ত্রীয় ক্রিয়া-কাণ্ড লইয়া ব্যাপৃত থাকিতে হয়। প্রাচীন গল্পে নাপিতই চিরকাল ধূর্ত্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। 'নরাণাং নাপিতো ধূর্ত্তঃ'। নাপিত ব্যবসায় উপলক্ষে বাড়ী বাড়ী বেড়ায়, সেখানেও কাজ করিতে করিতে সে সকল খবর আদায় করিবার সুবিধা পায়। ব্রাহ্মণের মত তাহাকে অনন্যমনা হইয়া স্বকার্য্যে লিপ্ত থাকিতে হয় না। সে ক্ষুরও চালায়, বাড়ীর বা পাড়ার গূঢ় খবরটিও আদায় করিয়া আনে। এইজন্য নাপিত ধূর্ত্ত। আমার বিশ্বাস সকল ব্যবসায়ের মধ্যে তন্তুবায়ের ব্যবসায়ই লোকের সাংসারিক জ্ঞান অর্জ্জনের প্রবল বাধাদায়ক। সেইজন্য তন্তুবায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অজ্ঞ। তাহার শিল্পের সূক্ষ্মতা, তাহার কারুকার্য্য, তাহার অনন্যমনস্কতা এবং তাহার দারিদ্র্য প্রভৃতি সকলই তাহার অজ্ঞতার পরিপোষক। এইজন্যই তন্তুবায়জাতি সমাজের পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়াও, চিরকাল উপহাসের বিষয় হইয়া রহিয়াছে।

অবশ্য আধুনিক কালে বঙ্গের অন্যান্য অধিকাংশ জাতির ন্যায় তন্তুবায়গণেরও অনেকে জাতীয় ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়াছেন, এবং ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিয়া হাকিম, উকিল, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার কাজ প্রতিষ্ঠার সহিত করিতেছেন। যতদিন তন্তুবায় তাঁত লইয়া ছিল, ততদিন ইহা সম্ভব হয় নাই। তাঁতের কাজ করিতে করিতে কেহ অন্য কোনও ক্ষেত্রে বিশেষ বুদ্ধি বিদ্যা বা অন্য-বিধ গৌরবের অধিকারী হইয়াছেন একপ দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বড় বিরল। কারণও পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তথাপি দৃষ্টান্ত যে নাই তাহা নহে। আমাদের দেশের সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মসংস্কারক কবীর তন্তুবায়ের ব্যবসায় করিতেন এবং ঐ কাজ করিতে করিতেই তাঁহার জ্ঞান লাভ হয়, এবং তৎপরেও তিনি উহা ত্যাগ করেন নাই। অন্য দেশেও দুই একটি দৃষ্টান্ত আছে। কবীরের জীবন সম্বন্ধে Evelyn Underhill লিখিয়াছেন :—

It is clear that he never adopted the life of the professional ascetic or retired from the world in order to devote himself to bodily mortifications and the exclusive pursuit of the contemplative life.........All the legends agree on this point that Kabir was a weaver, a simple and unlettered man who earned his living at the loom, like Paul the tent-maker, Boehme the cobbler, Bunyan the tinker, Torsteegen the ribbon-maker, he knew how to combine vision and industry.

কথিত আছে একবার কাশীতে গুরু রামানন্দের আদেশে কবীর সর্ব্বজিৎ নামে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন। বিচারের পূর্ব্বে পণ্ডিতজী জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি বাপু জাতিতে কি ?"

কবীর কহিলেন—"তাঁতী"।

পণ্ডিত।—"তাঁতীর সহিত পণ্ডিতের বিচার হয় না"।

কবীর। কেন? তাঁতী কি কম?

তারপর কবীর একটি কবিতায় বা গানে যাহা বলিলেন তাহার ইংরেজি অনুবাদ Macauliffe প্রণীত *Sikhism* নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল:—

No one knoweth the secret of the weaver
God hath woven the warp of the whole world
If thou listen to the Vedas and the Puranas
Thou shalt hear, "I have stretched the warp so long;
I have made the Earth and Firmament my workshop

I have set the Sun and the Moon in alternate motion
Working my legs I did one work'—with such a weaver my heart is pleased.
The weaver hath looked into his own heart and there recognised God.
Saith Kabir,'I have broken up my workshop'
And the weaver hath blended his thread with the thread of God.

ধামরাইতে তন্তুবায়ের সংখ্যা চিরকালই অধিক বলিয়া এবং পূর্ব্বকালে সকল তন্তুবায়ই জাতিগত ব্যবসায় দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিত বলিয়া ইহাদের অজ্ঞতা যে ক্রমে প্রবাদের বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু এই প্রবাদগুলির মধ্যেও যে একটু বিশেষত্ব আছে তাহা পরে বলিব। প্রথমতঃ দুই একটি প্রবাদই বলি।

কথিত আছে, একবার একদল তাঁতী কোনও এক হাটে কাপড় বিক্রয় করিতে যায়। ফিরিয়া আসিবার সময় পথিমধ্যেই সন্ধ্যা হওয়ায় তাহারা নির্ম্মল জ্যোৎস্নালোকে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর পার হইতে থাকে, কিন্তু দিগ্‌ভ্রম হওয়ায়—তাহারা গন্তব্য পথ হইতে দূরে এক বালুকাময় চরের নিকট গিয়া উপস্থিত হয়। চরের বিস্তীর্ণ বালুকা রাশির উপর জোৎস্না পতিত হওয়ায়—মূর্খগণের উহা নদী বা তড়াগ বলিয়া ভ্রম হয় এবং তাহারা সেই বালুচরের উপরই সন্তরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। ইহার ফল কিরূপ হইতে পারে তাহা পণ্ডিতগণের পক্ষে সহজেই অনুমেয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বক্ষঃস্থল ক্ষত বিক্ষত, ও রক্তাক্ত হইবার পূর্ব্বে মূর্খগণ বুঝিতে পারে নাই যে, উহা জল নহে বালুকামাত্র। সে যাহা হউক, এই কল্পিত বিপদ উত্তীর্ণ হইবার পর, তাহারা কেহ পিছনে পড়িয়া রহিল কি না তাহা নির্ণয় করিবার জন্য আপনাদের দলের লোকসংখ্যা গণনা করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহাতেও এক বিপদ উপস্থিত। প্রত্যেকেই আপনাকে বাদ দিয়া গণনা করায় দলের একজন লোক বালুচরেই ডুবিয়া গিয়াছে সিদ্ধান্ত করিয়া সকলে মিলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। ইতি প্রথম প্রবাদ।

দ্বিতীয় প্রবাদ এই যে, আর একবার নৌকা যোগে এক দূরবর্ত্তী হাট হইতে ফিরিবার সময় এক দল তাঁতী অর্দ্ধপয়সার আমড়া কিনিয়া ভোজন করে। তৎপরে পিপাসার্ত্ত হইয়া জলপান কালে জল মিষ্ট বোধ হওয়ায়, তাহাদের স্থূলবুদ্ধিতে এই প্রতীতি জন্মে যে, ঐ নদীর জল চিনিমিশ্রিত। তাহাদের মধ্যে একজন মাতব্বর ছিল, তাহার নাম হৈরা (হরি) চিপাই। হরি বিজ্ঞ বলিয়া পরিচিত ছিল, এবং সে কথক প্রভৃতির মুখে শাস্ত্র কথাও কিছু কিছু শুনিয়াছিল। সে বিজ্ঞোচিত গাম্ভীর্য্য সহকারে বলিল, "শাস্ত্রে যে ইক্ষু সমুদ্রের কথা আছে ইহা তাহাই। এই জল জ্বাল দিলে গুড় পাওয়া যাইতে পারে।" তাহার এই মৌলিকগবেষণাপূর্ণ সিদ্ধান্তে সকলে নৌকার অন্যান্য জিনিষ তীরে নিক্ষেপ করিয়া নৌকা ভরিয়া সেই কল্পিত ইক্ষুরস গৃহে আনয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের অতিরিক্ত উৎসাহে নৌকাখানি জলমগ্ন হইয়াছিল কিনা সে বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ অদ্যাপি পাই নাই। আশাকরা যায়, প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের চেষ্টায় যথা সময়ে কোনও একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত, পঠিত, ও গবেষিত হইয়া এ বিষয়ে প্রচুর জ্ঞানালোক নিক্ষেপ করিবে।

আর একবার একদল তাঁতী এক অন্ধকারময় রাত্রিতে নৌকাযাত্রা করে। নৌকাখানি যে তীরে একটি গাছের সঙ্গে বান্ধা ছিল, তাহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছিল। কাজেই সমস্ত রাত্রি নৌকা বাহিবার পর প্রভাতে দেখে তাহারা গ্রামের ঘাটেই আছে। তখন তাহাদের একজন বলিল, "কি আশ্চর্য্য! আমি ছাড়ি ধামরাইরে ধামরাই ছাড়ে না আমারে!" এই উক্তিটি এখনও ধামরাই বাসিগণের প্রাচীন কলঙ্কের স্মারক প্রবাদবাক্যরূপে

পরিণত হইয়াছে। কথিত আছে, এই প্রবাদ ধামরাই বাসী কাহারও কর্ণগোচর হইলে তিনি আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারেন না।

চতুর্থ প্রবাদটি এইরূপ। আর একবার একদল তাঁতী এক সুদূর হাট হইতে নৌকাযোগে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল। পথে তাহাদের একজন পিপাসার্ত্ত হইয়া একটি ঘটিদ্বারা নদী হইতে জল তুলিয়া পান করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু মূর্খের অশেষ দোষ, ঘটিটা নদীর স্রোতে হস্তচ্যুত হইয়া জলমগ্ন হইল। তখন তাহাদের মাতব্বর হরি টিপাই ব্যবস্থা করিল যে, নৌকার যে স্থান দিয়া ঘটিটি জলে পড়িয়াছে, ঐ স্থানে "মাথা কাঠে" দা দিয়া একটা দাগ করিয়া রাখা হউক। তাহাই করা হইল। পরে বাড়ীর ঘাটে আসিয়া হরি বলিল, "সকলে মাথা কাঠের দাগের সোজাসুজি জলে নামিয়া ডুবাইতে থাক, ঘটিটি নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে।" বলা বাহুল্য, মূর্খগণ তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইল। কতক্ষণ বা কত দিন পরে তাহাদের চৈতন্যোদয় হইয়াছিল, তৎ-সম্বন্ধে প্রমাণ সংগ্রহের ভার প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

আর একটি প্রবাদ এই যে, একবার ঘরের চালে একখণ্ড অর্দ্ধভক্ষিত পিষ্টক (চিতৈ পিঠা) দেখিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে আকুল হইয়া এক তন্তুবায় গৃহস্থ হরি টিপাইয়ের শরণাপন্ন হয়। হরি টিপাই সবিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, উহা আর কিছুই নহে, সম্ভবতঃ চাঁদে ঘুণ ধরায় তাহার কিয়দংশ আকাশ হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। কিয়ৎকাল পরে একটি কাক ঐ পিষ্টকখণ্ড লইয়া অন্যত্র উড়িয়া যাওয়ায় অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া সমস্ত তন্তুবায় সমাজ পূর্ব্বকথিত গৃহস্থকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য করিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বোক্ত ঘটনা অর্থাৎ ঘরের চালে পিষ্টকদর্শন, হরি টিপাইয়ের মৃত্যুর পর ঘটে। তন্তুবায়গণ উহা ঘুণে খাওয়া চাঁদের কোণা সিদ্ধান্ত করিয়া আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিল—

হৈয়া বিনে ধামরাই আঁধ,
ঘুণে খাইল স্বর্গের চাঁদ।

ষষ্ঠ প্রবাদ এই যে, একবার এক তাঁতীর পুত্র, ঘরের খুঁটি জড়াইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এমন সময় ৺ মাধব বিগ্রহের প্রসাদ দেখিয়া তাহা পাইবার জন্য ক্রন্দন করিতে থাকে। তাহার বাপ বা মা তাহাকে প্রসাদ দিতে আসিলে সে খুঁটির দুই দিক দিয়া দুই হাত বাড়াইয়া প্রসাদ লইল। এখন সে অবস্থায় প্রসাদ খাওয়া যায় না, আর অঞ্জলি বিমুক্ত করিয়া খুঁটির বেষ্টন ত্যাগ করিতে হইলে প্রসাদও মাটিতে পড়িয়া যায়। এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া তন্তুবায়-সুত উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিতে লাগিল। তাহার মূর্খ পিতা ও প্রতিবেশিবর্গ অন্য উপায় স্থির করিতে না পারিয়া ঘরের চাল খুলিয়া প্রসাদপাণি পুত্রকে খুঁটির মাথা পর্য্যন্ত তুলিয়া পরে খুঁটির বেষ্টন হইতে মুক্ত করিয়া আনে।

এইরূপ আরও ২।১টি প্রবাদ আছে। বাহুল্য ভয়ে তাহা উল্লেখ করিলাম না। এখন তন্তুবায়গণের সহিত এক গ্রামে বাস হেতু বুদ্ধির জড়তাগ্রস্ত দুই একটি প্রাচীন ভদ্র পরিবারের যে কৌলিক অপবাদ আছে, তদ্বিষয়ের উল্লেখ করিব। এক বৈদ্য বংশের কৌলিক অপবাদসূচক নাম—তোটের উরুষ। প্রবাদ এই, এই বংশের কোনও ব্যক্তির একটি গদি ছিল, তাহাতে বহুতর ছারপোকা জন্মে। ছারপোকা বংশ ধ্বংস করা অসাধ্য দেখিয়া সুবুদ্ধি বৈদ্য মহাশয় তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, অগ্নি কেবল ছারপোকাই ধ্বংস করিবে—গদি স্পর্শ করিবে না। কিন্তু অল্পক্ষণ পরে, ছারপোকাকুল নির্ম্মূল হইলে যখন তিনি গদিটি পুনরায় গৃহে তুলিয়া লইবার প্রয়াস করিলেন, তখন তাহার ভ্রম দূর হইল।

আর এক বৈদ্য বংশের খ্যাতি বা অখ্যাতি এই যে, এই বংশের কোনও সুযোগ্য ব্যক্তি একবার একটি সরা লইয়া তৈল কিনিবার জন্য দোকানে যান। তিনি

যতটুকু তৈল কিনিলেন, তাহাতেই সরা ভরিয়া গেল। কিন্তু রীতি আছে, জিনিষ কিনিলেই কিছু ফাউ লইতে হইবে। সুতরাং তিনিও যথারীতি ফাউ চাহিলেন। দোকানদার বলিল, ফাউ কোথায় লইবেন? তিনি ভাবিলেন, তাই ত, সরা ত ভরিয়া গিয়াছে, সরার নীচে যে 'মুছী' টুকু আছে, উহাতেই ফাউ লই।" এই ভাবিয়া যে-ই তিনি সরাটি উল্টাইলেন, অমনি সব তৈল মাটিতে পড়িয়া গেল। এই অপবাদ হইতে উক্ত বৈদ্য-বংশের নাম "চিৎসরা" হইয়াছে।

আর এক বংশের একজন রাত্রিযোগে মাংসভক্ষণে ইচ্ছুক হইয়া অন্ধকারে একটি পাঠা চুরি করিয়া তাহা বধ করেন। পরে দেখা গেল সেটা ছাগ নয় হিন্দুর অখাদ্য ছাগী। ঐ বংশের নাম "আঁধারে পাঠা"।

আর এক বংশের নাম "আদা-মাগুর"। এই বংশের একজন কীর্ত্তিমান্ সুবুদ্ধি পুরুষ এক জলাশয়ে মদগুরমৎস্য আছে শুনিয়া, বাড়ীতে গৃহিণীকে বলিয়া-ছিলেন, "গিন্নি, শীগ্‌গির্ আদা বাটিয়া রাখ, আমি মাগুর মাছ ধরিতে চলিলাম। অদ্য মাগুরের ঝোল খাইতে হইবে।" শুনা যায় শেষে তাঁহাকে শুধু আদ্রকের ঝোলই খাইতে হইয়াছিল, মদ্গুর মিলে নাই।

এক বিশিষ্ট কায়স্থ-বংশের অপবাদ এই যে, এই বংশের এক ব্যক্তি গাছে লেবু হইয়াছে দেখিয়া কার্পণ্য-দোষবশতঃ ভোজনকালে উহার এক অংশ কাটিয়া আনেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, উহা গাছে থাকিয়া ক্রমশঃ বড় হইবে। কয়েক দিন পরে গাছের নিকট গিয়া দেখিলেন অর্দ্ধকর্ত্তিত লেবুটি পচিয়া গিয়াছে। এই অপবাদ হইতে এই কায়স্থ বংশের নাম "কাটা জাম্বীর"। (জাম্বীর=জম্বীর)।

এই সঙ্গে এক ব্রাহ্মণ বংশেরও কীর্ত্তি বা অকীর্ত্তির কথা কীর্ত্তন করি। প্রবাদ এই যে, এই বংশের কোনও মহাজন একদা এক যজমানগৃহে সূর্য্যপূজায় পৌরোহিত্য করিতেছিলেন। আপনারা হয়ত জানেন, সূর্য্য পূজায় কবুতর (পায়রা) বলি দিবার রীতি আছে। কখনও কখনও উৎসর্গ করিয়া কবুতর ছাড়িয়াও দেওয়া হয়। সে যাহাই হউক, পুরোহিত-ঠাকুর উৎসর্গ করিবার জন্য কবুতরটি বামহস্তে ধরিতে যাইতেছেন কি অমনি কবুতরটি সূর্য্যের সেবায় নিজ গলরক্ত দান করিয়া স্বর্গে গমনের লোভ ত্যাগ করিয়া নিজের ডানা দুখানির জোরেই স্বর্গে যাওয়া যায় কি না তাহা দেখিবার জন্য উধাও হইয়া উড়িয়া গেল। পুরোহিত ঠাকুর দেখিলেন, তাঁহারই অসাবধানতায় যজমানের কার্য্য পণ্ড হইয়া যায়; তখন তিনি যজমানকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "কোনও চিন্তা নাই, উড়ন্ত কপোতও উৎ-সর্গের ব্যবস্থা আছে"। তার পর তিনি নিম্নলিখিত মন্ত্রে উক্ত কপোত উৎসর্গ করিলেন—

খাচায় নমঃ বাচায় নমঃ
যথায় যায় তথায় নমঃ ॥

এক্ষেত্রে পুরোহিতঠাকুরটি প্রকৃতপক্ষে মূর্খ ছিলেন কি, প্রত্যুৎপন্নমতি চতুর ব্যক্তি ছিলেন তাহা আপনারা বিবেচনা করিবেন। লোকে কিন্তু এখনও তাঁহার বংশকে "কবুতর বংশ" বলিয়া উপহাস করে।

এইরূপ নানা বংশের নানা অখ্যাতি আছে। এককালে এই সকল অপবাদ উল্লেখ করিয়া গ্রামে অনেক ঠাট্টা চাতুরী রসিকতা ইত্যাদি হইত। এখন রুচির পরিবর্ত্তন হওয়ায়, লোকে অপবাদগুলি প্রায়ই বিস্মৃত হইয়াছে। চেষ্টা করিয়াও আর অধিক সংগ্রহ করিতে পারিলাম না।

উপরে বলিয়াছি ধামরাই গ্রামটি খুব প্রাচীন; কাজেই প্রবাদগুলিও বহুকালাগত। লোকে ভালটা ভুলিয়া যায়, কিন্তু মন্দটা স্মরণ রাখে। সেক্সপীয়র বলিয়াছেন:—

The evil that men do lives after them,
The good is oft interred with their bones.

ধামরাই গ্রামের তন্তুবায় সম্বন্ধেও তাহাই হইয়াছে কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নানা দেশের তন্তুবায়

জাতির প্রবাদ ও কথা সাহিত্য তুলনা করিলে দেখা যায়, উক্ত গল্পগুলির মধ্যে কয়েকটি কেবল থামরাই গ্রামবাসিগণের কীর্ত্তির পরিচায়ক নহে। দুই একটি সমগ্র আর্য্য জাতির সাধারণ সম্পদ। একটা উদাহরণ দিব।

অনেকেরই বিদিত থাকা সম্ভব যে, আমাদের দেশের প্রাচীনতম উপকথাসংগ্রহের নাম বৃহৎ কথা। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে গুণাঢ্য নামক এক কবি প্রাকৃত পৈশাচী ভাষায় প্রতিষ্ঠান-নগরে উক্ত গ্রন্থখানি সঙ্কলন করেন। এই পুস্তকখানি বহুকাল যাবৎ লুপ্ত হইয়াছে। প্রাকৃত ভাষায় সঙ্কলিত হওয়াই উহা লুপ্ত হওয়ায় অন্যতর কারণ বলিয়া বোধ হয়। সে যাহা হউক, খৃষ্টীয় একাদশ অব্দে ক্ষেমেন্দ্র নামক এক কবি ঐ গ্রন্থখানির সার সংগ্রহ করিয়া বৃহৎকথামঞ্জরী নামে একখানি সংক্ষিপ্ত উপকথা-পুস্তক প্রণয়ন করেন। ঐ পুস্তক খানি অতি সংক্ষিপ্ত দেখিয়া কাশ্মীরপতি অনন্তরাজের মহিষী সূর্য্যবতী সোমদেব ভট্ট-নামক পণ্ডিতকে সংস্কৃতভাষায় নাতি-সংক্ষিপ্ত নাতিবিস্তীর্ণ বৃহৎকথানুসারী একখানি সর্ব্বজন চিত্তাকর্ষক গ্রন্থ রচনা করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহার উৎসাহে সোমদেব ভট্ট বৃহৎকথার সারসংগ্রহপূর্ব্বক, * আদর্শ পুস্তকের অধ্যায়ক্রমাদি ঠিক রাখিয়া † কথা-সরিৎসাগর-নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই অমূল্য গ্রন্থখানি প্রথমে জর্ম্মণিতে পরে কলিকাতায় এবং শেষে বোম্বাই নগরে ছাপা হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক টনি (C. H. Tawney) ইহার এক অতি বিশদ ও উজ্জ্বল ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। কাজেই উহা এখন সকল শিক্ষিত ব্যক্তিরই অধিগম্য হইয়াছে। এই কথাসরিৎসাগরের দশম লম্বকে (অধ্যায়ে) অনেক-গুলি মূর্খকথা আছে। তাহার দুই একটি আমাদের পূর্ব্বকথিত প্রবাদ গুলির সহিত সাদৃশ্যযুক্ত বলিয়া এস্থলে উল্লেখ করিব। প্রথমতঃ যেটির সাদৃশ্য সর্ব্বা-পেক্ষা অধিক তাহাই উল্লেখ করিতেছি।

তথেদানীমভিজ্ঞানকর্ত্তা চ শ্রূয়তাং প্রভো।
কস্যচিদ্‌যানপাত্রেণ মূর্খস্য ব্রজতোঽম্বুধৌ ॥
রাজতং ভাজনং হস্তাদপতত্তজ্জলান্তরে।
স তত্র মূর্খোঽভিজ্ঞানমাবর্ত্তাদিকমগ্রহীৎ ॥
আগচ্ছন্নুদ্ধরিষ্যামি তদিতোঽব্ধিজলাদিতি।
পারং প্রাপ্যাম্বুধে স্তীর্ণো দৃষ্ট্বাবর্ত্তাদি বারিণি।
মমজ্জ ভাজনং প্রাপ্তুং মভিজ্ঞানধিয়া মুহুঃ।
পৃষ্টঃ শেচাক্রাশয়ঃ সোঽন্যৈরুপাহসাত ধিকৃতঃ ॥

(১০ম লম্বক, ৫ম তরঙ্গ)

ইহার সংক্ষিপ্তার্থ এইরূপ—অর্ণবযানে চড়িয়া গমনকালে এক মূর্খের হস্ত হইতে একটি রৌপ্যপাত্র মধ্যসমুদ্রে পড়িয়া যায়। সে ঐ স্থানটির আবর্ত্তাদি চিহ্ন খুব ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া লইল। ভাবিল, আসিবার সময় জল হইতে পাত্রটি উঠাইয়া লইব। পরে সমুদ্র পার হইয়া তীরের সান্নিধ্যে আবর্ত্তাদি দেখিয়া ভাবিল, এইত সেই আবর্ত্ত। এইরূপ মনে করিয়া পাত্রটি তুলিবার আশায় সে পুনঃ পুনঃ জলে ডুব দিতে লাগিল, ক্রমে যখন লোকে তাহার অভিপ্রায় অবগত হইল, তখন সকলে তাহাকে উপহাস করিতে ও ধিক্কার দিতে লাগিল।

পূর্ব্বোক্ত গল্পটি লক্ষ্য করিয়া অধ্যাপক টনি ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের Indian Antiquary পত্রি-কায় এবং স্বকৃত কথাসরিৎসাগরের অনুবাদ পুস্তকের পাদটীকায় একস্থলে লিখিয়াছেন, Stanislas Julien চীন ভাষা হইতে যে অবদানগুলি অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাতে কথাসরিৎসাগরোক্ত এই গল্পটি আছে। Felix Liebrecht এই গল্পটির সহিত বিলাতে লিপ্রচত একটি গল্পের তুলনা করিয়াছেন। ঐ গল্পটির

* বৃহৎ কথায়াঃ সারস্য সংগ্রহং রচয়াম্যহম্‌।
কথাসরিৎসাগর ১।১।৩

† যথামূলং তথাচৈতন্ন মনাগপ্যতিক্রমঃ।
গ্রন্থবিস্তরসংক্ষেপমাত্রং ভাষা চ ভিদ্যতে॥ ঐ ১।১।১০

মর্ম্ম এইরূপ। একবার ইয়ারমাউথ নামক বন্দরে আয়র্লণ্ডবাসী একটা লোককে এক জাহাজে মাল বোঝাই কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। মাল বোঝাই হইলে, জাহাজ যখন পাল তুলিয়া যাত্রা করিবার উপক্রম করিতেছে, তখন সেই লোকটা তীরে দাঁড়াইয়া জাহাজের কাপ্তানকে ডাকিয়া বলিল, "কাপ্তান সাহেব, তোমার জাহাজের একটা shovel (বড় রকমের হাতা বিশেষ) দেখিও আমি জলে ফেলিয়া দিয়াছি। তবে যেখান দিয়া সেটা জলে পড়িয়াছে সেইখানে রেলিংএর গায়ে আমি একটা দাগ কাটিয়া রাখিয়াছি। তুমি যখন ফিরিয়া আসিবে তখন ঐ দাগ দেখিয়া খুঁজিলেই জিনিষটা পাইবে।"

Liebrecht কথিত গল্পটির সহিত আমরাই গ্রামের প্রবাদটির সাদৃশ্য অতি ঘনিষ্ঠ। উভয়ই প্রায় একরূপ। আবার Librecht মনে করেন যে, তিনি গ্রীক সাহিত্যেও ঐরূপ একটি গল্প পড়িয়াছেন। তবেই দেখুন, যাহা এতকাল আমরা পূর্ব্ববঙ্গের এক পল্লীগ্রামবাসী কতকগুলি তাঁতীর কীর্ত্তি বা কুকীর্ত্তি বলিয়া মনে করিতেছিলাম, তাহা একটি বহুজাতিসাধারণ গল্প বলিয়া সপ্রমাণ হইল। এইরূপে প্রবাদ, ছড়া, উপকথা এমন কি মূর্খের গল্পও কিরূপে পণ্ডিতগণের আলোচনার যোগ্য হইতে পারে পাশ্চাত্য দেশের অক্লিষ্টকর্ম্মা পণ্ডিতগণ তাহা দেখাইয়াছেন। জর্ম্মণিই এবিষয়ে প্রথম পথপ্রদর্শক। হায়, যে জর্ম্মণি এককালে তাহার জ্ঞানানুশীলনরত সন্তানগণের একনিষ্ঠ সাধনার ফলে য়ুরোপের জ্ঞানগুরু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, প্রুশিয়ার রণমদোন্মত্ত শাসকসম্প্রদায়ের দুঃশীলতার ফলে আজ তাহা সমগ্র সভ্যজগতের ঘৃণার পাত্র হইয়াছে। তাহার সুপ্রশস্ত কুঞ্জসমূহ আগ্নেয়াস্ত্র নির্ম্মাণের শিল্পশালায় পরিণত হইয়াছে! কি অধঃপতন! সে যাহাহউক, গত দেড়শত বৎসর যাবৎ এইজর্ম্মণির পণ্ডিতগণ সকল সভ্যদেশকে শিখাইতেছিলেন, ধর্ম্ম বল, সাহিত্য বল, ছড়া পাঁচালি বল, উদ্ভট গল্প বল, আচার বল, মনুষ্য সমাজের কিছুই বৈজ্ঞানিকের চক্ষে উপেক্ষণীয় নহে। প্রত্যেক দেশ বা জাতির মধ্যেই কতকগুলি প্রবাদ, ছড়া, উপকথা প্রচলিত আছে, এইগুলিকে পরীক্ষা করিয়া তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন স্তর আবিষ্কার পূর্ব্বক যথাবৎ বিভাগ ও বিন্যাস করিতে পারিলে, ঐ দেশের বা জাতির অতীত ও বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা, এবং তত্রত্য জ্ঞান, ধর্ম্ম, আচার, ও নানা প্রতিষ্ঠানের অভ্যুদয়, প্রসার, ও পরিণতির যথার্থ বিবরণ সঙ্কলন করা যাইতে পারে। আর জগতের সমস্ত জাতির প্রবাদ, উপকথা ইত্যাদির সবিস্তর বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিলে সমগ্র মানবজাতির চিন্তাপ্রবাহের ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ইতিহাস বলিতে পূর্ব্বকালে যাহাই বুঝাক না কেন, এখন লোকে উহাদ্বারা কেবল রাজরাজড়ার বিবরণই বুঝে। ঐতিহাসিক গবেষণার অর্থ আমাদের দেশে এখন তাম্রশাসন, শিলালিপি, ও মুদ্রার সাহায্যে বিস্মৃতনামা দুই চারিজন রাজা বা জমিদারের নাম আবিষ্কার। নানা গবেষণাকারিকর্ত্তৃক নানাভাবে পঠিত, বিলুপ্তবর্ণচিহ্ন হয়ত একখানি মাত্র তাম্রশাসন বা শিলাখণ্ড অবলম্বনে নানা মত বা থিওরি আবিষ্কার ও তৎসঙ্গে ভিন্ন মতাবলম্বীর কুৎসা প্রচারের নাম বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ইতিহাস রচনা। সে যাহাহউক, সেরূপ তাম্রশাসনাদির আলোচনাও যে একেবারে নিষ্ফল তাহা বলি না, এবং যেমন রাণী উইয়ের প্রসূত হাজার হাজার সন্তানের মধ্যে রাণী জাতীয় একটা বাঁচিয়া গেলেও উইয়ের ঢিপির সৃষ্টি হইতে পারে, সেইরূপ হয়ত কোনওকালে আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের হাজার হাজার থিওরির ২।৪টা টি কিয়া দুইচারিজন নূতন রাজা বা জমিদার ও তাহার বাড়ী ঘর, ও তাহার তথাকথিত দিগ্বিজয়ের ও আসমুদ্র বিস্তীর্ণ রাজ্যের (কেননা প্রশস্তি লেখকগণের চক্ষে সকল রাজাই দিগ্বিজয়ী ও সমুদ্রমেখলা ধরণীর স্বামী) বিবরণ উদ্ধারে সাহায্য করিবে। কিন্তু যথার্থ ইতিহাসানুসন্ধিৎসু

গণের একথা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে যে, যাহাকে ইংরেজিতে Vulgar antiquities বলে অর্থাৎ প্রাকৃত জন সমাজে প্রচলিত কথা ও প্রবাদ ও ছড়া ইত্যাদি, তাহাও, যথারীতি আলোচিত হইলে প্রত্নতত্ত্বের কাজেও নূতন আলো নিক্ষেপ করিতে পারে। আমরা কেবল রাজা জমিদারের নাম ও বিবরণকেই একমাত্র ইতিহাস বলিয়া মান্য করি না। জনসমাজের ইতিহাস, তাহাদের ধর্ম ও সামাজিক নীতির, তাহাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষার, তাহাদের যোগ ও ক্ষেমের, তাহাদের সাফল্য ও বৈফল্যের,—এককথায় তাহাদের মধ্যে সভ্যতালোকের প্রথম রশ্মিপাত হইতে তাহার চরমবিকাশের যথাযথ বিবরণকেই যথার্থ ইতিবৃত্ত বলি। জনসমাজের কাছে তোমার রাজরাজরা সমুদ্রের জলবুদ্বুদমাত্র। ঢপ গানে শুনিয়াছ ত, শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় রাজা হইয়া বসিয়াছেন, তখন শ্রীরাধার এক সখী তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন—

"কি বা দেখাও মতির মালা?—
তোমার মতির মালা
ব্রজে কত হয়ে আছে ধূলা!"

আমরাও সেইরূপ বলি, তোমার তথাকথিত প্রাচীনলেখে বিঘোষিত শত শত নরপতির মাথার মুকুট ও গলার মতির মালা নরসমাজের চরণতলে ধূলি হইয়া গিয়াছে, কেবল নরপতি লইয়া থাকিও না, নরসমাজের দিকেও যথোচিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে দৃষ্টি করিও।

যাক্ সে কথা, এখন প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করি। "চিৎসরা"র গল্পটিও খুব প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। কথা সরিৎসাগরে উহা এই আকারে পাইয়াছি:—

(এবং শ্রুতঃ কেশমুগ্ধ) তৈলমুগ্ধো নিশম্যতাম্।
মুগ্ধোঽভূৎ পুরুষঃ কশ্চিদ্ ভৃত্যঃ শিষ্টস্য কস্যচিৎ॥
স তেন স্বামিনা তৈলমানেতুং বণিজোঽন্তিকম্।
প্রেষিতো জাতু তস্মাৎ পাত্রে তৈলমুপাদদে॥
তৈলপাত্রং গৃহীত্বা তদাগচ্ছংস্তত্র কেনচিৎ।
ঊচে মিত্রেণ রক্ষেদং তৈলপাত্রং অবস্রবৎ॥
তচ্ছ্রুত্বা বীক্ষিতুমধঃ পাত্রং তৎপর্য্যবর্ত্তয়ৎ।
স মূঢ় স্তেন তৎসর্ব্বং তৈলং তস্যা পতদ্ ভুবি॥

(কথাসরিৎসাগর) ১০।৫।১৮৮—৯১

ইহার মর্ম্ম এইরূপঃ—এক ভদ্রলোকের এক মূর্খ ভৃত্য ছিল, তাহার প্রভু একদিন তৈল আনিবার জন্য পাত্রসহ তাহাকে বেণের নিকট পাঠাইয়া দেন। সে সেই পাত্রে তৈল লইয়া ফিরিয়া আসিতেছে, এমন সময় তাহার এক বন্ধু তাহাকে বলিল, "সাবধান, তৈল কিন্তু নীচ দিয়া চোয়াইয়া পড়িতেছে।" সে কথা সত্য কিনা দেখিবার জন্য যেই পাত্রটি উপুর করিল, অমনি সব তৈল মাটিতে পড়িয়া গেল।

ধামরাইর প্রবাদে ফাউয়ের কথা তুলিয়া মূর্খতায় একটু অধিক রং চড়ান হইয়াছে। ইহার অনুরূপ কোনও বিলাতী গল্পের কথা কেহ উল্লেখ করেন নাই, তথাপি অন্ততঃ সোমদেব ভট্টের সময় সুদূর কাশ্মীরেও যে এই গল্পটি প্রচলিত ছিল এবং সম্ভবতঃ উহা গুণাঢ্যের বৃহৎ কথাতেও উল্লিখিত ছিল, ইহা স্মরণ করিয়া আশা করি পূর্ব্বকথিত "চিৎসরা"-অপবাদযুক্ত বৈদ্যবংশ আপনাদিগকে কলঙ্কমুক্ত বিবেচনা করিবেন।

"ভোটের উরুষ" বংশের অবস্থা চিৎ-সরা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্প আশাপ্রদ। কেননা সুবিশাল কথাসরিৎসাগরে পুনঃ পুনঃ ডুব দিয়াও একটিও ছারপোকা রত্ন উদ্ধার করিতে পারিলাম না। তবে তুলার গদিতে না হউক, তুলার ছালায় অগ্নিসংযোগের একটি গল্প পাইয়াছি—তাহা এস্থলে উল্লিখিত হইল:—

(উক্তোঽনলকরণো) দেব শৃণু বচম্যথ তূলিকম্।
মূর্খঃ কশ্চিৎ পুমাং স্তূলবিক্রয়ায়াপণং যযৌ॥
অশুদ্ধমিতি তত্তস্য ন জগ্রাহাত্র কশ্চন।
তাবদ্দদর্শ তত্রাগ্নৌ হেম নিষ্টপ্তশোধিতম্॥
স্বর্ণকারেণ বিক্রীতং গৃহীতং গ্রাহকেণ চ।
তদ্দৃষ্ট্বাপি স তত্তূল মিচ্ছএ শোধয়িতুং জড়ঃ॥
অগ্নৌ চিক্ষেপ দগ্ধে চ তস্মিল্লোকো জহাস তম্॥

(কথাসরিৎসাগর ১০।৫।২৮—৩১)

ইহার সার এই :—এক মূর্খ তুলা বিক্রয় করিবার জন্য বাজারে গিয়াছিল, কিন্তু তুলা অশুদ্ধ অর্থাৎ যথারীতি পরিষ্কৃত হয় নাই দেখিয়া কেহ উহা ক্রয় করিল না। সেই মূর্খ সেই বাজারেই এক স্বর্ণকারের দোকানে দেখিতে পাইল যে, স্বর্ণকার সোণা পোড়াইয়া শুদ্ধ করিতেছে, এবং গ্রাহককে তাহা ক্রয় করিতে আপত্তি করিতেছে না। মূর্খ ভাবিল, 'তবে আমার তুলাগুলিও কেন এই উপায়ে শোধন করি না।" যে কথা সেই কাজ। ফলে ছালা শুদ্ধ সব তুলা ভস্ম হইয়া গেল।

"ভোটের উকুষের" সঙ্গে যে ইহার সাদৃশ্য একেবারেই নাই, তাহা বলা যায় না।

গাছ হইতে অর্দ্ধেক লেবু কাটিয়া আনার ও আমড়া ভোজনের পর জলপানেরও ঠিক অনুরূপ গল্প পাই নাই; তবে যে দুইটি গল্পের সঙ্গে উহাদের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে তাহা এখানে উল্লেখ করিতেছি। যাঁহারা ইহাতে কিছুমাত্র সাদৃশ্য না দেখিবেন, আশা করি তাঁহারা ইহা নূতন গল্পরূপেই উপভোগ করিবেন; দুই একজন চতুর গল্পপটু ব্যক্তি ভবিষ্যতে ইহা ধামরাই গ্রামেরই তন্তুবায়কুলের স্কন্ধে চাপাইয়া দিলেও আমি বিস্মিত হইব না :—

প্রথম গল্পটি এইরূপ :—

অয়মামলকনেতা দেবেদানীং নিশম্যতাম্।
কস্যাপ্যভূদ্‌গৃহস্থস্য ভৃত্যঃ কশ্চন মুগ্ধধীঃ॥
সমাদিশদ্ গৃহস্থস্তং ভৃত্যমামলকপ্রিয়ঃ।
গচ্ছারামাৎ সুমধুরাণ্যানয়ামলকানি মে॥
একৈকং দশনচ্ছেদেনা স্বাদ্যানীতবাঞ্জড়ঃ।
আস্বাদ্য মধুরাণ্যেতান্যানীতানীক্ষতাং প্রভুঃ॥
সোঽব্রবীৎ সোঽপি তান্যর্দ্ধোচ্ছিষ্টান্যালোক্য কুৎসয়া।
ত্যক্তো গৃহপতি স্তেন ভৃত্যেনাবুদ্ধিনা সমম্॥

(কথাসরিৎসাগর ১০।৫।২৯৫—২৯৮)

ইহার মর্ম্ম এই :—

এক গৃহস্থের এক হাবা চাকর ছিল। গৃহস্থটি আমলকী ভাল বাসিতেন, তিনি চাকরকে বলিলেন "যা ত বাগান হইতে আমার জন্য কয়েকটা মিষ্ট আমলকী নিয়া আয়।" চাকরটা বাগানে গিয়া কতকগুলি আমলকী দাঁতে কাটিয়া চাকিয়া আনিল ও প্রভুকে দেখাইয়া বলিল, "দেখুন চাকিয়া এই কয়টা মিষ্ট পাইয়া আপনার জন্য আনিয়াছি।" গৃহস্থ দেখিলেন বেটা সব কয়টাই অর্দ্ধেক খাইয়া আনিয়াছে, তখন তিনি তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন।

ধামরাইয়ের কাটা জামীরের গল্পে চাকরের উল্লেখ নাই, কথাসরিৎসাগরে অর্দ্ধেকখানি গাছে রাখিয়া লেবু বড় হইতে দেওয়ার উল্লেখও নাই।

দ্বিতীয় গল্পটি এইরূপঃ—

(নিধানালোকনং কৃত্বা) শ্রূয়তাং লবণাশনম্।
বভূব গহ্বরো গ্রামবাসী কোঽপি জড়ঃ পুমান্॥
স মিত্রেণ গৃহং জাতু নীতো নগরবাসিনা।
ভোজিতো লবণস্বাদূন্যন্নানি ব্যঞ্জনানি চ॥
কেনেয়ং স্বাদুতান্নাদেরিত্যপৃচ্ছৎ স গহ্বরঃ।
প্রাধান্যাল্লবণেনেতি তেনোচে সুহৃদা তদা॥
তদেব তর্হি ভোক্তব্য মিত্যুক্ত্বা লবণস্য সঃ।
পিষ্টস্য মুষ্টিমাদায়—প্রক্ষিপ্যা ভক্ষয়ন্ মুখে॥
তচ্চূর্ণং তস্য দুর্ব্বুদ্ধে রোষ্ঠৌ শ্মশ্রূণি চালিপৎ।
হসতস্তু জনস্যাত্র মুখং ধবলতাং যযৌ॥

(কথাসরিৎসাগর ১০।৫।৩৯—৪৩)

ইহার মর্ম্ম এইঃ—

একগ্রামে একটা অতিবড় মূর্খ লোক ছিল। তার নগরবাসী এক বন্ধু একদিন তাহাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া আসিল এবং নানা সুস্বাদু খাদ্য খাইতে দিল। সেই সব জিনিষ খাইয়া মূর্খটা বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিল, "এসব জিনিষ এত সুস্বাদু হইল কি করিয়া ?" বন্ধু বলিল, "খাদ্যে লবণ দেওয়াতেই স্বাদ অনেকটা বাড়িয়াছে"। তবে "সেই জিনিষটাই খাইতে হইবে,"

এই বলিয়া সে এক লবণের পিণ্ড লইয়া মুখে ফেলিয়া দিল।...ইত্যাদি।

প্রবন্ধ যথেষ্ট বড় হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষতঃ আর অধিকক্ষণ মূর্খের সংসর্গে বাস করা সকলের মতে সমীচান বলিয়াও বোধ না হইতে পারে। একজন পণ্ডিত বলিয়াছেন—

হীয়তে হি মতি স্তাত হীনৈঃ সহ সমাগমাৎ।
সমৈশ্চ সমতামেতি বিশিষ্টৈশ্চ বিশিষ্টতাম্॥

অতএব এইখানে মূর্খের সংসর্গ ত্যাগ করিয়া পণ্ডিত-মণ্ডলের রচণচ্ছায়া আশ্রয় করাই শ্লাঘ্য বিবেচনা করিলাম।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত-গুপ্ত কবিরত্ন।

দোল।

১

তোমার সাথে আজকে হরি! হবে আমার হোলী খেলা!
অন্তরের (ই) অন্তঃপুরে বসবে শুধু ফাগের মেলা!
পিচ্‌কারী মোর নয়ন দু'টী, হৃদয়-আবীর আন্‌ল লুটি'
মর্ম্মকোষের শোণিতবিন্দু ঢাল্‌ল তায় সারাবেলা।
প্রেমের ঠাকুর! দয়াল তুমি করোনা আর আমায় হেলা!

২

দাঁড়াও তুমি দাঁড়াও সখা! আমার মানস-কদমতলে!
আশা-সাধের যমুনা মোর বহিয়া যাক্ কলুকলে!
তোমার রাকা বদনশশী, চিত্তাকাশে উঠুক্ হাসি'
বাজুক্ তোমার মোহন বাঁশী পাগল-করা ভূমণ্ডলে!
সকল বাঁধন মুক্ত হয়ে লুপ্ত হব চরণতলে!

৩

আলো সাজে কালা আমার! সাজবে আজ আজকে তুমি
প্রাণের দোলায় দুলবে মোর রক্ত কপোল মেহে চুমি'।
"বউকথা কও" কোকিল শ্যামা, আজকে ভুলে দিস্‌নে ক্ষমা
আবেগ ভরে পড়িস্‌নেরে প্রিয়ার বুকে তিলেক ঘুমি'!
আজকে প্রিয় রচ্‌বে যে রে মধু-ফাগের নাট্যভূমি!

৪

মধুর লীলার জীবন-বঁধু! গোপন বুকে দাওগো দোল!
ভবের হাটে বেচাকেনা থাকুক্ নিয়ে গণ্ডগোল!
তুমি আমার আমি তোমার ইহার বেশী চাইনে আর,
তোমার রসে রাঙ্গিয়ে দাও ভুবন জোড়া মরণ-কোল!
ভুলিয়ে দাও ভুলে ভরা ধরায় যত অসার রোল!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

শেষ বাণী

"Truth sits upon the lips of dying men."

মরণোন্মুখ ব্যক্তি কখনও সত্য ব্যতীত মিথ্যা বলিতে সাহসী হয় না। সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া যে ব্যক্তি কেবল মিথ্যারই উপাসনা করিয়াছে, সত্যের নিকট যে চির-বিদ্রোহী, জীবন মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া সে কিছুতেই পুনরায় মিথ্যার অভিনয় করিতে সাহসী হইবে না। হয়তো "The dread of something after death" অথবা বিধাতার অপর কোন বিচিত্র বিধান বলে এরূপ হইয়া থাকে; এ প্রহেলিকার বিশেষ কোন সমাধান নাই।

আবার, যিনি যে পন্থা অবলম্বন করিয়া জীবন-যাপন করিয়াছেন মৃত্যুকালে তদ্রূপ বাণী তাঁহাদের মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া থাকে। যাঁহারা জ্ঞানী ও ভগবৎ-প্রেমিক তাঁহাদের শেষ বাণীতে কোন নৈরাশ্য সূচিত হয় না, স্মিতবদনে তাঁহারা সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করেন; মৃত্যু তাঁহাদিগকে পরাজয় করিতে না পারিয়া নিজেই পরাজিত হইয়া থাকে। যাঁহারা স্বদেশ

প্রেমিক, নির্ভীক হৃদয়ে তাঁহারা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন এবং তাঁহাদের বাণীতে কেবল স্বদেশ-মাতার কল্যাণ কামনাই নিহিত। আর পাপভারাক্রান্ত ব্যর্থ জীবন, কণ্টকময় মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া কেবল হা হুতাশ অথবা প্রথম ও শেষ মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া থাকে।

আমরা কতিপয় খ্যাতনামা পুরুষের শেষ বাণী আলোচনা করিব। মৃত্যুসময়ের বাণী অতি অল্প কথায়ই নিঃশেষিত হইয়া থাকে। কর্ম্মময় জীবনের বিপুল ইতিহাস শেষ সময়ে কেবল কয়েকটী অক্ষরেই পর্য্যবসিত হয়। জার্ম্মাণ কবি ও দার্শনিক, পণ্ডিতপ্রবর গেটে (Goethe) মৃত্যুসময় চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"Light, Light, more Light!"—"আলো চাই, আরো আলো চাই।" সমস্ত জীবন কাব্যে ও দর্শনে তিনি এই অপূর্ব্ব "আলো"র সন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার তৃষ্ণা মিটে নাই। সংসারের জীবন-প্রদীপটী নিভিবার সময় কোন্ এক ত্রিদিব আলো তাঁহা আকর্ষণ করিয়া নিল!

"Eli Eli lama sabachthani"—"my God, my God, why hast thou forsaken me?"—ভগবন্, তুমি আমাকে ত্যাগ করিলে কেন? প্রেম ও সহিষ্ণুতার অবতার প্রভু খ্রীষ্ট ক্রশ্ হইতে শেষ মুহূর্ত্তে এইরূপ কাঁদিয়া ফেলিলেন। খ্রীষ্টের এই ব্যাকুলতা ও হতাশের ভাবে বেশ মাধুর্য্য আছে। কিন্তু এই মহাপুরুষের মৃত্যু লীলা ও শেষ বাণীর সহিত অপর মহাপুরুষ, জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ সক্রেটীসের তুলনা করিলে যথেষ্ট বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। কোন হতাশা বা বেদনার ক্ষীণ ছায়াও তাঁহার আনন্দ-ঘন, প্রশান্ত মূর্ত্তির উপর পতিত হয় নাই। বিচারক নির্দ্দিষ্ট Hemlock পান করিয়া তিনি আত্মার অমরত্ব ঘোষণা করিতে করিতে মৃত্যুকে বরণ করিলেন। পার্শ্বস্থ শিষ্যকে বলিয়া গেলেন যে, তিনি কোন্ গ্রীক দেবীর নিকট মানত্ করিয়াছিলেন, তাহা পরিশোধ করা হয় নাই—"Crito, I owe a cock to Æsculapios."—তাহা যেন পরিশোধ করা হয়।

খ্রীষ্টের মৃত্যুকালীন ক্ষণস্থায়ী দুর্ব্বলতা সাধারণ মানবগণের নিকট বেশ স্বাভাবিক। সক্রেটীসের কঠোর মৃত্যুবরণ কেবল তাঁহার পক্ষেই সম্ভব হইয়াছিল। গ্রীক্ ও খৃষ্টান আদর্শের বিভিন্নতা উক্ত দুই মহাপুরুষ প্রদর্শন করিয়াছেন; এই বিষয়ে একজন ইয়োরোপীয় পণ্ডিত অতিশয় সুন্দর অভিমত প্রদান করিয়াছেন,—"We might have preferred to see the strong light relieved by shadow, by some touch of nature at the thought of parting from family and friends, by some human misgivings on the threshold of the unknown. * * * The Greek ideal was one of strength and widely different from the later and deeper Christian ideal of strength made perfect in weakness. In many respects, the end of Socrates may indeed be regarded as a Euthanasia." (Sir Alexander Grant.)

সাধক কবি রামপ্রসাদ প্রাণ খুলিয়া গাহিয়াছিলেন,—"ক্ষণেক দাঁড়া ওরে শমন, পরাণ ভরে মাকে ডাকি।" শমন হয়তো তখন তাঁহার দুয়ারে পরওয়ানা লইয়া একেবারে স্বশরীরে হাজির হইয়াছিল না; কবি অদূর ভবিষ্যতে শমনের আগমন কল্পনা করিয়া ওরূপ গাহিয়াছিলেন, যেন সেই ভীতির সময়েও তিনি তাঁহার জীবনব্যাপী কর্ত্তব্য বিস্মৃত না হন। রোমীয় পণ্ডিত Archimedes এবং ফরাসী রাসায়নিক পণ্ডিত Lavoisier এর দুয়ারে একদিন বাস্তবিকই শমন ঘাতকের রূপে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল—কিন্তু তখনও পণ্ডিতদ্বয় একটুকুও কম্পিত হইলেন না। উভয়ে ঠিক একই কথায় ঘাতককে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চাহিয়াছিলেন—"একটু অপেক্ষা কর ভাই, আমি এই সমাধানটা শেষ করিয়া লই, পরে আমাকে মারিয়া ফেল"—"Wait, till I have finished the problem." রক্তলোলুপ ঘাতক

তাঁহাদের জীবন-ব্যাপী সাধনার মর্য্যাদা বুঝিবার পাত্র নহে! অচিরে তাঁহাদের শির ভূলুণ্ঠিত হইল।

গ্রীসের Thebes নগরার স্বাধীনতা কল্পে বীরকেশরী Epaminondas নিজ জীবন বিপন্ন করিয়াও ব্রতী হইয়াছিলেন, স্বদেশের স্বাধীনতা চিন্তা ব্যতীত অপর কোন চিন্তা করিবার তাঁহার সময় ছিল না। শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে তিনি রণক্ষেত্রে সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া পতিত হইলেন; জীবনের আর আশা রহিল না, প্রাণবায়ু বহির্গত হইবার অল্পক্ষণ পূর্ব্বে সংবাদ বাহক আসিয়া তাঁহার বিজয় বারতা প্রদান করিল। বীর হাসিমুখে বলিলেন "Then I die happy" অমনি মৃত্যু-যবনিকা পতিত হইল। General Wolfe ও Quebec এর যুদ্ধ শেষে এই কথা বলিয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। আরও একটী চিরন্তন সত্য বাণী তাঁহার মনে পড়িয়াছিল—

"The paths of glory lead but to the grave."

ইংলণ্ডের কিশোর কবি Keats চিরজীবন সৌন্দর্য্যের উপাসক ছিলেন; তাঁহার সমগ্র ইন্দ্রিয়নিচয় সৌন্দর্য্য উপভোগে নিরত থাকিত। কল্পনারাজ্যে বিচরণ করিতে তিনি সময় সময় এমন প্রাণ মন তৃপ্তিকর স্থানে পৌঁছিতেন যে, তখন তাঁহার মৃত্যুকে বরণ করিতে বাসনা হইত। সুকণ্ঠ Nightingale পাখীর সঙ্গীত শ্রবণে তিনি আত্মহারা হইয়া বলিয়াছিলেন—

"I have been half in love with easeful Death.

* * * *

Now more than ever seems it rich to die,
To cease upon the midnight with no pain,
While Thou art pouring forth thy soul abroad
In such an ecstasy !"

Keats এর এই প্রকার মরণের সাধ অচিরেই সফল হইয়াছিল। মরিবার সময়ও তাঁহার সৌন্দর্য্য পিপাসা মিটে নাই, তাই তিনি শেষ মুহূর্ত্তে বলিলেন— "I feel the flowers growing over me."—যেন স্বর্গধামে কোন অপার্থিব পুষ্প বিতানের সন্ধান পাইয়া অভিনব যাত্রা করিতেছেন।

উচ্ছৃঙ্খল শিরোমণি, প্রতিভা দীপ্ত ইংরেজ কবি বায়রণ সংসারে সুখের আস্বাদন-লাভে বঞ্চিত ছিলেন। ফরাসী কবি ও লেখক Voltaire এর জীবনও শান্তি-বিরহিত ছিল। উভয়েই স্বীয় অন্তরে বিরাট অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া সাধকের মত অহর্নিশ তাহাতে আহুতি দিয়াছেন, এবং সম্রাট ও সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বৈজয়ন্তী তুলিয়াছেন। সমস্ত জীবনে শান্তি মিলিল না—বায়রণ তাই মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে ঝাঁপ দিতে সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন 'I must sleep now" Voltaire পার্শ্বস্থ বান্ধবগণকে অন্য কথা তুলিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন—"Do let me die in peace."—জীবিত থাকিতে আমার শান্তি মিলে নাই, এবার যখন সন্ধান পাইয়াছি, আমাকে আর বাধা দিও না।

গ্রহ ও নক্ষত্রগণের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত Copernicus এর নির্দ্দিষ্ট জীবন কাল ফুরাইয়া আসিয়াছে। কোথায় সূর্য্য, কোথায় পৃথিবী, অন্তরীক্ষে কোথায় কোন্ গ্রহের স্থান—এই অপূর্ব্ব সন্ধানের প্রেরণায় উদাসী পণ্ডিত সমস্ত জীবন বিরাট ব্যোমে বিচরণ করিয়াছেন, তবু তাঁহার সাধনার শেষ হইল না। তাঁহার মনে হইল, যেন বিধাতা-নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য অসম্পন্ন রহিয়া গেল, তাঁহার সামর্থ্য শেষ হইয়া আসিয়াছে, ভগবানের চরণে তাই মৃত্যুসময়ে শেষ প্রার্থনা জানাইতেছেন "Now, O Lord, set Thy servant free"

একজন বাঙ্গালী কবি গাহিয়াছেন,—

"ক্লেশের মরণ বরণ করিয়া অমর হয়েছে কারা!
স্মৃতি-ছায়াপথ উজলি' জগৎ তারা হয়ে আছে তারা!"

বাস্তবিক, তাঁহারাই ধন্য যাঁহারা আপন ধর্ম্মবিশ্বাস অটুট রাখিবার জন্য ক্লেশের মরণ বরণ করিয়াছেন। Foxe's "Book of Martyrs" এবং আমাদের শিখ-গুরুগণের

জীবনেতিহাসে এইরূপ শত শত অপূর্ব্ব কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। সাধু Lambertকে খৃষ্ট ধর্ম্মে অনুরাগের নিমিত্ত অগ্নিরাশি মধ্যে পুড়িয়া মরিতে হয়। অগ্নিমধ্যে তাঁহাকে নিক্ষেপ করিবার সময় বিচারক পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখনও মত পরিবর্ত্তন ও ক্ষমা ভিক্ষা কর, নতুবা কে তোমাকে রক্ষা করিবে?' সাধু অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া বলিলেন "None but Christ, None but Christ" ফরাসী বালিকা Joan of Arc এর জীবনাহুতিও এইরূপ বিস্ময়কর। অগ্নিরাশিতে নিমজ্জিত হইয়াও বালিকা আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিতে লাগিল "Jesus, Jesus, Jesus! Blessed be God!" বিধাতার চরণে যাঁহারা এরূপ নিজ জীবন আহুতি দিবেন, তিনি তাঁহাদিগকে নির্ভয় বাণী দিয়াছেন। সকল ধর্ম্মমতই এই আশার বাণী প্রদান করিতেছে। মৃত্যুসময়ে যে বিধাতার উদ্দেশে কাতর প্রার্থনা জানাইবে, বিধাতা তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিবেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এই আশার বাণী ঘোষণা করিয়াছেন—

"অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রযাতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥

বাইবেলে খৃষ্ট ঘোষণা করিয়াছেন "Call upon me in the days of trouble, I will deliver you"

মৃত্যুর আগমন অবশ্যম্ভাবী। সমস্ত জীবন মানুষের প্রস্তুত থাকিতে হইবে,—সে যেন জ্বালাময়ী ভৈরবীর বেশে না আসিয়া শান্তিময় শ্যামরূপে নামিয়া আসে; সেই মাহেন্দ্রক্ষণে যেন প্রাণ খুলিয়া তাহাকে আহ্বান করিতে পারি—

"মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান।

* * * *

তুঁহু মম মাধব তুঁহু মম দোসর,
তুঁহু মম তাপ ঘুচাও;
মরণ রে আও রে আও।"

শ্রীসুকুমার দাস গুপ্ত।

সুবর্ণ গ্রাম।

সোণার ভারতে সোণার বঙ্গে সোণার সুবর্ণ গ্রাম।
"স্বর্ণ ভূষিত" আদম জাতির ইহাই প্রাচীন ধাম॥
স্বর্ণ প্রসূতি স্বর্ণ গ্রামেতে হ'য়েছিল স্বর্ণবৃষ্টি।
বলে জনবাদে এই হেতুবাদে সোনারগাঁ নাম সৃষ্টি॥

স্মৃতিচূড়ামণি রঘুনন্দন-গ্রন্থে রয়েছে লেখা
লৌহিত্য নদ-পূর্ব্ব পারেতে স্বর্ণগ্রামের রেখা॥ *
লক্ষা-মেঘনা ব্রহ্মপুত্রে বেষ্টিত যার ভূমি,
পুরীর পরিখা "মেন্দাখালি" গিয়াছে যাহারে চুমি';

আজকে সে সব নদনদী মাঝে রাজে না নৌবহর,
"জাঙ্গালিয়া" জনপদে নাই নাবিক বংশধর।
এই নগরীর স্থানে স্থানে আছে অতীতের স্মৃতি গাঁথা,
খালে ও জঙ্গলে ভগ্ন দেউলে পরকাশে মৌনব্যথা।

কোথা সে হিন্দু নৃপতি বৃন্দ? দনুজ-মর্দ্দন রাজ?
স্মরিলে যাঁদের কীর্ত্তিকলাপ বাজে বুকে শত বাজ।
পাঠান ভূপতি গিয়াসউদ্দীন, ঈশাখাঁ মসনদ আলি,
অমর করিয়া গিয়াছে ইঁহারা এই নগরীর ধূলি।

শের শা'র সেই বিশাল বর্ত্ম যদিও বিদ্যমান,
স্বর্ণগ্রাম হ'তে পঞ্চনদেতে কেবা করে অভিযান?
"মগড়া পাড়ের" বক্ষ উপরি রাজধানী আজি লুপ্ত,
সুন্দর কারুকর্ম্মখচিত রম্য হর্ম্ম্য সকলি গুপ্ত।

"নহবতখানায়" প্রহরে প্রহরে বাজে না রাজার ঘড়ী,
"তহবিলে" আজি নাই তহশীল নাই সে বিশালা পুরী।

* লৌহিত্যাৎ পূর্ব্বতো বঙ্গং বঙ্গে স্বর্ণগ্রামাদয়ঃ।

"শোয়ালদী" গ্রামে কোথা সে মস্‌জিদ কোথা সে
হোসেন শাহ্,
সন্ধ্যা সকালে নমাজের কালে কে ডাকে তথা 'আল্লাহ' ?

"দলের বাগের" সেনাদলপতি দলে কি অরাতি দল ?
"হাবছাদী" গ্রামে আছে কি সে রাজা প্রখর বুদ্ধিবল ?
"আমিনপুরেতে" শুধু আছে নাম "সহর সোণার গাঁও'
"ক্রোড়ী বাড়ীতে" কোথা ক্রোড়পতি ? কেহ নাহি
করে রাও।

নাহি নাহি সেই দর্গা দুর্গ দীর্ঘিকা শত শত,
হায় "দমদমা দুর্গ" দুর্গম ভূমিতে হ'য়েছে নত।
ব্রহ্মপুত্রজলে এখনো ত খেলে প্রকৃতি কত না খেলা। *
লাঙ্গলবন্ধ পঞ্চমীঘাটে এখনো ত বসে মেলা।

কলকল নাদে নদ মেঘনাদ সাগরের পানে ধায়,
ধরে না এখন স্বর্ণজননী সোণার ভূষণ গায়।
সোণার গাঁয়ের সূক্ষ্ম শুভ্র সুন্দর মসলিন,
মিহি চা'ল আর কার্পাস কৃষি সকলি হয়েছে লীন।

শাখিশাখে বসি' পাখী শত শত আজিও প্রভাতী গায়,
ফুল পরিমল পরশিয়া বহে আজিও মলয় বায়।
সে মধুর গানে সে মিঠা পবনে জুড়াইয়া স্বীয় অঙ্গ,
জাগুক আবার সুবর্ণগ্রাম জাগুক আবার বঙ্গ।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন কাব্যতীর্থ

* লাঙ্গলবন্ধতীর্থে ১৩০৯ সনের ঘূর্ণিবাত্যা (Cyclone) সেই স্থানের বিশেষ অনিষ্ট সাধন করে।

মানব সমাজ ও যুদ্ধ।

যুদ্ধের মত ভয়ানক ব্যাপার মানব সমাজে দ্বিতীয় আর নাই। যুদ্ধে অসংখ্য লোক অকালে কালের কবলে পতিত হয়, শতশত লোক নানারূপে অঙ্গহীন হইয়া চির জীবন অন্ধ বা পঙ্গু হইয়া অরুন্তুদ কষ্টে দিনাতিপাত করে, শত শত লোকের ধন প্রাণ মদমত্ত বিজেতার অঙ্গুলি সঞ্চালনের উপর নির্ভর করে। আর যে দেশের বুকের উপর এই লোকভয়ঙ্কর নরমেধ যজ্ঞের সর্ব্বধ্বংসকারী হুতাশন প্রজ্জ্বলিত হয় সে দেশের শ্রী নষ্ট হয়, নগর শ্মশানে পরিণত হয়, সুরম্য পুষ্পোদ্যান প্রেতভূমি হইয়া উঠে এবং সমগ্র দেশটী ধ্বংসলীলার ধূমাবতী রূপ ধারণ করে। যুদ্ধে কত শত সরলা অভাগিনীর হাতের শঙ্খ ভাঙ্গিয়া পড়ে, কপালের সিন্দুর মুছিয়া যায়, সতীত্ব ধর্ম্ম নির্দ্দয় দস্যুকরে লুণ্ঠিত হয় এবং কত শত মানব শিশু অনাথ হইয়া স্রোতের ফুলের মত সংসার সাগরে ভাসিয়া বেড়ায়। যুদ্ধের এই ভীষণতা দর্শনে কোন্ সাহসী মানবের অন্তঃকরণ চমকিয়া না উঠে? যুদ্ধের এই নিদারুণ দুঃখকষ্ট দর্শনে কোন্ সহৃদয় মানবের অন্তঃকরণ বিগলিত না হয়? বলা বাহুল্য, এতাদৃশ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ যে মানব সমাজের কল্যাণকর নহে, বরং প্রভূত অমঙ্গলের নিদানস্বরূপ, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই।

এখন জিজ্ঞাস্য এই, মানব সমাজ হইতে যুদ্ধ চির-কালের তরে দূর করা যায় কি না? যে ভয়ঙ্কর ব্যাপার মানব সমাজের অকল্যাণকর এবং যাহা বর্ত্তমান সভ্যতার কলঙ্ক বলিয়া প্রত্যেক সহৃদয়, চিন্তাশীল লোকের দ্বারা নিন্দিত হয়, সেই ভয়াবহ যুদ্ধের লৌহশৃঙ্খল হইতে মানব সমাজ ও সভ্যতাকে মুক্ত করা যায় কি না? আপাততঃ ইহা অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয় এবং সম্ভবতঃ আরও বহুকাল যুদ্ধদানব মানবসমাজের বুকে তাণ্ডব নৃত্যে মানবের সুখ শান্তি নষ্ট করিবে। কিন্তু অধুনা অনেকে

হইলেও ক্রমোন্নতিশীল মানব সমাজ হইতে এককালে যুদ্ধ দূরে পলায়ন করিতে পারে; এবং যুদ্ধ যদি মানব সমাজের প্রকৃত পক্ষেই অশুভকর বলিয়া স্বীকৃত হয়, তবে কি উপায়ে উহা নিবারিত হইতে পারে, সে বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করা এবং উদ্দেশ্য সাধনানুকুল উপায় উদ্ভাবন করা প্রত্যেক সমাজহিতৈষী চিন্তাশীল ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য।

যুদ্ধটা কি? এক অর্থে যুদ্ধকে রাষ্ট্রবিপ্লব বলা যাইতে পারে। উচ্ছৃঙ্খলতা, ব্যভিচার, অত্যাচার, নীতির অবমাননা, বিধি ব্যবহার উল্লঙ্ঘন এবং ন্যায় ও ধর্ম্মানুগত বিচারের অধীন না হইয়া বাহুবলের দ্বারা স্বত্ব সংস্থাপন উভয়েরই প্রধান লক্ষণ। কোন রাজ্যের মধ্যে কোনও এক ব্যক্তি বাহুবলের দ্বারা তাহার প্রতিবেশীর সম্পদ্ কাড়িয়া লইলে দস্যু বলিয়া নিন্দিত হয়, এবং সেই দস্যুতার জন্য শাস্তি দিতে দেশে দেশে বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই বিচারালয়ের আদেশ অবহেলা করিবার শক্তি কাহারও নাই, কেন না, সমগ্র মানবসমাজের প্রতিনিধি স্বরূপ পুলিশ বাহুবলের দ্বারা প্রত্যেককে ন্যায়ানুমোদিত বিচারের আদেশ পালন করিতে বাধ্য করিতে পারে। কিন্তু যখন কোনও এক জাতি স্বার্থে অন্ধ হইয়া অথবা আকাঙ্ক্ষার অমিত আবেগে অপর কোন দুর্ব্বল জাতির বুকের উপর সহস্র করে সঙ্গীন তুলিয়া দাঁড়ায়, যখন ক্ষমতার মদগর্ব্বে কোন জাতি ধরাকে সরা জ্ঞান করিয়া দুর্ব্বলতর জাতির উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে দীর্পদর্পে অগ্রসর হয়, তখন সেই উদ্ধত জাতিকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে এবং উহার অবৈধ ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করিতে কোনও বিচারালয় নাই, কোন সর্ব্বশক্তিমান্ সম্রাট নাই। যদি থাকিত তবে বাহুবলের দ্বারা স্বত্ব সংস্থাপন বা পরস্পরের বিবাদ মীমাংসা ব্যক্তিগত পক্ষে যেমন দস্যুতা বলিয়া নিন্দিত হয়, জাতিগত পক্ষেও তেমনি নিন্দিত হইত। যুদ্ধ মানবের সেই আদিম অসভ্য যুগের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। জ্ঞান বিজ্ঞান সমুন্নত শ্রেষ্ঠ সভ্যতা গর্ব্বিত বর্ত্তমান মানবসমাজে বিংশ শতাব্দীর এই লোকভয়ঙ্কর যুদ্ধ যে দুরপনেয় কলঙ্ক স্বরূপ, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে; এবং যে সভ্যতার এই যুদ্ধ দুশ্ছেদ্য অঙ্গ স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে, সে সভ্যতা বিনা বিচারে আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে কি না, তাহা বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবার অযোগ্য নহে।

প্রাচীনকাল এবং মধ্যযুগাপেক্ষা বর্ত্তমান যুগে যুদ্ধে মানবের নৃশংসতা এক দিকে সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। হীনবল, নিরুপায়, নিরস্ত্র এবং বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করা পূর্ব্বে অতি গর্হিত কাজ বলিয়া বিবেচিত হইত, কিন্তু অধুনা প্রতিপক্ষ অপেক্ষা নিজপক্ষে অধিক সংখ্যক সৈন্য, উৎকৃষ্টতর অস্ত্রাদি এবং অন্যান্য বিষয়ে অধিক সুবিধা থাকা গর্ব্ব এবং গৌরবের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয় এবং প্রতিপক্ষকে অন্নহীন, বুভুক্ষাপ্রপীড়িত ও বিপদগ্রস্ত করিয়া তাহাকে যুদ্ধে পরাজিত করা আধুনিক সেনাপতিগণ যুদ্ধ কৌশলের পরাকাষ্ঠা বলিয়া মনে করে। আধুনিক সভ্যতার আমরা অন্য পাঁচ বিষয়ে যতই গর্ব্ব করি না কেন, প্রাচীন বর্ব্বর জাতি অপেক্ষা আধুনিক সভ্য জাতিগণ যুদ্ধে ন্যায় বা মনুষ্যত্বের যে খুব বেশী মর্য্যাদা বা উচ্চ হৃদয়ের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছে, তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। এবং যতদিনে মনুষ্য সমাজ হইতে এতাদৃশ যুদ্ধ তিরোহিত না হইবে, ততদিন মানুষ প্রকৃত সভ্যতা লাভ করিয়াছে, একথা বলা যায় কিনা সন্দেহ।

মনুষ্য সমাজের উন্নতির জন্য যতপ্রকার চেষ্টা হইয়াছে, তন্মধ্যে যুদ্ধ নিবারণের চেষ্টা বোধহয় সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। মহামতি ব্রাইট, সহৃদয় কবি ভিক্টর হিউগো, হেনরি রিচার্ড ব্রাউন প্রভৃতি ইউরোপীয় মনীষিগণ এ বিষয়ে বহু চেষ্টা ও গবেষণা করিয়া মনুষ্য সমাজের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। এবং ইংলণ্ডের যুদ্ধ

নিবারণ কল্পে যে শান্তি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, উহারও সদস্য সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। যুদ্ধ নিবারণের জন্য অনেকে নানা রূপ পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। পন্থাগুলি প্রত্যেক চিন্তাশীল মানবের গবেষণার যোগ্য। কেন না, কেবল ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি বিধান এবং যুদ্ধকে নিন্দা করিলেই মনুষ্য সমাজ যুদ্ধের নির্দয় হস্ত হইতে মুক্ত হইবে না, পরন্তু যাহাতে ভবিষ্যতে কোনদিন যুদ্ধ সংঘটিত হইতে না পারে, তজ্জন্য বিধি ব্যবস্থা সংস্থাপিত করিতে হইবে।

যদি গভীর ভাবে চিন্তা করা যায়, তবে দেখা যায় যে, যুদ্ধ বাধিবার মূল কারণ সমস্ত জাতির উপর সর্ব্বশক্তিমান একজন কর্ত্তা না থাকা। যদি অপরাজেয় সর্ব্বমান্য একজন কর্ত্তা থাকিত, তবে সে কিছুতেই তাঁহার আপন রাজ্য মধ্যে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ করিতে অনুমতি দিত না। যদি দুই জাতির ভিতর কোনও কলহ উপস্থিত হইত, তবে সে তাহার বিচারালয়ে উহাদিগকে নিয়া তাহার প্রবর্ত্তিত বিধি অনুযায়ী বিচার করিয়া কলহ মিটাইয়া দিত। বর্ত্তমানে আন্তর্জাতিক আইন বলিয়া যাহা প্রচলিত আছে, তাহা বাস্তবিক পক্ষে কোন 'আইন' নহে, কেন না উহা কতগুলি বহুদিন প্রচলিত প্রথা বা স্বীকারোক্তির সমষ্টি মাত্র। উহা কি করিতে হইবে না তাহাই শুধু বলিয়া থাকে, কিন্তু কি প্রণালীতে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য পরিচালন করিলে কি কি নিয়মানুযায়ী প্রজাগণের শাসন সংরক্ষণ করিলে ভবিষ্যতে মানব সমাজে যুদ্ধ অসম্ভব হইবে, তাহা কিছুই নির্দ্দেশ করে না। অধুনা যদি কোন জাতি উহার কোন বিধি বা নিষেধ না মানে, তবে ঐ জাতিকে ঐ নিয়ম মানিতে জোর করিয়া বাধ্য করাইতে পারে এমন কোনও শক্তিমান্ বিচারালয় মনুষ্যসমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বর্ত্তমান যুদ্ধের কথাই ধরা যাউক। সার্ভিয়া এবং অষ্ট্রীয়ার ভিতর কোনও বিষয় লইয়া কলহ উপস্থিত হইল এবং ঐ দেশদ্বয় আপনাদের কলহ বাহুবলের প্রয়োগ ব্যতীত মিটাইতে পারিল না। যদি ইউরোপে এমন কোনও বিচারালয় থাকিত, যাহা ইউরোপের সকল জাতির কলহ ন্যায়ানুসারে বিচার করিয়া দিতে পারিত এবং অষ্ট্রীয়া ও সার্ভিয়া যদি উক্ত বিচারালয়ে আপনাদের কলহ উপস্থিত করিত, তবে এমন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ কদাপি সংঘটিত হইতে পারিত না। অবশ্য ঐ বিচারালয়ের এমন শক্তি থাকা প্রয়োজন যে, উহার আদেশ মানিতে প্রত্যেক জাতি বাধ্য হয়।

এই সমস্ত কথার উল্লেখ করিয়া ইউরোপের কোন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি কহিয়াছেন যে, সকল জাতির উপর একটী নিরপেক্ষ ধর্ম্মাধিকরণ প্রতিষ্ঠাপিত হউক এবং সমগ্র মানব সমাজকে পরিচালিত করিবার জন্য কতকগুলি সাধারণ বিধি ব্যবস্থা লিখিত হউক। ঐ সকল বিধি ব্যবস্থা এমন ভাবে গঠিত হইবে যে, ঐগুলি অনুসরণ করিয়া চলিলে মানব সমাজে যুদ্ধ কখনও সংঘটিত হইতে পারিবে না।

কিন্তু প্রশ্ন এই, ঐ ধর্ম্মাধিকরণের আদেশ যদি কোনও জাতি অমান্য করে, তবে কি করা যাইবে? এজন্য কেহ কেহ প্রস্তাব করিয়াছেন যে, একটী আন্তর্জাতিক সৈন্যদল গঠিত হউক, ঐ সৈন্যদল ঐ ধর্ম্মাধিকরণের আজ্ঞাবহ রহিবে এবং যদি কোনও জাতি কোন বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া অপর কোনও জাতির সহিত কলহ করে এবং ঐ কলহ মীমাংসা করিবার জন্য উক্ত ধর্ম্মাধিকরণে বিচারপ্রার্থী না হইয়া বাহুবলের আশ্রয় লয়, তবে ঐ সৈন্যদলের সাহায্যে উক্ত জাতিকে বাধ্য করাইতে হইবে।

এই কথা পরিস্ফুট করিতে যাইয়া কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, মার্কিন দেশের মত সকল জাতি এবং সকল রাজ্য লইয়া একটী যুক্তরাজ্য গঠিত হউক, তাহা হইলে আর যুদ্ধ সম্ভবপর হইবে না। সমস্ত জাতির উপর যে সাধারণ শাসন স্থাপিত হইবে, তাহার শক্তি ভিন্ন ভিন্ন জাতির শক্তি অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে, কাজেই উহার বিধি ব্যবস্থা এবং আদেশ প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন

জাতি মানিয়া লইতে স্বীকৃত বা বাধ্য হইবে।

এখন এই 'সাধারণ শাসন' স্থাপিত হইতে পারে কি প্রকারে? কেহ কেহ বলিয়াছেন, প্রথমতঃ ২।৩ টী জাতি মিলিয়া একটী "মিত্র শাসন" স্থাপিত হউক এবং ক্রমে ক্রমে অন্যান্য জাতিকে শাসনের অধীনে আসিতে অনুরোধ করা হউক, তাহা হইলেই কালে সকল জাতি মিলিয়া একটী সাম্রাজ্য গঠিত হইয়া উঠিবে। বলা বাহুল্য, সকল জাতির উপর যে সাধারণ মহাসভা স্থাপিত হইবে, উহাতে সকল জাতির প্রতিনিধি থাকিবে এবং সকল জাতিই ঐ মহা সাম্রাজ্যের অধীনে থাকিয়া সমানং সুবিধা সুযোগ ভোগ করিবে।

কিন্তু এই আদর্শ সাম্রাজ্যটী কল্পনার চক্ষে অতি সুন্দর হইলেও কার্য্যে প্রতিষ্ঠাপিত করা তত সহজ নহে। কেহ বলিয়াছেন, মনুষ্য সমাজ হইতে যুদ্ধ দূরীভূত করিতে হইলে প্রতি দেশকে নিরস্ত্র হইতে হইবে। বর্ত্তমানে শান্তির সময় সমাজের ভার স্বরূপ যে দেশে দেশে অগণিত সশস্ত্র সৈন্যদল রাখা হয়, উহা ছাটিয়া কাটিয়া দূরীভূত করিতে হইবে। তাহা হইলে সহজে আর কোন দেশ অন্য দেশের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে না। কিন্তু একথায় অনেকে আপত্তি তুলিয়া বলেন যে, তাহা হইলে দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন সংরক্ষণ অনেক সময় অসম্ভব হইয়া উঠিবে। মোটের উপর মানব সমাজ হইতে যুদ্ধ দূর করিবার জন্য যে সমস্ত পন্থা প্রদর্শিত হইয়াছে, উহা সম্পূর্ণভাবে সত্য বা উদ্দেশ্যানুকূল না হউক, উহা যে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির ভাবিয়া দেখা উচিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কিন্তু ইউরোপীয় মনীষিগণের চিন্তা প্রণালী অনুসরণ করিলে একটী বিষয়ে আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া থাকা যায় না। তাঁহারা সমগ্র মানব সমাজ হইতে যুদ্ধ দূর করিবার জন্য চিন্তা করিতে যাইয়া বাস্তবিক পক্ষে যেন শুধু পাশ্চাত্য দেশের কথাই ভাবিয়াছেন। * তাঁহাদের যেন বিশ্বাস শুধু পাশ্চাত্য দেশেই মানব সভ্যতা এবং মানব সমাজ সীমাবদ্ধ। তাই যখন সমগ্র মানব জাতির উপর একটী "সাধারণ শাসন" স্থাপনের কথা আলোচিত হইয়াছে, তখন অধুনা যে সমস্ত জাতি ন্যায় বা অন্যায় ভাবে অন্য জাতির অধীন রহিয়া অন্য জাতিদ্বারা শাসিত হইতেছে সেই সমস্ত জাতির কথা একবার ভুলক্রমেও উল্লিখিত হয় নাই।

আমাদের কিন্তু ধারণা অন্যরূপ। মানব সমাজ হইতে যুদ্ধ কোনওদিন একেবারে তিরোহিত হইবে না। যতদিন প্রকৃতির নিয়ম অক্ষুণ্ণ রহিবে, যতদিন মানব সমাজে উন্নতির জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা রহিবে, যতদিন মানবের প্রাণ সজীব রহিবে, ততদিন যুদ্ধ রহিবে; কেন না এক হিসাবে যুদ্ধে প্রাণের বিকাশ হয়, এবং যুদ্ধই প্রাণ। কিন্তু সে দার্শনিক কথা ছাড়িয়া দিয়াও যদি বাস্তবিকই আমাদের মানব সমাজ হইতে যুদ্ধ দূর করিতে চেষ্টা করিতে হয়, তাহা হইলে যে সকল বিধি ব্যবস্থা স্থাপন করা কর্ত্তব্য এবং একান্ত প্রয়োজন, তাহার কয়েকটী এখানে প্রস্তাবিত হইল—

প্রথমতঃ—প্রত্যেক স্বতন্ত্র জাতিরই স্বায়ত্ব শাসনের স্বাভাবিক অধিকার আছে, একথা পৃথিবীর সকল জাতিকে মানিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ—কোনও জাতির অন্য কোন জাতির উপর সেই জাতির অনিচ্ছায় শাসন করিবার অধিকার নাই একথা মানিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ—প্রত্যেক জাতিরই তাহার নিজ নিজ আদর্শ অনুযায়ী শাসন প্রণালী শিক্ষা দীক্ষা পরিচালনের স্বাভাবিক অধিকার আছে এবং উহাতে অন্য কোন জাতির হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই, একথা মানিতে হইবে।

---

* একথাটী সম্পূর্ণ সত্য নহে। কেন না, শান্তি-সংসদে চীন জাপানও রহিয়াছে; এবং যে League of Nations গঠিত হইবার কথা হইতেছে, তাহাতে চীন জাপানের যোগ দেওয়া অসম্ভব নহে। প্রঃ সঃ

এতদ্ব্যতীত আরও অনেক বিধি ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং সকল জাতিকে মানিতে হইবে। যতদিন মানব সমাজে উপরোক্ত অবস্থা না দাঁড়ায়, যতদিন প্রাচ্য পাশ্চাত্য সকল জাতি সর্ব্ব বিষয়ে সমভূমিতে আসিয়া না পৌঁছে, তত দিন সমগ্র মানব সমাজের উপর যে কোনও সাধারণ শাসন স্থাপিত হইতে পারিবে এবং ঐ শাসন সমগ্র মানব সমাজ অবনত মস্তকে গ্রহণ করিবে, তাহা আমরা বিবেচনা করি না।

আমরা পাশ্চাত্য জাতির মনীষিদিগকে জিজ্ঞাসা করি, উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি পাশ্চাত্য জগতের মহাসভায় গৃহীত হইবে কি? যদি না হয়, তবে মানব সমাজ হইতে যুদ্ধ দূর করিবার আশা শুধুই কল্পনার কুহক মাত্র। মানব সমাজে যুদ্ধ দানব আরও কিছুদিন অপ্রতিহত-ভাবে রাজত্ব করিবে। *

শ্রীরমেশচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার।

* ইউরোপে শান্তিসংসদ প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পূর্ব্বে এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল। শান্তিসংসদে যে সকল প্রস্তাব আলোচিত ও গৃহীত হইতেছে,—বিশেষতঃ আন্তর্জাতিক সমিতি (League of Nations) গঠন সম্বন্ধে যে প্রস্তাব উঠিয়াছে,—সে সমস্তই এই প্রবন্ধে প্রকাশিত মতের অনুকূল। প্রঃ সঃ।

নব পরমাণুবাদ।

পরমাণু বিশ্বের সূক্ষ্মতম জড়োপাদান। সুতরাং পরমাণুবাদ যে জড়বাদ হইবে, তাহা অতীব সহজ-বোধ্য। আমাদের ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন পরমাণু-বাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই উভয় দর্শনেই জড়-রূপেই পরমাণুর ধারণা দেখা যায়। পাশ্চাত্য পরমাণু-বাদেও জড়রূপেই পরমাণুর ধারণা। এই প্রকারে পরমাণু জড়তত্ত্ব রূপেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় জগতেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। জড়রূপে পরমাণুর ধারণা এতকাল পর্য্যন্ত আমাদের মধ্যে এরূপই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, এক্ষণে পরমাণু সম্বন্ধে অন্য কোনরূপ সন্ধান আমাদিগকে কেহ প্রদান করিতে চাহিলে, আমরা যে তাহা শুনিতে চাহিব না বরঞ্চ উপেক্ষা করিতেই উদ্যত হইব, তাহা কিছুই বিচিত্র নহে। আমরা কিন্তু পরমাণু সম্বন্ধে নূতন সন্ধান প্রদান করিতেই অগ্রসর হইয়াছি। আমাদের সেই সন্ধানে পূর্ব্বেই উপেক্ষা প্রদর্শন করা না হয়, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা। প্রথমেই আমরা বায়ুপুরাণ হইতে একটী স্থল উদ্ধৃত করিতেছি—

"তাসু প্রকৃতিমৎ সূক্ষ্মমধিষ্ঠাতৃত্বমব্যয়ম্।
অচুৎপাদ্যং পরংধাম পরমাণুপরেশয়ম্॥
অক্ষয়শ্চাপ্যনুহ্যশ্চ অমূর্ত্তি মূর্ত্তিমানসৌ।
প্রাদুর্ভাব তিরোভাবঃ স্থিতিশ্চাপ্যনুগ্রহঃ॥
বিধিরন্যৈর নৌপম্যঃ পরমাণুর্মহেশ্বরঃ॥"

বায়ুপুরাণ ১০১ অধ্যায়।

"তন্মধ্যে প্রকৃতিমান্, সূক্ষ্ম, অক্ষয়, অব্যয়, অচুৎপাদ্য, অতর্ক্য, অমূর্ত্ত অথচ মূর্ত্তিমান্, পরমাণুস্বরূপ, অধিষ্ঠাতা-ত্মক, পরমধাম পরমেশ্বর বিরাজমান। তিনি প্রাদু-র্ভাব তিরোভাব স্থিতি বিধি দয়াদির মূল আশ্রয়, অথচ সর্ব্ববিধ বৃত্তিদ্বারা অনৌপম্য॥"

এস্থলে পরমাণুর জড়ত্বের সহিত ঈশ্বর চৈতন্যের সংমিশ্রণেরই আশ্চর্য্য চেষ্টার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে পরমাণু বিশ্বের উপাদান-কারণ, আর ঈশ্বর নিমিত্ত-কারণ বা কর্ত্তা। ইহাতে পরমাণু স্বতন্ত্র তত্ত্বরূপে পরিণত হওয়াতেই দ্বৈতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। এই দ্বৈতবাদ স্বীকার করিতে গেলে ঈশ্বরকে খর্ব্ব করিতে হয় বলিয়াই অদ্বৈতবাদের পক্ষ হইতে পরমাণুতে চৈতন্যের আরোপ করতঃ উপাদান কারণ-কেই নিমিত্ত কারণে পরিণত করা হইয়াছে। উদ্ধৃত বর্ণনায় পরমাণু ও ঈশ্বরের মধ্যে কিরূপ চমৎকার সাদৃশ্য

প্রদর্শন পূর্ব্বক সামঞ্জস্য বিধান করা হইয়াছে, তাহা বিশেষরূপেই লক্ষণীয়।

বায়ু পুরাণেরই অন্য একটী বাক্যেও স্পষ্টভাবেই পরমাণুর সহিত পরমেশ্বরের অভেদ ভাব স্বীকৃত হইয়াছে যথা:—

"ঈশ্বরঃ পরমাণুত্বাত্তাবগ্রাহ্যো মনীষিণাম্ ॥"

"ঈশ্বর পরমাণু স্বরূপ বলিয়া মনীষিদিগের ভাবের দ্বারাই মাত্র গ্রাহ্য ॥"

ঈশ্বরের এই পরমাণুরূপ যে কেবল পুরাণের উক্তি-তেই সন্নিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা নহে। এতদনুসারে বিষ্ণুর একনামও "পরমাণ্বঙ্গক" হইয়াছে। এইরূপে তাহাতে পর্য্যন্ত যে পরমাণুর ঈশ্বরত্ব ধারণার সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই আমরা দেখিতে পাইতেছি। কেবল তাহাই নহে, পরমাণুর ঈশ্বরত্ব ধারণার উৎপত্তি কিরূপে হইয়াছে, তাহাও আমরা এখানেই দেখিতে পাই। পরমাণু ঈশ্বরের অঙ্গরূপে স্বীকৃত হইয়াই ঈশ্বরত্বে পরিণত হইয়াছে; ইহাই আমরা জানিতে পারিতেছি। এই প্রকারে ঈশ্বরের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাব হইতেই জড় পরমাণু-বাদ চেতন পরমাণুবাদে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে। পরমাণু বাদের দ্বৈতবাদের সহিত এখানেই অদ্বৈত-বাদের সমন্বয় ঘটিয়াছে।

পুরাণে যাহা সিদ্ধান্তরূপে প্রকাশিত, উপনিষদে তাহারই যুক্তি বিবিধ দৃষ্টান্ত সহকারে গুরুশিষ্য সংবাদ স্থলে প্রদর্শিত। এস্থলে আমরা সেই বিচিত্র দৃষ্টান্ত পরম্পরার দুইটী দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিব—

"ন্যগ্রোধ ফল মত আহরেতীদং ভগবইতি ভিন্ধীতি ভিন্নং ভগব ইতি কিমত্র পশ্যসীত্যণ্ব্য ইবেমা ধানা ভগব ইত্যাসা মঙ্গৈকাং ভিন্ধীতি ভিন্না ভগব ইতি কিমত্র পশ্যসীতি নকিঞ্চন ভগব ইতি ।১।

তং হোবাচ যং বৈ সৌম্যৈতমণিমানং ন নিভালয়স এতস্য বৈ সোম্যৈ ষোঽণিম্ন এবং মহান্ ন্যগ্রোধস্তিষ্ঠতি। শ্রদ্ধৎস্ব সোম্যেতি স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্য মিদং সর্ব্বং তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ। ইতি দ্বাদশ খণ্ডঃ। ৬ষ্ঠ অঃ

"লবণ মেতদুদকেঽ বধায়াথ মা প্রাতরুপসীদথা ইতি সহ তথা চকার তংহোবাচ যদ্দোষা লবণ মুদকেঽ বাধা অঙ্গ তদাহরেতি তদ্ধাবমৃশ্য ন বিবেদ ।১। যথা বিলীন মেবাঙ্গাস্যান্তাদা চামেতি কথমিতি লবণমিতি মধ্যাদা-চামেতি কথমিতি লবণমিত্যন্তা দাচামেতি কথমিতি লবণমিত্যভিপ্রাশ্যৈ ন দথ মোপসী দথা ইতি তদ্ধ তথা চকার তচ্ছশ্বৎসংবর্ত্ততে তংহোবাচাত্র বাব কিল যৎসো-ম্য ন নিভালযসেঽত্রৈব কিলেতি। স য এষোঽণিমৈত দাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেত-কেতোইতি ॥"

ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ ছান্দোগ্যোপনিষৎ ॥

(গুরু বলিতেছেন) "ইহা হইতে ন্যগ্রোধফল আহ-রণ কর। (শিষ্য বলিতেছে) ভগবন্! এই ন্যগ্রোধ ফল। 'ইহাকে ভগ্ন কর'। 'ভগবন্! ভগ্ন করা হই-য়াছে।' 'ইহাতে কি দেখিতে পাইতেছ?' 'হে ভগবন্। এই ক্ষুদ্র বীজ সকল।' 'ইহাদের একটীকে ভগ্ন কর।' 'ভগবন্! ভগ্ন করা হইয়াছে।' 'ইহাতে কি দেখিতে পাইতেছ?' 'ভগবন্। কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।' তাহাকে (গুরু) বলিলেন, হে সোম্য। যে অণুরূপকে নিরীক্ষণ করিতে পারিতেছ না, এই অণুরূপেরই (বিকাশরূপে) এই প্রকাণ্ড ন্যগ্রোধ বৃক্ষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। হে সোম্য। ইহা বিশ্বাস কর যে, সেই অণুত্বই এই (বৃক্ষ)। এই সমস্ত বিশ্বই অণিমাত্মক। উহাই সত্য। উহাই আত্মা। তুমিও হে শ্বেতকেতো। উহাই।' (গুরু এইরূপ বলিয়া বিরত হইলে শিষ্য বলি-লেন)' হে ভগবন্! পুনর্ব্বার আমাকে বিশেষ ভাবে বলুন। (গুরু) বলিলেন, 'হে সোম্য। তাহাই করিতেছি।'

'এই লবণ জলে রাখিয়া প্রাতঃকালে আমার নিকট আসিও।' সে তাহাই করিল। তাহাকে গুরু বলিলেন

'ওহে রাত্রিতে যে লবণ জলে রাখিয়াছিলে তাহা আনয়ন কর।' তাহা সে হস্তের দ্বারা খুঁজিয়া পাইল না। যেহেতু ইহা জলে বিলীন হইয়া গিয়াছে। (গুরু বলিলেন) 'ইহার উপর হইতে আচমন করিয়া কিরূপ স্বাদ পাওয়া যায় দেখ।' শিষ্য বলিলেন 'লবণের স্বাদ'। 'ইহার মধ্য হইতে আচমন করিয়া দেখ কিরূপ স্বাদ?' 'লবণ স্বাদ।' 'তল হইতে আচমন করিয়া দেখ কিরূপ স্বাদ?' 'লবণ স্বাদ।' 'ইহা পান করতঃ আমার নিকট আসিও।' সেই (শিষ্য) তাহাই করিল।' "ইহা পুনঃ পুনঃ হইতে লাগিল। তাহাকে গুরু বলিলেন 'হে সোম্য! ইহাতেই সমস্ত বিদ্যমান আছে, কিন্তু তাহা নিরীক্ষণ করিতে পারিতেছ না। এই যে অণুত্ব তাহাই সেই সমস্ত। সমস্ত বিশ্বই এই অণুস্বরূপ। উহাই সত্য। উহাই আত্মা। তুমিও হে শ্বেতকেতো! উহাই।'

এস্থলে বিশ্বের মূল অণুত্বরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই অণু যে চৈতন্যস্বরূপ, জড়স্বরূপ নহে, তাহাও ছান্দোগ্যোপনিষদেরই অপর স্থলে স্পষ্টরূপেই প্রতিপাদিত দেখা যায়। এখানে আমরা তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি :—

"অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তৎ পুরীষং ভবতি যো মধ্যম স্তন্মাংসং যোঽণিষ্ঠস্তন্মনঃ। ১। আপঃ পীতাস্ত্রেধা বিধীয়ন্তে তাসাং য স্থবিষ্ঠো ধাতু স্তন্মূত্রং ভবতি যো মধ্যমস্ত লোহিতং যোঽণিষ্ঠঃ স প্রাণঃ। ২। তেজোঽশিতং ত্রেধা বিধীয়তে তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তদস্থি ভবতি যো মধ্যমঃ স মজ্জা, যোঽণিষ্ঠঃ সাবাক্। ৩। অন্নময়ং হি সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাগিতি ভূয় এব মা ভগবন্বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ। ৪।

ইতি পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

"ভুক্ত অন্ন তিন প্রকারে পরিণত হয়, যাহা স্থূলাংশ- [illegible] হয়, যাহা মধ্যম প্রকারের বস্তু তাহা মাংস হয়, আর যাহা সূক্ষ্মতম বস্তু তাহা মন হয়। পীত জল তিন প্রকারে পরিণত হয়, ইহার স্থূলাংশ মূত্র হয়, মধ্যমাংশ রক্ত হয়, আর সূক্ষ্মতমাংশ প্রাণ হয়। ভুক্ত তেজঃ পদার্থ তিন প্রকারে পরিণত হয়, স্থূলাংশ অস্থি, মধ্যমাংশ মজ্জা ও সূক্ষ্মতমাংশ বাক্‌রূপে পরিণত হয়।

হে সোম্য! মন অন্নময়, প্রাণ জলময় এবং বাক্ তেজোময়। 'হে ভগবন্! পুনর্ব্বার আমাকে বলুন।' 'হে সোম্য! তাহাই করিব।'

এই বর্ণনা হইতে সমস্ত স্থূলরূপের মূল অবলম্বন স্বরূপেই যে পরমাণু বর্ত্তমান এবং এই পরমাণু যে চৈতন্যাত্মক তাহাই প্রতীয়মান হয়।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে পরমাণু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার নাম Electron বা তাড়িতাণু। এই তাড়িতাণু সকল শক্তির আধার বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। পরমাণু সকল এই সমস্ত তাড়িতাণু দ্বারাই গঠিত। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে এতৎসম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়—"Each atom has proved to be a remarkable constellation of electrons, a colossal reservoir of energy." The Evolution of mind—by Mac Cabe p 14.

"প্রত্যেক পরমাণুই সুস্পষ্ট লক্ষিত তাড়িত'পুঞ্জ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। প্রত্যেকটীই শক্তির বিপুল আধার।"

পরমাণু যে শক্তির আধার বলিয়া উক্ত হইয়াছে, উহার সেই শক্তি যে তাড়িত হইতেই প্রাপ্ত, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। কারণ তাড়িত নিজেই যে শক্তি পদার্থ তাহা সকলেরই সুবিদিত। তাড়িতের কার্য্যের দ্বারাই পরমাণু সকলের সংযোগ বিয়োগ সাধিত হইয়া বিশ্বের পদার্থ সকলের সৃষ্টি হয়। উপনিষদের 'অণিষ্ঠ' বা অণুতম সূক্ষ্মতত্ত্ব তাড়িতাণুর অনুরূপ বলিয়াই আমাদের মনে হয়। কিন্তু কেবল তাড়িতাণুর অনুরূপ বলিলেই ইহার যথার্থ স্বরূপ বলা হইল বলিয়া আমরা মনে করিতে

পারি না। তাড়িতাণু কেবল শক্তি স্বরূপ কিন্তু উপনিষদের অণিষ্ঠ কেবল শক্তি স্বরূপই নহে, ইহা তদতিরিক্ত চৈতন্ত স্বরূপও বটে অর্থাৎ উপনিষদের 'অণিষ্ঠ' চৈতন্যানুপ্রাণিত শক্তি স্বরূপ। পরমাণুতে এইরূপ চৈতন্তের আরোপ না করিলে পরমাণুযোগে চেতন সৃষ্টির কোন ব্যাখ্যাই দেওয়া যাইতে পারে না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পরমাণুবাদীদিগের মতে ঈশ্বর জগতের স্বতন্ত্র চেতনরূপী কর্ত্তা ও পরমাণু স্বতন্ত্র জড়োপাদান রূপে স্বীকৃত হওয়ায় এবং ঈশ্বর সৃষ্টি হইতে পৃথক রূপে অবস্থিত থাকায় সৃষ্টিতে চৈতন্যের স্ফুরণ অতীব দুর্জ্জ্ঞেয় রহস্য রূপেই পরিণত হয়। কিন্তু চেতনরূপী বিশ্বস্রষ্টার বিকাশ রূপে পরমাণুর কল্পনা করিলে চেতনসৃষ্টির সুব্যাখ্যা যেমন আমরা পাইতে পারি, জড় সৃষ্টির সুব্যাখ্যাও আমরা তেমনই পাইতে পারি। কারণ জড়, চেতনেরই স্থূলরূপ এবং চেতন জড়েরই সূক্ষ্মমূলতত্ত্ব বা আত্মা। উপনিষৎ "অণোরপি অণীয়ান্" বলিয়া এই সূক্ষ্ম মূলতত্ত্ব বা আত্মাকেই নির্দ্দেশিত করিয়াছে। অণু হইতেও অণু রূপে বর্ত্তমান থাকিয়া বিশ্বের এই চরম তত্ত্বরূপ পরমাত্মা পরমাণু অপেক্ষাও সূক্ষ্মরূপে ইহার মূল স্বরূপ হইয়াছেন। এইরূপেই উপনিষৎ ও পুরাণে পরমাণুতত্ত্ব চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরতত্ত্বের সহিত অভিন্নরূপে পরিণত হইয়া এক অভিনব পরমাণুবাদের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা প্রচলিত জড় পরমাণুবাদ নহে পরন্তু চেতন পরমাণুবাদ॥

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে ইহার যে সূচনা মাত্র হইয়াছে, প্রাচ্য বিজ্ঞানের শেষ মীমাংসাতেই তাহার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

উমা পরিণয়।

আমার হাতে এক খানা প্রাচীন পুথি আছে। কীটদষ্ট পাতাগুলি সোয়া শতাধিক বৎসরের প্রাচীন। কবি সদাশিব মজুমদার মহাশয় "উমা পরিণয়" নামক এই কাব্যের রচয়িতা। এই পুরাণো পাতা তাহারই সাক্ষী।

'উমা পরিণয়ই' তাঁহার একমাত্র কাব্য কি না জানিতে পারি নাই।

উমা পরিণয়ের যে অংশ আমরা পাইয়াছি তাহাতে নিম্নলিখিত কবিতাংশ আছে।

> "বিংশৎ বৎসর গর্ভে থাকি ভগবতী।
> জন্ম লইলেন তবে ভাবি পশুপতি॥
> ... ... কহিছেন সকল।
> মহা ভাগবতের মত কহিব মঙ্গল॥
> চতুর্ভুজা ত্রিনয়নী অতি জ্যোতির্ম্ময়।
> দেখিয়া সকল লোক হইল বিস্ময়॥
> গিরিরাজ নিকটে বার্ত্তা জন্মের কথন।
> শুনি হরষিত হৈল হিমাল রাজন॥
> নানা বাদ্য বাজে তবে জয় জয় ধ্বনি।
> মঙ্গল রচন করি মনে মনে গণি॥
> পূর্ব্ব কথা স্মরি রাজা করিল গমন।
> মনের আকাঙ্ক্ষা আছে করিতে দর্শন॥
> ... ... প্রার্থনা গিরি মেনকা সহিতে।
> ত্রৈলোক্য মোহিনী দুর্গা হইল সেহি মতে॥
> ব্রহ্মরূপা সনাতনী জগৎ ঈশ্বরী।
> পুত্রীভাবে পাইলেন হিমালয় গিরি॥
> সতীর বিচ্ছেদে হরে একমন হৈয়া।
> দুর্গা দুর্গা মন্ত্র জপ করেন বসিয়া॥

অতঃপর ভগবতী হিমালয়ের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া ভগবান্ শঙ্করের জন্য মেনকার ঘরে জন্ম লইলেন। শুভদিনে মহারাজ হিমালয় কন্যা দেখিলেন। তখন

> স্বর্গ হৈতে পুষ্পবৃষ্টি হৈল হিমালয়।
> দশদিকে পুষ্প গন্ধে করিল আলয়॥(১)

(১) আলয়—আলোকিত শব্দ হইতে। এস্থলে মোহিত, মুগ্ধ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এরূপ স্থলে অন্যত্র 'আলয়' শব্দের ব্যবহার আমরা পাইয়াছি—লেখক।

হিমালয় দেখিলেন 'কন্যার জনমে' গিরিপুরী অপূর্ব্ব শোভাময়ী হইয়াছে। কন্যা দেখিয়া হিমালয়

"ব্রাহ্মণকে ধনবস্ত্র করি বিতরণ।
দুগ্ধবতী সহস্র ধেনু দিলেন তখন॥"

হিমালয় একদৃষ্টে 'মাও' র "অষ্টভুজা অর্দ্ধচন্দ্র মাথে" রূপ নিরীক্ষণ করিয়া

"কৃতাঞ্জলি হৈয়া পড়ে ভূমির উপর।"

এমত অবস্থায় কারণ জানিবার আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক। হিমালয় কহিলেন—

"কেবা জন্মিলা মাও অতি সুলক্ষণা।
দেখিবারে চাহি আমি কিঞ্চিৎ মহিমা॥"

তখন দৈববাণী হইল—

"দেবতা মনুষ্য রক্ষা করিবার তরে।
জন্ম লইলা মাও মেনকা উদরে।"

অতঃপর ভগবতী পিতাকে দিব্য চক্ষু দিয়া আপন বিভূতি দর্শন করাইলেন।

"শিবা রূপা প্রথমে হইলা মহামায়া"
"অর্দ্ধচন্দ্র মাথে শোভে অতি বিলক্ষণ।
মস্তকেতে জটা জূট ত্রিশূল ধারণ॥
... ... অতি ভয়ঙ্করী।
ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধান করিলা শঙ্করী॥
পঞ্চমুখ তিন চক্ষু নাগ আভরণ।
সর্পের লগুণ গলে শোভে বিলক্ষণ॥"

রূপ দেখিয়া হিমালয় 'আনন্দ হৃদয়' হইলেন। তারপর অন্যরূপ দেখিতে চাহিলেন। দেবী তখন

"হইলা বৈষ্ণবীরূপা সর্ব্বলোকে দেখে॥
নীল উৎপলের প্রায় শরীরের কান্তি।
বনমালা গলে শোভে রূপের মূরতি॥
চন্দনে সর্ব্বাঙ্গ তান (১) করিছে লেপন।
হস্ত পদের আভা রক্ত বরণ॥"

রূপ দেখিয়া হিমালয় আনন্দে আত্মহারা হইলেন।

(১) তাঁহার

অধ্যায় শেষ করিয়া কবি আত্ম পরিচয় দিয়াছেন—

"দ্বিজ দুর্গারাম সুত অতি দীন হীন।
দয়াকর দয়াময়ী আজি শুভদিন॥
বিপ্র সদাশিবে বন্দে ভবানীর পাও।
রচিব লাচাড়ি কিছু দয়া কর মাও।"

লাচাড়ি

"প্রণমহ জগৎ জননী।
ব্রহ্মা বিষ্ণু হরি হরে সর্ব্বদায় স্তুতি করে
আত্মারূপা ব্রহ্ম সনাতনী। ১
তুমি সে সকল কর্ত্তা বিধির বিধাতা,
নমো নম শ্চরণ কমলে।
জগৎ পূজক তুমি কিরূপে স্তবিব আমি
মরিলে রাখিও পদতলে॥ ২

অতঃপর হিমালয় গৌরীর নামকরণ করিলেন। উল্লাসে গিরি কন্যার শত নাম রাখিলেন। লাচাড়ি শেষে কবি পুনরায় আপন পরিচয় দিয়াছেন।

"দ্বিজ সদাশিবে কয় বিষম শমন ভয়,
দূর কর গিরিরাজ সুতা।
তুমি দয়া কর যারে, তারে কি করিতে পারে
তুমি মাও বিধির বিধাতা॥"

এই খানেই আমরা কবির রচনার পরিচয় শেষ করিতে বাধ্য হইলাম। আর যে ছিন্ন পত্রাংশ পাইয়াছি তাহাতে বোধ হয়, অন্যূন দেড়শত পৃষ্ঠায় কাব্যখানি শেষ হইয়াছিল। ছিন্ন পত্র হইতে আমরা স্থানে স্থানে কবিতাংশ উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

..............................বরযাত্রগণ।
আইলা পুষ্পকে।.........
............রথে জুড়ি উচ্চৈশ্রবা।
..............................হংস রথে চড়ি॥
নারদে ... .
... ...পূর্ণ বৃষ্টি পকে।
করিল গোলিয়।

হুলু দিল। ... ...

... ...মকে (১) জোকার।

মলয় বাতাস দিল চামর নাড়িয়া।

কত ফুলে .. ..

... ... মন্দির শোভন।

বসন্ত ঋতুর হৈল পূর্ণ আবির্ভাব।

এই সকল অংশ হইতে যে ভাব পাওয়া যায়, তাহাতে আমরা একটী নূতন তথ্য প্রাপ্ত হইয়াছি। শিবের বিবাহ বর্ণনে ভারতচন্দ্র কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। তাহার যোড়া মিলে না। ভারত লিখিয়াছেন—

"নিজগণ লয়ে বরযাত্রী হয়ে
চলিলা যত অমর।
অপ্সরা নাচিছে কিন্নরী গাইছে
পুলকিত মহেশ্বর॥
....
ইন্দ্রের শাসনে মরত ভুবনে
চলে যত রাজগণ।

তার পর নারদ ঠাকুর বর সাজাইয়াছেন। কিন্তু এদিকে মহাদেবের অনুচর—

"ভুত প্রেতগণ ধায় অগণন
আন্ধার হৈল ধূলায়॥
খাবার খাবায় মসাল নিবায়
আন্ধারে শোভিত তায়॥"

ভুত বরযাত্রগণের ভদ্রতার ছিড়িকে পড়িয়া

বরযাত্রগণ লইয়া জীবন
পলাইলা দিয়া রড়।
ইন্দ্রাদি পলায় অন্য কেবা তায়।

কিন্তু সদাশিব মজুমদারের উমা পরিণয়ের বরযাত্রগণ অনেকটা সভ্য হইয়াছেন—এরূপ বোধ হয়। বরযাত্র দলে 'পুষ্পকের' প্রয়োজন দেখা গিয়াছে। উচ্চৈঃশ্রবা পর্য্যন্ত রথে জুড়িয়া (সম্ভবতঃ) ইন্দ্র চলিয়াছেন। হংস রথে (সম্ভবতঃ) পিতামহ। পথে পুষ্প বৃষ্টি হইয়াছে। অনুমান হয়, পথ ঘাট 'সোসর' করা হইয়াছে। নারীগণ হুলু দিয়া বরকে বিদায় করিল। মর্ত্ত্যেও জোকার ধ্বনি হইল। চামরের পর্য্যন্ত আমদানী। অবশেষে "বসন্ত ঋতুর হৈল পূর্ণ আবির্ভাব"। সুতরাং সদাশিব শিবের বিবাহে ভুত প্রেতগুলিকে কৈলাসের পাহাড়ায় রাখিয়া গিয়াছিলেন এরূপ অনুমিত হয়।

আর এক খানা ছিন্ন পত্রের প্রান্তে পত্রাঙ্ক আছে, উহার কতকাংশ কীটদষ্ট। ১৩ বেশ বোঝা যায়—তার পরেও একটা অঙ্কের অর্দ্ধাংশ আছে,উহা ৫ বলিয়া বোধ হয়। ঐ অংশের কবিতায় যাহা পাঠ করা গিয়াছে, তাহা এস্থলে লিখিত হইল। কারণ এই কাগজ আর লোক লোচনের সম্মুখে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। সুতরাং ধ্বংস মুখ হইতে যে টুকু রাখিতে পারিয়াছি, তাহা উপেক্ষা করিতে পারি না।

"কৈলাসের পুরে .....
... ... চন্দ্রিকা কিরণ।
লেহ্য পেয় .. ...
সতীর বদন। ... ... পূর্ণশশী।
হিমাল সদন। ... ...
ব্রহ্মাণী ইন্দ্রাণী আইলা ... ...
দুর্গারাম সুত। ... ...
ভবানীর পাও।
... ... উমা পরি
নাচাড়ী॥
বাপ গিরিরাজ
জগতের পতি। ....কৈলাস।

বাহুল্য ভয়ে এই সকল কবিতাংশের কতিপয় ছত্র পরিত্যক্ত হইল। ইহাতে লাভের কিছু না পাইয়াছি, এমন নহে, তথাপি একঘেঁয়ে তাজা কবিতায় পাঠক ও শ্রোতার ধৈর্য্য পরীক্ষা করা অসমীচীন মনে করিয়াছি।

(১) মকে অর্থ মর্ত্ত্যে। অন্যত্র
"স্বর্গে হুলুহুল মকে জোকার"।

উদ্ধৃত অংশ পাঠে মনে হয় বিবাহান্তে হরগৌরী কৈলাসে গিয়াছেন।

কবি সদাশিব মজুমদারের উদ্ধৃত কবিতাংশ রক্ষণীয় না হউক, তথাপি এক হিসাবে আমরা ইহাকে মূল্যবান্ মনে না করিয়া পারি না। বিশেষতঃ এই কয়েকটী কথার ভিতর গ্রন্থের উদ্দেশ্য কতকটা প্রকাশিত হইয়াছে। উমা মহেশ্বরের আগমনে কৈলাস শ্রীযুক্ত হইয়া উঠিল। ব্রহ্মাণী ইন্দ্রাণী আসিলেন। সম্ভবতঃ দেবদেবীগণের আগমনে কৈলাসের নীরবতা দূরীভূত হইল। লেহ্য পেয় ও চর্ব্ব চোষ্য ভোজনে সকলে পরিতৃপ্ত হইলেন।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

অভাব।

(১)

প্রাণে আজ বুঝিতেছি দারুণ অভাব!
কেমনে দেখাব তার প্রকট প্রভাব!
ঘরে ঘরে হাহাকার, সদা ঝরে আঁখি-ধার,
তবু করি অস্বীকার—হায় কি স্বভাব!
কোথায় চলেছি সবে, কে ভাবি সে কথা কবে,
ঘুমাই টাকার রবে, গণি শুধু লাভ!
কেবলি টাকা ও টাকা, টাকাই জীবন-চাকা,
টাকা বিনা সব ফাঁকা—এই মনোভাব!
আর কি মানুষ আছি, কোনোরূপে রহিয়াছি,
একেবারে ভুলিয়াছি জাতীয় বিভাব!
প্রাণে আজ বুঝিতেছি দারুণ অভাব!

(২)

দারুণ অভাবে আজ কাঁদে প্রাণ মন!
কিছুতেই সুখ নাই, সদা উচাটন!
ভুলেছি অতীত-স্মৃতি, ভুলিয়াছি আর্য্যনীতি,
বাদ দিয়া সমাজ-রীতি চির সুশোভন!
আচারে বিচারে মোরা, যেন ঠিক বর্ণচোরা,
ধরিয়াছি বুড়া ছোঁড়া বিজাতি-ধরণ!
এ-বি সি-ডি কিছু শিখি, ব্রাহ্মণ কেটেছি টিকি,
দেব-দেবী-মূর্ত্তি দেখি হাস্য-আলাপন!
নাহি কোনো ধর্ম্ম-বোধ, আছে শুধু কাম ক্রোধ,
পাপেরে করি না রোধ, বীভৎস জীবন!
দারুণ অভাবে আজ কাঁদে প্রাণ মন!

(৩)

দারুণ অভাবে আজি দেখি অন্ধকার!
মানুষ কুকুর সম ঘোরে চারিধার!
কি পুরুষ কিবা নারী, পরস্পরে মারামারি,
তুচ্ছ দ্রব্যে কাড়াকাড়ি, দুষ্ট ব্যবহার!
পরকাল নাহি মানে, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি জানে,
ক্ষমা শুচি ধ্যান দানে রুচি নাহি আর।
বিধাতারে গেছে ভুলি', ম'জে আছে নিয়ে ধূলি,
শিখিয়াছে বাঁধা বুলি, ঘোর অহঙ্কার!
পুরুষ রমণী-ভক্ত, রমণী গহনাসক্ত,
উভয়েরই দেহে রক্ত ফোটা দুই চার।
দারুণ অভাবে আজ দেখি অন্ধকার!

(৪)

দারুণ অভাবে প্রাণ হয়েছে পাগল!
বলিতে পারি না খুলে অভাব সকল!
পুরুষেরি মত নারী, হইয়াছে কদাচারী,
কলহ শিখেছে ভারী, বচনে অটল।
পাশ্চাত্য নারীর মত, বিলাস ব্যসনে রত,
কতরূপে অবনত, জীবন তরল!
রাঁধে বাড়ে খায় আছে, কেবলি মূর্খামি বাচে,
খোস গল্পে প্রাণ বাঁচে, কে বলে সরল!
সীতা সাবিত্রীর জাতি, বিলাসে রহিল মাতি',
না রাখিল জ্ঞান-ভাতি ধর্ম্ম অবিচল!
দারুণ অভাবে প্রাণ হয়েছে পাগল!

(৫)

দারুণ অভাব আর না রাখিল মান।
না রাখিল দয়ামায়া হৃদয়ের টান।
ভুলেছি পরের দুখ, জানি শুধু আত্মসুখ,
হয়েছে কোমল বুক কঠিন পাষাণ!
অপরের আঁখি-জলে, আর না হৃদয় গলে,
কেড়ে খাই ছলে বলে, করি অপমান!
কি ব্রাহ্মণ কিবা মুচী, শিখিয়াছি তোষামুদি
সত্যকে রেখেছি রুধি'—এত অভিমান!
বিধাতা করিলে রোষ, সদা করি আপশোস্
খুঁজে মরি পরিতোষ, যাচি পরিত্রাণ!
দারুণ অভাব আর না রাখিল মান।

(৬)

কতরূপে অভাবের দিব পরিচয়!
শুকায়ে গিয়াছে হায় প্রাণ সমুদয়!
রহিল না ধর্ম্ম মান, পূজি শুধু পুষ্পবাণ,
চুল দিয়া কাটা কাণ ঢাকি অসময়!
কেবলি নিঃস্বার্থভাবে, কিসে কার প্রাণ যাবে,
বিনা সুদে বিনা লাভে সাধি দেশময়!
হায় হায় হরি হরি!—ব্যক্তিত্ব বিক্রয় করি',
যেথা সেথা ঘুরে মরি, কত কষ্ট ভয়!
নিজের নিজস্ব নাই, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই,
দিবানিশি খাবি খাই, হিয়া বিদরয়!
কতরূপে অভাবের দিব পরিচয়!

(৭)

দারুণ অভাবে কাঁদি সারা নিশিদিন!
হয়েছি এমনি মোরা অপদার্থ হীন!
পরের ঐশ্বর্য্যে সুখে, তীক্ষ্ণ শেল বিঁধে বুকে,
নিজেরি স্বজিত দুখে রহি বিমলিন!
তুমি ছোট আমি বড়,—এ নীতি খাটাতে দড়,
বুঝি না বাঁচ কি মর, পাপাচারে লীন।
চাচা তুই প্রাণ বাঁচা, ছুটে চল্ দিয়ে কাছা,
প্রাণ-পাখী ছেড়ে খাঁচা হয় বা উড্ডীন!
ত্যাগের দেশের লোক, সদা সহে রোগ শোক,
কুকার্য্যে কত না রোখ, তবু হলো ক্ষীণ!
দারুণ অভাবে কাঁদি সারা নিশিদিন।

(৮)

সকলেই জানি ঠিক অভাব কিসের!
অভাব হয়েছে শুধু খাঁটি হৃদয়ের।
হয়ো না হয়ো না রুষ্ট, যতই হও না পুষ্ট,
শোণিত হয়েছে দুষ্ট সারাটি দেশের!
আর্য্য ঋষিদের ছেলে, সুরা খাই অবহেলে,
তাই সবে পায়ে ঠেলে, কি দোষ তাদের।
ব্রাহ্মণ জাহান্নমে, গিয়াছে নিজেরি ভ্রমে,
নামিয়াছে ক্রমে ক্রমে পথে নরকের!
নিদারুণ দুখ সে কি, ব্রাহ্মণেরি দেখাদেখি,
পতন—বুদ্ধির ঢেঁকি অন্য জাতিদের।
সকলেই জানি ঠিক অভাব কিসের!

(৯)

আবার উঠিতে পারি হইলে মানুষ!
হই যদি ধর্ম্মপ্রাণ, থাকে যদি হুঁস!
বিলাস ছাড়িতে হবে, উঠিতে পারিব তবে,
কতক্ষণ থাকে নভে হাউই ফানুস!
ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, ভাবে যদি পর-ইষ্ট,
ঘুচিবেরে দুরদৃষ্ট, সবার কলুষ!
আহারে বিহারে খাঁটি, হতে হবে পরিপাটি,
এদেশের খুঁটি নাটি নহে ভূষি তুষ!
বিশিষ্টতা দেশাচার, তুচ্ছ নাহি কোরো আর,
দেখ না কি চারিধার যমের অঙ্কুশ!
আবার উঠিতে পারি হইলে মানুষ!

(১০)

অধম্য বস্তুর জন্য কিসের প্রয়াস!
কখনো কি কমিবে না সুখের পিয়াস!

কাচকে কাঞ্চন ভেবে, অনুক্ষণ তারে সেবে,
ঘুস দিতে যাও দেখে বাড়িলে হুতাশ!
লয়ে পুত্র পরিবার, ধার'না কাহারো ধার,
চিরদিন বাঁচিবার কতবার আশ!
একদিন অকস্মাৎ, হইবে অশনিপাত,
আসিবে আঁধার রাত, ঘোর সর্ব্বনাশ!
রহিলে ধর্ম্মের আলো, সেদিন হইবে ভালো,
উজ্জ্বল হইবে কালো জীবন-আকাশ!
অযথা বস্তুর জন্য কিসের প্রয়াস!

(১১)

ভাই রে জীবন-সন্ধ্যা ক্রমশঃ ঘনায়!
ভেবে কি দেখ না তুমি যাইবে কোথায়!
এই ঘর এই বাড়ী, যেতে হবে সব ছাড়ি',
বৈতরণী দিবে পাড়ি হয়ে অসহায়!
দুইদিন আগে পাছে, মরণ লিখিত আছে,
আর কি পরাণ বাঁচে ধর্ম্মহীনতায়!
নষ্টামি ভণ্ডামি যত, শাস্তি ঠিক তারি মত,
হইবে জীবন গত তীব্র যাতনায়!
সময় থাকিতে ভাই, এস কিছু করে যাই,
কেঁদে বৃথা ফল নাই ঘোর নিরাশায়!
ভাই রে জীবন-সন্ধ্যা ক্রমশঃ ঘনায়!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

বেদবিদ্যা *

সংস্কৃত ভাষা দুই প্রকার; লৌকিক ও বৈদিক। আমাদের স্কুল কলেজে ও টোলে সাধারণতঃ যে সংস্কৃত ভাষা পড়ান হয় তাহাকে লৌকিক সংস্কৃত কহে। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ যে ভাষা বলিতেন তাহাকে আজকাল সংস্কৃত ভাষা বলা হয়। যেন, উহা প্রাকৃত বা জন সাধারণের ভাষাকে মাজিয়া ঘসিয়া জীর্ণ সংস্কার করিয়া মানুষেরাই উহাকে তৈয়ার করিয়াছে। কিন্তু খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে "সংস্কৃত" শব্দদ্বারা সংস্কৃত ভাষাকে বুঝাইত না। তখন সংস্কার শব্দের অর্থ ছিল অলঙ্কার, এবং সংস্কৃত শব্দের অর্থ ছিল "অলঙ্কৃত" (পাণিনি ৬।১।১৩৭)। "সংস্কৃত" বলিলে যে, "সংস্কৃত" ভাষাকে বুঝায়, তাহা আমরা প্রথমতঃ দণ্ডীর কাব্যাদর্শে লক্ষ্য করি। দণ্ডী কবি খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর অর্থাৎ গুপ্তবংশীয় যুগের লোক। গুপ্ত-রাজগণের আমলে আমাদের প্রাচীন ভাষাকে বৌদ্ধযুগীয় প্রাকৃত ভাষা হইতে যে ঝাড়িয়া বাছিয়া সংস্কৃত করা হইয়াছিল, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। বৌদ্ধযুগে জনসাধারণে একপ্রকার প্রাকৃত ভাষা বলিত। মন্ত্রতন্ত্রে কেবল সংস্কৃত ভাষার প্রচলন ছিল। তখন হইতেই বোধ হয় ঐ প্রাচীন ভারতীয় ভাষার নাম দেবভাষা হইল,—কারণ দেবতাদের সঙ্গে আলাপ করিতে তখনও সেই প্রাচীন ভাষা ব্যবহৃত হইত। Rhys Davids (Buddhist India pp 153-154) প্রমুখ মনীষিগণ সংস্কৃত ভাষা হইতে প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন বটে; কিন্তু তাঁহাদের মতে, বৌদ্ধযুগের পরে সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টি হয়। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পাণিনির সময়ে খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতেও সংস্কৃত ভাষাকে "সংস্কৃত ভাষা" বা "দেবভাষা" প্রভৃতি কোনও বিশেষণ না দিয়া কেবল ভাষা বলা হইত।

সংস্কৃত কাব্যে আমরা যে দুই একটী আর্ষ প্রয়োগ (Archaic usage) পাই,* ঐরূপ আর্ষ প্রয়োগময় কোনও ভাষার কল্পনা করিলে আমরা বেদের ভাষা কিরূপ তাহার একটু ধারণা করিতে পারি। দেব দেবী পূজা, শ্রাদ্ধ, বিবাহ ও প্রায়শ্চিত্তের সময় অদ্যাপি আমাদিগকে মধ্যে মধ্যে ঐরূপ বেদমন্ত্র পাঠ করিতে

---

* ঢাকা সাহিত্য পরিষদের বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ।

* যথা 'ত্রিয়ম্বকং সংযমিনং দদর্শ' কালিদাস, কুমার-সম্ভব, ১ম সর্গ।

হয়। কোনও রসিক নৈয়ায়িক বেদের তাবার লক্ষণ এইরূপ করিতেন "ব্যাকরণে ভগ্নে সতি নানাস্বর পরিপূরিতং অসংবদ্ধপ্রলপিতঞ্চং বেদত্বম্।" পাশ্চাত্য মনীষিদের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাকেও এইরূপ অসংবদ্ধ প্রলপিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা অজ্ঞানতা মূলক। বাল গঙ্গাধর তিলক তাঁহার Arctic Home of the Vedas নামক গ্রন্থে যথার্থই বলিয়াছেন যে, খৃষ্টের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে যখন বেদের ব্রাহ্মণ ভাগের আবির্ভাব হইয়াছিল, তখনও আর্য্য ঋষিদিগের নিকটে বেদের ভাষা দুর্ব্বোধ বলিয়া বিবেচিত হইত, তখনও বেদোক্ত বহু শব্দের অর্থ লইয়া ঋষিদিগের মধ্যে মতদ্বৈধ হইত। এবং তাহাতেই ব্রাহ্মণ ভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। বহু শতাব্দী সমতীত হইবার পরেও এমতাবস্থায় এক্ষণে বেদ অত্যন্ত দুর্ব্বোধ হইবারই কথা। কিন্তু ধন্য নিরুক্তকার, ব্যাকরণকার, ভাষ্য ও টীকাকারগণ, যাঁহাদের অদম্য উৎসাহের ফলে অদ্যাপি বেদমন্দিরের দ্বার আমাদের নিকটে উন্মুক্ত রহিয়াছে।

সেই দিনকার বৌদ্ধ যুগেরই বহু কীর্ত্তিস্তম্ভ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ভূগর্ভলীন হইয়া রহিয়াছে। গন্ধার, তক্ষশিলা, পুরুষপুর, পুষ্কলাবতী নলন্দ, এমন কি সুদূরবর্ত্তী খোটান দেশেও ভূগর্ভলীন বৌদ্ধযুগের বহু প্রাচীন কীর্ত্তি ধ্বজা পাওয়া গিয়াছে (Stein)। বৌদ্ধযুগেরও সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী বৈদিক যুগের ভূগোল ও ইতিহাসের বৃত্তান্ত যে তদোহধিক নিম্ন ভূগর্ভে লীন এবং দুর্লভ হইবে, তাহা বিচিত্র নহে। বাস্তবিক, বৈদিকযুগের ভূগোল ও ইতিহাস বৃত্তান্তের অভাব নিবন্ধনই পূর্ব্বোক্ত রসিক নৈয়ায়িকের বেদলক্ষণ নির্দ্ধারণ করিবার অবকাশ হইয়াছে।

যাহা হউক, আমরা আর্য্য সন্তান। যে বেদ মন্ত্র সহস্র সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে সরস্বতী তটে উচ্চারিত হইয়া, সরস্বতী নদীর নামটী বাগ্‌দেবীকেও অর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, সেই বেদমন্ত্র অদ্যাপি আর্য্যগণ প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যাকাল উচ্চারণ করিতেছেন। রাষ্ট্রবিপ্লবের পরে রাষ্ট্রবিপ্লব আসিতেছে আর যাইতেছে—আর্য্যধর্ম্মের প্রতিও আর্য্যশাস্ত্রের উপর দিয়া বহু ঝঞ্ঝাবাত উপর্য্যুপরি প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। তথাপি আর্য্য সন্তানগণের হৃদয়ে সেই বেদ মন্ত্র অচল অটল ভাবে অদ্যাপি বিরাজ করিতেছে। সেই মূল মন্ত্রে আমাদের জাতীয় হৃদয়কে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে বলিয়াই, অদ্যাপি আমরা বাঁচিয়া আছি এবং পরেও থাকিব। এবং তাহারই দরুণ শক ও হুন রাজন্যগণ বিজয়ী হইয়া আর্য্যধর্ম্ম আলিঙ্গন করিয়া আর্য্যদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলেন।

সেমিটিক বা চীন দেশের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলেও বোধ হয় যে, আর্য্যজাতির বেদ গ্রন্থের মত প্রাচীন আর একটী এরূপ অনির্ব্বচনীয় গৌরবের জিনিষ তাহাদেরও ছিল না। বেদের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা না থাকিলে এবং বেদ ও বেদাঙ্গাদি এতাবৎকাল পর্য্যন্ত রক্ষা করিবার সুবন্দোবস্ত না থাকিলে, ভারতীয় আর্য্যগণ যে, বিজেতৃ পরম্পরার সঙ্ঘর্ষে, ওয়েল্‌স্ ও কর্ণওয়ালের কেল্টিক জাতির ন্যায় ধরাতল হইতে নিঃসারিত হইয়া বিস্মৃতির অতল জলধি গর্ভে নিমজ্জিত হইতেন না, তাহা বলা সুকঠিন। যখন পাশ্চাত্য জগতের অধিকাংশ স্থান অজ্ঞানধ্বান্ত রাশিতে সমাচ্ছন্ন ছিল, তখন হইতে ভারতে যে জ্ঞান রবি সমুদিত, তাহার কারণও উপর্য্যুক্ত বেদ গ্রন্থ।

কোন কোন পাশ্চাত্য মনীষী (Macdonell) বলিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতের কোনও ইতিহাস নাই, কারণ, প্রাচীন ভারত কোন ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ঘটাইতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু, বৈদিকযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া গুপ্ত বংশীয়দের রাজত্ব কাল পর্য্যন্ত ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, বিদেশ জয় স্পৃহা ভারতীয় রাজন্যগণের মনে ছিল না। কিন্তু ভারতের সমৃদ্ধি

শালিতার কথা শুনিয়া সুদূর বেবিলোনিয়া, রোম, গ্রীস্, ইজিপ্ট প্রভৃতি বিদেশীয় প্রাচীন সওদাগরগণ ভারতের সহিত স্থলপথে ও জলপথে বাণিজ্য করিতেন ভারতীয় শিল্প দ্রব্যকে রোমের বিলাসী নাগর ও নাগরীগণ অত্যন্ত ভাল বাসিতেন।

খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে অশোকের রাজত্বকালে, Syria, Egypt, Macedonia, Cyrene (Tripoli)* প্রভৃতি দেশে রাজা অশোক কর্ত্তৃক ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরিত হইয়াছিল। রাজা কনিষ্ক কাশগর ইয়ারকাণ্ড ও খোটান জয় করিয়াছিলেন। রাজা বিজয় সিংহল জয় করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন যবদ্বীপে ও কচ্চিন দেশে আর্য্যসন্তানগণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, পরকীয় দেশ বিজয় করিতে আর্য্য জাতির স্পৃহা ছিল না। ভারতমাতা বাহ্য জয় অপেক্ষা অন্তঃকরণ জয় করাকে অধিক মূল্যবান্ মনে করিয়া আসিতেছেন। ৯০০ খৃষ্টাব্দ হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে একরূপ নির্ব্বাসিত হইয়াছে বটে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে সমগ্র মানব জাতির প্রায় অর্দ্ধাংশ অনুপ্রাণিত হইয়াছে।† বর্ত্তমান কালে সমগ্র মানব জাতির শতকরা প্রায় ৪০ জনে বৌদ্ধধর্ম্মের কোনও না কোনও তত্ত্ব আত্মসাৎ করিয়াছে। ভারতবর্ষ, নেপাল, আফগানিস্থান, পূর্ব্ব তুরকিস্থান, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া, চীন, জাপান, পূর্ব্বদ্বীপ পুঞ্জ, শ্যাম, ব্রহ্ম, সিংহল দেশ কোনও না কোনও যুগে বৌদ্ধ ধর্ম্মের মহত্ব ঘোষণা করিয়াছে। খৃষ্টধর্ম্ম ও মুসলমান ধর্ম্মের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম অদ্যাপি জগতে পতাকা উড্ডীন রাখিয়াছে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেশ্বরবাদীই হউক, আর নিরীশ্বর বাদীই হউক, ভারতীয় প্রত্যেক ধর্ম্মের মূলই বেদে নিহিত রহিয়াছে। বেদবিদ্যাকে ব্রাহ্মণগণ একচেটিয়া বা নিজস্ব করিয়া রাখিয়াছিলেনই বলুন, আর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রভাবে ভারত নিঃক্ষত্রিয় হইয়াছে ইহাই বলুন, একথা ধ্রুব সত্য যে, (যদ্যপি তাহা স্বীকার্য্য নহে) যুগ যুগান্ত ব্যাপিয়া এই ব্রাহ্মণগণই প্রবল ঝঞ্জাবাতের মধ্য দিয়া সংসার সুখে নিস্পৃহ হইয়া, অম্লান ও অক্ষুব্ধ চিত্তে বেদবিদ্যাকে হৃদয়ে ধারণ ও বহন করিয়া আনিয়া বর্ত্তমান জগতের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। এবং ইহাও সত্য যে, যদি অধুনাতন ভারতবাসীদের কোনও গৌরবের বিষয় থাকে, উহা কেবল সেই আর্য জ্ঞান ভাণ্ডার এবং ধর্ম্মপ্রাণতা। সেই গৌরবের ভাণ্ডারটীকে যাঁহারা এতকাল পর্য্যন্ত কষ্ট স্বীকার করিয়া আনিয়া বর্ত্তমান জগদ্বাসীর নিকটে দিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতার ভাজন বটেন।

প্রাচীন গ্রীক ও রোম দেশীয় সাহিত্যের পরিমাণের সহিত সংস্কৃত সাহিত্যের পরিমাণের তুলনা করিলে, (Macdonell) দেখা যায় যে, সংস্কৃত সাহিত্য একাকী উপর্য্যুক্ত দুইটী সাহিত্যের সমষ্টির সমান। সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে বেদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। গুরুশিষ্য পরম্পরা কর্ত্তৃক মুখে মুখে উহা বর্ত্তমান জগতের নিকটে সমানীত হইয়াছে। "অপৌরুষেয়ং বাক্যং বেদঃ"। পাশ্চাত্য মনীষিগণ অসাধারণ ধিষণা ও গবেষণাবলে যে সমুদয় প্রমাণ পাইয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহারা অনুমান করিয়াছেন যে, খৃঃ পূঃ সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে * বেবিলোনিয়া হইতে ভারতীয় সওদাগরগণ ভারতে লেখনকলাটী শিক্ষা করিয়া, ভারতে আনয়ন করিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ফলের আবিষ্কার অহরহই হইতেছে, এবং আশা করা যায় যে, দ্রাবিড় বা অন্যান্য স্থানীয় কবরস্থিত Cairns বা প্রস্তরলিপির পাঠোদ্ধার হইলে, উপর্য্যুক্ত বাদটীও প্রতিবাদিত হইবে। বর্ত্তমানে

* V. Smith.

† Hunter's History of India p. 72.

* এই মত গ্রহণ করিলে, ভট্টমোক্ষ মুলরের খৃঃ পূঃ ৩৫০ অব্দীয় লেখন প্রণালীর আবিষ্কার বাদ খণ্ডন হয় বটে।

আমরা ধরিয়া লইলাম যে, খৃঃ পূঃ সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে যে কারণেই হউক ভারতে একপ্রকার লেখন প্রণালী ছিল। পরলোকগত ৺ মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার তাঁহার শ্রীগোপাল বসু মল্লিক ফেলোশিপের বক্তৃতাচ্ছলে বলিয়াছেন যে, কোনও বৌদ্ধ রাজা হিন্দুশাস্ত্রগুলিকে একটা অগ্নিকুণ্ডে পোড়াইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এই দৃষ্টান্ত অন্য কোনও রাজাও যে অনুকরণ করেন নাই তাহা বলা যায় না। কথিত আছে, যে সমুদয় বেদ দ্বৈপায়ন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছিল, তদ্ভিন্ন আরও অনেক বেদ দ্বৈপায়নের যুগে বর্ত্তমান ছিল, তাহা তাঁহার হস্তগত হয় নাই। তিনি যে সমুদয় সঙ্কলন করিতে পারিয়াছিলেন তাহাই বেদ নামে আজকাল প্রসিদ্ধ। উক্ত আছে,—বিব্যাস বেদান্ যস্মাৎ তস্মাদ্ ব্যাস ইতিস্মৃতঃ। আর যে সমুদয় ঋষিগণ তাহা অবিকল মুখস্থ রাখিতে সমর্থ না হইয়া কেবল তাহার মর্ম্ম স্মরণ রাখিতে পারিয়াছিলেন, সেই সমুদয় লুপ্তবেদের স্মৃত মর্ম্মই ঋষিগণ কর্ত্তৃক স্মৃতিশাস্ত্র নামে প্রচলিত হইতেছে। এইরূপ স্মৃতিশাস্ত্রকারগণের নামও আমরা বহু পাইয়া থাকি। মন্বত্রিবিষ্ণু ইত্যাদি। আর্য্যশাস্ত্র বিদেশী রাজত্বের আমলে ঐ শাস্ত্রগুলি কেবল লিখিত না থাকিয়া ঋষিগণের কণ্ঠস্থ ছিল বলিয়া, ঐ সমুদয় শাস্ত্র রক্ষণের যেমন একরূপ সুবিধা ঘটিয়াছিল, সেইরূপ ঋষিগণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের কণ্ঠস্থ শাস্ত্রগুলির ধ্বংসেরও কারণ হইয়াছিল।

বেদ শব্দের লক্ষণ কি, এক্ষণে আমরা তাহা আলোচনা করিব। প্রাচীনেরা বেদের কোনও লক্ষণ না দিয়া, কেবল বলিয়াছেন,

মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্ (প্রতিজ্ঞাসূত্র)। বেদ শব্দের অর্থ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ।

সর্ব্বানুক্রমণীবৃত্তিতে ষড়্‌গুরুশিষ্য বলিয়াছেন,—

মন্ত্র ব্রাহ্মণয়োরাত বেদশব্দঃ মহর্ষিয়ঃ
বিনিযুক্তরূপো যঃ স মন্ত্র ইতি প্রচক্ষতে॥
বিধিস্তুতিকরং শেষং ব্রাহ্মণং কথয়ন্তি হি।

অর্থাৎ, ইষ্ট প্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহারের উপায় যে বলিয়া দেয়, তাহা বেদপদবাচ্য। বেদ অপৌরুষেয় বাক্য। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ব্যাসদেব লোকহিতের নিমিত্ত বহু বেদ হইতে সংগ্রহ করিয়া যাহা সঙ্কলন করিয়াছেন তাহাই বেদ। বেদের একটী নাম শ্রুতি—যাহা অবিকল গুরুশিষ্য পরম্পরা ক্রমে অনাদি কাল হইতে আমাদের নিকটে মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে তাহাই শ্রুতি। বেদ যদিও ব্যাস দেব কর্ত্তৃক ঋক্ সাম যজুঃ ও অথর্ব্ব এই চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, তথাপি প্রত্যেক বেদের গুরু ও শিষ্য বৈচিত্র্যে গুরুশিষ্যদের অনবধানতাবশতঃ, শিষ্যের বহুত্ব হইতে নানা বেদশাখার উদ্ভব হইয়াছে। যেমন, বুদ্ধ দেবের মত প্রথমতঃ একরূপই সকল শিষ্যে প্রতিপাদিত হইয়াছিল, কিন্তু শিষ্যবুদ্ধি বৈচিত্র্যে বৌদ্ধ ধর্ম্মেরও নানা শাখার উৎপত্তি হইয়াছে; এইরূপ একই ত্রিকাণ্ড বা চতুষ্কাণ্ড বেদবৃক্ষ হইতে নানা শাখা প্রশাখার উদ্ভব হইয়াছে, মূলে একমাত্র ব্রহ্মাই রহিয়াছেন। তাই, সকল শাখারই মূল শ্রুতিবাক্য, এবং সকল শাখারই প্রতিপাদ্য যজ্ঞানুষ্ঠান বটে।

একই বেদের বহুশাখা থাকিলে, শাখাগুলিকে একই বেদের বিভিন্ন সংস্করণ স্বরূপ মনে করা যাইতে পারে। (Max Muller Lit. P. 124) বেদ শাখাশব্দে যেমন বেদের কোন সংস্করণ বা Recension বা পাঠ বা পাঠান্তরকে বুঝায়, তেমন সেই সেই শ্রেণীর পাঠকেরাও 'চরণ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষার একটী বিশেষত্ব এই যে, সংস্কৃতে প্রত্যেক বর্ণেরই উচ্চারণ হয়, কোনও 'নিঃশব্দ বর্ণ' Silent letter নাই। আধুনিক কোন মুদ্রিত বেদ যেমন পাঠান্তরসহ, প্রাচীন কালেও বেদের বিশুদ্ধি উচ্চারণ দ্বারাই রক্ষিত হইত। আজকাল মুদ্রা যন্ত্রে বিভিন্ন স্বর ও ব্যঞ্জনের উচ্চারণ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যেমন নানাবিধ 'সীসকাক্ষর' বা type

এর আবিষ্কার হইতেছে, প্রাচীন কালে সেইরূপ বিশুদ্ধতা "শিক্ষা" শাস্ত্রদ্বারা সাধিত হইত। শিক্ষা শাস্ত্রকে উচ্চারণ বিজ্ঞান বা Phonetics বলা যাইতে পারে। লৌকিক ও বৈদিক এই উভয় ভাষা অবলম্বনে পাণিনীয় শিক্ষা বিরচিত হইয়াছে। যে স্বর ও ব্যঞ্জন উচ্চারণ সমুদয় ক্ষেত্রেই সমান, পাণিনীয় শিক্ষা শাস্ত্রে কেবল তাহারই আলোচনা করা হইয়াছে। আর, যে স্বর ও ব্যঞ্জনের উচ্চারণ বেদের শাখাভেদে পৃথক্ পৃথক্, তাহাকে "প্রাতিশাখ্য" শাস্ত্রে আলোচনা করা হইয়াছে; অতএব শিক্ষা শব্দটী একটী ব্যাপক শব্দ বটে, তন্মধ্যে "প্রাতিশাখ্য" নামটী প্রত্যেক শাখা অবলম্বনে রচিত হইয়াছে বলিয়া উহাকে "ব্যাপ্য" শব্দ বলা যাইতে পারে। যেমন, ঋগ্বেদের স্বতন্ত্র উচ্চারণ অবলম্বনে রচিত শিক্ষা শাস্ত্রকে ঋক্ প্রাতিশাখ্য, এবং যজুর্বেদের স্বতন্ত্র উচ্চারণ অবলম্বনে রচিত শিক্ষা শাস্ত্রকে যজুঃ প্রাতিশাখ্য বলা যায়। বর্ত্তমান যুগে কোন ছাপার পুথিতে ভুল থাকিলে, তাহা যেমন অনায়াসে ধরা যায়, এইরূপ প্রাচীন কোনও শাখার অধ্যেতার পাঠ এই প্রাতিশাখ্য শাস্ত্রের দ্বারা সংশোধিত হইত। ঋক্ সাম যজুঃ ও অথর্ব্ব, মূল বেদ এই চারিটী হইলেও—অধ্যেতৃদিগের সঙ্ঘ, ও দেশ কাল, পাত্র এবং অধ্যেতব্য শাখা ভেদে বহু বেদ গ্রন্থের আবির্ভাব হইয়াছিল। এক ব্যাসদেব হইতে গুরুশিষ্য পরম্পরা দ্বারা বেদের কত শাখা প্রশাখা উৎপন্ন হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

শাকলশিষ্যদের ঐতরেয় ব্রাঃ অপরের শাঙ্খায়ন বা কৌষীতকী ব্রাঃ অন্যথা ঋগ্বেদের ৮ ভেদ

শাকল বাস্কল (ঐতরেয় ঐতরেয়) শাঙ্খায়ন মাণ্ডূক (কৌষীতকী কৌষীতকী)

(ব্রাহ্মণ আরণ্যক) (ব্রাহ্মণ আরণ্যক)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

শিশির বাস্কল সাঙ্খ্য বাৎস আশ্বলায়ন

১ ২ ৩ ৪ ৫

একবিংশত্যধ্বযুক্তম্ ঋগ্বেদম্ ঋষয়ো বিদুঃ। সহস্রাধ্বা সামবেদো যজুরেকশতাধ্বকম্॥ নবাধ্বাহ থর্ব্বণোহ নো তু প্রাহুঃ পঞ্চদশাধ্বকং॥ যদ্ গুরুশিষ্য।

মন্ত্র ব্রাহ্মণ কল্পানাম্ অঙ্গানাং যজুষাম্ ঋচাম।

যন্নাং যঃ প্রবিভাগজ্ঞঃ সোঽধ্বর্যুঃ কৃৎস্নমুচ্যতে॥

চরণব্যূহ, ২।২

বৈশম্পায়ন প্রণীত ‡

(কৃষ্ণ) যজুর্ব্বেদ—৮৬ শাখা সম্পন্ন

চরকাঃ	আহ্বরকাঃ	কঠাঃ	প্রাচ্যকঠাঃ	কপিষ্ঠলকঠাঃ	আইলকঠাঃ	চারায়ণীয়াঃ	বারায়ণীয়াঃ	বার্ত্তান্তবীয়াঃ	শ্বেতাশ্বতরাঃ	ঔপমন্যবঃ	মৈত্রায়ণীয়াঃ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২

পাতাস্তনীয়াঃ
চরণ ব্যূহমতে

খাণ্ডকীয়াঃ ঔখীয়াঃ

তৈত্তিরীয়াঃ

আপস্তম্বী	বৌধায়নী	ভারদ্বাজী	হৈরণ্যকেশী	শাট্যায়নী
১	২ বা কালেয়া	৩সত্যাষাঢ়ী	৪	৫

মানবাঃ	বারাহাঃ	দুন্দুভাঃ	ছগলেয়াঃ	হারিদ্রবীয়াঃ	শ্যামায়নীয়াঃ
১	২	৩	৪	৫	৬

‡ বিশ্বকোষ ও চরণব্যূহ সভাষ্য দ্রষ্টব্য

প্রাচ্যা উদীচ্যা নৈঋর্ত্যা

(শুক্ল) যজুর্ব্বেদ (বা বাজসনেয়ী সংহিতা)

বা কপোলাঃ ?　　অদ্ধাঃ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
কাণ্বাঃ	মাধ্যন্দিনেয়াঃ	জাবালাঃ	বৌদ্ধায়নাঃ	শাফেয়াঃ	অপায়নীয়াঃ	কাপীলাঃ	পৌণ্ড্রবৎসাঃ	আবটিকাঃ	পরমাবটিকাঃ	পারাশরীয়াঃ	বৈণেয়াঃ	বৌধেয়াঃ	ঔধেয়াঃ	গালব
							বা পৌণ্ড্রবৎসাঃ			বা পারাশর্য্যাঃ				

ভিত্তি স্থানীয়ো যজুর্ব্বেদশ্চিত্রস্থানীয়া বিতরৌ। তস্মাৎ কর্ম্মসু যজুর্ব্বেদস্য প্রাধান্যম্। Preface to তৈত্তিরীয় ভাষ্য; বিষ্ণুপুরাণেও উক্ত হইয়াছে যে, 'এক আসীদ্ যজুর্ব্বেদ শ্চতুর্ধা তং ব্যকল্পয়ৎ'।

যজুর্ব্বেদ সংহিতার অন্যতর নাম বাজসনেয়ী সংহিতা। উক্ত ও আছে, যজুর্ঁি দ্বিবিধম্ শুক্লং কৃষ্ণঞ্চ, তত্র

শুক্লং কৃষ্ণমিতি দ্বেধা যজুশ্চ সমুদাহৃতম্।
শুক্লং বাজসনং জ্ঞেয়ং কৃষ্ণং তু তৈত্তিরীয়কম্।

যজুর্ব্বেদ "শুক্ল" ও "কৃষ্ণ" এই দুই ভাগে বিভক্ত। তাহার কারণ নিম্নলিখিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন মুনি স্বকীয় স্ত্রী ও পুত্রকে পাদাঘাত করিবার অপরাধে ব্রহ্মহত্যা পাপে কলুষিত হইয়াছিলেন। তাহা নিরাকরণের নিমিত্ত বৈশম্পায়ন মুনি তদীয় শিষ্যগণকে ব্রত আচরণ করিতে বলিয়াছিলেন। তন্মধ্যে, অন্যতম শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন "ভগবন্, এসকল শিষ্যের তপস্যা করিয়া ফল কি? আমিই সুদুস্কর ব্রত আচরণ করিব।" তাহা শুনিয়া বৈশম্পায়ন কুপিত হইয়া বলিলেন "তোমাদ্বারা আমার কাজ নাই, তুমি আমার শিষ্য হইয়া আমার অবমাননা করিয়াছ, তুমি আমার নিকটে যাহা অধ্যয়ন করিয়াছ, তাহা ত্যাগ কর।" তাহা শুনিয়া যাজ্ঞবল্ক্যও যে যজুর্ব্বেদ বৈশম্পায়নের নিকটে শিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্গিরণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তাহা দেখিয়া মুনিগণ প্রলুব্ধ হইলেন। কিন্তু, উদ্গীর্ণ যজুঃ সমূহ মুনিরূপে গ্রহণ করিতে লজ্জিত হইয়া তিত্তিরি পক্ষিরূপ ধারণপূর্ব্বক আত্মসাৎ করিলেন। তাহাই তৈত্তিরীয় বেদ বা কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ নামে জগতে প্রসিদ্ধ হইল।

যাজ্ঞবল্ক্য বসিয়া রহিলেন না। বৈশম্পায়ন যে সমুদয় যজুর্ব্বেদ জানিতেন না, সেই সমুদয় যজুঃ লাভ করিবার আশায়, যাজ্ঞবল্ক্য সূর্য্যের উপাসনা করিতে লাগিলেন। স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ সবিতা তাঁহাকে পঞ্চদশ শাখা বিশিষ্ট অযাতযাম যে যজুর্ব্বেদ অর্পণ করেন তাঁহারই নাম শুক্ল যজুর্ব্বেদ। সূর্য্যের অন্যতম নাম বাজসনি বলিয়া এবং এই যজুর্ব্বেদ সূর্য্য প্রদত্ত বলিয়া, ইহার নাম বাজসনেয়ী সংহিতা হইল।

বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত ১২।৬।২৬।৭৩ দ্রষ্টব্য।

সামবেদস্য কিল সহস্রভেদা ভবন্তি। এষু অনধ্যায়েষু অধীয়ানা স্তে শতক্রতুবজ্রেণ আহতাঃ

সহস্রং গীত্যুপায়াঃ

সামবেদ (প্রথমতঃ সহস্রভেদ ছিল)

রাণায়নীয়াঃ | শাট্যমুগ্রাঃ | কালোপা বা কাপোলাঃ | মহাকাপোলাঃ বা মহাকালোপাঃ | লাঙ্গলিকাঃ বা লাঙ্গলায়নাঃ | শার্দ্দূলীয়াঃ বা শার্দ্দূলাঃ | কৌথুমাঃ

কৌথুমাঃ — ১ আসুরায়ণাঃ, ২ বাতায়নাঃ, ৩ প্রাঞ্জলিদ্বৈনভৃতঃ, ৪ প্রাচীনযোগ্যাঃ, ৫ নৈগন্মীয়াঃ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
রাণায়নীয়	শাট্যায়নীয়	সাত্যমুদ্গল	মুদ্গল	অহাস্বর	যাজন	কৌথুম	গৌতম	জৈমিনী
মহারাষ্ট্র						গুর্জ্জর		কর্ণাট

১	২	৩	৪
আসুরায়ণাঃ বা আসুরায়ণীয়াঃ	বাতায়নাঃ বা সুরায়ণীয়	বার্ত্তান্তরের	প্রাঞ্জল

কাহারো কাহারো মতে বর্ত্তমান যুগে সামবেদের মাত্র ১৩টী (ত্রয়োদশটী) শাখা আছে। তন্মধ্যে কাশী, কান্যকুব্জ, গুর্জ্জর, বাঙ্গলা প্রভৃতি দেশে কৌথুমী শাখার প্রাধান্য এবং দ্রাবিড়ে রাণায়নী শাখার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়।

অথর্ববেদঃ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
পিপ্পলাঃ	শৌনকাঃ	দামোদাঃ	তোত্তায়নাঃ	জাবালাঃ	ব্রহ্মপলাশা	কুনখী	দেবদর্শী	চারণ বিদ্যাঃ

আমরা ঋক্ সাম যজু ও অথর্ব্ববেদ এই চারিটী বেদেরই শাখা প্রশাখার নির্দ্দেশ করিয়াছি। হয়ত অনেক সমালোচক ইহাকে পণ্ডশ্রম মনে করিবেন কিন্তু বাল্যকালে আমরা নামশ্লোক পড়িবার প্রসঙ্গে এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছি—তোমাদের কোন্ বেদ ? বেদের কোন্ শাখা ? তোমাদের কয় প্রবর ইত্যাদি। সুতরাং, যাঁহারা এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কখনও শুনিয়াছেন, তাঁহারা বোধহয় উপর্য্যুক্ত শাখা-গুলিকে একেবারে অনর্থক মনে করিবেন না। আবার, অথর্ব্ববেদকে বেদ সংজ্ঞার মধ্যে আনিতে কাহারো কাহারো অমত আছে, তাঁহারা অথর্ব্ববেদকে স্বতন্ত্র বেদ সংজ্ঞার বহির্ভূত করিয়া, ত্রয়ী শব্দে ঋক্ সাম ও যজুঃ এই ত্রিবেদীকে বুঝিয়া থাকেন। যাহাদের মতে, অথর্ব্ববেদকে বেদ বলা হয়, তাহাদের মতে ঐ ত্রয়ী শব্দের অর্থ কি, তাহা আমরা এস্থলে আলোচনা করিব।

সর্ব্বানুক্রমণীর টীকাতে উক্ত হইয়াছে যে,

'ঋক্‌পাদবন্ধো, গীতস্তু সাম, গদ্যং যজুর্মন্ত্রঃ'

আবার ইহাও উক্ত হইয়াছে যে,

চতুর্ষ্বপি হি বেদেষু ত্রিধৈব বিনিযুজ্যতে।

বেদৈরশূন্য ইত্যাদৌ মন্ত্রে ত্রৈবিধ্যমুচ্যতে ॥

আমরা দেখিতে পাই যে, ঋগ্‌বেদ কেবল পদ্যময় ; যজুর্ব্বেদে গদ্যাংশই অধিক এবং সামবেদ কেবল গানময়, তবে সামবেদের গানগুলি ঋক্‌মন্ত্রে মিশ্রিত। এই তিন বেদ ছাড়াও অথর্ব্ববেদ নামে একটী চতুর্থবেদ আছে, অথর্ব্বা ঋষি উহার প্রবর্ত্তক। বোধ হয়, বেদ-ত্রয়ের মন্ত্রগুলিকে তিনিই সর্ব্বাগ্রে যজ্ঞকর্ম্মে নিযুক্ত করিবার বিধি প্রণয়ন করেন, এই জন্যে এই বেদের নাম অথর্ব্ব বেদ হইয়াছে। মোটের উপরে এই চারি বেদে আমরা মাত্র তিন শ্রেণীর রচনা দেখিতে পাই, পদ্যময়ী, গানময়ী ও পদ্যগদ্যময়ী। রচনার প্রকৃতি অনুসারে চারিবেদকেই ত্রয়ীনামে অভিহিত করা হয়। সুতরাং ত্রয়ী বলিলে চারিবেদকেই বুঝাইয়া থাকে। 'বেদচতুষ্টয়ং ত্রয়ী।'

উক্ত বেদত্রয়ের বা চতুষ্টয়ের প্রত্যেকটীকে এক-একটী সংহিতা বলে কারণ "বর্ণানাম্ একপ্রাণযোগঃ সংহিতা'' যজুঃ প্রাতিশাখ্য 1. 158

অথর্ব্ববেদে অভিজ্ঞতা না থাকিলে, ঋক্ সাম ও যজুর্ব্বেদে অধিকার লাভ করাও অসম্ভব। বর্ত্তমান যুগে শ্রাদ্ধের চৌউয়ারীতে যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে ব্রহ্মা, হোতা, সদস্য, বিরাট্, গীতা এই পঞ্চ বরণের প্রথা আছে। পূর্ব্বে এইরূপ যজ্ঞে হোতার মন্ত্র প্রধানতঃ ঋক্‌মন্ত্র ছিল, অধ্বর্য্যুর মন্ত্র প্রধানতঃ দুইবেদ--যজুর্ব্বেদ ও ঋক্‌বেদ (বোধ হয় ইহা হইতেই দ্বিবেদী বা দোবে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইয়াছে)। উদ্‌গাতার মন্ত্র প্রধানতঃ ঋক্ যজুঃ ও সাম (বোধ হয় ইহা হইতেই ত্রিবেদী বা তেওয়ারী ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইয়াছে) এবং ব্রহ্মার মন্ত্র প্রধানতঃ অথর্ব্ববেদ (বোধ হয় ইহা হইতেই আমাদের চতুর্ব্বেদী বা চোবে ব্রাহ্মণের নামাকরণ হইয়াছে)। 'ব্রহ্মা সর্ব্ববিদ্যঃ সর্ব্বং বেদিতুম্ অর্হতি'' (যাস্ক 1. 3. 3)

সুতরাং বিধান আছে যে,

ঋগ্বেদ্ বিদামেব হোতারং বৃণীষ

যজুর্ব্বিদম্ অধ্বর্য্যুং, সামাবিদম্ উদ্‌গাতারম্ অথর্ব্বা-ঙ্গিরোবিদং ব্রহ্মাণম্। গোপথ পূর্ব্বার্দ্ধে 1. 3. 1. 2

ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও উক্ত হইয়াছে,—

'ঋচৈব হোত্রং ক্রিয়তে,

যজুষা আধ্বর্য্যবং, সাম্না উদ্‌গীথং, ব্যাবব্ধা ত্রয়ী বিদ্যা ভবত্যথ কেন ব্রহ্মত্বং ক্রিয়তে ইতি ? ত্রয্যা বিদ্যয়েতি ব্রূয়াৎ'' 5. 5. 8

পূর্ব্বে আমরা মন্ত্রাত্মক বেদশাখার নাম উল্লেখ করিয়াছি, তাহার মন্ত্র ত্রয়োদশ প্রকার বটে, যথা,

বিধ্যর্থবাদ যাচ্ঞাশীঃ স্তুতিপ্রৈষ প্রবহ্লিকাঃ।

প্রশ্নো ব্যাকরণং তর্কপূর্ব্ববৃত্তানুকীর্ত্তনম্ ॥

অবধারণং চোপনিষদ্ বাক্যার্থাশ্চ ত্রয়োদশ।

মন্ত্রেষু যে প্রদৃশ্যন্তে ব্যাখ্যাতু শ্রুতিচোদিতাঃ ॥

সুতরাং মন্ত্র বলিলে কেবল স্তব বুঝাইতে পারে না।

ইতিপূর্ব্বে আমরা বেদের লক্ষণ বলিতে সায়নোক্ত "মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক শব্দরাশি বেদঃ" এইরূপ লক্ষণ বলিয়াছিলাম এবং মন্ত্রাত্মক বেদ চতুষ্টয়ের অধ্যেতৃ সংঘের দেশ, কাল ও ব্যক্তিভেদ জনিত শাখা প্রশাখার কথাও বলিয়াছি। এক্ষণে ব্রাহ্মণাত্মক বেদের বিষয়ে আলোচনা করিব।

ষড়্গুরু শিষ্য তাঁহার সর্ব্বানুক্রমণীর বৃত্তির ভূমিকাতে বলিয়াছেন,

মন্ত্রব্রাহ্মণয়োরাহু র্বেদশব্দং মহর্ষয়ঃ।
বিনিয়োক্তব্য রূপো যঃ স মন্ত্র ইতি চক্ষতে ॥
বিধিস্তুতিকরং শেষং ব্রাহ্মণং কথয়ন্তি হি।
বিনিয়োক্তব্য রূপশ্চ ত্রিবিধঃ সম্প্রদর্শ্যতে ॥

(ঋক্, যজুঃ, সাম)

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, গুরুশিষ্য পরম্পরাক্রমে মুখে মুখে শ্রুত হইয়া বেদমন্ত্রগুলি আমাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া উহাদিগকে "শ্রুতি" বলে। তাই মনুও বলিয়াছেন,

শ্রুতিস্তু বেদো বিজ্ঞেয়ো ধর্ম্মশাস্ত্রং তু বৈ স্মৃতিঃ।

তন্মধ্যে, মন্ত্রাত্মক বেদ যে "শ্রুতি" নামে প্রসিদ্ধ, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত, এবং বেদের "ব্রাহ্মণ" ভাগ যে "শ্রুতি" তাহা স্মৃতিকার মহর্ষিগণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বেদমন্ত্রগুলির মধ্যে কোন্ মন্ত্র কোন্ যজ্ঞের কোন্ অবস্থাতে প্রযোজ্য, তাহা ব্রাহ্মণ-বেদে আলোচনা করা হইয়াছে, সুতরাং, বেদের এই ব্রাহ্মণ ভাগকে বেদের বিধিভাগ বলা যাইতে পারে।

বিধিস্তু দ্বিবিধঃ, অ-প্রবৃত্ত-প্রবর্ত্তন-পরঃ অজ্ঞাত-জ্ঞাপনপরশ্চ। অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞান-কাণ্ড ভেদে বিধি দুই প্রকার। জৈমিনি ভাষ্যকার শবর স্বামী কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণের লক্ষণ নিম্নলিখিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে—

হেতু র্নির্ব্বচনং নিন্দা প্রশংসা সংশয়ো বিধিঃ।
পর-ক্রিয়া পুরা-কল্পো ব্যবধারণকল্পনা ॥
উপমানং দশৈবৈতে বিধয়ো ব্রাহ্মণস্য তু।
এতদ্বৈ সর্ব্ববেদেষু নিয়তং বিধিলক্ষণম্ ॥

উদাহরণ যথা,

হেতু শূর্পেণ জুহোতি, তেন হ্যন্নং ক্রিয়তে
নির্ব্বচন—তদ্ দধ্নো দধিত্বম্
নিন্দা—উপবীতা বা এতস্যাগ্নয়ঃ
প্রশংসা—বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা ইত্যাদি

ব্রাহ্মণবেদে—ইতিহাস, পুরাণ, গাথা এবং মন্ত্রাত্মিকা, গাথাত্মিকা এবং ব্রাহ্মণাত্মিকা নারশংসী বা মানুষ প্রশংসার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

বিধিবাক্য, অর্থবাদ ও উপনিষদ্ বা দার্শনিক বাক্যে ব্রাহ্মণবেদ পরিপূর্ণ বটে।

ঋগ্বেদের প্রত্যেক শাখার স্বতন্ত্র ব্রাহ্মণ নাই। শাকল শাখার পাঁচটী প্রশাখারই ব্রাহ্মণ একমাত্র ঐতরেয় বা বহ্বৃগ ব্রাহ্মণ। আর সকল শাখার ব্রাহ্মণের নাম কৌষীতকী বা শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণ।

যজুর্ব্বেদের তিনটী ব্রাহ্মণ—(১) মৈত্রায়ণীয় বা অধ্বর্য্যু ব্রাহ্মণ, (২) বাজসনেয়ক বা শতপথ ব্রাহ্মণ এবং (৩) তৈত্তিরীয়ক ব্রাহ্মণ। শতপথ ব্রাহ্মণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

সামবেদের জৈমিনি, কৌথুম ও রাণায়নীয় এই তিনটী শাখারই একটী মাত্র ব্রাহ্মণ আছে, উহার নাম ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ।

অথর্ব্ব বেদের একটী মাত্র ব্রাহ্মণ আছে, উহার নাম গোপথ ব্রাহ্মণ।

এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও অনেকখানি ব্রাহ্মণ আছে।

এক বেদের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা আছে বটে, তা বলিয়া প্রত্যেক শাখায় মন্ত্রগুলি বিভিন্ন নহে। কিন্তু কখনো কখনো শাখাগুলির মন্ত্রসংখ্যার বিভিন্নতা

দেখা যায়। কিন্তু প্রত্যেক শাখার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র (১) শ্রৌত (২) গৃহ্য ও (৩) প্রাতিশাখ্য সূত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সূত্র—(১) ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শ্রৌত সূত্রের নাম আশ্বলায়ন শ্রৌত সূত্র এবং সাংখায়ন ব্রাহ্মণের শ্রৌতসূত্রের নাম সাংখায়ন শ্রৌতসূত্র।

(২) এইরূপ, আশ্বলায়ন ও সাংখায়ন নামে গৃহ্য সূত্রও আছে।

শ্রৌত সূত্র ও গৃহ্য সূত্রের মধ্যে পার্থক্য এই যে, শ্রৌত বা কল্প সূত্রে অশ্বমেধ ও সোমযজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডের ব্যবস্থা আছে এবং গৃহ্য সূত্রে, দশ সংস্কার এবং গর্ভাধান, জাতকর্ম্ম, উপনয়ন, বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা আছে।

(৩) প্রাতিশাখ্য সূত্রে প্রত্যেক শাখা ভেদে মন্ত্রের উচ্চারণের বিশেষত্ব দেখান হইয়াছে।

সাধারণতঃ ছন্দঃ, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও সূত্রযুগ নিম্নলিখিত রূপে বিভক্ত হইয়া থাকে, যথা—

ছন্দোযুগ	১২০০ খৃঃ পূঃ	—১০০০ খৃঃ পূঃ
মন্ত্র ,,	১০০০ ,,	—৮০০ ,,
ব্রাহ্মণ ,,	৮০০ ,,	—৬০০ ,,
সূত্র ,,	৬০০ ,,	—২০০ ,,

কিন্তু, ডাক্তার হেগের মতে উপর্যুক্ত চতুর্যুগ খৃঃ পূঃ ২৪০০ হইতে ১২০০ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। প্রাচীন বৈদিক যুগে অনুবাকানুক্রমণী, সর্ব্বানুক্রমণী প্রভৃতি নানা প্রকারের অনুক্রমণী দেখিতে পাওয়া যায়। পাঠকেরা আজকাল সূচিপত্রের যেরূপ আদর করিয়া থাকেন, সুদূর বৈদিক যুগেও সূচির সেরূপ আদর ছিল, দেখা যায়।

এই প্রসঙ্গে সংহিতাবিভাগ সম্বন্ধেও দু একটী কথা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সংহিতা দ্বিবিধ—নির্ভুজ বা আর্ষী সংহিতা এবং প্রতৃণ সংহিতা। চরণ ব্যূহ ধৃত আরণ্যক বচন যথা,

যদ্ধি সন্ধিং বিবর্ত্তয়তি তং নির্ভুজস্য রূপম্
যচ্ছুদ্ধে অক্ষরে অভিব্যাহরতি তৎ প্রতৃণস্য।

অর্থাৎ দু'টী পদের বা অক্ষরের মধ্যে যে সন্ধি থাকে, তাহার বিচ্ছেদ না করিয়া অধ্যয়ন করার নাম নির্ভুজ সংহিতা এবং দু'টী পদ বা অক্ষরের মধ্যে সন্ধি না করিয়া উচ্চারণ করার নাম প্রতৃণ সংহিতা।

আদ্যে যথাযথং পাঠাঃ—অগ্নিমীড়ে পুরোহিতম্ দ্বিতীয়ে পদ-সংহিতা ও ক্রম-সংহিতা।

(১) পদ সংহিতা যথা, অগ্নিম্, ঈড়ে, পুরঃ হিতম্।

(২) ক্রম সংহিতা যথা, অগ্নিম্ ঈড়ে, ঈড়ে পুরোহিতম্, পুরোহিতম্।

এই পদ সংহিতা ও ক্রম সংহিতা শিষ্যবুদ্ধি বৈশদ্যার্থ এবং মুখস্থ করিবার প্রণালী নির্দ্দেশার্থ মাত্র। শৌনকীয় চরণব্যূহ পরিশিষ্টে ক্রম সংহিতারও অষ্ট প্রকারের নির্দ্দেশ আছে, যথা,

জটা মালা শিখা লেখা ধ্বজো দণ্ডো রথো ঘনঃ।
অষ্টৌ বিকৃতয়ঃ প্রোক্তাঃ ক্রমঃ পূর্ব্বমনীষিভিঃ॥

এক্ষণে অথর্ব্ববেদ সম্বন্ধে ২।১টী কথা বলা আবশ্যক। অথর্ব্ববেদ সাংসারিক লোকের শান্তি ও পৌষ্টিক পুরোহিত কর্ম্মে অত্যন্ত উপাদেয় বটে। উহাতে, চিকিৎসা, সভাজয়, দুঃস্বপ্ন শান্তি, বিপদ-জয়, পাপ-ক্ষয়, দশকর্ম্ম, অগ্ন্যাধান, রাজসূয়, অশ্বমেধ নক্ষত্র পূজা, হোম, উৎপাত শান্তি, গতায়ুর জীবন প্রাপ্তি, ব্রহ্মবর্চ্চস কামীর কর্ম্ম, অভিচার কর্ম্ম সমূহের কর্ত্তা, [illegible], আত্মরক্ষা—বৈনায়ক হোম, রাজ্যাভিষেক প্রভৃতি—কর্ম্মের সম্পাদন পদ্ধতি বিধিবদ্ধ রহিয়াছে।

বর্ত্তমান যুগে, সংস্কৃত শাস্ত্রের মধ্যে উপনিষদ্ বা দার্শনিক প্রকরণ লইয়াই অনেকে গবেষণা করিতেছেন। উপনিষদ্ বা দার্শনিক বাদ সমূহ ভিন্নও যে বৈদিক গবেষণার আরও একটী প্রশস্ত ক্ষেত্র রহিয়াছে তাহা আলোচনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। শাখা প্রশাখার ভেদে বেদ কত প্রকাণ্ড সাহিত্য তাহার কিঞ্চিৎ আভাস আমরা প্রদান করিয়াছি মাত্র। 'কালস্রোতের মধ্যে

এমন একটী স্তর দেখা যায়, যে সময়ে বেদোক্ত কর্ম্ম-কাণ্ডের অবাধ অনুষ্ঠান ছিল। যখন পরীক্ষিৎ, জন-মেজয় প্রমুখ রাজন্যবর্গ সূতপ্রমুখ পরিব্রাজকের মুখে বিবিধ বার্ত্তা শ্রবণ করিতেন। যখন শুকদেবের মত বক্তা বর্ষব্যাপী, দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী, এমন কি, সহস্রবর্ষব্যাপী দীর্ঘ-সত্রে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতেন। যখন এক এক সত্রে ভারতের নানা স্থান হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সশিষ্য আগমন করিয়া বর্ত্তমান যুগের বিশ্ববিদ্যালয়ের এক একটী Faculty বা Board সংগঠন বা Session করিয়া শিষ্যগণের নিকটে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতেন। এক এক শাস্ত্র বিষয়ক এক একটী সভা সমিতি সংগঠন করিয়া সুবিশাল পুরুষমেধ, অশ্বমেধ, রাজসূয় প্রভৃতি সত্রের মণ্ডপের নানা স্থান নানাবিধ বেদধ্বনিতে মুখরিত হইত। এইরূপ মেলার সমস্ত ব্যয় সম্ভার রাজ-কোষ হইতে সম্পাদিত হইত। বেদজ্ঞগণ এক এক সত্রে নানা প্রকারের বহুমূল্য উপহার লাভ করিয়া চির সুখে নিশ্চিন্ত মনে শাস্ত্রের আলোচনা করিতে পারিতেন। পুরাণ বর্ণিত প্রত্যেক মহা যজ্ঞের বিবরণ পাঠেই আমরা এইরূপ বৈদিক সত্র বা sessionএর অনির্ব্ব-চনীয় প্রভাব দেখিতে পাই। সমগ্র ভারতবাসী পণ্ডিত-গণ এক সত্রে সমবেত হইয়া নিজেদের গুণাগুণের পরীক্ষা করিতেন। এই সমুদয় কারণেই শত সহস্র বর্ষ ব্যাপিয়া, রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্য দিয়াও অক্ষত দেহে অম্লান চিত্তে আমাদের বৈদিক সন্ধ্যার মন্ত্র পাঠ ও গায়ত্রীজপ প্রভৃতি নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে আমরা অদ্যাপি বিরত হই নাই, এই সমুদয় কারণেই ব্রহ্মণ্যতেজ, স্ফুলিঙ্গমাত্রায় হউক না—অদ্যাপি প্রজ্বলিত রহিয়াছে। যে বেদবিদ্যা আমাদের নিজস্ব, যে বেদবিদ্যা লইয়া পৃথিবীর নানা স্থানে নানা প্রকারের গবেষণা ও নূতন নূতন তথ্যের আবিষ্কার চলিতেছে, অথচ যে বেদবিদ্যা আমাদের মজ্জাগত, তাহার প্রতি আমাদের যাহাতে বিশেষরূপে চিত্তাকর্ষণ হয়, তাহা করা আমাদের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য বটে।

পরিশেষে উপবেদ সম্বন্ধে আমরা দু'একটী কথা বলিয়া প্রবন্ধ উপসংহার করিব। আজকাল কি স্কুলে কি কলেজে, ছাত্রগণের অধিকাংশ সময় পাশ্চাত্য বিদ্যা অর্জ্জন করিতেই ব্যয়িত হয়। পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে আমাদের শিক্ষা করিবার অসংখ্য বিষয় আছে, তাহা আমি অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু, আমরা বাঙ্গালী, বাঙ্গলার হাওয়া আমাদের যেরূপ স্বভাব-স্বাস্থ্যকর, অন্যান্য দেশের হাওয়া ততদূর স্বাস্থ্যকর নহে। বর্ষা-কালে জল প্লাবিত স্থানসমূহের অধিবাসীগণের নিকটে সেই জলপ্লাবনই স্বাস্থ্যকর বটে, তাহাতে তাহাদের সর্দ্দি জ্বর হয় না। কারণ, সেই জল বায়ুতেই তাহাদের দেহের উপাদান। সেই জল বায়ুতে বাস করিয়া তাহারা বাস্তবিক মায়ের কোলেই যেন বাস করিতেছে। সেই স্থানে সকলই "আমার" নিজস্ব। সেই স্থানে "আমি" ও "আমার" কথাটী অত্যন্ত ব্যাপক। বিদেশে প্রবাসীর "আমি" ও "আমার" কথাটীর মত সঙ্কীর্ণ নহে। স্কুল কলেজে পাঠ্য কলাশাস্ত্র ও বিজ্ঞান শাস্ত্রে ছাত্রদিগের এমন অনেক কথা উদরস্থ হয়, যাহা পরিপাক করিতে তাহারা সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত। আমার বিবেচনাতে ভারতীয় ভিত্তিতেই এবং ভারতীয় উপা-দানেই ভারত সন্তানগণকে সুরম্য সৌধ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। বিদেশী মাল মশল্লায় কারবার করিয়া দেশের উন্নতি সাধন করা দুঃসাধ্য বটে। বঙ্গদেশে কত সময়ে মায়ের কত সুসন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু বিদেশীয় হাল চালে কেহই কৃতিত্ব লাভ করেন নাই। মাইকেল মধুসূদন ইংরাজী কবিতা রচনা পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গলায় মেঘনাদবধ রচনা করিয়া অনন্ত কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। স্যর্ জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদের জীবন থাকার বাদ আবিষ্কার করিয়া জগৎকে বিস্ময়ে আপ্লুত করিয়াছেন। কিন্তু, যে আর্য্য সন্তান শিশুকাল হইতে শিখিয়াছেন যে, ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সমগ্র বিশ্বই

ত্রিগুণাত্মক, এ আবিষ্কার তাঁহার পক্ষেই সুলভ, অন্যের পক্ষে সুদূর পরাহত। ডাক্তার পি, সি, রায় হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রে নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া জগৎকে মোহিত এবং স্বদেশকে লাভবান্ ও গৌরবান্বিত করিতেছেন, তাহারও মূলে দেখা যায় যে, দেশীয়-উপকরণ লইয়াই তাঁহার ব্যবসায়—অর্থাৎ এমন সকল দ্রব্যজাত লইয়া তিনি সন্নিবিষ্ট, যে সমুদয়কে তিনি বলিতে পারেন "এ সমুদয় আমার" "আমি যে মায়ের সন্তান, ইহারাও সেই মায়ের সন্তান, ইহাদের সঙ্গে আমার জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ রহিয়াছে, ইহাদিগকে আমি বিলক্ষণ চিনি, ও ভাল বাসি।" আবার যে রসে স্যর্ রবীন্দ্রনাথ জগৎকে আপ্লাবিত করিতে পারিয়াছেন, সেই রসটী আমাদের পৈতৃক। বিজাতীয় রসকে হজম করিলে যে বিজাতীয় শক্তির আবির্ভাব হয়, এ সেইরূপ রস নহে। এ রসও স্বাভাবিক, শক্তির উন্মেষও স্বাভাবিক।

ভারতীয় বেদবিদ্যা আলোচনার প্রসঙ্গে এ সকল কথা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া কেহ মনে করিবেন না। চারিটী বেদের প্রত্যেকের এক একটী উপবেদ আছে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, ঋগ্বেদের উপবেদ আয়ুর্ব্বেদ, যে ক্ষেত্রে স্যর্ জগদীশ ও প্রফুল্লচন্দ্র গবেষণা করিতেছেন। যজুর্ব্বেদের উপবেদ ধনুর্ব্বেদ এবং সামবেদের উপবেদ গন্ধর্ব্ববেদ। আর, অথর্ব্ববেদের উপবেদ অর্থশাস্ত্র। ভারতের অর্থ বৃদ্ধি এবং হাহাকার নিবৃত্তির জন্যে বঙ্গের বহু সুসন্তান বহু আলোচনা করিতেছেন, মনীষি স্যর্ নীলরতন সরকার তাঁহার অন্যতম। সম্প্রতি অত্রত্য 'জাতীয় উন্নতিসাধন' সমিতির সভাতে, তিনি চর্ম্ম ব্যবসায় সম্বন্ধে এক অতি সারগর্ভ এবং উপদেশপূর্ণ অভিভাষণ করিয়াছেন। শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি সাধনার্থ এস্থানে একটী সমিতিরও গঠন হইয়াছে বলিয়া শুনিতেছি। তাঁহারা মনে রাখিবেন, ইংরেজী শিক্ষা কোনও দিন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বিদ্বিষ্ট ছিল, আজকাল প্রায় সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলেরাই ইংরেজী পড়িতেছেন। এইরূপ "চামড়ার ব্যবসায়" যতই ঘৃণিত বলিয়া আজকাল বিবেচিত হউক না কেন, উদ্যোক্তৃগণ হঠাৎ একটা Tannery বা রঞ্জন-শিল্পালয় খুলিয়া না বসিয়া যদি অগ্রে এই শাস্ত্রশিক্ষার জন্যে একটী বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করেন এবং সেই বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের ব্যবহারিক শিক্ষার (Practical Trainingএর) সুব্যবস্থা করেন, তবে বোধ হয়, ব্যবসায় বিজ্ঞানের সুবন্দোবস্ত হইবে এবং Dacca Tannery worksএর ন্যায় এ বিষয়টী অল্পায়ু হইবে না। কোষ্ঠার জন্যে পূর্ব্ববঙ্গ খুব প্রসিদ্ধ। একথাও স্যর্ নীলরতন বলিয়াছেন। আশা করি, কোষ্ঠার ব্যবসায় সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান বিষয়েও উক্ত শিক্ষাসমিতির দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে।

শ্রীদেবেন্দ্র কুমার বিদ্যারত্ন।

হাওড়া-সহরে

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন।

দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন ও প্রদর্শনী।

আগামী গুড্ ফ্রাইডের ছুটিতে, ১৩২৬ সালের ৬ই ও ৭ই বৈশাখ হাওড়া-সহরে "বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের" দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন হইবে। সেই সঙ্গে সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ক একটি প্রদর্শনী (Exhibition) হইবে। বাঙ্গালার সাহিত্যানুরাগী সুধী সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই এই সম্মিলনে যোগদান করেন, সহায় হন—ইহাই প্রার্থনা। যাঁহারা সম্মিলনে পাঠের

জন্য প্রবন্ধ লিখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনুগ্রহ-পূর্ব্বক প্রথমে প্রবন্ধের বিষয়টি আমাদিগকে জানাইবেন, এবং ১৫ই চৈত্রের মধ্যে প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি আমাদিগকে পাঠাইয়া দিবেন। যাঁহারা প্রদর্শনীর জন্য দ্রষ্টব্য সামগ্রী পাঠাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাও অনুগ্রহ করিয়া তদ্বিবরণ সত্বর আমাদিগকে জানাইবেন এবং নির্দিষ্ট দিবসের পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য-সামগ্রী পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন। যাঁহারা প্রতিনিধিরূপে সম্মিলনের কার্য্যে যোগদান করিতে চাহেন, তাঁহারাও যত সত্বর সম্ভব, পত্র দ্বারা আপনাপন অভিমত জানাইবেন। বিদুষী মহিলাগণের জন্যও এই সম্মিলনে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইতেছে। ইতি—
৯ই ফাল্গুন, ১৩২৫ সাল।

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী।
সম্পাদক—অভ্যর্থনা সমিতি।
"বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন", হাওড়া।

পদক পুরস্কার

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য নিম্নোক্ত পদক ও পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

পদক প্রবন্ধের বিষয়

(১) হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী সুবর্ণ পদক—বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান।

(২) ঠাকুরদাস দত্ত-সুবর্ণপদক—বঙ্গের পাঁচালী ও সমসাময়িক অন্যান্য সাহিত্যে কবি ঠাকুরদাস দত্তের প্রভাব।

(৩) ব্যোমকেশ মুস্তফী-সুবর্ণ পদক—প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গল।

(৪) রামগোপাল-রৌপ্যপদক—স্বর্গীয় বরদাচরণ মিত্র মহাশয়ের কাব্য সমালোচনা।

(৫) শশিপদ-রৌপ্যপদক—জাতীয় জীবনে সাহিত্যের প্রভাব।

(৬) ব্যোমকেশ মুস্তফী-রৌপ্য পদক—২৪ পরগণায় ও কলিকাতায় জলযান ও তৎসংক্রান্ত প্রচলিত শব্দ ও তাহার সুনির্দ্দিষ্ট অর্থ ও প্রয়োগ।

পুরস্কার

(৭) রামেশচন্দ্র-জাতীয় শিক্ষাবৃত্তি

(২১৲)—এমার্সনের চিন্তাপ্রণালীর সহিত ভারতবর্ষীয় চিন্তাপ্রণালীর সম্বন্ধ।

(৮) শিশিরকুমার ঘোষ-পুরস্কার

(২৫৲)—নরহরি সরকারের জীবন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—প্রবন্ধগুলিতে গবেষণা এবং বিচার-শক্তির পরিচয় থাকা চাই। ৩য় বিষয় পরিষদের সদস্যগণের জন্য এবং ৬ষ্ঠ বিষয় পরিষদের ছাত্রসভ্যগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট। অন্যান্য বিষয়ে সর্ব্বসাধারণে প্রবন্ধ লিখিতে পারেন। আগামী ২রা বৈশাখ (১৩২৬) তারিখের পূর্ব্বে প্রবন্ধগুলি পরিষদের সম্পাদকের নিকট নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির,
২৪৩।১, অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।
৭ই ফাল্গুন। ১৩২৫।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সম্পাদক।

৮ম বর্ষ | চৈত্র ১৩২৫ | ১২শ সংখ্যা

বর্ত্তমান ইউরোপের যুগসমস্যা।

বর্ত্তমান ইউরোপের রাষ্ট্র ও সমাজে যে নানা প্রকার জটিল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যে সভ্যতা এতদিন পর্য্যন্ত আমাদের আদর্শস্থানীয় ও সর্ব্বতোভাবে অনুকরণযোগ্য বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছিল, তাহা যেন এক্ষণ ধ্বংস-মুখে অগ্রসর হইতেছে বলিয়া বোধ হইতেছে। অনেকে বলিয়াছিলেন যে, বিগত ইউরোপীয় যুদ্ধ ইউরোপীয় সভ্যতার ধ্বংস সাধন করিবে। আমাদের কিন্তু মনে হইয়াছিল যে, ঐ যুদ্ধে ইউরোপীয় সভ্যতার ধ্বংস কার্য্য কয়েক বৎসর স্থগিত রাখিবে মাত্র। যে কারণপরম্পরা এই ধ্বংস কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল, বিগত যুদ্ধ বিপ্লবের সময় তাহার কার্য্য স্থগিত ছিল মাত্র। যুদ্ধের অবসানে তাহার কার্য্য পুনরায় যে আরম্ভ হইয়াছে, তাহার যথেষ্ট লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

যাহা হউক, এই সভ্যতা ধ্বংস হউক বা না হউক ইহা বর্ত্তমান সময়ে যে সমস্ত সমস্যা উপস্থিত করিয়াছে, তাহাই এই প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

ইউরোপের সমস্ত সমস্যার মূলেই সাম্য ও স্বাধীনতা-বাদ। সকলেই জানেন যে, রুশো ও ফরাসী বিশ্বকোষের (Encyclopedia) লেখকগণ এই মতবাদ অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রচারিত করিয়াছিলেন। তাহার ফলে ফরাসী দেশে ভীষণ রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল। সেই সময়ে যে বীজ উপ্ত হইয়াছিল, তাহাই কালক্রমে পরিণতি লাভ করিয়া বর্ত্তমান যুগসমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। অতএব এই সমস্যা বুঝিতে হইলে অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিকগণের প্রচারিত সাম্য ও স্বাধীনতাবাদ ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে।

এই সাম্য ও স্বাধীনতাবাদ নানা ভাবে কার্য্য করিয়াছে। ইহা যে কেবল প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালীর প্রতিষ্ঠা করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে, তাহা নহে। ইহা এক-দিকে individualism বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বাদ, অপর দিকে collectivism বা সংঘবাদেরও সৃষ্টি করিয়াছে।

এই collectivism যখন উৎকট কোটিতে আরোহণ করে, তখনই তাহা socialism, communism প্রভৃতি আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ ও সংঘবাদ উভয়েরই মূল এক হইলেও ইহাদের মধ্যে বিরোধ আছে। সাম্যবাদ ও স্বাধীনতা বাদ উভয়ই এক সময়ে প্রচারিত হইয়াছিল এবং উভয়কেই একই আন্দোলনের যমজ সন্তান বলিয়া সচরাচর গণ্য করা হয় সত্য, কিন্তু তথাপি অবস্থা বিশেষে এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। স্বাধীনতার অতি বৃদ্ধি হইলে কোন ২ অবস্থায় সাম্যের অপলাপ হয় এবং সাম্যের অতি বৃদ্ধি হইলে কোন ২ অবস্থায় স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। ক্রমে ২ এই সমস্ত তত্ত্ব পরিস্ফুট করা যাইবে। এখানে এই পর্য্যন্ত বলা আবশ্যক যে, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের সহিত স্বাধীনতার যতটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, সাম্যের ততটা নয়; এবং সংঘবাদের সহিত সাম্যের যতটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, স্বাধীনতার ততটা নয়। কিন্তু তাই বলিয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা সাম্যকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করে না, বরং কোন ২ বিষয়ে অতিমাত্রায় সাম্যের সমর্থন করে। এবং সংঘবাদীরাও স্বাধীনতার বিরোধী নয়, বরং কোন ২ বিষয়ে স্বাধীনতাকেই তাহাদের মূলমন্ত্র বলিয়া প্রচার করে।

মানুষে ২ চারি প্রকার সম্বন্ধ, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক। সুতরাং মানুষের স্বাধীনতাও চারি প্রকারের,—রাজনৈতিক স্বাধীনতা (political liberty), রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা (civil liberty), সামাজিক স্বাধীনতা (social liberty) এবং পারিবারিক স্বাধীনতা (domestic liberty)।*

কিন্তু রাজ্যের স্বাধীনতার (independence) সহিত রাজনৈতিক স্বাধীনতার (Political liberty) গোল করা উচিত নহে। স্বাধীন দেশ (independent country) মাত্রেরই যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আছে, তাহা নহে। যে দেশের রাজশক্তি প্রজাসমষ্টির ইচ্ছাদ্বারা পরিচালিত হয়, কেবল মাত্র সেই দেশেই রাজনৈতিক স্বাধীনতা আছে বলিয়া ধরা যায়। প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী (republican form of Government) পূর্ণ ভাবে প্রজাসমষ্টির ইচ্ছাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং যে দেশে প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী সুপ্রতিষ্ঠিত,—যেমন ফ্রান্স ও আমেরিকা, সে দেশেই রাজনৈতিক স্বাধীনতা পূর্ণ ভাবে বিরাজমান। ইংলণ্ডে প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত নহে; তথায় অভিজাতবর্গের ইচ্ছাদ্বারা শাসন প্রণালী আংশিক ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়; সুতরাং ফ্রান্স বা আমেরিকায় যতটা রাজনৈতিক স্বাধীনতা আছে, ইংলণ্ডে ততটা নাই। জার্ম্মেনি স্বাধীন দেশ বটে; কিন্তু বিগত ইউরোপীয় যুদ্ধের অবসানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সেদেশে স্বেচ্ছাচার পরতন্ত্র শাসনপ্রণালী (autocratic form of Government) প্রতিষ্ঠিত ছিল; সুতরাং সে দেশে তখন রাজনৈতিক স্বাধীনতা মোটেই ছিল না।

অতঃপর রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার (civil liberty) কথা। যে রাষ্ট্রশক্তি—তাহা প্রজাতন্ত্রই হউক বা স্বেচ্ছাচার তন্ত্রই হউক—প্রজা সাধারণের স্বাধীনতার উপর কতিপয় নির্দ্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় ব্যাপার ভিন্ন অন্য কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে না, সেই রাষ্ট্রের প্রজাবৃন্দ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া থাকে। কোনও দেশে রাজনৈতিক স্বাধীনতা কম থাকিলেই যে সে দেশে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাও কম থাকিবে, এমন কোন কথা নাই। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, ইংলণ্ডে প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত নহে বলিয়া সে দেশে পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা নাই; কিন্তু তথাপি সে দেশে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অত্যন্ত বেশী। ইংলণ্ডে

---

* John Stuart Mill তাঁহার Liberty নামক গ্রন্থে civil liberty ও social liberty একই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। আমার বোধ হয়, এই দুইটী শব্দ পৃথক ২ অর্থে ব্যবহার করাই বেশী সুবিধাজনক।

স্বাধীনতার আবাস ভূমি (home of liberty) বলা হইয়া থাকে। ক্রীতদাসও ইংলণ্ডে পদার্পণ করিলে স্বাধীন হইয়া থাকে; প্রত্যেক ইংরেজের বাড়ী তাহার দুর্গস্বরূপ। এই সমস্তের অর্থ কি? যে দেশে পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা নাই, সেই দেশকে স্বাধীনতার আবাস ভূমি বলে কেন? তাহার কারণ এই যে, ইংলণ্ড প্রায় পূর্ণ পরিমাণে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা উপভোগ করে। ইংলণ্ডের প্রজাগণ যে পর্য্যন্ত প্রতিবেশীর কোনও অনিষ্ট না করে, সে পর্য্যন্ত কতিপয় নির্দ্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় ব্যাপার ভিন্ন অন্য বিষয়ে রাষ্ট্রশক্তি প্রজার স্বাধীনতার উপর কোনও হস্তক্ষেপ করে না; প্রজা কি করে না করে, তাহার কোনও খোঁজ খবরও করে না। এই জন্যই সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক নির্য্যাতনের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার জন্য অনেক সময়ে ভিন্ন দেশীয় অনেক বিপ্লববাদীও ইংলণ্ডে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে।

ইংলণ্ডেও কতক পরিমাণে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আছে; কিন্তু যে দেশে তাহা একেবারেই নাই, যে দেশ একেবারে স্বেচ্ছাচার পরায়ণ রাজশক্তির অধীন, সে দেশেও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বহুল পরিমাণে বর্ত্তমান থাকিতে পারে। আমরা এই প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারত বর্ষের কথা অবতারণা করিতে ইচ্ছা করি। প্রাচীন ভারতবর্ষের শাসন প্রণালীকে সচরাচর স্বেচ্ছাচারপরায়ণ রাজতন্ত্র বলিয়াই অভিহিত করা হইয়া থাকে, যদিচ অনেক বিষয়ে উহার সহিত ভারতীয় শাসন প্রণালীর যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। আইন প্রণয়ন রাজশক্তির একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাই প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু ভারতীয় রাজগণের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ছিল না। তাঁহারা অন্যের প্রণীত আইনের প্রয়োগ (administer) করিতেন মাত্র। অবশ্যই একথা ঠিক যে, জন সাধারণেরও সাক্ষাৎ ভাবে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ছিল না; কিন্তু আচার বা customএর দ্বারা জন সাধারণ শাস্ত্রীয় বিধির পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারিত। এবং আচারের প্রাধান্য ভারতীয় শাস্ত্রেও স্বীকৃত হইয়াছিল। Sir John Woodroffe তাঁহার নব প্রকাশিত *Is India civilised* নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"The Hindu kings were not autocrats. Their will was as much subject to the general Dharma as were the people. Whilst the people recognised the king, his duties and functions, the king did the same as regards the people. The Hindu spirit politically displayed itself in a form which was worthy of its other great achievements". *Is India civilized.* p 153.

অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন যে, এই সিদ্ধান্তের অনুকূল অনেক প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে। এই প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ বা সম্যক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

এখানে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, প্রাচীন ভারতের অধিকাংশ স্থলের শাসন প্রণালীকে স্বেচ্ছাচার তন্ত্র বলা সঙ্গত হউক আর নাই হউক, একথা ঠিক যে কতিপয় ক্ষুদ্র রাজ্য ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্য কোথাও প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত ছিল না। কিন্তু তথাপিও ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বড় কম ছিল বলিয়া মনে হয় না। ভারতীয় রাজগণ প্রজার দৈনিন্দন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। গ্রাম্য পঞ্চায়েতগণই গ্রামের সমস্ত কার্য্যের পরিচালনা ও পরিদর্শন করিত। রাজাকে যথাসময়ে কর দিতে পারিলেই প্রজাগণ রাষ্ট্রীয় প্রভাবের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিত। এই জন্যই বিদেশী লেখকগণও প্রত্যেক গ্রামকেই (village community) এক একটী ক্ষুদ্র সাধারণ তন্ত্র (a little republic) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এসম্বন্ধে E. B. Havell তাঁহার নব প্রকাশিত *History of Aryan rule in India* নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"The Common belief of Europe that

Indian monarchy was always an irresponsible and arbitrary despotism is, so far as concerns the pre-Muhammadan period, only one of the many false conceptions of Indian history held by Europeans. Neither ancient nor modern history in Europe can shew a system of local self-government more scientifically planned, nor one which provided more effective safe-guards against abuses, than that which was worked out by Aryan philosophers as the social and political basis of Indo-Aryan religion. The liberty of the Englishman was wrung from unwilling rulers by bitter struggles and by civil war. Indian Aryan constitution was a free gift of the intellectuals to the people ; it was designed, not in the interest of one class, but to secure for all classes as full a measure of liberty and of spiritual and material possessions as their respective capacities and considerations of the common weal permitted". Havell's History of Aryan rule in India, quoted in *London Times.*

Sir John Woodroffe বলিয়াছেন—

"Those who say that this country has never known Self-Government, do not themselves know their subject. As M. Barthelemy Saint Hilaire said, ("L' Inde Anglaise") "In no country in the whole world has com munal autonomy been so developed" It was, as Prof. Monier Williams said, Self government in all its purity. This was the primitive communal organisation of the village with its headman, Panchayet or council and its local officers and servants. Well developed also were the relations and functions of the people (Praja dharma) towards the King with his councillors and of the King towards his people (Raja dharma). Some seem to think that because India had not the ballot-box and hustings, and other paraphernalia of political western life, it did not know what Self-Government is" *Is India Civilised* p. p 151-152.

এসম্বন্ধে আর অধিক মত উদ্ধারের প্রয়োজন নাই। প্রাচীন ভারতে যে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অভাব ছিল না, তাহা প্রমাণিত করার জন্য ইহাই যথেষ্ট।

তারপর সামাজিক ও পারিবারিক স্বাধীনতার কথা। সমাজও অনেক সময়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর অযথা হস্তক্ষেপ করিয়া থাকে। অনেক সময়ে সমাজের ভয়ে অনেকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক কর্ম্ম করিয়া থাকে। ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর সমাজকে এইভাবে হস্তক্ষেপ করিতে না দেওয়াই সামাজিক স্বাধীনতার মূল কথা। ইংলণ্ডের মত সামাজিক স্বাধীনতা আর কোন দেশেই বোধ হয় নাই। কিন্তু ইংলণ্ডের এই যে সামাজিক স্বাধীনতা, ইহা কেবল কর্ম্মের স্বাধীনতা (freedom of action) মাত্র ; মতের স্বাধীনতার (freedom of opinion) সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। ইউরোপের অন্যান্য দেশের ন্যায় ইংলণ্ডেও লোক মতের অত্যাচার (tyranny of opinion) যথেষ্ট। মিল বলিয়াছেন অন্যদেশ অপেক্ষা ইংলণ্ডেই বোধ হয় ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক *। ইহার ফলেই ইংলণ্ডের লোকেরা

*"In England * * * the yoke of opinion is perhaps heavier * * * than in most other countries of Europe. Mill's *Liberty* p. 5

স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারিলেও স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে পারে না। তাহাদের দেশে কর্ম্মবীরের যতটা সদ্ভাব, চিন্তাবীরের ততটা সদ্ভাব নাই। ভারতবর্ষে অপর পক্ষে কর্ম্মের স্বাধীনতা মোটেই নাই; কিন্তু চিন্তার স্বাধীনতা যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কোন প্রকার সমাজগর্হিত কাজ না করিয়া কেবল মাত্র কোন মত প্রচারের দ্বারা—তা' সে মত যতই উদ্ভট এবং প্রচলিত বিশ্বাসের বিরোধী হউক না কেন—কেহ কখনও সমাজের দ্বারা দণ্ডিত হয় না। এই চিন্তা ও কর্ম্মের স্বাধীনতার পার্থক্য সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্ব্বে 'প্রতিভা' পত্রিকায় এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। এবিষয়ে যাঁহারা আরও বিশদ ভাবে আলোচনা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সে প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারেন।

তারপর পারিবারিক স্বাধীনতার কথা। পরিবারের কর্ত্তাও পরিবারস্থ ব্যক্তির উপর অযথা অত্যাচার করিতে পারে। প্রাচীন রোমে পরিবারের কর্ত্তা পরিবারের যে কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত করিতে পারিতেন। কালক্রমে তাঁহার ঐ ক্ষমতা অন্তর্হিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার সমস্ত অধিকার লুপ্ত হয় নাই। এখনও স্ত্রীকে স্বামীর অধীন হইয়া থাকিতে হয়। পরিবারের মধ্যে স্ত্রী ও স্বামী যখন সমান অধিকার ও সমান স্বাধীনতা উপভোগ করিতে পারিবে, তখনই পূর্ণ পারিবারিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত যে আলোচনা হইল, তদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতার সহিত রাষ্ট্রীয়, সামাজিক বা পারিবারিক স্বাধীনতার কোন অচ্ছেদ্য সম্পর্ক নাই। কারণ আমরা দেখিয়াছি যে, ইংলণ্ডে পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা না থাকিলেও পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বর্ত্তমান রহিয়াছে। পরে দেখাইব যে, ফ্রান্সে পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও তথায় ইংলণ্ডের অনুরূপ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমরা দেখিয়াছি যে, পূর্ব্বকালে ভারতবাসীরা যথেষ্ট পরিমাণে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা উপভোগ করিত। এবং সামাজিক স্বাধীনতা সম্পর্কেও দেখাইয়াছি যে, প্রাচীন ভারতে কর্ম্মের স্বাধীনতা ছিল না বটে, কিন্তু চিন্তার স্বাধীনতা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমান ভারতবর্ষেও রাজনৈতিক স্বাধীনতা নাই বটে কিন্তু আংশিক পরিমাণে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আছে। ভারতবর্ষে *Habeas corpus Act* প্রচলিত নাই; আবার বিনা বিচারেও লোকে কারাদণ্ড ভোগ করিয়া থাকে; এতদ্ভিন্ন বর্ত্তমান ভারতীয় রাষ্ট্রশক্তি আইন অনুসারে প্রজার দৈনিন্দন কার্য্যে যথেচ্ছা হস্তক্ষেপ করিতে পারে; কাহারও কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমনের বাধা জন্মাইতে পারে; কাহাকেও কোন সভা সমিতিতে বক্তৃতা দিতে নিষেধ করিতে পারে; ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা যে ভারতবর্ষে নাই, তাহা ঠিক। কিন্তু অপর পক্ষে, বর্ত্তমান ভারতবর্ষে ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য কাহাকেও রাজকীয় নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয় না। লোকে যে ভাবে ইচ্ছা সে ভাবেই স্বীয় অবলম্বিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে। ইংলণ্ডে *Toleration Act* পাশের পূর্ব্বে Dissenter দিগের এই স্বাধীনতা ছিল না। Catholic দিগের এই অধিকার পাইতে আরও সময় লাগিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন বর্ত্তমান ভারতবর্ষে কাহারও ধর্ম্মবিশ্বাস তাহার রাজকার্য্য লাভের অন্তরায় বলিয়া পরিগণিত হয় না। ইংলণ্ডে ১৮২৯ সনের Catholic Relief Act এর পূর্ব্বে রোমান Catholicগণ এই অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল। ইংলণ্ড বহু রক্তপাতে এবং ক্রমে ক্রমে সমাজ ও ধর্ম্ম সম্পর্কিত যে সমস্ত অধিকার লাভ করিয়াছিল, ভারতবর্ষ সিপাহিবিদ্রোহের পর মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ১৮৫৮ সনের সুবিখ্যাত ঘোষণার বলে সেই সমস্ত অধিকার লাভ করিয়াছে। ভারতীয় রাষ্ট্রশক্তি উৎকট সমাজ সংস্কারকদিগের উত্তেজনা ব্যতীত অনর্থক প্রজার ধর্ম্ম ও সামাজিক আচার ব্যবহারের উপর

হস্তক্ষেপ করিয়াছে।

এক্ষণে আমরা সাম্যের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করিব। স্বাধীনতার ন্যায় সাম্যও চারি প্রকারের। রাজনৈতিক সাম্যের অর্থ এই যে, রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির রাজশক্তি পরিচালনের ক্ষমতা সমান হইবে। অর্থাৎ কাহারও একাধিক ভোট থাকিতে পারিবে না (one man one vote)। অতএব বলাই বাহুল্য যে, যে দেশে রাজনৈতিক স্বাধীনতা নাই, সে দেশে রাজনৈতিক সাম্যের কথা উঠিতেই পারে না। পূর্ণ রাজনৈতিক সাম্য ব্যতীত পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা থাকিতেই পারে না। অতএব এই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য ও স্বাধীনতার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ।

রাষ্ট্রীয় সাম্যের অর্থ এই যে, রাষ্ট্রের চক্ষে—আইনের চক্ষে সকলই সমান বলিয়া গণ্য হইবে। রাষ্ট্রের মধ্যে কাহারও অন্যাপেক্ষা অধিক রাষ্ট্রীয় অধিকার (privilege) থাকিতে পারিবে না।

প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রীয় সাম্য ছিল না, কারণ তখন জাতিবিশেষে দণ্ডবিধির ইতরবিশেষ হইত। পক্ষান্তরে বর্তমান ইংলণ্ডেও সকল বিষয়ে রাষ্ট্রীয় সাম্য নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপে জ্যেষ্ঠপুত্রের উত্তরাধিকার বিধির (law of primogeniture) উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা সাম্যের পরিপন্থী সন্দেহ নাই। কারণ, এই বিধান অনুসারে পিতৃত্যক্ত সম্পত্তির উপর জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্রের সমান অধিকার জন্মে না। ভারতবর্ষ ও ফ্রান্সে এই বিধি প্রচলিত নয়। সুতরাং উত্তরাধিকার সম্পর্কে ভারতীয় ও ফরাসী বিধি ইংলণ্ডীয় বিধি অপেক্ষা অধিকতর সাম্য ভাবাক্রান্ত।

সামাজিক সাম্যের ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। ইহা সহজেই বোধগম্য। ইংলণ্ডে যেমন পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা নাই, তেমন সামাজিক সাম্যও নাই। কারণ, ইংলণ্ডে অভিজাতবর্গেরই সামাজিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই সামাজিক বৈষম্যের প্রকার ভেদ আছে। ভারতবর্ষে ইহা জন্মগত; আমেরিকায় ইহা ধনগত; এবং ইংলণ্ডে ইহা কতক জন্মগত, কতক ধনগত, ও কতক গুণগত। ভারতবর্ষীয় সমাজ সংস্কারকেরা জন্মগত আভিজাত্যের বিরুদ্ধেই তীব্র প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। কিন্তু ধনগত আভিজাত্য যে কতদূর অনিষ্টজনক, তাহা আজকাল ইউরোপীয়েরা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিতেছে। এবং ইহা সমূলে ধ্বংস করিবার চেষ্টার ফলেই Socialism এর উৎপত্তি হইয়াছে।

অনেকে গুণগত আভিজাত্যের পক্ষপাতী কিন্তু খাঁটি গুণগত আভিজাত্য এজগতে এ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। ইংলণ্ডের অভিজাত্য আংশিক পরিমাণে গুণগত সন্দেহ নাই। সেখানে নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাও গুণের দ্বারা অভিজাত সম্প্রদায় ভুক্ত হইতে পারে। কিন্তু তদ্দ্বারাও সমাজ যে বিশেষ উপকৃত হয়, তাহা নহে। কারণ গুণগত আভিজাত্যই আবার বংশগত হয়। লর্ড মর্লি গুণবলেই viscount হইয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার পুত্র জন্মের দ্বারাই viscount হইবেন। এতদ্ভিন্ন কোনও নিম্ন শ্রেণীর লোক লর্ডশ্রেণী ভুক্ত হইবা মাত্রই খাঁটি লর্ড সন্তানের ন্যায় নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করে। এই শ্রেণীবিদ্বেষ যে কতদূর অনিষ্টজনক এবং সামাজিক উৎপীড়নের নিদান, তাহা ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক থেকারে (Thackeray) তাঁহার Book of Snobs গ্রন্থে দেখাইয়াছেন। তিনি সমস্ত ইংলণ্ডীয় সমাজকে একটা মইএর সহিত তুলনা করিয়াছেন। যাহারা মইএর উপরের ধাপে আছে, তাহারা নীচের ধাপের লোকদিগকে লাথি মারিতেছে ও উচ্চতর ধাপের লোকের লাথি মস্তক পাতিয়া লইতেছে। অতএব গুণগত আভিজাত্যের প্রতিষ্ঠা দ্বারাও সামাজিক বৈষম্যের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। কারণ গুণ সকলের সমান নহে।

এই সামাজিক সাম্যের সহিত রাজনৈতিক স্বাধী-

নতার বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই। যাঁহারা মনে করেন, যে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র, তাঁহারা ভ্রান্ত। ইংলণ্ডে সামাজিক সাম্য না থাকা সত্ত্বেও বিশেষ পরিমাণে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও পূর্ণ পরিমাণে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আছে। আজ যদি ইংলণ্ড লর্ড সভা (House of Lords) তুলিয়া দেয়, তবে ইংলণ্ডে সামাজিক বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও ঐ দেশ পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতার অধিকারী হইবে। অতএব সামাজিক সাম্যের অভাব রাজনৈতিক স্বাধীনতার পরিপন্থী নহে। একথা আমাদের দেশের অনেক রাজনৈতিক ও সমাজ সংস্কারকগণের অপরিজ্ঞাত হইলেও ইংলণ্ডের লোকদিগের অপরিজ্ঞাত নহে। ডাইসি (Dicey) বলিয়াছেন—

"Democacy in modern England has shewn singular tolerance, not to say admiration, for the kind of social irregularities involved in the existence of the crown and of an hereditary and titled peerage; a cynic might even suggest that the easy working of modern English constitutionalism proves how beneficial may be in practice the result of democracy tempered by snobbishness". Law and Opinion p. 57.

পারিবারিক সাম্যের অর্থ এই যে, স্ত্রীকে স্বামী অপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে করিতে হইবে না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রের ন্যায় পারিবারিক ক্ষেত্রেও সাম্য ও স্বাধীনতার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। কারণ স্ত্রীকে স্বামীর সমান মনে করিলেই স্ত্রীকে স্বামীর অনুরূপ স্বাধীনতাও দিতে হইবে। এতক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিব যে, আমরা যাহাকে স্ত্রীস্বাধীনতা বলি, কি কারণে নব্য নাট্যকারেরা তাহা লইয়া সন্তুষ্ট নহেন। রমণীকে স্বাধীন ভাবে চলিতে ফিরিতে দিলে, অথবা তাহাকে কোর্টশিপ করিবার অধিকার প্রদান করিলেই স্ত্রীস্বাধীনতার চূড়ান্ত হইল বলিয়া আমরা মনে করি। কিন্তু এই স্ত্রীস্বাধীনতা সেরূপ নহে। এই স্ত্রীস্বাধীনতা সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা বিবাহ প্রথার উচ্ছেদসাধক। ইউরোপের বিবাহ চুক্তি মূলক। কিন্তু ইউরোপেও বিবাহকালে রমণীকে প্রতিজ্ঞা করিতে হয় যে, সে সর্ব্ব বিষয়েই স্বামীর আজ্ঞা পালন করিবে। ইহা সাম্যের বিরোধী। স্বামী ও স্ত্রী যদি সমানই হয়, তবে স্ত্রী স্বামীর আদেশ পালন করিবে কেন? আর, স্ত্রী যদি সেরূপ প্রতিজ্ঞা করে, তবে স্বামীই বা কেন প্রতিজ্ঞা করিবে না যে, সে সর্ব্ববিষয়েই স্ত্রীর আজ্ঞা পালন করিয়া চলিবে? ফলতঃ এরূপ উৎকট সাম্যবাদের উপর বিবাহের ভিত্তি সংস্থাপিত হইতে পারে না। ইউরোপে ডাইভোর্স প্রথা প্রবর্ত্তিত ও বেন্থাম প্রমুখ হিতবাদীদের চেষ্টায় সম্প্রসারিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু বার্ণার্ড শ প্রভৃতি নব্য নাট্যকারেরা তাহাতেও সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহারা উহার আরও সম্প্রসারণ ও এমন কি বিবাহকে একটী সাময়িক চুক্তিতে পরিণত করিতে ও আদালতের সাহায্য ব্যতীতই তাহা ভঙ্গ করিবার অধিকার লাভের চেষ্টা করিতেছেন।

এইখানেই স্বাধীনতা ও সাম্যবাদের আলোচনা সমাপ্ত করিলাম। অতঃপর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের অবতারণা করিব। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বাদ বুঝিতে হইলে সাম্য ও স্বাধীনতার যে বিশ্লেষণ করিলাম, তাহা মনে রাখিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সাম্য অপেক্ষা স্বাধীনতার সহিতই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে, স্বাধীনতা চারি প্রকারের। ইহার মধ্যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার সহিত ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বাদের ততটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই। অবশ্য ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদীরাও দেশে রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠাকে অত্যাবশ্যকীয় বলিয়া মনে করেন। কিন্তু

তাঁহারা বলেন যে, উহাই যথেষ্ট নহে; যে রাষ্ট্রশক্তি প্রজাসমষ্টির ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহাও রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির (individual) স্বাধীনতার উপর অযথা হস্তক্ষেপ করিতে পারে। অতএব রাষ্ট্রশক্তি বা ষ্টেটের (state) ক্ষমতা সংকোচ করিয়া ব্যক্তির স্বাধীনতাকে নিরঙ্কুশ করিতে হইবে। ইংলণ্ডে জেরিমি বেন্থাম (Jeremy Bentham) এই মতবাদ প্রচার করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। হিত-বাদের (untilitarianism) প্রতিষ্ঠা যেরূপ তাঁহার এক কীর্ত্তি, এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বাদের (individualism) প্রতিষ্ঠা না হউক প্রচারও তাঁহার অপর কীর্ত্তি। বেন্থামকে এই মতের প্রতিষ্ঠাতা বলা যায় না; কারণ ইংলণ্ড চিরকালই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বাদের পক্ষপাতী; উহা প্রাচীন কাল হইতেই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার লাভের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে।

কিন্তু ফরাসীরা সেরূপ করে নাই। ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের ইতিহাস বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিপ্লববাদীদের একদিকে প্রচারিত Rights of man বা মানবের অধিকার শীর্ষক ঘোষণা পত্রে সর্ব্বপ্রকার সাম্য স্বাধীনতারই উল্লেখ ছিল বটে; কিন্তু তথাপি তাহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল, রাজনৈতিক স্বাধীনতা (সুতরাং রাজনৈতিক সাম্য) ও রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সাম্য। একদিকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অপর দিকে প্রায় সর্ব্ব প্রকার সাম্যের জন্যই তাহারা একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার ফলেই রাজা প্রাণ হারাইয়াছিলেন এবং আভিজাত্য সমূলে উৎপাটিত হইয়াছিল। অতএব বলিতে হইবে যে, বিপ্লববাদীরা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সাম্য সংস্থাপনের জন্য যতটা আগ্রহশীল ছিল, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক স্বাধীনতার জন্য ততটা ছিল না। অবশ্যই একথা সত্য যে, মধ্যবিত্ত লোকেরা সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতারই পক্ষপাতী ছিল; কিন্তু নিম্নশ্রেণীর লোকেরা সাম্যের জন্যই ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল; এবং অবশেষে Marat এর অধিনায়কত্বে নিম্নশ্রেণীরই জয় হইয়াছিল। তাহার ফলে সাম্য কর্ত্তৃক স্বাধীনতা বিনষ্ট হইয়াছিল। Lord Acton বলিয়াছেন—

"The deepest cause which made the French Revolution so disastrous to liberty, was its theory of equality. Liberty was the watch-word of the middle class, equality of the lower. It was the lower class that won the battles of the third estate; that took the Bastille, and made France a constituted monarchy; that took the Tuilleries, and made France a Republic. They claimed their reward. The middle class having cast down the upper orders with the aid of the lower, instituted a new inequality and a privilege for itself. By means of a tax-paying qualification, it deprived its confederates of their vote. To those, therefore, who had accomplished the Revolution, its promise was not fulfilled. Equality did nothing for them. The opinion at that time was almost universal, that society is founded on an agreement which is voluntary and conditional and that the links which bind men to it are terminable for sufficient reason, like those which subject them to authority. From these popular premises, the logic of Marat drew his sanguinary conclusions. He told the famished people that the conditions on which they had consented to bear their evil lot, and had refrained from violence, had not been kept to them. It was suicide, it was

murder; to submit to starve and to see one's children starving, by the fault of the rich. The bonds of society were dissolved by the wrong it inflicted. The state of nature had come back, in which every man had a right to what he could take. The time had come for the rich to make way for the poor. With their theory of equality, liberty was quenched in blood, and Frenchman became ready to sacrifice all other things to save life and fortune".

অতিরিক্ত স্বাধীনতার ফলে সাম্যের সহিত স্বাধীনতার এইরূপ বিরোধ হইবেই হইবে।

কিন্তু ইংলণ্ডের ইতিহাস অন্যরূপ। ইংলণ্ডে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। সেই জন্য ফরাসী দেশের ন্যায় ইংলণ্ডে আভিজাত্য সমূলে উৎপাটিত হয় নাই। পক্ষান্তরে, ইংলণ্ডের লোকেরা চিরকালই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার বিশেষ পক্ষপাতী এবং ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের বহু পূর্ব্ব হইতে এই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছিল। Dicey বলিয়াছেন—

"Individualism has always found its natural home in England" Law and Opinion p 174.

ইংলণ্ডের Common Law ও ইহার অনুকূল ছিল। Dicey বলিয়াছেন—

"Benthamism was, and was ultimately felt to be, little else than the logical and systematic development of those individual rights, and especially of that individual freedom which has always been dear to the common law of England. The faith indeed of the utilitarians in the supreme value of individual liberty, and the assumption on which that faith rests, owe far more to the traditions of the common law than thinkers, such as John Mill, who was no lawyer, are prepared to acknowledge." Ibid p 175.

এই জন্যই ইংলণ্ডের লোকেরা যতটা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা উপভোগ করে, ফরাসীরা সাধারণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াও ততটা করিতে পারে না। ইহার কারণ এই যে, তাহারা রাষ্ট্র ও সমাজে স্বাধীনতা অপেক্ষা সাম্যের উপরই বেশী জোর দিয়াছে। Dicey বলিয়াছেন—

"French democracy is opposed to differences of rank involving political inequality. The very foundation of the French political and social system, is the existence of a large body of small landed proprietors, to use English expressions, of small free-holders. Testamentary freedom, in the English sense of the word, is unknown. The systematic and equal division of a deceased person's property, corresponds with the French ideas of justice, and prohibits that formation of large hereditary estates which has long been a marked feature of English social life. For personal liberty, and for what we should call religious freedom, by which I mean the effectual right of every man to advocate and propogate any theological and religious dogma which he pleases to adopt, and generally for the right of association, French democracy has hitherto shown little care". Ibid p. 59.

এই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদকে Doctrine of *Laissez faire* বা রাষ্ট্রীয় ঔদাসীন্যবাদও বলে। Dicey ইহার এইরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন—

"Every man is, in the main, and as a general rule, the best judge of his own happiness. Hence legislation should aim at the removal of all those restrictions on the free action of an individual which are not necessary for securing the like freedom on the part of its neighbours". Ibid p. 145.

চুক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করাও এই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের এক মূলমন্ত্র; এবং পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ডাইভোর্স প্রথার সম্প্রসারণের জন্যও এই মতবাদ বিশেষরূপে দায়ী। কারণ ইউরোপে বিবাহ চুক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। Dicey বলিয়াছেন—

"From these guiding principles ** English individualists have in practice deduced two corollaries, that the law ought to extend the sphere and enforce the obligation of contract, and that as regards the possession of political power, every man ought to count for one, and no man ought to count for more than one" Ibid p. 149.

"Hence individualistic reformers opposed anything which shook the obligation of contract, or what at bottom is the same thing, limited the contractual freedom of individuals. It is no accident that Bentham very early in his career assaulted the usury laws. To individualism, again, is assuredly due that legislation of divorce, which is itself a mere extension of the area of contractual freedom". Ibid p.p. 150.

যাহা হউক, Bentham কেবল state বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন; তিনি বিবিধ প্রকারে আইনের সংস্কার দ্বারা কেবল রাষ্ট্রের ক্ষমতাই কমাইতে সচেষ্ট ছিলেন; কিন্তু তাঁহার শিষ্য ষ্টুয়ার্ট মিল গুরু অপেক্ষাও অধিক অগ্রসর হইয়া ঘোষণা করিলেন যে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার যেমন রাষ্ট্রের নাই, তেমন সমাজেরও নাই। Dicey বলিয়াছেন—

"Bentham assaulted restriants imposed by definite laws—John Mill carried the war a step further, and, in his treatise on *Liberty*, denounced restraints on the action of individuals imposed by social conventions". Ibid p. 148.

মিল নিজে বলিয়াছেন—

"Protection, therefore, against the tyranny of the magistrate is not enough. There needs protection also against the tyranny of the prevailing opinion and feeling; against the tendency of society to impose, by other means than civil penalties, its own ideas and practice as rules of conduct on those who dissent from them".—Mill's *Liberty*. p. 3.

এপর্য্যন্ত যে আলোচনা হইল, তদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক স্বাধীনতা পূর্ণ ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে উৎসুক। এই জন্যই আমি পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম যে, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের সহিত স্বাধীনতার যতটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, সাম্যের সহিত ততটা নয়। অবশ্যই তাহারা সাম্যও চায়। ইতিপূর্ব্বে Diceyর বাক্য উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছি যে, তাহারা বলে যে, রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রত্যেকেরই সমান হওয়া উচিত—

(as regards the possession of political power every man ought to count for one)। এই মতানুসারে ইংলণ্ডের House of Lordsকে একেবারে তুলিয়া দিতে হয়। কিন্তু তাহারা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতার সংকোচ করিতে যেরূপ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছে, House of Lordsএর ক্ষমতা সংকোচ করিবার জন্য অর্থাৎ রাজনৈতিক সাম্য স্থাপন করার জন্য সেরূপ চেষ্টা করে নাই আবার তাহারা রাষ্ট্রীয় সাম্যেরও বিরোধী নয় সত্য, কিন্তু ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পরিপন্থী বলিয়া বেন্থাম usury lawএর বিরুদ্ধে যেরূপ খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন, রাষ্ট্রীয় সাম্যের বিরোধী Law of primogeniture বা Power of Testamentary dispositionsএর বিরুদ্ধে সেরূপ হন নাই। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক স্বাধীনতার দিকে তাঁহাদের যতটা ঝোঁক ছিল, সাম্যের দিকে ততটা ছিল না।

কিন্তু পারিবারিক স্বাধীনতার সম্বন্ধে তাহাদের অভিমত কি? ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা পারিবারিক স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠার জন্যও প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশ্যই রাজনৈতিক ক্ষেত্রের ন্যায় পারিবারিক ক্ষেত্রেও সাম্য ও স্বাধীনতার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। তথাপি তাঁহারা স্বাধীনতার দিক দিয়াই পরিবারকে আক্রমণ করিয়াছেন; তবে প্রসঙ্গতঃ তাঁহারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, রমণী পুরুষ অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহে। যাহা হউক, এক্ষণে পারিবারিক স্বাধীনতা সম্বন্ধে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা কি বলিয়াছেন, তাহাই উল্লেখ করিব। Mill লিখিয়াছেন—

"Not a word can be said for despotism in the family which cannot be said for political despotism". Mill's. *Subjection of women.* p. 63.

এই রমণীর অধীনতার মূল কি? ইহার মূল বিবাহ। বিবাহ প্রথা যতদিন থাকিবে, ততদিন স্ত্রীকে স্বামীর অধীন হইয়াই থাকিতে হইবে। কাজেই Mill বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন—

Marriage is the only actual bondage known to our law. There remain no legal slaves except the mistress of every house"—Mill's Subjection of women (Ed. 1873) p. 152.

তিনি এই পুস্তকের আরেক স্থানে বলিয়াছেন—

"No slave is a slave to the same length and in so full a sense of the word, as wife is.—Hardly any slave, except one inmediately attached to their master's person, is a slave at all hours and all minutes * * * But it cannot be so with the wife". Ibid p. 59.

এক্ষণে দেখুন, কোথাকার জল কোথায় দাঁড়াইয়াছে। এই উৎকট ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ আমাদিগকে কোথায় আনিয়া পৌঁছাইয়াছে। যে বিবাহপ্রথা মানব সভ্যতার প্রথম উন্মেষাবধি দেশ নির্ব্বিশেষে, জাতি নির্ব্বিশেষে জগতের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; যে প্রথা সকল দেশের সকল জাতির জ্ঞানী ব্যক্তিরা সমাজ সৌধের ভিত্তিস্বরূপ বলিয়া পরিকীর্ত্তন করিয়া আসিয়াছেন; যাহার পবিত্রতা রক্ষার জন্য জগতের সমস্ত ধর্ম্মপ্রচারক ও সাধুব্যক্তিরা পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছেন; ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদীরা সেই বিবাহপ্রথার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। ইহার ফলে যে, ইউরোপীয় সমাজে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? নানা কারণেই ইউরোপের সুসভ্য নরনারীরা আজকাল বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে অনিচ্ছুক। বিবাহ স্বাধীনতা বিলোপ করে ইহাও তাহার এক প্রধান কারণ। বার্ণাড শ তাঁহার 'Getting married' নামক নাটকের একটী পাত্রী লেসবিয়ার দ্বারা এইরূপ বলাইয়াছেন, "মা হইতে চাই বলিয়াই যে একজন আসিয়া আমাকে আবার পত্নী বলিয়াও দাবী করিবে, সে আমি কিছুতেই সহ্য করিতে

পারি না।" বাস্তবিক নব্য নাট্যকারেরা এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদে দীক্ষিত হইয়াই নব্য নারীসমস্যার উত্থাপন করিয়াছেন। মিল যে বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, ইঁহারা সে বিষয়ে নাটক লিখিতেছেন, এই মাত্র প্রভেদ। দার্শনিক ও কবির এই যুগপৎ আক্রমণের বিরুদ্ধে বিবাহপ্রথা আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে কিনা কে বলিবে? কিন্তু লক্ষণ বড় ভাল দেখা যাইতেছে না। ইংলণ্ডে 'National council for the unmarried Mother and her child' নামক এক সভা আছে। সেই সভার ধনরক্ষক Sir C. Wakefield সেদিন বলিয়াছেন যে, ইংলণ্ড ও ওয়েলসে প্রতি বৎসর অবিবাহিত স্ত্রীপুরুষের সাইত্রিশ হাজার সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

"Thirty-seven thousand children were born out of wedlock in England and Wales each year. (*Amrita Bazar Patrika, 1st March, 1919*).

পারিবারিক স্বাধীনতার বৃদ্ধির সহিত এইরূপ জারজ সন্তানের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তজ্জন্য ইংলণ্ড বা ইউরোপের লোকেরা বিচলিত নহে। বর্ত্তমান সময়ে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। Dicey বলেন যে,ইংলণ্ডে ১৮২৫ খৃঃঅব্দ হইতে ১৮৭০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বেন্থাম প্রচারিত ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের পূর্ণ প্রভাব বর্ত্তমান ছিল, তৎপর সংঘবাদের যুগ আরম্ভ হইয়াছে। কেহ যেন মনে না করেন, যে, ব্যাভিচারের বৃদ্ধিই সংঘবাদের অভ্যুত্থানের কারণ—সে কারণ অন্যরূপ। প্রবন্ধান্তরে তাহার আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ।

হৃদয়হীনা।

১

সুন্দরি, ওগো সুন্দরি নিরদয়,
কৃপা কটাক্ষ বিতর ভক্তজনে;
কহ শুধু মোরে প্রাণ যে কোথায় রয়,
মন রহে তব ওই তনু আবরণে?
মায়াবিনী অয়ি নির্ম্মম রে পাষাণি
এত ঝড়ে মম তুমি কি মৌনলীনা?
এত তরঙ্গে স্থির কিসে নাহি জানি
সুন্দরি, অয়ি নিদয় হৃদয়হীনা!

২

যত তুষায় কতভাবে কতদিন
আরাধনা কত সাধনা ও পদা-রতা,
একটি ঈষাড়া হিয়া যাহে পরিচিন
নাই নাই তবু একটী সুখের কথা!
একটি পদ্মবাণী ও ওষ্ঠাধরে
সংশয় নাশি' না কহিলে ভাবাধীনা
অন্তর যাহে স্থির আশ্বাসে ভরে
সুন্দরি অয়ি নিদয় হৃদয়হীনা!

৩

অঙ্গ আমার পীড়িয়া রঙ্গরসে
আলিঙ্গি' যাও মুরছি' সর্ব্বমতি
চিরদিন তুমি; তবু ও পরাণ রসে
মুগ্ধ হৃদয় না লভিল একরতি!
হাহাকারে প্রাণ পাথসাটে ভাঙ্গে বুকে—
হিয়া তব পাখী কোন লোকে উড্ডীনা
নিমগ্ন যেন আপন গুপ্ত সুখে;
সুন্দরি অয়ি নিদয় হৃদয়হীনা!

৪

কতদিন ধরি কতভাবে কত মতে
ধরা দিলে মোরে, তবু তুমি অনয়ত্ত

গুপ্ত রহিলে সকল প্রকাশ পথে ;
সর্ব্বতা'ষণী কহিলে না তব কথা ।
লোলুপ নেত্রে দিকে দিকে আছ খুলে
দেখিতে মিষ্ট হাসি তব সুকঠিনা ,
দয়ার বিন্দু ও পাষাণে কোথা গলে
সুন্দরি অয়ি নিদয় হৃদয়হীনা ।

৫

মধুর মন্ত্রে নিজ মনে ধরা জুড়ি'
শান্ত বিলাও অনন্ত সামগীতি ,
হুঙ্কারে কভু ঝঙ্কারে দিশা পূরি
পাগলিনী ধাও দলিয়া মলিয়া ক্ষিতি ।
কত রূপ তব ভঙ্গী বিলাস রাতি,
কত লীলা তব ছান্দসী অমলিনা.
হৃদয় লইয়া কত খেলা নিতরতি ;
সুন্দরি তুমি গোপনে হৃদয়হীনা ।

৬

কটাক্ষ তব শিহরিছে মেঘে মেঘে
হিয়া তব উঠে সমুদ্রে উছসিয়া
উল্লাস তব গগনে পবনে বেগে
বনে বনে ছুটে আলিঙ্গে লহরিয়া,
অনন্ত মুখে ঝরে হাসি নিঝরে ।
লক্ষ্য ধরিয়া ধ্রুবতারা অমলিনা
মন খানি যেন ধ্যানস্থ গিরিশিরে—
সুন্দরি তুমি গোপনে হৃদয়হীনা ।

৭

বরতনু তব সবুজে সোনালি নীলে
বরণে বরণে মোহিছে ভুবন আঁখি ।
জড়তাপুরীর গর্ত্ত তামসী তলে
দীপ্তি বেদনে জাগাইছ প্রাণপাখী,
অজানা আলোক পুলকে পরাণী বুকে
দিকে দিকে তোল ঝঙ্কারি' মনোবীণা ;
হৃদয় বিলায়ে, তোল বিতরি' এতেক সুখে
সুন্দরি তুমি আপনি হৃদয়হীনা ।

৮

খোল মুখ খোল লক্ষ ভকত প্রাণে
পরিশেষে কোথা ঢালিছ গো স্নেহবারি ?
কিবা বিমর্ষে অন্ধ ভুবন পানে
না বুঝিল কোথা ঝরিছে নেত্রবারি ?
কিবা নির্মম অন্ধ আবেগে চলি
শক্তিরূপিণী শবের হৃদয়াসীনা
খেয়ালে' মত্ত সত বুঝি নরবলি
সুন্দরি অয়ি নিদয় হৃদয়হীনা ?

৯

যুগে যুগে কত প্রেমিকে রচিল ছন্দ ;
চিনিতে বুঝিতে ধরিতে চাহিল হিয়া,
চিরকাল তুমি ডিঙ্গাইয়া ভাবরন্ধ্র
মুষ্টি গলিয়া অচিন্ত্যা দাঁড়াইয়া !
বঞ্চিয়া সবে হাসিছ কি সুগোপনে
সবার অর্থ যোগায়ে অর্থ বিনা !
চরমে যোত্রবিহীনা এতেক ধনে
সুন্দরি তুমি গোপনে হৃদয়হীনা ।

১০

একি ইঙ্গিত—গোপনে গোপনে যেন
আপনা হইতে ছাড়াইতে চাহ ভবে !
আপন হস্তে খেলাঘর রচি পুন
হেলায় ভাঙ্গিয়া দলিয়া চলিছ সবে ।
জনতা হইতে বিজনে টানিছ লোকে
হাটের বক্ষে বাজাও নীরব বীণা
সংসার খুলি' বনেরে ঈষাড়া চোখে !
সুন্দরী অয়ি নিদয় হৃদয়হীনা ।

১১

সিন্ধু যেথায় নাচিতেছে মাল ঝাঁপে
পর্ব্বত যেথা অনন্তে তোলে শির,
দিকে দিকে যেন, স্থিরে অস্থির দাপে
ঊর্দ্ধে মজিছে হিয়াখানি উবীর,
ঊর্দ্ধ হইতে স্নিগ্ধ শীতল আঁখি

শান্ত নীলিমা রঙ্গে চির রঙ্গীনা,
অজ্ঞাত পথে হোথা কেন লহ ডাকি'
সুন্দরি অয়ি নিদয় হৃদয়হীনা ?

১২

একি ইঙ্গিত ? ধরি যেন নাহি ধরি,
সংশয় জালে বুঝিতে—না বুঝে হিয়া
জড়তার বুকে প্রাণ নিঃসেক করি
নিয়ত তাহারে খোঁচাইছ মন দিয়া !
জড় হতে ভাবে ভাব হতে ভুবনরে
ভাবের অতীতে টানিছ আত্মাধীনা !
থাকে থাকে ভবে টানিতেছ সুস্থিরে
সুন্দরি অয়ি নিদয় হৃদয়হীনা !

১৩

অয়ি অগম্যা টানিতেছ কার পানে
কোন্ আশে কহ জগতেরে কোন্ দেশে ?
চরমে কি তুমি আপনারি পতি টানে
প্রাপ্তিরূপিণী শত ভ্রান্তির শেষে
বিশ্বমোহিনী, ভাবিনী কোথা' কি তুমি ?
বিশ্বতারিণী রাগিণী অন্তরীণা ?
সবের সকল তিরিষা শান্তিভূমি !
সুন্দরি অয়ি নিদয় হৃদয়হীনা।

১৪

কোন ঠাঁই হতে কোন চোখে নিরখিলে
কোন্ হিয়া তলে স্বরূপে গো নিরুপমা
কহ এত ভব গড়মিলে মিল মিলে
ঐক্যের তালে একটি রাগিণী সমা !
কায়াতে ছায়াতে মধ্যেতে কোথা এক,
সকল সত্তা সুষমায় সমীচীনা ?
সত্যেতে নহে কল্পনা পরশেক
সুন্দরি অয়ি নিদয় হৃদয়হীনা ?

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

কৌটিল্যের অর্থ শাস্ত্রেতে "গুপ্তচর।"

কৌটিল্যের বিষয় পুরাণে বা তথাকথিত প্রাচীন ইতিবৃত্তে বা আখ্যায়িকায় অতি সামান্যই জানিতে পারা যায়। কৌটিল্য সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত যাহা অনুসন্ধান ও আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, তিনি একজন অসাধারণ রাজনীতিপরায়ণ পণ্ডিত ছিলেন। কথিত আছে, তিনি স্বীয় কার্য্যকুশলতা, পাণ্ডিত্য ও বিচক্ষণ বুদ্ধি প্রভাবে নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া চন্দ্রগুপ্ত নামক একজন মৌর্য্য নরপতিকে মগধের সিংহাসনে স্থাপন করেন। তাঁহার এই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত তাঁহাকে স্বীয় মন্ত্রীর পদে বরণ করিয়া লন।

খৃঃ পূঃ ৩২২ অব্দে চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। সম্ভবতঃ এই সময়েই চাণক্য (বিষ্ণুগুপ্ত বা কৌটিল্য) মন্ত্রীত্বের পদে অভিষিক্ত থাকিয়া তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "অর্থশাস্ত্র" গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকিবেন। আর, শ্যামাশাস্ত্রী বি, এ, এম, আর, এ, এস, অর্থশাস্ত্রের অনুবাদ প্রসঙ্গে অবতরণিকা অংশে উল্লেখ করিয়াছেন, "From Indian epigraphical researches, it is known beyond doubt that, Chandra Gupta was made king in B. C. 321 and that Asokavardhana ascended the throne in B. C. 296. It follows therefore that Kautilya lived and wrote his famous work, the Arthasastra, somewhere between B. C. 321 and 300.

আমরা এই অর্থনীতি পাঠে মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক ও তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ভারতবর্ষের রাজনীতি, সমাজনীতি, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের মনোজ্ঞ বিবরণ জানিতে পারি। তখন দেশে গুপ্তচরদিগের দ্বারা অধিকাংশ সময়ে বহু বিষয়ে বিশেষতঃ জটিল

রাজনৈতিক প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ের অনুসন্ধান লওয়া হইত। অর্থশাস্ত্রের আলোচনায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ, গুপ্তচর প্রসঙ্গে বলিয়াছেন; "The inveterate and universal suspicion which regulated the dealings between every Raja and his fellow-rulers, governed the conduct of the prince to his officials and subjects. Nobody was to be trusted. The government relied on a highly organized system of espionage, pervading every department of the administration and every class of the population. The formal rules concerning spies, occupy a prominent place in the treatise, every chapter of which assumes that the working of the machinery of government depends mainly on the successful utilization of secret information." *

তৎকালে প্রত্যেক নৃপতির অধীনেই এক একটী গুপ্তচর বিভাগ ছিল। কপট ব্যক্তিগণ সময় সময় অন্যের মনোভাব পরিজ্ঞাত হইবার ইচ্ছায় নৃপতি কর্ত্তৃক গুপ্তচরের কার্য্যে নিযুক্ত হইত। মন্ত্রীগণ নিয়ত এই শ্রেণীর লোকদিগকে যোগ্যতানুসারে অর্থ ও সম্মান দ্বারা পুরস্কৃত করিতেন। অত্যন্ত দূরদর্শী ও পবিত্র স্বভাব বিশিষ্ট আর এক শ্রেণীর গুপ্তচর ছিল। তাহারা স্বকীয় কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত বহু শিষ্য সংগ্রহ করিয়া লইত। তাহারা কৃষিকার্য্য, গোমহিষ্যাদি প্রতিপালন, ধাতুশিল্প ও বাণিজ্যাদি ব্যবসায়ের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আপনাদের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। রাজার অর্থের কোনও প্রকার হস্তান্তর বা অন্য কোনও প্রকারে অপচয় সাধিত হইতেছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া প্রকৃত সংবাদ প্রেরণ করাই এই শ্রেণীর গুপ্তচরদিগের শিষ্যগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইত। তৃতীয় শ্রেণীর গুপ্তচরগণ "গৃহপতিক" চর নামে খ্যাত হইত। তাহারা স্বীয় গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত রাজার নিকট হইতে ভূমি বৃত্তিস্বরূপ প্রাপ্ত হইত। তাহারা উক্ত ভূখণ্ডে কৃষিকার্য্য সম্পাদন করিয়া স্বকীয় অন্নবস্ত্রের সংস্থাপন করিয়া রাজার চরের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। পরবর্ত্তী শ্রেণীর চরগণ বাণিজ্যবৃত্তি অবলম্বনে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। এই শ্রেণীর চরগণের কেবল মাত্র স্থলপথেই বাণিজ্য করিবার অধিকার ছিল। পঞ্চম শ্রেণীর গুপ্তচরগণ "তাপস" নাম ধারণ করিত। তাহারা শিরমুণ্ডন করিয়া দাড়ী গোঁফ কামাইয়া রাজার কার্য্যে অগ্রসর হইত। তাহারা বহুসংখ্যক শিষ্যকর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া নগরের উপকণ্ঠে বাস করিত এবং সামান্য কিছু ফল মূল আহার করিয়া জনসাধারণকে বঞ্চনা করিত। সময় সময় সাধারণের দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় সামগ্রীর দ্বারা স্বীয় রসনার তৃপ্তি সাধন করিয়া চরের কার্য্য সম্পাদন করিত। বণিক্ শ্রেণীর গুপ্তচরগণ এই শ্রেণীর চরগণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে পারিত। তাহাদের অন্যান্য শিষ্যগণ তাহাদের অদ্ভুত কার্য্য ও গুণের সংবাদ চতুর্দ্দিকে প্রচার করিত। তাহারা অঙ্গবিদ্যায় (palmistry) বিশেষ পারদর্শী ইত্যাদি নানা প্রকার কুহকপূর্ণ বাক্য চারিদিকে ঘোষণা করিয়া সাধারণ লোকদিগকে তাহাদের পার্শ্বে একত্র করিত। যাহারা তাহাদের নিকট আপনাদের বিষয় জানিতে আসিত তাহারা আয়, অগ্নিতে অপচয়, দস্যু তস্কর হইতে ভয়, রাজদ্রোহীদিগের বিনাশ, সাধুগণের পুরস্কার বৈদেশিক ব্যাপারের কিঞ্চিৎ আভাস ইত্যাদি বিষয় গুপ্তচরগণের শিষ্যদিগের মুখে শুনিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়া সতত সন্তোষ থাকিত। শিষ্যগণের কর্ম্মপটুতার উপরই এই শ্রেণীর গুপ্তচরগণের কার্য্যের সফলতা বহু পরিমাণে নির্ভর করিত। শিষ্যগণ বিবিধ বিষয়ে নানা প্রকার অদ্ভুত, অদ্ভুত গল্প প্রচার করিয়া সাধারণ

* Early History of India.

ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে গুপ্তচরগণের বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস বদ্ধমূল করিত। এই শ্রেণীর গুপ্তচরদিগের হস্তে আর একটী গুরুতর ভার ন্যস্ত ছিল। তাহারা দূরদর্শী, বাক্‌পটু ও সাহসী ব্যক্তিগণের রাজার নিকট হইতে পুরস্কার প্রাপ্তি, মন্ত্রীগণের পরিবর্ত্তন প্রভৃতি নানা বিষয় জন সাধারণের নিকট সতত প্রচার করিত। রাজ-দরবারে ইহাদের প্রতিপত্তি বড় কম ছিল না। ইহাদের বাক্যের তাৎপর্য্যানুসারে মন্ত্রীগণ কোন কোন বিষয়ে স্বীয় কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতেন। মন্ত্রীগণ তাহাদের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ যে সকল বিশিষ্ট কারণে উত্তেজিত হইয়াছেন তাহাদিগকে অর্থ ও সম্মান দ্বারা যথোচিত ভাবে পুরস্কৃত করিয়া তাহাদের ক্রোধাগ্নির শান্তি বিধান করিতেন। আর যাহারা বিনা কারণে অথবা অতি সামান্য কারণে অসন্তুষ্ট প্রকাশ করিতেন অথবা রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেন, মন্ত্রীগণ গোপনে তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিতেন। তাহাদের এই সমুদয় কার্য্য ব্যতীত আরও একটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল। তাহারা রাজকর্ম্মচারীগণের চরিত্রের বিষয়ে সতত অনুসন্ধান করিত। এই সমুদয় কার্য্যের জন্য রাজা গুপ্তচরদিগকে সাধারণ ভাবে অর্থ প্রদানে ব্যতীত সময় সময় বিশেষ পুরস্কার ও সম্মানসূচক পদবীর দ্বারা তাহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন।

এই সমুদয় গুপ্তচর ব্যতীত দেশে আরও বিবিধ শ্রেণীর গুপ্তচর ছিল। তাহারা নানাস্থানে গমনাগমন করিয়া চরের কার্য্য সম্পাদন করিত। তিক্ষ্ণ (fire brand) রসদ (a poisoner) ভিক্ষুকী (a mendicant woman) সাত্রী (a class mate) প্রভৃতি বিবিধ শ্রেণীর চর রাজার রাজ্যের কুশলার্থ সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিত। যে সকল পিতৃ মাতৃহীন অনাথ বালক বিজ্ঞান, অঙ্গবিদ্যা, মায়া বিদ্যা, ধর্ম্ম কার্য্য বিষয়ক কর্ত্তব্য [illegible] বিদ্যা, অন্তর চক্রবিদ্যা, প্রভৃতি অধ্যয়ন করিত এবং রাজ সকাশ হইতে অন্ন বস্ত্র প্রাপ্ত হইত, তাহারা "সাত্রী" নামে কথিত হইত। দেশের যে সমুদয় দুঃসাহসিক ব্যক্তি অর্থোপার্জ্জনের আশায় জীবনের মায়া মমতা বিসর্জ্জন দিয়া বলদীপ্ত হস্তী ও ব্যাঘ্র প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ করিত, তাহারা "তিক্ষ্ণ" নামে পরিচিত হইত। আর যাহাদের হৃদয়কন্দর হইতে পিতৃস্নেহের উৎস শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, যাহারা ভীষণ নৃশংস, তাহারা "রসদ" নাম ধারণ করিত। সম্বলহীনা বুদ্ধিমতী ব্রাহ্মণ বিধবাগণ স্বকীয় গ্রাসাচ্ছাদনের অভি-লাষিণী হইয়া "পরিব্রাজিকা" নাম ধারণ করিতেন। এই শ্রেণীর চরগণ রাজ অন্তঃপুরে বিশেষ সম্মান লাভ করিতেন। রাজ্যের প্রধান প্রধান মন্ত্রীগণের গৃহে সতত গমনাগমন করিয়া বিবিধ সংবাদ সংগ্রহ করাই এই শ্রেণীর চরের বিশিষ্ট কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইত। অনেক মুণ্ডিতমস্তক ও শূদ্র জাতীয় রমণীও সময় সময় এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত।

এই সমুদয় চরগণের মধ্যে যাহারা উচ্চবংশসম্ভূত, রাজভক্ত, বিশ্বস্ত, দেশ ও ব্যবসায় ভেদে নিয়ত উত্তম বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে নিপুণ, বহুভাষাবিদ্, ধাতুরত্ন প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর শিল্পকার্য্যে সুদক্ষ, কেবল মাত্র তাহারাই মন্ত্রী, পুরোহিত, সেনাপতি, যুবরাজ, দাররক্ষক প্রধান করসংগ্রাহক, সন্নিধাত্রী, প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তা, নায়ক, পুররক্ষক, ব্যবহারিক, কর্ম্মান্তিক পরিদর্শক, মন্ত্রীপরিষদ, অধ্যক্ষ, দণ্ডপাল, দুর্গ-বনভূমি প্রভৃতি পরিদর্শক প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের কার্য্যের গতিবিধি নির্ণয় কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। এই সমুদয় রাজ-কর্ম্মচারীগণের বাহ্যিক কার্য্যপ্রণালীর উপর সূক্ষ্মদৃষ্টি রাখিবার নিমিত্ত "তিক্ষ্ণ"গণ নিযুক্ত হইত। এই কার্য্য ব্যতীত এই শ্রেণীর চরগণ রাজকীয় ছত্র, পাদুকা, পাখা গ্রহণ, রাজসেবা, রথ পরিচালন প্রভৃতি কার্য্যে সাহায্য করিত। মন্ত্রীগণ তিক্ষ্ণগণের দ্বারা সংগৃহীত সমুদয় সংবাদ চরবিভাগের কার্য্যালয়ে লইয়া যাইত।

যে সকল রসদ শ্রেণীর চর (Saucemaker) পাচকের কার্য্য করিত, স্নানের জল আনিয়া দিত, শয্যা রচনা করিত, যে সকল ভৃত্য কুব্জ, বামন, কিরাতি, অন্ধ, খঞ্জ, কালা ও বাতুলের কল্পিতরূপ ধারণ করিতে পারিত, আর যে সকল ব্যক্তি গায়ক, নৃত্যবিদ্, বাদ্য-যন্ত্রে সুনিপুণ ছিল. কেবল তাহারাই সমস্ত রাজকর্ম্মচারী-গণের অন্তঃপ্রকৃতি বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত নিযুক্ত হইত। সময় সময় সুশিক্ষিতা রমণীগণও এই কার্য্যে অগ্রসর হইতেন। ভিক্ষুকীগণ চরবিভাগের অধ্যক্ষের নিকট সমুদয় সংবাদ লইয়া যাইত। কর্ম্মচারী-গণ এই সংবাদ অবগত হওয়া মাত্রই চরগণের বাক্যের সত্যতা নির্দ্ধারণ করিবার নিমিত্ত স্বকীয় অধীন ব্যক্তি-গণকে নিযুক্ত করিতেন, যাহারা এই কার্য্যে নিযুক্ত হইত, তাহারা পরস্পরকে চিনিতে কোনও প্রকার সুযোগ প্রাপ্ত হইত না। ভিক্ষুকীগণ রাজদরবারে বিশেষ সংবাদ লইয়া প্রবেশ লাভ করিত; কোনও কারণে প্রবেশের অনুমতি পাইতে গৌণ হইলে সাঙ্কেতিক চিহ্নের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্বকীয় অভি-প্রায়ানুসারে সংবাদ প্রেরণ করিত। চরবিভাগের কর্ম্মচারীগণ তিনটী বিভিন্ন স্থান বা ব্যক্তি হইতে চরগণের বাক্যের যথার্থতা পরীক্ষা করিতেন। যখন তিন জন বিভিন্ন ব্যক্তি হইতে একই প্রকার সংবাদ গ্রহণ করিতেন, তখন তাঁহারা চরগণের বাক্য সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিতেন না। অন্যথা হইলে চরগণ গুপ্তভাবে শাস্তি লাভ করিত অথবা কর্ম্মচ্যুত হইত।

অনেক সুশিক্ষিতা রমণী নৃপতিগণের গৃহে চরের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। বণিক শ্রেণীর গুপ্তচরগণ দুর্গের মধ্যেই সতত তাহাদের কর্ম্মে তৎপর থাকিত। যোগী ও তাপসগণ দুর্গের উপকণ্ঠে, কৃষক ও বণিকগণ গ্রামের বিভিন্ন অংশে স্বীয় স্বীয় কার্য্যে নিয়ত যত্নশীল থাকিত। অরণ্যপ্রদেশে শ্রমণ, বনবাসী, ও [illegible]জাতির প্রধান ব্যক্তিগণ শত্রুগণের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদাই নিযুক্ত থাকিত। এক রাজার রাজ্যে অন্য নৃপতি কর্তৃক নিযুক্ত চরগণ অনেক সময় ভ্রমণ করিত। এই চরগণকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা, তাহাদের কার্য্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করা দেশীয় গুপ্তচরগণের এক প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। বিদেশীয় চরগণের কার্য্যপ্রণালী লক্ষ্য করিবার নিমিত্ত দেশীয় চরগণ সময় সময় রাজ্যের প্রান্তদেশে বাস করিত।

গুপ্তচরগণ সাধারণতঃ সাধারণ গৃহস্থ বা কৃষকের বেশে বাস করিত। তাহারা প্রত্যেক গ্রামের গৃহ, পরিবার, ভূমি ও ভূমির উৎপন্ন দ্রব্য, ভূমির উপসত্ব, করদান হইতে মুক্তি, প্রত্যেক পরিবারের জাতি ও ব্যবসায় প্রভৃতি বিষয়ে গ্রাম্য ও জেলা শাসনকর্তার বিবরণের সত্যতা নির্দ্ধারণ করিত; তাহাদিগকে প্রত্যেক পরিবারের আয়, ব্যয়, মানুষ ও পশুর সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে তালিকা সংগ্রহ করিতে হইত। এতদ্ব্যতীত তাহাদের অপরাপর কর্ম্মও ছিল। তাহারা দেশবাসিগণের স্থানান্তরে গমনা-গমন, চরিত্রহীন ব্যক্তিগণের গতিবিধি এবং ভিন্ন দেশীয় চরগণের উপর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিত। বণিকবেশে গুপ্তচরগণ খনিজ, বনজ ও হস্ত সহযোগে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ ও মূল্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান লইত। বিদেশ হইতে যে সকল দ্রব্য আসিত, তাহার নির্দ্ধারিত কর সংগ্রহ বিষয়ে যথাযথ সংবাদ লওয়াও তাহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইত। যে স্থানে চারিটী রাস্তা একসঙ্গে মিলিত হইয়াছে, এরূপ স্থানে, পুষ্করিণী, নদী অথবা অন্যান্য স্নানশালার সন্নিকটে, তীর্থস্থানে, তপোবনে, পরিত্যক্ত স্থানে, পর্ব্বতো-পত্যকায়, বনভূমিতে, সন্ন্যাসী অথবা প্রসিদ্ধ চোরের বেশে, আপনাদের পার্শ্বচরগণসহ দস্যু, তস্কর, শত্রু প্রভৃতির গতিবিধি লক্ষ্য করিত।

তাপসশ্রেণীর গুপ্তচরগণ বিবিধ কৌশলে সন্দেহযুক্ত যুবকগণের কার্য্যপ্রণালীর উপর প্রখর দৃষ্টি রাখিত।

যখন চরিত্রহীন যুবকগণ কোনও বিশেষরূপে চিহ্নিত দ্রব্য ক্রয়, বিক্রয় বা কোনও স্থানে আবদ্ধ রাখিত, তখন তাহারা এই শ্রেণীর গুপ্তচরের দ্বারা ধৃত হইয়া বিচারালয়ে প্রেরিত হইত। চরগণ তাহাদিগকে ধরিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিত না। তাহাদের বিগত দিনের এবং তাহাদের সহচরগণের নাম ধাম ইত্যাদির নানা প্রকার সংবাদ লইত। সময় সময় ইহারা ইহা অপেক্ষাও গুরুতর কার্য্যে নিযুক্ত হইত। তাহারা প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ চোরের বেশ ধারণ করিয়া খ্যাতনামা দস্যু তস্করগণের সহিত মিলিত হইয়া আপনাদের মনোভিলাষ পূর্ণ করিত। এরূপ কর্ম্ম যে বিপজ্জনক ছিল না তাহা নহে, কিন্তু কিছুতেই তাহারা পুরস্কার ও সম্মান প্রাপ্তির আশা পরিত্যাগ করিতে পারিত না। এই সমুদয় বিশিষ্ট দস্যু তস্করগণ ধৃত হইবা মাত্রই চরগণ তাহাদিগকে করসংগ্রাহক কর্ম্মচারিগণের নিকট লইয়া যাইত। কর্ম্মচারিগণ প্রকাশ্যস্থানে এই প্রচার করিতেন যে, রাজা দস্যু তস্করগণকে ধরিবার নিমিত্ত সর্ব্বক্ষমতার মূলাধার ভগবানের নিকট হইতে বিশেষ অনুগ্রহ পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাজার উপদেশানুসারে এই সকল দস্যুতস্কর ধৃত হইয়াছে। যাহাদের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যে সকল দস্যু তস্কর আছে, যাহারা তাহাদিগকে আশ্রয় দান করিবে বা অন্য কোনও প্রকারে সাহায্য করিবে, তাহারা রাজদ্বারে বিশেষ দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। এই শ্রেণীর দস্যু তস্করগণকে ধরিতে সময় সময় বড়ই বিব্রত হইতে হইত। যখন তাহারা ধৃত হইলেও মুক্ত হইবার নিমিত্ত বলপ্রকাশ করিত, গুপ্তচরগণ অন্য কোনও উপায় স্থির করিতে না পারিলে মদন নামক একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষের রস তাহাদের মুখবিবরে ঢালিয়া দিত। এরূপ করা মাত্রই দস্যু তস্করগণ হতচেতন হইয়া পড়িত, সুতরাং তাহাদিগকে বিচারালয়ে লইয়া যাইবার নিমিত্ত কোনও প্রকার বেগ পাইতে হইত না।

রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারিগণ রাজার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া যদি রাজার বিরুদ্ধে সন্দেহযুক্ত আলাপ ব্যবহার করিতেছেন প্রকাশ পাইলে, তাপস শ্রেণীর গুপ্তচরগণ তাহাদের কার্য্যের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেন। এইপ্রকার অনুসন্ধানের ফলে তাহাদের অপরাধ প্রকাশ পাইলে, রাজা রাজ্যের শান্তিবিধান ও শ্রীসম্পাদনের জন্য এই কর্ম্মচারিগণকে বিশদরূপে শাস্তি প্রদান করিতেন। গুপ্তচরগণ বিশ্বাসঘাতক রাজকর্ম্মচারিগণের ভ্রাতাদিগের বিবিধ প্রকারে সন্তোষবিধান করিয়া তাহাদের মনোগত ভাব জানিয়া লইত। এই প্রকারে চরেরা তাহাদের সমুদয় বিষয় অবগত হইয়া তাহাদের প্রাণনাশে অগ্রসর হইত। সময় সময় গুপ্তচরগণ চিকিৎসকের বেশে তাহাদিগকে বিষাক্ত ঔষধ সেবন করাইতে বাধ্য করিত। এই সমুদয় কার্য্য ব্যতীত তাহাদের আরও বহুপ্রকার কর্ম্ম ছিল। দুর্ব্বল নৃপতিগণ শক্তিশালী হইয়া উঠিলে পূর্ব্বকৃত সন্ধি-সর্ত্ত আর মানিয়া চলিতে চাহিতেন না। কেহও প্রথমে সন্ধিপত্র ভঙ্গ করিতে চাহিলে রাজারা সর্ব্বপ্রথমে গুপ্তচরেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। আবার রাজ্যে যখন নানা প্রকার বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইত, জনসাধারণ রাজার বিরুদ্ধে নানা প্রকার অন্যায় অসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ করিত, রাজ্যে অরাজকতা সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিত, তখনও গুপ্তচরগণের কার্য্য কম ছিল না। প্রজাগণকে দমন রাখিতে হইলে, দুষ্টের দমন ও দুর্ব্বলের প্রতিপালন করিতে হইলে গুপ্তচর নিয়োগ তাহাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। স্বকীয় বা পরকীয় রাজ্যে ভেদনীতির বীজ বপন করিতে গুপ্তচরগণই সর্ব্বাপেক্ষা সিদ্ধহস্ত ছিল। এই কার্য্যে অপর কেহই তাহাদের সমকক্ষ ছিল না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃপতি বা যোদ্ধ বর্গের মধ্যে অশান্তি ও মনোমালিন্য উৎপাদন করিতে তাহারা যথেষ্ট বুদ্ধির ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিত। অগ্নি, অস্ত্র ও বিষ নিয়ত তাহাদের সহগমন করিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যেখানে অগ্নি বা অস্ত্র প্রয়োগের দ্বারা কৃতকার্য্য হইবার তাদৃশ সম্ভাবনা ছিল না, সেই ক্ষেত্রে তাহারা বিষপ্রয়োগ করিত। রসদ, শস্যভাণ্ডার

প্রকৃতির নানাপ্রকার রূপচর্য্য করিতে তাহাদের যথেষ্ট মাহাত্ম্য দেখা যাইত। তাহারা এই প্রকার প্রভুভক্ত ছিল যে, রাজাদেশ প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত রাজ্যের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষকেও হত্যা করিতে কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ হইত না। তাহাদের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত আপনাদিগকে অগ্নিদেবতা, নাগদেবতা বলিয়া পরিচয় দিত। শত্রুদিগকে ভিন্ন পথে চালিত করিতে তাহারা সাবশেষ নিপুণ ছিল। সংক্ষেপে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, গুপ্তচরগণ রাজার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিল। *

ভ্রান্ত।

কি করিতে আমি কি যে ক'রে ফেলি
ভ্রান্ত বশে!
তোমার কার্য্য তুমিই সাধি'ছ—
এ অপযশে
কতদিন আমি তোমায় বেদনা
দিয়েছি নাথ!
আজি এ হৃদয়ে বাজি'ছে তাই সে
দারুণ ঘাত!

অন্ধকারের তিমিরাবরণে—
ঢাকা এ' হৃদি,
জানি না তোমায় পারি না বুঝিতে
তোমার বিধি,
মননে আমার, কার্য্যে আমার—
কতই ভুল,
সত্য খুঁজিতে ছেপে ধরি বসি
মিথ্যামূল!

নাশ' এ অন্ধ চিত্ত হইতে
ভ্রান্তি ঘোর
তোমার নিদেশ জানাও আমায়
হে প্রভো মোর!
তুমি করহে কার্য্য আমার
শুভঙ্কর,
নিয়ত রাখ' অন্তর মোর
নিরন্তর।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

মহাকবি সাদি।

প্রাচ্য দেশীয় কবিদিগের মধ্যে সাদির ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন কবি বিরল। কবিকুলশিরোমণি হাফিজ ও আনুষঙ্গীর জন্মভূমি বলিয়া যে পারস্য দেশ সর্ব্বোন্নত মস্তকে এখনও শিক্ষিত জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে, আমাদের কবি সাদিও সেই পারস্য দেশেরই অন্যতম সুসন্তান। সাদির বাল্যনাম 'মসলে উদ্দীন'; কিন্তু তৎকালীন পারস্য সম্রাট সাদি বীন জেঙ্গীর নামানুসারে তিনি মসলেউদ্দীনের পরিবর্ত্তে সাদি নাম গ্রহণ করেন।

সাদির পিতার সাংসারিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না—কোনও প্রকারে কষ্টেসৃষ্টে দিন গুজরাণ হইত মাত্র। সাদির বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাহাদের এ অবস্থাও উত্তরোত্তর শোচনীয় হইতে লাগিল। তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হইবার পূর্ব্বেই এই অভাব অনটনের মধ্যেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইল।

অল্প বয়সে পিতৃহারা হইয়া সাদি অকুল পাথারে পড়িলেন। সংসার প্রতিপালন জন্য এই বয়সেই তাঁহাকে দিন রাত্রি কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত। কিন্তু বাড়ীতে থাকিতেই তিনি বোগদাদ নগরের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপকের শিক্ষাধীনে

* প্রবন্ধ লেখক নিজের নাম দিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। আমরা জানি তিনি তাঁহার নিজের জিনিষ চিনিয়া লইতে অস্বীকার করিবেন না। প্রঃ সঃ।

পাঠ অভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হন। এখন পিতৃ বিয়োগে তাঁহার স্কন্ধে সংসারের গুরুভার পড়িলেও তিনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন নাই, বিদ্যালয়ে তিনি নিয়মিত সময়ে পাঠাভ্যাস করিতেন আর অবসর সময়ে দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া সংসারের জন্য অর্থোপার্জ্জন করিতেন। এই ভাবে পূর্ণ ত্রিশ বৎসর কাল বিদ্যালয়ে থাকিয়া বিপুল অধ্যবসায় ও পরিশ্রম সহকারে নানাবিধ শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করতঃ বিদ্বৎ সমাজে পরিচিত ও যশস্বী হইয়া উঠেন।

বাল্যকাল হইতেই সাদি পদ্য লিখিতে ভাল বাসিতেন। বয়স ও জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পদ্য লিখিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা বাড়িতে লাগিল। তিনি নিজের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার সাহায্যে প্রথমতঃ কাব্য লিখিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ "বোস্তান" বাহির হইতে না হইতেই তাঁহার যশঃ সৌরভ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। লোকে দেশ বিদেশ হইতে, তাঁহাকে ভক্তি ও প্রীতির অঞ্জলি দিতে লাগিল। ক্রমে তিনি "গোলেস্তান, খোরেদ, আরবী ও দেওয়ান" প্রভৃতি আরও কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ লিখিয়া কাব্যামোদী পাঠকগণকে উপহার দিলেন, তাঁহার কবিযশঃ চরমে উঠিল। তিনি সর্ব্ববাদীসম্মত কাব্য সম্রাট বলিয়া অভিনন্দিত হইলেন।

বিভিন্ন দেশীয় মানব সমাজের রীতি নীতি, আচারপদ্ধতি, ক্রিয়া-কলাপ অবগত হইবার অভিপ্রায়ে সাদি ত্রিশ বৎসরের উর্দ্ধকাল সিরিয়া, আর্ম্মেনিয়া, মিশর আরব ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি প্রদেশ সমূহে পর্য্যায়ক্রমে অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

কবিবরের সময়, শক্তি ও প্রতিভা শুধু কাব্য রচনা করিয়াই পর্য্যবসিত হয় নাই। তিনি একজন ধর্ম্মপরায়ণ খাঁটি মুসলমান ছিলেন। একবার নয়, দুইবার নয় সাদি তাঁর জীবনে পর পর চতুর্দ্দশ বার পদব্রজে মক্কাতীর্থ দর্শন করিয়া অসাধারণ ইচ্ছাশক্তি, সহিষ্ণুতা ও ধর্ম্মপরায়ণতার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। দ্বাদশ বর্ষ যাবৎ তিনি জেরুজিলাম নগরস্থ যীশু খৃষ্টের সমাধি ভবনে বারিবাহক কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময় তিনি জেরুজিলাম তীর্থগত সমস্ত যাত্রীকেই জলদানে পরিতৃপ্ত করিয়া বিমল আত্মপ্রসাদ ও অসীম পুণ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন।

ইউরোপ খণ্ডের প্রধানতম কবি সেকস্‌পীয়রের সহিত কবিবর সাদির অনেকটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সেকস্‌পীয়র ও সাদি উভয়েরই একান্ত বাসনা ছিল যে, তাঁহাদের গ্রন্থ সমূহ সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের শিক্ষিত সমাজে প্রচারিত ও আদৃত হয়, ভগবানের কৃপায় তাঁহাদের এ আকাঙ্ক্ষা বিশেষ রূপেই পরিপূর্ণ হইয়াছে। সেকস্‌পীয়র ও সাদি বাল্য জীবনে অনেক অভাব ও অনাটন ভোগ করিয়াছেন, দুঃখ কষ্ট পাইয়াছেন। শেষ বয়সে তাঁহারা উভয়েই সুখে ও শান্তিতে ছিলেন।

১২০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে সাদি মানবলীলা সম্বরণ করেন।

সাদির গুণমুগ্ধ ভক্তগণ তাঁহার প্রতি সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন জন্য নিজ নিজ সন্তানগণকে সর্ব্বপ্রথমেই তৎপ্রণীত 'করিমা' নামক কাব্যগ্রন্থ শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। কবিত্ব-গুণ সমালোচনা করিতে গেলে 'করিমাকে' তত উচ্চ আসন প্রদান করা যায় না বটে, কিন্তু ইহাতে কবিতাচ্ছলে সাদি যে সকল অমূল্য উপদেশ রাখিয়া গিয়াছেন, পারশ্য দেশবাসী আবাল-বৃদ্ধবনিতার নিকটে এখনও তাহা ঋষিবাক্যের ন্যায় আদৃত ও পূজিত হইয়া থাকে।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

শ্রীহট্টে গ্রাম্য-গীতির কাহিনী।

বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে কথ্যভাষা, যেমন বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে, দেশ বিশেষে প্রচলিত কণ্ঠগুলি গানও তেমনি সেই দেশেরই সম্পত্তি বলিয়া শুধু

সেই সেই দেশেই সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। চেষ্টা করিলে বিভিন্ন দেশের কথ্য ভাষা অবলম্বনে লিখিত প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করিয়া যেই প্রকার আমাদের বঙ্গ সাহিত্যের কলেবর বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, গ্রাম্য গীতি-গুলি একত্র করিলেও বোধ হয় তদ্রূপ সাহিত্যের একটা দিক পুষ্ট করা অসম্ভব হয় না। ভাব ও কলা নিয়াই সাহিত্যের সত্তা। এই সত্তার বলেই সাহিত্য সকলের চক্ষে আদরণীয় হয়, ভাষার দিকে লক্ষ্য মুখ্য নহে, গৌণ। একই মনসার বিষয় অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপ 'ভাসান' 'গান' রচিত হইয়াছে। ভাষা, ভাব, অলঙ্কার, রীতি সমুদয়ই দেশ বিশেষে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। এই স্থলে আমরা উৎকর্ষ ও অপকর্ষ ঠিক করিব ভাব ও কলা নিয়া—ভাষা নিয়া নহে।

প্রস্তাবিত "শ্রীহট্টের গ্রাম্যগীতি" যদিও নিম্নশ্রেণীর নিরক্ষর লোকদের মধ্যেই ভূয়ো বিস্তৃত, তথাপি ইহাতে বঙ্গবাসীর না হউক—অন্ততঃ শ্রীহট্টবাসীর গৌরব করিবার কিঞ্চিৎ কারণ আছে।

নিরক্ষর অনেক কবির কবিতা সঙ্কলনেও যে ভাষা বহু প্রসারিত হইতে পারে। অনেক দেশের ভাষার ইতি-হাসই এই কথার সাক্ষ্য দিতে সমর্থ। ছড়া, পাঁচালী, কবিওয়ালার টপ্পা এই সকলের মধ্যেও অনেক ভাবু-কতার পরিচয় পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন ঐ সকলের মধ্যে রসের সমাবেশ, অনুপ্রাসের সৌষ্ঠব মাঝে মাঝে দক্ষতার সহিতই বিন্যস্ত থাকে। কতক কাল পূর্ব্বে বঙ্গসাহি-ত্যের বহু মাসিক পত্রেই গ্রাম্য কবিওয়ালার জীবনী, টপ্পা, গান প্রভৃতি আদরে মুদ্রিত হইত। গ্রাম্য বালিকা ও রমণীদের ব্রত, ব্রতকথা, পূজা, কাহিনী প্রভৃতিও অনেক কাগজেই মুদ্রিত হইতে দেখা গিয়াছে। এই সমস্ত রক্ষার দ্বারা একদিকে যেমন দেশের সাময়িক ইতিহাসের কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়, অপর দিকেও তেমনি বাঙ্গলা সাহিত্যের কিছু না কিছু পুষ্টি সাধন

হয়ই হয়। এই কারণেই আজ "শ্রীহট্টের গ্রাম্য গীতির" কথা স্মরণ করাইয়া দিবার নিমিত্ত সকলের সম্মুখে উপস্থিত হইতে সাহস পাইতেছি। অন্যান্য দেশ অপেক্ষা শ্রীহট্টের এই সকল গীতিতে একটু বিশেষ পারিপাট্য লক্ষিত হয়। অনুসন্ধিৎসু ইচ্ছা করিলে এই বিষয়ে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতে পারেন। এক সময়ে এই সবদেশের লোকের জীবন কি সুখেই কাটিয়াছে তাহা নিম্নে বর্ণিত কাহিনী হইতে উপলব্ধ হইবে।

কিছুকাল পূর্ব্বে শ্রীহট্ট অঞ্চলের লোক আর্থিক অবস্থায় বেশ সুখেই দিন কাটাইত। এক দিনের নিমিত্তও তাহাদের "অন্নচিন্তা চমৎকার" হইয়া উঠিত না।

গোলাভরা ধান ছিল, খালে বিলে ও নদীতে প্রচুর মৎস্য ছিল, আর ছিল গোয়াল ভরা গাই এবং তার দুগ্ধ। উদর পোষণের জন্য মানুষ যাহা চায় কিছুই তাহাদের অভাব ছিল না, কাজেই তাহারা ক্ষেতের কাজ ছাড়া সকল সময়ই রঙ্গ রসে মগ্ন থাকিত। ফূর্ত্তি ছিল তাদের নিত্য সহচর, শক্তি ছিল আত্মবন্ধু। নিম্নবর্ণিত কাহিনী হইতে সেই সময়কার কতকটা চিত্র মনে মনে অঙ্কিত করা যাইতে পারে।

শীতকাল। সন্ধ্যার সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। কম্বল সম্বল বৃদ্ধ মাধব মালী উনুনের ধারে উপবিষ্ট। এমন সময় সাড়েসাত বৎসরের বালক বন-মালী, ঠাকুর দাদাকে পশ্চাৎ দেশ হইতে পাক্ড়াও করিয়া বলিল "দাদু একটা গল্প বল্বী।" বৃদ্ধ তখন তাম্রকূট সেবনে ব্যস্ত ছিল, নাতির আবদারে তত্টা মনোযোগ করে নাই। নাতিও না-ছোড়-বান্দা; পুনঃ পুনঃ সে ক্ষুদ্র সুকোমল হস্তের মুষ্টাঘাতে দাদাকে উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। নপ্তার সেই সাদর আপ্যা-য়নে তামাকু সেবনে ব্যাঘাত জন্মিতেছে দেখিয়া হুকার নলের ফাঁকে খন খন কাসিতে কাসিতে একটী

দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বৃদ্ধ বলিল "এমন দিন আর পাবে না ভাই।" তখন অগত্যা হুকা খানা বেড়ার ধারে রাখিয়া বৃদ্ধ মাধব মাঝী আবার বলিতে আরম্ভ করিল। "একদিন ছিল, যখন আমরাও তোদেরই মত হাসি তামাসায় দিন কাটাইতাম। দুঃখ কাকে বলে জানি নাই। বাবা বোঝায় বোঝায় ধান ঘরে আনিতেন, মা তাই চাল করিয়া আমাদিগকে ভাত রাঁধিয়া খাওয়াইতেন। আর এখন?—এখন একমুঠো অন্নের জন্য এই বুড়ো বয়সেও দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করিতে হয়। তাই বল্‌ছি ভাই এমন দিন আর থাকবে না। এইত দেখ না—তোর বাবা সেই দিনের ছেলে; না খাইয়া চেহারা তার কিরূপ হইয়া গিয়াছে। সারা দিন মাটি কাটিয়া দশটা পয়সা সে ঘরে আনে। তাহাতে ছয়জন লোকের খাওয়া চলে কি? কি উপায়ে তোদের পালন করব সেই চিন্তায় অস্থির আছি দাদা। এখন কি আর গল্প গুজব ভাল লাগে?

"না দাদু, গল্প বলতেই হবে।"

"ওরে শোন বলছি।" এই বলিয়া বৃদ্ধ আবারও বলিতে আরম্ভ করিল। "আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন কত যে গান কত যে তামাসা করিয়াছি, তাহার নামও তোরা জানিস না।"

"তোমরা কি দাদা! পৌষ মাসের শীতের রাত্রিতেই এত নাচ গান করিয়াছ?"

"তা হবে কেন? আমাদের শীত গ্রীষ্ম জ্ঞান ছিল না, রাত্রি দিন বোধ ছিল না। বৈশাখের শেষেই যখন ক্ষেতের কাজ শেষ হইয়া যাইত। বর্ষার নূতন জলে মাঠ ঘাট ভরিয়া যাইত তখন হইতেই আমরা দলে দলে "ঘাটুগানে" মাতিয়া যাইতাম। অনেক সময় সারা রাতই ঘাটুগানে কাটাইয়াছি।

"ঘাটুগান কি দাদু!"

"ঘাটুগানের নামও শুনিস্ নাই? তা না শুনবারই কথা। আজ কাল আর কোথাও বড় ঘাটুগানের প্রচলন নাই। আমরা যখন তোর ঐ বাড়ীর ধনা কাকার মত বড়, তখন গ্রামের অনেকে মিলিয়া ঢোল, করতাল, বেহালা লইয়া কোনও একজায়গায় মহলা দিতাম। সকলে গোল হইয়া চারিদিকে সারি সারি বসিয়া পড়িতাম, একটী ছোক্‌রা মেয়ে সাজিয়া আমাদের সকলের মাঝে দাঁড়াইয়া নাচিত ও গান করিত। তাহার গানের সঙ্গে আমরাও সকলে একসুরে দোহার ধরিতাম। ঢোল, বেহালা ও করতালের সহিত গান জমিত ভাল। ঐ গানকেই ঘাটুগান বলে*।

"তার পর?"

"তার পর আর কি? এই ভাবে ঘাটুগান গাহিয়া গাহিয়া কত আমোদই না আমরা পাইয়াছি। অনেক জায়গায় আমাদিগকে বায়না দিয়া আদর করিয়া নিয়া কতলোক আমাদের ঘাটুগান শুনিয়াছে। পয়সার অভাব আমাদের ছিল না, খুসী হয়ে যে যা দিত তাতেই আমাদের আনন্দ ছিল। ঐ বাড়ীতে তোর এক জাঠা ছিলেন, তিনি কত গান রচনা করিয়াছেন। আমরা সেই সমস্ত গান সুর তাল দিয়া গ্রামে গ্রামে গাহিয়া বেড়াইতাম, আমাদের মত আরও কত ঘাটুগানের দল ছিল। দুই দল এক জায়গায় উপস্থিত হইলেই লোকে ভাল মন্দ বুঝিতে পারিত। এই ভাবে বর্ষার পূর্ব্বে ২।১ মাস ঘাটুগান গাহিয়া বর্ষার সময়ে যখন বৃষ্টির জলে ও বন্যার জলে হাওর, মাঠ, খাল, বিল, সব জলে ডুবুডুবু হইয়া যাইত, রাস্তা, ঘাট, সব জলময় হইয়া পড়িত, নূতন জল পাইয়া মাঠের ধান ক্ষেতে সবুজ রং ধারণ করিত, বাতাস পাইলেই হাওরে ঢেউ খেলিত,—তখন আমরা "নাও দৌড়ের" জন্য খেলুয়া নৌকার তালাসে বাহির হইতাম। নৌকায় উঠিয়া গ্রামে গ্রামে খেলুয়া নৌকার অনুসন্ধান সে বড় আমোদের দিনই

* পশ্চিম অঞ্চলের লোকদের মধ্যে এখনও সেই পদ্ধতিতে গান করা প্রচলিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

গিয়াছে ভাই। চারিদিকে চাহিয়া দেখিতাম কোথাও বা তরঙ্গহীন স্বচ্ছ সলিলের কল্লোল ক্রীড়া, কোথাও বা দিগন্ত বিস্তৃত ধান্যশীর্ষের শ্যামলতা, কোথাও বা নীল, লাল ও সাদা পালের নৌকার সো সো গতি। আবার শুনিতাম সেই সমস্ত নৌকার মাঝিদের "ভাটিয়াল গান।"

"নাও দৌড়" কি রকম ঠাকুর দাদা! "খেলুয়া নৌকা" কত বড়? "ভাটিয়াল গান কাকে বলে?"

গল্প বুঝি বড়ই ভাল লাগছে ভাই? না? শোন তবে একে একে সবই বলছি। খেলুয়া নৌকা ত্রিশ বত্রিশ হাত লম্বা। চওড়ায় বড় বেশী নয়, আড়াই হাত কি তিনহাত। প্রত্যেক নৌকায় ষাট সত্তর জন লোক উঠে। নৌকার দুইধারে সারি দিয়া কতক লোক বসে, কতক লোক দাঁড়াইয়া থাকে। তখন খাঁজ ও করতাল লইয়া সারিগান আরম্ভ হয়। বৈঠার তালে তালে তাল পড়িতে থাকে। নৌকা পবন বেগে চলিতে থাকে। কোন কোন স্থানে এক সঙ্গে বার কি চৌদ্দ খানা নৌকা পাল্লা দেয়। ঐসমস্ত নৌকার কোন খানা একশত দৌড়ের, কোন খানা বা দেড়শত দৌড়ের। সেই নৌকার পাল্লাতে যাহাদের জিত হয়, তাহাদের ভাগ্যেই 'বাহবা' 'বাহবা' পুরস্কার বর্ষিত হয়। সময় সময় বিজিত দলের অদৃষ্টে মেড়া খাসি পর্য্যন্ত উপহার প্রদত্ত হয়। * আষাঢ়ের শেষ হইতে ভাদ্রের কতক দিন পর্য্যন্ত এই ভাবে কাটিয়া যায়।

শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে বিষহরি পূজা হইয়া গেলে পাড়ায় পাড়ায় পদ্মাপুরাণ পড়ার ধুম লাগিত। † পাঠের সময় পাখোয়াজের আওয়াজে হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব তাল বাজিয়া উঠিত। সময় সময় নৌকায় উঠিয়া হাওরের মাঝে আসিয়া পদ্মাপুরাণ পাঠ হইত। সে সময়ে যে কি আনন্দেই দিন কাটাইয়াছি, সেইদিন আর তোরা পাবি কোথায়?

তারপর ভাদ্র মাসে পদ্মাপুরাণ শেষ হওয়া মাত্রই মহারোলে কবিগানের ঢোল বাজিয়া উঠিত। তখন আমরা কবিগানের তানে ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া যাইতাম। আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাস কবিগানেই কাটিয়া যাইত।

বৃদ্ধ অতি সংক্ষেপে সব কথা শেষ করিবার সুযোগ দেখিতেছিল, কিন্তু চতুর নাতির নিকট তাহাকে পরাস্ত হইতে হইল। নাতি কুতূহল পরবশ হইয়া বারংবারই প্রশ্ন করিতে লাগিল—

"কবিগান কি ঠাকুর দাদা?"

"কবিগানের কথা তোর নিকট বলিলেও তুই বুঝিবি না। উহা একরকম গানই। তবে ইহাতে কবিওয়ালাদের অনেক ছড়া, পাঁচালী তৈয়ার হয়। সেই সমস্ত শুনিতে বড় মধুর।" এই সময় বাবা মাঝী শয্যায় যাইবার অভিপ্রায়ে ভাটিয়াল গানের কথা কিছু না বলিয়াই পিঠা পায়েসের প্রসঙ্গ তুলিল। পৌষ মাসের সেই ধানকাটা, ধান তোলা, চাউল করা, গোলাবাঁধা, পিঠা খাওয়া প্রভৃতি নিজের কাজেই ২।৩ মাস চলিত। কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই মনের আনন্দে শিরইনের ভাত * এবং পিঠা, চিড়া খাইত। রাত্রিকালে বৈষ্ণবদের আখড়ায় সেবার ধুম, বাউলের গানের উচ্চ রবে গ্রামবাসী মত্ত। ডপকি ও একতারার গুম্ গুম্ ধ্বনিতে শরীর যেন এখনও রোমাঞ্চিত হয়। এর পরে তিলুয়া সংক্রান্তির তিলুয়া মহোৎসব চলিয়া গেলে ফাল্গুন চৈত্র মাসে দোল পূর্ণিমার উৎসব আরম্ভ হইত। দোলের সময় "হলি"গান বড়ই মজার। পথেঘাটে আবিরের ছড়াছড়ি, রংএর খেলা, লালে লাল। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীদের হলি-গান। হলি গানের সঙ্গে কবিগানের কতকটা মিল আছে।

* নাও দৌড় বঙ্গের সর্ব্বত্র না থাকিলেও শ্রীহট্টে ও ময়মনসিংহে অদ্যাবধি প্রচলিত আছে।

† বিষহরি পূজা ও পদ্মাপুরাণ পাঠের প্রচলন অন্যত্রও আছে। বঙ্গের [illegible] অধিকাংশ স্থানেই শ্রাবণমাস ভরিয়া পদ্মাপুরাণ পাঠ হয় এবং পরে বিষহরি পূজা হয়।

* বিরুন্ন বা শিরইন একপ্রকার ধান। শ্রীহট্ট অঞ্চলে ইহার খুব আদর। নিম্ন সমাজে এখনও এই চাউলের ভাত রাঁধিয়া আত্মীয়কে নিমন্ত্রণ করা হয়।

কপালে তুই কিছুই বুঝ্‌বি না। এখন আর হুলি গান কোথায়? সেই রং খেলাই বা কোথায়?

পরে যখন চৈত্র মাসের প্রচণ্ড রৌদ্র, তখন আমরা গাহিতাম গাজনের গান। দলে দলে রাঙ্গা কাপড় পড়িয়া, সন্ন্যাসী সাজিয়া, রুদ্রাক্ষ ধারণ করিয়া, শিঙ্গা ফুঁকিয়া, জয় শঙ্কর নাদে বাহির হইতাম, ঢাকে ঢোলে গাজনের নাচ গান হইত। গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড রৌদ্রও আমাদের নিকট কষ্টকর মনে হইত না। এই সময় মুসলমান সম্প্রদায় রাত্রিকালে গাজির গানে বা জারিগানে মত্ত হইত। কোথাও বা চন্দ্র সওদাগরের কাহিনী গান করিয়া লোকে দু পয়সা উপার্জ্জনও করিত আজ কাল আর সেই দিন নাই, সেই আনন্দও নাই। দিন দিন লোকের সংখ্যা বাড়িতেছে ও সঙ্গে সঙ্গে পেটের জ্বালায় লোক অস্থির। এই জন্যই বলছি ভাই "তেমন দিন আর হবে না।" এই বলিয়া বৃদ্ধ নাতির দিকে তাকাইয়া দেখে যে নাতি কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন কাব্যভারতী।

মিলন যাত্রা।

ভুলে গেছি কবেকার সে কোন্ অতীত কথা,
পরাণে মোর ফুটল্ যবে সুখের মত ব্যথা!
কবে বাদ্য বেজেছিল বিয়ে বাড়ীর বুকে,
সানাইগুলি গানের ছলে কেঁদে উঠল সুখে,
ভোর না হতে সুরের চড়ায় ঠেক্‌ল ঘুমের তরী,
মা বোনেরা দূর্ব্বা নিয়ে গেল আশীষ করি!
তার পর সে যাত্রা সুরু কোন্ অজানা পথে,
চিরদিনের ঘরটি ছেড়ে চড়ে পাল্কী রথে;
বরযাত্রী সুখে গজে বিপুল সে বাহিনী,
আজো সে দিন মনে হলে স্বপ্ন বলে মানি!
রাজার ছেলে যাচ্ছি কি গো আন্‌তে রাজবালা,
তার দুইটি আঁখিপাতে কি স্বপ্ন দিয়ে ঢালা?
বুকের মাঝে সুপ্ত কি গো আঁচল ঢাকা হিয়া?
ঠোটের ভিতর লুপ্ত আজো উচ্ছল অমিয়া?
কণ্ঠে আজো ফুটেনি তার প্রেম-গুঞ্জরণ?
আঁখির কোণে হয়নি আঁকা মধুর অঞ্জন?
চমকে তার ফুটেনা কি গোলাপ কলি গালে?
থেকে থেকে কাঁপেনাক বক্ষ তালে তালে?
তাড়িত-ভরা রুধির ধার বয় না দেহে বেগে?
কিরণ-ঢালা হৃদয়-নভ ছায় না কভু মেঘে?
ফুটবে বলে হিয়া পদ্ম আজও কি গো বুজে?
আজো কি তায় আলোক-দূত পায় নি পথ খুঁজে?
হাসে খেলে গায় কি গান নাচে ধেয়ে ধেয়ে,
পাড়ায় পাড়ায় বেড়ায় ছুটে সে চঞ্চল মেয়ে?
খেলার ছলে পুতুল গলে পড়ায় কি সে মালা,
পরক্ষণেই ডুবায় তাহে জলে রাজার বালা?
পুতুল-শিশু কলিফুট হিয়ার পরে রাখে,
মাতৃস্নেহেরি পূর্ব্বরাগে রাখে কোলে কাঁখে?
রাজায় রাণী কনের কাছে বিয়ের কথা কয়,
আড়াল থেকে কখন শুনে কখন বসে রয়;
বাপ মায়েরে ছেড়ে যাবে কাঁদে কি তায় হিয়া?
অজানা সেই রাজপুত্র যাবে কি তায় নিয়া?
চির পুরোণো আবাসখানি বাপের হাসি মুখ,
ভাই বোনেরা যাদেরে হেরে স্নেহেতে পুরে বুক,
স্নেহ সরল পাড়ার লোক, জ্যাঠ দিদি তার,
সকল ছেড়ে যেতেই হবে কোলটি ছেড়ে মার?
যেতেই হবে ছেড়ে দিয়ে আদর পোষা 'পুষি'
এই ছিল কি ভালে লিখা মা বাপের এই খুসি?
ভাগ্যে লিখা যার সনেতে সারা দিনটা খেলে
রাতটা কাটে বুকে বুকে একি শয়ন মেলে,
ছেড়ে যাবে এক পরাণি ইন্দু সখী সেই,
ছেড়ে যাবে বকুলতলা ভালে কি লিখা এই?
সকাল সাঁঝে ফুল কুড়ানো সঙ্গী সখী নিয়ে
তারি তলায় বসে বসে মুখেতে মুখ দিয়ে

আকাশ পানে চেয়ে চেয়ে ফুলের মতই ফুটা,
বাঁধন হীন মেঘের মত হেথায় হোথা ছুটা,
নিজের রোপা চাঁপা গাছটি, জল ছিটানো তায়,
কোলের শিশু যেমন করে পালন করে মায়,
মেঘের খেলা চির পুরোণো নভ পটের পরে,
নিশীথ রাতে মোহন ছবি তারার মালা ধরে,
পুকুর জলে ছায়ার মেলা ম্লান তারার দীপ,
ভাঙা বীচির ভালে লিখা মন-ভুলানো টীপ ;
লেবু গাছের পাতার ফাঁকে চাঁদের উঁকি মারা
নিঝুম ধরা নিদে যখন চেতন কণা হারা,
পূবের ঘরে দাদার সাথে বৌদি যেথা শু'য়ে
কি কথা হয় শুনা কাণটি বেড়ার ফাঁকে থুয়ে ;
'কে রে' বল্লে অম্নি ছুটা কঙ্কন কাঁপায়ে
দিবসেতে দোষের বোঝা সখীতেই চাপায়ে ;
বৌদি যবে "দেখ্‌ব তবে" বলে দেখায় ভয়,
তারি সাথে স্নেহাভিমান লাজের অভিনয়,—
এ সব ছেড়ে কোথায় যাবে ঠিকানা তার নাই,
দিবস নিশি হিয়াটি তার কাঁদছে কি গো তাই ?

এম্নিতর কতই কথা কল্পনাতে এঁকে
আপন মনে ভাবছি বসে হিয়ার রঙে মেখে ।
বাহকদের গুণগুণানি মৌনতারে নাশি,
যাত্রীদলে গল্পগান পরাণ খোলা হাসি,
যে কোনো গাঁয় এলে অম্নি বাজনা জয়রোল,
প্রকৃতির গুপ্তবীণে অজানা কল্লোল,
কি হিল্লোলে আজ্‌কে নাচে নূতন রসে ভোর
করুণ-দীন গোপন-লীন মর্ম্মপুরে মোর !

আকাশ-ফাটা তপন জাল ধরায় গেছে ছেয়ে,
লতা-গুল্ম গজিয়ে উঠে তারি পরশ পেয়ে ;
তারি পরশ ভুলে হরষ নীলাম্বু অতলে,
তারি স্পর্শে হর্ষে নাচে বীচির মালা জলে ;

পরশে তার বৈশাখেতে বরষ মেলে আঁখি,
কণ্ঠে ফুটে কমকণ্ঠ কূজন-করা পাখী ;
অঙ্গে ফুটে তরঙ্গিয়া গতি ক্লান্তিহীন,
শূন্য প্রাণে গুঞ্জরিয়া উঠে সৃষ্টিবীণ !

ধীরে ধীরে দুপুর এল থম্‌কে গেল হাওয়া,
নীল সাগরে থেমে গেল মেঘের আসা-যাওয়া,
বুলবুলিটির কণ্ঠ মাঝে গানটি গেল মরি,
নিখিল আঁখি হঠাৎ নিদে আস্‌ল যেন ভরি,
'মেছোরাঙা' ক্ষান্ত দিল শিকার ধরার কাজ,
নদীর জলে নেমে এল আলস-ভরা সাজ,
ঝুমঝুমিটি ছেড়ে দিয়ে খোকা ঘুমায় ঘরে,
খোকার মা সে রান্নাঘরে ঘুমায় পিড়ি পরে,
তুলসী তলে ঠাকুর মায়ের থাম্‌লো পূজা রব,
পিঞ্জরেতে পোষা ময়না নিশ্চল নীরব ।
পাতাবাহার পাতায় পাতা প্রজাপতির পাখা,
সহসা তায় যায় না দেখা নিঝুম নিদে মাখা !

আমিই শুধু বহেই চলি পেরিয়ে নদী বনে,
পেরিয়ে কত প্রান্তরেরে আকুল জাগা মনে ;
হেথায় হের 'হোলির খাল' ! জলের সরু রেখা,
শীতের রোদে দুইটি পারে কাঁদা যায় যে দেখা,
ডাইনে মেলা ছায়াকুঞ্জে নীলকণ্ঠ গ্রাম,
বইছে বামে বিপুল নদী 'বল্‌দি' তাহার নাম,
সাম্‌নে পাতা আকাশ মেশা হরিত-আঁকা মাঠ,
দূর কিনারে ছায়ার মত সবুজ পল্লীবাট ।
নাইক বটে তের নদী সাতটা সমুদ্দুর,
এ মাঠটির প্রান্ত নহে কখ্‌খনো কম দূর !
খাসটি ছেড়ে পাল্কী পরে ছড়ায়ে দিনু গায়,
মাঠের কভু শেষ আছে কি শেষ আছে কি হায় ?
নয়ন পাতা স্বপন ভাবে কখন মুদে এল,
বাহির ছেড়ে প্রাণের মাঝে নিখিল ডুবে গেল !

এই নিখিলে নাইক পাতা পাতার কাঁপা আছে,
এই নিখিলে নাইক নদী বীচির মালা নাচে,
হেথায় আছে কিরণহীন ছায়ার উজ্জলতা,
হেথায় আছে কূজনভরা নিঝুম নীরবতা,
পাতার পাখে ফুল উড়িছে এই নিখিলের নভে,
ইটকাঠেরা ছিটকে ছুটে মিল পুরোণো নবে;
চুলের কাঁটা, দুধের হাসি জলো গঙ্গার পার,
রোদের গুঁড়া আঁখির মুদা, সিতি বলাকার,
মনের মলা, কবির কলা, পাঁকের রেখা কালো,
এক মালাতে সকল মিলি ছড়ায় গলে আলো!

স্বপন ছায়া কখন গেল স্বপ্ন-পুরীর দেশে,
ম্লান ধরার অপরাহ্নে উঠনু জাগি শেষে।
হরিত আঁকা মাঠের রেখা সবুজ বনভূমে
পাতায় শাখে জড়িয়ে এবে ডুবে আসল ঘুমে;
অস্ত রবির দীর্ঘ বাঁকা কিরণ শলাকারা
গাছের ফাঁকে জলে বিঁধে হয়ে আছে হারা;
বাঁশের বনে মুখর কবি বন-চিলেরা হাঁকে,
বুনো দেশের অতিথ নব পিকেরা সব ডাকে;
নেড়ে গাছের শাখে শাখে রক্ত শিমূল ফুল,
সবুজ বনের রাঙা আঁখি বলে হয় যে ভুল;
শিমুলতরু নিঃশেষিত রিক্ত হয়ে তবে
হৃদয়-ফলে দীর্ণ করি ছড়ায় তুলা ভবে,
আপনি জেগে নিখিলের সে সুখনিদ্রা তরে
অতুলন সে তুলা-শয়ন মেলে ধরার পরে!

ধীরে ধীরে গায়ের রেখা যাচ্ছে দেখা দূরে,
রাখাল শিশু চড়ায় গরু হেথায় হোথা ঘুরে;
সমকৃষ্ণ কাক আরোহী ধবলীটির পিঠে,
পৈজায় বিজ্ঞ ঘাড় নাড়িছে সুর হাঁকিছে মিঠে!

কলসী কাঁখে পাড়ার মেয়ে সজনে দীঘির পার,
দিনের পুঁজি উজাড় করি কমায় হিয়ার ভার।
নিবিড় কালো গভীর জলে লাল কুমুদের মেলা,
সজীব রাঙা কুমুদ ফুলে গাঁথা দীঘির বেলা।—
হয়ত কেহ ফুটে গেছে ফুটেনি বা কেহ,
নয়ন খুলে জলমুকুরে হেরিছে কেউ দেহ।
ফোটার আভাস কাঁপছে জলে কাঁপছে মাটি ছেয়ে,
অতল পানে তপন ডোবে ফোটার গানটি গেয়ে;
আঁধার-বুকে গজিয়ে উঠে ফোটার অণু গুলি,
হিয়ার ফুটো খুঁজে ফিরে অনিল-দোলে দু'লি;
ফোটার রাগে সারা দীঘির পরাণ গেছে পূ'রে,
ফোটার হাওয়া কুমুদ হতে কুমুদে যায় ঘুরে।
পেয়েছে কেউ পরশ তারি পায়নিও বা কেহ,
তারার আলোয় শুধু কারো ভরা মরম গেহ,
আর কেহ বা দিনের আলোর সুদূর পর পারে
আভাসে তার পরশ পেয়ে ফুটে উঠছে ধারে।
সময় হলো, আর বেশী না, নয়কো বেশী দেরী,
জগৎ জুড়ে জেগে উঠে মিলন-ডাকে ভেরী,
সারা দীঘির হৃদয় নভে উঠবে প্রাণ বঁধু,
জ্যোতির স্রোতে ঝরেপড়বে মিলন-ফুল-মধু;
তনু-ডাঁটায়-ভাঙা ঢেউয়ের আকুল ঘরে ঘরে
হাজার লাখে চাঁদের ছবি ফুটবে হাসিভরে,
তনু-বৃন্ত ঘিরি ঘিরি হাজার আলিঙ্গন,
শিশির-জমা আঁখির জলে হাজারো চুম্বন।

* * *

এমন কালে কে গো তুমি সিক্ত সিত বেশ
শুভ্র পূত ফুলটি যেন দুখের নাহি শেষ,
ফিরছ একা, নিশার মত মুদা আঁখির পাত,
তোমার ঘরে হাসবে না কি আজকে নিশানাথ?

* * * *

তুমিই বা কে চোখে মুখে রাঙা সজলতা,
ভরা ঘটের ভারে গেছে বেঁকে তনুর লতা?
দলটি ছেড়ে আপন মনে ফিরছ গেহপানে,

তোমার "তাঁরে" গাল দিয়েছে,লেগেছে তাই প্রাণে?
এই বুঝি এ ঘরটি তব? কাঁদ্‌ছে শিশু ফুলে,
এই বেলাতে কলসী রাখ, লওকো কোলে তুলে;
এ কেমন এ মার্‌ছ ওরে! রাগটি এত কেন?
বয়স বেশী নয়কো তব লভেছ ধন হেন!
আহা বাছার কোমল গায়ে লাগছে কত জানি,
মা মা ডাকি কাঁদ্‌ছে শুয়ে বাড়িয়ে দুটি পাণি!
হাঁ এইত এম্‌নি করি লওকো তুলি বুকে,
এম্‌নি করি আদর করি চুমো খাও তার মুখে;
একি নিজেই কাঁদ্‌লে ও যে অশ্রু যে ঝরিছে,
আঁখির দ্বারে জমাট হিয়া উচ্ছলি ক্ষরিছে!

* * *

মুঞ্জরিত আম তরুটি আড়ালে তার হায়,
চিরতরে মাতা শিশুর মিলন ঢ়বে যায়;
এতক্ষণে হয়ত দোঁহে আঁখি জলের মাঝে
সেজে উঠ্‌ছে সুখ-উজল হাসি-রেখার সাজে;
তার পরেতে আর কেহ সে চুমো দুইটি দিয়ে
মাতা শিশুর গণ্ডে দিবে অশ্রুটি মুছিয়ে;
হাসির রোদে দিবস রাতি ফুল ফুটিবে মুখে
হাসির রোদে ঢেউ খেলিবে গভীর বুকে বুকে।
আবার যবে হাসির রোদে তেতে উঠবে ধরা,
সুখের ঝলক ঝিলিক দিবে সীকর-কণা-হরা,
তপ্ত বালি তীক্ষ্ণধারে হাসবে সুখ-সূচি,
অশ্রু তখন আস্‌বে নামি তাপটি যাবে ঘুচি।
হাসি-কান্নার মালা গেঁথে জীবনের দিন গুণা,
রবির বুকে মেঘের খেলা, মেঘে কিরণ বুনা।

* * *

এমন সময় ঐ হের না ঐ হের ঐ চেয়ে
বিয়ে বাড়ীর আলোর গেছে ধরণীতল ছেয়ে,
বাজ্‌না এল এগিয়ে নিতে এগিয়ে নিতে তোরে,
এই বেলা তোর থাম্‌তে হবে নাম্‌তে হবে ওরে!
ওরে পান্থ পথ ফুরালো যাত্রা হলো সারা,
তার পর সে কি আছে রে কি রে আপন-হারা?

শ্রীসুখরঞ্জন রায়।

সাহিত্যিকের নানা কথা। *

"নমু বক্রবিশেষনিঃস্পৃহা গুণগৃহ্যা বচনে বিপশ্চিতঃ।"

নমো গণেশায়। ১

সিদ্ধিদাতা গণেশের নাম লইয়া কার্য্যারম্ভ করিবার রীতি আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল। এখন গণেশ তো দূরের কথা 'শ্রীদুর্গা' 'শ্রীহরি' পর্য্যন্ত লোপের মধ্যে। ছেলেবেলা যখন লিপি শিক্ষা করিতাম, তখন 'ক খ'র পূর্ব্বে একটি অদ্ভুত অক্ষর লিখিত হইত' তাহার নাম 'আঁজি'; এই আঁজির আকৃতি ছিল S এইরূপ অর্থাৎ ইংরেজী 'এস্‌' অক্ষরটি উল্টা করিয়া বসাইলে যাদৃশ দেখায়। ইহা গণেশেরই প্রতিরূপ—তাঁহার শুঁড় মাথা ও ভুঁড়ি দ্বারা উপলক্ষিত হইতেন। প্রাচীন দলিলাদিতেও একটি '৭' অঙ্ক প্রারম্ভে দেখা যাইত। ইহাও বোধ হয় গজপতির সশুণ্ড-মুণ্ডের চিহ্ন।

---

* যখন যে কথাটি মনে উদিত হয়, একখানি নোট্‌-বুকে তাহা লিখিয়া রাখি—তাহাই 'নানা কথা' এই শিরোনামে প্রচারিত হইতেছে। অনেকগুলি কথা ইতঃপূর্ব্বে নিজের (এবং অপর কোনও কোনও সাহিত্য বান্ধবের) নানা প্রবন্ধে স্থান পাইয়াছে; সেগুলি বর্জ্জন করিয়াছি। এই নানা কথার বিষয়গত শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে পারিব না—চিন্তা কখনও প্রণালীবদ্ধ ভাবে উপজাত হয় নাই, হইবেও না। বিশেষবিৎ পাণিনিও যখন "শ্বানং যুবানং মঘবানম্‌" এক সূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন, তখন এই অর্ব্বাচীনের এতদ্‌বিষয়ক ত্রুটি অবশ্যই সুধীগণ মার্জ্জনা করিবেন।

আধুনিক গনেশ। ২

দেব গণপতির দুইটি কার্য্য ছিল—বিঘ্নের নাশ এবং সিদ্ধি প্রদান। এই দুই কার্য্য যাঁহার দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাঁহার নাম গ্রহণ আধুনিক গ্রন্থলেখকগণও করিয়া থাকেন—উৎসর্গ পত্রে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। লেখা ও বিষয় যতই মন্দ হউক না কেন, ঐ "গণেশায় নমঃ" এর গুণে গ্রন্থের সমস্ত দোষ কাটিয়া গেল—এবং পাঠ্য নির্ব্বাচিত হইল। আবার স্কুলপাঠ্য গ্রন্থে আমাদের মহামান্য সম্রাটের ছবিও গণেশের মূর্ত্তিস্থানীয় হইয়াছে। এটা কিছু অশোভন নহে, কেন না রাজ-দর্শনও পুণ্যাবহ।

প্রাচীনকালে সমালোচনা।

প্রকাশ্য কাগজপত্রে না হউক, রাজদরবারে অথবা বড়লোকের মজলিসে কাব্যের সমালোচনা যে প্রাচীন কালেও চলিত, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই মহাকাব্য লক্ষণে আছে—

'আদৌ ... ...
নিন্দা খলাদীনাং সতাঞ্চ গুণকীর্ত্তনম্।'

মহাকবি কালিদাস তদীয় প্রথম কাব্য মেঘদূতে ইঙ্গিতে খলনিন্দা ও সজ্জন স্তুতি করিয়াছেন।

স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলা দুৎপতোদঙ্মুখঃ খং
দিঙ্নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থুলহস্তাবলেপান্।

মহাকাব্য অপেক্ষা দৃশ্যকাব্যের সমালোচনা বোধ হয় অধিকতর হইত। তাই কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রে দেখিতে পাই—

"পুরাণ মিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং
ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ ভজন্তে
মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ॥"

কালিদাস যাহা মৃদুভাবে বলিয়াছেন, ভবভূতি তাহা একটু জোরের সহিত কহিয়াছেন—

"সর্ব্বথা ব্যবহর্ত্তব্যং কুতোহ্যবচনীয়তা।
যথা স্ত্রীণাং তথা বাচাং সাধুত্বে দুর্জ্জনোজনঃ।"
(উত্তর চরিত)

তারপর "মালতী মাধবে" একেবারে চূড়ান্ত করিয়া দিয়াছেনঃ—

"যে নাম কেচি দিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।
উৎপৎস্যতে হস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা
কালোহ্যয়ং নিরবধি র্বিপুলা চ পৃথ্বী।"

অধুনাতন সমালোচনা। ৪

এটা ইংরেজের কাছ হইতে আমদানী। বঙ্কিমবাবুর বঙ্গদর্শন, যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের আর্য্যদর্শন, প্রভৃতির "দর্শন" আমাদের সাংখ্যপাতঞ্জল সূচক "দর্শনের" অনু-যায়ী নহে। ইংরেজী "এডিনবরা রিভিউ" ইত্যাদির "রিভিউ" শব্দের অনুবাদ। এডিনবরা রিভিউর অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। অতি সমালোচনায় অনিষ্টও যে না হইয়াছিল এমন নহে—কবি কীটস্ নাকি তীব্র বিরুদ্ধ সমালোচনায় ভগ্নহৃদয় হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তবে বায়রণের ধাত অন্যরকম ছিল—তিনি "ইংলিশ বার্ডস এণ্ড স্কচ্ রিভিউয়ার্স্" লিখিয়া প্রতিশোধ নিয়াছিলেন। * বঙ্কিম বাবুর দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের আবর্জ্জনা অনেকটা দূরীভূত হইয়াছিল, কিন্তু স্থায়ী ফল হয় নাই। তিনিও দুই চারি স্থলে গালি যে না খাইয়া-ছিলেন, এমন নহে। অধুনা বিস্মৃত "সুরলোকে বঙ্গের পরিবার" "বঙ্গীয় সমালোচক" "বলদ-মহিমা নাটক" ইত্যাদি পুস্তক পুস্তিকা তাঁহাকে গালি দিবার উদ্দেশ্যে প্রচারিত হইয়াছিল।

---

* ইদানীং সুপ্রসিদ্ধা মেরী কুরেলি তদীয় "ট্রেশার-অব হেভেন্" নামক গ্রন্থে সমালোচকদিগকে চিড়িয়া-খানায় পূরিয়া রহস্য করিয়াছেন।

অর্ব্বাচীন সমালোচনা। ৫

কিন্তু আজকাল যে ভাবে সমালোচনা চলিয়াছে, তাহাতে দলা-দলি রেষা-রেষি ইত্যাদি অনেক পাওয়া যায়। বঙ্কিম বাবুর দিনেও কতকটা গুরু লঘু জ্ঞান আমাদের সমাজে ছিল। তাই তদীয় প্রচেষ্টায় কিছু কাজও হইয়াছিল। এখন কেহ কাহারও প্রাধান্য মানিতে চায় না। আর মানিবেই বা কাকে? বঙ্কিম বাবু নাকি রমেশদত্তকে বলিয়াছিলেন "তোমরা যা লিখিবে তাহাই ভাষা হইবে।" সাহিত্য সম্রাটের এই অনুজ্ঞাবাণী এখন সকলেই আপনার পক্ষে খাটাইয়া যা' খুশী লিখিয়া থাকেন। কাব্যের রীতি অলঙ্কার গুণ-দোষ ইত্যাদির বোধ তো উঠিয়াই গিয়াছে--শব্দের বানান অথবা অর্থ যাহারা জানে না, এমন লোকও গ্রন্থকার বলিয়া পরিচিত—"মাসিক পত্র ও সমালোচনের" সম্পাদক। ইঁহাদের দ্বারা সমালোচনাই বা কি হইবে, আর ইঁহাদের কথাই বা কে শুনিবে? ব্যাপার দেখিয়া যাঁহারা ক্ষমতাবান্ ব্যক্তি তাঁহারা "মৌনং তত্রহি শোভনম্" রীতি অবলম্বন করিয়া বসিয়া আছেন। দেশের অবস্থা বাস্তবিক শোচনীয় বলিতে হইবে।

বনানী ও সেনানী। ৬

সেদিন কোনও পত্রিকায় দেখিলাম "বনানী" শব্দ বনরাজী অর্থে লিখিত হইয়াছে। পাণিনি ব্যাকরণের ৪।১।৪৯ সূত্রানুসারে 'অরণ্যানী' ইত্যাদি হয়। বর্ত্তমানে যদি সংস্কৃতভাষা জীবিত থাকিত, তাহা হইলে নবীন কোনও কাত্যায়ন বা পতঞ্জলি হয়ত ইহারই পরে "বনস্য চ' এইরূপ একটী 'বার্ত্তিক' বা 'ইষ্টি' যুড়িয়া দিতেন। ফলতঃ 'বনানী' শব্দটী চালাইলে কোনও অন্যায় হয় না। বঙ্গ ভাষায় যাঁহারা ব্যাকরণ লিখিবেন, তাঁহারা তদ্ধিত প্রকরণে অরণ্যানীর পার্শ্বে "বাঙ্গলায় বনানীও এইরূপে সাধিত হইতে পারে"—ঈদৃশ একটি মন্তব্য দিয়া শব্দটির প্রচলনে সহায়তা করিতে পারেন। তবে "সেনানী" সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কথা। সংস্কৃতে এবং তদনুযায়ী ভাষায় ইহার একটি অর্থ রূঢ় হইয়া আছে। ইহা এখন "সেনাগণ" অর্থে ব্যবহার করিলে অপপ্রয়োগ হইবে মাত্র। মহাকবির (স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল *) প্রয়োগ বশতঃ ইহা স্থলবিশেষে মার্জ্জনীয় হইতে পারে, কিন্তু গ্রহণীয় হইতে পারে না।

সততা ও মহানতা। ৭

বঙ্গভাষায় 'সততা' শব্দটী বোধ হয় টিকিয়া গিয়াছে। 'সত্তা' 'সত্ত্ব' 'সত্য' প্রভৃতি দ্বারা যাহা বুঝায়, 'সততা' দ্বারা তাহা হইতে ভিন্ন অর্থ সূচিত হইয়া থাকে এবং এই আকৃতিগত বৈলক্ষণ্যই ইহার অর্থভেদে সহায়তা করিতেছে। 'ত' কে হলন্ত না করিয়া অকারান্ত করাটাতে ব্যাকরণগত ভুল আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু বঙ্গভাষায় হলন্ত ও অদন্তে পার্থক্য কোথায়? ধরুন শব্দরূপ; 'সৎ' ও 'সত' এই দুইটিতে কোনও প্রভেদ দেখা যায় না। অতএব যদি বঙ্গভাষায় কোনও সংস্কৃত সূত্র করিতে হয় (যেমন "প্রাকৃতের" আছে), তাহা হইলে বলিতে হইবে, "সর্ব্বে হলন্তা অদন্তা ইব সুপ্ তিঙ্ তদ্ধিতেষু"। এত বড় না হউক, অন্ততঃ এতাদৃশ একটা বিধি করা প্রয়োজন। কিন্তু 'মহানতা' † সম্বন্ধে উপরি লিখিত মন্তব্য খাটে না। 'মহত্ব' দ্বারা যদি কেবল চরিত্রোৎকর্ষই বুঝায়, তাহা হইলেও 'বিশালত্ব' প্রভৃতি দ্বারা অনায়াসে ভাব প্রকাশ করা যায়। এস্থলে আপত্তির কারণ এই যে, এখানে দ্বিবিধ অশুদ্ধি আছে (১) 'মহৎ' শব্দটির (যাহা বঙ্গভাষায় গৃহীত হইয়াছে) পরিবর্ত্তে 'মহান্' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে এবং (২) ইহাকে অকারান্ত করা হইয়াছে। একটি বরং সহ্য যায়, কিন্তু অনেক গলদ অমার্জ্জনীয়।

---

* "শুনিয়াছি কোলাহল সেনানীর"
দ্বিজেন্দ্রলালের "সীতা"—৮১ পৃঃ

† শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় কৃত "ইংরেজবর্জ্জিত ভারতবর্ষ"

ভাষা ও ব্যাকরণ। ৮

ব্যাকরণ দ্বারা ভাষা নিয়মিত হইয়াছে, কিন্তু জীবন্ত* ভাষাকে শৃঙ্খলিত করা যে সে কাজ নহে। যাঁহারা সেকালের 'হাইলি' 'লেনি' কৃত ইংরেজী ব্যাকরণ পড়িয়া ইংরেজী ভাষা শিখিয়াছেন, তাঁহারা আজকালকার নূতন সংকলিত ইংরেজী ব্যাকরণ দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, জীবন্ত ভাষার দৌড় কত। তথাপি ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা খুব। নচেৎ উচ্ছৃঙ্খল লেখকগণের দৌরাত্ম্যে ভাষার সৌষ্ঠব হানি হয়। বঙ্গভাষা জীবন্ত ভাষা; ইহার ব্যাকরণও আছে; কিন্তু এই ব্যাকরণ ভূয়োভূয়ঃ পরিবর্ত্তনশীল। পরন্তু এই পরিবর্ত্তন যিনি করিবেন তিনি স্বয়ং শক্তিশালী লোক হইবেন। সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে বিশেষজ্ঞ হওয়া চাই, আবার ইংরেজী এবং আরবী পারসীতেও কিঞ্চিৎ প্রবেশ হওয়া আবশ্যক।

জনাব ও গবর্ণর জেনারল। ৯

'প্রকৃতিবাদ' একখানি উৎকৃষ্ট অভিধান। সংকলয়িতা একজন প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু কেবল সংস্কৃত বা সামান্য ইংরেজী জানিলে কি হইবে—অনেক শব্দ আরবী পারসী হইতে আগত,তাহাও তো ধরিতে হইবে। এই অভিধানে 'জনাব' শব্দটীর ব্যুৎপত্তি এইরূপ দেওয়া হইয়াছে—

(জন—অব্ রক্ষা করা, ক্বিপ্—ক) বিং ত্রিং, লোকপালক।

পণ্ডিত মহাশয় পারসী জানিতেন না, তাই এই বিড়ম্বনা ঘটিয়াছে। আমার স্মরণ হয়, যখন সম্মতি আইন উপলক্ষে 'বঙ্গবাসী' পত্রের প্ররোচনায় এক সহরের কতিপয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত "শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারল মহোদয় সমীপে" আবেদন পত্র পাঠাইতে ছিলেন, তখন একজন পণ্ডিত প্রচার করিলেন যে,'গবর্ণর জেনারেল' শব্দের পরিবর্ত্তে অপর সংস্কৃতজ একটি শব্দ ব্যবহার করা যাউক। তখন অন্য একজন বৈয়াকরণ বলিয়া উঠিলেন, "ইহাকেই সংস্কৃত বলিয়া ধরুন না কেন? দেখুন, "গো+অর্ণ+র+জ+ইন+অর+ল" —গবর্ণর জেনারল; গৌ ভূমিশ্চ অর্ণং জলং চ গবর্ণে। তে স্তঃ অস্য (দেশস্য) ইতি গবর্ণরঃ-দেশঃ; তস্মিন্ জায়ন্তে যে তে গবর্ণরজাঃ, তেষাম্ ইনাঃ রাজানঃ ইতি গবর্ণরজেনাঃ, এতদ্দেশস্থা রাজানঃ; তান্ অরং ক্ষিপ্রং লয়তি (স্বগুণে) গৃহ্নাতি (ইতি ক)-গবর্ণর,-জেনারলঃ।"

বাঙ্গালার অভিধান ও ব্যাকরণ। ১০

একটা রব বহুদিন হইতে শুনিতে পাই, বাঙ্গালার অভিধান ও ব্যাকরণের অভাব! তাহা ঠিক কি? মানুষের কোনও কিছুই গলদ শূন্য হইবে, ইহা আশা করা বৃথা। 'সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর' অভিধান বা ব্যাকরণ নাই বলিয়া অভিধান ও ব্যাকরণ নাই একথা বলা যাইতে পারে না। 'প্রকৃতিবাদ' অভিধানখানি বেশ—তাহার অনুসরণে 'প্রকৃতিবোধ' 'প্রকৃতি নির্ণয়' ইত্যাদি বহু হইয়াছে। ব্যাকরণের মধ্যেও 'সাহিত্য প্রবেশ' ব্যাকরণ খুবই ভাল; তৎপ্রকার "ব্যাকরণ মঞ্জুষা" 'ব্যাকরণ সার' ইত্যাদি বহু ব্যাকরণ হইয়াছে। তবে যাঁহারা রব উঠান, তাঁহাদের পেটের কথা এই যে, ঐ সকল ব্যাকরণ ও অভিধান "সংস্কৃত" অনুযায়ী এবং তাঁহাদের সংস্কৃতে জ্ঞান অনেক সময় শোচনীয়। একজন মহাত্মা 'সুহৃদোত্তম' লিখিয়াছেন, আর একজন 'প্রবেশমানা পত্নী' লিখিয়াছিলেন। সুতরাং ইঁহারা "ব্যাকরণ নাই" একথা বলিতে বাধ্য। একজন পারুষ্য স্থলে 'পৌরুষ' লিখিয়াছেন, 'তিমিরাচ্ছন্ন' স্থলে 'নিবিড়াচ্ছন্ন' লিখিয়াছেন।* অতএব, ব্যাকরণ বা 'অভিধান' ইহাদের না থাকিবারই কথা। ইতি—কস্যচিৎ বিদ্যাবিনোদস্য

*"জীবন্ত" শব্দটি দেখিয়া কেহ যেন চমৎকৃত না হন; শত্রু স্থানে 'অন্ত' বাঙ্গালার বৈকল্পিক প্রয়োগ বরাবর চলিয়া আসিয়াছে।

* এই সকল উদাহরণ বড় বড় সাহিত্যরথী মহারথ হইতে সংগৃহীত; নাম বলিয়া তাঁহাদিগকে অ-পদস্থ করা অনুচিত মনে করি। সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বিদ্যারত্ন এম্‌-এ মহাশয় এতাদৃশ গলদ বহু ঘাটিয়া "ব্যাকরণ বিভীষিকা" প্রভৃতি লিখিয়াছেন।

কস্থর কবুল।

(১)

সাগর পারের সভ্যতা লো শ্রীপদে তোর নমস্কার।
জীবন থেকে এবার তোকে করবো মোরা বহিষ্কার।
ঠেকে ঠুকে ঢের শিখেছি, সইছি এখন মনস্তাপ;
ছেড়ে দে তুই কেঁদে বাঁচি—দূর করি সব মনের পাপ।
তোর কাছে হায় যা পেয়েছি বেবাক্ মোদের ধার করা;
স্বাস্থ্য গেছে, শান্তি গেছে, যৌবনে তাই পাই জরা।
ঢের ঘুরেছি পথে পথে, মায়ের ছেলে যাই ঘরে;
বলবো আজি বলবো ক'টি মনের কথা থর্ থরে।

(২)

মুনি ঋষির বংশধরের কোথায় প্রাণের নির্ম্মলতা?
পরের পাতের এঁটো চেটে হারাই জাতির বিশিষ্টতা!
যেই বামুনের ধূসর পায়ে বিশ্ববাসীর লুটতো মাথা,
সেই বামুন আজ লক্ষীছাড়া, রান্না ঘরে নাড়্ছে হাতা!
ভোগ-লালসার তোলবতীর কলুষ ভরা গাঁতার জলে,
আগে ভাগে পাপের ভরা ভাসায় বামুন কর্ম্ম-ফলে।
সেই বামুনের অনুকরণ করলো অপর জাত্ ক'টি;
তার ফলে আজ দেশটা জুড়ে একটা ভীষণ নটুখটি।

(৩)

সভ্যতার সব গুণ্ড রোগে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছি ক্রমে;
ভুক্তভোগী দেশের মানুষ, আর পোড়ো না এমন ভ্রমে!
এখনো ঘোর, সময় আছে—সামলে চলো এই বেলা!
ঘরের দিকে তাকাও এখন, আস্তেছে ভাই খুব ঠেলা!
বাঁচ্তে যদি চাও সকলে বরণ করো প্রাচ্যতা!
আঁকড়ে ধরো আঁকড়ে ধরো দেশের প্রাচীন সভ্যতা!
মনের শুচি আসল শুচি, হ্যাটকোটে সব খুঁৎ ঢাকা;
খাঁটি রেখে মনকে তোমার উচিত ঋষির মান রাখা!

(৪)

হায়রে নকল সাহেব সাজা, দেশের পিণ্ডি চট্‌কানো!!
জাতির খাঁটি বিশিষ্টতা মুছতে তোম্‌রা খুব জানো!
ঘর্ম্মে হাজার মর্ম্ম গলুক্, আঁটা পোষাক রইবে ঠিক্;
গাধার টুপি মাথায় দিয়ে ছুটিস্ বোকা দিগ্বিদিক্।
অনুকরণ করিস্ যাদের তারা খাঁটি সব দেশে;
বজায় রাখে জাতীয়তা খাওয়া ভাষা ভাব বেশে।
মরবে তবু গ্রীষ্ম দেশের কিছুই তারা মানবে না;
আমার দেশের নকল সাহেব এইগুলি কি শিখ্‌বে না?

(৫)

ভারতবাসী চায় না রে ভাই ধন দৌলতের কুলীনতা!
চায় না তারা অমন ধারা কপট প্রাণের কুটিলতা!
প্রাচীন জাতিভেদটি বরং হাজার গুণে বলুব্বা ভালো;
টাকা পয়সার কুলীনতায় জীবন এখন মসী-কালো!
রোগে শোকে দরিদ্রতায় ক্রমে ক্রমে হচ্ছি শেষ;
এখন যদি না ফিরি তো ধ্বংস হবে সোনার দেশ!
এটা সেটা ইত্যাদি সব ঢের তো খেলাম অখাদ্য;
পূর্ব্ব পুরুষ মুনি ঋষির আর হবো না অবাধ্য!

(৬)

ময়লা যাদের কাপড় চোপড়, অপরিষ্কার শরীর মন,
তাদের সাথে খাওয়ার আগে জীবন করো বিসর্জ্জন।
স্পর্শদোষে আহার দোষে রক্ত হবে দুষ্ট রে!
সেই শোণিতের সার ধাতুটা আর কি হবে পুষ্ট রে!
কুকুর-শৃগাল-ধর্ম্ম ফুটে উঠবে আপন সন্তানে;
কামড়ে টুঁটি ধরবে তারা, ধর্‌ছে যেমন সব খানে!
ধাপে ধাপে ওঠার রীতি প্রচার করে হিন্দুরা;
সেইটি আবার প্রচার করো, পাবে সুখের দিন পুরা!

(৭)

ঘরের লক্ষী পায় ঠেলেছি, পাচ্ছি এখন খুব সাজা;
তাইতো এখন দিন যামিনী হাড়ে মাসে হই ভাজা!
সর্ব্বনাশী সভ্যতা লো, ধন্যি তোমার কেরদানি!
যা দিছ তার নাই তুলনা, আর কোরো না রগ্রানি!

কা চুরুট আর কোকেন—কোকোর বিষে হচ্ছি অল্লায়ু;
সুরা জীবন করলো গুড়া, ত্রিশেই ছাড়ি শেষ-বায়ু!
বিলাসিতার লাভ বুঝেছি, জীবন কাটে লোকসানে;
করবো সরল জীবন যাপন, শান্তি আছে সেইখানে।

(৮)

বাবুয়ানার আগুনের জিভ্ স্বর্গ বুঝি স্পর্শ করে!
তাই বুঝি পাপের প্রসার সমান এখন বাইরে ঘরে।
অনাবৃষ্টির অনাসৃষ্টির বাইরে ভীষণ অত্যাচার;
ঘরের ভিতর নীরস নারীর চটক ভারী চমৎকার!
বিবিয়ানা বিদ্যা এখন, গয়না—শাড়ী জ্যাকেট্ জামা;
রাতে দিনে চল্‌তেছে খুব গলা-সাধা সা-রি-গা-মা!
ঘরে ঘরে "অমর" এখন, উপন্যাসের অপ্সরী!
প্রাণের মানুষ কেঁদে বলে—"রক্ষে করো, পায় পড়ি!"

(৯)

চাইনে মোরা সহর-জোড়া হ্যাট্-কোটের এই সভ্যতা;
বিশ্বব্যাপী যুদ্ধটা আজ্ জানাচ্ছে তার উচ্চতা।
চাইনে কলের হাওয়াগাড়ী, চাইনে কামান বারুদ গোলা;
প্রতীচ্যে সব পচ্‌তে থাকুক্,থাকুক্ তাদের শিকেয় তোলা!
উড়ো জাহাজ,মকর পোত আর বোমার ভীষণ ফাটাফাটি!
সাগর পারেই চলুক জোরে, চাইনে মোরা কান্নাকাটি!
ধর্ম্ম তাদের ধামা চাপা, তাই তো এত দুর্গতি;
স্বদেশবাসী, সাম্‌লে চলো—দূর করো সব দুর্ম্মতি!

(১০)

ব্রহ্মচারী ছাত্রদের সেই গাছের নীচে জ্ঞানার্জ্জন,
সেই আমাদের ভালো ছিল, দিলাম সে সব বিসর্জ্জন!
দালান কোঠার গোলামখানায় শিখ্‌ছি এখন বাঁদ্‌রামি;
দাঁড়ে ব'সে "মাই লর্ড, সার্" হচ্ছে শেখা দিন-যামি!
চাইনে খেতে চপ্ কাট্‌লেট্, চাপরঘণ্ট ঢের ভালো;
ধুতি চাদর বজায় থাকুক্, কারণ—গায়ের রং কালো।
ধর্ম্ম মোদের সকল কাজে, আঁকড়ে তাকেই ধর্‌বো রে!
রক্তলোচন সভ্যতা লো, 'কুত্তা তেরা বোলায় লে'!!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

সাহিত্যিক অবদান:—

রঙ্গপুর সাহিত্যপরিষৎ হইতে প্রকাশিত (১) অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ; (২) কৃত্তিকাবিজয়; (৩) আহ্নিকাচার তত্ত্বাবশিষ্ট; (৪) নিমাই চরিত; (৫) সত্যনারায়ণের পাঁচালী; (৬) কর্পূরস্তব, অনুমান ১১০০ এগার শত পৃষ্ঠায় এই ছয়খানি পুস্তক তিন টাকার স্থলে এক টাকায় বিক্রয় করা হইতেছে। যাঁহারা সম্পূর্ণ সেট ক্রয় করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহাদিগকে প্রত্যেক গ্রন্থের জন্য অর্দ্ধমূল্য প্রদান করিতে হইবে। যাঁহারা অন্ততঃ একসেট গ্রন্থ ক্রয় করিবেন, তাঁহাদিগকে কামরূপ, গৌরীপুর, মালদহ, পাবনা ও রাজসাহী অধিবেশনের দেড় সহস্রাধিক পৃষ্ঠার সচিত্র কার্য্যবিবরণ ও অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধাবলী সমন্বিত গ্রন্থরাজি প্রয়োজনীয় ডাক মাশুল ও প্যাকিং মাত্র লইয়া প্রদান করা হইবে। বলা বাহুল্য, সর্ব্বপ্রকার পুস্তকেরই ডাক মাশুল গ্রাহকের দেয়। গ্রন্থের সংখ্যা অধিক হইলে রেলওয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে, রেলওয়ে যোগে পুস্তক গ্রহণই সুবিধাজনক। পূর্ব্বোক্ত পূর্ণ সেট গ্রন্থ ক্রেতৃদিগকে রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার পুরাতন খণ্ডগুলি ৩ তিন টাকাস্থলে এক টাকায় প্রদান করা হইবে। অন্যথা পূর্ণ মূল্য প্রদান করিতে হইবে। রঙ্গপুর সাহিত্যপরিষদের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিলে গ্রন্থাদি প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।